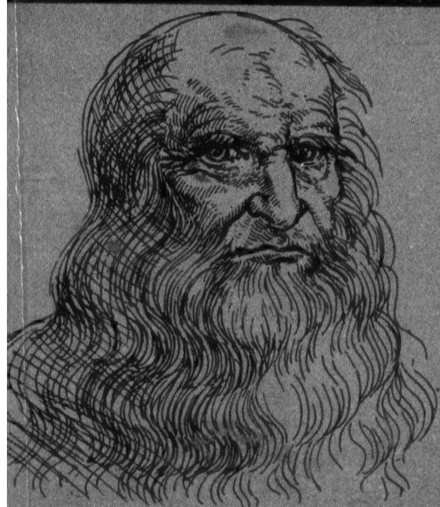
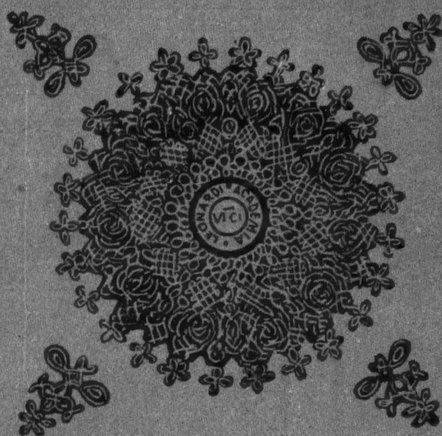
সমকালীন **প্রাণিবিদ্যা**





অরূপ কুমার সিংহ
সীমানন্দ অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবর্ষ স্নাতক শ্রেণীর পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত

সমকালীন প্রাণিবিদ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ অরূপকুমার সিংহ
ও
ডঃ সীমানন্দ অধিকারী

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন
৫৪বি পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ সম্পর্কে দু'চার কথা

রেনেসাযুগের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো-দ্য-ভিন্সি। একদিকে তিনি যেমন মোনালিসার রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে শিল্প জগতে অমরত্ব লাভ করেছেন অন্যদিকে এই বিচিত্র মানুষটি কারিগরি, ভাস্কর্য, স্থপতিবিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্বের গভীর চর্চা ও গবেষণায় তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রাণিবিজ্ঞানের ব্যবচ্ছেদ, শারীরবৃত্ত, প্যাথোলজি, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর গবেষণালব্ধ ফল পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক দিন পর্যন্ত অজানা ছিল। সামাজিক অবস্থা বা ধর্মীয় আবহাওয়া এই সব তথ্য প্রকাশনের অনুকূল ছিল না। শব ব্যবচ্ছেদ অথবা নারীদেহের শারীরবৃত্তীয় বর্ণনা সে যুগে ধর্মীয় ও সামাজিক অপরাধ হিসাবে গণ্য হত।

লিওনার্দো-দ্য-ভিন্সির মৃত্যুর প্রায় তিন শতাব্দী পরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর প্রাণিতত্ত্বের গবেষণার চিত্রসহ পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন সংগ্রহশালা থেকে প্রকাশিত হয় এবং প্রাণিতত্ত্ববিদরা ও সাধারণ মানুষ শিল্পীর সৃজনশীলতার নূতন দিগন্তের সন্ধান পান।

প্রচ্ছদে শিল্পীর প্রতিকৃতি, তাঁর বহু অলংকৃত স্বাক্ষর এবং শিল্পীর নিজের হাতে আঁকা ঘোড়া ও মানুষের মুখের রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সমকালীন প্রাণিবিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এ বছরের গোড়ার দিকে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝে কিছু সময় কেটে গেছে এবং এই সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকারা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য প্রচণ্ড তাগাদা দিয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তুগুলো বর্তমানের প্রাণিবিদ্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচণ্ড রকম গবেষণা চলছে এবং প্রায় প্রতিদিনই বিষয়বস্তুগুলোতে নূতন জ্ঞান সংযোজিত হচ্ছে। এই রকম একটা বিষয় হচ্ছে জীনতত্ত্ব। ছাত্রছাত্রীদের জীনতত্ত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞানের বুনিয়াদকে শক্ত করবার জন্য জীনতত্ত্ব উপস্থাপনায় গতানুগতিকতা পরিহার করে বিষয়বস্তুর অবতারণায় পরীক্ষামূলক ভাবে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছি। এ-বিষয়ে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক অনুজপ্রতিম সচ্চিদানন্দ মণ্ডল অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে আমাদের শ্রমলাঘব করেছেন। এছাড়া পাণ্ডুলিপি পড়ে মতামত জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সুপারিশ করে একাধিক সহকর্মী আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নামগুলোর তালিকা এত দীর্ঘ যে সেগুলো অনুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

পাঠ্যসূচীর নববিন্যাসকে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মোড়কে এখনো পুরোপুরি ঢাকতে পারা যায় নি। তাছাড়া কিছুটা জোর কদমে চলার চেষ্টা করেছি। সুতরাং তথ্য বা বিষয়বস্তু পরিবেশনায় এদিক-ওদিক হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ-সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী ও একই বৃত্তিধারী সুধীদের মতামত আহ্বান করছি। আশা রাখি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো দূর করতে পারবো।

অরূপ কুমার সিংহ
সীমানন্দ অধিকারী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রাণিবিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এই সংস্করণ প্রকাশ করতে কিছু দেরী হল। দেরীটা অনিচ্ছাকৃত সেজন্য আশা করছি মার্জনা পাবো।

প্রাণিবিদ্যা প্রকাশের পর ছাত্রছাত্রী ও সমবৃত্তিধারী শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা এসেছে। সেগুলো গুরুত্ব অনুসারে যতদূর সম্ভব পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নাম অনুক্ত রাখাই উপস্থিত যুক্তিযুক্ত মনে করছি।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু সর্বতোভাবে সমান নয়। তবে পাঠ্যসূচী পরিবেশনায় যতদূর সম্ভব নিয়মনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছি।

এই সংস্করণের পঞ্চম অধ্যায়ে জৈব রসায়ন সংযোজিত হয়েছে—যেহেতু দুএকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে জৈব রসায়ন অন্তর্ভুক্ত আছে। অল্প পরিসরে এবং সহজবোধ্য করে জৈব রসায়ন আলোচনা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে শ্রী সুনন্দ অধিকারীর অকাতর সাহায্য আমাদের মনে থাকবে।

অরূপ কুমার সিংহ
সীমানন্দ অধিকারী

সূচীপত্র

● প্রথম অধ্যায়

কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ব

● দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবর্তন ও অভিযোজন

● তৃতীয় অধ্যায়

ভ্রূণতত্ত্ব, কলা, অঙ্গতন্ত্র ও কলাস্থান

• চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

● পঞ্চম অধ্যায়

জৈব রসায়ন

প্রথম অধ্যায়

কোষ, ক্রোমোসোম বংশগতি ও জীনতত্ত্ব

জীব জগতের ভিন্নতার মধ্যে একত্ব হইল কোষ। কোষ জীবিত বস্তুর গঠন ও কর্মের একক। বহু বৎসরের গবেষণায় কোষ সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক কিছু জানা গিয়াছে; যদিও অনেক কিছু এখনো অজানা রহিয়াছে। কোষ ও কোষ-অঙ্গাণু সম্পর্কে বর্তমানে যাহা জানা গিয়াছে তাহা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

জীবনের সৃষ্টি একবারই হইয়াছে। সময়ের স্রোতে জীবনের প্রবাহে যে বৈচিত্র্য আসিয়াছে সেই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক ক্রোমোসোম তথা DNA। ক্রোমোসোমের গঠন, কোষ বিভাজনে ইহাদের আচরণ এবং বংশগতিতে ইহার ভূমিকাও বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ 1

কোষ, কোষের উপাদান ও কোষ অঙ্গাণু

1.1 প্রোটোপ্লাজম ও কোষ

জীবনের লক্ষণ, স্থায়িত্ব এবং বিস্তার এক অত্যাশ্চর্য রাসায়নিকের মধ্যে নিহিত থাকে। এই রাসায়নিকটি হইল **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm)। পরিব্রাজক বিজ্ঞানী **পারকিনজি** (Purkinje) 1839 খৃষ্টাব্দে 'প্রোটোপ্লাজম' শব্দটির প্রচলন ও ব্যবহার করেন। রাসায়নিক বিবর্তনের (Chemical evolution) মধ্য দিয়া অজৈব বস্তু হইতে জৈব বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া যে প্রোটোপ্লাজমের উদ্ভব হইয়াছে সেই প্রোটোপ্লাজমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক কিছু জানা গিয়াছে। প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন উপাদান, উপাদানগুলির পরিমাণ এবং উপাদানগুলি কিভাবে রাসায়নিক যৌগ গঠন করিয়া আছে সে সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীদের জ্ঞান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

জীবিত বস্তুর দেহের প্রোটোপ্লাজম সুসংহত হইয়া **কোষের** মধ্যে অন্তরীণ থাকে। অর্থাৎ জীবিত দেহের গঠন ও কর্মের একক যে কোষ সেই কোষের মধ্যে থাকিয়া প্রোটোপ্লাজম যাবতীয় জৈব কার্য সমাধা করে।

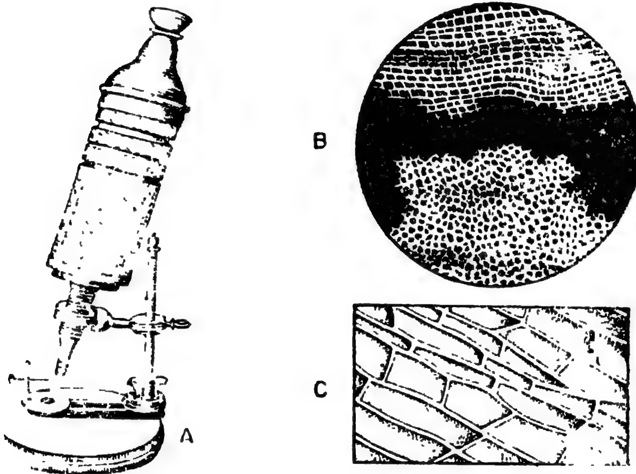
কোষ জীবিত বস্তুর গঠন ও কর্মের একক। অ্যামিবা হইতে মানুষ সকলের দেহই কোষ দ্বারা গঠিত। জীবিত বস্তুর দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারাও গঠিত হইতে পারে। আবার অসংখ্য কোষ সমষ্টিগতভাবে একটি জীবিত বস্তু গঠন করিতে পারে। কোষ অণুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। সুতরাং কোষ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্বে সম্ভব হয় নাই।

1.2 কোষতত্ত্বের ইতিহাস

গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 384-322 B. C.) বলেন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের দেহের গঠনের মধ্যে সমতা আছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের দেহের মধ্যেই একই ধরনের গঠনগত এককের পুনরাবৃত্তি থাকে (All animals and plants, however complicated, are constituted by few elements which are repeated in each one of them)। অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যের সত্যতা প্রায় আঠারো শত বৎসর পরে কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরেই প্রমাণিত হয়।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo de Vinci, 1452-1519) ক্ষুদ্রাকার বস্তু পর্যবেক্ষণে আতস কাঁচের (Lens) উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। জ্যানসেন ভ্রাতৃদ্বয় (1590) প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জনক হইলেও জীবিত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম ব্যবহার করেন রবার্ট হুক (Robert Hooke,

1635-1703)। নিজ উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বোতলের ছিপি হিসাবে যে শোলা বা কর্ক (Cork) ব্যবহার করা হয় সেই কর্কের গঠন পরীক্ষা করেন (চিত্র 1.1)। তিনি দেখেন যে কর্ক একই ধরনের অনেকগুলি ছোট ছোট 'কক্ষ' দ্বারা সৃষ্ট। এই কক্ষগুলিকে তিনি কোষ নামে অভিহিত করেন। তিনি যে কর্ক পরীক্ষা করেন তাহা ছিল মৃত গাছের অংশবিশেষ। সুতরাং জীবিত কোষে যে সমস্ত বস্তু থাকে সেগুলি তাঁহার নজরে পড়ে নাই। কোষের মৃত প্রাচীরগুলিই তিনি সর্বপ্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় দেখেন। তবে একথা সত্য যে তিনিই **সেল'** (Cell) কথাটির স্রষ্টা। 1665 খৃষ্টাব্দে হুক তাঁহার **মাইক্রোগ্রাফিয়া** (Micrographia) পুস্তকে কোষের কথা চিত্রসহকারে বর্ণনা করেন। কোষ ছাড়াও তিনি



চিত্র 1.1 A. রবার্ট হুক ব্যবহৃত মাইক্রোস্কোপ. B এবং C. রবার্ট হুকের দেখা কর্কের গঠন (রবার্ট হুকের "মাইক্রোগ্রাফিয়া" হইতে)।

খনিজ পদার্থের গঠন, তুলা সুত্রের গঠন এবং ছোট গাছ ও প্রাণী সম্বন্ধেও তাঁহার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে রবার্ট হুক জাতিতে ইংরাজ ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি একটি রসায়নাগারের সহকারী কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি রয়াল সোসাইটির কিউরেটর (Curator) নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে 1662 খৃষ্টাব্দে **রয়াল সোসাইটি অফ লণ্ডন ফর ইমপ্রুভিং ন্যাচারাল নলেজ** (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) নামক বিজ্ঞানীদের এই আদি সোসাইটির জন্ম হয়।

মারশেলো ম্যালপিঘি (Marcello Malpighi, 1628-1694) উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের গঠনের একক হিসাবে যে সমস্ত গ্লোবিউল (Globules) এবং স্যাকিউলসের (Saccules) কথা বলেন সেগুলিকেও অবশ্য কোষের নামান্তর হিসাবে

গণ্য করা যাইতে পারে। নেমিয়ান গ্রু (Nehmian Grew, 1641-1712) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উদ্ভিদ দেহের কোষ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেন এবং এই কোষের অনেক ছবি অংকন করেন। সেল শব্দটি তিনি ব্যবহার না করিলেও উদ্ভিদ দেহের আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে তাঁহার অঙ্কিত ছবি হইতে অনেক তথ্য জানা যায়।

লিউয়েনহক (A V. Leeuwenhoek, 1632-1723) সেই সময়ে প্রচলিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কিছুটা উন্নতিসাধন করেন। তিনি (চিত্র 1.2) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রাকার প্রাণী ও উদ্ভিদ, রক্তের কোষ, শুক্রকীট ইত্যাদি পরীক্ষা করেন। প্রাণিদেহের মাংসপেশী, নার্ভ, ত্বক্ এবং ক্ষুদ্রাকার পতঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষার জন্যও তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এক কথায় তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য নূতন পথ নির্দেশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একথাই বলা হয় যে তিনি "বিন্দুতে সিন্ধু" দেখিয়াছিলেন।



চিত্র 1.2 লিউয়েনহক—এক বিন্দু জলে একসিন্ধু আণুবীক্ষণিক দেখেন।

রবার্ট হুকের পর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের গঠনের একক হিসাবে কোষকে চিহ্নিত করিতে প্রায় দেড় শত বৎসর লাগিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে কোষ সম্বন্ধে যাহারা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন তাঁহারা হইলেন উলফ (Wolf, 1759), দ্য মিরবেল (de Mirbel, 1802), ওকেন (Oken, 1805) এবং ল্যামার্ক (Lamark, 1809)। ডুট্রোশে (Dutrochet, 1824) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদের দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশকে যদি নাইট্রিক অ্যাসিডে সিদ্ধ করা হয় তাহা হইলে ঐ অংশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ কণাগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রবার্ট হুক বর্ণিত কোষের ন্যায় দেখায়। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহের গঠনে ছোট ছোট কক্ষ বা কোষের উপস্থিতি সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হন।

রবার্ট হুক কোষ প্রাচীরের দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। কোষ প্রাচীরের ভিতরে যে সমস্ত উপাদান থাকে সেগুলি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ গঠনে কোষের সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়।

1831 খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) অর্কিডের (Orchid) কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতির কথা বলেন এবং ঐ নিউক্লিয়াসের বর্ণনা দেন। 1832 খৃষ্টাব্দে ডুমোরটিয়ার (Dumortier) শৈবাল (Algae) জাতীয় উদ্ভিদের কোষ বিভাজন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 1835 খৃষ্টাব্দে ডুজার্ডিন (Dujardin) কোষমধ্যস্থ জেলীর ন্যায় থক্থকে পদার্থটিকে সারকোড (Sarcode)

আখ্যা দেন। অবশ্য পরবর্তী কালে হুগো ভন মোল (Hugo von Mohl, 1846) সারকোড শব্দটির পরিবর্ত হিসাবে প্রোটোপ্লাজম কথাটি ব্যবহার করেন। আবার কোনও কোনও জীববিদ্যার ইতিহাসবিদ্ বলেন যে প্রোটোপ্লাজম শব্দটি পারকিনজি প্রথম 1839 খৃষ্টাব্দে ব্যবহার করেন।

1.3 সেল থিয়োরী বা সেল ডকট্রিন (Cell Theory or Cell Doctrine)

বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহ গঠনে কোষের উপস্থিতি বিষয়ে সকল জীব-বিজ্ঞানীরা একমত হইলেন। কিন্তু প্রাণিদেহ গঠনে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট কোন কোষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত কেহ নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রাণিদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অণুবীক্ষণের তলায় দেখিয়া উহাতে উদ্ভিদের ন্যায় সুগঠিত 'কক্ষ' বা 'সেল' (Cell) স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে পাইলেন না।

এই সময়ে জার্মান দেশের বিজ্ঞানী থিয়োডার স্যোন (Theodor Schwann, 1810-1882) কোষ সম্বন্ধে তৎকালীন ধারণার আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। তখনও পর্যন্ত কোষ বলিতে কোষবেষ্টনকারী প্রাচীরকে বুঝান হইত। সোন কোষ-


A


B

চিত্র 1.3 স্যোন (A) এবং শ্লাইডেন (B) - সেল থিয়োরীর যুগ্ম প্রবক্তা।

প্রাচীর হইতে দৃষ্টিকে কোষ-প্রাচীর মধ্যস্থ অঙ্গাণুগুলির দিকে আকৃষ্ট করিলেন। কোষের পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যায় স্যোন সম্পূর্ণ নূতনত্ব আনিয়া দেন। এখানেই তাঁহার কৃতিত্ব।

1831 খৃষ্টাব্দে ব্রাউন উদ্ভিদ কোষে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতির কথা বলেন। সোন প্রাণিকোষ লইয়া নানান পরীক্ষা করেন। তিনি প্রাণিকোষেও নিউক্লিয়াস দেখেন কিন্তু কোষ-প্রাচীর দেখিতে পান নাই। তবে তিনি বলেন যে নিউক্লিয়াস একটি তরল পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং খুব সম্ভবত এই তরল পদার্থকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তরল পদার্থটির বাহিরে একটি পাতলা পর্দা থাকে। তিনি ধারণা

করিলেন যে কোষ-প্রাচীর বিষয়ে প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদ-কোষে ভিন্নতা থাকিলেও কোষ-প্রাচীর মধ্যস্থ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষে প্রচুর সমতা রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিউক্লিয়াসের কথা বলা যাইতে পারে। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের কোষেই নিউক্লিয়াস বর্তমান।

এই সময় আর একজন জার্মান বিজ্ঞানী স্লাইডেন (M. J Schleiden, 1804-1881) প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষের গঠনের মধ্যে সমতার কথা বলেন।

প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে আকারগত ভিন্নতা রহিয়াছে কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদকে গঠন একক বা কোষের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে উহাদের মধ্যে গঠনগত সমতা রহিয়াছে। বস্তুত কোষ সকল জীবিত বস্তুর গঠন একক। এই মতবাদকে বলা হয় **সেল থিয়োরী বা সেল ডক্ট্রিন** (Cell theory or Cell doctrine)। স্যোন ও স্লাইডেনকে (চিত্র 1.3) এই মতবাদের যুগ্ম স্রষ্টা বলা হয়। 1833-1839 খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বলা হয়—

1. প্রত্যেক জীবিত বস্তুর গঠন একক কোষ।
2. প্রত্যেক জীবিত বস্তুর জীবনের আরম্ভে একটিমাত্র কোষ থাকে।

একটি কোষ হইতে অন্য একটি কোষ কিভাবে সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে স্যোন ও স্লাইডেনের ধারণা নির্ভুল ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন একটি কোষের অভ্যন্তরে আর একটি কোষ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভ্রূণের গঠন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে একটি জনিতৃকোষ হইতে মাইটোসিস (Mitosis) পদ্ধতির কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। অপত্য কোষ দুইটি দেখিতে জনিতৃকোষের ন্যায়। এই পর্যবেক্ষণ হইতে **রুডলফ ভারচাউ** (R. Virchow) 1855 খৃষ্টাব্দে বলেন পূর্বসৃষ্ট একটি কোষ হইতেই অন্য কোষ সৃষ্টি হয়। ফলে স্যোন ও স্লাইডেনের সেল থিয়োরীতে আরও একটি সার্বজনীন সত্য সংযোজিত হয়। এই সত্যটি হইল পূর্বসৃষ্ট কোষ হইতে অন্য কোষের সৃষ্টি (*Omnis cellulae cellula*—all cells from cell)। ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষের আবিষ্কার, ইহারা কোষ ছাড়া কিছু নহে এবং ইহারাই মিলিত হইয়া নূতন জীবনের সৃষ্টি করে - এই কথা প্রমাণিত হওয়ায় ভারচাউ-এর বক্তব্যের সহিত সকলে একমত হন। জীবনের ধারা কোষ হইতে কোষের মধ্য দিয়াই বংশপরম্পরায় অব্যাহত থাকে।

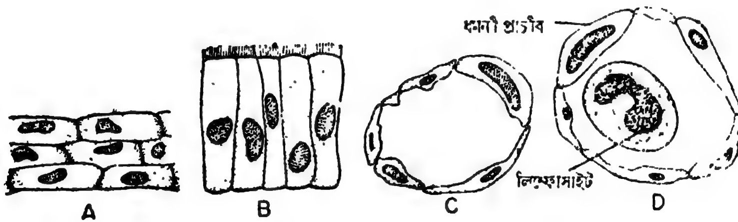
তাহা হইলে সেল থিয়োরীর মূল কথা হইল—

1. প্রত্যেক জীবিত বস্তুর গঠন একক কোষ (All bodies are made up of cells)
2. প্রত্যেক জীবিত বস্তুর জীবনের আরম্ভে একটি মাত্র কোষ থাকে (Life starts as a single cell)।
3. পূর্বসৃষ্ট কোষ হইতে অন্য কোষের সৃষ্টি হয় (A cell always originates from a pre-existing cell)।

1.4 কোষ

সেল থিয়োরীর প্রতিষ্ঠা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি ও কোষ অঙ্গাণু পর্যবেক্ষণে রাসায়নিক বস্তুর উপযোগিতা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোষের উপাদান ও অঙ্গাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানা তথ্য জানিতে পারেন। কোষ, কোষের উপাদান ও অঙ্গাণু সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

a. **কোষের সংজ্ঞা** : কোষ বলিতে সাধারণত পাতলা আবরণী বেষ্টিত খানিকটা প্রোটোপ্লাজমকে বুঝান হয়। এই প্রোটোপ্লাজম অবশ্য **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) ও **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm)—এই দুই অংশে বিশেষিত হইয়া যায় এবং সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। তাহা হইলে কোষের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে কোষ, কোষ আবরণী বেষ্টিত একটি নিউক্লিয়াস-যুক্ত কিছুটা সাইটোপ্লাজম। কিন্তু এই সংজ্ঞা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কেন না কোষ নিউক্লিয়াসবিহীন হইতে পারে, যথা—স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহের পূর্ণ গঠিত (Mature) **লোহিত রক্তকণিকা** (Erythrocyte)। আবার অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে—যথা, **প্যারামোশিয়াম** (*Paramoecium*)। ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া বা ব্লু-গ্রীণ শৈবাল (Blue-green algae) ইত্যাদি জীবিত বস্তুর দেহে আবার সুচিহ্নিত নিউক্লিয়াস থাকে না। সুতরাং কোষের গঠন নির্ভর নির্ভুল সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নহে। সেই কারণে কোষের সংজ্ঞা দিবার জন্য বর্তমানে বলা হয় যে কোষ অর্ধভেদ্য (Semipermeable) পর্দাবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের এক ক্ষুদ্র অংশ যাহা উপযুক্ত পরিবেশে নিজস্ব উপাদানগুলি নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে।

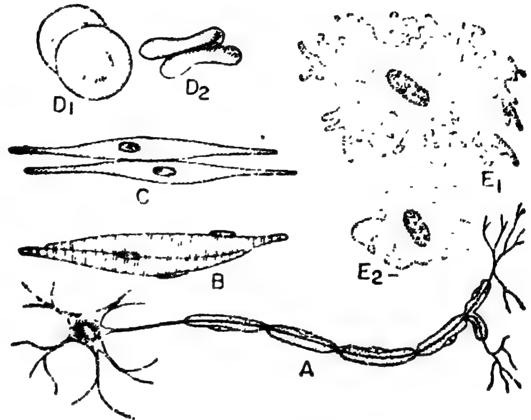


চিত্র 1.4 একই প্রজাতির প্রাণীর দেহ গঠনকারী কোষের বৈচিত্র্য। (A) ত্বকের কোষ, (B) পৌষ্টিক নালীর কোষ, (C) ধমনী প্রাচীরের কোষ এবং (D) ধমনী প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ লিম্ফোসাইট।

b. **কোষের আকার**—সব কোষের আকার এক রকম নহে। কোষের আকারের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। কোষ গোলাকার, স্তম্ভকের ন্যায়, ত্রিকোণাকৃতি, লম্বা, নলাকার ইত্যাদি নানা আকারের হয়। বিভিন্ন এককোষী প্রাণী এবং শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের কোষের আকারের মধ্যে বৈচিত্র্য বর্তমান। অনেক এককোষী প্রাণীর কোষ আবরণী বিশেষিত হইয়া **ফ্লাজেলা** (Flagella, *plural of* Flagellum), **সিলিয়া**

Cilia, *plural of* Cilium) ইত্যাদি সৃষ্টি করে ফলে কোষের আকারে ভিন্নতা আসিয়া পড়ে। অনেক এককোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদের কোষ আবরণীর বাহিরে আরও একটি সিলিকীয় (Silicious) আবরণীর সৃষ্টি হয় এবং ইহা এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের আকার মোটামুটি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই প্রাণীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষের মধ্যে আকারগত পার্থক্য দেখা যায় (চিত্র 1.4)। বহুকোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে কোষের আকার কোষের কাজ ও সংস্থাপনার উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল (চিত্র 1.5)। মানুষের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষের মধ্যে কোষের আকারজনিত পার্থক্য খুব স্পষ্ট। ডিম্বকোষ গোলাকার এবং তুলনায় আকারে বড়। পক্ষান্তরে শুক্রকোষ লম্বা, ফ্লাজেলামযুক্ত এবং আকারে ডিম্বকোষের তুলনায় অনেক ছোট।



চিত্র 1.5 প্রাণিদেহের বিভিন্ন আকারের কোষ। A = নার্ভকোষ, B—C = পেশী কোষ, $D_1 - D_2$ = লোহিত রক্তকণিকা, $E_1 - E_2$ = মেলানোসাইট।

সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও কোষের আকার কোষের কাজ ও সংস্থাপনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাণ্ডের আকার লম্বা হওয়ায় কাণ্ড গঠনকারী অনেক কোষ লম্বাকার। কাণ্ডমধ্যস্থ সংবহনকারী (Conducting) কোষগুলি আকারে লম্বা।

কোষের আকার পৃষ্ঠ টান (Surface tension) ও কোষের উপর চাপ (Pressure) এই দুইটি প্রধান শর্তের উপর নির্ভর করে। কলা কৃষ্টির (Tissue culture) সময় কোষের আকার সাধারণত গোলাকার হইয়া যায়।

c. **কোষের মাপ** (Cell size)—কোষ আণুবীক্ষণিক। কোষের মাপ বুঝাইতে যে এককের ব্যবহার করা হয় তাহাকে বলে মাইক্রন (Micron)। কোষ অঙ্গাণুগুলি ও ভাইরাসের জন্য আরও ছোট একক এঙ্গস্ট্রম (Angstrom) ব্যবহার করা হয়।*

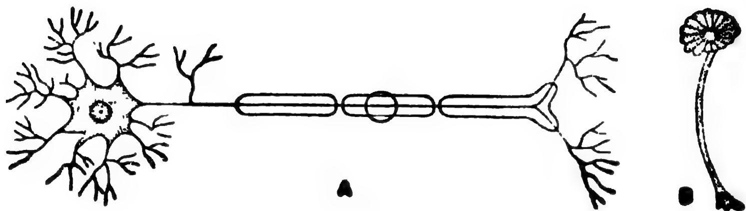
কোষের মাপের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। উটপাখীর (Ostrich) ডিম, এককোষী উদ্ভিদ অ্যাসিটেবুলেরিয়া (Acetabularia) বা মানুষের নার্ভকোষ

* অধুনা মাইক্রন (μ) বুঝাইতে মাইক্রন মিলিমিটার (μm) চিহ্ন এবং এঙ্গস্ট্রমের পরিবর্তে 10^{-1} nm ব্যবহৃত হয়। nm = ন্যানোমিটার (nanometer)।

$$1\ \mu m = \frac{1}{1000} mm,\ 1\ nm = \frac{1}{1000} \mu m,\ 1\ angstrom\ (\AA) = 10^{-1} nm\ or\ \frac{1}{10} nm$$

আকারে সর্ববৃহৎ (চিত্র 1.6)। আবার জীবাণু মাইকোপ্লাজমার (Mycoplasma) মাপ 1 μm অপেক্ষা কম। কোষের মাপ ছোট বা বড় হওয়া অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কোষের মধ্যে মৃত বস্তু, সঞ্চিত খাদ্য ও বর্জ্যদ্রব্যের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

একই প্রাণীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষের মাপের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। মানুষের নার্ভকোষ প্রত্যঙ্গ সমেত প্রায় এক মিটার লম্বা হইতে পারে। মানুষের ত্বক্ গঠনকারী কোষ, যকৃতের ও বৃক্কের কোষের গড় মাপ 30 μm। আবার মানুষেরই লোহিত রক্তকণিকার মাপ 7 μm (চিত্র 1.7) এবং ছোট শ্বেত রক্তকণিকার মাপ 3 হইতে 4 μm।

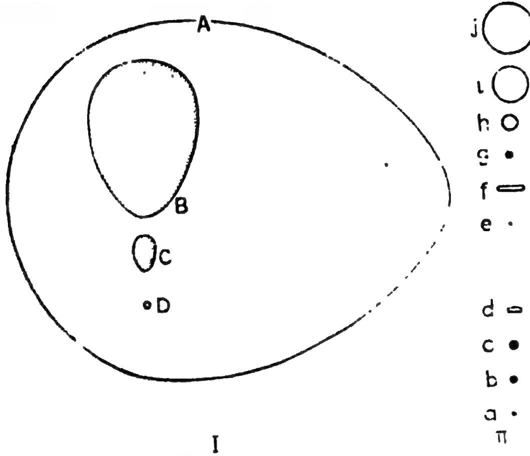


চিত্র 1.6 সর্ববৃহৎ কোষ — (A) প্রাণিদেহের সর্ববৃহৎ কোষ নার্ভকোষ এবং (B) উদ্ভিদের মধ্যে অ্যাসিটেবুলেরিয়ার কোষের আকার সর্ববৃহৎ।

কোষের মাপ কোষ পৃষ্ঠের (Cell surface) কতটুকু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শে থাকে তাহা নির্ধারণ করে। কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিপাকজনিত নানা রাসায়নিক বস্তু প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হয়। কোষ আবরণী এই সমস্ত রাসায়নিকের বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ছাড়াও পরিপার্শ্ব হইতে কতখানি পদার্থ কোষের অভ্যন্তরে আসিবে তাহা নির্ধারণ করাও কোষ আবরণীর কাজ। কোষের আকার বড় হওয়ার অর্থ কোষ পৃষ্ঠের মাপ কম হওয়া। সুতরাং একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বড় আকারের কোষের আভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে প্রায় উপবাসে থাকিতে হয় কেন না কোষের মাপের তুলনায় কোষ পৃষ্ঠ কম হওয়ায় পরিপার্শ্ব হইতে পরিমাণ মত পুষ্টি-দায়ক রাসায়নিক কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। অবশ্য ইহা সবসময়ে সত্য হয় না। কোষ পৃষ্ঠের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য অনেক কোষে নানা ধরনের গঠনবিস্তৃতি থাকে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্যনালীর স্তম্ভকাকার আবরক কোষ (Columnar epithelial cells) এবং বৃক্কনালীর কোষের কথা বলা যাইতে পারে। স্তম্ভকাকার আবরক কোষের যে অংশ খাদ্যনালীর গহ্বরের দিকে থাকে সেই অংশের কোষ আবরণী সূচের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য মাইক্রোভিলাই (Microvilli, *plural of* Microvillus) সৃষ্টি করে। ইহার ফলে কোষ পৃষ্ঠের মাপ বাড়িয়া যায়। আবার বৃক্কনালীর ভিত্তি গঠনকারী কোষসমূহের (Basal cells) কোষ আবরণী দুই তিন প্রস্থে ভাঁজ হইয়া যায় এবং কোষ পৃষ্ঠকে বাড়াইয়া দেয়।

কোষের মাপ কোষের মধ্যে কি হারে বিপাকীয় কাজ চলে তাহার উপর নির্ভরশীল। সাধারণত বিপাকীয় কাজ যে সমস্ত কোষে বেশী হারে হয় সেই সমস্ত কোষ আকারে ছোট।

কোষের মাপ নানান শর্তের উপর নির্ভর করে। তবে একথা বলা হয় যে কোষের মাপ অন্যূন 20 nm হওয়া চাই। ইহা অপেক্ষা ছোট হইলে ইউক্যারিওটিক কোষ (Eukaryotic cell) বাঁচিতে পারে না।



চিত্র 1.7 কোষের মাপের পার্থক্য।

I. A = উটপাখীর ডিম (170 mm × 135 mm), B = মুরগীর ডিম (60 mm × 45 mm), C = হামিং পাখীর ডিম (13 mm × 8 mm) এবং D – মানুষের ডিম (0·1 mm)।

II. a = হিমোগ্লোবিন অণু (7nm) ; b = ফেজ (80 nm) ; c – নিউমোনিয়াস ব্যাক্টিরিয়া (100 nm × 200 nm) ; d = ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস (500 nm × 200 nm) ; e = ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস (0 5 nm × 0 2 nm) ; f – টাইফয়েড ব্যাসিলাস (2·4 nm × 0·5 nm) ; g = লোহিত রক্তকণিকা (7 μm) ; h – যকৃৎ কোষ (20 μm) ; i – অ্যাসটেরিয়াসের ডিম (70 μm) ; j = মানুষের ডিম (100 μm)।

d. **কোষের সংখ্যা**—প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত হইতে পারে। কিন্তু বহুকোষী প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে অসংখ্য কোষ থাকে। প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ আকারে বড় হইলেই তাহাদের দেহে কোষের সংখ্যা বেশী হয়। কিন্তু ইহা সর্বদা সত্য নহে। একই মাপের চঞ্চল প্রাণী ও প্রোথিত প্রাণীর (Sedentary) দেহের কোষের সংখ্যা গণনা করিলে দেখা যায় যে চঞ্চল প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোষের সংখ্যা কম (চঞ্চল প্রাণী = পতঙ্গ, পাখী এবং প্রোথিত প্রাণী = অ্যাম্ফিঅক্সাস)।

1.5 কোষের প্রকারভেদ

কোষ অর্থে অল্প পরিমাণ সাইটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম মধ্যস্থ নিউক্লিয়াস এবং কোষ আবরণীকে বুঝান হয়। কিন্তু কিছু আদি (Primitive) জীবিত বস্তুর গঠনের মধ্যে ঐ তিন প্রধান কোষ অঙ্গাণু সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে না। ব্যাক্টিরিয়া ভাইরাস এবং ব্লু-গ্রীণ শৈবাল (Blue-green algae) ঐ সমস্ত আদি জীবিত বস্তুর উদাহরণ। কিছু কোষ অঙ্গাণুর অভাব থাকায় ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস ও ব্লু-গ্রীণ শৈবালের কোষগুলিকে প্রোক্যারিওটিক কোষ (Prokaryotic cell) বলা হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জীবিত বস্তুর কোষে সব কয়টি কোষ অঙ্গাণু সুবিন্যস্ত অবস্থায় উপস্থিত থাকে তাহাদের ইউক্যারিওটিক কোষ (Eukaryotic cell) বলা হয়। আদ্যপ্রাণী অ্যামিবা হইতে মানুষ সকলেরই দেহ ইউক্যারিওটিক কোষ দ্বারা গঠিত।



চিত্র 1.8 প্রোক্যারিওটিক কোষসমূহের চিত্ররূপ—(কালো বৃত্ত = নিউক্লিওপ্রোটিন। A = দণ্ডাকৃতি ভাইরাস—নিউক্লিওপ্রোটিন ও প্রোটিনের সংস্থাপন। B = ব্যাকটিরিয়া এসেরিকিয়া কোলাইতে নিউক্লিওপ্রোটিন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। C = ব্লু-গ্রীণ শৈবাল — নিউক্লিওপ্রোটিন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে।

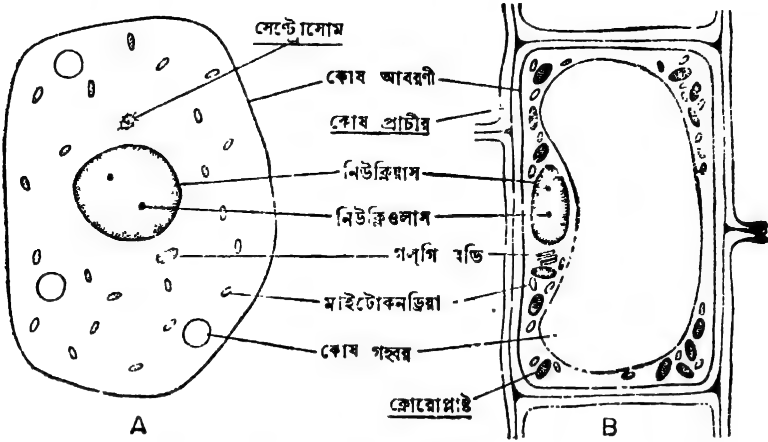
সাধারণভাবে প্রোক্যারিওটিক কোষে নিউক্লিয়াস সুগঠিত অবস্থায় থাকে না। তবে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু থাকে তাহাদের প্রোক্যারিওটিক কোষের মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় (চিত্র 1.8)। প্রোক্যারিওটিক কোষে নিউক্লিও আবরণী (Nuclear membrane) না থাকায় নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ বস্তুসমূহ সাইটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া যায়। প্রোক্যারিওটিক কোষে লিপিড ও প্রোটিন যোগে সৃষ্ট কোষ আবরণী বা ঝিল্লী থাকে না।

প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বস্তুত বিষয়টি বিতর্কমূলক। তবে ইহা সত্য যে প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে প্রভেদ খুব স্পষ্ট।

16 ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন

যে সমস্ত কোষ কোষের সংজ্ঞা পুরাপুরি পালন করে তাহাদের প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ (Eukaryotic cells) বলা হয়। অ্যামিবা হইতে মানুষ

অথবা শৈবাল হইতে বটবৃক্ষ—সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষই প্রকৃত বা ইউ-ক্যারিওটিক কোষ। ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে আকার ও মাপের বৈচিত্র্য



চিত্র 1.9 ইউক্যারিওটিক কোষ. A = আদর্শ প্রাণিকোষ, B = আদর্শ উদ্ভিদকোষ। উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে কয়েকটি অঙ্গাণু নিম্নরেখিত করা হইয়াছে। (গল্গি স্থলে গলজি পড়িতে হইবে)।

সর্বাধিক। কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজম মধ্যস্থ বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু (Organella) এবং নিউক্লিও আবরণীযুক্ত সুগঠিত নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক কোষের বৈশিষ্ট্য (চিত্র 1.9)। ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন দুইটি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয়। এই দুইটি অংশের একটি হইল ইহার A. আণবিক গঠন (Molecular structure) এবং অন্যটি হইল ইহার B. **অণুবীক্ষণিক গঠন** (Microscopic structure)। আণুবীক্ষণিক গঠন পর্যালোচনায় সাধারণ অণুবীক্ষণ (Light microscope) এবং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ (Electron microscope) ব্যবহার করিয়া যে তথ্য জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

A. **কোষের আণবিক গঠন**—আণবিক গঠন বলিতে কোষের প্রোটোপ্লাজম যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান লইয়া গঠিত সেই সমস্ত উপাদান এবং উপাদানগুলির মধ্যে যে রাসায়নিক সংযুতি থাকে তাহাদের বোঝান হয়। প্রোটোপ্লাজম বিশ্লেষণ করিয়া যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রোটোপ্লাজমের ওজনের সিংহভাগ (প্রায় 95%, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই চারিটি মৌলিক পদার্থ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। বাকী 5% অন্যান্য প্রায় 30টি মৌলিক পদার্থের ভাগে। প্রোটোপ্লাজমের মৌলিক রাসায়নিক-গুলির নাম ও পরিমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল·

মৌলিক পদার্থের নাম	শতকরা ওজন
অক্সিজেন	62
কার্বন	20
হাইড্রোজেন	10
নাইট্রোজেন	3
ক্যালসিয়াম	2·50
ফসফরাস	1·16
ক্লোরিন	0 16
সালফার	0 14
পটাসিয়াম	0·11
সোডিয়াম	0· 0
ম্যাগনেসিয়াম	0·07
আয়োডিন	0 014
আয়রণ	0 010
	99·244
ট্রেস্ এলিমেন্ট (Trace element), যথা—ম্যাঙ্গানিজ, বোরণ, সিলিকণ, কপার ইত্যাদি	0 756
	100·000

এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত সকল মৌলিক পদার্থ সমুদ্রের জলে পাওয়া যায়। জীবন তথা প্রোটোপ্লাজমের উদ্ভব হইয়াছিল সমুদ্র জলে। সুতরাং যদি একথা মনে করা যায় যে প্রোটোপ্লাজমের গঠনের মধ্যে সমুদ্রের উপাদানগুলি আজিও প্রতিফলিত রহিয়াছে তাহা হইলে বোধ হয় ভুল হইবে না। উপরোক্ত অধিকাংশ মৌলিক পদার্থ এককভাবে না থাকিয়া অন্য মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া যৌগ রূপে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে। যৌগগুলিকে দুইটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়—
a. অজৈব যোগ এবং b. জৈব যৌগ।

a. **অজৈব যৌগসমূহ**

জল অজৈব যোগসমূহের মধ্যে প্রধান। প্রোটোপ্লাজমের শতকরা 5 হইতে 90 বা ততোধিক ভাগ জল। এই জলের কিছু অংশ মুক্ত (Free) এবং কিছু অন্য বস্তুর সহিত যুক্ত (Bound) অবস্থায় পাওয়া যায়। কোষে যত পরিমাণ জল থাকে তাহার শতকরা 95 ভাগ মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং বিভিন্ন অজৈব রাসায়নিকের দ্রাবক রূপে কাজ করে। বাকী 5 ভাগ কোষের অন্যান্য রাসায়নিক বিশেষত প্রোটিনের সহিত যুক্ত অবস্থায় থাকে। দাঁতের এনামেল অংশে অথবা কোন কোন গাছের বীজে জলের পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগ। মজ্জাহীন অস্থিতে (Marrowless bone) ইহার পরিমাণ শতকরা 25 ভাগ। দুধে জলের পরিমাণ শতকরা 90 ভাগ। জেলি ফিস

(Jelly fish) নামক একনালী প্রাণীর দেহে 95 ভাগ জল। একজন মানুষের সমগ্র দেহে শতকরা 67 ভাগ জল থাকে।

জল জীবিত বস্তুর গঠনে এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। জলের কিছু গুণাগুণই ইহার প্রয়োজনীয়তার কারণ। জল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবক (Solvent) অর্থাৎ জলে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক রাসায়নিক বস্তু দ্রবীভূত হইতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়া সার্থক হওয়া অনেকটা বিক্রিয়াশীল বস্তুর দ্রবীভবনের উপর নির্ভরশীল। দ্রব বস্তুগুলি আকারে ছোট হইয়া অণু (Molecule) বা আয়ন (ion) অবস্থা পায়। জল দ্রাবক রূপে দ্রব বস্তুগুলিকে আকারে ছোট করিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্য করে।

জলের আর একটি গুণ ইহার স্থায়িত্ব। জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। জলে দ্রবীভূত অবস্থায় রাসায়নিকগুলির মধ্যে যে বিক্রিয়া ঘটে সেখানে দ্রাবকের (জলের) গঠন অণু-বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ সমস্ত বিক্রিয়া আর ঘটিতে পারিবে না।

প্রোটোপ্লাজমে অন্যান্য অজৈব পদার্থের সমষ্টির পরিমাণ শতকরা 5 ভাগ। এই সমস্ত পদার্থের কিছু কিছু কঠিন অবস্থায় এবং অধিকাংশই দ্রবীভূত অবস্থায় প্রোটোপ্লাজমে থাকে। কঠিন অবস্থায় থাকা অজৈব পদার্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হইল ক্যালসিয়াম ও সিলিকন (Silicon)। অস্থি ক্যালসিয়াম ফসফেট $[Ca_3(PO_4)_2]$ দ্বারা গঠিত। শামুকের খোলক ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) দ্বারা গঠিত।

দ্রবীভূত অবস্থায় যে সমস্ত অজৈব পদার্থ থাকে তাহাদের কিছু কিছু মুক্ত (Free) অবস্থায় এবং অধিকাংশই আয়ন অবস্থায় থাকে। প্রোটোপ্লাজমের পরাধর্মী বা ধনাত্মক-চার্জ সমন্বিত অজৈব পদার্থ হইল—হাইড্রোজেন আয়ন (H^+), ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{++}), সোডিয়াম আয়ন (Na^+) সোডিয়াম আয়ন (K^+) এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়ন (Mg^{++})। প্রোটোপ্লাজমের অপরাধর্মী বা ঋণাত্মক চার্জ সমন্বিত অজৈবগুলি হইল হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-), কার্বোনেট আয়ন ($CO_3^=$), বাই-কার্বোনেট আয়ন (HCO_3^-), ফসফেট আয়ন ($PO^=$), ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) এবং সালফেট আয়ন ($SO_4^=$)।

b. জৈব যৌগসমূহ

জৈব যৌগ তাহাদের বলা হয় যাহাদের মধ্যে কার্বন পরমাণু কার্বন পরমাণুর সহিত যুক্ত থাকে (Linked carbon)। এক কথায় জৈব যৌগ সেইগুলিই যাহার মধ্যে কার্বন থাকে। অবশ্য ইহার কিছু ব্যতিক্রম থাকে। কার্বোনেট উদ্ভূত যৌগগুলি জৈব যৌগ নহে। সেই কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), কার্বোনেট আয়ন ($CO_3^=$), বাই-কার্বোনেট আয়ন (HCO_3^-), এবং কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) অজৈব যৌগ। কিন্তু মিথেনের (CH_4) মধ্যে যদিও কার্বন পরমাণুর সহিত কার্বন পরমাণুর যোগ থাকে না তথাপি ইহাকে জৈব যৌগ বলা হয়।

প্রোটোপ্লাজমে অনেক ধরনের জৈব যৌগ থাকে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)। এই সমস্ত যৌগের পরিমাণ বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষের প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন। মানুষের দেহের সামগ্রিক ওজনে প্রোটিন 15 ভাগ, লিপিড 13 ভাগ এবং কার্বোহাইড্রেট 1 ভাগ পাওয়া যায়।

অনেক অণুর সমন্বয়ে জৈব যৌগ সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টিতে একই (Similar) গঠনবিন্যাসের অণু অথবা গঠনবিন্যাসে ভিন্নতাযুক্ত (Dissimilar) অণু অংশ গ্রহণ করে। সর্বাপেক্ষা সরল অবস্থায় যে অণু গঠিত হয় তাহাকে মোনোমার (Monomer) বলে। অর্থাৎ, জৈব যৌগের একক মোনোমার। মোনোমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিতে পারে। কিছু কার্বোহাইড্রেট মোনোমার অবস্থায় থাকে। একটি মোনোমার এক বা কয়েকটি মোনোমারের সহিত যুক্ত হইয়া অলিগোমার (Oligomer) সৃষ্টি করে। মোনোমারের সংখ্যা অনেক হইলে তাহাদের সমষ্টিগতভাবে পলিমার (Polymer) বলা হয়। একই গঠন বিশিষ্ট মোনোমার দ্বারা সৃষ্ট পলিমারকে হোমোপলিমার (Homopolymer) এবং বিভিন্ন গঠনের মোনোমার দ্বারা সৃষ্ট পলিমারকে হেটারোপলিমার (Heteropolymer) বলে।

প্রোটিন (Protein)—কোষের রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে গঠনের দিক দিয়া প্রোটিন সর্বাপেক্ষা জটিল। প্রোটিন কথাটি গ্রীক শব্দ প্রোটোশ (*Protos*) হইতে আসিয়াছে। শব্দটির অর্থ 'আমার স্থান সর্বপ্রথম'। প্রোটিন জীবজগতের চাবিকাঠি। ইহাকে বাদ দিলে জীবন আর জীবন থাকে না। প্রতি কোষ, প্রতি প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং এনজাইমগুলি প্রোটিন নির্মিত।

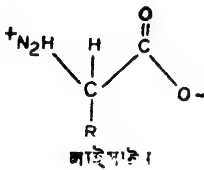
প্রোটিন মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের যৌগ। ইহার সহিত ফসফরাস, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রণ যুক্ত থাকিতে পারে।

প্রোটিনের আণবিক ওজন 10^3 হইতে 10^6 এবং অসংখ্য পরমাণু প্রোটিনের একটি অণু সৃষ্টি প্রয়োজন হয়। লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) একটি অতি পরিচিত প্রোটিন। ইহার আণবিক গঠনের সূত্র $C_{3032} H_{4816} O_{872} N_{780} S_8 Fe_4$। পরমাণুগুলি যোগ করিলে দেখা যাইবে এক অণু প্রোটিন সৃষ্টিতে 9512টি পরমাণু লাগিয়াছে। অ্যাসিড, অ্যালক্যালি (Alkali) অথবা এনজাইমের প্রয়োগে প্রোটিন, জলবিশ্লেষিত হইয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডের (Amino acid) সৃষ্টি করে। প্রায় কুড়ি রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে প্রোটিন সৃষ্ট। ইনসুলিন (Insulin) প্রায় 16 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়। প্রোটিন সৃষ্টিতে একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং প্রতি অ্যামাইনো অ্যাসিডের 300 হইতে 3000 এককের প্রয়োজন হয়।

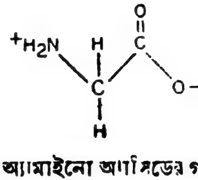
অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে ইহার কেন্দ্রস্থলে একটি কার্বন পরমাণু রহিয়াছে। এই কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুটিকে অ্যালফা কার্বন

(α Carbon) বলা হয়। এই কেন্দ্রীয় কার্বনের একদিকে একটি অ্যামাইনো গ্রুপ (Amino group) এবং অন্য দিকে একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (Carboxyl group) যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে।

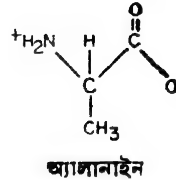
অ্যামাইনো গ্রুপটি যোজক যুক্ত একটি নাইট্রোজেন পরমাণু ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। কার্বোক্সিল গ্রুপটি একটি কার্বন, দুইটি অক্সিজেন এবং একটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। কার্বোক্সিল গ্রুপের কার্বনটি অ্যালফ্যা কার্বনের সহিত যুক্ত থাকে। অ্যালফ্যা কার্বনটি পুনরায় অ্যামাইনো অ্যাসিডের পার্শ্বশৃঙ্খলের (Side chain) সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইংরাজী অক্ষর (R) দ্বারা এই পার্শ্বশৃঙ্খলটি নির্দেশিত হয়।



লাইসাইন



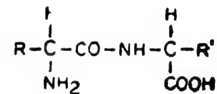
অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন



অ্যালানাইন

আর (R) অনেক ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু অথবা একটি মিথাইল গ্রুপ (CH_3) অথবা অন্য জটিল বস্তু হইতে পারে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপ ধনাত্মক চার্জ যুক্ত এবং কার্বোক্সিল গ্রুপটি ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত। এই দুই বিপরীতধর্মী চার্জ অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুর দুই প্রান্তে (Bipolar) থাকার ফলে ইহা একাধারে অ্যাসিড ও ক্ষারীয় রূপে রাসায়নিক বিক্রিয়া করিতে পারে।

প্রোটিন অণু অ্যামাইনো অ্যাসিড সমন্বয়ে সৃষ্ট। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি নিয়মানুসারে যোজক দ্বারা একে অন্যের সহিত যুক্ত থাকে। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপের সহিত যুক্ত থাকে। কার্বন-অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেনের (–CO-NH) এই বন্ধনকে **পেপটাইড যোজক** (Peptide bond) বলা হয়। যখন দুইটি অ্যামাইনো অ্যাসিড বন্ধনীভুক্ত হয় তখন তাহাদের মধ্যকার বন্ধনকে **ডাইপেপটাইড যোজক** (Dipeptide bond) বলা হয়।



একটি ডাইপেপটাইড যোজক দ্বারা যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল অথবা অ্যামাইনো গ্রুপের সহিত অন্য এক বা একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের যোগসাধন ঘটিলে তাহাকে **পলিপেপটাইড** (Polypeptide) বলা হয়।

প্রোটিন অণুর মাপ কি ধরনের এবং কত সংখ্যায় অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হইয়া ঐ প্রোটিন অণুটি সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার উপর নির্ভরশীল প্রোটিনকে ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule) বলা হয়। প্রোটিন অণুর আকার

অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি কিভাবে সজ্জিত রহিয়াছে তাহার উপর নির্ভরশীল। কিছু প্রোটিন অণু লম্বাকারে সজ্জিত থাকে; যথা—চুল, তন্তু (Fibre)। হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে প্রোটিন অণুগুলি বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকে।

প্রোটিন অণুতে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাবিন্যাসের (Sequence) উপর প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য আংশিকভাবে নির্ভরশীল। সজ্জাবিন্যাসের রকমফের যত বেশী প্রোটিনের বৈশিষ্ট্যও তত ভিন্ন। একটি তুলনা দিলে প্রোটিনের বৈচিত্র্যের কারণটুকু বুঝা যাইবে। ইংরাজী বর্ণাক্ষর (Alphabets) সংখ্যায় খুব বেশী নয় (মাত্র 26টি)। কিন্তু এই বর্ণগুলিকে অর্থবহ করিয়া সাজাইয়া অজস্র শব্দ সৃজন করা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শব্দগলিতে অক্ষরের সংখ্যা 10টির বেশী হয় না। অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা 20টি। এই কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডরূপী অক্ষরকে ব্যবহার করিয়া শব্দ তৈয়ারীর ন্যায় অজস্র রকমের প্রোটিন সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং হাজার হাজার রকমের প্রোটিন নিম্নোক্ত কারণে সৃষ্টি হয়। (1) যে কোন একটি বা একটি হইতে কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হইয়া প্রোটিন সৃষ্টি করিতে পারে। (2) যে কোন একটি বা সব কয়টি অ্যামাইনো অ্যাসিড যে কোন সংখ্যায় উপস্থিত থাকিতে পারে। (3) অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাবিন্যাস পরিবর্তনে কোন বাধানিষেধ নাই। একই প্রজাতির দেহকোষে হাজার হাজার বিভিন্ন প্রোটিন থাকে। অন্য একটি প্রজাতির দেহেও হাজার হাজার বিভিন্ন প্রোটিন থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুই প্রজাতির প্রোটিনগুলি পুরোপুরি রূপে কখনই একই ধরনের হইতে পারে না। তবে একথা প্রমাণিত যে বিবর্তনের ধারায় নিকট সম্বন্ধযুক্ত প্রজাতিগুলির মধ্যে প্রোটিন গঠনের সমতা দেখা যায়।

বহুবিধ প্রোটিন আছে। এই প্রোটিনগুলিকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :—

অযৌগিক প্রোটিন (Simple Protein) : এই ধরনের প্রোটিন সহজেই বিশ্লেষিত (Hydrolysed) হইয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে মুক্ত করিয়া দেয়। জল বিশ্লেষিত হইবার সময় অ্যামাইনো গ্রুপের নাইট্রোজেন এবং কার্বোক্সিল গ্রুপের কার্বন মধ্যস্থ যোজক ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই জলের অণু কার্বোক্সিল ও অ্যামাইনো গ্রুপের ভাঙ্গা যোজকের সহিত যুক্ত হয়। জলের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নাইট্রোজেনের সহিত এবং হাইড্রক্সিল অণু (OH) কার্বনের সহিত যুক্ত হয়।

কনজুগেটেড প্রোটিন (Conjugated Protein) : প্রোটিন অন্য রাসায়নিক বস্তুর সহিত যুক্ত হইয়া কনজুগেটেড প্রোটিন সৃষ্টি করে। যে বস্তুর সহিত প্রোটিন যুক্ত হইতেছে তাহা জৈব হইলে জৈব বস্তুটিকে **প্রস্থেটিক গ্রুপ** (Prosthetic group) এবং বস্তুটি অজৈব হইলে বস্তুটিকে **কো-ফ্যাক্টর** (Co-factor) বলা হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন, হিমোগ্লোবিন হিমোসায়ানিন, ফসফোপ্রোটিন ইত্যাদি কনজুগেটেড প্রোটিনের উদাহরণ।

ডিরাইভড প্রোটিন (Derived Protein) : তঞ্চিত (Coagulated) এবং আংশিক জলবিশ্লেষিত প্রোটিনকে ডিরাইভড প্রোটিন বলে। উদাহরণ—প্রোটিওজ (Proteose)।

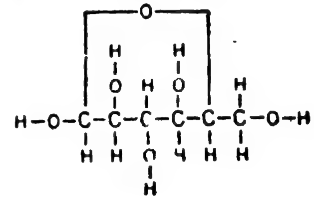
রাসায়নিক বা ভৌত প্রভাবে প্রোটিন খুবই নমনীয়। তাপ, pH পরিবর্তন, চাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি অতি সহজেই প্রোটিনের গঠন ভাঙ্গিয়া দেয়। যখন গঠন পুরোপুরি ভাঙ্গিয়া যায় তখন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পদ্ধতিটিকে **তঞ্চন** (Coagulation) বলে। গঠনের স্বল্প পরিবর্তন হওয়াকে **ডিন্যাচুরেশন** (Denaturation) বলে।

প্রোটিনের অনেক কাজের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য কার্য :—

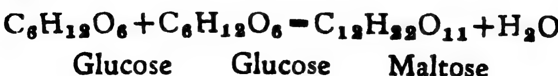
1. ইহা প্রোটোপ্লাজমের মুখ্য গঠনকারী।
2. এনজাইমরূপে প্রোটিন জৈব বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা শ্লথ করে।
3. ইহার দ্বারা অন্য জৈব উপাদান বিশেষত নিউক্লিওপ্রোটিন সৃষ্টি হয়।

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) : কার্বোহাইড্রেট কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দ্বারা সৃষ্ট। কার্বোহাইড্রেটে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন 1 : 2 অনুপাতে থাকে। জলেও অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অনুপাত 1 : 2। সেই কারণে কার্বোহাইড্রেটকে **হাইড্রেটেড কার্বন** (Hydrated carbon) বলা হয়।

শর্করা ও শর্করাজাত বস্তুসমূহ কোষের প্রধান কার্বোহাইড্রেট। প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে গ্লুকোজ (Glucose) সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। গ্লুকোজের রাসায়নিক সূত্র $C_6H_{12}O_6$। গ্লুকোজে 6টি কার্বন পরমাণু, 12টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 6টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। পরমাণুগুলির সজ্জাবিন্যাস নির্দিষ্ট। পরমাণুগুলি পার্শ্বে নির্দেশিতভাবে সজ্জিত থাকে।

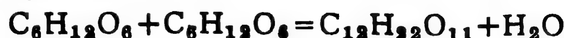


জৈব পদার্থের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার অণুগঠনকারী পরমাণুগুলির সজ্জাবিন্যাস পাল্টাইলে অণুটি অন্য অণুতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। গ্লুকোজ অণুর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির সজ্জাবিন্যাসের সামান্যতম পরিবর্তন ঘটিলে নূতন ধরনের যে অণু পাওয়া যাইবে তাহার বৈশিষ্ট্য গ্লুকোজ হইতে আলাদা হইয়া যাইবে—যদিও ইহাতে অণুগঠনকারী পরমাণুগুলির সংখ্যা একই থাকিবে। গ্লুকোজের হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন অক্সিজেনের (H and OH) সজ্জাবিন্যাসে পরিবর্তন সাধিত হইলে গ্লুকোজ হইতে **ফ্রাকটোজ** (Fructose) এবং **গ্যালাকটোজ** (Galactose) পাওয়া যাইতে পারে। এনজাইমের কাজের ফলে এক অণু গ্লুকোজ আর এক অণু গ্লুকোজের সহিত যুক্ত হইয়া 12টি কার্বন যুক্ত **মল্টোজ** (Maltose) সৃষ্টি করে। এই বিক্রিয়ায় 1 অণু **জল** উপজাত (By-product) হিসাবে সৃষ্ট হয়।



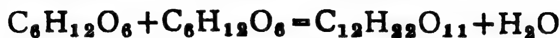
$$\underset{\text{Glucose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{Glucose}}{C_6H_{12}O_6} = \underset{\text{Maltose}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O$$

এইভাবে গ্লুকোজ ফ্রাকটোজের সহিত যুক্ত হইয়া সুক্রোজ (Sucrose = cane sugar) অথবা গ্লুকোজ গ্যালাকটোজের সহিত যুক্ত হইয়া ল্যাকটোজ (Lactose = milk sugar) সৃষ্টি করে।



$$C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 = C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$$

Glucose   Fructose   Sucrose



$$C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 = C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$$

Glucose   Galactose   Lactose

কার্বোহাইড্রেটকে কার্বন পরমাণুর সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া তিনভাগে ভাগ করা হয়—

1. **মনোস্যাকারাইড** (Monosaccharide) : মনোস্যাকারাইড বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে গঠনের দিক দিয়া মোটামুটি সরল। সচরাচর ইহাদের স্থূল রাসায়নিক সংকেত (Empirical formula) $C_xH_{2x}O_x$ রূপে লেখা হয়। কার্বন পরমাণুর সংখ্যার উপস্থিতি নির্ভর নিম্নোক্ত ধরনের মনোস্যাকারাইডে পাওয়া যায়—

a. ট্রাইওজ (Triose)—তিনটি কার্বন পরমাণুযুক্ত। উদাহরণ : গ্লিসে-রালডেহাইড (Glyceraldehyde)।

b. টেট্রোজ (Tetrose)—চারিটি কার্বন পরমাণুযুক্ত। উদাহরণ : এরিথ্রোজ (Erythrose)।

c. পেনটোজ (Pentose)—পাঁচটি কার্বন পরমাণুযুক্ত। উদাহরণ : রাইবোজ (Ribose), ডি-অক্সিরাইবোজ (Deoxyribose), জাইলোজ (Xylose)।

d. হেক্সোজ (Hexose)—ছয়টি কার্বন পরমাণুযুক্ত। উদাহরণ : গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ, গ্যালাকটোজ, ম্যামনোজ।

e. হেপটোজ (Heptose)—সাতটি কার্বন পরমাণুযুক্ত। উদাহরণ : সেডো-হেপটুলোজ (Sedoheptulose)।

মনোস্যাকারাইডগুলি মনোমার (Monomer) হওয়ায় স্বাভাবিক অবস্থায় জল-বিশ্লেষিত হইয়া অধিকতর অযৌগিক গঠনের হইতে পারে না। তবে বিশেষ অবস্থায় কোন কোন কার্বোহাইড্রেট, যেমন গ্লুকোজ বিয়োজন (Decomposition) পদ্ধতিতে জল এবং 1টি, 2টি বা 3টি কার্বন পরমাণুযুক্ত যৌগে পরিণত হইতে পারে। এক্ষেত্রে বিয়োজনের জন্য শক্তির উদ্ভব হয়। প্রোটোপ্লাজমে পেনটোজ এবং হেক্সোজ ধরনের মনোস্যাকারাইডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী।

2. **অলিগোস্যাকারাইড** (Oligosaccharide) : দুইটি হইতে দশটি মনো-স্যাকারাইড মনোমার যুক্ত হইয়া অলিগোস্যাকারাইডের সৃষ্টি করে। ইহাদের স্থূল রাসায়নিক সংকেত $(C_xH_{2x-2}O_{x-1})$। কয়েকটি [illegible] অলিগোস্যাকারাইড হইল—

a. ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide)—দুইটি কার্বোহাইড্রেট মনোমার যুক্ত হইয়া ডাইস্যাকারাইডের সৃষ্টি করে। ইহাতে 12টি কার্বন পরমাণু থাকে। উদাহরণ : সুক্রোজ, মলটোজ, ল্যাকটোজ।

b. ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharide)—তিনটি কার্বোহাইড্রেট মনোমারযুক্ত। উদাহরণ : অ্যারাবিনোজ (Arabinose), র‍্যামনোজ (Rhamnose)।

c. টেট্রাস্যাকারাইড (Terrasaccharide)—চারিটি কার্বোহাইড্রেট মনোমার-যুক্ত। উদাহরণ : স্টাকিওজ (Stachyose)।

d. পেন্টাস্যাকারাইড (Pentasaccharide)—পাঁচটি কার্বোহাইড্রেট মনোমার-যুক্ত। উদাহরণ : ভারবাসকোজ (Verbascose)।

বিভিন্ন অলিগোস্যাকারাইডের মধ্যে ডাইস্যাকারাইড বেশী পরিমাণে প্রোটোপ্লাজমে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ কোষের প্রোটোপ্লাজমে সুক্রোজ ও মল্টোজ এবং প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমে ল্যাকটোজ পাওয়া যায়।

3. **পলিস্যাকারাইড** (Polysaccharide) : দশের অধিক এবং প্রায় এক হাজার মনোস্যাকারাইড মনোমার যুক্ত হইয়া পলিস্যাকারাইড সৃষ্টি করে। ইহাদের স্থূল রাসায়নিক সংকেত ($C_xH_{2x-2}O_{x-1}$)"। জলবিশ্লেষিত হইয়া পলিস্যাকারাইড হইতে অযৌগিক কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রোটাপ্লাজমে দুই ধরনের পলিস্যাকারাইড পাওয়া যায়।

a. হোমোপলিস্যাকারাইড (Homopolysaccharide)—একই গঠন বিশিষ্ট এবং একই রকমের মনোস্যাকারাইড অণু যুক্ত হইয়া হোমোস্যাকারাইডের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য হোমোপলিস্যাকারাইডের মধ্যে স্টার্চ, গ্লাইকোজেন এবং সেলুলোজ (Starch, Glycogen and Cellulose) পড়ে। স্টার্চ—অ্যামাইলোজ (Amylose) এবং অ্যামাইলোপেকটিন (Amylopectin) যোগে, গ্লাইকোজেন—গ্লুকোজ অণু যোগে সৃষ্ট এবং সেলুলোজ—সেলোবিয়োজ (Cellobiose) ও ইহা সংলগ্ন কিছু গ্লুকোজ যোগে সৃষ্ট।

b. হেটারোপলিস্যাকারাইড (Heteropolysaccharide)—বিভিন্ন ধরনের মনোস্যাকারাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড বা ফসফোরিক অ্যাসিড বা অ্যামাইনো নাইট্রোজেন (Amino nitrogen) যুক্ত হইয়া হেটারোপলিস্যাকারাইডের সৃষ্টি করে। মূলত তিন প্রকারের হেটারোপলিস্যাকারাইড পাওয়া যায়।

i. প্রশমিত হেটারোপলিস্যাকারাইড (Neutral heteropolysaccharide)—অনেক মনোস্যাকারাইড এবং এসিলিটেটেড অ্যামাইনো নাইট্রোজেন (Acvletated amino nitrogen) যুক্ত হইয়া ইহা সৃষ্টি করে। উদাহরণ : কাইটিন (Chitin)।

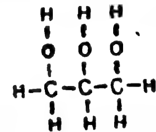
ii. আম্লিক হেটারোপলিস্যাকারাইড (Acidic heteropolysaccharide)—অনেক মনোস্যাকারাইড ও সালফিউরিক অম্ল বা অন্য অম্ল যোগে সৃষ্ট অণু। উদাহরণ : হাইলুরোনিক অম্ল (Hyluronic acid), হেপারিন (Heparin)।

22. মিউকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোপ্রোটিন (Mucoprotein and Glycoprotein)—প্রশমিত হেটারোপলিস্যাকারাইড ও প্রোটিন যোগে সৃষ্ট। লোহিত রক্তকণিকায়, লালারসে, অ্যালবুমেনে (Albumen) মিউকোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

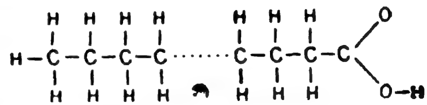
কার্বোহাইড্রেট কোষের নানা প্রয়োজনীয় কাজ করে। কেবলমাত্র সবুজ উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষ করিতে পারে। প্রাণীরা কার্বোহাইড্রেটের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কোষের মধ্যে গ্লুকোজ জ্বালানি (Fuel) হিসাবে থাকে এবং ইহাই শক্তির প্রধান উৎস। গ্লাইকোজেন ও স্টার্চ সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে। ইহারা স্থায়ী অণু। প্রয়োজনে ইহারা অযৌগিক শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। সেলুলোজ উদ্ভিদ কোষ প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া উদ্ভিদ কোষকে যান্ত্রিক সহায়তা (Mechanical support) দান করে।

লিপিড (Lipids) ঃ কার্বোহাইড্রেটের ন্যায় লিপিড কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু যোগে সৃষ্ট। তবে লিপিড অণুতে কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা কম। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ হইতে পাওয়া চর্বি, তেল ইত্যাদি লিপিডের উদাহরণ। ইহারা জলে দ্রবণীয় নহে কিন্তু গরম অ্যালকোহল, ইথার (Ether) বা ক্লোরোফর্মে (Chloroform) দ্রবণীয়। ইহারা জলবিদ্বেষী এবং ইহাদের গঠন কাঠামোয় হাইড্রোকার্বনের (Hydrocarbon) শৃঙ্খল লম্বা অথবা বলয় আকারে (Ring) থাকে।

ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিণ যুক্ত হইয়া অযৌগিক লিপিড (Simple lipid) সৃষ্টি করে। গ্লিসারিণে তিন পরমাণু কার্বন, তিন পরমাণু অক্সিজেন এবং আট পরমাণু হাইড্রোজেন থাকে। ইহা ক্ষারকীয় (Basic) প্রকৃতির।


গ্লিসারিণের রাসায়নিক সংযুতি

ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বনশৃঙ্খল (Chain) লম্বা। শৃঙ্খলের একপ্রান্তে কার্বোক্সিল গ্রুপ (Carboxyl group—COOH) থাকে। ইহার উপস্থিতিতে ফ্যাটি অ্যাসিডটি আম্লিক গুণ পায়।


ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন

এক অণু লিপিড সৃষ্টিতে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এক অণু গ্লিসারিণ প্রয়োজন হয়। ইহাদের সংযুতির সময়, প্রতি অণু ফ্যাটি অ্যাসিড হইতে একটি করিয়া হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং গ্লিসারিণ হইতে তিনটি হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) মুক্ত হয়। ইহারা মিলিত হইয়া তিন অণু জল সৃষ্টি করে। লিপিড সৃষ্টিতে অম্লের সহিত ক্ষারের বিক্রিয়া ঘটে। সেই কারণে উৎপাদিত রাসায়নিকটিকে লবণ বলা চলে। জৈব অম্ল ও জৈব ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণকে **এসটার** (Ester) বলা হয়। *লিপিডকে এসটারও বলা চলে।*

মূলত দুই প্রকারের লিপিড প্রোটোপ্লাজমে পাওয়া যায়—অযৌগিক লিপিড ও যৌগিক লিপিড (Simple lipid and Compound lipid)। উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষে যে ফ্যাট পাওয়া যায় তাহাদের **প্রাকৃতিক ফ্যাট** (Natural fat) বলা হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিণ (অ্যালকোহল) যোগে ইহা সৃষ্ট। ইহা এবং **মৌচাকের মোম** (Bee's wax) অযৌগিক ফ্যাটের উদাহরণ। মৌচাকের মোমে অ্যালকোহলের পরিবর্ত হিসাবে মাইরিসিল (Myricil) থাকে।

যৌগিক লিপিড ফ্যাটি অ্যাসিড ও অন্য রাসায়নিক, যথা—ফসফরাস, কার্বো-হাইড্রেট ইত্যাদি অণুযোগে সৃষ্ট। স্টেরয়েড (Steroid), ফসফোলিপিড (Phospholipid), স্ফিনগোলিপিড (Sphingolipid), গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid), লাইপোপ্রোটিন (Lipoprotein) ইত্যাদি যৌগিক লিপিডের উদাহরণ।

কোষে কার্বোহাইড্রেটের ন্যায় লিপিডও বহুবিধ কাজ করে। ইহার অণুতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। বিয়োজন প্রক্রিয়ায় এই শক্তির প্রয়োজনে প্রকাশ ঘটে। লিপিড প্রয়োজনে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনে রূপান্তরিত হইতে পারে। সরলীকৃত লিপিড জটিল যৌগের সংশ্লেষে ছাঁচের ন্যায় কাজ করে। কোষ আবরণী, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম ইত্যাদি সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করিয়া ইহারা কোষের কাঠামো সৃষ্টি করে। হর্মোন ও ভিটামিন সৃষ্টিতে লিপিডের প্রয়োজন হয়। প্রোটোপ্লাজম হইতে বস্তুর বাহিরে যাওয়া বা আসা লিপিড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid): নিউক্লিক অ্যাসিড একটি অতি জটিল জৈব যৌগ। ইহা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস যোগে সৃষ্ট। নিউক্লিক অ্যাসিড একটি পলিমার (Polymer)। ইহার গঠন একক মোনোমারগুলিকে **নিউক্লিওটাইডস** (Nucleotides) বলে। এক নিউক্লিওটাইড মোনোমার 1 অণু ফসফোরিক অ্যাসিড, 1 অণু শর্করা (Sugar) এবং 1 অণু নাইট্রোজেন যুক্ত বেস (Base) দ্বারা গঠিত। হাইড্রোজেন আয়নের সহিত যুক্ত হইবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুকে বেস (Base) বলা হয়। নিউক্লিওটাইডের শর্করাটি পেনটোজ (Pentose = 5 carbon) শর্করা। নাইট্রোজেন যুক্ত বেস দুই প্রকারের—পিউরিন (Purine) এবং পিরিমিডিন (Pyrimidine)। দুই ধরনের নাইট্রোজেনযুক্ত বেস—এডিনিন ও গুয়ানিন (Adenine and Guanine) পিউরিনের অন্তর্গত এবং তিন ধরনের নাইটোজেনযুক্ত বেস—সাইটোসিস, থায়ামিন এবং ইউরাসিল (Cytosine, Thymine and Uracil) পিরিমিডিনভুক্ত। পিরিমিডিনের মূল কাঠামোয় 4টি কার্বন ও 2টি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে। ইহার পরমাণুগুলি একটি বৃত্তে সজ্জিত থাকে। কিন্তু পিউরিনে পরমাণুগুলি দুইটি বৃত্তে সজ্জিত থাকে। নিউক্লিওটাইডের ফসফেট অংশটি সর্বদা একই রকম থাকে।

সুতরাং নিউক্লিওটাইডের গঠন নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করা যায় :

1. সাইটোসিন
থায়ামিন
ইউরাসিল
} পিরিমিডিন—পেনটোজ শর্করা— ফসফেট

2. এডিনিন
গুয়ানিন
} পিউরিন—পেনটোজ শর্করা—ফসফেট

5টি নাইট্রোজেনযুক্ত বেস থাকিলেও চারি প্রকারের নিউক্লিওটাইড যে কোন নিউক্লিক অ্যাসিডে পাওয়া যায়। কেননা দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে এবং প্রতি নিউক্লিক অ্যাসিডে চারি ধরনের নিউক্লিওটাইড থাকে। একটি নিউক্লিওটাইডের শর্করা অপর নিউক্লিওটাইডের ফসফেটের সহিত যুক্ত থাকে। অসংখ্য নিউক্লিওটাইড অণু মিলিয়া নিউক্লিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে :

দুই প্রকারের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে : (1) ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribose Nucleic Acid) বা সংক্ষেপে DNA এবং (2) রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribose Nucleic Acid) বা সংক্ষেপে RNA।

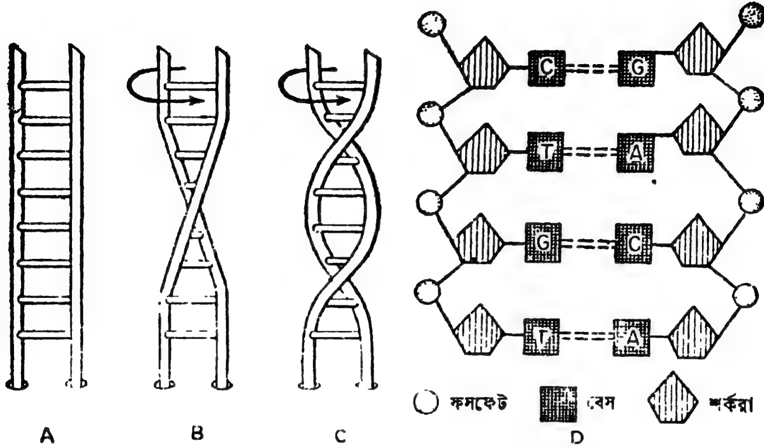
1. **ডি. এন. এ. (DNA):** ইহা প্রধানত নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং ইহা ক্রোমোসোমের (Chromosome) মুখ্য সংগঠক। সাইটোপ্লাজমেও কিছু কিছু DNA এর উপস্থিতি প্রমাণিত হইয়াছে। নিউক্লিয়াসের ওজনের শতকরা ৭ ভাগ DNA।

ডি এন. এ অণুতে নাইট্রোজেনযুক্ত বেস, পেনটোজ-শর্করা এবং ফসফেট থাকে। নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলির মধ্যে এডিনিন (Adenine=A) ও গুয়ানিন (Guanine=G) পিউরিনের অন্তর্গত এবং সাইটোসিন (Cytosine=C) ও থায়ামিন (Thymine=T) পিরিমিডিনের অন্তর্গত। পেনটোজ শর্করাটির নাম ডিঅক্সিরাইবোজ। ইহাতে রাইবোজ শর্করা হইতে 1টি অক্সিজেন পরমাণু কম থাকে।

এডিনিন→ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা→ফসফেট
গুয়ানিন→ ,, → ,,
সাইটোসিন→ ,, → ,,
থায়ামিন→ ,, → ,,
} DNA অণু

ওয়াটসন ও ক্রিক (Watson and Crick) 1953 খৃষ্টাব্দে ডি. এন. এ. অণুর সজ্জাবিন্যাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। একথা বর্তমানে প্রমাণিত যে ডি. এন. এ. (DNA) অণুগুলি দুইটি লম্বা শৃঙ্খল তৈয়ারী করে (চিত্র 1.10B)। শৃঙ্খল দুইটি একে অন্যকে বেষ্টন করে। ফলে শৃঙ্খল দুইটিকে ঘোরান সিঁড়ির রেলিংএর মত দেখায় (চিত্র 1.10C)। প্রতিটি শৃঙ্খলে ফসফেট, শর্করার সহিত যুক্ত থাকে। সিঁড়ির ধাপগুলি নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলির দ্বারা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ শৃঙ্খল দুইটি পরস্পরের সহিত নাইট্রোজেনযুক্ত বেস দ্বারা যুক্ত।

নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলি দুর্বল হাইড্রোজেন যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। কিন্তু বেসগুলি এলোমেলোভাবে যুক্ত হয় না। কঠিন নিয়মের মধ্যে থাকিয়া সব সময়ে এডিনিন থায়ামিনের সহিত এবং সাইটোসিন গুয়ানিনের সহিত যুক্ত থাকে (চিত্র 1.10D)। এডিনিন কখনই সাইটোসিনের সহিত অথবা গুয়ানিন কখনো থায়ামিনের সহিত যুক্ত হয় না।



চিত্র 1.10. DNA এর গঠন

আর. এন. এ. (RNA)—ইহা মূলত সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসে প্রায় শতকরা এক ভাগ এবং নিউক্লিওলাসে RNA পাওয়া যায়।

RNA-এর নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলি এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিল। অর্থাৎ এখানে থায়ামিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে। RNA-এর পেনটোজ শর্করাটির নাম রাইবোজ।

আর.এন এ. (RNA) অণু নিউক্লিওটাইড দ্বারা সৃষ্ট। ইহার গঠন নিম্নোক্তরূপ:—

এডিনিন→রাইবোজ শর্করা→ফসফেট
গুয়ানিন→ " → "
সাইটোসিন→ " → " RNA অণু
ইউরাসিল→ " → "

নিউক্লিওটাইডগুলি মিলিয়া একটিমাত্র শৃঙ্খল সৃষ্টি করে। কোষে তিন প্রকারের আর. এন. এ. (RNA) পাওয়া যায়।

a. **মেসেঞ্জার আর. এন. এ.** (Messenger RNA or mRNA)—ইহা নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ডি. এন. এ. (DNA) দ্বারা সৃষ্ট হয়। ইহা প্রোটিন সংশ্লেষে ছাঁচের (Template) কাজ করে। সমগ্র RNA-এর শতকরা দশ ভাগ মেসেঞ্জার

আর. এন. এ । ইহা নিউক্লিয়াসে সঞ্চিত থাকার পর নিউক্লিও আবরণী ভেদ করিয়া সাইটোপ্লাজমে যায় এবং রাইবোসোমের সহিত যুক্ত হইয়া প্রোটিন সংশ্লেষ করে। মনে করা হয় ইহা DNA-এর নির্দেশ বহন করে।

d. **রাইবোসোমাল আর এন এ** (R bosomal RNA or rRNA)—রাইবোসোমের মধ্যে যে RNA পাওয়া যায় তাহাকে রাইবোসোমাল আর এন. এ. বলে। সমগ্র RNA-এর শতকরা 80 ভাগ ইহা গঠন করে। রাইবোসোম প্রোটিন সংশ্লেষের স্থান। এখানে মেসেঞ্জার RNA-এর নির্দেশে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংযুক্তি ঘটে এবং প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

c. **ট্রান্সফার আর এন এ. বা এ্যাকসেপ্টর আর এন. এ.** (Transfer RNA or tRNA or Acceptor RNA or aRNA)—RNA-এর শতকরা দশভাগ ট্রান্সফার আর এন. এ। আকার এবং গঠনে ইহার সহিত মেসেঞ্জার RNA-এর মিল আছে। তবে ইহারা আকারে ছোট। ইহা DNA হইতে সৃষ্ট হয় এবং প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রকারভেদ অনুযায়ী নানা ধরনের ট্রান্সফার আর. এন এ. আছে। একটি ট্রান্সফার আর. এন. এ. অণু প্রয়োজনীয় বা নির্দিষ্ট আর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সহিত যুক্ত হয় এবং শৃঙ্খলটিকে গঠন করে।

নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। DNA-এর মধ্য দিয়া বংশধারার পরম্পরা রক্ষিত হয়।

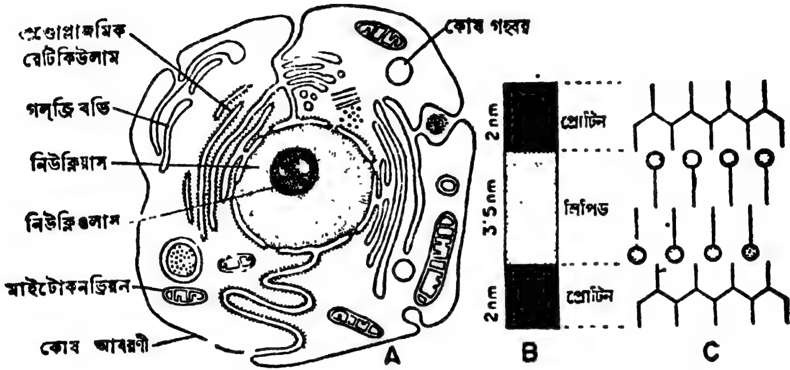
B. কোষের আণুবীক্ষণিক গঠন

1. **কোষ আবরণী**: প্রাণিকোষে কোষমধ্যস্থ সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসকে পারিপার্শ্বিক প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য **কোষ আবরণী** থাকে। উদ্ভিদ বা ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে কোষ আবরণীর বাহিরে আরও একটি আচ্ছাদন থাকে। আচ্ছাদনটি **কোষ প্রাচীর** বলে। যকৃত কোষ, অ্যামিবা, লোহিত রক্তকণিকা ইত্যাদি বিভিন্ন কোষের কোষ আবরণী পর্যালোচনা করিয়া কোষ আবরণী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে।

গঠন : কোষ আবরণী খুব পাতলা এবং অর্ধভেদ্য। কোষ আবরণী স্থিতিস্থাপক, পরিবর্তনশীল, ভঙ্গুর অথবা যথেষ্ট শক্ত হইতে পারে। অ্যামিবার ক্ষেত্রে কোষ আবরণী মসৃণ, প্যারামেশিয়ামে সিলিয়ামযুক্ত আবার সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী অনেক প্রাণীর ডিম্বকোষে ইহা শক্ত। কোষ আবরণী কোষের জীবিত অংশ। অন্যান্য কোষ অঙ্গাণুর সহিত ইহার নিবিড় যোগ (চিত্র 1.11A), স্বীয় ক্ষত পূরণের আংশিক ক্ষমতা, স্বীয় নড়ন ক্ষমতা ইত্যাদি ইহা যে জীবিত তাহা প্রমাণ করে। কোষ আবরণী স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত। ছিদ্রগুলির মাপ 08 হইতে 5 nm। এই মাপ নির্দিষ্ট নহে। মাপ কোষের বিপাকীয় অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

রাসায়নিক উপাদান—কোষ আবরণীতে প্রায় 5% কার্বোহাইড্রেট, 20 হইতে 40% লিপিড, 60 হইতে 80% প্রোটিন থাকে। ইহা ছাড়াও প্রায় 30 প্রকারের উৎসেচকের সন্ধান কোষ আবরণীতে পাওয়া গিয়াছে।

আণবিক গঠন (Molecular structure)—কোষ আবরণীর দুইটি প্রধান উপাদান প্রোটিন ও লিপিড। ইহাদের একত্রে লাইপোপ্রোটিন (Lipoprotein) বলা হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে লিপিড ও প্রোটিন অণু জলে মিশাইলে তাহারা সংযোজিত হইয়া লাইপোপ্রোটিন আবরণী সৃষ্টি করে। এই লাইপোপ্রোটিন আবরণী ও কোষ আবরণীর মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকে। কোষ আবরণী প্রায় 7·5 nm পুরু। এই আবরণীর বাহির ও ভিতরের স্তর প্রোটিন অণু দ্বারা গঠিত। বাহির ও ভিতরে



চিত্র 1.11. A = একটি আদর্শ কোষের চিত্ররূপ (ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে) ; কোষ অঙ্গাণুগুলি ও আবরণীর পারস্পরিক যোগ লক্ষণীয়। B - C = কোষ আবরণীর রাসায়নিক গঠনের চিত্ররূপ। B = ভিতরে ও বাহিরে প্রোটিন, মধ্যে লিপিড. C দুই স্তরে লিপিডের সজ্জাবিন্যাস।

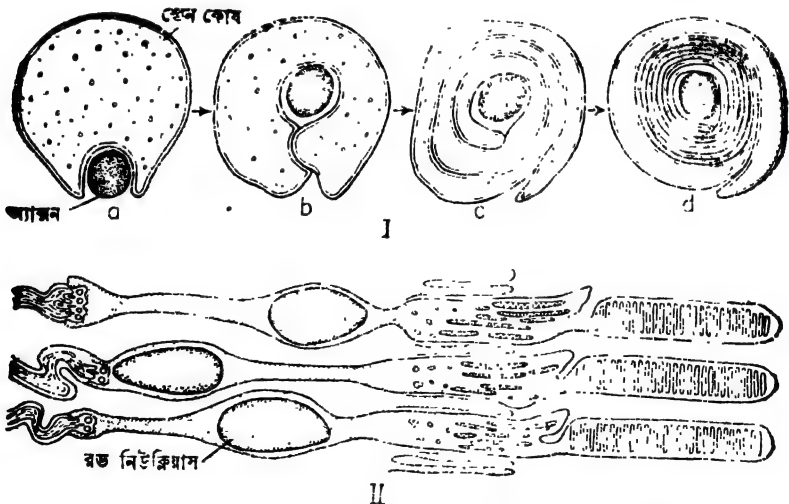
প্রোটিন অণুস্তর প্রত্যেকেই 2 nm পুরু। এই দুই প্রোটিন স্তরের মধ্যে লিপিড অণু দুই স্তরে সজ্জিত থাকে (চিত্র 1.11 B)। এই দুই লিপিড স্তর যুগ্মভাবে 3·5 nm পুরু। কোষ আবরণীর প্রোটিন ও লিপিড যেভাবে সজ্জিত থাকে তাহাকে স্যাণ্ডউইচের (Sandwitch) সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুই প্রোটিন স্তরের মধ্যে যে মুখোমুখি অবস্থায় দুইস্তর লিপিড থাকে তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা গিয়াছে (চিত্র 1.11C)। কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যার কোষ আবরণী হইতে লিপিড নিষ্কাশন করিয়া ঐ নিষ্কাশিত লিপিডকে যদি জলের উপর একস্তরে (Monolayer) বিছানো যায় তাহা হইলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় তাহা ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার কোষ পৃষ্ঠের সম্মিলিত মাপের দ্বিগুণ হয়।

কোষ আবরণীর পরিবর্তিত রূপ—কর্ম ও গঠন অনুযায়ী কোষ আবরণীর অবয়বের নানা ধরনের পরিবর্তন হয়।

A. ইঁদুরের ক্ষুদ্রান্ত্রের স্তম্ভকাকার আবরক কোষের মুক্ত অংশে ও কোষের দুই পার্শ্বের কোষ আবরণী নানাভাবে বিশেষিত হয়। দুই পার্শ্বের কোষ আবরণীতে অনেক ভাঁজ (Fold) সৃষ্টি হয়। এই ভাঁজের মধ্য দিয়া পাশাপাশি কোষগুলির

মধ্যে নিবিড় সংযোগ গড়িয়য়া ওঠে। এই কোষের মুক্ত অংশের কোষ আবরণী সরু সরু অসংখ্য ভাঁজে কুঞ্চিত হইয়া যায়। এই সরু ভাঁজগুলিকে মাইক্রোভিলাই (Microvilli, *plural* of Microvillus) বলা হয় (চিত্র 1.14A)। প্রতি কোষে 2,000 হইতে 3,000 মাইক্রোভিলাই থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের এই আবরক কোষ পাচিত খাদ্য শোষণ করে। মাইক্রোভিলাসগুলি শোষণ পৃষ্ঠকে (Surface area of absorption) বহুলাংশে বাড়াইয়া দেয়। ইঁদুর ছাড়াও পাচিত খাদ্য শোষণকারী প্রাণিকোষ সমূহে এই মাইক্রোভিলাই পাওয়া যায়।

B. **মায়েলিন শীথ** (Myelin sheath): নার্ভকোষের অ্যাক্সনকে (Axon) বেষ্টন করিয়া যে মায়েলিন শীথ থাকে তাহার গঠন পর্যালোচনা করিলে কোষ আবরণীর রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে বেশ কিছু জানা যায়। মায়েলিন শীথটি যে কোষ বিশেষিত হইয়া সৃষ্টি করে তাহার নাম সোন কোষ (Schwann cell)। ইহাকে কেহ কেহ উপগ্রহ কোষ বা স্যাটিলাইট কোষ (Satellite cell) বলেন। মায়েলিন শীথ গঠনের সময় দেখা যায় যে অ্যাক্সনের সংযোগী সোন কোষের সাইটোপ্লাজম হইতে অনেক অঙ্গাণু বর্জিত হয় এবং সোন কোষ আবরণীটি অ্যাক্সনকে বেষ্টন করিয়া বহুস্তরে সজ্জিত হইয়া যায় (চিত্র 1.12 I) একথা মনে করা হয় যে মায়েলিন শীথ নার্ভকোষের সংবেদন ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়। তবে এ কথা জানা



চিত্র 1.12. I. a—d. নার্ভকোষের অ্যাক্সনকে বেষ্টন করিতে সোন কোষের ক্রমিক রূপান্তর।
II. মেরুদণ্ডীর রড ও কোন কোষের কোষ আবরণীর বিশেষ সজ্জা।

গিয়াছে যে বিশেষিত হওয়ার ফলে সোন কোষের কোন আবরণীর আণবিক গঠন আর স্পষ্ট থাকে না।

C. **মেরুদণ্ডীর চোখের রড ও কোন কোষ** (Rods and Cones of Vertebrate eye): মেরুদণ্ডীর চোখের রড ও কোন কোষগুলির গঠন লম্বা।

কোষের যে অংশ মুক্ত অবস্থায় থাকে সেই অংশের কোষ আবরণীর নিচে অনেক পাতলা পর্দা একটার পর আর একটা অবস্থায় সজ্জিত থাকে। এই পর্দাগুলি কোষ আবরণীর বিশেষিত অংশ। কোষ আবরণীর এই অংশ ভিতরের দিকে অনেক ভাঁজ (Fold) সৃষ্টি করে। পরে এই ভাঁজগুলি কোষ আবরণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পর্দাগুলি সৃষ্টি করে (চিত্র 1.12 II)। একটি রড বা কোন কোষে 500 হইতে 1,000 এই ধরনের পর্দা থাকে। এই পর্দাগুলি আলোক পরিগ্রাহীরূপে কাজ করে।

কোষ আবরণীর ক্রিয়া—

a. কোষ ও কোষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া কোষ আবরণী একটি রক্ষণ (Protective) প্রাচীরের ন্যায় কাজ করে। কোষের আকার নির্ধারণেও ইহা সাহায্য করে। জলবাসী এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোষের বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মূলত মিঠা বা লবণাক্ত জল থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোষের বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রক্ত, লসিকা বা অর্ধতরল খাদ্যবস্তু থাকে।

b. কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখ্য হইল—

(i) **ভেদ্যতা** (Permeability)– কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া নানা বস্তুর অণু ও আয়ন যাতায়াত করিতে পারে। কোষ আবরণীর কর্তৃত্বাধীন এই ক্ষমতাকে ভেদ্যতা বলা হয়। নিম্নোক্ত ধরনের ভেদ্যতা দেখা যায়—

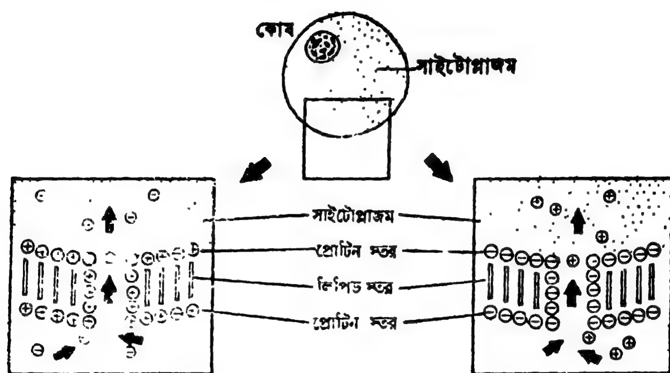
অভেদ্য (Impermeable) : কয়েক ধরনের মাছের অনিষিক্ত (Unfertilized) ডিম্বকোষের কোষ আবরণী অভেদ্য। গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া কিছুই এই আবরণীর মধ্য দিয়া ভিতরে যাইতে বা বাহিরে আসিতে পারে না।

অর্ধভেদ্যতা (Semipermeability) : কোন কোন কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া কেবলমাত্র জল যাতায়াত করিতে পারে। দ্রব (Solute) অবস্থায় থাকা কোন বস্তু এই ধরনের আবরণীর মধ্যে যাইতে পারে না। এই ধরনের কোন কোষ আবরণীর অস্তিত্ব আছে কি না তাহা বর্তমানে তর্কসাপেক্ষ।

পছন্দযুক্ত ভেদ্যতা (Selective permeability) : এই ধরনের কোষ আবরণী অনেক বস্তুর মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটিকে কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে বা বাহিরে যাইতে দেয়। এক কথায় এই ধরনের আবরণীর বাছাই বা পছন্দ (Selection) করার ক্ষমতা থাকে।

কোষ আবরণীর ভেদ্যতা যে বস্তু কোষের মধ্যে যাইবে বা কোষ হইতে বাহিরে আসিবে সেই বস্তুটি লিপিডে কতখানি দ্রবণীয় তাহার উপর নির্ভরশীল। লিপিডে দ্রবণীয় বস্তু কোষ আবরণী দিয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারে। কোষ আবরণীর ভিতর দিয়া ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) সহজে প্রবেশ করিতে পারে না কিন্তু যাহারা ইলেকট্রোলাইট নহে (Non-electrolyte) অথচ ইলেকট্রোলাইটের সহিত সমমাপের তাহারা সহজে প্রবেশ করিতে পারে। ইহার কারণ এই যে ইলেকট্রোলাইটদের নিজস্ব

অপরাধর্মী বা ঋণাত্মক (Negative) অথবা পরাধর্মী বা ধনাত্মক (Positive) চার্জ (Charge) থাকে। অনুরূপভাবে কোষ আবরণীর প্রোটিন অণুগুলিতেও ঋণাত্মক (অপরাধর্মী) বা ধনাত্মক (পরাধর্মী) চার্জ থাকে। প্রোটিন অণুতে যখন ঋণাত্মক চার্জ থাকে তখন ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রোলাইট কোষ আবরণীতে ঢুকিতে পারে না কেননা একই ধরনের চার্জ পরস্পরকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে (চিত্র 1.13)। কিন্তু ইলেকট্রোলাইট যদি ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয় তাহা হইলে ইহা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটিন অণুর মধ্য দিয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু যে তরল মাধ্যমে (Medium)



চিত্র 1.13. কোষ আবরণীর বৈদ্যুতিক চার্জ এবং কোষে বিভিন্ন বস্তুর অনুপ্রবেশ। + = পরাধর্মী এবং – = অপরাধর্মী।

কোষ থাকে তাহার অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের উপর প্রোটিন অণুর ঋণাত্মক বা ধনাত্মক চার্জগুলি নির্ভর করে। অম্লীয় মাধ্যমে প্রোটিন অণুর চার্জ ধনাত্মক হয়। দেখা গিয়াছে যে অম্লীয় মাধ্যমে লোহিত রক্তকণিকা ও সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি এক সঙ্গে রাখা যায় তাহা হইলে লোহিত রক্তকণিকার কোষ আরবণীর মধ্য দিয়া Cl^- অণু সহজে প্রবেশ করে এবং Na^+ অণু প্রবেশ পারে না।

সুতরাং কোষের ভেদ্যতা কোষ আবরণীর প্রোটিন অণুর বৈদ্যুতিক চার্জ এবং যে বস্তুটি কোষে প্রবেশ করিবে লিপিডে তাহার দ্রবণীয়তার উপর নির্ভরশীল।

(ii) **অভিস্রবণ বা অসমোসিস** (Osmosis)—কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া জল সহজেই যাওয়া-আসা করিতে পারে। কোষ অভ্যন্তর ও কোষের বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এস্থলে কোষ আবরণী ভেদ্য পর্দার (Permeable membrane) কাজ করে। কোষ অভ্যন্তর ও কোষের বাহিরের পরিবেশের ঘনত্বের (Concentration) তফাৎ হইলে কম ঘন অংশ হইতে জল বেশী ঘন অংশের দিকে যায়। দুই পার্শ্বের ঘনত্ব সমান সমান হইলে জলের প্রবাহ বন্ধ হয় (Dynamic equilibrium)। জলের এই কম ঘনত্ব হইতে বেশী ঘনত্বের দিকে যাওয়াকে অভিস্রবণ বলে। কোষ অভ্যন্তরে ঘনত্ব বেশী হইলে বাহির হইতে জল কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই

পদ্ধতিকে এণ্ডঅসমোসিস (Endosmosis) বলা হয়। ইহার বিপরীত পদ্ধতিকে বলা হয় এক্সঅসমোসিস (Exosmosis)।

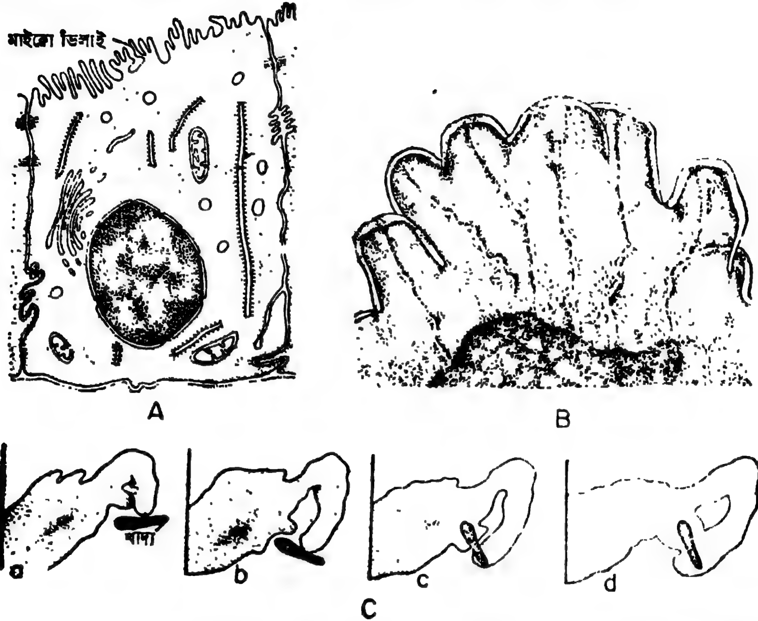
কোষে যে জল থাকে সেই জলে দ্রব অবস্থায় নানা রাসায়নিক থাকে। উদাহরণ হিসাবে স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকার কথা বলা যায়। লোহিত রক্তকণিকার কোষের জলে পটাসিয়াম (K^+), ক্যালসিয়াম (Ca^+) প্রভৃতি ধাতুর মৌল ও ফসফেট (PO_4^-) যৌগ আয়ন অবস্থায় এবং হিমোগ্লোবিন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই লোহিত রক্তকণিকাকে যদি 0·9% সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) দ্রবণে রাখা যায় তাহা হইলে লোহিত রক্তকণিকায় কোনরূপ অভিস্রবণ হয় না। অভিস্রবণ না হইবার কারণ এই যে এক্ষেত্রে লোহিত রক্তকণিকার অভ্যন্তরের ঘনত্ব লোহিত রক্তকণিকার বাহিরের পরিবেশের সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের ঘনত্বের সহিত সমান। যখন কোষের বাহিরের দ্রবণের ঘনত্ব কোষের অভ্যন্তরের ঘনত্বের সমান থাকে তখন কোষের বাহিরের দ্রবণকে **আইসোটোনিক দ্রবণ** (Isotonic solution or fluid) বলা হয়। যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনত্ব 0·9% এর বেশী করা যায় তাহা হইলে এক্স্অসমোসিস পদ্ধতিতে লোহিত রক্তকণিকা হইতে জল কোষের বাহিরে চলিয়া যায়। বেশী ঘনত্বের এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণকে এক্ষেত্রে **হাইপারটোনিক দ্রবণ** (Hypertonic solution) বলা হয়। আবার সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনত্ব যদি 0·9% এর কম করিয়া তাহাতে লোহিত রক্তকণিকা রাখা হয় তাহা হইলে এণ্ডঅসমোসিস পদ্ধতিতে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে জল প্রবেশ করিবে। এক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণকে **হাইপোটোনিক দ্রবণ** (Hypotonic solution) বলা হয়।

এণ্ডঅসমোসিস পদ্ধতিতে যে জল কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা কোষের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপকে বলা হয় হাইড্রোষ্টাটিক প্রেসার বা প্রেষ (Hydrostatic pressure)। অসমোসিস পদ্ধতিতে এই চাপ সৃষ্টি হয় বলিয়া এই চাপকে অসমোটিক প্রেসার বা অভিস্রবণ প্রেষ (Osmotic pressure) বলা হয়। কোষ অভ্যন্তর ও কোষের বাহিরের মধ্যে চাপ সৃষ্টি কোষ আবরণীর কর্তৃত্বাধীন।

(ii) **ব্যাপন বা ডিফিউশন** (Diffusion)—ডিফিউশন পদ্ধতিতে কোন বস্তু বেশী ঘনত্ব বিশিষ্ট স্থান হইতে কম ঘনত্ব বিশিষ্ট স্থানে পরিবাহিত হয়। এই বস্তু পরিবহণ সাধারণত কোন শক্তি (Energy) নির্ভর নহে। রক্তবাহিত পাচিত খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন ইত্যাদি ডিফিউসন পদ্ধতিতে কোষের বাহির হইতে কোষ অভ্যন্তরে আসে এবং একই পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্যদ্রব্য কোষ অভ্যন্তর হইতে কোষের বাহিরে যায়। কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া এই ব্যাপন পদ্ধতি চলে।

(iv) **সক্রিয় পরিবহণ** (Active transport)—এই পদ্ধতিতে কোষ আবরণীর মধ্য দিয়া কম ঘনত্ব বিশিষ্ট অংশ হইতে বেশী ঘনত্ব বিশিষ্ট অংশে অণু প্রবেশ করে। এই পদ্ধতি শক্তির উপর নির্ভর করে কেন না এই পদ্ধতির ক্রিয়া ব্যাপন পদ্ধতির বিপরীত। কোষ মধ্যস্থ মাইটোকনড্রিয়ন নিঃসৃত এডিনোসিন ট্রাইফসফেট

(Adenosin triphosphate or ATP) এই শক্তি যোগায়। মনে করা হয় কোষ আবরণীতে এক ধরনের বাহক অণু (Carrier molecule) থাকে। ইহারা যে অণুগুলিকে কোষের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে সেইগুলিকে বাছিয়া লয়। বহনকারী অণু ও সংগৃহীত অণু মিলিয়া একটি অস্থায়ী যোগ সৃষ্টি করে। কোষ অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান মাত্র এই অস্থায়ী যোগ ভাঙিয়া যায়।



চিত্র. 1.14 A – ইঁদুরের ক্ষুদ্রান্ত্রের কোষ আবরণীর মাইক্রোভিলাই। B = অ্যামিবার পিনোসাইটোসিস কোষ আবরণী প্রোথিত হইয়া নালিকা সৃষ্টি করে (কেন্দ্রমুখী কালো দাগ)। নালিকায় জল প্রবেশ করার পর নালিকাগুলি কোষ আবরণী হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। C = অ্যামিবার ফ্যাগোসাইটোসিসের ঘটনা প্রবাহ। a – p – ক্ষণপদ দ্বারা খাদ্যবস্তুকে বেষ্টন ও পরে বেষ্টিত খাদ্যটিকে সাইটোপ্লাজমে অধিগ্রহণ।

(v) ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis)—এই পদ্ধতিতে কঠিন খাদ্যবস্তু বা জীবাণুরা কোষের বাহির হইতে কোষ অভ্যন্তরে নীত হয় (চিত্র 1.14 C)। অ্যামিবার খাদ্যগ্রহণ বা শ্বেত রক্তকণিকার জীবাণু ভক্ষণ ফ্যাগোসাইটোসিসের উদাহরণ। ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতি সার্থক করিতে কোষ আবরণী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে (অ্যামিবার ক্ষেত্রে ক্ষণপদ সৃষ্টি)।

(vi) পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis)—অনেক জলীয় পদার্থ কোষ অভ্যন্তরে পিনোসাইটোসিস পদ্ধতিতে যায়। ইহাকে কোষের জলপান বলা চলে। অ্যামিবার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা হয় (চিত্র 1.14 B)। এই পদ্ধতিতে জলীয় পদার্থ সমেত কোষ আবরণী কোষ অভ্যন্তরে প্রথমে ঝুলিয়া

পড়ে এবং পরে এই ঝুলিয়া পড়া অংশটি কোষ আবরণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে কোষ আবরণীর সক্রিয় ভূমিকা থাকে।

(vii) **পৃষ্ঠটান** (Surface tension)—কোষ আবরণীতে পৃষ্ঠটান স্বল্প মাত্রায় থাকে। যে সমস্ত রাসায়নিক লিপিডে দ্রবণীয় তাহারা সহজে কোষ আবরণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কোষ আবরণীতে লিপিড থাকায় ইহাদের প্রবেশ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু লিপিড স্তর ভিতরে ও বাহিরে প্রোটিন দ্বারা আবৃত থাকায় পৃষ্ঠটানের পরিমাণ যতটা হওয়া উচিত ততটা হইতে পারে না।

II সাইটোপ্লাজম

কোষ আবরণীর বেষ্টনীর মধ্য হইতে নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm) বলে। সাইটোপ্লাজম দুইটি মূল উপাদান, ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (Matrix) ও কোষ অঙ্গাণু (Cell organella) লইয়া গঠিত।

ম্যাট্রিক্স : সাইটোপ্লাজম হইতে কোষ অঙ্গাণুগুলি ও নিউক্লিয়াস তুলিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্স। ম্যাট্রিক্স স্বচ্ছ, সমসত্ত্ব (Homogeneous) এবং কলয়ড্যাল (Colloidal)। ম্যাট্রিক্সের অপর কয়েকটি নাম গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স (Ground substance), হায়ালোপ্লাজম (Hyaloplasm), কাইনোপ্লাজম (Kinoplasm) ইত্যাদি।

ম্যাট্রিক্সের ভৌত ধর্ম : ম্যাট্রিক্সে প্রচুর পরিমাণ জল থাকে। এই জলে কিছু রাসায়নিক দ্রব অবস্থায় এবং কিছু রাসায়নিক অদ্রব (Suspended) অবস্থায় থাকে। অদ্রব রাসায়নিকগুলির পরিধির মাপ 0·001 হইতে 0·14 μm এর মধ্যে থাকে। এই অদ্রব রাসায়নিকগুলি দুই প্রকারের—**জলপ্রেমী** (Hydrophilic) ও **জলবিদ্বেষী** (Hydrophobic)। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও নানাবিধ খনিজ জলপ্রেমী পক্ষান্তরে লিপিড জলবিদ্বেষী।

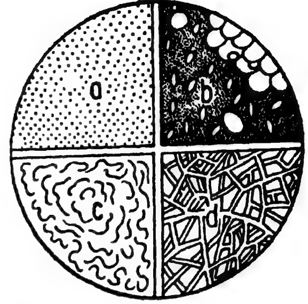
ম্যাট্রিক্স কলয়েড স্বভাবের হওয়ায় ইহা অর্ধ-কঠিন (Semisol) অথবা তরল অবস্থায় থাকে। ইহার অর্ধ-কঠিন দশাকে **জেল দশা** (Gel phase) এবং তরল দশাকে **সল দশা** (Sol phase) বলে। জেল দশায় দ্রবগুলি বিভিন্ন ভাবে যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। কার্বন ও হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন ইত্যাদির মধ্যে যোজক গড়িয়া উঠে। জেল দশার স্থায়িত্ব যোজকের গঠনের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহার তীব্রতার উপর নির্ভরশীল। সাইটোপ্লাজমে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়া বা বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে ইহা জেল দশা হইতে সল দশায় অথবা সল দশা হইতে জেল দশায় রূপান্তরিত হইতে পারে। সাইটোপ্লাজমের কলয়েডগুলির এই বিশেষ ক্ষমতাকে উভয়মুখী দশান্তর (Phase reversal) বলা হয়।

ম্যাট্রিক্সের গঠন প্রকৃতি (Appearance of Matrix) : সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্সের গঠন প্রকৃতি কেমন তাহা লইয়া নানা তর্কবিতর্ক আছে (চিত্র 1.15)। গঠন সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদগুলি নিম্নোক্তরূপ—

a **রেটিকিউলার থিয়োরী** (Reticular theory)—এই মতবাদে বলা হইয়াছে সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্স জালিকাকারে সজ্জিত থাকে।

b. **অ্যালভিওলার থিয়োরী** (Alveolar theory)—সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্স অনেকটা সাবানের ফেনার ন্যায়- ইহাই এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

c. **গ্রানুলার থিয়োরী** (Granular theory)—এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্সটি অসংখ্য কণা দ্বারা গঠিত। কিছু কণা আকারে বড় আবার কিছু কণা আকারে ছোট অর্থাৎ কণাগুলির আকারের মধ্যে মাপের হেরফের আছে। এই কণাগুলিকে বায়োপ্লাস্ট (Bioplast) বলা হইয়াছে।



চিত্র 1.16 সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্সের গঠন : a=গ্রানুলার, b=অ্যালভিওলার, c=ফাইব্রিলার, d=রেটিকিউলার।

d. **ফাইব্রিলার থিয়োরী** (Fibrillar theory)—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যাট্রিক্সকে কি রকম দেখায় তাহাই এই মতবাদের ভিত্তি। এই মতবাদে বলা হইয়াছে ম্যাট্রিক্সটি তন্তুময়। বর্তমানে এই মতবাদটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্সের কাজ

(i) **সাইক্লোসিস** (Cyclosis)—সল দশার জেল দশায় অথবা জেল দশার সল দশায় রূপান্তরিত হইবার ক্ষমতা থাকার ফলে ম্যাট্রিক্স কোষ আবরণীর মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরিতে পারে। জলের চাপ (Hydrostatic pressure), অ্যাসিড বা অম্লত্বের পরিবর্তন (pH), উত্তাপ ইত্যাদিকে দশান্তরের কারণ স্বরূপ গণ্য করা হয়। ম্যাট্রিক্সের আবর্তনের ফলে কোষ অঙ্গাণুগুলি কোষের মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে। এককোষী প্রাণী প্যারামেশিয়ামের ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স মধ্যস্থ খাদ্য গহ্বরগুলি এইভাবে আবর্তিত হয়।

(ii) **অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of pH)— ম্যাট্রিক্সের মধ্যে নিরন্তর নানা ধরনের বিপাকীয় ক্রিয়া চলে। ইহার ফলে ম্যাট্রিক্সের অম্লত্বের অথবা ক্ষারত্বের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এই হ্রাস বা বৃদ্ধির খুব বেশী পরিবর্তন সহ্য করিবার ক্ষমতা ম্যাট্রিক্সের নাই। সেই কারণে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ম্যাট্রিক্সে নানা রাসায়নিক পদার্থ [মূলত কার্বোনেট ও বাই-কার্বোনেট (Carbonate and Bicarbonate)] থাকে। ইহারা বাফার (Buffer) হিসাবে কাজ করে এবং ম্যাট্রিক্সের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) **বিপাকীয় ক্রিয়া**– কোষের বিপাকীয় ক্রিয়ার প্রধান আসর—ম্যাট্রিক্স। এই বিপাকীয় ক্রিয়া দুই প্রকারের—উপচিতি ও অপচিতিমূলক। উপচিতিতে প্রোটিন,

কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ইত্যাদির সংশ্লেষ হয়। অপচিতিতে কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুর জারণ (Oxidation) হয়।

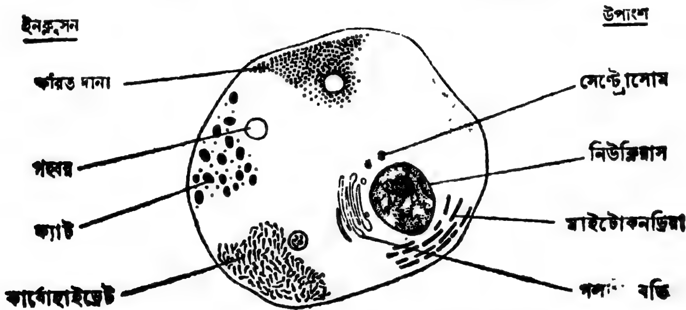
(iv) **উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া**—উত্তাপ, আলো, রাসায়নিক ইত্যাদির প্রয়োগে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ম্যাট্রিক্স সে উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

(v) **পরিবহণ** (Conduction)—ম্যাট্রিক্সের আবর্তিত হইবার ক্ষমতা আছে। এই আবর্তনের ফলে জৈব রসায়নগুলি কোষ মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত হইতে পারে।

(vi) **বৃদ্ধি ও বিভাজন**—উপচিতিমূলক বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে কোষের বৃদ্ধি ঘটে। কোষের বৃদ্ধির সহিত ম্যাট্রিক্সের বৃদ্ধিও জড়িত। বৃদ্ধি বেশী হইলে কোষ বিভাজনের সহিত ম্যাট্রিক্সও বিভাজিত হয়।

III. কোষ অঙ্গাণু

সাইটোপ্লাজমে মূলত দুই প্রকারের ভিন্ন ধর্মী বস্তু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটিকে জীবন্ত (Living) এবং কয়েকটিকে জীবন লক্ষণহীন (Non-living) বস্তু বলা হয়। সাধারণত যাহাদের জীবন্ত মনে করা হয় তাহাদের



চিত্র 1.16 কোষ অঙ্গাণু ও কোষ ইনক্লুসনের চিত্ররূপ। চিত্রে যে ভাবে দেখান হইয়াছে জীবিত কোষে উহারা সেইভাবে থাকে না। (গলগি=গলজি)

কোষ অঙ্গাণু বা **উপাংশ** (Organella) এবং অন্যগুলিকে **সেল ইনক্লুসন** (Cell inclusions) বলা হয় (চিত্র 1.16)

কয়েকটি কোষ অঙ্গাণু সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল—

A. এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (Endoplasmic reticulum)

সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্স জুড়িয়া শাখা-প্রশাখা যুক্ত অনেক জালিকা থাকে। সাইটোপ্লাজমের এণ্ডোপ্লাজম অংশে এই জালিকা ঘন সন্নিবিষ্ট থাকায় এই জালিকাকে এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা বলা হয়। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই জালিকা দেখা যায় না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই জালিকা সম্বন্ধে অনেক থ্য

জানা গিয়াছে। 1945 খৃষ্টাব্দে পোর্টার (Porter) এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার বর্ণনা দেন।

আকার ও গঠন: এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার তন্তুগুলিকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফাঁপা নলের ন্যায় দেখায়। কতকগুলি জালিকার একপ্রান্ত কোষ আবরণীর ছিদ্রের সহিত এবং অন্য প্রান্ত নিউক্লিয়াস আবরণীর ছিদ্রের সহিত যুক্ত থাকে। জালিকা প্রাচীর গঠনে কোষ আবরণীর গঠনের ন্যায় অর্থাৎ ইহা লিপিড ও প্রোটিন যোগে সৃষ্ট। কিন্তু ইহা কোষ আবরণীর তুলনায় কম পুরু। জালিকা প্রাচীর গড়ে 5 হইতে 6 nm পুরু। জালিকা মধ্যস্থ ফাঁপা অংশের ব্যাস সর্বত্র একই রকমের নহে। স্থানে স্থানে একটি জালিকার দুই দিকের প্রাচীর খুব কাছাকাছি থাকে এবং স্থানে স্থানে দুই দিকের প্রাচীরের মধ্যে বেশ কিছুটা দূরত্ব থাকে। ইহাদের মধ্যবর্তী অংশে একটি অনচ্ছ তরল পদার্থ থাকে।

জালিকা গাত্রের গঠন অনুযায়ী এণ্ডোপ্লাজমের জালিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: **মসৃণ গাত্র জালিকা** (Smooth-surfaced endoplasmic reticulum) এবং **রুক্ষ গাত্র জালিকা** (Rough-surfaced endoplasmic reticulum)। মসৃণ গাত্র জালিকা সাধারণত সেই সব কোষে পাওয়া যায় যে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষ খুব বেশী হয় না। এডিপোজ কোষ (Adipose cell), ইনটারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell), যকৃতের গ্লাইকোজেন (Glycogen) সঞ্চয়কারী কোষ, শুক্রকীট প্রস্তুতকারী কোষ (Spermatocyte) ইত্যাদিতে মসৃণ গাত্র এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা পাওয়া যায়।

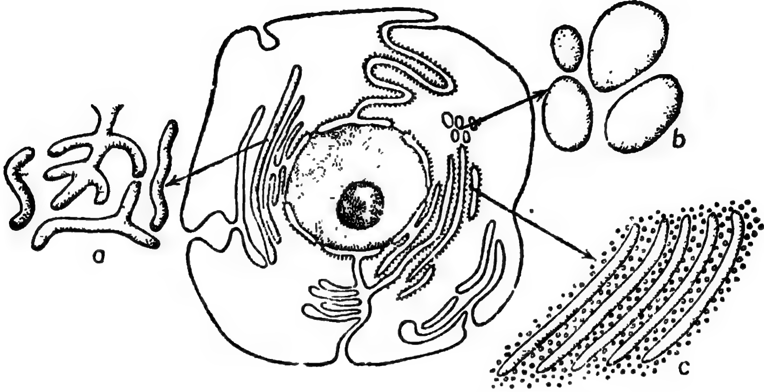
রুক্ষ গাত্র জালিকা সেই সমস্ত কোষে পাওয়া যায় যেখানে বেশী পরিমাণে প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। প্রোটিন সংশ্লেষে রাইবোসোমের (Ribosome) উল্লেখজনক ভূমিকা থাকে। জালিকা গাত্রে বিভিন্ন আকারের রাইবোসোম লাগিয়া থাকার জন্যই এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকাকে রুক্ষ দেখায়। অগ্ন্যাশয় ও যকৃত কোষের এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা সেই কারণে রুক্ষ।

গঠন অনুযায়ী এণ্ডোপ্লাজমের জালিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র 1.17)।

i. **সিসটারনি** (Cisternae, *plural of* Cisterna)—এই ধরনের জালিকাগুলি লম্বা, দুই পাশে চাপা এবং শাখাহীন। গড় পরিধি 4 হইতে 6 nm। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি যে সমস্ত কোষ গঠনমূলক কাজ বেশী করে সেই সমস্ত কোষে এই প্রকার জালিকা পাওয়া যায়।

ii. **থলির আকার বা ভেসিকিলস** (Vesicles)—এই ধরনের জালিকাগুলি ডিম্বাকার। ইহাদের ব্যাস 25 হইতে 50 nm এবং ইহারা বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। অধিকাংশ কোষে এই ধরনের জালিকা পাওয়া যায়।

iii. **নলাকার বা টিউবিউলস (Tubules)**—এই ধরনের জালিকাগুলি লম্বা এবং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। অপর দুই ধরনের জালিকার সহিত ইহারা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইহাদের ব্যাস 5 হইতে 20 nm। অধিকাংশ কোষেই ইহাদের পাওয়া যায়।



চিত্র 1.17 কোষের মধ্যে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের বিন্যাস। a = নলাকার, b = থলির আকার ও c = সিস্টারনি।

সব কোষে এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা থাকে না। সে সমস্ত কোষে এই জালিকা থাকে না তাহাদের মধ্যে উল্লেখ্য হইল ব্যাক্টিরিয়া, লোহিত রক্তকণিকা, ডিম্বকোষ এবং ভ্রূণ অবস্থার কোষ (Embryonic cells)। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে 1 ml যকৃত কোষে প্রায় 11 বর্গ মিটার এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা থাকে এবং এই জালিকার তিন ভাগের দুই ভাগ রুক্ষ।

এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার উৎপত্তি: এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা সৃষ্টির পদ্ধতি স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। মনে করা হয় নিউক্লিয়াসের আবরণী হইতে এই জালিকার সৃষ্টি হয়; আবার উল্টাভাবে ধরিলে কোষ বিভাজনের শেষ দশায় (Telophase) এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা হইতে নিউক্লিয়াসের আবরণী সৃষ্টি হয় (চিত্র 1.18 1)।

এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার কার্য

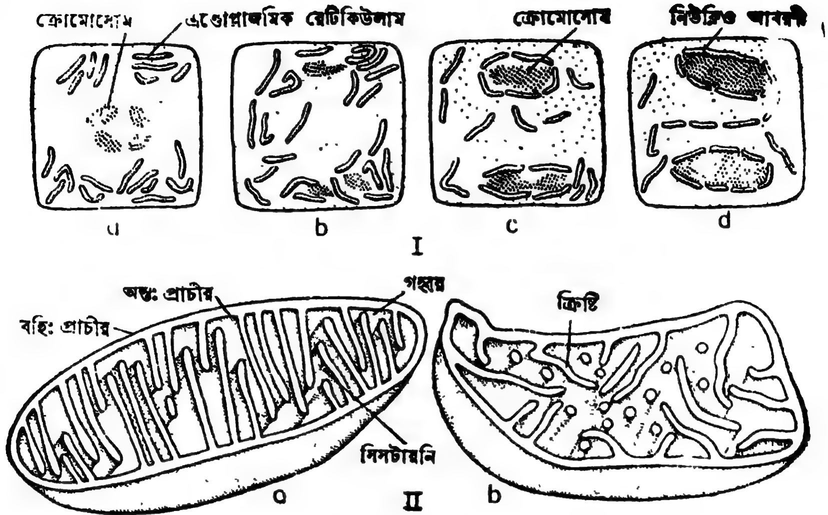
i. ইহা সাইটোপ্লাজমের জন্য একটি কাঠামো হিসাবে কাজ করে। সাইটোপ্লাজমের কলয়েডগুলিকে ধরিয়া রাখিতে ইহা সাহায্য করে।

ii. অসমোসিস, ডিফিউসন ইত্যাদি পদ্ধতিতে যে অণু বিনিময় হয়—এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার গাত্র তাহাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

iii. জালিকা গাত্রে অনেক উৎসেচক থাকে। উৎসেচকগুলি অনেক সংশ্লেষমূলক ও অনেক বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

iv. নিউক্লিয়াসের আবরণী সৃষ্টিতে এই জালিকা অংশ গ্রহণ করে।

v. অনেক রাসায়নিক বস্তুজনিত বিষক্রিয়ার (Toxic effect) হাত হইতে ইহা কোষকে রক্ষা করে।



চিত্র 1.18. I. a—d—এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম হইতে নিউক্লিও আবরণী সৃষ্টি। II. মাইটোকনড্রিয়নের আভ্যন্তরীণ গঠন। a ক্রিষ্টি অন্তঃপ্রাচীরের উপর লম্বভাবে সজ্জিত, b = ক্রিষ্টির এলোমেলো সজ্জা।

vi. কোষের মধ্যে ক্ষরণ বা সিক্রিটরী (Secretory) বস্তুর পরিবহণে ইহা সাহায্য করে। পরিবহণ নিম্নোক্ত উপায়ে হয়—

রুক্ষ জালিকা→মসৃণ জালিকা→গলজি আবরণী→লাইসোসোম বা সিক্রিটরী কণা।

B. মাইটোকনড্রিয়ন (*sing.* Mitochondrion : *pl.* Mitochondria)

কোষ অঙ্গাণুগুলির মধ্যে প্রধানতম হইল মাইটোকনড্রিয়ন। মাইটোকনড্রিয়ন শব্দটি গ্রীক। মাইটো (*Mito* = thread) এবং কনড্রিয়ন (*chondrion* = granule) এই দুইটি শব্দের সমাহারে মাইটোকনড্রিয়ন শব্দটি গড়িয়া উঠিয়াছে। মাইটোকনড্রিয়ন শব্দগত অর্থে দানাদার সুতা। শব্দটি বেণ্ডা (Benda) 1897 খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন।

অবস্থান : ব্যাক্টিরিয়া ও ব্লু-গ্রীণ শৈবাল ছাড়া প্রত্যেক প্রাণী বা উদ্ভিদকোষে মাইটোকনড্রিয়ন পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পূর্ণগঠিত লোহিত রক্তকণিকায়

মাইটোকনড্রিয়ন থাকে না যদিও ইহার উপস্থিতি লোহিত রক্তকণিকা গঠনের প্রথম অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণত সমগ্র সাইটোপ্লাজম জুড়িয়া মাইটোকনড্রিয়ন ছড়ানো থাকে। তবে যে সমস্ত কোষ বিপাকীয় কার্যে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে তাহাদের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় ইহারা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। রোগাক্রান্ত কোষে (Pathogenic cell) মাইটোকনড্রিয়ন নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অথবা কোষ আবরণীর তলায় থাকে। কোষের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যবস্তুর আধিক্য ঘটিলে মাইটোকনড্রিয়নের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। কোষ বিভাজনের সময় ইহারা বেমতন্তুর (Spindle) আশে পাশে স্থান করিয়া লয়। মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) গঠনকারী মাংসপেশীর মায়োফাইব্রিলের (Myofibril) ক্ষেত্রে মাইটোকনড্রিয়নগুলি আই ব্যাণ্ডের (I band) কাছে বৃত্তাকারে কেন্দ্রীভূত থাকে। মূত্রনালীর কয়েক স্থলে মাইটোকনড্রিয়ন কোষ আবরণীর উপর লম্বভাবে সাজানো থাকে। প্যারামেশিয়ামের ক্ষেত্রে মাইটোকনড্রিয়ন কোষ আবরণীর নিকটবর্তী সাইটোপ্লাজমে থাকে।

কোষের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়নের স্থান সচরাচর নির্দিষ্ট। সাধারণত স্তম্ভকাকার কোষগুলির ভিত্তি অংশে (Basal region) মাইটোকনড্রিয়ন থাকে। এইগুলি কোষটির লম্বা দিকের সহিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে, শ্বেত রক্তকণিকায় মাইটোকনড্রিয়নগুলি সেন্ট্রিওল (Centriole) ঘিরিয়া অরীয়ভাবে সাজানো থাকে। মনে করা হয় মাইটোকনড্রিয়নের অবস্থান সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্সের প্রকৃতি, কোষের আকার এবং ব্যাপন ক্রিয়ার গতিপথের (Direction of diffusion flow) উপর নির্ভরশীল।

সংখ্যা : কোষে মাইটোকনড্রিয়নের সংখ্যা কোষটির কাজের হার ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সেই কারণে এক প্রজাতি (Species) হইতে অন্য প্রজাতিতে অথবা একই প্রজাতির বিভিন্ন কোষে মাইটোকনড্রিয়নের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সাধারণত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মাইটোকনড্রিয়নের সংখ্যা কম। কোন কোন শৈবালে মাত্র একটি মাইটোকনড্রিয়ন থাকে। এককোষী অ্যামিবাতে মাইটোকনড্রিয়নের সংখ্যা অগণ্য। ইঁদুরের যকৃতের কোষে 500 হইতে 1,600 মাইটোকনড্রিয়ন পাওয়া যায়।

আকার : মাইটোকনড্রিয়নের আকার লম্বা, গোলাকার, আংটির ন্যায় ইত্যাদি নানা ধরনের। তবে এই আকার প্রায়শই নির্দিষ্ট থাকে না। শারীরবৃত্তীয় কাজে মাইটোকনড্রিয়নের আকারের পরিবর্তন ঘটে।

গঠন : মাইটোকনড্রিয়নের গঠন অনেকটা বদ্ধ থলির ন্যায়। সেই হিসাবে মাইটোকনড্রিয়নের দুইটি অংশ। মাইটোকনড্রিয়নের প্রাচীর (Mitochondrial wall) এবং প্রাচীরমধ্যস্থ ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (Matrix)।

মাইটোকনড্রিয়নের প্রাচীর ও কোষ আবরণীর গঠনের মধ্যে যথেষ্ট সমতা আছে। মাইটোকনড্রিয়নের প্রাচীর দুই স্তর বিশিষ্ট। বাহিরের প্রাচীরটিকে বহিঃপ্রাচীর

(Outer wall) এবং ভিতরের প্রাচীরটিকে অন্তঃপ্রাচীর (Inner wall) বলা হয়। দুইটি স্তরই কোষ আবরণীর ন্যায় প্রোটিন ও লিপিড যোগে সৃষ্ট। প্রতিটি প্রাচীর প্রায় 4 nm পুরু এবং ইহারা উভয়েই জলপ্রেমী (Hydrophilic)। মাইটোকনড্রিয়নের বহিঃপ্রাচীর ও অন্তঃপ্রাচীরের মধ্যে প্রায় 7 nm দূরত্ব থাকে। মাইটোকনড্রিয়নের বহিঃপ্রাচীর মসৃণ। কিন্তু অন্তঃপ্রাচীর অমসৃণ। অন্তঃপ্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঁজ সৃষ্টি করে এবং ভাঁজগুলি ভিতরের গহ্বরের দিকে প্রসারিত হয়। এই ভাঁজগুলিকে **মাইটোকনড্রিয়নের ক্রিষ্টি** বা শুধু **ক্রিষ্টি** (Cristae mitochondriales or Cristae, *plural of* Crista) বলা হয়। এই ভাঁজগুলি মাইটোকনড্রিয়নের একদিকের অন্তঃপ্রাচীর হইতে অন্যদিকের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত নহে। ভাঁজগুলি অন্তঃপ্রাচীরের অংশ অথবা নূতন কিছু সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

মাইটোকনড্রিয়নের ক্রিষ্টির সংখ্যায় যথেষ্ট হেরফের দেখা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর কোষ হইতে একই মাপের মাইটোকনড্রিয়ন লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ক্রিষ্টার সংখ্যা একই মাপের কোষের ক্ষেত্রেও সমান নহে। যকৃত কোষের মাইটোকনড্রিয়নের ক্রিষ্টার সংখ্যা বৃক্ক কোষের মাইটোকনড্রিয়নের ক্রিষ্টার সংখ্যা হইতে অনেক কম।

অধিকাংশ মাইটোকনড্রিয়নে ক্রিষ্টাগুলি অন্তঃপ্রাচীরের উপর লম্বভাবে থাকে। কোন কোন কোষের মাইটোকনড্রিয়নের ক্রিষ্টাগুলির অবস্থান অন্যরূপ হইতে পারে (চিত্র 1.18 II)।

নার্ভকোষ ও সরেখ (Striated) মাংসপেশীর ক্ষেত্রে ক্রিষ্টি মাইটোকনড্রিয়নের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হইয়া সজ্জিত থাকে। শুক্রকোষে ক্রিষ্টাগুলি চক্রাকারে সজ্জিত হইয়া বলয় সৃষ্টি করে। মানুষের শ্বেত রক্তকণিকায় ক্রিষ্টাগুলি শাখাপ্রশাখা সমন্বিত হয়। ক্যাওস ক্যাওস (*Chaos chaos*) নামক প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্রিষ্টাগুলি এলোমেলোভাবে সজ্জিত থাকে। শুক্রজনিতৃ কোষে (Spermatocyte) ক্রিষ্টাগুলি গোলাকার।

মাইটোকনড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স সমসত্ব, অর্ধ-তরল পদার্থ দ্বারা গঠিত। ইহা জল বিদ্বেষী। ইহার মধ্যে অনেক কণা (Granules) পাওয়া যায়। মনে করা হয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অণু এই কণার সহিত যোজিত থাকে। অন্তঃকোষ প্রাচীর এবং ক্রিষ্টাগুলি অনেক কণাবস্তু (Particles) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এই কণা বস্তুগুলিকে **এফ-ওয়ান পারটিকল** (F_1 particles) বলে। এই কণা বস্তুগুলি আয়তনে প্রায় 8·হইতে 10 nm। ইহাদের অবস্থান নিয়মানুগ। কেননা দুই কণাবস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্দিষ্ট—প্রায় 10 nm। কেহ কেহ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে মাইটোকনড্রিয়ন প্রতি ইহার সংখ্যা 10^4 হইতে 10^5। মনে করা হয় এই কণাগুলি এক ধরনের বিশেষ উৎসেচক। এই উৎসেচকটির নাম এ টি পি-এজ (ATP-ase)।

রাসায়নিক উপাদানসমূহ: মাইটোকনড্রিয়নের রাসায়নিক উপাদান একই রকমের হইলেও উপাদানগুলির পরিমাণ সকল মাইটোকনড্রিয়নে সমান নহে। ইহাতে শতকরা 65 হইতে 70 ভাগ প্রোটিন, 25 হইতে 30 ভাগ লিপিড, 0·5 ভাগ RNA এবং অল্প মাত্রায় DNA পাওয়া যায়। মাইটোকনড্রিয়নে DNA থাকায় মনে করা হয় ইহারা নিজেদের বংশগতি নিজেরাই নির্ধারণ করে। বর্তমানে মাইটোকনড্রিয়নের বহিঃপ্রাচীর গাত্রে রাইবোসোমের (Ribosome) অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

মাইটোকনড্রিয়নের উৎপত্তি: কোষের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়নের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয় তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মতবাদগুলি প্রচলিত—

1. স্বাধীনভাবে সৃষ্টি (Origin *de novo*)—এই মতবাদে বলা হইয়াছে কোষের মধ্যে যে লিপিড ও প্রোটিন আছে তাহা হইতেই প্রতি কোষে মাইটোকনড্রিয়নের সৃষ্টি হয়।

2. এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম হইতে—অনেকে মনে করেন এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা অথবা কোষ আবরণী হইতে মাইটোকনড্রিয়নের সৃষ্টি হয়।

3. পূর্ব সৃষ্ট মাইটোকনড্রিয়ন হইতে—মনে করা হয় পূর্ব সৃষ্ট মাইটোকনড্রিয়ন হইতে বিভাজন পদ্ধতির সাহায্যে নূতন মাইটোকনড্রিয়নের সৃষ্টি হয়।

মাইটোকনড্রিয়নের কার্য: মাইটোকনড্রিয়ন কোষের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গাণু। ইহা নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করে—

a. শক্তি উৎপাদন—পদার্থের পরমাণু যোজক দ্বারা যুক্ত হইয়া অণু সৃষ্টি করে। যুক্ত থাকার ফলে সৃষ্ট অণুগুলির মধ্যে শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যোজক হইতে মুক্তি লাভ করিলে সেই সুপ্ত শক্তির প্রকাশ ঘটে। সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে যোজক ছিন্ন হইলে 300 কিলো ক্যালোরির মত তাপ শক্তি পাওয়া যায়।

কোষ মধ্যস্থ কার্বোহাইড্রেট, লিপিড এবং অল্প মাত্রায় প্রোটিন জ্বালানি হিসাবে কাজ করে। অক্সিজেনের সাহায্যে দহনের ফলে এই সমস্ত বস্তু হইতে শক্তি এবং জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। এই উদ্ভূত শক্তি মাইটোকনড্রিয়ন এডিনোসাইন ট্রাইফসফেট (Adenosine triphosphate or ATP) নামক রাসায়নিকের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। একটি এডিনোসিন ট্রাইফসফেটে তিনটি ফসফেট গ্রুপ (Phosphate group) থাকে। ইহাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসফেট গ্রুপকে যোজক দ্বারা যুক্ত রাখিতে খুব বেশী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসফেট গ্রুপের যোজক ছিন্ন হয় তখন এই সুপ্ত শক্তির প্রকাশ ঘটে।



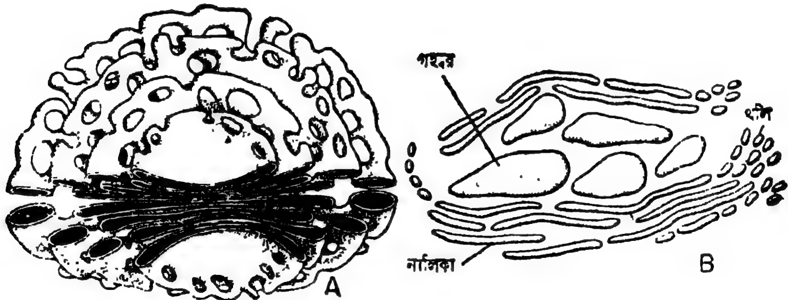
$$A-P\sim P\sim P \rightleftarrows A-P\sim P+P_1+7000\ \text{kcal}$$

কোষের অল্প পরিসরে এই ভাবে শক্তি উৎসারী (Energy-rich) ফসফেট বণ্ডের ($\sim$P) মধ্যে শক্তি সুপ্ত অথচ সহজলভ্য অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। এই সুপ্ত শক্তির

প্রকাশ ঘটিলে সেই প্রকাশিত শক্তি কোষের নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য যথা - শ্বসন চক্র, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ, কোষ বিভাজন, নার্ভ সংবেদ, আলোক বিচ্ছুরণ (Bioluminescence) ইত্যাদিতে ব্যয়িত হয়। সেই কারণে মাইটোকনড্রিয়নকে কোষের শক্তির কারখানা (Power house of cell) বলা হয়।

C গল্‌জি বডি (Golgi Body)

এণ্ডোপ্লাজমের জালিকায় ন্যায় দেখিতে কয়েকটি জালিকা কোষের মধ্যে থাকে। জালিকাগুলির গাত্র মসৃণ এবং ইহারা উচ্চশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে জোটবদ্ধ অবস্থায় এবং কিছু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোষে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এই জালিকাগুলিকে গল্‌জি বডি (Golgi body), গল্‌জি অ্যাপারেটাস (Golgi apparatus), গল্‌জি কমপ্লেক্স (Golgi complex) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় (চিত্র 1.19A)। বিড়াল এবং এক রকমের পেচকের (Barn owl) নার্ভকোষে গলজি বডির উপস্থিতি সম্বন্ধে 1898 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম তথ্য সরবরাহ করেন ক্যামিলো গল্‌জি (Camilo Golgi)। জীবকোষে গলজি বডির উপস্থিতি বহুদিন বিতর্কমূলক অবস্থায় ছিল। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর এই বিতর্কমূলক অবস্থার অবসান ঘটে। বর্তমানে গল্‌জি বডির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলে স্থির নিশ্চিত।



চিত্র 1.19. A = গল্‌জি বডি (আংশিক ব্যবচ্ছেদিত)। B = গল্‌জি বডির বিভিন্ন প্রকার জালিকা।

অবস্থান : কোষের মধ্যে গল্‌জি বডির স্থান নির্দিষ্ট নহে। দেখা গিয়াছে নার্ভ কোষের ক্ষেত্রে ইহা নিউক্লিও আবরণীর সন্নিকটে এবং এক্টোডার্মের Ectoderm) কোষের ক্ষেত্রে উহা নিউক্লিও আবরণী ও কোষ আবরণীর মাঝামাঝি থাকে। অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কোষে এবং প্রায় প্রতি উদ্ভিদ কোষে গল্‌জি বডি সুসংহত ভাবে একস্থানে না থাকিয়া সমগ্র সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। অনেকে ইহাদের গল্‌জি বডির পরিবর্তে ডিক্‌টিওসোম (Dictyosome) বলার পক্ষপাতী।

গঠন : গল্‌জি বডির গঠনে মূলত তিন প্রকারের জালিকা দেখা যায় (চিত্র 1.19 B), যথা—

a. **সিসটারনা** (*sing.* Cisterna *pl.* Cisternae)—ইহা চেপ্টা নালিকার ন্যায়। অসমান দৈর্ঘ্যের একাধিক জালিকা সম্মিলিত ভাবে ইহা সৃষ্টি করে। জালিকাগুলি সমান্তরাল ভাবে অথবা পরস্পরের সহিত যুক্ত অবস্থায় সজ্জিত থাকে। দুই জালিকা মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব 20 হইতে 30 nm।

জালিকাগুলির প্রাচীরের গঠন কোষ আবরণীর ন্যায়। প্রাচীর প্রায় 6 nm পুরু। একই জালিকার দুই দিকের প্রাচীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব 15 nm। সিসটারনার এক প্রান্ত নিউক্লিও আবরণী বা এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের খুব কাছাকাছি থাকে।

b. **ভ্যাকুওল** (Vacuole) : ইহা দেখিতে গোলাকার থলির ন্যায়। ইহা সিসটারনার নিকটে থাকে। মনে করা হয় সিসটারনা প্রাচীর প্রশস্ত হইয়া ভ্যাকুওল-গুলি সৃষ্টি করে। একটি ভ্যাকুওলের দুই দিকের প্রাচীর মধ্যবর্তী দূরত্ব 6 হইতে 20 nm।

c. **ভেসিকল** (Vesicle) : ভেসিকলগুলিও গোল, তবে আকারে ছোট এবং সিসটারনির প্রান্তদেশে থাকে। একটি ভেসিকলের ব্যাস 40 হইতে 80 nm। মনে করা হয় ভেসিকলগুলি সিসটারনির ছিন্ন প্রান্তসমূহ হইতে সৃষ্ট হয়।

রাসায়নিক উপাদান : গল্‌জি প্রাচীরে লিপিড, লাইপোপ্রোটিন এবং অনেক ধরনের উৎসেচক পাওয়া যায়। নার্ভকোষের গল্‌জি বডিতে লেসিথিন (Lecithin) ও কেফালিন (Cephalin) পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও ফ্যাটি অ্যাসিড, ভাইটামিন C এবং অ্যাসিড ফসফাটেজ (Acid phosphatase) গল্‌জি বডিতে পাওয়া গিয়াছে। গল্‌জি বডিতে যে সমস্ত উৎসেচক পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল এ. ডি. পি-এজ (ADP-ase) এবং এ টি. পি.-এজ (ATP-ase)।

গল্‌জি বডির উৎপত্তি : গল্‌জি বডি মসৃণ গাত্র এণ্ডোপ্লাজমিক রেটি-কিউলাম হইতে সৃষ্ট হয়। এই মতের সপক্ষে অনেক প্রমাণ কোষবিজ্ঞানীরা দিয়াছেন।

গল্‌জি বডির কার্য : গল্‌জি বডির প্রকৃত কাজ কি তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। গল্‌জি বডি কোষের মধ্যে থাকিয়া নিম্নোক্ত কাজগুলি করে—

1. যৌগ শোষণ ও সঞ্চয় (Absorption of and Storage of compound) : লৌহ, তাম্র ও স্বর্ণ ঘটিত যৌগ গল্‌জি শোষণ করিতে পারে কেন না গল্‌জি বডি প্রাচীরে এই সমস্ত যৌগের উপস্থিতি প্রমাণিত হইয়াছে। গল্‌জি

বডি লিপিড শোষণ, সঞ্চয় ও লিপিডের রাসায়নিক ধর্মের কিছুটা পরিবর্তন আনিয়া দেয়।

2. ক্ষরণ ভেসিকলের সৃষ্টি (Formation of Secretory Vesicle): গলজি বডির প্রধান কাজ ক্ষরণ ভেসিকলের তথা প্রাথমিক লাইসোসোমের (Primary Lysosome) সৃষ্টি। এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের লাইসোসোম প্রোটিন সংশ্লেষ করে এবং এই সংশ্লেষিত প্রোটিন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের প্রাচীর ভেদ করিয়া নালিকা মধ্যে প্রবেশ করে। তথা হইতে এই সংশ্লেষিত প্রোটিন গলজি বডিতে সঞ্চয়ের জন্য প্রেরিত হয়। দেখা গিয়াছে যে যে সকল ক্ষেত্রে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের সহিত গলজি বডির সরাসরি যোগ থাকে না সেই সব ক্ষেত্রে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম হইতে সংশ্লেষিত প্রোটিন দানা আকারে বাহিরে আসে এবং সিসটারনার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। সিসটারনার ভিতরে এই সঞ্চিত প্রোটিন ঘনীভূত হয় এবং তথা হইতে আবরণীযুক্ত প্রোটিন দানা রূপে বাহিরে আসে। এইগুলিকে ক্ষরণ ভেসিকল (Secretory vesicles) বলা হয়।

3. অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি (Formation of Acrosome): শুক্রকোষের অ্যাক্রোসোম সৃষ্টিতে গলজি বডি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

4. ইহা অযৌগিক শর্করা (Simple sugar) হইতে নানাবিধ কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

5. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির হইতে হর্মোন ক্ষরণে ইহা সাহায্য করে। দেখা গিয়াছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির গলজি বডি অক্ষম হইয়া পড়িলে হর্মোন ক্ষরিত হয় না।

6. উৎসেচক ক্ষরণে ইহা সাহায্য করে।

7. যে সমস্ত কোষ ক্ষরণমূলক কার্য করে সেই সমস্ত কোষে গলজি বডি সুগঠিত হয়। কোষের মধ্যে ক্ষরিত বস্তু গলজি বডির মধ্যে সঞ্চিত থাকে ও ঘনত্ব লাভ করে। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃস্রাবী (Exocrine) অংশের কোষে জাইমোজেন (Zymozen) সৃষ্টির সহিত গলজি বডির প্রত্যক্ষ যোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

8. গলজি বডি মাইটোকনড্রিয়নের ADP সৃষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করে।

D. *সেন্ট্রিওল* (Centriole)

অধিকাংশ প্রাণিকোষে এবং কিছু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষে সেণ্ট্রিওল বা সেণ্ট্রোসোম (Centrosome) পাওয়া যায়।

অবস্থান: সেণ্ট্রিওল মোটামুটিভাবে কোষের কেন্দ্রস্থলে এবং নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি জায়গায় থাকে। অনেক কোষে ইহারা নিউক্লিও আবরণীর মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় থাকে। অনেক কোষে ইহা গলজি বডি দ্বারা আংশিক আবৃত থাকে। সেণ্ট্রিওলের সংখ্যা একটি বা দুইটি। সেণ্ট্রিওলের সংখ্যা দুইটি হইলে একটি অপরটির উপর প্রায় লম্বভাবে থাকে। কোষে সেণ্ট্রিওলের অবস্থান মোটামুটি নির্দিষ্ট।

গঠন : সেণ্ট্রিওল স্তম্ভকাকার। ইহা দৈর্ঘ্যে 300 হইতে 500 nm এবং ইহার ব্যাস 150 nm। সেণ্ট্রিওলের প্রস্থচ্ছেদ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে প্রতি সেণ্ট্রিওল বৃত্তাকারে সজ্জিত নয়টি নলের গুচ্ছ (Bundles) লইয়া গঠিত (চিত্র 1.20)। প্রতি গুচ্ছে আবার তিনটি করিয়া নালিকা থাকে। এই তিনটির মধ্যে যে নালিকাটি কেন্দ্রস্থলে থাকে সেইটি পার্শ্ববর্তী গুচ্ছের কেন্দ্রবিচ্যুত নালিকার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এইভাবে থাকার ফলে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষকে বেষ্টন করিয়া ঘোরান সিঁড়ির ন্যায় সেণ্ট্রিওলটি গঠিত হয়। সেণ্ট্রিওল মিয়োসিস (Meiosis) পদ্ধতিতে বিভাজনের সময় ও ভ্রূণের গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় সুগঠিত হইয়া উঠে।



চিত্র 1.20. সেণ্ট্রিওলের নালিকাগুলির সজ্জা (ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে)।

রাসায়নিক উপাদান ও উৎপত্তি : সেণ্ট্রিওলের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নাই ; সেণ্ট্রিওলে DNA থাকায় মনে করা হয় ইহা স্ববিভাজিত হইতে পারে। সিলিয়াযুক্ত এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে (যেমন—প্যারামেশিয়াম) দেখা গিয়াছে স্ববিভাজন করিয়া ইহারা একাধিক নূতন সেণ্ট্রিওল সৃষ্টি করে। এই নূতন সেণ্ট্রিওলগুলি কোষ আবরণীর পরিসীমায় চলিয়া আসিয়া তথায় বেসাল বডি (Basal body) রূপে বিরাজ করে।

কার্য : সেণ্ট্রিওলের কার্য বিতর্কমূলক। মনে করা হয় কোষ বিভাজনের সময় ইহারা বেমতন্তু (Spindle) সৃষ্টি করে। কিন্তু উচ্চতর উদ্ভিদ কোষে ইহা না থাকিলেও বেমতন্তু গঠিত হয়। সুতরাং কোষ বিভাজনে ইহার ভূমিকা বিতর্কমূলক। সিলিয়াম ও ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে সেণ্ট্রিওল হইতে বেসাল বডির সৃষ্টি হয়। শুক্রকীটের (Sperm) ফ্ল্যাজেলাম সৃষ্টিতে দুইটি সেণ্ট্রিওলের মধ্যে নিউক্লিয়াস হইতে দূরে অবস্থিত সেণ্ট্রিওলটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

E. *রাইবোসোম* (Ribosome)

প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোষেই রাইবোসোম পাওয়া যায়। 1955 খ্রীষ্টাব্দে পালেড (Palade) ইহার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ছাড়া সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে না।

অবস্থান : প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক উভয় ধরনের কোষেই রাইবোসোম থাকে। প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোসোম কণাগুলি সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো অবস্থায় থাকে। ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের বহির্গাত্রে রাইবোসোম লাগিয়া থাকে।

সংখ্যা : কোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোসোমের সংখ্যা অগণ্য। যে সমস্ত কোষে প্রোটিন সংশ্লেষ বেশী হয় সেই কোষগুলিতে রাইবোসোমও অধিক সংখ্যায় থাকে।

আকার : রাইবোসোম আকারে ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার। ইহাদের ব্যাস 15 হইতে 20 nm। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় রাইবোসোমের দেহ দুইটি অংশে বিভক্ত। দুইটি অংশের মধ্যে একটি আকারে অন্যটি অপেক্ষা বড় এবং এই বড় অংশটি গম্বুজাকৃতি। ছোট অংশটি এই গম্বুজের মাথার উপর অবস্থিত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে রাইবোসোমের আকার কোষের মধ্যে কতটা ম্যাগনেসিয়াম আছে তাহার উপর নির্ভরশীল। কোষে ম্যাগনেসিয়ামের ঘনত্ব বাড়িলে রাইবোসোমের অংশ দুইটি প্রায় যুক্ত হইয়া যায়। আবার ম্যাগনেসিয়াম কম হইলে রাইবোসোমের অংশ দুইটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

রাসায়নিক সংগঠন : প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোষেই রাইবোসোমের রাসায়নিক সংগঠনে সমতা দেখা যায়। রাইবোসোম মূলত RNA ও প্রোটিন যোগে সৃষ্ট। রাইবোসোমে 40 হইতে 60% RNA এবং বাকী অংশ প্রোটিন। মনে করা হয় রাইবোসোমের কেন্দ্রস্থলে প্রোটিন এবং পরিসীমায় RNA থাকে। 6 হইতে 8টি রাইবোসোম অনেক ক্ষেত্রে একটি লম্বা m RNA সূত্রের সহিত অস্থায়ী ভাবে যুক্ত থাকে। এইভাবে যুক্ত থাকা অবস্থায় ইহাদের পলিসোম (Polysome) বলা হয়।

রাইবোসোমের কার্য : প্রোটিন সংশ্লেষ রাইবোসোমের প্রধান কার্য।

F. লাইসোসোম (Lysosome)

বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর মধ্যে লাইসোসোমের কথা সাম্প্রতিক কালে জানা গিয়াছে। ক্রিষ্টিয়ান দ্য দুভে (Christian de Duve) 1955 খ্রীষ্টাব্দে এই কোষ অঙ্গাণুটির নামকরণ করেন। কথাটির শব্দগত অর্থ হইল পাচনকারী দেহ (*Lyso*=digestive, *soma*=body)।

অবস্থান : প্রত্যেক প্রাণিকোষে এবং উদ্ভিদের ভাজক কোষে (Meristematic cell) লাইসোসোম পাওয়া যায়। ক্ষরণকারী কোষসমূহে (যেমন—যকৃৎ কোষ, অগ্ন্যাশয় কোষ, বৃক্ক কোষ) এবং শ্বেত রক্তকণিকায় অন্যান্য কোষের তুলনায় লাইসোসোম সংখ্যায় বেশী। কোষে লাইসোসোমের সংখ্যা অগণন।

আকার এবং মাপ : লাইসোসোমগুলি মসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এবং গোলাকার। উদ্ভিদের ভাজক কোষে ইহাদের গাত্র অসমান। ইহাদের গড় মাপ 0·2 হইতে 0·8 μm। বৃক্ক কোষে ইহাদের মাপ প্রায় 5 μm।

গঠন : লাইসোসোমের গঠন অনেকটা গোলাকার থলির ন্যায় অর্থাৎ আবরণী এবং আবরণী বেষ্টিত কিছুটা স্থান লইয়া লাইসোসোম সৃষ্ট। আবরণীটি গঠনে কোষ আবরণীর ন্যায়। আবরণী বেষ্টিত অংশটি কোন কোন লাইসোসোমে কঠিন আবার কোন কোন লাইসোসোমে ইহা অপেক্ষাকৃত ঘন বহির অংশ ও অপেক্ষাকৃত কম ঘন ভিতর অংশে বিভক্ত থাকে। আবরণী বেষ্টিত স্থানে একাধিক উৎসেচক ও ফেরিটিন (Ferritin) কণা পাওয়া যায়।

লাইসোসোমের উৎপত্তি : লাইসোসোমের উৎপত্তি কোথা হইতে হয় তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহারা কোষ আবরণী হইতে উদ্ভূত হয়, আবার কেহ কেহ বলেন গলজি বডি হইতে লাইসোসোমের উৎপত্তি হয়।

লাইসোসোমের কার্য :

1. লাইসোসোম ঘটিত পাচন (Lysosomal digestion)—খাদ্যকণা কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খাদ্য গহ্বরের সৃষ্টি করে। ইহা ক্রমে লাইসোসোম কণার নিকটে আসে এবং আসার পর খাদ্য গহ্বর ও লাইসোসোম একত্রে মিশিয়া যায়। লাইসোসোম-মধ্যস্থ উৎসেচক এক্ষণে খাদ্যটির উপর ক্রিয়া করিয়া খাদ্যকণাটিকে পাচিত করে।

2. কোষ অভ্যন্তরস্থ বস্তুর পাচন বা অটোফেগী (Autophagy)—কোষ-অভ্যন্তরে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড সংশ্লেষিত হইবার পর কিছু পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। উপবাসকালে লাইসোসোম এই সমস্ত সঞ্চিত বস্তু পাচন করাইয়া প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

3. নিজ কোষ পাচন বা অটোলাইসিস (Autolysis)—রোগঘটিত বা অন্য কোন কারণে কোষের মৃত্যু হইলে সেই কোষমধ্যস্থ লাইসোসোম ঐ মৃত কোষটিকে পাচিত করে। কোষের মৃত্যু হইলে ঐ কোষমধ্যস্থ লাইসোসোমের আবরণীটি নষ্ট হইয়া যায় এবং আবরণী মধ্যস্থ উৎসেচকগুলি মুক্ত হয়। ফলে মৃত কোষ এবং কোষ অঙ্গাণুগুলি পাচিত হইয়া যায়। ব্যাঙাচির নিজ লেজ পাচন লাইসোসোমের কাজের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

4. বহিঃকোষীয় পাচন (Extracellular digestion)—প্রয়োজন হইলে লাইসোসোমগুলি কোষ আবরণীর বাহিরে নিজেদের উৎসেচকগুলিকে পাঠাইয়া বহিঃকোষীয় পাচন সম্পাদন করিতে পারে।

G. *পেরোক্সিসোম*

অবস্থান : প্রাণিদেহের যকৃত ও বৃক্ক কোষে প্রচুর সংখ্যায় পেরোক্সিসোম পাওয়া যায়।

আকার এবং গঠন : আকারে ইহারা গোল অথবা ডিম্বাকৃতি। গড় ব্যাস 300 – 500 nm। একটি 6 nm পুরু আবরণী দ্বারা ইহাদের বহিঃগাত্র গঠিত।

কাজ : পেরোক্সিসোমের মধ্যে একাধিক উৎসেচক থাকে। উৎসেচকগুলির ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড (H_2O_2) জলে (H_2O) পরিণত হয়।

H. *কোষ গহ্বর বা ভ্যাকুওল* (Vacuole)

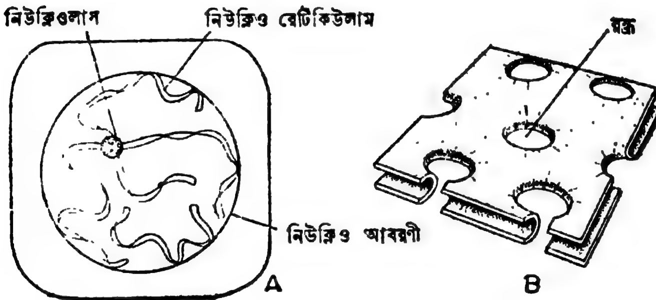
কিছু কিছু প্রাণিকোষে এবং প্রায় সকল উদ্ভিদ কোষে এক বা একাধিক গহ্বর থাকে। কোষ গহ্বরগুলি উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। গহ্বরগুলি শূন্য নহে। আবরণী বেষ্টিত তরল পদার্থ লইয়া গহ্বরটি সৃষ্ট। কোষ গহ্বরের আবরণীটিকে টোনোপ্লাস্ট (Tonoplast) বলে। ইহার গঠনের সহিত কোষ আবরণীর গঠনের সমতা আছে।

গহ্বরের মধ্যে যে তরল পদার্থ থাকে তাহাতে লবণ, অম্ল, শর্করা এবং কয়েক ক্ষেত্রে রঙ্গক এনথোসায়ানিন (Anthocyanin) পাওয়া যায়। অনেক বর্জ্য পদার্থও ইহাতে পাওয়া যায়।

I. *নিউক্লিয়াস* (Nucleus)

নিউক্লিয়াস কোষের এক অতি প্রয়োজনীয় সংগঠক। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একে অন্যের পরিপূরক। একের অভাবে অন্যটি বাঁচিতে পারে না। কোষ হইতে নিউক্লিয়াসকে তুলিয়া লইলে অবশিষ্ট সাইটোপ্লাজমের জৈব কার্য বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার মৃত্যু হয়। আবার সাইটোপ্লাজম হইতে তুলিয়া লওয়া নিউক্লিয়াসটিও সাইটোপ্লাজম ব্যতীত ইহার জৈব কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। নিউক্লিয়াস কোষমধ্যস্থ বিভিন্ন বিপাকীয় কার্য পরিচালনা করে। নিউক্লিয়াস বংশপরম্পরাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অবস্থান. ইউক্যারিওটিক কোষে নিউক্লিয়াস সুগঠিত। স্তন্যপায়ীর পূর্ণ-গঠিত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। কিন্তু গঠনের প্রারম্ভিক দশায় ইহাদের কোষগুলিতে নিউক্লিয়াস থাকে। প্রোক্যারিওটিক কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না।



চিত্র 1.21. A = নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ উপাংশসমূহ।
B = নিউক্লিও আবরণীর ত্রৈমাত্রিক চিত্ররূপ।

সংখ্যা : একটি কোষে একটি নিউক্লিয়াস—ইহাই রীতি। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। এককোষী প্যারামেশিয়াম দুইটি নিউক্লিয়াস ধারণ করে। অস্টিওব্লাস্ট কোষ (Osteoblast) এবং সরেখ (Striated) মাংসপেশীতে অনেক নিউক্লিয়াস থাকে। একটি কোষের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হইয়া এই সমস্ত বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে অথবা একাধিক কোষ পরস্পর মিলিয়া বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে—ইহা লইয়া যথেষ্ট বিতর্ক আছে। বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রাণিকোষকে সিনসিটিয়াল কোষ (Syncytial cell) এবং বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত উদ্ভিদ কোষকে সিনোসাইট (Caenocyte) বলা হয়।

আকার : নিউক্লিয়াসের আকার সাধারণত গোল তবে নিউক্লিয়াসের আকার নানান ধরনের হইতে পারে। যে সমস্ত উদ্ভিদ কোষে কোষ গহ্বর বড় সেই সব কোষে কোষ গহ্বর জনিত চাপে নিউক্লিয়াসটি লেন্সের (Lens) ন্যায় দেখায়। কিছু কিছু শ্বেত রক্ত কণিকায়, কিছু কিছু পতঙ্গের বুনন গ্রন্থি (Spinning gland) এবং গঠন কার্যরত কোষে নিউক্লিয়াস শৃঙ্খলের ন্যায় (Lobed)। সাধারণভাবে বলা যায় কোষের আকারের উপর নিউক্লিয়াসের আকার অনেকটা নির্ভরশীল।

মাপ : নিউক্লিয়াসের মাপ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন। আবার একই প্রজাতির প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গগঠনকারী কোষে ইহার মাপ ভিন্ন ভিন্ন। জনন একক (শুক্রকীট ও ডিম্বাণু) গঠনকারী কোষে (Spermatocyte and Oöcyte) এবং দ্রুত বর্ধনশীল (Growing) কোষে নিউক্লিয়াসের মাপ তুলনায় বড়। নিউক্লিয়াসের মাপ ও সাইটোপ্লাজমের মাপের মধ্যে কিছুটা সমানুপাতিকতা (Proportional) বর্তমান। এই সমানুপাতিকতা নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা হয়

$$NP = \frac{V_n}{V_c - V_n}$$

এখানে NP = নিউক্লিওসাইটোপ্লাজম ইনডেক্স (Nucleocytoplasm index), V_n = নিউক্লিয়াস ভলুম (Nucleus volume) এবং V_c = সাইটোপ্লাজম ভলুম (Cytoplasm volume)।

গঠন : নিম্নোক্ত অংশগুলির সমন্বয়ে নিউক্লিয়াস গঠিত (চিত্র 1.21)—

a. নিউক্লিও আবরণী (Nuclear membrane);
b. নিউক্লিও রস বা নিউক্লিওপ্লাজম (Nuclear sap or Nucleoplasm);
c. ক্রোমাটিন ফাইবার (Chromatin fibre) বা নিউক্লিও রেটিকিউলাম;
d. নিউক্লিওলাস (Nucleolus)।

নিউক্লিও আবরণী : নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন করিয়া যে আবরণীটি থাকে তাহাকে নিউক্লিও আবরণী বলা হয়। আবরণীটি পাতলা, অর্ধভেদ্য এবং ইহা সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ উপাংশগুলির মধ্যে প্রাচীরের ন্যায় উপস্থিত থাকে।

নিউক্লিও আবরণী ও কোষ আবরণীর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে। তবে নিউক্লিও আবরণীর সংখ্যা দুইটি অথবা বলা যায় নিউক্লিও আবরণী দুই স্তর বিশিষ্ট— বহিঃআবরণী ও অন্তঃআবরণী। বহিঃআবরণীর বহিঃগাত্রে এবং কখনও কখনও অন্তঃগাত্রে রাইসোসোম লাগিয়া থাকে; অন্তঃআবরণীতে রাইবোসোম লাগিয়া থাকে না। বহিঃআবরণীটি স্থানে স্থানে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের সহিত বা গলজি বডির সহিত যুক্ত থাকে।

অন্তঃআবরণী ও বহিঃআবরণী প্রত্যেকেই প্রায় 9 nm পুরু। দুই আবরণীর মধ্যে 10 হইতে 20 nm দূরত্ব থাকে। দুই আবরণী মধ্যবর্তী শূন্যস্থানটিকে পেরিনিউক্লিয়ার স্পেস (Perinuclear space) বলা হয়। নিউক্লিও আবরণী স্থানে

স্থানে রন্ধ্র বা ছিদ্রযুক্ত (চিত্র 1.21 B)। ছিদ্রপথ অষ্টভুজের (Octagonal) ন্যায় এবং মাপে প্রায় 50 nm। কোন কোন কোষে ছিদ্রপথগুলি নিয়মিত দূরত্বে অবস্থিত আবার কোন কোন কোষে ছিদ্রপথগুলির দূরত্ব ততটা নিয়মিত নহে। ছিদ্রপথ অঞ্চলগুলিতে বহিঃআবরণী ও অন্তঃআবরণী পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে।

নিউক্লিও আবরণী এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম হইতে সৃষ্ট হয়। কোষ বিভাজনের টিলোফেজ (Telophase) দশায় যখন নূতন নিউক্লিও আবরণীর প্রয়োজন হয় তখন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের ছিন্ন অংশগুলি জোড়া লাগিয়া ইহা সৃষ্টি করে।

নিউক্লিও আবরণী কোষের নানান প্রয়োজনীয় কার্য করে। ইহা সাইটোপ্লাজম নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে অবাধ মিশ্রণে বাধাস্বরূপ। নিউক্লিও আবরণী অর্ধভেদ্য। অনেক কোষে (যেমন —উসাইট—Oöcyte) ইহা নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আয়ন বিনিময়ে সাহায্য করে। আবার ড্রসোফিলার (*Drosophila*) লালাগ্রন্থি কোষের নিউক্লিও আবরণী ব্যাপন পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন কি ইহা আয়ন বিনিময় করিতে দেয় না।

নিউক্লিও আবরণীর ছিদ্রপথে বড় আকারের অণু (Macromolecule) আসা-যাওয়া করিতে পারে। নিউক্লিওপ্লাজম হইতে সাইটোপ্লাজমে এই ছিদ্রপথে রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন (Ribonucleoprotein = RNP) যাইতে পারে।

নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm): নিউক্লিও আবরণীর মধ্যে যে স্বচ্ছ, সমসত্ব, দানাদার ও অম্লধর্মী ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স থাকে তাহাকে নিউক্লিওপ্লাজম বলা হয়। ইহার অপর নাম ক্যারিওলিম্ফ বা নিউক্লিয়ার স্যাপ (Karyolymph or Nuclear sap)। নিউক্লিওপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল। নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoprotein) ইহার মূল সংগঠক। নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid), প্রোটিন, উৎসেচক এবং খনিজ লবণ নিউক্লিওপ্লাজমে পাওয়া যায়।

দুই প্রকারের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে। ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribose Nucleic acid, সংক্ষেপে DNA) এবং রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribose Nucleic acid, সংক্ষেপে RNA)। নিউক্লিওপ্লাজমে নানা ধরনের জটিল প্রোটিন পাওয়া যায়। কিছু প্রোটিন অম্লধর্মী (Acidic protein) এবং কিছু প্রোটিন ক্ষারধর্মী (Basic protein)। আবার কিছু প্রোটিন RNA-এর সহিত যুক্ত হইয়া রাইবোপ্রোটিন (Riboprotein) অবস্থায় থাকে। নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক উৎসেচক থাকে। DNA এবং RNA সংশ্লেষে এই উৎসেচকগুলি কাজ করে। নিউক্লিওপ্লাজমে যে সমস্ত খনিজ লবণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে উল্লেখ্য হইল পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম। DNA এর গঠন বিন্যাসের জন্য (চিত্র 1.10) দ্রষ্টব্য।

নিউক্লিও জালিকা বা ক্রোমাটিন ফাইবার (Chromatin fibre) : নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক লম্বা, পাকানো এবং সুতার ন্যায় সরু জালিকা পাওয়া যায়। এইগুলিকে নিউক্লিও রেটিকিউলাম, ক্রোমাটিন ফাইবার বা ক্রোমোটিন তন্তু বলা হয়। কোষ যখন বিভাজিত হয় না তখন এই জালিকা দেখা যায়। কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিও জালিকা রূপান্তরিত হইয়া ক্রোমোসোমে (Chromosome) পরিণত হয়। নিউক্লিও জালিকা পাকযুক্ত এবং নিউক্লিওপ্লাজমের সর্বত্র ছড়াইয়া থাকে। বিশেষ ধরনের রঞ্জক ব্যবহার করিলে জালিকার কিছু অংশ গাঢ় রূপে রঞ্জিত হয় আবার কিছু অংশের রঙ গাঢ় হয় না। ইণ্টারফেজ অবস্থায় গাঢ় রঞ্জিত অংশকে হেটারোক্রোমাটিন (Heterochromatin) এবং অল্প রঞ্জিত অংশকে ইউক্রোমাটিন (Euchromatin) অংশ বলা হয়।

নিউক্লিওলাস (Nucleolus)

নিউক্লিয়াসে গোলাকার, অম্লপ্রেমী (Acidophilic) একটি দানা থাকে। ইহাকে নিউক্লিওলাস বলা হয়। নিউক্লিওলাসের মাপ কোষের সংশ্লেষমূলক কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উসাইট (Oöcyte), নার্ভকোষ বা ক্ষরণকারী কোষে নিউক্লিওলাসের আকার বড়। আবার শুক্রকীট, পেশীকোষ ইত্যাদিতে নিউক্লিওলাসের আকার তুলনায় ছোট। একটি কোষে এক, দুই বা চারিটি নিউক্লিওলাস থাকিতে পারে। একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে নিউক্লিওলাসের সংখ্যা সাধারণত নির্দিষ্ট। নিউক্লিওলাই (নিউক্লিওলাসের বহুবচন) নিউক্লিয়াসের মধ্যে একসঙ্গে বা ছড়ানো অবস্থায় থাকিতে পারে। নিউক্লিওলাসের পরিসীমার নিকট অনেক ঘন দানা থাকে। দানাগুলির ব্যাস 15 হইতে 20 nm। এই অংশটিকে গ্রানুলার অংশ (Granular region) বলা হয়। এই অংশটি রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা সৃষ্ট। নিউক্লিও-লাসের কিছু অংশকে তন্তুময় অংশ (Fibrillar region) বলা হয়। এই অংশটি সুতার ন্যায়। তন্তুগুলি লম্বায় 8 nm। কোন কোন নিউক্লিওলাসের কিছুটা অংশ অনিয়তাকার (Amorphous)। এই অংশে কিছু কিছু প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনগুলি পেপসিন উৎসেচক প্রয়োগে সহজেই জলবিশ্লেষিত (Hydrolysed) হইয়া যায়।

নিউক্লিওলাসের কোন আবরণী থাকে না। ইহার সমগ্র অংশটি ক্যালসিয়াম আয়ন (Calcium ion) অক্ষুন্ন রাখে। নিউক্লিওলাসে কিছু কিছু গহ্বর দেখা যায়।

নিউক্লিওলাস মূলত RNA এবং প্রোটিন যোগে সৃষ্ট। নিউক্লিওলাসের RNA-এর সহিত রাইবোসোমের RNA-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। নানা ধরনের প্রোটিন নিউক্লিওলাসে পাওয়া যায়। একটি প্রধান প্রোটিনের নাম ফসফোপ্রোটিন (Phosphoprotein)।

নিউক্লিওলাসের কার্য :

a. রাইবোসোমের RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষ নিউক্লিওলাসের প্রধান কাজ। দুইটি ক্রিয়াই DNA নিয়ন্ত্রণ করে।

b. সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের বিপাকীয় কাজের মধ্যে ইহা সমন্বয় ঘটায়। কোষ বিভাজনের সময় ইহার প্রথমে অবলুপ্তি ও পরে পুনর্গঠন হয়।

c. দুইটি নিউক্লিওলাই-এর একটিকে নষ্ট করিলে কোষ বিভাজন হয় না। সুতরাং কোষ বিভাজনে ইহার ভূমিকা আছে।

I. **ভিটামিন** (Vitamin) : প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে ভিটামিন থাকে। ভিটামিন জটিল জৈব যৌগ। ইহাদের রাসায়নিক সংগঠনের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। ইহারা অতি অল্প মাত্রায় কোষে উপস্থিত থাকে। কিন্তু কোষের তথা জীবিত বস্তুর বৃদ্ধি, জৈবক্রিয়া এবং প্রজননে ইহাদের প্রয়োজন আছে। কোষের বিপাকীয় অনেক ক্রিয়ায় ভিটামিন উৎসেচকের ন্যায় কাজ করিয়া বিক্রিয়ার হার বাড়াইয়া দেয়। উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা বেশী। কোষের মধ্যে সকল ভিটামিনের সংশ্লেষ হয় না। খাদ্যবস্তুর মধ্য হইতে প্রাণীরা ভিটামিন সংগ্রহ করে। নানা প্রকারের ভিটামিন আছে। বিভিন্ন ভিটামিনকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—i. জল দ্রাব্য ভিটামিন (Water-soluble Vitamin) এবং ii. ফ্যাট দ্রাব্য ভিটামিন (Fat-soluble Vitamin)। ভিটামিন এ, ডি, ই, কে (A, D, E, K) ইত্যাদি ফ্যাটে দ্রবণীয় এবং ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (Vitamin B-Complex অর্থাৎ B_1, B_2 ইত্যাদি) জলে দ্রবণীয়। ভিটামিনের অভাবে বিপাকীয় ক্রিয়া বিশৃংখল হইয়া পড়ে এবং নানা রোগ দেখা দেয়।

J. **হর্মোন** (Hormone) : অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতে (Endocrine) যে হর্মোন সৃষ্টি হয় তাহা রক্তবাহিত হইয়া কোষে আসে। কোষের সাইটোপ্লাজমে এই হর্মোন অল্পমাত্রায় উপস্থিত থাকে। ইহারা কোষের মধ্যে উৎসেচক, RNA সংশ্লেষ ইত্যাদি কার্যে লাগে।

কোষ ও কোষ অঙ্গাণুর কার্য

1. **কোষ** : প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন ও কর্মের একক।

2. **কোষ আবরণী** : কোষের বাহির হইতে কোষের মধ্যে বস্তুর প্রবেশ এবং কোষ হইতে কোষের বাহিরে বস্তুর বহিষ্করণ নিয়ন্ত্রিত করে।

3. **সাইটোপ্লাজম** : ইহা বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুকে ধারণ করে। ইহার ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স অংশে উৎসেচক এবং জৈব পদার্থসমূহ, যেমন—প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট থাকে। নিউক্লিয়াসের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ইহার মধ্যে নানা সংশ্লেষমূলক কার্য সাধিত হয়।

4. **এণ্ডোপ্লাজমের জালিকা** : ইহা সাইটোপ্লাজমকে ধরিয়া রাখার কাঠামো হিসাবে কাজ করে। জালিকাগুলি থাকার ফলে কোষপৃষ্ঠের আয়তন বহুগুণ বর্ধিত হয়। অন্তঃকোষীয় এবং বহিঃকোষীয় রাসায়নিক অণু পরিবহণে ইহা সাহায্য করে। নিউক্লিও আবরণী সম্ভবত ইহা হইতে সৃষ্ট হয়।

5. **মাইটোকনড্রিয়ন** : কোষ মধ্যে ইহা শক্তির উৎস বা কারখানা হিসাবে কাজ করে। ইহা শ্বসনে সাহায্য করে।

6. **গলজি বডি** : সংশ্লেষিত প্রোটিন ও উৎসেচকের সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসাবে ইহা কাজ করে।

7. **কোষ গহ্বর** : অপ্রয়োজনীয় জল, বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি কোষ গহ্বরে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে।

8. **সেন্ট্রিওল (প্রাণিকোষে)** : কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠনে এবং সেই সূত্রে ক্রোমোসোমের স্থানান্তরণে ইহা সাহায্য করে।

9. **নিউক্লিয়াস** : কোষের সমস্ত কার্যকে ইহা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা কোষের প্রাণকেন্দ্র। কোষের বৃদ্ধি ও প্রজননে ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

10. **নিউক্লিও আবরণী** : সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে ইহা বিভেদ প্রাচীর রূপে থাকে। ইহার ভেদ্যতা থাকার ফলে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজমে বস্তুর প্রবেশ ও প্রস্থান সম্ভব হয়।

11. **নিউক্লিওপ্লাজম** : ক্রোমাটিন ফাইবারগুলিকে ইহা ধারণ করে, DNA এবং প্রোটিন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় এমন রাসায়নিক ইহার মধ্যে থাকে।

12. **ক্রোমোসোম** : ইহারা বংশগতির ধারক ও বাহক।

13. **নিউক্লিওলাস** : রাইবোসোম ও প্রোটিন সংশ্লেষে ইহা কাজ করে।

অনুচ্ছেদ 2

ক্রোমোসোম ও কোষ বিভাজন

2.1. ক্রোমোসোম

কোষের নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক ক্রোমাটিন ফাইবার বা তন্তু (Chromatin fibres) থাকে। ইহারা নিউক্লিওপ্লাজমে সাধারণ অবস্থায় বিশৃংখল অবস্থায় ছড়ানো থাকে। কোষ বিভাজনের সময় নিরুদিত (Dehydrated) হওয়ার ফলে ইহাদের স্পষ্ট আকারে দেখা যায়। আকারে ইহারা সূতার ন্যায়। ইহাদের **ক্রোমোসোম** বলা হয়। কোষ বিভাজনের মেটাফেজ (Metaphase) ও অ্যানাফেজ (Anaphase) দশায় ক্রোমোসোমের অবয়ব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

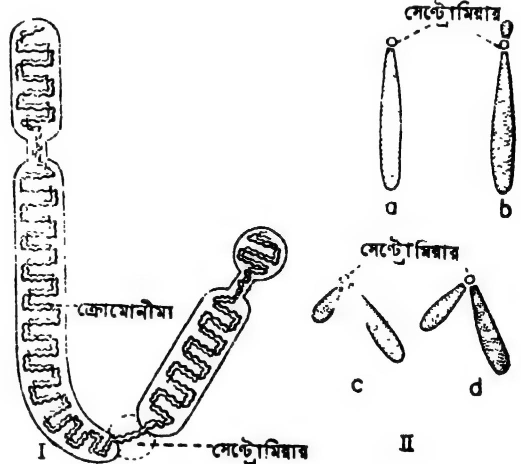
ক্রোমোসোম সংখ্যা: কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ একটি প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে যদি 10টি ক্রোমোসোম থাকে তাহা হইলে সেই প্রজাতিভুক্ত সকল প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা 10টি হইবে। সেই কারণে অন্যান্য চরিত্র লক্ষণের সহিত ক্রোমোসোম সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি নির্ধারণ তথা শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে অ্যাসকেরিস মেগালোসেফালা (*Ascaris megalocephala*) নামক গোলকৃমির ক্রোমোসোম সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম—মাত্র দুইটি। আবার এককোষী প্রাণী অ্যামিবার ক্রোমোসোমের সংখ্যা 600 বা তাহারও বেশী। শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণী বা উদ্ভিদের অবস্থান বা তাহাদের দেহ গঠনের জটিলতা ক্রোমোসোমের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। অনেক উচ্চশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ অপেক্ষা কম হইতে পারে। অধিকাংশ প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা 2 দ্বারা বিভাজ্য হইবে। যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ যৌন প্রজনন করে তাহাদের দেহকোষে ক্রোমোসোম জোড়ায় জোড়ায় থাকে। প্রতি জোড়ার একটি সভ্য ডিম্বাণু বা মাতার নিকট হইতে এবং অন্য সভ্যটি শুক্রাণু বা পিতার নিকট হইতে আসে। উচ্চতর প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহকোষের ক্রোমোসোম সেই কারণে ডিপ্লয়েড (Diploid = 2n) অবস্থায় থাকে। এই সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের পূর্ণ গঠিত জনন কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোমযুক্ত কোষকে হ্যাপ্লয়েড (Haploid = n) অবস্থা বলা হয়।

মাপ: ক্রোমোসোমের মাপ নানা ধরনের হইতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের মাপ একই প্রজাতির সকল সভ্যের সকল দেহকোষে একই রকমের। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোসোমের মাপ বিভিন্ন। ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 0·2 হইতে 50 μm হইতে পারে। প্রস্থে ক্রোমোসোম 0·2 হইতে 2 μm পর্যন্ত হইতে পারে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে উদ্ভিদের ক্রোমোসোম মাপে বড়। একটি কোষে

যতগুলি ক্রোমোসোম থাকে তাহারা সকলে মাপে এক নয় অর্থাৎ একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মাপ বিভিন্ন। ড্রসোফিলা (*Drosophila*) নামক মাছির লার্ভার লালা গ্রন্থির (Salivary gland) ক্রোমোসোম মাপে বড়।

আকার : ক্রোমোসোমের আকার সাধারণত লম্বা। কিছু কিছু ক্রোমোসোম আকৃতিতে স্থূল। তবে ক্রোমোসোমের আকার সর্বদা একই রকম থাকে না। কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় ক্রোমোসোমের আকারের পরিবর্তন হয়। ইণ্টারফেজ (Interphase) বা একই কোষের পর পর দুইবার বিভাজন মধ্যবর্তী অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি পাকানো সরু সুতার ন্যায় দেখায়। আবার মেটাফেজ বা অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলি ইণ্টারফেজ দশার তুলনায় মোটা ও অল্প পাকানো অবস্থায় থাকে। এই সময়ে ক্রোমোসোমগুলি ইংরাজী V অক্ষরের ন্যায় দেখায়। V অক্ষরটির দুইটি বাহু সম বা অসম হইতে পারে।

গঠন : প্রতি ক্রোমোসোমের দেহ দুই গুচ্ছ তন্তু বা **ফাইবার** (Fibre) দ্বারা গঠিত। প্রতি গুচ্ছকে ক্রোমোনীমা (Chromonema) বা ক্রোমাটিড (Chromatid) বলা হয়। একটি ক্রোমোসোমে অন্যূন দুইটি ক্রোমোনীমা থাকে (চিত্র 2.1)। প্রতি গুচ্ছ ক্রোমোনীমা আবার আরও সূক্ষ্ম তন্তু (Microfibrils দ্বারা গঠিত। ক্রোমোনীমা দুইটি পরস্পরকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া থাকে (চিত্র 2 1-I)। ক্রোমোনীমা গুচ্ছের ব্যাস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন হইয়া যায়। ইণ্টারফেজ দশায় এই ব্যাস 25 nm। মেটাফেজ দশায় 3C0 nm। ক্রোমোনীমার দেহের সর্বত্র রাসায়নিকগুলির ঘনত্ব একই রকমের নহে। স্থানে স্থানে এই ঘনত্ব খুব বেশী। ক্রোমোনীমার দেহের বেশী ঘন অংশগুলিকে **ক্রোমোমিয়ার** (Chromomere) বলা হয়। দুই ক্রোমোমিয়ারের মধ্যবর্তী অল্প ঘন অংশকে **ইণ্টার ক্রোমোমিয়ার** (Inter chromomere) বলা হয়। একই প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ক্রোমোনীমার দেহে ক্রোমোমিয়ার ও ইণ্টার ক্রোমোমিয়ার



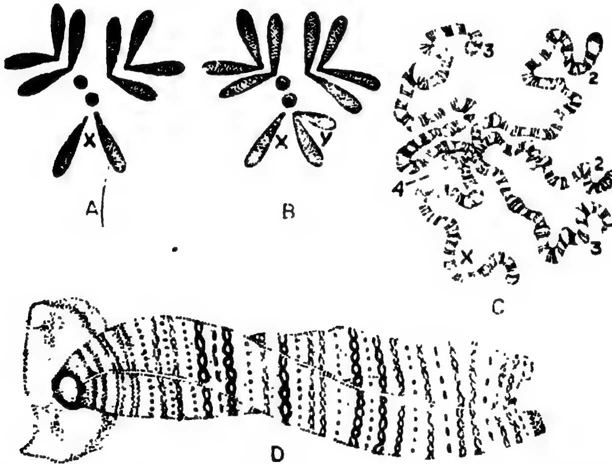
চিত্র 2.1 I অ্যানাফেজ দশায় দেহ ক্রোমোসোমের চিত্ররূপ ; II সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান নির্ভর বিভিন্ন প্রকারের ক্রোমোসোম : a. অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক, b. টিলোসেণ্ট্রিক, b. সাব মেটাসেণ্ট্রিক, 4. মেটাসেণ্ট্রিক।

অংশ সুনির্দিষ্ট থাকে। কেহ কেহ মনে করেন ক্রোমোমিয়ার অংশে নিউক্লিওপ্রোটিন বেশী মাত্রায় থাকে আবার কেহ কেহ মনে করেন ক্রোমোমিয়ার অংশে ক্রোমোনীমা দুইটির মধ্যে বেশী সংখ্যক পাক থাকে।

প্রতি ক্রোমোসোমে অন্তত একটি গোলাকার ও স্বচ্ছ অংশ আকে। এই অংশটিকে সেণ্ট্রোমিয়ার বা কাইনীটোকোর (Centromere or Kinetochore) বলা হয়। ক্রোমোনীমা দুইটি এই অংশ দ্বারা পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। সেণ্ট্রোমিয়ারের উভয় দিকের প্রত্যেকটিকে ক্রোমোসোমের বাহু বলা হয়। সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান প্রতি ক্রোমোসোমের ঠিক একই স্থানে নহে। তবে একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ক্ষেত্রে প্রতি কোষে ইহার অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে। সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমের নিম্নোক্ত উপায়ে নামাকরণ করা হয় (চিত্র 2.1-II) --

a. **টিলোসেণ্ট্রিক** (Telocentric)—সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের এক প্রান্তের একটু নিচে থাকে।

b. **অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক** (Acrocentric)—সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের একেবারে এক প্রান্তে থাকে।



চিত্র 2.2 ড্রসোফিলার ক্রোমোসোম (A), স্ত্রী (B), পুরুষ। x এবং y দ্বারা সেক্স ক্রোমোসোমকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। C. ড্রসোফিলার লালাগ্রন্থির ক্রোমোসোম। 2, 3, 4 অটোসোমসমূহ। লক্ষণীয়—4 আকারে খুব ছোট। x = সেক্স ক্রোমোসোম। 4নং অটোসোমের বহুগুণ বর্ধিত চিত্ররূপ D। লক্ষণীয়—হোমোলোগাস ক্রোমোসোম ঘন সন্নিবিষ্ট, সেণ্ট্রোমিয়ার অস্পষ্ট (বা.ম), ব্যাণ্ড ও ইণ্টার ব্যাণ্ড।

c. **মেটাসেণ্ট্রিক** (Metacentric)—সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের মধ্যভাগে থাকে।

d. **সাবমেটাসেণ্ট্রিক** (Sub-metacentric)—সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের মধ্যভাগের একটু নিচের দিকে থাকে।

কোন কোন ক্রোমোসোমে একটির বেশী সেণ্ট্রোমিয়ার থাকে। সেণ্ট্রোমিয়ারের উপস্থিতির জন্যে ক্রোমোসোম গাত্রে যে ভাঁজ পড়ে সেই ভাঁজটিকে **প্রাইমারী কন্‌সট্রিকশন** (Primary constriction) বলা হয়। এই ভাঁজ ছাড়া ক্রোমোসোমের গাত্রে অন্য ভাঁজ থাকিলে সেই ভাঁজকে **সেকেণ্ডারী কন্‌সট্রিকশন** (Secondary constriction) বলা হয়। সেকেণ্ডারী কন্‌সট্রিকশন অংশ কোষ বিভাজনের শেষ দশায় নিউক্লিওলাসের গঠনে সাহায্য করে বলিয়া এই অংশকে **নিউক্লিওলার জোন** (Nucleolar zone) বলা হয়। অবশ্য সব ক্রোমোসোমে নিউক্লিওলার জোন থাকে না। প্রতি কোষে মাত্র দুইটি ক্রোমোসোমে এই জোন থাকে। এই ক্রোমোসোম দুইটিকে **নিউক্লিওলার ক্রোমোসোম** (Nucleolar chromosome বলা হয়।

একটি ক্রোমোসোমের দুই বাহুর অগ্রভাগ সুচিহ্নিত। অন্য ক্রোমোসোমের প্রান্ত ভাগের সহিত ইহা সাধারণত যুক্ত হয় না। ক্রোমোসোমের প্রান্ত বিন্দুকে টিলোমেয়ার (Telomere) বলা হয়। অনেক ক্রোমোসোমের সহিত গোলাকার বোতামের ন্যায় একটি বস্তু তন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে। এই গোলাকার বস্তুটিকে স্যাটেলাইট (Satellite) বলা হয়।

পূর্বে মনে করা হইত প্রতি ক্রোমোসোম একটি ম্যাট্রিক্সের উপর থাকে এবং ম্যাট্রিক্স ও ক্রোমোসোমকে বেষ্টন করিয়া **আবরণী** বা **পেলিকল** (Pellicle) থাকে বর্তমানে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারে ইহা প্রমাণিত যে ম্যাট্রিক্স ও পেলিকল থাকে না।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদান

নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন ক্রোমোসোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। একটি ক্রোমোসোমের দেহের ওজনের 90 শতাংশ নিউক্লিওপ্রোটিন। অবশিষ্ট 10 শতাংশ রেসিডিউয়াল ক্রোমোসোম (Residual chromosome)। ক্রোমোসোমের প্রধান নিউক্লিক অ্যাসিড হইল DNA। নিউক্লিওপ্রোটিনের 45 শতাংশ DNA এবং বাকী 55 শতাংশ হিস্টোন (Histone) নামক প্রোটিন। রেসিডিউয়াল ক্রোমোসোমে 13 শতাংশ RNA, 2 শতাংশ DNA এবং বাকী 85 শতাংশ প্রোটিন। কিছু কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়। রেসিডিউয়াল প্রোটিনের মুখ্য উপাদান ট্রিপটোফ্যান ও টাইরোসিন (Tryptophan and Tryrosine)। রেসিডিউয়াল প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের বাঁধন হিসাবে কাজ করে। ক্রোমোসোমের দেহ হইতে এই প্রোটিন পরীক্ষামূলকভাবে সরাইয়া লইলে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের বাঁধন ভাঙ্গিয়া যায়।

ক্রোমোসোমের প্রকারভেদ

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের (লিঙ্গভেদ সম্পন্ন) ক্রোমোসোমের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। ইহাদের দেহকোষে যতগুলি ক্রোমোসোম পাওয়া যায়

তাহাদের মধ্যে একজোড়া ক্রোমোসোম অন্যান্য ক্রোমোসোম হইতে একটু ভিন্নধর্মী। এই একজোড়া ভিন্নধর্মী ক্রোমোসোমকে **সেক্স** বা **লিঙ্গ ক্রোমোসোম** (Sex chromosome) বা সংক্ষেপে **এক্স ক্রোমোসোম** (X chromosome) বলা হয় (চিত্র 2.2 A-B)। বাকী ক্রোমোসোমগুলিকে **অটোসোম** (Autosome) বলা হয়। ইহার অর্থ ক্রোমোসোম দুই প্রকারের অটোসোম ও সেক্স ক্রোমোসোম। সেক্স ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারক। সেক্স ক্রোমোসোম দুইটিকে X এবং Y এই দুইটি ইংরাজী অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একজোড়া সেক্স ক্রোমোসোমের দুইটি X ক্রোমোসোম বা একটি X ও অন্যটি Y ক্রোমোসোম হইতে পারে। মানুষের দেহ কোষে 46টি ক্রোমোসোম থাকে। ইহাদের মধ্যে 22 জোড়া অটোসোম এবং একজোড়া সেক্স ক্রোমোসোম। নারীর ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোসোম দুইটির প্রত্যেকটিই X ক্রোমোসোম এবং পুরুষের ক্ষেত্রে দুইটি সেক্স ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি X এবং অন্যটি Y। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নারীর ক্ষেত্রে দুইটি সেক্স ক্রোমোসোম একই ধরনের অর্থাৎ X এবং পুরুষের ক্ষেত্রে দুইটি সেক্স ক্রোমোসোম একই ধরনের নহে—একটি X এবং অন্যটি Y। কিন্তু সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই সেক্স ক্রোমোসোম দুইটির একটি X এবং অন্যটি Y হইলে সেই প্রাণীটি পুরুষ হইবে অথবা দুইটিই X হইলে সেটি নারী হইবে ইহা সত্য নহে। সেক্স ক্রোমোসোম দুইটিই X হইলে সেই দশাকে **হোমোজাইগাস** (Homozygous) দশা এবং একটি X ও অন্যটি Y হইলে সেই দশাকে **হেটারোজাইগাস** (Heterozygous) দশা বলা হয়। যথা, মুরগী ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষ = হোমোজাইগাস = XX এবং স্ত্রী হেটারোজাইগাস = XY। অনেক পুরুষ পতঙ্গের একজোড়া সেক্স ক্রোমোসোমের একটি (Y) অনুপস্থিত থাকে। সেক্স ক্রোমোসোমের এই দশা বুঝাইতে XO এই দুইটি ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করা হয়।

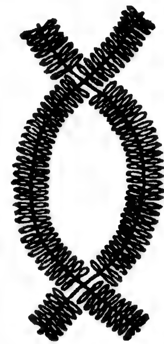
ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন

বিশেষ রঞ্জক, যথা বেসিক ফুকসিন (Basic Fuchsin) ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্রোমোসোম গাত্রের কয়েকটি স্থান গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় এবং কয়েকটি স্থান হালকা রঙে রঞ্জিত হয়। ইন্টারফেজ অবস্থায় হালকা রঙে রঞ্জিত স্থানগুলিকে **ইউক্রোমাটিন** (Euchromatin) স্থান এবং গাঢ় রঙে রঞ্জিত স্থানগুলিকে **হেটারোক্রোমাটিন** (Heterochromatin) স্থান বলা হয়। মনে করা হয় ইউক্রোমাটিন স্থানগুলি বংশগতির ব্যাপারে সক্রিয় এবং এখানে বেশি পরিমাণ DNA থাকে। পক্ষান্তরে হেটারোক্রোমাটিন স্থানগুলিতে DNA-এর পরিমাণ কম থাকে। ইহা বংশগতির ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ক্রোমোসোমের নিজস্ব বিপাকীয় ক্রিয়ায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষে এই স্থানগুলি অত্যন্ত সক্রিয়।

বৃহদাকার ক্রোমোসোম

ড্রসোফিলা নামক মাছির লার্ভা অবস্থার লালাগ্রন্থির কোষে বৃহদাকার ক্রোমোসোম দেখা যায়। এই ক্রোমোসোমগুলিকে পলিটিন ক্রোমোসোম (Polytene chromosome) বলা হয়। ড্রসোফিলার ক্রোমোসোম সংখ্যা চারি জোড়া। লার্ভার লালাগ্রন্থির কোষে ক্রোমোসোমগুলি সাধারণ দেহকোষের ক্রোমোসোমের তুলনায় লম্বায় এবং চওড়ায় অনেক বড় দেখায়। লালাগ্রন্থির এই ক্রোমোসোমগুলিতে DNA-এর পরিমাণ দেহকোষের অন্যান্য ক্রোমোসোমের তুলনায় অনেক বেশী থাকে এবং ক্রোমোনীমাগুচ্ছের সংখ্যাও বেশী হয়। এই ক্রোমোসোমগুলির সমগ্র দৈর্ঘ্য জুড়িয়া কিছুদূর অন্তর অন্তর **কালো বেষ্টনী** (Dark band) থাকে। দুইটি কালো বেষ্টনীর মধ্যবর্তী অংশকে **ইন্টার ব্যান্ড** (Inter band) বলা হয় (চিত্র 2.2 C-D)। কালো বেষ্টনী অঞ্চলে DNA বেশী পরিমাণে থাকে এবং অনেকে মনে করেন এই অঞ্চলগুলিকেই জীন (Gene) বলা উচিত।

কিছু কিছু উভচর সরীসৃপ এবং মাছের ডিম্ব-সৃষ্টিকারী কোষ [উসাইট (Oocyte)] গুলির বিভাজনের ডিপ্লোটিন (Diplotene) দশায় বৃহদাকার ক্রোমোসোম দেখা যায়। এই ক্রোমোসোমগুলিকে **ল্যাম্প ব্রাস** (Lamp brush) ক্রোমোসোম বলা হয় (চিত্র 2.3)। এই ক্রোমোসোমগুলি লম্বায় পলিটিন ক্রোমোসোম অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বড়। ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোসোমের দেহ একটি কেন্দ্রীয় বা ক্রোমোসোমাল অক্ষ (Central or Chromosomal axis) এবং এই অক্ষ হইতে নির্গত পার্শ্বীয় লুপ (Lateral Loop) দ্বারা গঠিত। লুপগুলি সংখ্যায় অনেক এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের দুই পার্শ্বে থাকায় সমগ্র ক্রোমোসোমকে বুরুশের (Brush) ন্যায় দেখায়। কেন্দ্রীয় অক্ষে চারিটি ক্রোমোনীমা থাকে।



চিত্র 2.3 ব্যাঙের ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোসোম।

কতকগুলি পরিচিত প্রাণীর সোমাটিক (2n) ক্রোমোসোম সংখ্যা :—

মানুষ	46	কুকুর	78
পায়রা	80	বিড়াল	38
নেংটি ইঁদুর	40	গরু	60
মেঠো ইঁদুর	42	ঘোড়া	66
মাছি	12	ভেড়া	54
মশা	6	গঙ্গাফড়িং	পুরুষ—23
মৌমাছি	32		স্ত্রী— 24
ব্যাঙ	22	পঙ্গপাল	পুরুষ—13
গিনিপিগ	64		স্ত্রী— 14
খরগোস	44		

2.2 ইউক্যারিওটিক কোষের বিভাজন

জীবিত বস্তুর প্রধান ধর্ম স্বপ্রজনন (Self-reproduction)। কোষ অঙ্গাণুগুলি ইউক্যারিওটিক কোষে সুসংবদ্ধ হইয়া থাকে। অধিকাংশ অঙ্গাণুই স্বপ্রজনন ক্ষমতার দ্বারা ঠিক নিজের ন্যায় অঙ্গাণু গঠন করিতে পারে। নূতন কোষ অঙ্গাণু গঠনে পূর্বসৃষ্ট অঙ্গাণুগুলি ছাঁচের (Template) ন্যায় কাজ করে। সেল থিয়োরী এই কথাই বলে যে নূতন কোষ সর্বক্ষেত্রেই পূর্বসৃষ্ট কোষ হইতে সৃষ্টি হয়। পূর্বসৃষ্ট কোষ বা জনিতৃ কোষ হইতে নূতন কোষ বা অপত্য কোষ সৃষ্টির সম্ভাবনা তখনই হইতে পারে যখন কতকগুলি কোষ অঙ্গাণুর স্বপ্রজনন হয়। প্রয়োজনীয় অঙ্গাণুগুলির স্বপ্রজনন হইলেই একটি জনিতৃ কোষ হইতে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। জনিতৃ কোষ হইতে অপত্য কোষ সৃষ্টি **বিভাজন** প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া হয়। জনিতৃ কোষ বিভাজিত হইয়া সৃষ্ট অপত্য কোষ গুলিতে জনিতৃ কোষের গুণাগুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে।

2.3 ইউক্যারিওটিক কোষের বিভাজন পদ্ধতিসমূহ

ইউক্যারিওটিক কোষের বিভাজন পদ্ধতি তিন প্রকার—A. মাইটোসিস (Mitosis), B. মিয়োসিস (Meiosis) এবং C. অ্যামাইটোসিস (Amitosis)। মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনে জনিতৃ কোষের ক্রোমোসোমগুলি অপত্য কোষ দুইটিতে সংখ্যাগত এবং গুণগতভাবে একই রকম হয়। অর্থাৎ জনিতৃ কোষে যতগুলি ক্রোমোসোম থাকে তাহারা সমান সংখ্যায় এবং সমগুণ সম্পন্ন অবস্থায় অপত্য কোষে আসে। মুখ্য জনন অঙ্গ ব্যতীত সমস্ত দেহ কোষে মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনে জনিতৃ কোষ হইতে বিভাজনের চূড়ান্ত পর্যায়ে চারিটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। প্রতি অপত্য কোষ জনিতৃ কোষে যতগুলি ক্রোমোসোম থাকে তাহার অর্ধেক পায় এবং অপত্য কোষের ক্রোমোসোমের গুণগত অবস্থা জনিতৃ কোষের ক্রোমোসোমের গুণগত অবস্থা হইতে একটু আলাদা হয়। মুখ্য জনন অঙ্গে মিয়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন হয়। অ্যামাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন **প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন**। জনিতৃ কোষ হইতে সৃষ্ট অপত্য কোষ দুইটিতে ক্রোমোসোমগুলি সম সংখ্যায় এবং সমগুণ সম্পন্ন অবস্থায় যায়। সেই হিসাবে মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের সহিত অ্যামাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের অনেক মিল আছে। কিন্তু মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনে ক্রমিক এবং দৃশ্যমান ঘটনা থাকে। অ্যামাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনে এই ক্রমিক এবং দৃশ্যমান ঘটনাগুলি পরিলক্ষিত হয় না।

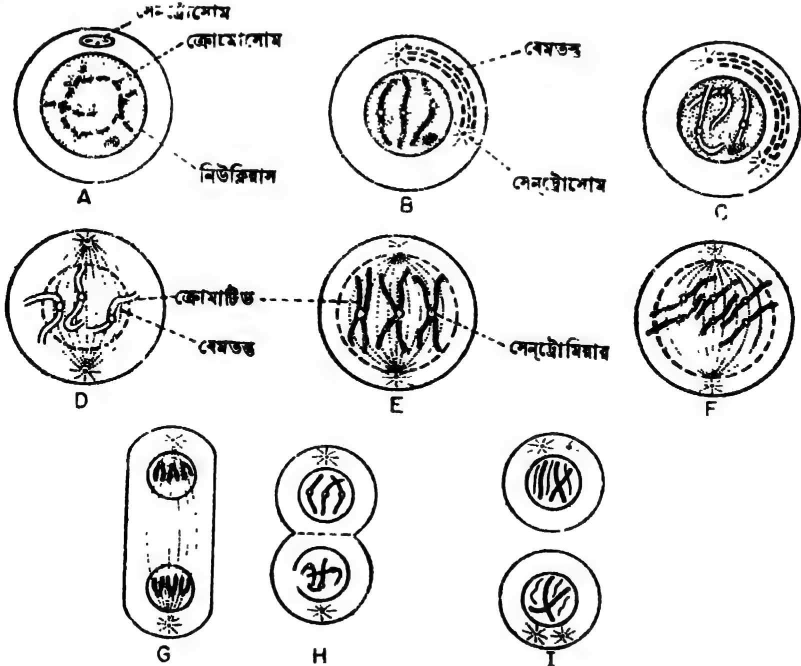
A. মাইটোসিস : ইংরাজী মাইটোসিস কথাটির অর্থ নিউক্লিয়াসের বিভাজন। কিন্তু প্রচলিত অর্থে মাইটোসিস বলিতে নিউক্লিয়াস বিভাজন, সাইটো-

প্লাজমের বিভাজন এবং সর্বোপরি জনিতৃ কোষটির সম্পূর্ণ বিভাজন বোঝান হয়। মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনে কতকগুলি ক্রমিক ঘটনাবলী থাকে। এই ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার সুবিধার জন্য কয়েকটি ধাপ বা দশায় (Stage) ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয় (চিত্র 2.4)।

মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের ক্রমিক ঘটনাবলীকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়—

a. ইণ্টারফেজ (Interphage)
b. প্রফেজ (Proptase)
c. মেটাফেজ (Metaphase)
d অ্যানাফেজ (Anaphase)
e. টিলোফেজ (Telophase)

নিউক্লিয়াস বিভাজনের উপরি উক্ত দশাগুলি অতিক্রান্ত হইবার পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis) বলা হয়।



চিত্র 2.4 মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজন : A – D = প্রফেজ, E = মেটাফেজ, A = অ্যানাফেজ, C = টিলোফেজ, H = সাইটোকাইনেসিস, I = অপত্যকোষ।

সুতরাং মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনকে ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য দুইটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয়। প্রথম ভাগটি হইল নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা

ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis) এবং দ্বিতীয় ভাগটি হইল **সাইটো-কাইনেসিস**।

a. **ইণ্টারফেজ** (Interphase) : যখন কোন কোষ বিভাজিত হয় না অথবা একটি কোষ পর পর দুইবার বিভাজনের মধ্যবর্তী সময়ে যে দশায় থাকে সেই দশাটিকে **ইণ্টারফেজ** অথবা **রেষ্টিং ফেজ** (Resting phase) বলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই দশার কোষ পরীক্ষা করিলে মনে হয় কোষটি প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু আসলে এই দশায় কোষের মধ্যে উপচিতিমূলক কাজ উচ্চ হারে সংঘটিত হয়। সুতরাং এই দশায় কোষের শারীরবৃত্তীয় অবস্থা যথেষ্ট সক্রিয় থাকে। এই দশাটিকে সেই কারণে অনেকে **শক্তি সংগ্রাহক দশা** (Energy stage) বলার পক্ষপাতী। নিউক্লিয়াসের উপাংশগুলির মধ্যে ক্রোমোসোমে যে DNA থাকে তাহার পরিমাণ বিপাকীয় উপচিতিমূলক কাজের সাহায্যে দ্বিগুণিত হইয়া যায়। সাইটোপ্লাজমের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশার মধ্যে ইণ্টারফেজের স্থিতিকাল সর্বাধিক। মাইটোসিস সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় এই দশাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা— G_1, S_1 এবং G_2। শেষ বা টিলোফেজ দশার পর হইতে সংশ্লেষমূলক কাজ সুরুর আগের অবস্থাটিকে G_1 বা গ্যাপ 1 (Gap 1), সংশ্লেষমূলক কাজ চলাকালীন অবস্থাকে S_1 এবং সংশ্লেষমূলক কাজ শেষ হওয়ার পর হইতে পরবর্তী বিভাজনের আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে G_2 বা গ্যাপ 2 (Gap 2) অবস্থা বলা হয় (চিত্র 2.5)। ইণ্টারফেজ দশায় সংশ্লেষমূলক ক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছে। আইসোটোপ দ্বারা চিহ্নিত অ্যামাইনো অ্যাসিড বা নিউক্লিওটাইড এই দশায় কোষ মধ্যে প্রবেশ করাইলে উহারা সংশ্লেষমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখা গিয়াছে চিহ্নিত লিউসাইন (Leucine) নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমে, চিহ্নিত থাইমিডন (Thymidine) ক্রোমোসোমের DNAতে এবং চিহ্নিত ইউরিডিন (Uridine) DNAতে গৃহীত হয়।

চিত্র 2.5 মাইটোটিক চক্র – M = মাইটোসিস, G_1 = সংশ্লেষমূলক দশা, S = DNA সংশ্লেষ দশা, G_2 = S ও M-এর মধ্যবর্তী দশা।

ইণ্টারফেজ দশায় কোষ নিম্নোক্ত অবস্থায় থাকে—

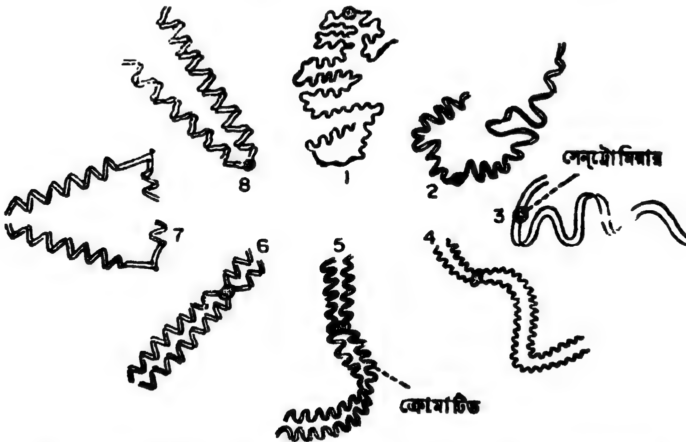
1. নিউক্লিও আবরণী অক্ষত।
2. ক্রোমোসোমগুলি লম্বা পাকানো ক্রোমাটিন তন্তুরূপে নিউক্লিওপ্লাজমে ব্যাপিত (Diffused) অবস্থায় থাকে (চিত্র 2.6-1)।
3. ক্রোমোসোমের DNA পরিমাণে দ্বিগুণ হয়।

4. নিউক্লিওলাস এই সময়ে স্পষ্ট এবং তুলনায় আকারে বড় হয়।
5. সেন্ট্রোসোমে দুইটি সেন্ট্রিওল স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রতি সেন্ট্রিওলকে বেষ্টন করিয়া একটি ঘন অঞ্চল বা সেন্ট্রোস্ফিয়ার (Centrosphere) থাকে।

b. **প্রফেজ** (Prophase) : প্রফেজ দশায় বিভাজন ক্রিয়ারত কোষ নিম্নোক্ত অবস্থায় থাকে—

1. কোষ গোলাকার ও প্রতিসরণশীল (Refractive) হইয়া উঠে।
2. নিউক্লিও আবরণীর ছিন্ন হইতে সুরু করে।
3. ক্রোমাটিন ফাইবারগুলি বিদূরিত (Dehydrated) হওয়ার ফলে ক্রোমোসোমগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ক্রোমোসোমগুলি ধীরে ধীরে বেশী [চিত্র 2.6 (2-4)] পুরু হয়।
4. প্রতি ক্রোমোসোম দুইটি ক্রোমোনীমা বা ক্রোমোটিড তন্তু দ্বারা গঠিত। দুইটি ক্রোমোটিড কাছাকাছি এবং পরস্পরের প্রায় সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট আকর্ষণ (Attraction) থাকে। ক্রোমাটিড দুইটি কেবলমাত্র সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে।

5. সেন্ট্রিওল দুইটি পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া যায় কিন্তু বেমতন্তু (Spindle fibre) দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। বেমতন্তুগুলি কিভাবে



চিত্র 2.6 ক্রোমোনীমার পাক খাওয়া অবস্থার পরিবর্তন চক্র: 1=ইন্টারফেজ, 2—4=প্রফেজ, 5—6=মেটাফেজ, 7=অ্যানাফেজ, 8=টিলোফেজ।

সৃষ্ট হয় তাহা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন বেমতন্তুগুলি প্রোটিন নির্মিত এবং সল হইতে জেল অবস্থা হওয়ার দরুন এই তন্তুগুলি সৃষ্টি হয়। আবার অনেকে মনে করেন বেমতন্তুগুলি প্রত্যেকেই এক একটি অনুনালিকা (Microtubule)। নালিকাগুলির ব্যাস 14 হইতে 23 nm। বেমতন্তুগুলি প্রোটিন নির্মিত। সাইটোপ্লাজমের প্রোটিনের প্রায় 15 শতাংশ বেমতন্তু সৃষ্টিতে

ব্যবহৃত হয়। বেমতন্তু চারি প্রকারের। কতকগুলি তন্তুর সহিত ক্রোমোসোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা যুক্ত থাকে। ঐগুলিকে **ক্রোমোসোমাল তন্তু** (Chromosomal tibre) বলা হয়। কতকগুলি তন্তু দুই প্রান্তের দুই সেণ্ট্রিওলের সহিত সোজাসুজি যুক্ত থাকে। ঐ তন্তুগুলিকে **কনটিনিউয়াস তন্তু** (Continuous fibre) বলা হয়। কতকগুলি হ্রস্বাকার তন্তু কেবলমাত্র সেণ্ট্রিওল দুইটি হইতে সূর্যচ্ছটার ন্যায় বাহির হয়। ইহাদের **এ্যাসট্রাল তন্তু** (Astral rays) বলা বলা হয়। বিভাজনের অ্যানাফেজ এবং টিলোফেজ দশায় দুই গুচ্ছ ক্রোমোসোম মধ্যবর্তী তন্তুগুলিকে **ইণ্টারজোনাল তন্তু** (Interzonal fibre) বলা হয়।

6. নিউক্লিওলাস ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া যায়।

7. প্রফেজ দশার শেষ ভাগে সেণ্ট্রিওল দুইটি কোষের দুই বিপরীত প্রান্তে (Opposite poles) বা মেরুতে চলিয়া যায় এবং বেম (Spindle) গঠন সম্পূর্ণ করে। ক্রোমাটিডগুলি আরও হ্রস্ব ও পুরু হইয়া উঠে।

c. **মেটাফেজ** (Metaphase): এই দশায় বিভাজন-রত কোষটি নিম্নোক্ত অবস্থায় থাকে—

1. নিউক্লিও আবরণী সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়।
2. ক্রোমোসোমগুলি বেমতন্তুর মধ্যরেখা (Equator) বরাবর চলিয়া আসে।
3. ক্রোমোসোমগুলি বেমতন্তুর মধ্যরেখায় সুবিন্যস্ত হয়।
4. সাধারণত ক্ষুদ্রাকার ক্রোমোসোমগুলি প্রান্তীয় বেমতন্তুগুলিতে এবং তুলনায় বড় ক্রোমোসোমগুলি কেন্দ্রীয় বেমতন্তুগুলিতে সেণ্ট্রোমিয়ার দ্বারা আটকাইয়া থাকে।

d **অ্যানাফেজ** (Anaphase): এই দশায় নিম্নোক্ত অবস্থা দেখা যায়—

1. সেণ্ট্রোমিয়ার দ্বিবিভাজিত হয়।
2. ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে **বিকর্ষণ** (Repulsion) স্পষ্ট হইয়া উঠে।
3. প্রতিটি ক্রোমোটিড পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নিজেরাই ক্রোমোসোমে পরিণত হয়।
4. প্রতি ক্রোমোসোমের দুইটি ক্রোমোটিডের মধ্যে বিপরীতমুখী গমন প্রচেষ্টা দেখা যায়। অর্থাৎ একটি ক্রোমোসোমের দুইটি ক্রোমোটিডের একটি যে মেরুর (Pole) দিকে যায় সেই ক্রোমোসোমের অপর ক্রোমাটিডটি ঐ মেরুর বিপরীত দিকে যাইবার চেষ্টা করে।
5. ক্রোমোসোমাল বেমতন্তুর সঙ্কোচন এবং ইণ্টারজোনাল বেমতন্তুর প্রসারণের ফলে ক্রোমোসোমগুলির মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য হইয়া উঠে।

e. **টিলোফেজ** (Telophase): টিলোফেজ দশার ঘটনাক্রম প্রফেজ দশার প্রায় বিপরীত। এই দশায় বিভাজনরত কোষের নিম্নোক্ত অবস্থা হয়—

1. ক্রোমাটিড বিপরীত মেরুতে দেখা যায়।
2. ক্রোমাটিডগুলি পুনরায় লম্বা ও পাকানো হইয়া যায়।

3. নিউক্লিওলাস পুনরাবির্ভূত হয়।
4. নিউক্লিও আবরণী পুনর্গঠিত হয়। এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা হইতে নিউক্লিও আবরণীটির সৃষ্টি হয় এবং বেমতন্তুর কাঠামো ভাঙ্গিয়া যায়।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis): টিলোফেজ দশার শেষ পর্বে দেখা যায় যে নিউক্লিয়াসের দ্বিবিভাজন সমাপ্ত এবং দুইটি নিউক্লিয়াস সুগঠিত এবং সুচিহ্নিত। এই অবস্থায় সাইটোকাইনেসিস সুরু হয়। কোষের মধ্যরেখার (দুই মেরুর মধ্যস্থল দিয়া) সাইটোপ্লাজমে একটি ভাঁজ (Furrow) দেখা যায় (চিত্র 2.4 H)। ভাঁজটি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হয় এবং পরিশেষে কোষটি দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। ভাঁজটি সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসাবে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

মাইটোসিস পদ্ধতিতে প্রস্তুতি পর্ব ও বিভাজন পর্ব

প্রস্তুতি পর্ব	বিভাজন পর্ব	
ইন্টারফেজ, প্রোফেজ, মেটাফেজ,	অ্যানাফেজ	টিলোফেজ
ক্রোমোসোমের স্বপ্রজনন, ক্রোমোসোম দৈর্ঘ্যের হ্রস্বতা, বেমতন্তুর গঠন ও প্রসারণ—নিউক্লিও আবরণীর অন্তর্ধান—নিউক্লিওলাসের অন্তর্ধান—বেমতন্তুর মধ্য-রেখার দিকে ক্রোমোসোমের চলন ও সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা বেমতন্তু সংলগ্ন হওয়া	একটি ক্রোমোসোমের দুই ক্রোমাটিডের মধ্যে বিচ্ছেদ, বেমতন্তুর আরও প্রসারণ, ক্রোমাটিডগুলির মেরু অঞ্চলে সরিয়া যাওয়া	ক্রোমোসোমের পাক খুলিয়া যাওয়া—বেমতন্তুর অন্তর্ধান—নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব—নিউক্লিওআবরণীর পুনরাবির্ভাব—সেন্ট্রিওল গঠন—কোষ বিভা-

কোষ বিভাজনে বাধা সৃষ্টি: কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করিয়া স্বাভাবিক কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করা যায়। ভৌতবস্তুর মধ্যে রঞ্জন এবং অতি বেগুনী রশ্মি (X-ray, Ultra-violet ray) প্রয়োগে দেখা যায় যে কোষের মধ্যে অসম (Unbalanced) সংশ্লেষ ক্রিয়া ঘটে। কোষ বিভাজিত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে বৃহদাকার অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের কোষ সাধারণত বাঁচে না।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করিয়া বিভাজন চক্র অথবা চক্রের কোন দশাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া সম্ভব। টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline), ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol), ইউরিথেন (Urethane), কলচিশিন (Colchicine) ইত্যাদি এই ধরনের কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ। কলচিশিন সাইটোপ্লাজমের প্রোটিনকে বেমতন্তু গঠন হইতে নিবৃত্ত করে।

মাইটোসিস পদ্ধতিতে কয়েকটি কোষের বিভাজনের সময়

কোষের নাম	সময় (মিনিটে)			
	প্রফেজ	মেটাফেজ	অ্যানাফেজ	টিলোফেজ
1. ট্রাইটনের লিভারের ফাইব্রোব্লাস্ট	18+	17 – 18	14 – 26	28
2. ইঁদুরের প্লীহা	20 – 35	6 – 15	8 – 14	9 – 26
3. গঙ্গাফড়িংয়ের নিউরোব্লাস্ট	102	13	9	57

মাইটোসিস পদ্ধতি সম্পন্ন হইতে কত সময় লাগে

মাইটোসিস পদ্ধতিকে আলোচনার সুবিধার জন্য ইন্টারফেজ, প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টিলোফেজ এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র পদ্ধতিটি ধারাবাহিক এবং চক্রাকার (Cyclical)। সুতরাং কোন একটি দশার শেষ এবং ইহার ঠিক পরবর্তী দশার আরম্ভ কখন তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক।

মাইটোসিস পদ্ধতির সমগ্র চক্রটি অথবা চক্রের একটি দশা শেষ হইতে যে সময় লাগে তাহা সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। বিভিন্ন ধরনের কোষে চক্রের অথবা চক্রের কোন একটি দশার সময় বিভিন্ন। গড়ে চক্রটি শেষ হইতে 18 ঘণ্টা সময় লাগে। উত্তাপের তারতম্যেও কম সময় বা বেশী সময় লাগে। কোন কোন পতঙ্গের ডিম অথবা কলাকৃষ্টিতে সমগ্র চক্রটি আধঘন্টায় শেষ হইয়া যায়। গঙ্গাফড়িংয়ের নিউরোব্লাস্ট কোষে (Neuroblast cell) 26 ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে চক্রটি শেষ হইতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর জীবনের সর্ব অবস্থায় কোষ বিভাজনের হার সমান নহে। সদ্য নিষিক্ত (Fertilized) ব্যাঙের ডিম প্রথম সাত ঘণ্টায় পাঁচবার বিভাজিত হয়। আরও পরে ইহার লার্ভার কোষগুলি 24 ঘণ্টায় একবার এবং ব্যাঙাচি অবস্থার কোষগুলি 4 হইতে 5 দিনে মাত্র একবার বিভাজিত হয়।

তবে একথা জানা গিয়াছে যে কোষ বিভাজনে যত সময় লাগে তাহার বেশীর ভাগ অংশ কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্বে বিশেষতঃ ইণ্টারফেজ দশায় অতিবাহিত হয়।

কোষ বিভাজনের কারণ

কোষ কেন বিভাজিত হয় তাহা স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে দেখা গিয়াছে যে একটি অ্যামিবা একটি নির্দিষ্ট আয়তনে (Size) আসার পর বিভাজিত হয়। অ্যামিবাকে যদি উপবাসী রাখা যায় তাহা হইলে ইহা বিভাজিত হয় না। মনে করা হয় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ সমানুপাতিক রাখার জন্যই কোষ বিভাজনের প্রয়োজন। এই চিন্তা যুক্তিসঙ্গত। কারণ নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় কার্যের নিয়ন্ত্রক।

ইহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সাইটোপ্লাজমের উপর কার্যকর। কোষে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে নিউক্লিয়াসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। যদি বিভাজনরত অ্যামিবার কোষ হইতে নিউক্লিয়াস তুলিয়া লইয়া অন্য একটি অ্যামিবার কোষে বসাইয়া দেওয়া হয় (দ্বিতীয় অ্যামিবার দেহ হইতে নিউক্লিয়াস পূর্বেই অপসারিত) তাহা হইলে দ্বিতীয় অ্যামিবার কোষে বিভাজন সুরু হয় না। একটি কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম উভয়েই বিভাজনের জন্য প্রস্তুত না থাকিলে বিভাজন হয় না।

মাইটোসিস পদ্ধতির উপযোগিতা

a. অনেক এককোষী প্রাণী ও উদ্ভিদ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি করে।

b. বহুকোষী প্রাণী বা উদ্ভিদ একটিমাত্র কোষ লইয়া জীবন সুরু করে। মাইটোসিস দেহের কোষের সংখ্যা বহুগুণ বাড়াইয়া দেয়। একজন পূর্ণ গঠিত মানুষের দেহে কোষের সংখ্যা 10^{14}। একটিমাত্র কোষ লইয়া মানুষের জীবনের সুরু। ঐ একটি কোষ হইতেই মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোটি কোটি কোষের সৃষ্টি হয়।

c. একটি মাতৃ কোষ হইতে মাইটোসিস পদ্ধতিতে যে দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তাহারা মাপে মাতৃ কোষ অপেক্ষা বড় হয় না। শারীরবৃত্তীয় বা সংশ্লেষমূলক কাজকে মাইটোসিস পদ্ধতি উদ্বুদ্ধ করে।

d. মাইটোসিস পদ্ধতিতে যে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তাহাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গুণ মাতৃ কোষের ন্যায়। ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গুণ একই থাকায় দেহের বৃদ্ধি সুশৃংখলিত (Organised) হইতে পারে।

e. দেহের ক্ষত স্থানকে পূর্বের ন্যায় করিয়া তুলিতে অর্থাৎ ক্ষত সংরোহণে (Healing of wound) মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনের প্রয়োজন হয়। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর ছিন্ন দেহাংশ পুনর্গঠনে অর্থাৎ পুনরুৎপত্তিতে) মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনের প্রয়োজন হয়।

f. দেহ গঠনকারী অনেক কোষের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃত কোষের স্থলাভিষিক্ত কোষগুলি মাইটোসিস পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকা বেশী দিন বাঁচে না। নূতন লোহিত রক্তকণিকা অস্থিমজ্জায় (Bone marrow) মাইটোসিস পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। আবরণী কলার কোষক্ষয় পূরণে মাইটোসিস কাজ করে।

B. *মিয়োসিস* (Meiosis or Reduction Division)

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। একটি প্রজাতির একটি সভ্যের সকল কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা একই। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিবার জন্য এক বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়।

এই বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজনকে **মিয়োসিস** বা **স্বল্পীকরণ বিভাজন** বা **রিডাকসন ডিভিসন** (Meiosis or Reduction division) বলা হয়।

যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের যৌন প্রজনন হয় তাহাদের মুখ্য যৌন অঙ্গে বা প্রজনন কোষে (Germ cell) মিয়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন হয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই অঙ্গ হইল **শুক্রাশয়** (Testis) ও **ডিম্বাশয়** (Ovary) এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহা **পরাগধানী** (Anther) এবং **ডিম্বাশয়** (Ovary)।

মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনে একটি কোষের পর পর দুইবার বিভাজন ঘটে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বিভাজনে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিভাজনটি সাধারণ মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনের ন্যায় অর্থাৎ প্রথম বিভাজনে প্রাপ্ত অর্ধেক সংখ্যার ক্রোমোসোম সম সংখ্যায় অপত্য কোষগুলিতে যায়। মিয়োসিস পদ্ধতির শেষে একটি কোষ হইতে চারিটি কোষ উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনে যে দুইবার কোষ বিভাজন হয় তাহার প্রথমটিকে **মিয়োটিক বিভাজন**—I (Meiotic division—I) এবং দ্বিতীয়টিকে **মিয়োটিক বিভাজন—II** (Meiotic division—II) বলা হয়। দুইটি বিভাজনকেই আলোচনার সুবিধার জন্য মাইটোসিস পদ্ধতির ন্যায় প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টিলোফেজ এই চারিটি দশায় ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের **প্রফেজ দশাকে** লেপ্টোটিন (Leptotene), জাইগোটিন (Zygotene), প্যাকিটিন (Pachytene), ডিপ্লোটিন (Diplotene) ও ডায়াকাইনেসিস (Diakinesis) এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অনেকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজনকে **হেটারোটীপিক** (Hetero-typic) এবং দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনকে **হোমিওটীপিক** বিভাজন (Homeo-typic) আখ্যা দিয়াছেন।

মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনকে ঘটনাক্রম অনুসারে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা হয়—

মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন

প্রথম মিয়োটিক বিভাজন নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও সেই সঙ্গে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়।
- প্রফেজ—I —→ লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন, ডায়াকাইনেসিস
- মেটাফেজ—I
- অ্যানাফেজ—I
- টিলোফেজ—I

ইন্টারফেজ

দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন নিউক্লিয়াসের বিভাজন মাইটোসিস পদ্ধতির ন্যায়। সমসংখ্যক ক্রোমোসোম অপত্য কোষে যায়।
- প্রফেজ—II
- মেটাফেজ—II
- অ্যানাফেজ—II
- টিলোফেজ—II

মিয়োসিস পদ্ধতির ঘটনাক্রম

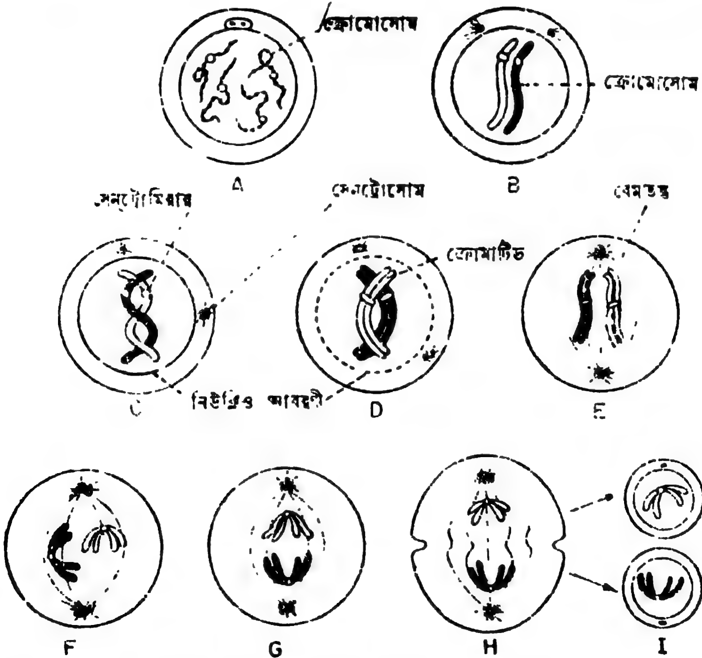
প্রফেজ—I : এই দশায় কোষের নিউক্লিয়াসের আকার বৃদ্ধি পায়। এই দশাটি অন্যান্য সকল দশার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী। ঘটনা পরম্পরা অনুসারে এই দশার পাঁচটি ভাগকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা হয় —

লেপ্টোটিন

1. ইহা মিয়োটিক প্রফেজের প্রথম দশা। 2. এই দশায় নিউক্লিয়াসের আকার বৃদ্ধি পায়। 3. নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ক্রোমোসোমগুলি লম্বা, পাকহীন সুতার ন্যায় থাকে। 4. ক্রোমোসোম গাত্র দানাযুক্ত (Granular) দেখায়। 5. ক্রোমোসোম দৈর্ঘ্যের কয়েক স্থানে বড় আকারের ফাঁস (Coil) এবং কয়েক স্থানে ছোট আকারের ফাঁস দেখা যায় (চিত্র 2.7A)।

জাইগোটিন

1 একই গঠনের বা সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলি বা হোমোলোগাস (Homologous chromosomes) পাশাপাশি সজ্জিত হয় (চিত্র 2.7 B, C)। একই গঠনের



চিত্র 2.7 প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের দশাসমূহ।

ক্রোমোসোমগুলি আকারে এক এবং উহাদের উভয়েরই দেহে জীনের সজ্জাক্রম একই রকমের থাকে। পাশাপাশি সজ্জিত হইবার সময় প্রতিটি জোড়ার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের হোমোলোগাস অংশও পাশাপাশি আসে। এই সময় হোমোলোগাস

ক্রোমোসোম জোড়ার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ তীব্র থাকে। দুইটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটি পিতৃ জনন কোষ এবং অন্যটি মাতৃ জনন কোষ হইতে আসে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের পাশাপাশি আসাকে **সাইন্যাপসিস** (Synapsis) বলা হয়। পাশাপাশি অবস্থিত যুগ্ম ক্রোমোসোমকে **বাইভ্যালেণ্ট** (Bivalent) বলা হয়।

2. জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হওয়ার পর প্রতিটি ক্রোমোসোমই পাকাইয়া গিয়া দৈর্ঘ্যে ছোট এবং প্রস্থে মোটা হইয়া যায়।

3. নিউক্লিওলাসের আকার বৃদ্ধি ঘটে।

4. সেণ্ট্রিওল দুইটি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং বেমতন্তু গঠনের সূত্রপাত দেখা যায়।

প্যাকিটিন

1 প্রতিটি বাইভ্যালেণ্ট সৃষ্টিকারী ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হইয়া ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে (চিত্র 2 7 D)। একটি বাইভ্যালেণ্ট এই অবস্থায় দুইটি ক্রোমোসোম হইতে সৃষ্ট চারিটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত থাকে। চারিটি ক্রোমাটিড সমন্বিত অবস্থাকে **টেট্রাড** (Tetrad) বলা হয়। ক্রোমাটিড গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটির মধ্যে আকর্ষণ কমিয়া যায়। কিন্তু বাইভ্যালেণ্টের একটি ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের সহিত অন্য ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের আকর্ষণ গড়িয়া উঠে।

2. বাইভ্যালেণ্টের ক্রোমোসোম দুইটি পরস্পর পরস্পরকে পাকাইয়া ধরে। একটি ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটিও পরস্পরকে পাকাইয়া ধরে।

3. বাইভ্যালেণ্টের একটি ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড অন্য ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের সহিত কয়েক স্থলে সংলগ্ন থাকে। এই সংলগ্ন থাকা অংশকে ইংরাজী 'X' অক্ষরের ন্যায় দেখায় এবং সংলগ্ন থাকার স্থানটিকে **ক্যায়াসমা** (Chiasma) বলে। একটি বাইভ্যালেণ্টে কতগুলি ক্যায়াসমা থাকিবে তাহা বাইভ্যালেণ্ট গঠনকারী ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘ দেহধারী ক্রোমোসোমের বাইভ্যালেণ্টে বেশী সংখ্যার ক্যায়াসমা গড়িয়া উঠিতে পারে। প্রতি বাইভ্যালেণ্টে ন্যূনপক্ষে 1টি এবং সর্বাধিক 12টি ক্যায়াসমা দেখা গিয়াছে। একটি ক্যায়াসমা ইহার খুব নিকটে ও আর একটি ক্যায়াসমা গঠনকে প্রতিহত করে। প্রতিহত করার ঘটনাকে **ইণ্টারফিয়ারেন্স** (Interference) বলা হয়।

4. যে যে অংশে ক্রোমাটিড দুইটি সংলগ্ন থাকে সেই অংশগুলিতে ক্রোমাটিডগুলি প্রথমে ছিঁড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লাগিয়া যায়। জোড়া লাগিয়া যাইবার সময় একটি ক্রোমাটিড অন্য ক্রোমাটিডের সহিত যুক্ত হয় (চিত্র 2.3)। ইহা ছাড়াও যুক্ত হইবার সময় ক্রোমাটিডদের মধ্যে যে অংশ বিনিময় ঘটে তাহাকে **ক্রসিং ওভার** (Crossing over) বলে। ক্রসিং ওভারে ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় হওয়ার ফলে ক্রোমাটিডদের জীনের সজ্জার পরিবর্তন ঘটে বা ক্রসিং ওভারের পূর্বে ক্রোমাটিডের

জীনের যে সজ্জা বিন্যাস থাকে ক্রসিং ওভারের পর সেই সজ্জা বিন্যাসের তফাৎ হইয়া যায় কারণ একটি ক্রোমাটিডের কিছুটা অংশ নিজস্ব থাকে এবং বাকী কিছু অংশ অন্য ক্রোমাটিডটি গঠন করে।

ডিপ্লোটিন

1 হোমোলোগাস ক্রোমসোমগুলির মধ্যে আকর্ষণের তীব্রতা না থাকায় ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করে। 2. ডিপ্লোটিনের শেষ দশায় ক্যায়াসমা গঠনকারী অংশগুলি সেণ্ট্রোমিয়ারের উভয় দিকে এবং ক্রোমোসোম দুইটির দুই প্রান্তে চলিয়া যায়। ক্যায়াসমার এই ক্রোমোসোমের প্রান্তে যাইবার প্রচেষ্টাকে **টারমিনালাইজেশন** (Terminalization) বলে।

ডায়াকাইনেসিস

1 হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি আকারে আরও ছোট হইয়া যায়।

2 ক্যায়াসমার টারমিনালাইজেশনের গতি বৃদ্ধি পায়।

3 বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটি পরস্পর হইতে আলাদা হইয়া গিয়া একটিমাত্র প্রান্তীয় বিন্দুতে পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। বাইভ্যালেণ্টের এই প্রান্তীয় বিন্দুতে যুক্তি মেটাফেজ দশা পর্যন্ত থাকে।

4. ক্রোমোসোমগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুবিন্যস্ত থাকে।

5. নিউক্লিওলাস অন্তর্হিত হয়।

মেটাফেজ –I

1. নিউক্লিও আবরণী অদৃশ্য হয়।

2 বেমতন্তু সুগঠিত হইয়া যায়।

3. বাইভ্যালেণ্টগুলি আলাদা হইয়া যায় এবং প্রতিটি ক্রোমোসোম সেণ্ট্রোমিয়ারের সাহায্যে বেমতন্তুর সহিত যুক্ত থাকে। বেমতন্তুগুলির মধ্যভাগে ক্রোমোসোমগুলি থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে প্রতিটি ক্রোমোসোমে দুইটি ক্রোমাটিড থাকে এবং দুইটি ক্রোমাটিড সেণ্ট্রোমিয়ার দ্বারা যুক্ত থাকে।

অ্যানাফেজ –I

1. ক্রোমোসোমগুলি দৈর্ঘ্যে ছোট কিন্তু প্রস্থে মোটা হয়।

2 ক্রোমোসোমগুলি দুই মেরুর দিকে (Poles) যাইতে চেষ্টা করে।

টিলোফেজ –I

1. ক্রোমোসোমগুলি মেরুর নিকট চলিয়া যায়।

2. নিউক্লিও আবরণী গঠিত হয়।

3. নিউক্লিওলাস পুনরাবির্ভূত হয়।

সাইটোকাইনেসিস

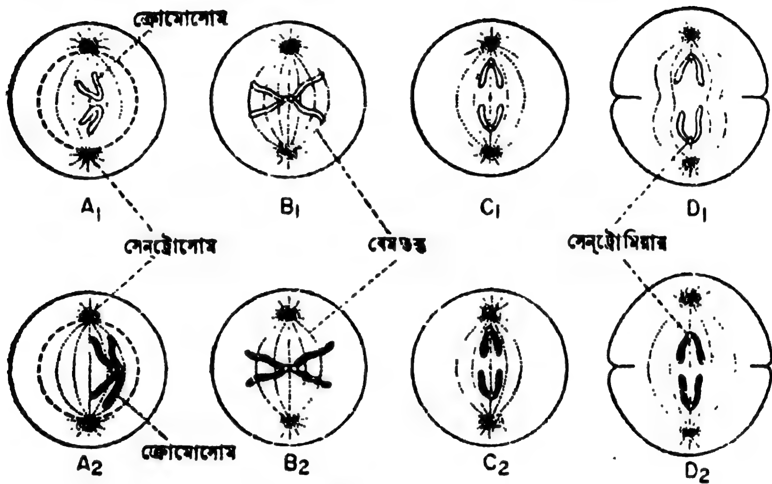
মাইটোসিস পদ্ধতির ন্যায় এইবার সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয় এবং দুইটি কোষের সৃষ্টি হয়।

ইণ্টারফেজ

প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের পর হইতে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের সুরু হওয়া পর্যন্ত কোষ দুইটি ইণ্টারফেজ দশায় থাকে এবং এই অবস্থায় সংশ্লেষমূলক কাজ হয়। কেহ কেহ ইণ্টারফেজ দশাটিকে **ইণ্টারকাইনেজ** (Interkinese) বলার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন

দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনের অনুরূপ (চিত্র 2.8)। বিভাজন প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত রূপ :



চিত্র 2.8 দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের দশাসমূহ।

প্রফেজ—II

এই দশাটি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে। উপস্থিত থাকিলে ঘটনাক্রম অনুযায়ী এইভাবে সাজানো যায় :

1. নিউক্লিও আবরণী নষ্ট হইয়া যায়।
2. ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডগুলি স্পষ্ট থাকে।
3. বেমতন্তু সৃষ্টির সূচনা দেখা যায়।
4. নিউক্লিওলাস অন্তর্হিত হয়।

মেটাফেজ—II

1. বেমতন্তু সুগঠিত হয়। সেন্ট্রিওল দুইটি দুই মেরুতে থাকে।
2. ক্রোমোসোমগুলি বেমতন্তুর মধ্যরেখায় সজ্জিত থাকে।
3. প্রতি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় এবং ক্রোমাটিড দুইটি দুই বিপরীত মেরুতে যাইবার চেষ্টা করে।

অ্যানাফেজ—II

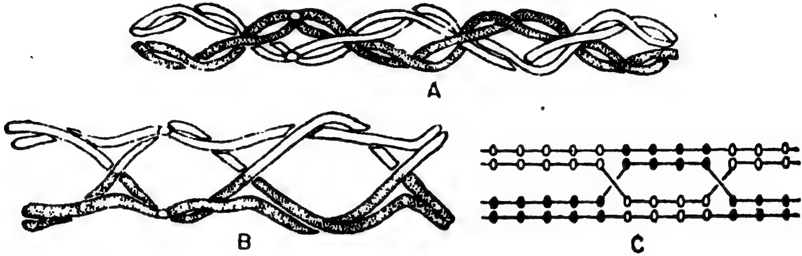
ক্রোমাটিডগুলি মেরুর দিকে অগ্রসর হয়।

টিলোফেজ—II

1. ক্রোমাটিড মেরুতে পৌঁছায়।
2. নিউক্লিও আবরণী সৃষ্টি হয়।
3. নিউক্লিওলাস পুনরাবির্ভূত হয়।

সাইটোকাইনেসিস

সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় এবং দুইটি কোষের সৃষ্টি হয়।



চিত্র 2.7 A. হোমোলোগাস ক্রোমোসোমদ্বয়ের ক্যায়াসমা গঠনের পূর্বদশা, B. ক্যায়াসমা গঠন, ক্রোমাটিডের যুগপৎ ছেঁড়া ও জোড়া লাগা, C. ক্যায়াসমা গঠন (সরলভাবে দেখান হইয়াছে)।

মিয়োসিস পদ্ধতির তাৎপর্য (Significance of Meiosis)

জীবের বিশেষত উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মিয়োসিস পদ্ধতির উপযোগিতা অপরিসীম।

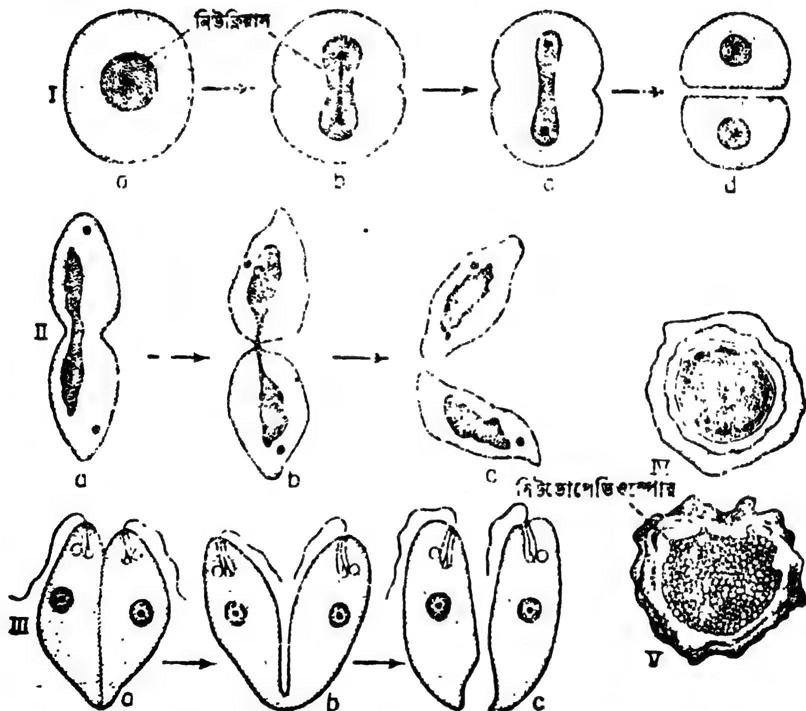
1. ডিম্বাণু ও শুক্রাণু নিষিক্ত হইয়া জাইগোট সৃষ্টি করে। ডিম্বাণু বা শুক্রাণুতে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক বা হ্যাপ্লয়েড (n) অবস্থায় যায়। দুই হ্যাপ্লয়েড (n) মিলিয়া ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরাইয়া আনে। এইভাবে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং মিয়োসিস পদ্ধতির সাহায্যে প্রাণী বা উদ্ভিদে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা হয়। কিছু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদে জনন একক (Sexual units) সৃষ্টির সময় মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন হয় না। কিন্তু জাইগোট সৃষ্টি হওয়ার পর ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখার জন্য ইহাতে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন হয়। এই ধরনের মিয়োসিসকে **জাইগোটিক মিয়োসিস** (Zygotic meiosis) বলা হয়।

2. মিয়োসিস পদ্ধতিতে **প্রকরণের** (Variation) সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ক্যায়াসমা ও ক্রসিং ওভারের ফলে ক্রোমাটিডদের মধ্যে অংশ বিনিময় ঘটে। অংশ বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীনের বিনিময় ঘটে। এই বিনিময়ের ফলে ক্রোমাটিডে জীনের যে সজ্জা থাকে তাহার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনই প্রকরণ আনিয়া দেয়। প্রকরণ বিবর্তনের পথ সংকেত করে।

C. অ্যামাইটোসিস (Amitosis)

মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমগুলির গঠন স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং বিভাজনের বিভিন্ন দশাগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদে কোষ বিভাজনের সময় বিভাজনের বিভিন্ন দশাগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশাগুলি স্পষ্ট না হইয়া কোষ বিভাজিত হইলে এই ধরনের বিভাজনকে প্রত্যক্ষ বিভাজন বা অ্যামাইটোসিস বলা হয়।

অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজনের সময় কোষের নিউক্লিয়াসটি লম্বা হইয়া যায়। ইহার দুই প্রান্ত মোটা ও মাঝের অংশটি সরু হইয়া ইহা ডাম্বেলের আকার ধারণ করে। মাঝের সরু অংশটি ক্রমে আরও সরু হইয়া যায় এবং পরে মোটা প্রান্ত দুইটির মধ্যে আর সংযোগ থাকে না। প্রতি প্রান্ত একটি করিয়া নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে।



চিত্র 12.0. I. অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজন, II. প্যারামোশিয়ামের অনুপ্রস্থ বাইনারী ফিসন, III. ইউগ্লিনার অনুদৈর্ঘ্য বাইনারী ফিসন, IV-V. অ্যামিবার বহুবিভাজন।

দুইটি নিউক্লিয়াস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষের সাইটোপ্লাজম দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং শেষে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। ব্যাক্টিরিয়া, অনেক এককোষী প্রাণী এবং অনেক মেরুদণ্ডীর ভ্রূণ ঝিল্লীতে (Embryonic Membrane) অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজিত হয়।

মাইটোসিস ও মিয়োসিসের তুলনা

মাইটোসিস	মিয়োসিস
1. দেহ কোষে এই পদ্ধতিতে বিভাজন হয়।	1. মুখ্য জনন অঙ্গের (Gonad) কোষে এই পদ্ধতিতে বিভাজন হয়।
2. মাতৃ জনন কোষ হইতে অপত্য কোষে সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম যায়।	2. অপত্য কোষগুলিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা মাতৃ জনন কোষের অর্ধেক হয়।
3. নিউক্লিয়াস মাত্র একবার বিভাজিত হয়।	3. নিউক্লিয়াস দুইবার বিভাজিত হয়। প্রথম নিউক্লিও বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়।
4. একটি কোষ হইতে দুইটি কোষের সৃষ্টি হয়।	4. একটি কোষ হইতে চারিটি কোষের সৃষ্টি হয়।
5. প্রফেজ দশা প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের প্রফেজ দশা অপেক্ষা অনেক সরল।	5. প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের প্রফেজ দশা জটিল ; তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী এবং দশাটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয়।
6. প্রফেজ দশার সুরু হইতেই ক্রোমোসোমগুলি লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হইয়া ক্রোমাটিডের সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোমগুলি কম দানাযুক্ত।	6. মধ্য প্রফেজ দশায় (Pachytene) ক্রোমোসোমগুলি লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হইয়া ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোমগুলি দানাযুক্ত।
7. হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পাশাপাশি আসিয়া বাইভ্যালেণ্ট সৃষ্টি করে না।	7. হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পাশাপাশি আসে ও বাইভ্যালেণ্ট সৃষ্টি করে।
8. ক্যায়াসমা বা ক্রসিং ওভারের ঘটনা ঘটে না।	8. ক্যায়াসমা এবং ক্রসিং ওভার মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনে অতি প্রয়োজনীয়।
9. ক্রসিং ওভার না ঘটায় জীনের সজ্জা বিন্যাসের পরিবর্তন হয় না।	9. ক্রসিং ওভারের ফলে জীনের সজ্জা বিন্যাসের পরিবর্তন হয়। ক্রসিং ওভারের পূর্বে একটি বাইভ্যালেন্টের ক্রোমাটিডের যে রূপসজ্জা থাকে ক্রসিং ওভারের পর ঐ ক্রোমাটিডের রূপসজ্জা পরিবর্তিত হয়।
10. মাতৃ জনন ক্রোমোসোম ও পিতৃ ক্রোমোসোম উভয়েই অপত্য কোষগুলিতে যায়।	10. মাতৃ ক্রোমোসোমগুলি প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের পর একটি কোষে এবং পিতৃ ক্রোমোসোমগুলি অন্য কোষে যায়।
11. অতি অল্প ক্ষেত্রেই মাইটোসিস পদ্ধতিতে প্রকরণ আসে।	11. মিয়োসিস পদ্ধতিতে প্রকরণ অবশ্যম্ভাবী এবং ইহার ফলেই বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ 3

বংশগতি ও জীনতত্ত্ব

3.1 ভূমিকা

প্রজনন পদ্ধতির মধ্য দিয়া জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে। উচ্চতর প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যৌন জনন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রজনন তথা বংশবৃদ্ধি ঘটে। যৌন জনন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অপত্য জনুর সহিত জনিতৃ জনুর অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব হয়। এবং অনুরূপ ভাবে পরবর্তী অপত্য জনুতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। বংশগতির ধারায় কিভাবে এই ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে মেণ্ডেল (1822—1884) সর্বপ্রথম পরীক্ষা নির্ভর ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দেন। সেই কারণে মেণ্ডেলকে (চিত্র 3.1) বংশগতি বিদ্যার জনক বলা হয়।



3.1 গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল— যিনি আধুনিক বংশগতি বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন।

3.2 বংশগতির মিশ্রণ মতবাদ

মেণ্ডেল-পূর্বকালে বংশগতি নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু অস্পষ্ট ও অসমর্থিত ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ায় ইহাদের কোনটিই কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এই সমস্ত মতবাদগুলির মধ্যে "বংশগতির মিশ্রণ মতবাদ" (Theory of blending inheritance) কিছুটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মতবাদে বলা হইয়াছে এক প্রকার "তরল নির্ধারক" জীবের বংশগতি নির্ধারণ করে। অপত্য জনুতে জনিতৃ জনুর (পিতা ও মাতা) এই তরল নির্ধারকের মিশ্রণ ঘটে এবং ইহার ফলে অপত্য জনুতে জনিতৃ জনুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। সার্বিক সমতা কিন্তু কখনই দেখা যায় না।

3.3 মেণ্ডেলের দৃষ্টিতে বংশগতি

বংশগতি অনুসরণ ও বংশগতি ব্যাখ্যায় মেণ্ডেল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করেন। অতুলনীয় মেধা, গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, সংস্কারমুক্ত মন এবং পরিশীলিত, বস্তুবাদী ও অকাট্য যুক্তিনির্ভর এক প্রচ্ছদপটে মেণ্ডেল বংশগতি ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মেণ্ডেলের মতে জীবদেহ বহু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সুসংহত ভাবে একটি জীবদেহে পরিস্ফুট হয়। সেইজন্য বংশগতি

অনুসরণে বৈশিষ্টগুলি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা না করিয়া এক একটি বৈশিষ্ট্যকে সনাক্তকরণ করিয়া তাহার পর্যালোচনা করা উচিত। একটি একটি বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত ভাবে জীবের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আনিয়া দেয়। প্রতি বৈশিষ্ট্যের জন্য একক বৈশিষ্ট্য (Unit character) থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্ধারক কণিকা (Particle) থাকে। প্রতি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া নির্ধারক কণিকা দায়ী। প্রজননের মাধ্যমে এই নির্ধারক কণিকাগুলির এক জনু হইতে পরবর্তী জনুতে পরিবাহিত হওয়ার পদ্ধতি মেন্ডেল দুইটি সূত্রের (Law) আকারে প্রতিস্থাপিত করেন। পরীক্ষালব্ধ নিরীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত হইতে তিনি সূত্র দুইটির প্রতিস্থাপনা করেন। নির্ধারক কণিকাগুলিকে বর্তমানে জীন (Gene) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মেণ্ডেল প্রবর্তিত বংশগতি মতবাদকে **বংশ-গতির কণিকা মতবাদ** (Particulate theory of inheritance) বলা হয়।

3.4 মেণ্ডেলের সার্থকতা—বংশগতি ব্যাখ্যায় মটর গাছের নির্বাচনে

বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একাধিক নিয়ম ও নীতি থাকে। ঐগুলি যথাযথ ভাবে অনুসরণ না করিলে ত্রুটিহীন পরীক্ষালব্ধ ফল পাওয়া যায় না। যে কোন পরীক্ষায় পরীক্ষণীয় বিবরটি যাহাতে অন্য কোন কারণ দ্বারা প্রভাবিত না হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বংশগতি সংক্রান্ত যে কোন পরীক্ষায় উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেণ্ডেল এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। পরীক্ষার বস্তু হিসাবে মটর গাছের নির্বাচন মেণ্ডেলের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। অবশ্য মটর গাছ ছাড়াও অন্যান্য অনেক গাছ লইয়া মেণ্ডেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু উহাদের ফলাফল চমকপ্রদ হয় নাই।

বংশগতি পরীক্ষায় মটর গাছের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ—

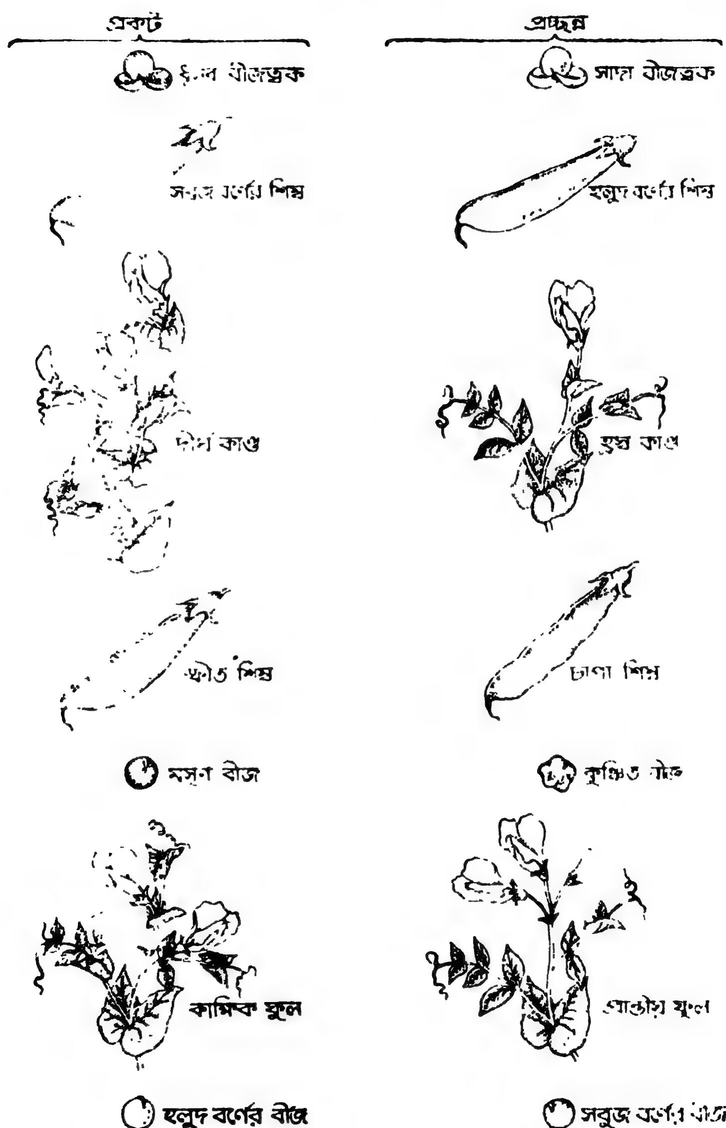
1. মটর গাছের প্রজনন স্বপরাগ যোগ ও ইতর পরাগ যোগ উভয় পদ্ধতিতেই ঘটিত হইতে পারে। স্বপরাগ যোগ পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন অপত্য জনুতে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাম্য বজায় থাকে। ধ্রুপদী জীনতত্ত্বে ইহাকে কো-আইসোজেনিক (Co-isogenic) অবস্থা বলে।

2. ইতর পরাগ যোগ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নির্দিষ্ট কোন একক বৈশিষ্ট্যের বংশগতি অনুধাবন করা যায়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরিবেশের বৈষম্য দূর করিবার জন্য এই ধরনের পরীক্ষায় একই পরিবেশ রক্ষা করিতে হয়। মটর গাছের ক্ষেত্রে এই সাম্য পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। কারণ বাগানের স্বল্প পরিসরে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরিবেশের বৈষম্য খুব বেশী হইতে পারে না।

3.5 মেণ্ডেল নির্বাচিত সাতজোড়া চরিত্র লক্ষণ

মটর গাছের **একক বৈশিষ্ট্যের** সংখ্যা অনেক। মেণ্ডেল মটর গাছের (*Pisum sativum*) মোট 253 রকমের বৈশিষ্ট্য লইয়া পরীক্ষা করেন। ইহাদের মধ্য হইতে

বংশগতি তথ্য পরিবেশনে সাতটি একক বৈশিষ্ট্যের উপর পাওয়া ফলাফল তিনি লিপিবদ্ধ করেন। মেণ্ডেল তাঁহার সংগৃহীত মটর গাছের সাতটি একক বৈশিষ্ট্যের প্রতিটির একটি করিয়া বিরুদ্ধাচারী বা বিপরীত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। প্রতিটি



চিত্র-3.2 মেণ্ডেল নির্বাচিত সাত জোড়া পরস্পর বিপরীত চরিত্রলক্ষণযুক্ত মটর গাছ।

একক বৈশিষ্ট্য এবং উহার বিপরীত বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়ায় তিনি ঐগুলি সহজেই সনাক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার পরীক্ষায় মেণ্ডেল এই পরস্পর বিপরীত

বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রলক্ষণকে কাজে লাগাইয়া ছিলেন। মটর গাছের মধ্যে এই ধরনের পরস্পর বিপরীত চরিত্রলক্ষণগুলি স্পষ্ট হওয়ায় মেন্ডেলের পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। মেন্ডেল নির্বাচিত সাত জোড়া পরস্পর বিপরীত চরিত্র লক্ষণগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল (চিত্র 3.2)।

a. বীজত্বক - মসৃণ অথবা কুঞ্চিত, b. বীজপত্রের বর্ণ—হলুদ অথবা সবুজ, c বীজত্বক —ধূসর অথবা সাদা ফুলের পাপড়ির বর্ণ -- লাল অথবা সাদা), d. কান্ডে ফুলের অবস্থান – কাক্ষিক অথবা প্রান্তিক, e. শিম্বের (Pod) আকৃতি – স্ফীত অথবা চাপা, f. শিম্বের বর্ণ — সবুজ অথবা হলুদ, g. কান্ডের দৈর্ঘ্য — দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব।

3.6 মেন্ডেলের পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রকৃতিতে মটর গাছের স্বপরাগ যোগ ঘটে। স্বপরাগ যোগ পদ্ধতিতে একই ফুলের বা একই গাছের ফুলের পরাগ সেই ফুলের বা সেই গাছের অন্য ফুলের ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। মেন্ডেলে তাহার সংকরায়ণ পরীক্ষায় স্বপরাগ যোগ বন্ধ করার জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যে মটরগাছ লইয়া তিনি পরীক্ষা করিতেন প্রয়োজন মত সেই মটর গাছের ফুলের পুংকেশর (Stamen) ফুলটি পূর্ণ-গঠিত হইবার পূর্বেই কাটিয়া দিতেন। ইহার পর পরীক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছের ফুলের পরাগের সাহায্যে পুংকেশর বর্জিত ফুলের কৃত্রিম ইতর পরাগ যোগ ঘটাইতেন।

চরিত্রলক্ষণ	প্রকট প্রচ্ছন্ন	F_1 জনুর ফিনোটাইপ	F_2 জনু (সংখ্যা) প্রকট	প্রচ্ছন্ন	যোগফল	F_2 জনু (শতকরা হার) প্রকট	প্রচ্ছন্ন
1. বীজ	মসৃণ × কুঞ্চিত	সব মসৃণ	5,474	1,850	7,324	74·7	25·3
2. বীজ পত্রের বর্ণ	হলুদ × সবুজ	সব হলুদ	6,022	2,001	8,023	75·1	24·9
3. বীজত্বক ফুলের রঙ	সাদা × ধূসর	সব সাদা	705	224	929	75·9	24·1
4. কান্ডে ফুলের অবস্থান	কাক্ষিক × প্রান্তিক	সব কাক্ষিক	651	207	858	75·9	24·1
5. শিম্বের আকৃতি	স্ফীত × চাপা	স্ফীত	882	299	1,181	74·7	25·3
6. শিম্বের বর্ণ	সবুজ × হলুদ	সব সবুজ	428	152	580	73·8	26·2
7. কান্ডের দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ × হ্রস্ব	সব দীর্ঘ	787	277	1,064	74·0	26·0
		মোট সংখ্যা	14,949	5,010	19,959	গড়—74·9	25·1

মেন্ডেল নির্বাচিত মটর গাছের সাতটি বিপরীত চরিত্রলক্ষণ ও উহাদের লইয়া মেন্ডেল কৃত পরীক্ষার ফল।

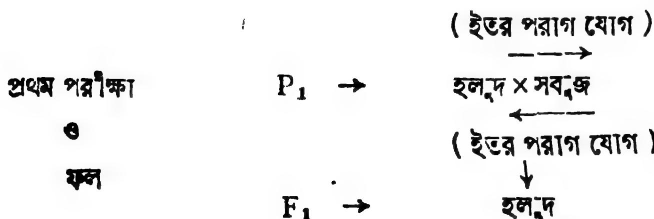
3.7 মেণ্ডেলের একসংকর পরীক্ষা ও পৃথগীভবন সূত্র

মেণ্ডেল সাতজোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণ যুক্ত মটর গাছের প্রতি জোড়ার মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে সংকরায়ণ পরীক্ষা ঘটাইয়াছিলেন। বর্তমান আলোচনায় কেবলমাত্র একজোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণের মধ্যে সংকরায়ণলব্ধ ফল উল্লিখিত হইল। এখানে উল্লেখ্য যে সাতজোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণের সংকরায়ণ পরীক্ষার ফল একই ধরনের হইয়াছিল (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছক দ্রষ্টব্য)।

মেণ্ডেল মটর গাছের বীজপত্রের বর্ণের দুইটি পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। একটি বীজপত্রের বর্ণ হলুদ ও অন্যটির বর্ণ সবুজ। মেণ্ডেল সর্বপ্রথম সুনিশ্চিত হইয়া লইলেন যে হলুদ বীজপত্র যুক্ত গাছ হইতে উৎপন্ন সকল গাছে সর্বদা হলুদ বর্ণের বীজপত্র সৃষ্টি হয় এবং সবুজ বীজপত্র যুক্ত গাছ হইতে উৎপন্ন সকল গাছে সবুজ বর্ণের বীজপত্র সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ইহারা যথাক্রমে বিশুদ্ধ হলুদ ও বিশুদ্ধ সবুজ বীজপত্র যুক্ত। এই ধরনের পরস্পর বিপরীত চরিত্রলক্ষণ জোড়াকে (হলুদ ও সবুজ বর্ণের বীজপত্র) অ্যালিলোমর্ফিক লক্ষণ (Allelomorphic character) বা **অ্যালিলস** (Alleles) বা অ্যালিলোমর্ফস (Allelomorphs) বলে। কেবলমাত্র একজোড়া অ্যালিলসের মধ্যে যে সংকরায়ণ করা হয় তাহাকে **এক সংকর** পরীক্ষা বলে।

মেণ্ডেল এই দুইটি পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছের মধ্যে প্রথম পরীক্ষায় **ইতর পরাগযোগ** ঘটাইলেন এবং এই জনুকে জনিতৃ জনু বা P_1 জনুরূপে চিহ্নিত করিলেন। এই ক্রমে ইতর পরাগযোগের ফলে যে বীজ সৃষ্টি হইল তাহাকে প্রথম অপত্য **জনু** বা F_1 জনু রূপে চিহ্নিত করিলেন। F_1 জনুতে উৎপন্ন সকল বীজের বীজপত্রের বর্ণ হলুদ হইল।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় মেণ্ডেল এইভাবে পাওয়া F_1 জনুর বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন করিলেন এবং এই গাছের ফুলের মধ্যে **স্বপরাগ যোগ** ঘটাইলেন। স্বপরাগ যোগে সৃষ্ট বীজগুলিকে তিনি **দ্বিতীয় অপত্য জনু** বা F_2 রূপে চিহ্নিত করিলেন। F_2 জনুতে হলুদ এবং সবুজ উভয় বর্ণের বীজপত্র পাওয়া গেল এবং হলুদ ও সবুজের অনুপাত হইল যথাক্রমে 3 : 1। ছকের আকারে পরীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ ফল দেখান হইল।



		স্বপরাগ যোগ →
	F_1 →	হলুদ × হলুদ
দ্বিতীয় পরীক্ষা ও ফল		← স্বপরাগ যোগ ↓
	F_2 →	হলুদ ও সবুজ
		(6022+2001=8023)
		শতকরা হার 75·1 ও 24·9
		অনুপাত 3 : 1

মেণ্ডেলের সিদ্ধান্ত

এক সংকর পরীক্ষায় F_2 জনু পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল হইতে মেণ্ডেল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন :—

1. একজোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণের মধ্যে সংকরায়ণ করিলে F_1 জনুতে উহাদের মধ্যে একটি প্রকাশ পায় এবং অন্যটি অপ্রকাশিত থাকে।

2. সাতজোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণযুক্ত মটর গাছের ক্ষেত্রে এই ফলাফল সর্বদা সত্য।

3. F_1 জনুতে যে চরিত্রলক্ষণটি (সবুজ) অপ্রকাশিত থাকে উহা F_2 জনুতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং চরিত্রলক্ষণটি মোট উৎপন্ন বীজের এক-চতুর্থাংশে দেখা যায়।

মেণ্ডেলের ব্যাখ্যা

সংকরায়ণ পরীক্ষালব্ধ ফলের ব্যাখ্যা মেণ্ডেল নিম্নলিখিত রূপে করেন :—

1. প্রতিটি চরিত্রলক্ষণের জন্য নিয়ামক বা নির্ধারক (Factor) থাকে।

2. কোন নির্ধারক অপ্রকাশিত থাকিতে পারে (F_1 জনুতে সবুজ বীজপত্রের বর্ণ) কিন্তু ইহা কখনও চিরতরে নষ্ট হইতে বা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না (F_2 জনুতে সবুজ বর্ণের বীজপত্রের পুনরাবির্ভাব)।

3. দুইটি বিপরীত চরিত্রলক্ষণের প্রতিটির জন্য একটি করিয়া নির্ধারক থাকে। F_1 জনুতে উহাদের একটি প্রকাশিত হয় এবং অন্যটি অপ্রকাশিত থাকে। F_1 জনুতে প্রকাশিত নির্ধারকটিকে **প্রকট** (Dominant) নির্ধারক এবং অপ্রকাশিত নির্ধারকটিকে **প্রচ্ছন্ন** (Recessive) নির্ধারক বলা হয়। F_1 জনুতে হলুদ প্রকট নির্ধারক এবং সবুজ প্রচ্ছন্ন নির্ধারক।

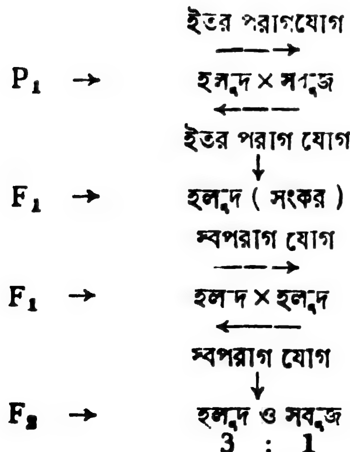
4. প্রকট নির্ধারককে উহার ইংরাজী প্রতিশব্দের প্রথম অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং ইহা বড় অক্ষরে (Capital letter) লেখা হয়। প্রচ্ছন্ন নির্ধারককে প্রকট অবস্থার ইংরাজী প্রতিশব্দের প্রথম অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং উহা ছোট অক্ষরে (Small letter) লেখা হয়। উদাহরণরূপে বলা যায় মটর গাছের বীজের গাত্র দুই

প্রকার, যথা—মসৃণ এবং কুঞ্চিত (Wrinkled)। সংকরায়ণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে মসৃণ প্রকট এবং কুঞ্চিত প্রচ্ছন্ন। মসৃণ শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ স্মুথ (Smooth)। সেইজন্য S অক্ষর দ্বারা প্রকট এবং s অক্ষর দ্বারা মটর বীজের গাত্রের প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ চিহ্নিত হয়। অনুরূপ ভাবে প্রকট হলুদ = Y এবং প্রচ্ছন্ন সবুজ = y দ্বারা চিহ্নিত হয়।

3.8 প্রতি চরিত্রলক্ষণের জন্য একজোড়া নিয়ন্ত্রক থাকে

একটি চরিত্রলক্ষণের জন্য কয়টি নিয়ন্ত্রক থাকে—একটি, দুইটি বা ততোধিক? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য মেণ্ডেল পুনরায় আর একটি পরীক্ষা করেন। তিনি পূর্ব পরীক্ষার F_2 জনুতে উৎপন্ন বীজগুলি হইতে যে মটর গাছ জন্মায় সেইগুলির মধ্যে স্বপরাগ যোগ ঘটান এবং F_3 জনু সৃষ্টি করেন। তিনি এই পরীক্ষা হইতে যে ফল পাইলেন তাহা হইতেছে—

a. প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ যুক্ত সবুজ বীজপত্রের গাছের মধ্যে স্বপরাগ যোগ করিলে কেবলমাত্র সবুজ বীজপত্র উৎপাদক মটর গাছ জন্মায়। অর্থাৎ ইহারা সংকর নহে—ইহারা বিশুদ্ধ। অনুরূপ ভাবে হলুদ বর্ণের বীজপত্র যুক্ত গাছ হইতে উৎপন্ন মটর গাছের মধ্যে স্বপরাগ যোগ করিলে কয়েকটি গাছ হইতে কেবলমাত্র হলুদ বর্ণের বীজপত্র যুক্ত বীজ সৃষ্টি হয় এবং গাছগুলির দ্বিগুণ সংখ্যক গাছ হইতে F_2 জনুর ন্যায় 3 : 1 অনুপাতে যথাক্রমে হলুদ ও সবুজ বর্ণের বীজপত্র যুক্ত বীজ উৎপাদিত হয়। ইহার অর্থ F_2 জনুতে উৎপন্ন সকল হলুদ বীজপত্র যুক্ত বীজ বিশুদ্ধ নয়। ইহাদের এক তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ এবং দুই-তৃতীয়াংশ সংকর। F_2 জনুতে এই সংকর দশা ধরা পড়ে। এই পরীক্ষাটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—



স্বপরাগ যোগ

(i) F_2 → সবুজ × সবুজ

স্বপরাগ যোগ

F_3 → সবুজ

স্বপরাগ যোগ

(ii) F_2 → হলুদ × হলুদ

স্বপরাগ যোগ

F_3 → হলুদ 1 (বিশুদ্ধ) : হলুদ 2 (সংকর) : সবুজ 1 (বিশুদ্ধ)

সুতরাং সংকর হলুদ বর্ণের বীজের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে হলুদ ও সবুজ এই দুইটি ভিন্ন চরিত্রলক্ষণের প্রতিটির জন্য একটি করিয়া মোট দুইটি নির্ধারক রহিয়াছে। ইহা হইতে সরলতম সিদ্ধান্ত এই করা যাইতে পারে যে প্রতিটি চরিত্রলক্ষণের জন্য দুইটি বা এক-জোড়া নির্ধারক থাকে। এই হিসাবে বিশুদ্ধ হলুদের ক্ষেত্রে YY, সংকর হলুদের ক্ষেত্রে Yy এবং বিশুদ্ধ সবুজের ক্ষেত্রে yy নির্ধারক থাকে। স্বপরাগ যোগ হইলে বিশুদ্ধ হলুদ (YY) এবং বিশুদ্ধ সবুজ (yy) সর্বদাই যথাক্রমে হলুদ ও সবুজ বীজ উৎপন্ন করে। কিন্তু সংকর হলুদের (Yy) Y নির্ধারকটি জনিতৃ জনুর বিশুদ্ধ হলুদ হইতে এবং y নির্ধারকটি জনিতৃ জনুর বিশুদ্ধ সবুজ হইতে আসে। অর্থাৎ জনিতৃ জনুতে পরাগরেণু বা ডিম্বক সৃষ্টির সময়ে নির্ধারক দুইটি (YY বা yy) যুগলবদ্ধ না থাকিয়া পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু ইহারা

চিত্র 3.3 পৃথগীভবন সূত্রের ফিনোটাইপ ব্যাখ্যা।


আবার পরাগরেণু ও ডিম্বকের মিলনের ফলে যে অপত্য জনু সৃষ্টি হয় তাহাতে

যুগলবদ্ধ হইয়া যায়। জনন কোষ সৃষ্টির সময় নির্ধারকদ্বয়ের পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার ঘটনাকে মেণ্ডেল **পৃথগীভবন সূত্র** (Law of Seggregation) আখ্যা দেন।

পৃথগীভবনের সংজ্ঞা

কোন একটি বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট জীন বা অ্যালিল যুগল জনিতৃ জনুতে জনন কোষ সৃষ্টির সময় পৃথক হইয়া যায় এবং অপত্য জনুতে পুনরায় যুগল অবস্থা লাভ করে।

মটর গাছের বীজের বর্ণ ও আকৃতি এই দুই চরিত্রলক্ষণ লইয়া বিভিন্ন গবেষকের পরীক্ষার ফল :

		বীজের আকৃতি			বীজপত্রের বর্ণ		
সংকর জনু	গবেষক	মসৃণ	কুঞ্চিত	কুঞ্চিতের শতকরা হার	হলুদ	সবুজ	সবুজের শতকরা হার
F_2	মেণ্ডেল	5,474—	1,850	25·2%	6,022—	2,001	24·9%
	কোরেন্স				1,394—	453	25·5%
	জারম্যাক	884—	288	24·6%	3,580—	1,190	24·9%
	বেটসন	10,793—	2,552	24·8%	11,903—	3,903	24·7%
	হার্স্ট	1,335—	420	23·9%	1,310—	445	25·4%
	লক	620—	197	24·1%	1,438—	514	26·2%
F_3	কোরেন্স				1,012—	344	25·5%
	জারম্যাক	2,087—	661	24·0%	3,000—	949	24·2%
	লক	769—	259	25·2%	3,082—	1,008	24·6%
F_4	কোরেন্স				225—	70	23·7%
	লক	2,328—	812	25·8%	2,400—	850	26·1%

3.9 জিনোটাইপ নির্ণয় পরীক্ষা

ফ্যাক্টর বা জীন কর্তৃক নির্ধারিত চরিত্রলক্ষণের বহিঃপ্রকাশ বা ফিনোটাইপের (Phenotype) সাহায্যে মেণ্ডেল ফ্যাক্টর বা জীনের উপস্থিতির কথা বলেন। ধ্রুপদী জীনতত্ত্বে জীনের উপস্থিতি নির্ণয়ে ইহাই একমাত্র পন্থা। অবশ্য এই শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের পর হইতে আণবিক জীনতত্ত্বের (Molecular genetics) সাহায্যে আরও অনেক পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

মেণ্ডেল প্রকট ও প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণের অ্যালিল লইয়া পরীক্ষা করেন। পূর্ব আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ কেবলমাত্র হোমোজাইগাস (Homozygous=yy) অবস্থায় প্রকাশিত হয়। সেইজন্য প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা না করিয়াই জিনোটাইপ (Genotype) জানা যায়। যেমন, কুঞ্চিত বীজত্বক মসৃণ বীজত্বকের একটি বিপরীত চরিত্রলক্ষণ এবং প্রচ্ছন্ন হওয়ায় ইহা কেবলমাত্র ss অবস্থায় প্রকাশিত হইতে পারে। প্রকট চরিত্রলক্ষণ হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস (Heterozygous=YY বা Yy) উভয় অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য জিনোটাইপ নির্ণয় করিতে হইলে ইহাদের লইয়া বিশেষ পদ্ধতিতে জনন সংক্রান্ত

পরীক্ষা করিতে হয়। মেণ্ডেল এই পরীক্ষাকে **পরীক্ষামূলক ক্রস** (Experimental or Test cross) আখ্যা দেন। এই পরীক্ষায় প্রকট চরিত্রলক্ষণের সহিত নির্ধারিত প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণের সংকরায়ণ ঘটানো হয়। যদি প্রকট চরিত্রলক্ষণটি হোমোজাই-গাস বা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহা হইলে F_1 জনুতে প্রকট লক্ষণটি প্রকাশিত হইবে। যদি প্রকট চরিত্রলক্ষণটি হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে তাহা হইলে F_1 জনুতে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয় লক্ষণই প্রকাশ পাইবে এবং উহাদের অনুপাত হইবে 1 : 1।

টেস্ট ক্রশ

P_1 – Yy × yy

জনন কোষ →

↓	y	y
Y	Yy	Yy
y	yy	yy

F_1 জনু

অনুপাত 1 : 1

আলোচ্য মসৃণ বীজত্বকের জিনোটাইপ জানিতে হইলে মসৃণ বীজত্বকের চরিত্র-লক্ষণযুক্ত মটর গাছের সহিত কুঞ্চিত বীজত্বকের চরিত্রলক্ষণযুক্ত মটর গাছের সংকরায়ণ করিতে হইবে। F_1 জনুতে যদি মসৃণ ও কুঞ্চিত উভয় প্রকার বীজত্বক 1 : 1 অনুপাতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে মসৃণ ফিনোটাইপ সংকর প্রকৃতির এবং ইহার জিনোটাইপ হেটারোজাইগাস বা Ss। আর যদি সবগুলি বীজত্বকই মসৃণ হয় তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইবে মসৃণ ফিনোটাইপ বিশুদ্ধ প্রকৃতির এবং ইহার জিনোটাইপ হোমোজাইগাস বা SS।

3.10 পৃথগীভবন সূত্রের সামগ্রিক পর্যালোচনা

মেণ্ডেলের পৃথগীভবন সূত্রের সামগ্রিক পর্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত-গুলি পাওয়া যায় (চিত্র 3.3)—

1. জীব মাত্রই অসংখ্য একক চরিত্রলক্ষণের সুসংহত যোগফল।

2. চরিত্রলক্ষণের নির্ধারক এক বা একাধিক রূপে থাকিতে পারে এবং ইহার ফলেই নির্ধারিত চরিত্রলক্ষণের গুণগত বা পরিমাণগত বৈষম্য দেখা যায়।

3. যে কোন চরিত্রলক্ষণের জন্য দুইটি নির্ধারক থাকে। নির্ধারক দুইটিকে অ্যালিল বলে। অ্যালিল দুইটি একই রূপের হইলে অবস্থাটিকে হোমোজাইগাস অবস্থা বলে। অ্যালিল দুইটি পরস্পর বিপরীতধর্মী হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাহাকে হেটারোজাইগাস অবস্থা বলে। হেটারোজাইগাস সংকর অবস্থা এবং হোমোজাইগাস বিশুদ্ধ অবস্থা নির্দেশ করে।

4 হেটারোজাইগাস অবস্থায় অ্যালিল দুইটির মধ্যে একটি প্রকট ও অন্যটি প্রচ্ছন্ন থাকে।

5. একক বৈশিষ্ট্যের জন্য যে চরিত্রলক্ষণ প্রতিফলিত হয় বা প্রকাশিত হয় তাহাকে **ঐ জীবের ফিনোটাইপ** বলে। প্রকট ও প্রচ্ছন্ন দুইটি অ্যালিল আলাদাভাবে বা একত্রে জীবটির **জিনোটাইপ** নির্দেশ করে।

3.11 একক বৈশিষ্ট্য ও ফিনোটাইপ সম্পর্কে ধারণা

কোন জীবের অ্যালিল জনিত চরিত্রলক্ষণকে ঐ জীবের জিনোটাইপ বলে। অ্যালিল বিপরীতধর্মী হইলে জিনোটাইপের ভিন্নতা আসে। মেণ্ডেলের পরীক্ষা হইতে ইহা প্রমাণিত যে ভিন্নতাগুলি গুণগত, পরিমাণগত বা অবস্থানগত হইতে পারে। মটর গাছের বীজের রঙ ইহার গুণগত বৈশিষ্ট্য। মটর গাছের দৈর্ঘ্য কম বা বেশী তাহা ইহার পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য। ফুলের কাক্ষিক বা প্রান্তীয় অবস্থান ইহার অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যাহাদের বৈষম্য সহজে বা বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না। উদাহরণ হিসাবে মানুষের রক্তের শ্রেণীর কথা বলা যায়। এই বৈষম্য নির্ণয়ে বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন। এই বিশেষ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে সকল ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট চরিত্রলক্ষণ একটি অ্যালিল দ্বারা নির্ধারিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে একটি চরিত্রলক্ষণ একাধিক জীন দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে।

মেণ্ডেল তাঁহার পরীক্ষায় মসৃণ ও কুঞ্চিত বীজ এই দুই বিপরীত চরিত্রলক্ষ যুক্ত মটর গাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটান। বীজের মসৃণতা উহাতে শ্বেতসারের উপস্থিতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে, কারণ শ্বেতসার জল ধারণ করিয়া বীজটিকে মসৃণ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কুঞ্চিত বীজের ক্ষেত্রে শ্বেতসারের পরিমাণ কম থাকে। শ্বেতসারের পরিমাণ কম হওয়ায় বীজের জল ধারণ ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং ফলে বীজটি কুঞ্চিত হইয়া যায়। সরল শর্করার রাসায়নিক সংযুতি ও শৃঙ্খল গঠন দ্বারা শ্বেতসার সৃষ্টি হয়। শৃঙ্খল গঠন ও রাসায়নিক সংযুতিতে **উৎসেচক** (Enzyme) প্রয়োজন। এই উৎসেচকটি মসৃণ বীজে থাকে কিন্তু কুঞ্চিত বীজে থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে মেণ্ডেল বর্ণিত একক বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে উৎসেচকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ফিনোটাইপ জীন কর্তৃক উৎপন্ন উৎসেচকের উপর নির্ভর করে।

নির্ধারক বা জীনগুলি কিভাবে ক্রিয়া করিয়া ফিনোটাইপ নির্ধারণ করে মেণ্ডেল সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেন নাই। ইহার কারণ মেণ্ডেলের সমসাময়িককালে জীনের উপাদান, উপাদানগুলির রাসায়নিক সংযুতি ও উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক কোন জ্ঞান ছিল না। পরবর্তীকালে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে একটি জীন একটি নির্দিষ্ট উৎসেচক সৃষ্টি করে। বক্তব্যটি আর পরিমার্জিত করিয়া বলা যায় একটি

সিসট্রন (Cistron) একটি পলিপেপটাইড গঠন করে। এখানে উল্লেখ্য জীন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণায় সিসট্রনকে জীনের ক্রিয়াগত চরম একক (Ultimate unit of physiological activity) রূপে গণ্য করা হইয়াছে। একটি সিসট্রনে শতাধিক নিউক্লিওটাইড থাকিতে পারে। বক্তব্যটির সরল অর্থ জীন কর্তৃক উৎপাদিত পলিপেপটাইডই একক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কারণ। মেণ্ডেলের একক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং মেণ্ডেল বর্ণিত একক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সর্বাংশে একক বৈশিষ্ট্য বলা যায় না (এ সম্পর্কে পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)।

3.12 একটি জীন কর্তৃক একাধিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণ বা প্লিয়োট্রপিজম (Pliotropism)

মসৃণ ও কুঞ্চিত বীজের উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট যে যে জীনটি বিশেষ উৎসেচকের নির্ধারক তাহাই আবার ঐ বীজের আকৃতি নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ একই জীন এই ক্ষেত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। জীন কর্তৃক একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হইবার ঘটনাকে প্লিয়োট্রপিজম বলে।

মানুষের ক্ষেত্রে সিকল সেল অ্যানিমিয়া (Sickle cell anaemia) নামক এক প্রকার বংশগতি নির্ভর রোগ আছে। এই রোগে লোহিত রক্তকণিকা কাস্তের (Sickle) আকার ধারণ করে এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় রক্তাল্পতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে একটি জীন একাধিক চরিত্রলক্ষণকে (কোষের আকার ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ) নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

3.13 বহু জীন ঘটিত বংশগতি (Polygenic heredity)

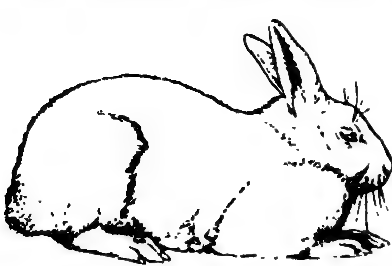
কোন একটি বিশেষ চরিত্রলক্ষণ একটি জীন ও উহার অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত যে একটি চরিত্রলক্ষণ একাধিক জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ঘটনাকে বহু জীন ঘটিত বংশগতি বলে। বহু জীন ঘটিত বংশগতি সাধারণতঃ পরিমাণগত বৈষম্য নির্দেশ করে। উদাহরণ হিসাবে গাছের দৈর্ঘ্য ও চোখে রঞ্জক পদার্থের পরিমাণের কথা বলা যায়।

3.14 বহু অ্যালিল (Multiple allele)

মেণ্ডেলীয় বংশগতি তত্ত্বে একটি জীনের দুইটি অ্যালিলের উপস্থিতির কথা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে কোন জীনের অ্যালিলের সংখ্যা দুই অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রায় সকল জীনের ক্ষেত্রেই দুই-এর অধিক অ্যালিল থাকা সম্ভব। কিন্তু এ কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে ডিপ্লয়েড (Diploid) জীবের ক্ষেত্রে কখনো কোনো জীনের একসঙ্গে দুইটির বেশী অ্যালিল একত্রে থাকে না।

বহু অ্যালিল ঘটিত বংশগতির উদাহরণ :—

A. এগাউটি খরগোসের গায়ের রঙ (Coat colour of Rabbit-Agouti)—সাধারণ খরগোসের গায়ের রংয়ের জীনের অ্যালিল C^{+} চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



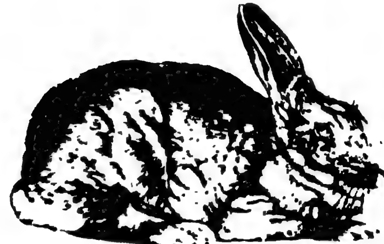
বর্ণহীন বা অ্যালবিনো



চিনচিলা



হিমালয়ান



এগাউটি

চিত্র 3.4 বহু অ্যালিল ঘটিত বংশগতি– এগাউটি খরগোসের গায়ের রঙ।

এই জীনের আরও তিনটি অ্যালিল পাওয়া যায়। অ্যালিল তিনটিকে C^{ch}, C^{h} এবং C^{a} চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। C^{+} অ্যালিল অন্য তিনটি অ্যালিলের উপর প্রকট। অর্থাৎ অ্যালিল C^{+}/C^{+} দশায় অথবা C^{+}/C^{ch} দশায় অথবা C^{+}/C^{a} দশায় সাধারণ রংয়ের ফিনোটাইপ প্রদর্শন করে (চিত্র 3.4)। C^{ch} অ্যালিল হোমোজাইগাস অবস্থায় চিনচিলা (Chinchila) ফিনোটাইপ দশা, C^{h} অ্যালিল হোমোজাইগাস অবস্থায় হিমালয়ান (Himalayan) ফিনোটাইপ দশা এবং C^{a} অ্যালিল হোমোজাইগাস অবস্থায় বর্ণহীন (Albino) ফিনোটাইপ দশা প্রদর্শন করে। কিন্তু C^{ch}/C^{h}, C^{ch}/C^{a} এবং C^{h}/C^{a} জিনোটাইপ অবস্থা হালকা ধূসর ফিনোটাইপ দশা প্রদর্শন করে। ইহা চিনচিলা এবং বর্ণহীনতা এই দুইএর মাঝামাঝি দশা। সুতরাং বলা যায় যে C^{ch} অ্যালিল C^{h} বা C^{a} অ্যালিলের সহিত হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকিলে অসম্পূর্ণ প্রকটতা প্রকাশ করে। হিমালয়ান (C^{h}) গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ বর্ণহীন কিন্তু পায়ে, নাকের ডগায় এবং কাণে রঞ্জক পদার্থ থাকায় ঐ অংশগুলি কালো দেখায়। বর্ণহীনতার ক্ষেত্রে C^{a} গায়ের রং সাদা কিন্তু চোখের রং গোলাপী (Pink) হয়।

এগাউটি খরগোসের গায়ের রঙের জীনতত্ত্বীয় ব্যাখ্যা

অ্যালিল	জিনোটাইপ	ফিনোটাইপ
C^+	C^+C^+, C^+C^{ch}, C^+C^h, C^+C^a	সাধারণ (Wild type)
C^{ch}	$C^{ch}C^{ch}$	চিনচিলা ধূসর
	$C^{ch}C^h$,$C^{ch}C^a$,C^hC^a	হালকা ধূসর
C^h	C^hC^h,	হিমালয়ান
C^a	C^aC^a	বর্ণহীন (Albino)

B মানুষের ABO রক্তশ্রেণী (Blood group) একটি বহু জীন ঘটিত বংশগতির উদাহরণ (চিত্র 3 5)।

3.15 জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ

জোহানসেন (Wilhelm Johannsen—1857-1927) 1909 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ শব্দ দুইটির প্রবর্তন করেন। শব্দ দুইটির সাহায্যে

চিত্র 3 5 মানুষের রক্তশ্রেণী ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া।

তিনি একটি জীবের জীনগত ও জীনের কার্যগত পার্থক্য নির্দেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। জিনোটাইপ শব্দটির অর্থ কোন জীবের জীনগত গঠন। অথবা অন্যভাবে

বলা যায় জিনোটাইপ হইতেছে একটি জীবের সমগ্র জীনের যোগফল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে কোন জীবের জিনোটাইপ বলিতে ঐ জীবের সকল জীন আক্ষরিক অর্থে বুঝায় না কেননা কোন জীবের সকল জিন সক্রিয় (Active) না থাকিতেও পারে।

সক্রিয় জীনের ক্রিয়ার ফলে কোন জীবের যে সমস্ত চরিত্রলক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলিকে ঐ জীবের ফিনোটাইপ বলে।

জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপের সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে এক বা সমান নয়। জিনোটাইপের জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে ফিনোটাইপ প্রকাশ পায়। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশেরও কিছু ভূমিকা থাকে।

সাধারণভাবে কোন জীবের ফিনোটাইপ ঐ প্রজাতির অন্য সভ্যের ফিনোটাইপের সহিত সর্বসম হয় না তবে এক বা অল্প কয়েকটি ফিনোটাইপ বিচার করিলে অনেক সময় একই প্রজাতির দুইটি সভ্যের মধ্যে সমতা দেখা যায়। আবার কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে দুইটি জীবের ফিনোটাইপ এক হইলেও তাহাদের জিনোটাইপ এক হয় না। মটর বীজের হলুদ চরিত্রলক্ষণ হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস উভয় জিনোটাইপ দশাতেই দেখা যায়।

3.16 একটি জীনের অ্যালিল সংখ্যা ও সম্ভাব্য জিনোটাইপ সংখ্যা

অ্যালিল সংখ্যা	জিনোটাইপ সংখ্যা	হোমোজাইগাস সংখ্যা	হেটারোজাইগাস সংখ্যা
1	1	1	0
2	3	2	1
3	6	3	3
4	10	4	6
5	15	5	10
n	$\frac{n(n+1)}{2}$	n	$\frac{n(n-1)}{2}$

3.17 প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক পর্যালোচনা

A. *অসম্পূর্ণ প্রকটতা*

(i) **স্ন্যাপড্রাগন ফুলের রঙ** : লাল ফুল হয় এইরূপ স্ন্যাপড্রাগন (Snap dragon) গাছের সহিত সাদা ফুল হয় এইরূপ স্ন্যাপড্রাগন গাছের সংকরায়ণ

করিলে F_1 জনুতে গোলাপী (Pink) ফুল উৎপাদক স্ন্যাপড্রাগন গাছ জন্মায় (চিত্র 3.6)। F_1 জনুর গোলাপী ফুলের স্ন্যাপড্রাগন গাছের মধ্যে স্বপরাগ-যোগ ঘটাইলে F_2 জনুতে তিন প্রকার গাছ পাওয়া যায়। একপ্রকার গাছে কেবলমাত্র লাল ফুল, অন্য প্রকার গাছে গোলাপী ফুল এবং বাকী গাছে সাদা ফুল ফোটে। এই তিন প্রকার গাছের অনুপাত 1 : 2 : 1 (লাল : গোলাপী : সাদা)।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এই ক্ষেত্রে মেণ্ডেল বর্ণিত নির্ধারকগুলির পৃথগীভবনে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছক হইতে বুঝা যায় যে Rr জিনোটাইপযুক্ত গাছে গোলাপী রঙের ফুল ফোটে। F_1 জনুতে R ও r এই দুই ধরনের জনন কোষ সৃষ্টি হয়। ইহাদের মিলনে F_2 জনুতে RR, Rr এবং rr এই তিন প্রকার জিনোটাইপ উৎপন্ন হয়। RR জিনোটাইপের ফিনোটাইপ লাল, Rr জিনোটাইপের ফিনোটাইপ গোলাপী এবং rr জিনোটাইপের ফিনোটাইপ সাদা। মেণ্ডেলে এক সংকর পরীক্ষায় প্রাপ্ত 1 : 2 : 1 এই অনুপাতে এক্ষেত্রেও জিনোটাইপ নির্ধারিত হইয়াছে কিন্তু ফিনোটাইপ 3 : 1 : : লাল : সাদা না হইয়া 1 : 2 : 1 : : লাল : গোলাপী : সাদা হইয়াছে।

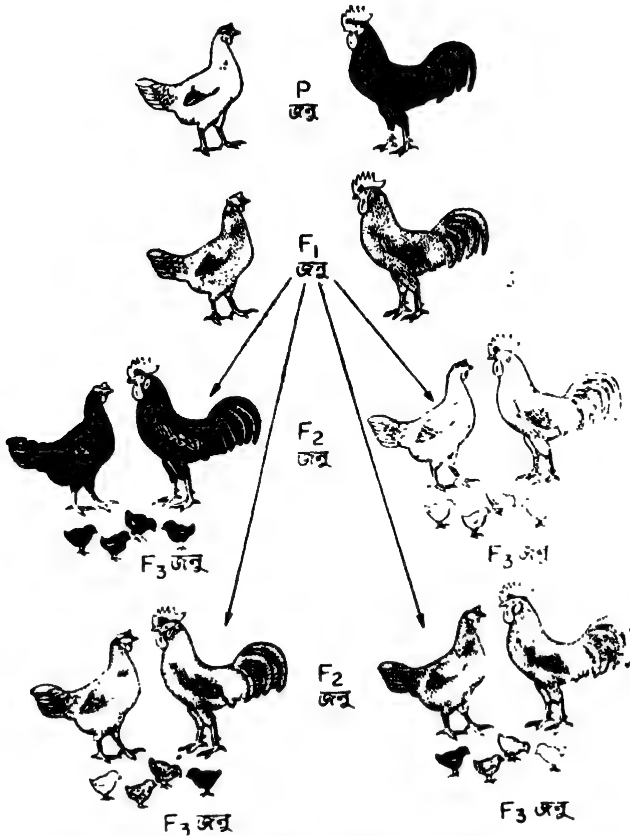


চিত্র 3.6 স্ন্যাপড্রাগন ফুলে অসম্পূর্ণ প্রকটতা।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে R ও r পরস্পরের অ্যালিল কিন্তু এক্ষেত্রে R-এর প্রকটতা সার্বিক নয়—প্রকটতা অসম্পূর্ণ

P_1 — RR × rr
F_1 — Rr (ফিনোটাইপ গোলাপী)
F_1 — Rr × Rr
F_2 — RR, Rr, rr
↓
(ফিনোটাইপ গোলাপী)

(ii) **অ্যানডালুসিয়ান (*Andalusian*) মোরগের পালকের রঙ:** P_1 জনুতে কালো পালকযুক্ত অ্যানডালুসিয়ান মোরগের সহিত সাদা পালকযুক্ত



চিত্র 3.7 অ্যানডালুসিয়ান মোরগের পালকের রঙে অসম্পূর্ণ প্রকটতা।

মুরগীর মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে F_1 জনুতে পালকের রঙ সাদা বা কালো না হইয়া নীলাভ ধূসর বর্ণের হয় (চিত্র 3.7)। F_2 জনুতে কালো, নীলাভ ধূসর ও সাদা যথাক্রমে 1 : 2 : 1 অনুপাতে প্রকাশিত হয়।

(iii) **সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*) ফুলের রঙ:** P_1 জনুতে লাল ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালতী গাছের সহিত সাদা ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালতী গাছের সংকরায়ণ ঘটাইলে F_1 জনুতে গোলাপী ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালতী গাছ এবং F_2 জনুতে 1 : 2 : 1 অনুপাতে লাল, গোলাপী ও সাদা ফুল উৎপাদনকারী সন্ধ্যামালতী গাছ পাওয়া যায়।

উপরের তিনটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যদি একটি জীন হোমোজাইগাস অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে এবং যদি ঐ জীনটির অ্যালিল

হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রথম জীনটির বিপরীত ফিনোটাইপ সৃষ্টি করে এবং যদি উহাদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাহা হইলে F_1 জনুতে যে হেটারোজাইগাস দশা সৃষ্টি হয় সেই দশায় P_1 জনুর প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক বজায় থাকে না। উভয় বৈশিষ্ট্যেরই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এক কথায় হেটারোজাইগাস অবস্থায় এইরূপ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের কেবলমাত্র গুণগত পরিবর্তন ঘটে না—কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তনও ঘটে। এই ধরনের গুণগত বৈষম্যের প্রকাশকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা অর্ধ প্রকটতা (Incomplete dominance) বলে।

B. *আংশিক প্রকটতা* (Partial dominance)

ড্রসোফিলার দণ্ডাকৃতি চক্ষু (Bar eyed Drosophila)—ড্রসোফিলার একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে এবং প্রতিটি পুঞ্জাক্ষিতে প্রায় 800 চক্ষু একক বা ওমাটিডিয়া (Omatidia) থাকে। সাধারণ পুঞ্জাক্ষির আকার গোল। ইহার সাধারণ অ্যালিলকে B^+ রূপে চিহ্নিত করা হয়। B^+/B^+ দশায় পুঞ্জাক্ষিতে ওমাটিডিয়ার সংখ্যা প্রায় 800।

অনেক সময় পরিবৃত্তির (Mutation) ফলে ওমাটিডিয়ার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং পুঞ্জাক্ষির আকৃতি দণ্ডের ন্যায় দেখায়। দণ্ডাকৃতি চক্ষু (Bar eye) প্রকট চরিত্র-লক্ষণ হওয়ায় ইহা ইংরাজী B অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়। দণ্ডাকৃতি চক্ষুতে ওমাটিডিয়ার সংখ্যা প্রায় 60। সাধারণ পুঞ্জাক্ষি ও দণ্ডাকৃতি পুঞ্জাক্ষি যুক্ত ড্রসোফিলার মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে B/B^+ অবস্থার F_1 জনুতে ওমাটিডিয়ার সংখ্যা 250—500 পর্যন্ত হয়। এই ঘটনাকে আংশিক প্রকটতা বলে।

C. *অতি প্রকটতা*

ড্রসোফিলার চোখের রঙ—ড্রসোফিলার চোখের স্বাভাবিক রং লাল। লাল রংয়ের জন্য দায়ী জীন পরিবৃত্তির ফলে পরিবর্তিত কাজ করিয়া সাদা চক্ষু উৎপন্ন করে। সাদা চক্ষুর জীনকে W দ্বারা এবং লাল চক্ষুর জীনকে W^+ চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয়। ড্রসোফিলার চোখে সিপিয়াপটেরিডিন (Sepiapteridine) ও হিমেলব্লাওস (Himmelblous) নামক বিশেষ ধরনের রঙ্গক (Pigment) পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে W^+/W^+ বা W/W এই হোমোজাইগাস দশা অপেক্ষা W^+/W হেটারোজাইগাস দশায় বেশী পরিমাণ রঙ্গক পদার্থ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে হেটারোজাইগাস দশায় রঙ্গকের পরিমাণগত বৃদ্ধি হইতেছে। এই অবস্থাকে অতি প্রকটতা বলে

সাধারণতঃ জৈব যোগ্যতার ক্ষেত্রে অতি প্রকটতা বেশী কার্যকরী হয়। জৈব যোগ্যতা অর্থে জনন ক্ষমতা, আকৃতি, বাঁচিয়া থাকিবার ক্ষমতা (Biological fitness) বুঝান হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে হোমোজাইগাস দশা অপেক্ষা হেটারোজাইগাস

দশায় জৈব যোগ্যতা বেশী থাকে। ইহার অর্থ হোমোজাইগাস জনিতৃ জনু অপেক্ষা হেটারোজাইগাস জনিতৃ জনুর জৈব যোগ্যতা বেশী।

D. সমপ্রকটতা

একটি জীনের অ্যালিলের সংখ্যা সাধারণতঃ দুইটি। কখনো কখনো অ্যালিলের সংখ্যা দুই অপেক্ষা বেশী হইতে পারে। কোন জীনের দুই-এর বেশী অ্যালিল থাকিলে জীনটিকে বহু অ্যালিল যুক্ত (Multiple allele) জীন বলা হয়। অনেক সময় দেখা যায় একটি অ্যালিল গুণগতভাবে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে অন্য অ্যালিল-গুলি কর্তৃক প্রকাশিত সেই বৈশিষ্ট্যটি প্রথমটি হইতে গুণগতভাবে পৃথক। এই অ্যালিলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বগতভাবে প্রকট প্রচ্ছন্ন বা আংশিক প্রকট হইতে পারে।

হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকা কোন জীনের অ্যালিল দুইটির প্রতিটিই সমান-ভাবে প্রকট হইলে অবস্থাটিকে সমপ্রকটতা বলে। মানুষের M, N, MN রক্তশ্রেণী ; ইঁদুরের ছাপ ছাপ (Mosaic) গাত্রবর্ণ ইত্যাদি সমপ্রকটতার উদাহরণ।

মানুষের M, N, MN রক্তশ্রেণী

কোন জীবিত প্রাণীর রক্তে বাহির হইতে কোন জৈব অণু বিশেষ করিয়া প্রোটিনধর্মী জৈব অণু প্রবেশ করিলে ঐ বাহ্য অণুর বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে ঐ প্রাণীর রক্তরসে এক প্রকার রাসায়নিক প্রস্তুত হইয়া যায়। প্রবেশকারী বাহ্য অণুটিকে **অ্যান্টিজেন** (Antigen) এবং উহার প্রতিরোধী রাসায়নিককে **অ্যান্টিবডি** (Antibody) বলে। অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের বিক্রিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন জনিত বিষক্রিয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

ল্যাণ্ডস্টাইজনার এবং লেভাইন মানুষের রক্তের লোহিত রক্তকণিকাকে অ্যান্টিজেন রূপে খরগোসের দেহে প্রবেশ করাইয়া খরগোসের রক্তরসে মানুষের লোহিত রক্তকণিকার বিরুদ্ধাচারী অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করাইয়া লন এবং ঐ অ্যান্টিবডির নিষ্কাশন করেন। এইবার ঐ নিষ্কাশিত অ্যান্টিবডির সহিত বিভিন্ন মানুষের রক্তের ক্রিয়া-বিক্রিয়া পরীক্ষা করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে কিছু মানুষের লোহিত রক্তকণিকা ঐ অ্যান্টিবডির সহিত বিক্রিয়া করিবার সময় পরস্পর যুক্ত হইয়া যাইতেছে। এই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা মানুষের রক্তকে M, N ও MN এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন—

a. M শ্রেণীর লোহিত রক্তকণিকাকে অ্যান্টিজেন রূপে ব্যবহার করিয়া যে অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় তাহা M এবং MN শ্রেণীর রক্তকণিকা যুক্ত করিতে পারে।

b. N শ্রেণীর লোহিত রক্তকণিকাকে অ্যান্টিজেন রূপে ব্যবহার করিয়া যে অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় তাহা N এবং MN শ্রেণীর রক্তকণিকা যুক্ত করিতে পারে।

c. MN শ্রেণীর লোহিত রক্তকণিকাকে অ্যাণ্টিজেন রূপে ব্যবহার করিয়া যে অ্যাণ্টিবডি পাওয়া যায় তাহা সকল শ্রেণীর লোহিত রক্তকণিকা যুক্ত করিতে পারে।

তাঁহারা আরো লক্ষ্য করেন যে পিতার রক্ত M শ্রেণীর এবং মাতার রক্ত N শ্রেণীর (অথবা ইহার বিপরীত) হইলে সন্তানের রক্ত সর্বদাই MN শ্রেণীর হয়। দেখা যাইতেছে M, N বা MN প্রত্যেকেই একটি করিয়া পৃথক ফিনোটাইপ। যদি M ফিনোটাইপের জিনোটাইপ MM ও N ফিনোটাইপের জিনোটাইপ NN হয় এবং যদি ইহারা যথাক্রমে পিতা ও মাতা হন তাহা হইল সন্তানের জিনোটাইপ হইবে MN এবং উহার ফিনোটাইপও হইবে MN। M ও N অ্যালিল দুইটি প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সম্পর্কযুক্ত হইলে পরবর্তী জনুতে M বা N শ্রেণীর রক্ত পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে MN শ্রেণীর রক্তের বিরুদ্ধচারী অ্যাণ্টিবডি M, N ও MN সকল শ্রেণীর লোহিত কণিকা যুক্ত করে। ইহার অর্থ M ও N প্রত্যেকেই সমভাবে প্রকট।

পিতা ও মাতার রক্তের শ্রেণী অনুযায়ী সন্তানের রক্তের শ্রেণী ও অনুপাত নিচে দেওয়া হইল—

পিতা মাতার জিনোটাইপ	রক্তের শ্রেণী		
	M	MN	N
MM×MM	সব	—	—
MM×MN	1	1	—
MM×NN	—	সব	—
MN×MN	1	2	1
MN×NN	—	1	1
NN×NN	—	—	সব

E. **বিলম্বিত প্রকটতা**—একটি প্রকৃত প্রকট চারিত্রলক্ষণ অনেক সময় বিলম্বে প্রকাশিত হয়। এই অবস্থাকে বিলম্বিত প্রকটতা বলে। মানুষের কালো চুল একটি প্রকট চারিত্রলক্ষণ, কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের চুল কালো হয় না। কিছু বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর চুলের রঙ কালো হইয়া যায়।

F. **বিপরীত প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক**—প্রচ্ছন্ন চারিত্রলক্ষণ কখনও কখনও প্রকট হইয়া উঠিতে পারে। হেলিক্স (*Helix*) গণের শামুকের খোলকের রঙ লাল এবং ইহা প্রকট। ইহার বিপরীত ও প্রচ্ছন্ন চারিত্রলক্ষণ হলুদ। লাল খোলক ও হলুদ

খোলক যুক্ত শামুকের মধ্যে সংকরায়ণ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে F_1 জনুতে হলুদ খোলক-যুক্ত হেলিক্স গণের শামুক পাওয়া গিয়াছে।

G. **সর্তসাপেক্ষ প্রকটতা**—প্রকট চরিত্রলক্ষণ কখনও কখনও পরিবেশের প্রভাবের সর্তাধীনে প্রকাশ পাইতে পারে। মরগ্যান (Morgan) এই রকম এক সর্তসাপেক্ষ প্রকটতার উল্লেখ করেন। তিনি দেখেন যে ড্রসোফিলাকে টাটকা খাবার দিলে এবং উহাকে বেশী আদ্র' পাত্রে পালন করিলে ড্রসোফিলার উদরের কালো বর্ণের বন্ধনীর (Band) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার ঐ ড্রসোফিলাকে টাটকা খাবার না দিয়া ও কম আদ্র' জায়গায় পালন করিলে উহার উদরের কালো বন্ধনীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

3.18 জিনোটাইপ, ফিনোটাইপ ও পরিবেশ

মেণ্ডেলের পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গিয়াছে যে ফিনোটাইপ জিনোটাইপ দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রকট চরিত্রলক্ষণ হোমোজাইগাস ও হেটারো-জাইগাস এই দুই অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। অপরপক্ষে প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ কেবলমাত্র হোমোজাইগাস দশায় প্রকাশিত হয়। পূর্ব প্রদত্ত অ্যালিল সম্পর্কিত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক না থাকিলেও জিনোটাইপ ফিনোটাইপ নির্ধারণ করে। ইহা সাধারণভাবে সত্য হইলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে জিনোটাইপ নির্ধারিত ফিনোটাইপের প্রকাশে পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ ফিনোটাইপ নির্ধারণে জিনোটাইপ ছাড়া পরিবেশেরও ভূমিকা থাকে। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

a. **হিমালয়ান খরগোসের গায়ের রঙ**—এক ধরনের কালো রংয়ের খরগোস পাওয়া যায়। ইহাদের হিমালয়ান খরগোস বলে। এই খরগোসের কালো রঙ প্রকট চরিত্রলক্ষণ। হোমোজাইগাস অবস্থায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে বা সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী হিমালয়ান খরগোসের গায়ের রঙ কালো। এই খরগোসকে অধিক উচ্চতা (সমুদ্রতল হইতে) এবং নিম্ন তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে রাখা হইলে ইহাদের গায়ের রঙ সাদা হইয়া যায়। প্রাণিদের গায়ের রঙ মেলানিন (Melanin) নামক রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। টাইরোসিন (Tyrosine) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাকীয় ক্রিয়ায় মেলানিন সৃষ্টি হয়। এই বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎসেচকের প্রয়োজন। হিমালয়ান খরগোসের ক্ষেত্রে উচ্চ তাপমাত্রায় এই উৎসেচক কার্যকরী হইতে পারে (37°C আদর্শ বিপাকীয় তাপমাত্রা) কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় এই উৎসেচক কাজ করিতে পারে না; ফলে মেলানিন উৎপন্ন হইতে পারে না। মেলানিনের অভাবে হিমালয়ান খরগোস বর্ণহীন বা সাদা হইয়া যায়।

b. **মানুষের বহু অঙ্গুলি (Polydactyly)**—মানুষের হাতে বা পায়ে সাধারণতঃ পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে। কিন্তু কখনও কখনও কোনও হাতে

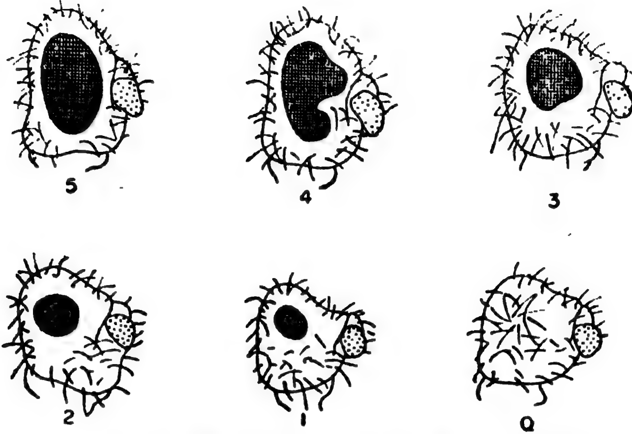
ছয়টি অঙ্গুলি দেখা যায়। ইহা একটি বংশগত চরিত্রলক্ষণ। বহু অঙ্গুলি দশা প্রকট জীন P দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার প্রচ্ছন্ন অ্যালিল হোমোজাইগাস (pp) দশা স্বাভাবিক অবস্থা (পাঁচটি অঙ্গুলি) সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে P/p হেটারো-জাইগাস দশাতে বহু অঙ্গুলি অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সকল হাত ও পায়ে বহু অঙ্গুলি না হইয়া কেবলমাত্র একটি হাত বা একটি পায়ে ছয়টি অঙ্গুলি দেখা যায়।

c. **পোটেনটুলা গাছ**—ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে 3টি পোটেনটুলা গ্ল্যানডুলোসা (*Potentula glandulosa*) উদ্ভিদ সংগ্রহ করা হয়। উহাদের একটিকে সমুদ্র

চিত্র 3.8 পোটেনটুলা গাছের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব।

উপকূলের তল হইতে 100 ফিট উচ্চ স্টানফোর্ড হইতে, একটিকে 4,600 ফিট উচ্চ মাথের হইতে এবং অবশিষ্টটিকে 10,000 ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট সিয়ারা নেভাদার টিমবারলিন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত প্রতি গাছকে এইবার তিন টুকরা করিয়া প্রতি টুকরাকে এক একটি উচ্চতায় (100 ফিট, 4,600 ফিট এবং 10,000 ফিট) রোপণ করা হয়। প্রতি টুকরার অঙ্গজ জনন হইতে পারে এবং ইহার ফলে জিনোটাইপ অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন উচ্চতায় (এক্ষেত্রে পরিবেশ) একই জিনোটাইপ যুক্ত গাছের বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে (চিত্র 3.8)। ইহা প্রমাণ করে যে, সকল পরিবেশে একটি নির্দিষ্ট জিনোটাইপ নিজেকে সর্বোত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।

d. ড্রসোফিলার লোব (Lobe) জীন—ড্রসোফিলার চোখের আকৃতি নিয়ন্ত্রক একটি প্রকট জীন L। এই জীনের সাধারণ অ্যালিল L^+ চোখের স্বাভাবিক আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। L/L^+ হেটারোজাইগাস দশায় চোখ লোব আকৃতি পায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকাশের বিস্তৃতিতে (Expressivity) ভিন্নতা দেখা যায়।



চিত্র 3.9 ড্রসোফিলার লোবজীনঘটিত প্রকাশ বিস্তৃতির ভিন্নতা (O=চক্ষুহীন)।

3.9 চিত্রে চোখ হীন অবস্থা হইতে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থার চোখ পর্যন্ত পাঁচ রকমের প্রকাশ বিস্তৃতির ভিন্নতা দেখান হইয়াছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে L/L^+ দশায় 75% লোব চক্ষু এবং 25% স্বাভাবিক চক্ষু ড্রসোফিলা পাওয়া যায়।

3.19 প্রকাশের গভীরতা (Penetrance) এবং বিস্তৃতি (Expressivity)

উপরের উদাহরণগুলি হইতে বলা যায় যে জিনোটাইপের প্রকাশ বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বাহ্য পরিবেশ বলিতে উষ্ণতা, সূর্যালোকের তীব্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলিতে লিঙ্গ, অন্য জীনের প্রভাব ইত্যাদি বুঝায়। জীন কর্তৃক নির্ধারিত ফিনোটাইপ যখন পূর্ণ প্রকাশিত হয় তখন এই প্রকাশকে ফিনোটাইপ প্রকাশের পূর্ণ বিস্তৃতি বলে। প্রকাশ আংশিকভাবে হইলে উহাকে আংশিক বিস্তৃতি বলে। হেটারোজাইগাস দশায় লোব জীনের প্রকাশের যে সকল ভিন্নতা পাওয়া যায় উহারা আংশিক বিস্তৃতির উদাহরণ।

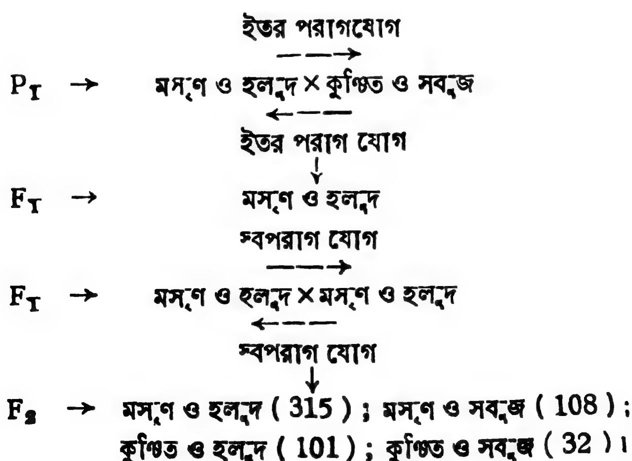
কোন ফিনোটাইপ জিনোটাইপ অনুযায়ী সকলের মধ্যে প্রকাশিত হইলে সেইরূপ প্রকাশকে প্রকাশের পূর্ণ গভীরতা (Complete penetrance) বলে। যখন

ঐ একই জিনোটাইপযুক্ত কিছু সভ্যের মধ্যে জিনোটাইপ অনুযায়ী ফিনোটাইপ দেখা যায় এবং কিছু সভ্যের মধ্যে উহা দেখা যায় না তখন ঐ প্রকাশকে প্রকাশের আংশিক গভীরতা বলে। L/L^+ জীন 75% প্রকাশিত হয়। সেই হিসাবে এক্ষেত্রে প্রকাশের গভীরতা 75%।

3.20 দ্বিসংকর পরীক্ষা ও স্বাধীন বিন্যাস সূত্র

এক সংকর পরীক্ষা হইতে ইহা প্রমাণিত যে চরিত্রলক্ষণের জন্য দায়ী জীনযুগল জনিতৃ জনুতে জনন কোষ সৃষ্টির সময় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং অপত্য জনুতে উহারা পুনরায় একত্রিত হয়। দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণ লইয়া সংকরায়ণকে দ্বি-সংকর পরীক্ষা বলে। দ্বিসংকর পরীক্ষা করিয়া মেন্ডেল দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণ বংশগতির মধ্য দিয়া কি ভাবে জনিতৃ জনু হইতে অপত্য জনুতে পরিবাহিত হয় সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল হইতে দুইজোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণের জীনের স্বাধীন বিন্যাস সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পরীক্ষায় তিনি দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণযুক্ত মটরগাছ নির্বাচন করেন এবং উহাদের মধ্যে সংকরায়ণ করান। মসৃণ বীজত্বক ও হলুদ বর্ণের বীজ ও কুঞ্চিত বীজত্বক ও সবুজ বর্ণের বীজ এই দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণ মেন্ডেলের পরীক্ষায় জনিতৃ জনু (P_1) রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে মসৃণ বীজত্বক ও কুঞ্চিত বীজত্বক হইল একজোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণ এবং হলুদ বর্ণ ও সবুজ বর্ণের বীজ হইল অপর জোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণ। ইহাদের মধ্যে মসৃণ প্রকট ও কুঞ্চিত প্রচ্ছন্ন এবং হলুদ প্রকট ও সবুজ প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ। পরীক্ষার ছক নিম্নোক্ত রূপ :—



বন্ধনীর মধ্যে পরীক্ষালব্ধ বীজের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সংখ্যাগুলির যোগফল 556।

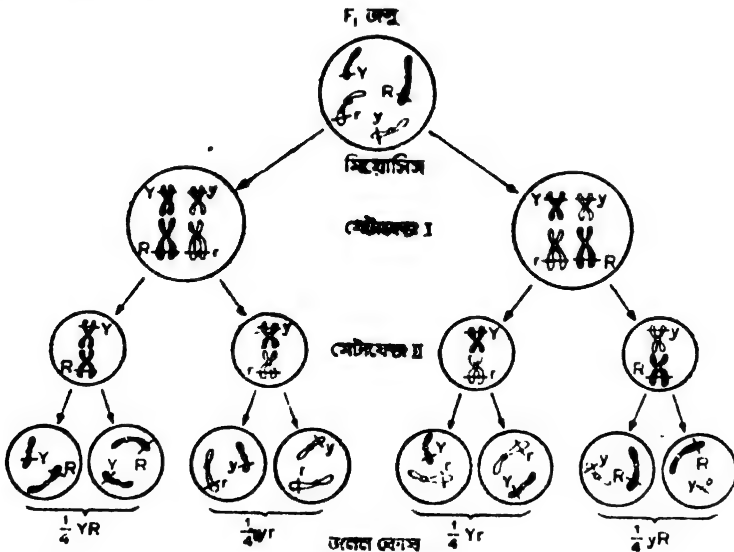
পরীক্ষার ছক অনুসরণ করিলে দেখা যায়—

(a) F_1 জনুতে সকল বীজ মসৃণ ও হলুদ হইয়াছে।

(b) F_1 জনুর বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের ফুলের মধ্যে স্বপরাগযোগ করাইলে F_2 জনুতে (1) মসৃণ হলুদ, (2) মসৃণ সবুজ, (3) কুঞ্চিত হলুদ, (4) কুঞ্চিত সবুজ এই চারি প্রকার ফিনোটাইপযুক্ত বীজ পাওয়া যায়।

(c) ইহাদের মধ্যে মসৃণ সবুজ ও কুঞ্চিত হলুদ নূতন চরিত্রলক্ষণ।

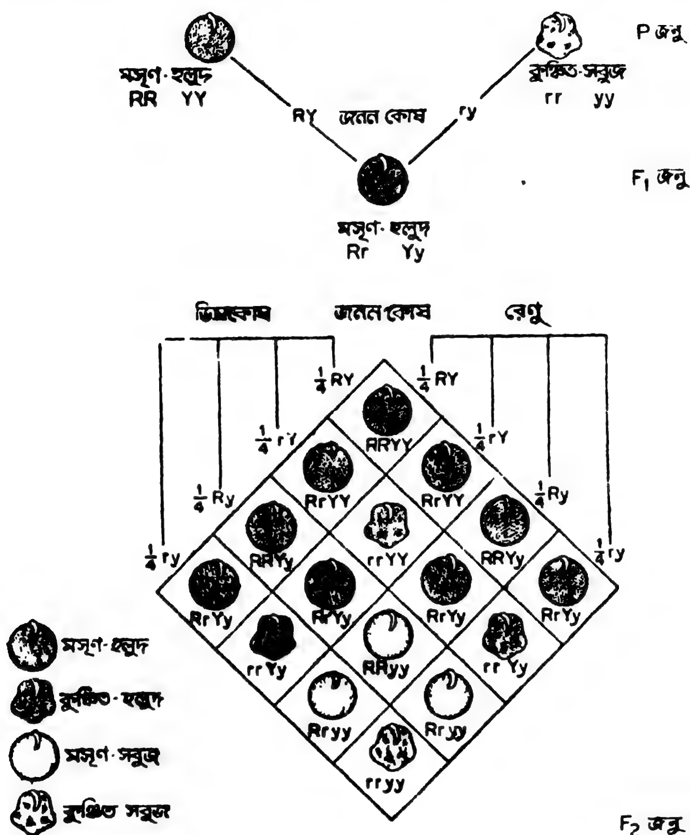
ব্যাখ্যা: দ্বিসংকর পরীক্ষার ফলাফলকে দুইটি পৃথকভাবে করা একসংকর পরীক্ষার যোগফল বলা যাইতে পারে। মসৃণ ও কুঞ্চিত বীজত্বকের ধর্মের এই দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে F_1 জনুতে সবগুলি বীজ মসৃণ হইবে এবং F_2 জনুতে বীজের তিন-চতুর্থাংশ মসৃণ ও এক-চতুর্থাংশ কুঞ্চিত হইবে। এই পরীক্ষায় মোট 423টি (315+108) মসৃণ বীজ ও 133টি (101+32) কুঞ্চিত বীজ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মসৃণ ও কুঞ্চিতের অনুপাত 423 : 133 বা $\frac{3}{4}:\frac{1}{4}$। এই অনুপাত সঠিকভাবে পৃথগীভবন সূত্র অনুসরণ করিতেছে। অনুরূপভাবে হলুদ বর্ণ ও সবুজ বর্ণের বীজের অনুপাত নির্ণয় করিলে দেখা যাইবে হলুদ ও সবুজ বর্ণ পৃথগীভবন সূত্র (416 : 140) একইভাবে পালন করিতেছে।



চিত্র 8.10 জনন কোষসৃষ্টির সময় চরিত্রলক্ষণের স্বাধীন আচরণ।

কিন্তু দ্বিসংকর পরীক্ষায় দুই প্রকার নূতন চরিত্রলক্ষণযুক্ত বীজের F_2 জনুতে উৎপত্তি (মসৃণ সবুজ ও কুঞ্চিত হলুদ) ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। P_1 এবং F_1 জনুতে মসৃণ ও হলুদ চরিত্রলক্ষণ একসঙ্গে উপস্থিত ছিল। কিন্তু F_2 জনুতে দেখা যাইতেছে

হলুদ চারিত্রলক্ষণ কুঞ্চিতের সহিত এবং সবুজ চারিত্রলক্ষণ মসৃণের সহিত যুক্ত হইতেছে। অর্থাৎ হলুদ ও মসৃণ চারিত্রলক্ষণ পরস্পর হইতে এবং কুঞ্চিত ও সবুজ চারিত্রলক্ষণ পরস্পর হইতে কিছু পরিমাণে বিচ্যুত হইতেছে। বিচ্যুত হইবার পর হলুদ কুঞ্চিতের সহিত এবং সবুজ মসৃণের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে কুঞ্চিত হলুদ ও মসৃণ সবুজ বীজ উৎপন্ন করিয়াছে। অর্থাৎ মসৃণ ও হলুদ পরস্পরের



চিত্র 3.11 মেণ্ডেলকৃত দ্বিসংকর পরীক্ষায় চারিত্রলক্ষণের স্বাধীন বিন্যাস।

অধীন নহে। জনন কোষ সৃষ্টির সময় তাহারা পরস্পর হইতে আলাদা হইতে বা স্বাধীনভাবে আচরণ করিতে পারে। অনুরূপভাবে কুঞ্চিত ও সবুজ পরস্পরের অধীন নহে। জনন কোষ সৃষ্টির সময় তাহারাও স্বাধীন আচরণ করিতে পারে (চিত্র 3.10)। অর্থাৎ একজোড়া চারিত্রলক্ষণ (বিপরীতধর্মী নহে) উহাদের জনুক্রমিক বিন্যাসের সময় স্বাধীন আচরণ করে এবং ইহাকেই স্বাধীন বিন্যাস সূত্র বলা হয় (চিত্র 3.11)।

এই সূত্র নির্দেশ করে যে কোন বীজের ত্বক মসৃণ হইবে না কুঞ্চিত হইবে এই ঘটনার সহিত ঐ বীজের বর্ণ হলুদ বা সবুজ হইবে তাহা জড়িত নহে। একটি বীজের ত্বক মসৃণ হইবে না কুঞ্চিত হইবে অথবা হলুদ হইবে না সবুজ হইবে তাহা সম্ভাবনার (Probability) উপর নির্ভরশীল। বীজবর্ণ সবুজ বা হলুদ হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ দুইটি স্বনির্ভর ঘটনা একসঙ্গে ঘটিবার সম্ভাবনা গাণিতিক সম্ভাবনার সম্পর্ক দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই গাণিতিক সম্ভাবনার সম্পর্ক হইতেছে স্বাধীন ভাবে সৃষ্ট দুইটি ঘটনার গুণফল।

মোট বীজের $\frac{3}{4}$ অংশের মসৃণ হইবার ও $\frac{3}{4}$ অংশের হলুদ হইবার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ মোট বীজের $(\frac{3}{4}\times\frac{3}{4})=\frac{9}{16}$ অংশের মসৃণ ও হলুদ হইবার সম্ভাবনা (একসংকর পরীক্ষা স্মর্তব্য)। এই গাণিতিক সম্ভাবনার হিসাবে—

a. মসৃণ ও হলুদ হইবে $\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}$ অংশ বা $\frac{9}{16}$ অংশ
b. মসৃণ ও সবুজ হইবে $\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}$ অংশ বা $\frac{3}{16}$ অংশ
c. কুঞ্চিত ও হলুদ হইবে $\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}$ অংশ বা $\frac{3}{16}$ অংশ
d. কুঞ্চিত ও সবুজ হইবে $\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}$ অংশ বা $\frac{1}{16}$ অংশ

অর্থাৎ উক্ত চারি প্রকার বীজের অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1। প্রকৃতপক্ষে দ্বিসংকর পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত স্বাধীন বিন্যাস সূত্রে এই ফলাফল পাওয়া গিয়াছে।

3.21 দ্বিসংকর পরীক্ষার ফিনোটাইপের সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি

দ্বিসংকর পরীক্ষায় অপত্য জনুর মোট সংখ্যার মধ্যে কোন ফিনোটাইপের সংখ্যা কতগুলি হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য মোট প্রাপ্ত সংখ্যার সহিত ঈপ্সিত (Expected) অনুপাত গুণ করিতে হয়। দ্বিসংকর পরীক্ষায় F_2 জনুতে প্রাপ্ত মোট বীজ সংখ্যা (315+108+101+32)=556।

দ্বিসংকর পরীক্ষায় মসৃণ ও হলুদ বীজের অনুপাত $\frac{9}{16}$

∴ মসৃণ ও হলুদ বীজের ফিনোটাইপ সংখ্যা $=556\times\frac{9}{16}$

অনুরূপ পদ্ধতিতে অন্যান্য বীজের ফিনোটাইপ সংখ্যা নির্ণয় করিতে হয়।

3.22 জিনোটাইপ নির্ণয়

দ্বিসংকর পরীক্ষায় এ পর্যন্ত 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত লইয়া যে আলোচনা করা হইল তাহা ফিনোটাইপের অনুপাত মাত্র। F_2 জনুতে লব্ধ বীজগুলির জিনোটাইপ কি নীতি অনুসরণ করিয়া নির্দিষ্ট হয় এবং কি ভাবে উহা ফিনোটাইপের 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতের সর্ত পূরণ করে তাহা জানা প্রয়োজন। কেন না জিনোটাইপে স্বাধীন বিন্যাস সূত্র অনুসৃত না হইলে ফিনোটাইপের অনুপাতের সহিত উহা সর্বসম হইতে পারে না।

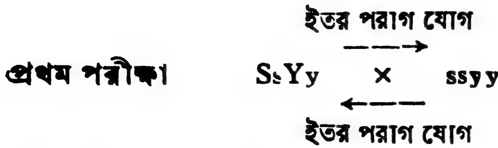
যদি বীজত্বকের মসৃণ লক্ষণের প্রকট অ্যালিলকে S ও কুঞ্চিত লক্ষণের প্রচ্ছন্ন অ্যালিলকে s দ্বারা এবং অনুরূপভাবে হলুদকে Y দ্বারা ও সবুজকে y দ্বারা সূচিত করা হয় তাহা হইলে P_1 জনুর জিনোটাইপ হইবে যথাক্রমে SSYY (মসৃণ হলুদ) এবং ssyy (কুঞ্চিত সবুজ) এবং ইহারা প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ। P_1 জনুতে উৎপন্ন জনন কোষের জিনোটাইপ হইবে যথাক্রমে SY এবং sy। এই দুই প্রকার জনন কোষের মিলনের ফলে F_1 জনুতে প্রাপ্ত মসৃণ হলুদ বীজের জিনোটাইপ হইবে SsYy। F_1 জনুর SsYy জিনোটাইপের গাছে পরাগরেণু ও ডিম্বক সৃষ্টির ফলে মোট চারি প্রকার জনন কোষ পাওয়া যাইবে কারণ পৃথগীভবন সূত্র অনুযায়ী Ss এবং Yy এই দুই হেটারোজাইগাস অ্যালিলদ্বয় পৃথক হইয়া যাইবে। অর্থাৎ বলা যায় যতগুলি জনন কোষ উৎপন্ন হইবে তাহার অর্ধাংশে S থাকিবে এবং বাকি অর্ধাংশে s থাকিবে। অনুরূপ ভাবে Yy অ্যালিলদ্বয়ের ক্ষেত্রেও অর্ধাংশে Y ও বাকি অর্ধাংশে y থাকিবে। আবার যে জনন কোষে S থাকিবে সেই জনন কোষেই Y বা y থাকিতে পারে। অর্থাৎ S আছে এইরূপ জনন কোষের অর্ধাংশে Y এবং বাকি অর্ধাংশে y থাকিবে। এই ক্ষেত্রে জনন কোষের জিনোটাইপ হইবে SY বা Sy এবং ইহারা সম সংখ্যায় উৎপন্ন হইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে মোট চারি প্রকার জনন কোষ, যথা—SY, Sy, sY এবং sy উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাদের একটিকে লইয়া গঠিত জনন কোষের সংখ্যা মোট উৎপন্ন জনন কোষের এক-চতুর্থাংশ হইবে অর্থাৎ ইহাদের উৎপাদনের অনুপাত হইবে 1 : 1 : 1 . 1।

জনন কোষ পরাগরেণু বা ডিম্বক যাহাই হউক না কেন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটিবে। ইহাদের যথেচ্ছ মিলনের ফলে F_2 জনু উৎপন্ন হইবে। এই মিলনের ফলাফল 3.11 চিত্রে দেখান হইয়াছে। মোট 16 প্রকার জিনোটাইপের মধ্যে 9 প্রকার মসৃণ হলুদ ফিনোটাইপের, 3 প্রকার মসৃণ সবুজ ফিনোটাইপের, 3 প্রকার কুঞ্চিত হলুদ ফিনোটাইপের এবং 1 প্রকার কুঞ্চিত সবুজ হইবে। অর্থাৎ ইহা 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত পালন করিতেছে।

পরীক্ষার ফলাফল হইতে আরো বলা যায় যে, যে সকল গাছের ফিনোটাইপ F_2 জনুতে কুঞ্চিত ও সবুজ তাহাদের জিনোটাইপ ssyy, কারণ প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ কেবলমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ পায়। মসৃণ ও হলুদ চরিত্রলক্ষণ যুক্ত বীজের জিনোটাইপ SSYY, SsYY, SSYy, SsYy হইতে পারে কারণ মসৃণ (S) কুঞ্চিতের (s) উপর এবং হলুদ (Y) সবুজের (y) উপর প্রকট।

এখন প্রশ্ন হইতেছে F_2 জনুতে যে নূতন দুই ধরনের বীজ যথা—মসৃণ সবুজ ও কুঞ্চিত হলুদ উৎপন্ন হইল উহাদের জিনোটাইপ কি হইবে ?

এই পরীক্ষায় F_1 জনুর বীজের জিনোটাইপ নিঃসন্দেহে SsYy। ইহার সহিত একটি পরীক্ষায় বিশুদ্ধ কুঞ্চিত সবুজ (ssyy) চরিত্রলক্ষণের ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় ইহার সহিত বিশুদ্ধ মসৃণ হলুদ (SSYY) বীজ যুক্ত গাছের সংকরায়ণ পরীক্ষা করিলে F_2 জনুর সকল প্রকার বীজের জিনোটাইপ নির্ধারণ সম্ভব হইবে।



SsYy হইতে উৎপন্ন জনন কোষের জিনোটাইপ SY, Sy, sY, sy অর্থাৎ চারি প্রকার

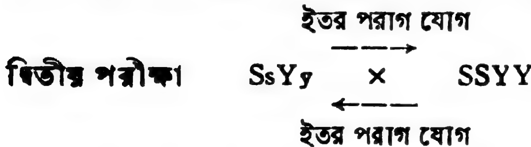
ssyy হইতে মাত্র এক প্রকার জিনোটাইপ যুক্ত জনন কোষ sy উৎপন্ন হইবে।

	SsYy হইতে জনন কোষ			
কুঞ্চিত সবুজ হইতে sy	SY	Sy	sY	sy
	SsYy	Ssyy	ssYy	ssyy
	মসৃণ হলুদ	মসৃণ সবুজ	কুঞ্চিত হলুদ	কুঞ্চিত সবুজ

অর্থাৎ মসৃণ সবুজের জিনোটাইপ Ssyy
এবং কুঞ্চিত হলুদের জিনোটাইপ ssYy
মেণ্ডেল এই পরীক্ষায় নিম্নোক্ত ফল পাইয়াছিলেন

ফিনোটাইপ	সংখ্যা	জিনোটাইপ
মসৃণ হলুদ	55	SsYy
মসৃণ সবুজ	51	Ssyy
কুঞ্চিত হলুদ	49	ssYy
কুঞ্চিত সবুজ	52	ssyy

অর্থাৎ চারি প্রকার ফিনোটাইপ প্রায় 1 : 1 : 1 : 1 অনুপাতে পাইয়াছিলেন।



SsYy হইতে জনন কোষ—SY, Sy sY, sy
SSYY হইতে জনন কোষ—SY|

	SY	Sy	sY	sy
SY	SSYY	SSYy	SsYY	SsYy
	মসৃণ হলুদ	মসৃণ হলুদ	মসৃণ হলুদ	মসৃণ হলুদ

এই ফলাফল সম্পূর্ণ আশানুরূপ। কিন্তু এই পরীক্ষা হইতে ইহা প্রমাণিত যে মসৃণ হলুদ ফিনোটাইপের ক্ষেত্রে চারি প্রকার জিনোটাইপ হইতে পারে। ফিনোটাইপ মসৃণ হলুদের জিনোটাইপসমূহ - SSYY, SSYy, SsYY এবং SsYy

যেহেতু হেটারোজোইগাস মটর গাছের মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটিলে পরবর্তী জনুতে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন চরিত্রলক্ষণ পুনরায় পাওয়া যায় সেইজন্য মেণ্ডেল উপরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট 177টি ক্ষেত্রে পুনরায় স্বপরাগযোগ করান এবং নিম্নোক্ত ফলাফল পান :

(1) 45 টির ক্ষেত্রে F_2 জনুতে কেবলমাত্র মসৃণ হলুদ বীজ পাওয়া যায় অর্থাৎ ইহাদের জিনোটাইপ SSYY

(2) 42টি ক্ষেত্রে মসৃণ হলুদ ও মসৃণ সবুজ বীজ পাওয়া যায় অর্থাৎ মসৃণ হলুদের জিনোটাইপ SSYy

(3) 47টি ক্ষেত্রে মসৃণ হলুদ ও কুঞ্চিত হলুদ বীজ পাওয়া যায় অর্থাৎ মসৃণ হলুদের জিনোটাইপ SsYY

(4) 43টি ক্ষেত্রে মসৃণ হলুদ, মসৃণ সবুজ, কুঞ্চিত হলুদ ও কুঞ্চিত সবুজ বীজ পাওয়া যায় অর্থাৎ মসৃণ হলুদের জিনোটাইপ SsYy।

3.23 ত্রিসংকর পরীক্ষা (Trihybrid cross)

তিন বা ততোধিক চরিত্রলক্ষণের ভিন্নতাযুক্ত মটর গাছের মধ্যে সংকরায়ণ পরীক্ষা করিয়া মেণ্ডেল যে ফলাফল পাইয়াছিলেন তাহাতেও স্বাধীন বিন্যাস সূত্রের সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যায়। ত্রিসংকর পরীক্ষায় তিনি নিম্নলিখিত বিপরীতধর্মী চরিত্র-লক্ষণগুলি নির্বাচন করিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন :—

1. বীজের আকৃতি মসৃণ বা গোল (প্রকট) বা কুঞ্চিত (প্রচ্ছন্ন)
2. বীজের বর্ণ হলুদ (প্রকট) বা সবুজ (প্রচ্ছন্ন)
3. ফুলের বর্ণ বেগুনী বা রক্তাভ (প্রকট) বা সাদা (প্রচ্ছন্ন)

প্রথম বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণের জিনোটাইপ দুইটি RR বা rr, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে YY বা yy এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে CC বা cc।

পরীক্ষা

ইতর পরাগযোগ
——→
মসৃণ, হলুদ বীজ ও বেগুনী ফুল × কুঞ্চিত, সবুজ বীজ ও সাদা ফুল
←——
ইতর পরাগযোগ

F_1 জনুতে প্রকট চরিত্রলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবে।

এইবার F_1 জনুর গাছে স্বপরাগযোগ ঘটান হইল এবং F_2 জনুতে মোট 8 প্রকার ফিনোটাইপ ও 27 প্রকার অনুমিত কিন্তু ঈপ্সিত জিনোটাইপ পাওয়া গেল।

a. 27টি মসৃণ, হলুদ, বেগুনী (জিনোটাইপ 8 প্রকার)
b. 9টি মসৃণ, হলুদ, সাদা (জিনোটাইপ 4 প্রকার)
c. 9টি মসৃণ, সবুজ, বেগুনী (জিনোটাইপ 4 প্রকার)
d. 9টি কুঞ্চিত, হলুদ, বেগুনী (জিনোটাইপ 4 প্রকার)

e. 3টি মসৃণ, সবুজ, সাদা (জিনোটাইপ 2 প্রকার)
f. 3টি কুঞ্চিত, হলুদ, সাদা (জিনোটাইপ 2 প্রকার)
g. 3টি কুঞ্চিত, সবুজ, বেগুনী (জিনোটাইপ 2 প্রকার)
h. 1টি কুঞ্চিত, সবুজ, সাদা (জিনোটাইপ 1 প্রকার)

চিত্র 3.12 মেন্ডেলকৃত ত্রিসংকর পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল।

F_1 সংকর জনু হইতে উৎপন্ন 8 প্রকার জনন কোষ, উহাদের মিলনে F_2 জনুর জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপসমূহ 3.12 চিত্রের মাধ্যমে দেখান হইল।

বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণের সংখ্যাসমূহ যত বেশী হইবে জনন কোষ সৃষ্টির সময় জনন কোষগুলির জীনগত বৈষম্যও তত বেশী হইবে। ইহার ফলে ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের বিন্যাসগত প্রকারভেদও বাড়িয়া যাইবে। বিপরীতধর্মী চরিত্রলক্ষণের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের বিন্যাসগত সংখ্যা বৃদ্ধি পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকে দেখান হইল—

বিপরীতধর্মী চরিত্র-লক্ষণের পার্থক্যের সংখ্যা	F_1 হেটারোজাইগাস জনু হইতে সৃষ্ট জনন কোষের শ্রেণী সংখ্যা	$F_1 \times F_1$ পরীক্ষায় উৎপন্ন F_2 জনুর বিন্যাসের শ্রেণী সংখ্যা	F_2 জনুতে জিনোটাইপের শ্রেণী সংখ্যা	F_2 জনুতে হোমোজাইগাস জিনোটাইপের শ্রেণী সংখ্যা	F_2 জনুতে হেটারোজাইগাস জিনোটাইপের শ্রেণী সংখ্যা	F_2 জনুতে পূর্ণ প্রকট ফিনোটাইপের শ্রেণী সংখ্যা
n	2^n	4^n	3^n	2^n	$3^n - 2^n$	2^n
1	$2^1 = 2$	$4^1 = 4$	$3^1 = 3$	$2^1 = 2$	$3^1 - 2^1 = 1$	$2^1 = 2$
2	$2^2 = 4$	$4^2 = 16$	$3^2 = 9$	$2^2 = 4$	$3^2 - 2^2 = 5$	$2^2 = 4$
3	$2^3 = 8$	$4^3 = 64$	$3^3 = 27$	$2^3 = 8$	$3^3 - 2^3 = 19$	$2^3 = 8$
4	$2^4 = 16$	$4^4 = 256$	$3^4 = 81$	$2^4 = 16$	$3^4 - 2^4 = 65$	$2^4 = 16$
5	$2^5 = 32$	$4^5 = 1024$	$3^5 = 243$	$2^5 = 32$	$3^5 - 2^5 = 211$	$2^5 = 32$
—						
—						
10	$2^{10} = 1,024$	$4^{10} = 1048576$	$3^{10} = 59049$	$2^{10} = 1024$	$3^{10} - 2^{10} = 58025$	$2^{10} = 1024$

3.24 একাধিক যুগল জীনের পারস্পরিক প্রভাব

একটি জীনের একের বেশী অ্যালিল থাকিতে পারে। এই অ্যালিলগুলি একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই হিসাবে একটি জীবের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বহুজীনের ক্রিয়া ও বিক্রিয়ার যোগফল মাত্র। সুতরাং মেণ্ডেলের তত্ব অনুযায়ী একক বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে সত্য হইলেও জীনতত্বীয় বিশ্লেষণে উহা সর্বদা সত্য নহে।

একটি ভ্রূণানু (Zygote) পরিস্ফুরণের বিভিন্ন দশা পরিক্রমা করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। ভ্রূণানু পরিস্ফুরণের ঘটনা প্রবাহকে এপিজেনেসিস (Epigenesis) বলে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোন জীন একক ভাবে কোন বৈশিষ্ট্য সচরাচর নির্ধারণ করে না যদিও বংশগতিতে ইহারা মেণ্ডেলের সূত্র অনুযায়ী জনিতৃ জনু হইতে অপত্য জনুতে পরিবাহিত হয়।

3.25 দুইটি যুগল জীনের পারস্পরিক প্রভাব

দ্বিসংকর পরীক্ষায় মেণ্ডেল এমন দুইটি যুগল জীন নির্বাচন করিয়াছিলেন যাহাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া অ্যালিল ছিল। ধরা যাউক প্রথম জীনটির দুইটি অ্যালিল হইল A এবং a এবং দ্বিতীয় জীনটির দুইটি অ্যালিল B এবং b এবং ইহারা ডিপ্লয়েড (Diploid = 2n) জীবে স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র পালন করে।

AaBb × AaBb এই হেটারোজাইগাস অবস্থায় স্বপরাগযোগ ঘটিলে মোট 9 প্রকার জিনোটাইপ 1/16 AABB : 2/16 AABb : 2/16 AaBB : 4/16 AaBb : 1/16 AAbb ; 1/16 aaBB : 2/16 Aabb : 2/16 aaBb : 1/16 aabb ছকে প্রদর্শিত অনুপাতে পাওয়া যাইবে। প্রতিটি যুগল জীন স্বাধীন বিন্যাস সূত্র পালন করিলে এবং কোন কারণে জিনোটাইপগুলি নষ্ট না হইলে উপরি-উক্ত অনুপাতের কোন পরিবর্তন হইবে না। জিনোটাইপের অনুপাত ফিনোটাইপের অনুপাত হইতে হিসাব করিয়া বাহির করিতে হয় কেননা ফিনোটাইপ দেখা যায় কিন্তু জিনোটাইপ দেখা যায় না। ইহা ছাড়াও একই প্রকার ফিনোটাইপের একাধিক প্রকার জিনোটাইপ হইতে পারে। ফলে ফিনোটাইপের অনুপাত সকল সময় জিনোটাইপের অনুপাতকে প্রতিফলিত করে না।

দুইটি যুগল জীনের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিলে উহাদের মধ্যে যে যে ফিনোটাইপ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহাদের অনুপাত সরণিতে দেখান হইয়াছে। পানেট স্কোয়ার (Punnet Square) বা চেকার বোর্ডে প্রতিটি জিনোটাইপ দেখান হইয়াছে। জিনোটাইপের ঘরগুলি 1—16 সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া জিনোটাইপগুলির সংযুক্তি দেখান হইয়াছে। ইহার পর যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে উহাদের জীনগুলি স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত কিন্তু ইহাদের ফিনোটাইপের অনুপাতে ভিন্নতা আসিয়াছে। ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

Aa Bb × Aa Bb

জনন কোষ → ↓	AB	Ab	aB	ab.
AB	AABB (1)	AABb (2)	AaBB (3)	AaBb (4)
Ab	AABb (5)	AAbb (6)	AaBb (7)	Aabb (8)
aB	AaBB (9)	AaBb (10)	aaBB (11)	aaBb (12)
ab	AaBb (13)	Aabb (14)	aaBb (15)	aabb (16)

3.26 একাধিক যুগলজীনের পারস্পরিক প্রভাব সংক্রান্ত উদাহরণ

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
উদাহরণ 1. উভয় যুগল জীনের সম্পূর্ণ প্রকটতা। বীজের বর্ণ হলুদ (A) সবুজের (a) উপর প্রকট; বীজের আকৃতি মসৃণ (B) কুঞ্চিতের (b) উপর প্রকট (মটর গাছ)	9/16	মসৃণ হলুদ	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13
	3/16	কুঞ্চিত হলুদ	6, 8, 14
	3/16	মসৃণ সবুজ	11, 12, 15
	1/16	কুঞ্চিত সবুজ	16
উদাহরণ 2. একটি যুগল জীন অন্য যুগল জীনের উপর আংশিক বা সম প্রকট। শিং বিহীন (A) শিং যুক্তের (a) উপর প্রকট; লাল লোম (B) সাদা লোমের (b) উপর প্রকট কিন্তু হেটারোজাইগাস দশায় রোয়ান (Roan) দশা প্রকাশ করে (গবাদি পশু)	6/16	শিংবিহীন, রোয়ান	2, 4, 5, 7, 10, 13
	3/16	শিংবিহীন, লাল	1, 3, 9
	3/16	শিংবিহীন, সাদা	6, 8, 14
	2/16	শিংযুক্ত রোয়ান	12, 15
	1/16	শিংযুক্ত লাল	11
	1/16	শিংযুক্ত সাদা	16

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
উদাহরণ 3.			
উভয় যুগল জীনের আংশিক	1/16	AAMM	1
বা সম প্রকটতা :	2/16	AAMN	2, 5
যুগল জীন (A) A এবং B	1/16	AANN	6
সম প্রকট	2/16	ABMM	3, 9
(ABO রক্তশ্রেণী)	4/16	ABMN	4, 7, 10, 13
যুগল জীন (B) M এবং N সম	2/16	ABNN	8, 14
প্রকট	1/16	BBMM	11
(M, MN, N রক্তশ্রেণী)	2/16	BBMN	12, 15
(মানুষের রক্তশ্রেণী)	1/16	BBNN	16
উদাহরণ 4.			
উভয় যুগল জীন পূর্ণ প্রকট।	9/16	ওয়াল নাট	1, 2, 3, 4, 5,
উভয় যুগল জীনে হোমো-			7, 9, 10, 13
জাইগাস প্রকট ও হোমোজাই-	3/16	গোলাপী	6, 8, 14
গাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আন্তঃ-	3/16	মটর	11, 12, 15
বিক্রিয়া ঘটে ও নূতন ফিনো-	1/16	একক	16
টাইপ উৎপন্ন হয়			
গোলাপ ঝুঁটি (A) অন্য ঝুঁটির (a) উপর প্রকট। মটর ঝুঁটি (B) অন্য ঝুঁটির (b) উপর প্রকট			
আন্তঃ-বিক্রিয়া—প্রকট গোলাপ ঝুঁটি ও প্রকট মটর ঝুঁটির মধ্যে আন্তঃ-বিক্রিয়ায় ওয়াল নাট বর্ণের ঝুঁটি উৎপন্ন হয়			
প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস গোলাপ ঝুঁটি ও মটর ঝুঁটির বিক্রিয়ায় একক ঝুঁটি উৎপন্ন হয়।			
(মোরগের ঝুঁটি)			
উদাহরণ 5.			
উভয় যুগল জীনের পূর্ণ			

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
প্রকটতা কিন্তু একটি হোমো-জাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অন্য যুগল জীনের ফিনোটাইপ প্রকাশে বাধা (Epistasis) দেয়।	9/16	অ্যাগাউটি	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13
ইঁদুরের বর্ণযুক্ত লোম (A) অ্যালবিনো (a) অবস্থার উপর প্রকট।	3/16	কালো	6, 8, 14
অ্যাগাউটি বর্ণ (B) কালো রঙের (b) উপর প্রকট আন্তঃ-বিক্রিয়া হোমোজাইগাস অ্যালবিনো অ্যাগাউটি ও কালো উভয় রঙ প্রকাশেই বাধা সৃষ্টি করে। (ইঁদুরের লোমের বর্ণ)	4/16	অ্যালবিনো	11, 12, 15, 16
উদাহরণ 6.			
উভয় যুগল জীনের পূর্ণ প্রকটতা কিন্তু উভয় জীনের	9/16	লাল	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13
হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অ্যালিল অন্য জীনের ক্রিয়ার উপর এপিস্টাসিস প্রকাশ করে। মটর ফুলের লাল রঙ (A) সাদার (a) উপর প্রকট, রঙ্গীন বর্ণ (B) বর্ণহীনতা (b) উপর প্রকট (মটর ফুলের রঙ)	7/16	সাদা	6, 8, 11, 12 14, 15, 16
উদাহরণ 7.			
উভয় যুগল জীনে পূর্ণ প্রকটতা কিন্তু একটি প্রকট জীন অপরটির প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে।	12/16	সাদা	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
সাদা (A) রঙ্গীনের (a) উপর প্রকট। হলুদ (B) সবুজের (b) উপর প্রকট।	3/.6	হলুদ	11, 12, 15
আন্তঃক্রিয়া – প্রকট সাদা, হলুদ ও সবুজ রংয়ের প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। (গ্রীষ্মকালীন স্কোয়াস ফুলের রং)	1/.6	সবুজ	16
উদাহরণ 8.			
উভয় যুগল জীনে পূর্ণ প্রকটতা কিন্তু উভয় জীনের প্রকট অ্যালিল অন্যের প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে।			
ত্রিকোণাকৃতি ক্যাপসুল (A) ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুলের (a) প্রকট।			
ত্রিকোণাকৃতি ক্যাপসুল (B) ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুলের (b) উপর প্রকট। [বারসার (Bursar) বীজের ক্যাপসুল (Capsule)]	15/16 1/16	ত্রিকোণাকৃতি ডিম্বাকৃতি	1—15 16
উদাহরণ 9.			
উভয় যুগল জীনে পূর্ণ প্রকটতা কিন্তু একটি প্রকট জীন অন্য প্রকট জীনের প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে আবার দ্বিতীয় জীনটি হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটির প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে।	13/16 3/16	সাদা রঙ্গীন	1—10, 13, 14, 16 11, 12, 15
বর্ণ নিরোধক (A) বর্ণযুক্তর (a) উপর প্রকট।			

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
রঙ্গীন (B) সাদা (b) এর উপর প্রকট। (মোরগের পালকের রঙ)			
উদাহরণ 10. উভয় যুগল জীনে পূর্ণ প্রকটতা কিন্তু উভয় প্রকট জীনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে নূতন ফিনোটাইপ।	9/16	চ্যাপ্টা	1—5, 7, 9, 10, 13
গোল আকৃতি (A) লম্বা আকৃতির (a) উপর প্রকট।	6/16	গোল	6, 8, 11, 12, 14, 15
গোল আকৃতি (B) লম্বা আকৃতি (b) এর উপর প্রকট। A এবং B এই দুই প্রকট অ্যালিল এক সঙ্গে উপস্থিত থাকিলে আন্তঃক্রিয়ায় চ্যাপ্টা আকার। (গ্রীষ্মকালীন স্কোয়াস ফল)	1/6	লম্বা	16
উদাহরণ 11. একটি যুগল জীনে পূর্ণ প্রকটতা অন্য যুগল জীনে আংশিক প্রকটতা। প্রথম জীন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় দ্বিতীয় জীনের উপর এপিস্টাসিস ঘটায়।	7/16	মসৃণ	1, 3, 9, 11, 12, 15, 16
এলোমেলো লোম (A) মসৃণের (a) উপর প্রকট।	6/16	আংশিক মসৃণ	2, 4, 5, 7, 10, 13
জীন (B) এলোমেলো লোমকে মসৃণ হইতে প্রভাবিত করে। (গিনিপিগের লোমের সজ্জা)	3/16	এলোমেলো	6, 8, 14
উদাহরণ 12. একটি যুগল জীনে পূর্ণ প্রকটতা			

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
অন্যটিতে আংশিক প্রকটতা। যে কোন জীন প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস অবস্থায় অন্যের উপর এপিস্টাসিস ঘটায়। যখন উভয় জীন প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস তখন প্রথম জীন দ্বিতীয় জীনের উপর এপিস্টাসিস ঘটায়।	6/16	হালকা কালো (ঝুল)	12, 4, 5, 7, 0, 13
	3/16	লাল	1, 3, 9
	3/16	গাঢ় কালো	11, 12, 15
	4/16	কালো	6, 8, 14, 16
স্বাভাবিক লাল রং (A) গাঢ় কালো (a) রঙের উপর প্রকট। স্বাভাবিক লাল রং (B) কালো রংয়ের (b) উপর আংশিক প্রকট। কালো হেটারোজাইগাস অবস্থায় হালকা কালো (ঝুল রং) দেখায় (গমের পোকা—ট্রাইবোলিয়াম *Tribolium*)			
উদাহরণ 13.			
একটি যুগল জীনে আংশিক প্রকটতা। আংশিক প্রকট হেটারোজাইগাস এবং অন্য জীনের প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস একই ফিনোটাইপ সৃষ্টি করে।	7/16	ঝুল কালো	2, 4, 5, 7, 10, 11, 13
	4/16	কালো	6, 8, 14, 16
স্বাভাবিক লাল রং (A) হালকা কালোর (a) উপর পূর্ণ প্রকট স্বাভাবিক লাল রং (B) কালো রংয়ের (b) আংশিক প্রকট।	3/16	লাল	1, 3, 9
কালো হেটারোজাইগাস অবস্থায় হালকা কালো (ঝুল কালো) হয় এবং হালকা কালো (ঝুল কালো) হোমোজাইগাস অবস্থায় মিলিত হইয়া গাঢ় ঝুল কালো ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে। (গমের পোকা ট্রাইবোলিয়াম *Tribolium*)	2/16	গাঢ় ঝুল কালো	12, 15

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যুগল জীন	F_2 জনুতে সম্ভাব্য অপত্য অনুপাত	ফিনোটাইপ	ছকের মধ্যে জিনোটাইপ নির্দেশক ঘর
উদাহরণ 14			
উভয় জীনের ক্ষেত্রে আংশিক প্রকটতা। প্রতিটি আংশিক প্রকট জীন মিলিত হইলে নূতন ফিনোটাইপ উৎপন্ন হয়। লাল রং (A) সাদা রংয়ের (a) উপর আংশিক প্রকট। (A) জীনের সংখ্যাবৃদ্ধি ফিনোটাইপ পরিবর্তন করে। লাল রং (B) সাদা রং (b) এর উপর আংশিক প্রকট। প্রতিটি B জীনের সংখ্যাবৃদ্ধিতে রংয়ের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন হয়। (মটর গাছের ফুলের রং)	1/16 AABB	লাল (10)	1
	2/16 AABb	লাল (8)	2, 5
	2/16 AaBB	লাল (7)	3, 9
	1/16 AAbb	লাল (6)	6
	4/16 AaBb	লাল (5)	4, 7, 10, 13
	1/16 aaBB	লাল (4)	11
	2/16 Aabb	লাল (3)	8, 14
	2/16 aaBb	লাল (2)	12, 15
	1/16 aabb	সাদা (0)	16
		বন্ধনী মধ্যস্থ সংখ্যাগুলি লাল রঙের তীব্রতা নির্দেশক	

ব্যাখ্যা : দ্বিসংকর পরীক্ষায় পাওয়া উপরি-উক্ত উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ পাওয়া যায়—

A. যখন প্রতিটি যুগল জীন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রলক্ষণ প্রকাশ করে

a. আদর্শ অনুপাত (উদাহরণ 1)—মটর গাছ লইয়া মেণ্ডেল দ্বিসংকর পরীক্ষায় যে অনুপাত (9 : 3 : 3 : 1) পাইয়াছিলেন তাহাকে আদর্শ অনুপাত বলা যায়। এই অনুপাত কি ভাবে আসে এবং প্রতিটি বীজের জিনোটাইপ কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহা দ্বিসংকর পরীক্ষা ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে।

b. আংশিক সমপ্রকটতা এবং ফিনোটাইপের অনুপাত (উদাহরণ 2)—আংশিক সমপ্রকটতা থাকিলে হেটারোজাইগাস জিনোটাইপ বিভিন্ন প্রকারের ফিনোটাইপ প্রকাশ করে। দুইটি যুগল জীনের একটির বা উভয়ের ক্ষেত্রে আংশিক বা সমপ্রকটতা থাকিলে ফিনোটাইপসমূহের অনুপাত আদর্শ অনুপাত থাকে না।

লাল বর্ণের (RR) লোমযুক্ত গবাদি পশুর সহিত সাদা বর্ণের (rr) লোমযুক্ত গবাদি পশুর সংকরায়ণ করিলে—হেটারোজাইগাস (Rr) F_1 জনুতে লোমের বর্ণ লাল ও সাদার মাঝামাঝি বা রোয়ান (Roan) হয়। এক্ষেত্রে R আংশিক প্রকট। শিংবিহীন (Polled) অবস্থা শিংযুক্ত (Horned) অবস্থার উপর প্রকট। হেটারোজাইগাস রোয়ান ও হেটারোজাইগাস শিংবিহীন গবাদি পশুর মধ্যে সংকরায়ণ

করিলে F_2 জনুতে আদর্শ অনুপাত না হইয়া অনুপাত হইবে 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1। সরণিতে প্রদত্ত উদাহরণ 2 অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে শিংবিহীন ও শিংযুক্তের অনুপাত 3 : 1 কিন্তু লাল, রোয়ান ও সাদার অনুপাত যথাক্রমে 1 : 2 : 1।

c. সমপ্রকটতার ক্ষেত্রে (উদাহরণ 3)—মানুষের রক্তের দুইটি অন্যতম শ্রেণী হইল ABO এবং MN। ABO শ্রেণীর রক্তের ক্ষেত্রে A এবং B উভয়ে উভয়ের উপর সমপ্রকট। অনুরূপভাবে M ও N পরস্পরের উপর সমপ্রকট। হেটারোজাইগাস (ABMN × ABMN) অবস্থায় সংকরায়ণ ঘটাইলে 9 প্রকার ফিনোটাইপ পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের শ্রেণী ও অনুপাত একই হইবে। এই অনুপাত 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1। এই ফলাফল হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে প্রতিটি জিনোটাইপ সুনির্দিষ্ট ফিনোটাইপ প্রকাশ করে এবং সমপ্রকটতার ক্ষেত্রে হেটারোজাইগাস অবস্থার ফিনোটাইপ হোমোজাইগাস অবস্থার ফিনোটাইপ হইতে পৃথক।

B. যখন প্রতিটি যুগল জীন একই চরিত্রলক্ষণের প্রকাশকে প্রভাবিত করে।

সম্পূর্ণ নূতন ফিনোটাইপ (উদাহরণ 4)—কোন বৈশিষ্ট্য দুই বা ততোধিক যুগল জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে নানা অনুপাতে ফিনোটাইপ পাওয়া যায়। এই অনুপাত বিভিন্ন যুগল জীনের পারস্পরিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি ও বিক্রিয়ার প্রখরতার উপর নির্ভর করে। মোরগের ঝুঁটির ক্ষেত্রে এইরূপ একটি নূতন ফিনোটাইপের আবির্ভাব বেটসন ও পানেটের পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে জানা গিয়াছে। মোরগের ঝুঁটি একাধিক প্রকারের হয় এবং ইহারা প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা যুগল জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মোরগের গোলাপ ফুলের ন্যায় ঝুঁটি একক (Single) ঝুঁটির উপর প্রকট। আবার মটরশুঁটির ন্যায় ঝুঁটিও একক ঝুঁটির উপর প্রকট। হেটারোজাইগাস গোলাপ ঝুঁটি ও মটর ঝুঁটির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে ওয়ালনাট (Walnut) ঝুঁটির (নূতন ফিনোটাইপ) উদ্ভব হয়। তবে ওয়ালনাট ঝুঁটির উদ্ভব তখনই হয় যখন প্রকট জীনগুলি একত্রে থাকে। এইক্ষেত্রে চারিপ্রকার ফিনোটাইপ পাওয়া যায় এবং উহাদের অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1। এই পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে ইহা প্রমাণিত যে দুইটি প্রকট যুগল জীনের আন্তঃক্রিয়ায় নূতন ফিনোটাইপ সৃষ্টি হইতে পারে।

C. **যুগল জীন কর্তৃক অন্য যুগল জীনকে অপ্রকাশিত রাখা** (উদাহরণ—5) বা এপিস্টাসিস (Epistasis)। সাধারণ অবস্থায় একটি প্রকট অ্যালিল উহার প্রচ্ছন্ন অ্যালিলকে অপ্রকাশিত রাখে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি জীন উহার অ্যালিল নহে এইরূপ জীনকে অপ্রকাশিত রাখে। এই ঘটনাকে এপিস্টাসিস বলে।

ইঁদুরের স্বাভাবিক লোমের বর্ণ ধূসর বা অ্যাগাউটি (Agouti)। লোমের স্তরে স্তরে ধূসর রঞ্জক সজ্জিত থাকে। একাধিক জীন এই বর্ণের পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে। এই জীনগুলির মধ্যে একটি জীনের ক্রিয়া খুব স্পষ্ট। এই জীনের অ্যালিল

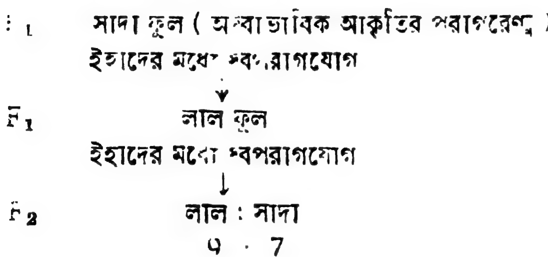
হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিলে ইঁদুরের গাত্রবর্ণ অ্যালবিনো (Albino) হয়, অন্য বর্ণ নিয়ন্ত্রকের উপস্থিতি ইহাদের কার্যকে ব্যাহত করে না।

আলোচ্য উদাহরণে AaBb জনিতা অ্যাগাউটি বর্ণের। কিন্তু উহাদের অপত্যদের ক্ষেত্রে যেখানে A জীন প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস অবস্থায় (aa) রহিয়াছে (11, 12, 15 এবং 16 সংখ্যক ঘর) সেখানে B জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যাগাউটি অথবা কালোবর্ণ কখনই প্রকাশ পায় না। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে (i) একটি যুগল জীন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়াও অন্য প্রকট জীনের হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস দশাকে অপ্রকাশিত রাখিতেছে ; (ii) এবং একটি প্রকট জীন অন্য একটি প্রকট জীনকে অপ্রকাশিত রাখিতেছে (A, B জীনের প্রকাশে বাধাস্বরূপ)।

A জীন B জীনের সহিত এপিস্টাসিস সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এক্ষেত্রে অ্যাগাউটি : কালো : অ্যালবিনোর অনুপাত 9 : 3 : 4 হইয়াছে।

D. একটি যুগল জীন অন্য একটি যুগল জীনের ক্রিয়ার পরিপূরক (উদাহরণ—6) বা পরিপূরক এপিস্টাসিস

বেটসন ও পানেট পরাগরেণুর আকৃতির বংশগতি অনুসরণ করিয়া নিম্নোক্ত ফল পান—



P₁ সাদা ফুল (অস্বাভাবিক আকৃতির পরাগরেণু)
ইহাদের মধ্যে স্বপরাগযোগ
↓
F_1 লাল ফুল
ইহাদের মধ্যে স্বপরাগযোগ
↓
F_2 লাল : সাদা
9 : 7

এই ক্ষেত্রে ফুলের রঙ দুইটি যুগল জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ইহারা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র অনুসরণ করে। দুইটি যুগল জীনের যে কোনটির হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন দশা সাদা ফুলের সৃষ্টি করে। এবং উভয় যুগল জীনের প্রকট অ্যালিল দুইটি পরিপূরকভাবে লাল রং সৃষ্টি করে।

E. প্রকট অ্যালিল কৃত এপিস্টাসিস (উদাহরণ—7)

গ্রীষ্মকালীন স্কোয়াশ ফলের (Summer Squash = *Cucurbita pepo*) সাদা রঙ একটি প্রকট জীন (A) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার উপস্থিতি অন্য সকল প্রকার রঙের প্রকাশকে বাধা দেয়। যদি সাদা রঙের জন্য দায়ী জীনকে A দ্বারা এবং হলুদ রঙকে B দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তবে AABB জিনোটাইপের ফিনোটাইপ অবশ্যই সাদা হইবে এবং aaBB জিনোটাইপের ফিনোটাইপ হইবে হলুদ। এইরূপ সাদা ও হলুদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিলে F_1 জনুতে যে হেটারোজাইগাস গাছ হইবে তাহাতে সাদা ফল ফলিবে। F_1 জনুর হেটারোজাইগাস গাছের মধ্যে স্বপরাগ যোগ ঘটিলে

F_2 জনুতে প্রাপ্ত A যুক্ত সকল ফলের রং সাদা হইবে। বাকি জিনোটাইপগুলির ক্ষেত্রে ফল রঙীন হইবে। অর্থাৎ প্রকট সাদা রঙ হলুদ বা সবুজ রং প্রকাশে বাধা দেয়।

F. প্রকট অ্যালিলকৃত এপিস্টাসিস একটিমাত্র যুগল জীনে সীমাবদ্ধ থাকে না (উদাহরণ—8)

দুইটি যুগল জীন একটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করিলে উভয় জীনের প্রকট অ্যালিল দুইটি পরস্পর পরস্পরের উপর এপিস্টাসিস জনিত প্রভাব বিস্তার করে। বৈজ্ঞানিক শাল (Shull), বারসা (Bursa) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। এই উদ্ভিদের বীজের বহিরাবরণের (Capsule) আকৃতি দুইটি যুগল জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ A ও B প্রত্যেকেই প্রকট এবং উভয়েই ত্রিকোণাকৃতি ক্যাপসুল সৃষ্টি করে—পক্ষান্তরে a ও b প্রচ্ছন্ন এবং ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুল সৃষ্টি করে। এই প্রকটতা অপর জীন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন হইলেও দেখা যায়। হেটারোজাইগাস ত্রিকোণাকৃতিদের (AaBb) মধ্যে স্বপরাগযোগ করাইলে F_2 জনুর 1/16 অংশে ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুল পাওয়া যাইবে। এই ফলাফল হইতে দেখা যাইতেছে যে কোন যুগল জীনের প্রকট অ্যালিল ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুলের উপর প্রকট।

G. মিশ্রভাবে প্রকাশিত এপিস্টাসিস (উদাহরণ—9)

এপিস্টাসিস মিশ্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে। একটি যুগল জীনের প্রকট অ্যালিল ও অন্য যুগল জীনের হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন দশা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মোরগের পালকের রঙ দুইটি যুগল জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি যুগল জীনের প্রকট অ্যালিল A রং প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে এবং অন্য যুগল জীন B হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন হইলেও রং প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়।

AaBb × AaBb. সংকরায়ণে A জীনের উপস্থিতির জন্য 12/16 অংশে, aa জীনের উপস্থিতির জন্য 1/16 অংশে কোন রঙ পাওয়া যাইবে না কিন্তু যাহাদের জিনোটাইপ aaBB, aaBb হইবে অর্থাৎ বাকী 3/16 অংশে রঙ দেখা যাইবে। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রকট বর্ণ নিরোধক ও প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস বর্ণ নিরোধক উভয়েই বর্ণ প্রকাশে বাধা দান করে। অর্থাৎ প্রকট বর্ণ নিরোধক জীনের অনুপস্থিতিতেও বর্ণহীন ফিনোটাইপ হইতে পারে।

H. রূপান্তরিত ফিনোটাইপ (উদাহরণ—10)

গ্রীষ্মকালীন স্কোয়াশের (*Cucurbita pepo*) ফলের আকৃতি একাধিক যুগল জীন নিয়ন্ত্রণ করে। জীন A এবং জীন B প্রত্যেকেই প্রকট ডিম্বাকৃতি স্কোয়াশ ফল ও জীন a এবং b, প্রত্যেকেই প্রচ্ছন্ন লম্বাকৃতি স্কোয়াশ ফল সৃষ্টি করে। P_1 জনুতে ডিম্বাকৃতি AAbb এবং ডিম্বাকৃতি aaBBর মধ্যে সংকরায়ণ করিলে F_1 জনুতে চ্যাপ্টাকৃতি বিশিষ্ট (AaBb) স্কোয়াশ ফল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটাইলে 9/16 চ্যাপ্টা ; 6/16 ডিম্বাকৃতি ও 1/16 লম্বাকৃতি স্কোয়াশ ফল

পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে রূপান্তরিত ফিনোটাইপ (9/16) পাওয়া যায় এবং ইহা আন্তঃক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

I. একটি যুগল জীনে অসম্পূর্ণ প্রকটতা (উদাহরণ—11, 12, 13)

1 হইতে 10 পর্যন্ত উদাহরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে আন্তঃজীন ক্রিয়ার প্রতি যুগল জীনেরই একটি করিয়া প্রকট অ্যালিল আছে। 11, 12, 13 এই তিনটি উদাহরণ হইতে ইহা প্রমাণিত যে সম্পূর্ণ প্রকটতা কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম পালন করে না। বহু দৃষ্টান্ত হইতে ইহা প্রতিপন্ন করা যায়।

গিনিপিগের দেহের কুঞ্চিত লোম (A), মসৃণ লোম (a) এর উপর প্রকট। অন্য যুগল জীনের প্রকট অ্যালিল (B) কুঞ্চিত লোম (A) কে মসৃণ লোমে রূপান্তরিত করিতে পারে কিন্তু মসৃণ হোমোজাইগাসকে (aa) কুঞ্চিত করিতে পারে না। B যুগল জীন অসম্পূর্ণ প্রকট হওয়ায় জিনোটাইপ A-BB মসৃণ, A-bb কুঞ্চিত এবং A-Bb উপরি-উক্ত দুইয়ের মাঝামাঝি ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে।

J সংযোজিত ফল (Additive effect)

একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক দুইটি যুগল জীনের মধ্যে অসম্পূর্ণ প্রকটতা থাকিলে আন্তঃবিক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্যটির প্রকাশে ভিন্নতা আসে। একটি অ্যালিল বৈশিষ্ট্যটির একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য অংশের নিয়ন্ত্রণ ঘটায় (যথা—অ্যালিল $a=0$, $A=3$, $b=0$, $B=2$)। এই সকল পরিমাপযোগ্য নিয়ন্ত্রণের ঘটনাকে সংযোজিত ফল বলা হয়। অ্যালিলগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার যোগফল দ্বারা এই সকল ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ প্রকাশিত হয়। যেমন অ্যালিল—

$$\{ A+a+B+b=3+0+2+0=5=\text{রংয়ের ঘনত্ব} \}$$

মেন্ডেল লাল ফুলযুক্ত মটর গাছের সহিত সাদা ফুলযুক্ত গাছের বিপরীত পরাগ যোগ ঘটাইয়া F_1 জনুতে যে সকল মটর গাছ পাইয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকটি গাছেই লাল ফুল ফুটিত।

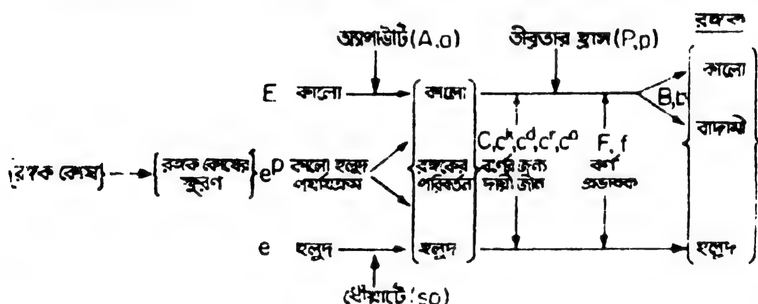
কিন্তু F_1 জনুর সংকর লাল ফুলযুক্ত মটর গাছের মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটাইয়া F_2 জনুতে যে যে 32টি গাছ পাইয়াছিলেন তাহাদের একটিমাত্র গাছে সাদা ফুল হইয়াছিল। বাকি 31টি গাছে গাঢ় হইতে হালকা পর্যন্ত বিভিন্ন তীব্রতার লাল ফুলযুক্ত গাছ হইয়াছিল। লাল রংয়ের এই বিভিন্ন প্রকাশকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মেন্ডেল বলিয়াছিলেন দুই বা দুইয়ের অধিক যুগল জীন এই লাল রংয়ের ভিন্নতার জন্য দায়ী। প্রতিটি অ্যালিলের জন্য পরিমাপযোগ্য মান ধার্য করিয়া F_2 জনুতে পাওয়া ফলাফলের ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য (সরণি দ্রষ্টব্য)।

3.27 দুইয়ের অধিক যুগল জীনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া

সুদীর্ঘ এবং ধারাবাহিক জৈব প্রক্রিয়ার ফলে একটি জীবের দৃশ্যমান এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এই জৈব ক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা সম্ভব

হইয়াছে। বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে একটি অভীষ্ট লক্ষ্যপথে পৌঁছানোর জন্য জৈব বিক্রিয়াগুলি ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। প্রতিটি বিক্রিয়া এবং বিক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ সুনির্দিষ্ট জীন নিয়ন্ত্রণ করে। গিনিপিগের লোমের বর্ণ একটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বহু জীন অংশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ গিনিপিগের লোমের যে বিভিন্ন বর্ণ হয় তাহার জন্য অনেক জীন দায়ী। এই জীনগুলির আন্তঃক্রিয়ার ফলে লোমের বর্ণের বৈচিত্র্য দেখা যায়। সুয়েল রাইট (Sewell Wright) এবং তাহার সহকর্মীগণ 50 বৎসর ধরিয়া অনলস গবেষণার মাধ্যমে গিনিপিগের লোমের বর্ণ নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন জীন ও উহাদের অ্যালিলসমূহ সনাক্ত করিয়াছেন। জীনসমূহ ও উহাদের অ্যালিলগুলি নিম্নোক্ত রূপ—

1. সম্পূর্ণ কালো (EE), অ্যালিল হলুদ (ee)
2. *অ্যাগাউটি (AA), অ্যালিল অ্যাগাউটি নয় (aa)
3. কালো (BB), অ্যালিল খয়েরী (bb)
4. রং হালকা হয় না (CC), অ্যালিল (c^d, c^a, c^k, c^r) রং হালকা হয়
5. রংয়ের ঘনত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকে (PP), অ্যালিল (pp) খয়েরী কিন্তু গাঢ়ত্ব হ্রাস পায়।
6. ছাপবিহীন (SS), ছাপযুক্ত (ss), কখনও কখনও (Ss) ছাপযুক্ত
7. চকচকে নয় (SiSi), চকচকে (sisi)



চিত্র 3.13 সুয়েল রাইট ও তাঁহার সহকর্মীগণ গিনিপিগের লোমের বর্ণ নির্ধারক বিভিন্ন জীন সনাক্ত করিয়াছেন। নির্ধারক জীনসমূহ ও উহাদের অ্যালিলগুলির আন্তঃক্রিয়ায় কিভাবে লোমের বর্ণ গঠিত হয় দেখান হইয়াছে; বামে আরম্ভ (রঞ্জক কোষ) দক্ষিণে সমাপ্তি।

গিনিপিগের লোমের বর্ণের নির্ধারক জীনসমূহ ও উহাদের অ্যালিলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া এই কথা প্রমাণ করে যে পারস্পরিক ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল (চিত্র 3.13)।

3.28 বহুজীন ঘটিত বংশগতি (Polygenic inheritance)

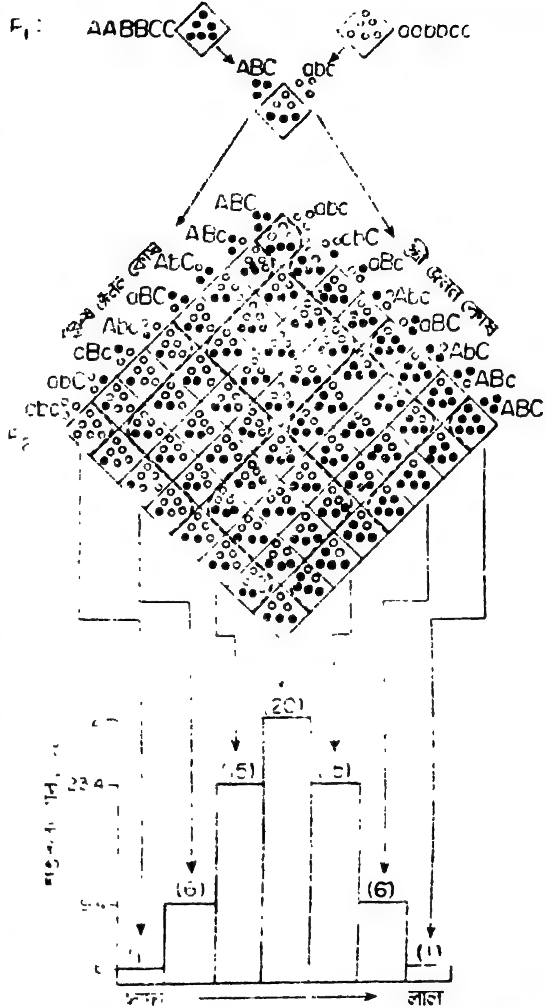
একটি বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট কোন জীন ও উহার অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় দুই বা ততোধিক যুগলজীন একটি বৈশিষ্ট্যকে সম্মিলিতভাবে

* অ্যাগাউটি = ধূসর ও হলুদডোরা যুক্ত; অ্যাগাউটি নয় = ধূসর কিন্তু হলুদডোরা বিহীন।

নির্ধারিত করে। প্রতিটি জীন ও তাহার অ্যালিল উক্ত ফিনোটাইপের আংশিক প্রকাশ ঘটায়। সকল জীনের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে উক্ত ফিনোটাইপ সকলভাবে প্রকাশ পায়। এই প্রক্রিয়াকে বহুজীন ঘটিত বংশগতি বলে।

মেণ্ডেল সাদা ও লাল (Purple) ফুলের মটর গাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইয়া সাদা, লাল এবং লালের গাঢ়ত্বের পরিমাণগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া নানা ধরনের লাল রংয়ের ফুল পাইয়াছিলেন। আগেই বলা হইয়াছে যে এই বৈশিষ্ট্যটি দুইটি আংশিক প্রকট জীন যুগল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বহুজীন ঘটিত বংশগতিতে সাধারণত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত পার্থক্য প্রকাশ পায়। বহুজীন ঘটিত বংশগতির নির্ধারক যুগল জীনগুলির প্রত্যেকটি উহাদের অ্যালিলের সহিত প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্কযুক্ত অথবা আংশিক প্রকট সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে।



চিত্র 3.14 বহুজীন ঘটিত বংশগতি—গমের শস্যের রং প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্কযুক্ত তিনটি যুগল জীন দ্বারা নির্ধারিত হয়। গাঢ় লাল (AA BB CC) ও সাদা (aa bb cc) রং যুক্ত গমের মধ্যে সংকরায়ণ করিয়া F_2 জনুতে প্রাপ্ত শস্য উৎপাদক সংখ্যা। হিস্টোগ্রামে (Histogram) রঙের তীব্রতার শতকরা হার দেখানো হইয়াছে।

গমের শস্যের রং তিনটি যুগল জীন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ধরা যাউক এই তিনটি যুগল জীনের প্রত্যেকটির প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্কযুক্ত দুইটি করিয়া অ্যালিল আছে এবং ইহাদের যথাক্রমে Aa, Bb, Cc

দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। সশ্যের লাল রং সাদার উপর প্রকট অর্থাৎ A,B,C হোমোজাইগাস অবস্থায় লাল রংয়ের সৃষ্টি করে ; a,b,c হোমোজাইগাস অবস্থায় সাদা রং নির্ধারণ করে। প্রতিটি যুগল জীন পৃথগীভবন সূত্রানুযায়ী 3 লাল (A—) : 1 সাদা (aa) অনুপাতে অপত্য জনু উৎপন্ন করে। যখন দুইটি যুগল জীনে (AaBb × AaBb) ক্রস ঘটান হয় তখনও প্রতি 16টির মধ্যে 15টি লাল বীজ (A—B—, A—bb, aaB—) এবং 1টি সাদা (aabb) বীজ উৎপন্ন হয়। এইরূপভাবে তিনটি জীন যুগলের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে প্রতি 64টি সশ্যের 63টি লাল ও 1টি সাদা হয়। A, B বা C ইহাদের যে কোনটি একই রকম বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে কারণ প্রত্যেকটি একই ভাবে কার্যকরী হয়।

উপরের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় যে লাল ফিনোটাইপ, জিনোটাইপের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন হইবে অর্থাৎ লাল রংয়ের গাঢ়ত্বের তারতম্য ঘটিবে। ছকের সাহায্যে এই বহুজীন ঘটিত বংশগতির বিভিন্ন প্রকার জিনোটাইপ ও তাহার ফিনোটাইপের পরিমাণগত পার্থক্য ও অনুপাত দেখান হইয়াছে। এখানে দেখানো হইয়াছে যে তিনটি জীন যুগলই স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র অনুসারে বিন্যস্ত হয় এবং উহাদের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় যে চরম মান যুক্ত ফিনোটাইপের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। বর্ণহীন (aa bb cc) এবং গাঢ়তম লাল (AA BB CC) সর্বাপেক্ষা কম (চিত্র 3.14)।

তবে বহুজীন ঘটিত বংশগতির বহুক্ষেত্রে প্রতিটি যুগল জীনকে পৃথকভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না কারণ প্রতিটি যুগল জীনের ক্রিয়া এতই নগণ্য যে তাহাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। মরথারের মতানুযায়ী বহুজীন (Polygene) তাহাদেরই বলা যায় যাহারা কোন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে কিছু না কিছু ক্রিয়া করে এবং পরস্পরের প্রতিপূরক হিসাবে কার্য করিয়া ইহারা সম্মিলিতভাবে পরিমাণগত ও সনাক্তযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি করে।

বহুজীন ঘটিত বংশগতির ক্ষেত্রেও অন্যান্য জীনের মত পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। এইজন্য নানাভাবে পরিমাণগত ও অনুপাতগত বৈষম্য দেখা যায়।

3·29 প্রভাবক জীন

অনেক সময় একটি জীনের ফিনোটাইপের পরিমাণগত প্রকাশ যথাযথ হয় না। ইহার কারণ হিসাবে বলা হয় যে প্রতি জীবের দেহে কিছু জীন থাকে যাহারা অন্য জীনের ফিনোটাইপ প্রকাশকে পরিমাণগত ভাবে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত জীনকে প্রভাবক জীন বলা হয়। প্রভাবক জীন অসংখ্য কিন্তু ইহাদের সকলের ক্রিয়াপদ্ধতি সঠিক ভাবে নিরূপিত হয় নাই।

ইতিপূর্বে যে সকল জীন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে উহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রভাবক জীনরূপে ক্রিয়াশীল। গিনিপিগের ক্ষেত্রে লোমের রঙের

গাঢ়ত্বের সহিত সম্পর্কিত একটি প্রভাবক জীন ধূসর (Sooty), লোমের রঙের গাঢ়ত্ব কমাইয়া বা বাড়াইয়া বর্ণ নিয়ন্ত্রক জীনের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ঠিক একই ভাবে মুরগীর ক্ষেত্রে একটি বর্ণ নিরোধক (Inhibitor) জীন মুরগীর পালকের রং নিয়ন্ত্রক জীনের ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিয়া রঙের প্রকাশকে প্রভাবিত করে।

অনেক সময় মিউটেশন জাত (Mutation) অ্যালিলের ক্ষেত্রে প্রভাবক জীন উপস্থিত থাকে। এই প্রভাবক জীন কোন কোন ক্ষেত্রে মিউটেশনজাত জীনের ফিনোটাইপ প্রকাশকে নিবারিত করে। এইক্ষেত্রে প্রভাবক জীনটিকে সাপ্রেসার (Supressor) বা নিরোধক জীন (su) বলা হয়। ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে su-Hw জীন এইরূপ একটি নিরোধক জীন। ইহা মিউটেশন জাত জীন Hw (Hairy wing)-এর প্রকাশকে আড়াল করে। Hw জীন ছাড়াও su-Hw জীন f (Forked Bristle) জীন, Ci (Cubitus interruptus) ইত্যাদি জীনের প্রকাশকে আড়াল করে। su-S জীন ড্রসোফিলার মিউটেশন জাত S (Star) জীনের প্রকাশে বাধা দেয়।

প্রভাবক জীন প্রকট বা প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার হইতে পারে। প্রভাবক জীন ফিনোটাইপ প্রকাশকে পরিমাণগতভাবে বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিতে পারে। ইঁদুরের লোমের বর্ণে সাদা ছাপ হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বহুসংখ্যক অল্প প্রভাব সম্পন্ন প্রভাবক জীন একত্রে সম্পূর্ণ সাদা লোম উৎপন্ন করিতে পারে। এইক্ষেত্রে প্রভাবক জীন ফিনোটাইপকে পরিমাণগতভাবে বাড়াইয়া (Enhance) দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবক জীন কোন একটি জীন প্রকট হইবে না প্রচ্ছন্ন হইবে তাহাও নির্ধারণ করে। ফোর্ড (Ford) এব্রাক্সাস গ্রাসুলারিয়েটা (*Abraxas grassulariata*) নামক মথের ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা এই ঘটনা প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ মথের L (Lutea) জীন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকিলে স্বাভাবিক সাদা রঙের পরিবর্তে হলুদ বর্ণের ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে। কিন্তু হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকিলে সাদা ও হলুদের মাঝামাঝি বা হালকা হলুদ ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে। পর পর চারিটি জনুতে হলুদ ও হালকা হলুদ আলাদা ও জীনগতভাবে চয়ন করিয়া দেখা গিয়াছে যে L জীন হলুদের ক্ষেত্রে প্রকট কিন্তু হালকা হলুদের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন হিসাবে ক্রিয়া করিয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বর্ধক ও নিরোধক জীন L জীনকে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন করিয়াছে।

3.30 মারণ প্রভাব (Lethality)

সাধারণতঃ কোন জীন ও তাহার অ্যালিল কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপ-গত বৈষম্য সৃষ্টি করে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন জীনের অ্যালিল ফিনোটাইপগত বৈষম্য সৃষ্টির পরিবর্তে জীবের মৃত্যু ঘটায়। যে সকল অ্যালিলের জন্য জীবের মৃত্যু ঘটে তাহাদের মারণ জীন বা Lethal gene বলে।

ফরাসী জীনতত্ত্ববিদ ক্যুনো (Cuenot) ইঁদুরের গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যালিল-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। আমরা জানি ইঁদুরের লোমের হলুদ বর্ণ লোমের অ্যাগাউটি বর্ণের উপর প্রকট। বিশেষ একটি ইঁদুর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিতরূপে পরীক্ষা করেন—

	প্রথম পরীক্ষা	দ্বিতীয় পরীক্ষা
P_1	হলুদ × হলুদ ↓	হলুদ × অ্যাগাউটি ↓
F_1	হলুদ ও অ্যাগাউটি ♂ × ♀	হলুদ : অ্যাগাউটি (1 : 1)
F_2	হলুদ ও অ্যাগাউটি ♂ × ♀	
F_3	হলুদ ও অ্যাগাউটি	

প্রথম পরীক্ষায় P_1 জনুতে হলুদের সঙ্গে হলুদের সংকরায়ণ ঘটাইয়া কোন জনুতে হোমোজাইগাস হলুদ পাওয়া যায় না কারণ প্রতি জনুতেই প্রচ্ছন্ন অ্যাগাউটির আবির্ভাব ঘটে।

মেণ্ডেলের পৃথগীভবন সূত্র অনুযায়ী প্রথম পরীক্ষায় হোমোজাইগাস হলুদ হওয়া উচিত কিন্তু হয় নাই। তাহার কারণ হলুদ হোমোজাইগাস অবস্থায় মৃত্যু ঘটায়। যে কোন জনুর হলুদ ও অ্যাগাউটির পরীক্ষা ক্রস ঘটাইয়া দেখা যায় যে হলুদ হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে। পরবর্তীকালে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্যুনোর এই পরীক্ষায় 25% ইঁদুর ভ্রূণাবস্থায় মারা যায় (চিত্র 3.15)।

Y/+ × Y/+

Y/Y ×, বাঁচে না, 25% — Y/+ হলুদ, Y/+ হলুদ, 50% — +/+ অ্যাগাউটি, 25%

চিত্র 3.15 ক্যুনোকৃত বিশেষ ইঁদুর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে Y জীনের পৃথগীভবন এবং হলুদ ও অ্যাগাউটি বর্ণের লোমযুক্ত ইঁদুর সৃষ্টির কারণ।

আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে হলুদ প্রকট কিন্তু ইহার মারণপ্রভাব প্রচ্ছন্ন। বহু প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের ক্ষেত্রেও মারণ প্রভাব দেখা যায়, অর্থাৎ হোমোজাইগাস অবস্থায় ইহাদের মারণ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এইরূপ মারণ জীনকে প্রচ্ছন্ন মারণ জীন বলে কারণ মারণক্রিয়া উক্ত জীনের হোমোজাইগাস অবস্থা ছাড়া প্রকাশ পায় না। যে সকল মারণ জীন হেটারোজাইগাস অবস্থায় মারণক্রিয়া ঘটায় তাহাদের প্রকট মারণ জীন (Dominant Lethal) বলে। যেমন মানুষের এপিলইয়া (Epiloia)—ইহার ফলে চর্মের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয়, মানসিক ভারসাম্য ভীষণভাবে নষ্ট হয় এবং

ইহার ফলে অতি অল্পবয়সেই রোগী মারা যায়। এপিলইয়ার জীন একটি অর্থাৎ হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকিলেই এই ঘটনা ঘটে।

অতএব সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে মারণ জীনের প্রভাবে পৃথগীভবন ও স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রন্বয় ব্যাহত হয়; ফলে প্রাপ্ত অনুপাতেরও বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখা যায়।

3.31 পৃথগীভবন বিকৃত কারক (Segregation distorter) জীন

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যুগল জীনের পৃথগীভবনের সময় একটি অ্যালিল কোন কারণে অপত্য জনুতে যাইতে অক্ষম হইয়া পড়িলে প্রকৃত পৃথগীভবন সত্ত্বেও প্রাপ্ত অনুপাতে তাহার প্রতিফলন দেখা যায় না। স্যানভলার ও হিরাইজুমি ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে এই ধরনের জীনের উপস্থিতি প্রমাণ করিয়াছেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে এই ধরনের জীন সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

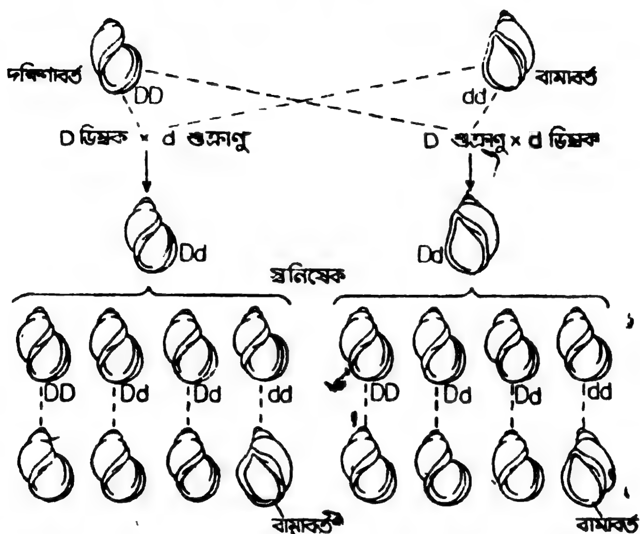
মেণ্ডেলীয় বংশগতি সূত্রের যে সকল ব্যতিক্রম আলোচনা করা হইয়াছে সেইগুলির ক্ষেত্রে জীনের পৃথগীভবন ও স্বাধীন বিন্যাস ঘটিয়াছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাহাদের ফিনোটাইপগত প্রকাশ ও অনুপাতের বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে জীনের পৃথগীভবন ও স্বাধীন বিন্যাস নানাভাবে পরিবর্তিত হয়; যদিও জীনের ফিনোটাইপগত প্রকাশ বিঘ্নিত হয় না। এইরূপ কয়েকটি বিভিন্নতার উল্লেখ নিম্নে করা হইল।

A. **লিংকেজ** : যখন দুই বা ততোধিক জীন স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত না হইয়া একই সঙ্গে অপত্য জনুতে যায় বা যাওয়ার প্রবণতা দেখায় তখন তাহাদের লিংকড জীন (Linked gene) এবং ঘটনাটিকে লিংকেজ (Linkage) বলে। এই বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

B. **লিঙ্গ-সংযোজিত বংশগতি** : বহু জীবের স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে এবং ইহাদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফিনোটাইপগত প্রভেদ দেখা যায়। ইহাকে যৌন দ্বিরূপতা বলে। কিছু জীন আছে যাহারা লিঙ্গ নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করে না কিন্তু লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জনিতৃজনু হইতে অপত্যজনুতে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়। এই জীনগুলিকে লিঙ্গ সংযোজিত জীন (Sex linked gene) বলে। অতএব লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতিকে সাধারণ লিংকেজ-এর পরিবর্তিত রূপ বলা যায়। লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতি মেণ্ডেল বর্ণিত সাধারণ বংশগতি সূত্রের ব্যতিক্রম। এই বিষয়ে লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি শীর্ষক অংশে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

C. **মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি** : কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য অপত্যজনুতে বাহিত হয় কিন্তু পিতার ঐ বৈশিষ্ট্য অপত্যজনুতে বাহিত হয় না। ইহাকে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি বলে। লিমনিয়া শামুকের (*Limnaea*) আবর্ত এইরূপ একটি বৈশিষ্ট্য।

লিমনিয়ার আবর্ত একটি যুগল জীনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। লিমনিয়ার আবর্ত ডান এবং বাম উভয়দিকে হইতে পারে। ডানদিকে আবর্তিত হইলে উহাকে দক্ষিণাবর্ত বলে এবং বামদিকে আবর্তিত হইলে উহাকে বামাবর্ত বলে। দক্ষিণাবর্ত অবস্থা প্রকট অ্যালিল D দ্বারা নির্ধারিত হয়। বামাবর্ত অবস্থা প্রচ্ছন্ন অ্যালিল d দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি জনিতৃজনুর হেটারোজাইগাস দক্ষিণাবর্ত (Dd) লিমনিয়ার স্বনিষেক ঘটানো হয় তবে দেখা যায় যে F_1 জনুতে সবই দক্ষিণাবর্ত হইয়াছে।



চিত্র 3.16 লিমনিয়া পেরিগ্রা (*Limnaea Peregra*) প্রজাতির শামুকে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি।

নিয়মানুযায়ী dd জিনোটাইপের বামাবর্ত হওয়া উচিত কিন্তু তাহা না হইয়া উহা দক্ষিণাবর্ত হয়। এইরূপ জিনোটাইপ যুক্ত দক্ষিণাবর্ত লিমনিয়ার মধ্যে স্বনিষেক ঘটাইলে পুনরায় বামাবর্ত লিমনিয়া উৎপন্ন হইবে (চিত্র 3.16)। মাতৃপ্রভাব মাত্র এক জনু স্থায়ী হয়। মেন্ডেলের বংশগতি সূত্র ও তাহার ব্যতিক্রম পর্যালোচনায় কেবলমাত্র ডিপ্লয়েড জীবের বংশগতি বিবেচনা করা হইয়াছে। হ্যাপলয়েড ও পলিপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে বংশগতির প্রকাশে নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এই সকল ক্ষেত্রে বংশগতি মেন্ডেলের সূত্রানুসারী হয় না।

3.32 সংক্ষিপ্তসার

1. জীন ফিনোটাইপ নির্ধারণ করে এবং জীন এক জনু হইতে অন্য জনুতে পরিবাহিত হয়।

2. একটি জীনের দুই বা ততোধিক অ্যালিল থাকিতে পারে। দুইয়ের বেশী অ্যালিল থাকিলে তাহাকে বহু-অ্যালিল বা Multiple allele বলে। কোন ডিপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে দুইটির বেশী অ্যালিল একসঙ্গে থাকিতে পারে না।

3. কোন জীনের অ্যালিলগুলি পরস্পর প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে অথবা উহারা সমপ্রকট, আংশিক প্রকট বা অতি প্রকট হইতে পারে। অনুরূপভাবে হ্যাপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে একটি, ট্রিপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে তিনটি অ্যালিল থাকে।

4. সাধারণভাবে একটি অ্যালিল একটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে কিন্তু একটি জীন একাধিক বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করিতে পারে (প্লিয়োট্রপিজম্) অথবা একাধিক জীন ও তাহাদের অ্যালিল একটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিতে পারে (বহুজীন ঘটিত বংশগতি (Polygenic inheritance) ।

5. কোন জীবের সামগ্রিক ফিনোটাইপ বহুজীন ও তাহাদের অ্যালিলের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

6. ডিপ্লয়েড জীবে জীন যুগলগুলি পৃথগীভবন ও স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র স্বাভাবিকভাবে মানিয়া চলিলেও বহুক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় ; যথা লিংকেজ, লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতি, মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি ইত্যাদি।

7. জীন ও তাহাদের অ্যালিলগুলি পৃথগীভবন ও স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র যে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করে সেই সকল ক্ষেত্রেও জীনের অ্যালিলগত আন্তঃক্রিয়া এবং দুই বা ততোধিক জীনের আন্তঃক্রিয়ার ফলে ফিনোটাইপগত অনুপাতের বিভিন্নতা দেখা যায়।

অনুচ্ছেদ—4

বংশগতি ক্রোমোসোম ভিত্তিক

4.1 কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্বের সেতুবন্ধন

মেণ্ডেল বংশগতি ব্যাখ্যায় 'নির্ধারক' (Factor) কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। মেণ্ডেলের নির্ধারক ছিল কল্পিত। কেননা মেণ্ডেল কল্পিত নির্ধারকগুলি এক জনু হইতে পরবর্তী জনুতে পরিবাহিত হয় সত্য হইলেও নির্ধারকগুলি কোথায় থাকে এবং কি ভাবেই বা পরিবাহিত হয় সে সম্বন্ধে কোন ধারণা সে সময়ে ছিল না। বংশগতি নির্ধারকের অবস্থান কোষের কোথায় এবং নির্ধারকের ভৌত প্রকৃতি কি এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর খুঁজিতে গত শতাব্দীর শেষভাগে বহু বিজ্ঞানী সচেষ্ট হন। কোষ ও কোষ অঙ্গাণুসমূহ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান গড়িয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে কোষের ক্রোমোসোমে মেণ্ডেল কল্পিত বংশগতির নির্ধারকগুলি অবস্থিত। এই ক্রোমোসোমগুলিই জনিতৃজনু হইতে অপত্যজনুতে যায়। ইহার অর্থ নির্ধারক বা জীনগুলি ক্রোমোসোমের সহিত পরিবাহিত হয়। কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্বের সহিত এইভাবে একটি নূতন সেতুবন্ধন স্থাপিত হয় এবং জীব-বিজ্ঞানের একটি নূতন শাখা সাইটোজেনেটিক্স (*Cytogenetics*) জন্মলাভ করে।

4.2 জীবদেহের গঠন

কোষ জীবদেহের গঠন ও কার্যের একক। বহুকোষী জীবে একই ধরনের গঠন ও কার্য-ক্ষমতাযুক্ত বহুকোষ মিলিত হইয়া কলা (Tissue) গঠন করে। একাধিক কলা সমবেতভাবে সৃষ্টি করে অঙ্গতন্ত্র (System)। একাধিক অঙ্গতন্ত্র সুসংহত হইয়া জীবদেহ গঠন করে। এক কথায় বলা যায় যে বিভিন্ন আকার ও কার্যভেদ-যুক্ত কোষের সামগ্রিক যোগফলে একটি জীবদেহ গঠিত হয়

4.3 মাইটোসিস ও জীবদেহ

উন্নততর জীবের দেহ অসংখ্য কোষ লইয়া গঠিত। কিন্তু সকল বহুকোষী জীব একটিমাত্র কোষ লইয়া জীবন সুরু করে। এই বিশেষ কোষটি হইল নিষিক্ত ডিম্ব বা জাইগোট (Fertilized ovum or Zygote)। কয়েকটি জীবের ক্ষেত্রে অবশ্য অনিষিক্ত ডিম্ব অপুংযোনি বা পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ জীব সৃষ্টি করিতে পারে। নিষিক্ত ডিম্ব অসংখ্যবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। নিষিক্ত ডিম্ব কখনই পূর্ণাঙ্গ জীবের ন্যায় আকার বিশিষ্ট নহে। মাইটোসিস পদ্ধতিতে সৃষ্ট কোষগুলি বিভিন্ন কার্যের উপযোগী হইবার জন্য বিশেষিত (Differentiated) হইয়া যায়। বিশেষিত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে কোষগুলির মধ্যে জনিতৃ জীবের আকার ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। এই পদ্ধতিকে স্ফুরণ (Morphogenesis) বলে।

জীনতত্ত্বের আঙ্গিকে স্ফুরণ পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একটি জীবের আকার, ব্যবহার, বৈশিষ্ট্য জীবটির জীনগুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই জীনগুলি বংশগতির নিয়মে জনিতৃ জনু হইতে অপত্য জনুতে পরিবাহিত হয়। অপত্য জনুতে নিষিক্ত ডিম্ব হইতে সৃষ্ট কোষগুলি বিশেষিত ও স্ফুরিত হয়। ফলে অপত্য জনু পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে এবং নিজেই জনিতৃ জনু সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায় যে অপত্য জনুর সৃষ্টির সময়কার কোষ (নিষিক্ত ডিম্ব) জনিতৃ জনু হইতে যে জীন লাভ করে সেইগুলিই মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের ফলে উহার সকল কোষে পরিবেশিত হয়। এই জীনগুলিই বিভিন্ন কোষকে বিভিন্ন কার্যের উপযোগী করিয়া তোলে। কোষ হইতে কোষে বিভাজনের মাধ্যমে জীন পরিবেশিত হয়। ইহা না হইলে জীবের ফিনোটাইপ মেণ্ডেলের সূত্রানুযায়ী প্রকাশ পাইতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যে প্রশ্ন মনে জাগে তাহা হইতেছে কোন কোষঅঙ্গাণু জনিতৃ জনু হইতে অপত্য জনুতে জীন বহন করে ?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন পর্যালোচনা প্রয়োজন (চিত্র 2.4 দ্রষ্টব্য)। মাইটোসিস পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত ঘটনা ঘটে :—

(i) একটি কোষ বিভাজিত হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়।

(ii) অপত্য কোষে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণের ভিন্নতা থাকিতে পারে অর্থাৎ অপত্য কোষের একটিতে বেশী বা কম সাইটোপ্লাজম থাকিতে পারে।

(iii) নিউক্লিয়াসের বিভাজন অত্যন্ত নিখুঁত। বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ কয়েকটি বস্তু সুসংহত হইয়া সুতার আকৃতি ধারণ করে। ইহাদের ক্রোমোসোম বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট জীবের সকল কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সর্বদা একই প্রকার। বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোসোম নিজদেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিভাজিত হয় এবং একটি ক্রোমোসোম হইতে এইভাবে দুইটি ক্রোমাটিড সৃষ্টি হয়। জনিতৃ জনু হইতে সৃষ্ট দুইটি অপত্য কোষের প্রতিটিতে একটি করিয়া ক্রোমাটিড যায়। সর্বোপরি জনিতৃ কোষের ক্রোমোসোমগুলি সম সংখ্যার এবং সমগুণসম্পন্ন অবস্থায় অপত্য কোষে যায়।

(iv) বিভাজন শেষ হইলে ক্রোমোসোমগুলি প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায় কিন্তু পুনর্বিভাজনের সময় আবার নিজস্ব অবয়ব ধারণ করে।

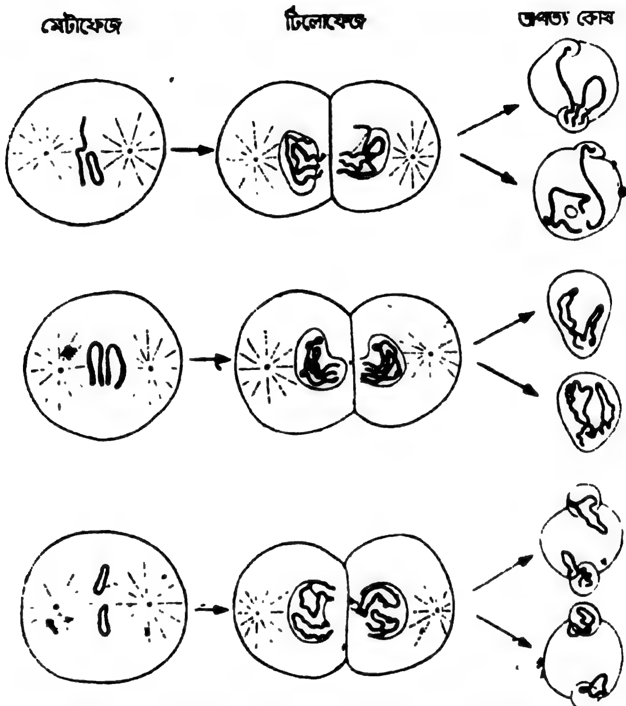
সুতরাং মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনে ক্রোমোসোমসমূহের একই সংখ্যায় এবং সমগুণসম্পন্ন অবস্থায় অপত্য কোষে যাওয়া, বিভাজনের সময় ইহাদের আকার নির্দিষ্ট থাকা ইত্যাদি হইতে ইহা অনুমান করা হয় যে একটি 'কোষ জনু' ইহা হইতে সৃষ্ট সকল 'কোষ জনুতে' ক্রোমোসোমের মাধ্যমে 'ক্রোমোসোমীয় যোগসূত্র' স্থাপন করে।

ক্রোমোসোম দ্বারা এক কোষ জনু হইতে অন্য কোষ জনুতে ক্রোমোসোমীয় যোগসূত্র রক্ষিত হয়—এই বক্তব্যের মধ্যেও কিছু সন্দেহ থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন মনে জাগে তাহা হইতেছে—

A. ইণ্টারফেজ দশায় কোষে ক্রোমোসোম থাকে কি থাকে না ?

B. কোষে একাধিক ক্রোমোসোম কেন থাকে ?

ইণ্টারফেজ দশায় কোষের মধ্যে ক্রোমোসোম সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথমদিকে বোভেরী (Boveri) তাঁহার পরীক্ষা হইতে জানান যে **কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমোসোম দেখা যায়।** ঘোড়ার অন্ত্রে পরজীবি রূপে বসবাসকারী অ্যাসকেরিস মেগালোকেফালা (*Ascaris megalocephala*) এইরূপ একটি প্রাণী। এই প্রাণীটির নিষিক্ত ডিম্বের বিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোম-



চিত্র 4.1 অ্যাসকেরিস মেগালোকেফালার স্ফুরণের প্রাথমিক দশায় ক্রোমোসোমের ধারাবাহিকতা।

গুলির কিছু অংশ নিউক্লিও আবরণীর বাহিরে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে (চিত্র 4.1)। ফলে নিউক্লিও আবরণী ঐ সমস্ত অঞ্চলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যায়। পরবর্তী কোষ বিভাজনের প্রফেজ দশায় নিউক্লিও আবরণীর প্রক্ষিপ্ত অঞ্চলসমূহে পূর্ববর্তী বিভাজনের টিলোফেজ দশার ক্রোমোসোমগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

অ্যাসকারিস মেগালোকেফালা বাইভ্যালেনস্ (*A. megalocephala bivalens*) প্রজাতির ক্রোমোসোম দুই জোড়া অর্থাৎ ইহাদের ৮টি প্রান্ত আছে। দুইটি অপত্য কোষে এই প্রান্তগুলির একটি অন্যটির বিপরীত দিকে থাকে এবং দেখিয়া মনে হয় একটি অপরটির দর্পণ বিম্ব (Mirror image)। **অ্যাসকারিস্ মেগালোকেফালা ইউনিভ্যালেনস্** (*A. megalocephala univalens*) এর ক্ষেত্রে মাত্র একজোড়া ক্রোমোসোম থাকে এবং এইক্ষেত্রে ক্রোমোসোমীয় যোগসূত্র আরও

পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই ক্ষেত্রে মাতৃকোষের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোম যে আকৃতিতে থাকে, অপত্যকোষের প্রফেজ দশায় ঠিক সেই আকৃতি প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যদিও ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমোসোম দেখা যায় না তথাপি উহাদের অস্তিত্ব কখনো বিলুপ্ত বা আকার কখনো পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ ক্রোমোসোম কোষ জনু যোগসূত্র স্থাপন করে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হিসাবে থিওডর বোভারীর (1900 খ্রীঃ) সমুদ্র-সজারু (Sea urchin) লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলা যায়। পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত তাঁহার যুক্তিগুলি নিম্নরূপ

(1) মাইটোসিস্ কোষ বিভাজন হইতে জানা যায় যে কোষ হইতে কোষ উৎপন্ন হয় এবং ক্রোমোসোম হইতে ক্রোমোসোম উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে প্রতিটি অপত্যকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে।

(2) নিষেক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে ইহা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকে। শুক্রাণু ডিম্বাণুর তুলনায় অনেক ছোট এবং আকৃতিতেও ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুক্রাণুর মধ্যে সাইটোপ্লাজম্ প্রায় থাকে না কিন্তু নিউক্লিয়াসটি সুগঠিত। ডিম্বাণুতে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ শুক্রাণুর তুলনায় বেশি থাকিলেও নিউক্লিয়াসের আকৃতি ও শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের আকৃতির অনুরূপ। অতএব বলা যাইতে পারে যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু বিশেষ ধরনের (Specialized) কোষ। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু জনিতৃ জনুতে উৎপন্ন হয় এবং পরস্পর মিলিত হইয়া অপত্য জনু সৃষ্টি করে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্য দিয়া জনিতৃ জনুর বৈশিষ্ট্যগুলি অপত্য জনুতে পরিবাহিত হয়। আবার যেহেতু উভয় জনন কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসেই একমাত্র সাম্য পরিলক্ষিত হয়, অতএব বলা যায় যে জননকোষের নিউক্লিয়াস বংশগতির ধারক ও বাহক। আরও নির্দিষ্টভাবে বলিলে বলা যায় নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমই বংশগতির ধারক ও বাহক।

(3) জনিতৃ জনুর দেহকোষে ক্রোমোসোমের যে সংখ্যা পাওয়া যায় অপত্য জনুর দেহকোষেও সেই সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। যদি দেহকোষে ও জননকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা একই থাকে তবে অপত্য জনুর দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণিত হইবে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এইরূপ কখনই ঘটে না। অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতিতে কোষ বিভাজিত হইয়া জননকোষ উৎপন্ন হয়। জননকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা অপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অর্ধেক হয়। এইরূপে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে অপত্য জনুর নিষিক্ত ডিম্বে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। 1883 খৃষ্টাব্দে এডুয়ার্ড ভন বেনডেন্ (Edouard Von Benden) পরীক্ষা দ্বারা দেখান যে অ্যাসকারিস মেগালোকেফালা বাইভ্যালেনসের দেহকোষে মোট 2 জোড়া ক্রোমোসোম থাকে এবং ডিম্বাণু ও

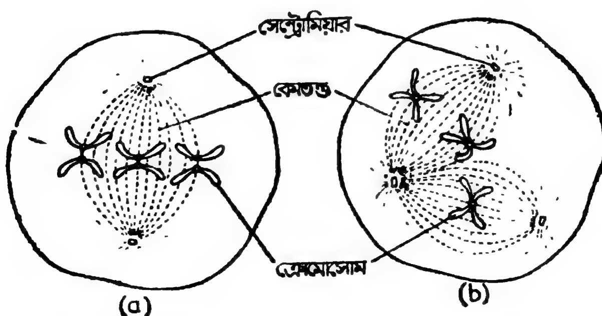
শুক্রাণুতে দুইটি করিয়া ক্রোমোসোম থাকে। যে বিশেষ বিভাজন পদ্ধতিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাহাকে স্বল্পীকরণ বিভাজন বা মিয়োসিস্ বলে (মিয়োসিসের সাধারণ বিবরণ আগেই দেওয়া হইয়াছে)। 1887 খৃষ্টাব্দে ওয়াইসম্যান প্রস্তাব করেন যে জীবদেহের প্রোটোপ্লাজম দুইটি অংশে বিভক্ত – উহাদের একটিকে সোমাপ্লাজম ও অপরাংশকে জার্ম প্লাজম বলে। সোমাপ্লাজম দ্বারা দেহকোষ উৎপন্ন হয় এবং জার্মপ্লাজম হইতে জননকোষ উৎপন্ন হয়। জননকোষের বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অর্ধেক হইয়া যায়।

(4) মেণ্ডেল বর্ণিত বংশগতি সূত্রের পুনরাবিষ্কারের ফলে আরও জানা যায় যে বংশগতির নির্ধারক বা জীনগুলি যে সূত্রানুযায়ী এক জনু হইতে অন্য জনুতে পরিবাহিত হয় ক্রোমোসোমগুলিও বংশগতির সেই একই সূত্রানুযায়ী এক জনু হইতে অন্য জনুতে পরিবাহিত হয় অর্থাৎ বংশগতির বাহক হিসাবে যে কোন প্রস্তাব করা হউক না কেন উহাকে মেণ্ডেলীয় তত্ত্বের নির্দিষ্ট নির্দেশিকার মধ্যে থাকিতে হইবে।

বোভারীর পরীক্ষা: সমুদ্র সজারুর (Sea urchin) ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর নিষেক দেহের বাহিরে ঘটে। এইজন্য ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে নিষেক ঘটানো সম্ভব। ভ্রূণতত্ত্বের পরীক্ষায় এইজন্যই এই প্রাণীটির যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

একটি ডিম্বাণু সাধারণত একটি শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়। বোভারী পরীক্ষামূলকভাবে দুইটি শুক্রাণু দ্বারা একটি ডিম্বাণুর কৃত্রিম উপায়ে নিষেক ঘটাইলেন (চিত্র 4.2)। কিন্তু নিষিক্ত ডিম্বাণুটি স্ফুরণের প্রাথমিক পর্বেই নষ্ট হইয়া গেল। শুক্রাণুর সংখ্যাধিক্যে ভ্রূণের মৃত্যু ঘটিবার কারণ জানিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ক্রোমোসোমীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফল নিম্নরূপ—

(1) নিষেকের সময় শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস ও একটি সেণ্ট্রিওল ডিম্বাণু মধ্যে প্রবেশ করে।



চিত্র 4.2 সমুদ্র সজারু লইয়া বোভারীর পরীক্ষার চিত্ররূপ— স্বাভাবিক (a); ত্রিমেরু বেমতন্তু গঠনের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যার অসাম্য (b)।

(2) নিষিক্ত ডিম্বাণুর প্রথম বিভাজনে ডিম্বাণুর সেণ্ট্রিওল ও শুক্রাণুর সেণ্ট্রিওল বেমতন্তু গঠন করে (সাধারণ কোষ বিভাজনের সময় সেণ্ট্রিওল বিভাজিত

হয় ও 140° কোণে স্থানান্তরিত হইয়া একই সরলরেখায় আসিয়া বেমতন্তু গঠন করে)। ক্রোমোসোমগুলি ক্রমশঃ নিজস্ব নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে এবং নিরক্ষীয় তলে সুসংবদ্ধ হইয়া মেটাফেজ দশার সূচনা করে। পরিশেষে অ্যানাফেজ ও টিলোফেজ দশা মাধ্যমে পরিণতি লাভ করিয়া দুইটি অপত্য কোষ উৎপন্ন করে।

(3) দুইটি শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত ডিম্বকে তিনটি সেণ্ট্রিওল থাকার জন্য (প্রতি শুক্রাণু হইতে একটি ও একটি ডিম্বাণুর) ত্রিমেরুযুক্ত বেমতন্তু গঠিত হয়।

(4) ত্রিমেরুযুক্ত বেমতন্তু যখন অ্যানাফেজ দশায় সংকুচিত হইতে সুরু করে তখন অসম বলের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অপত্যকোষের এক একটিতে এক এক রকম হয়।

(5) প্রতিটি অপত্যকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যার এই বৈষম্যের জন্য ভ্রূণাণু পরিস্ফুরণের প্রাথমিক পর্বেই নষ্ট হইয়া যায়।

(6) অতিরিক্ত একটি শুক্রাণুর জন্য এক প্রস্থ ক্রোমোসোম সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বোভারীর পর্যবেক্ষণ হইতে নিম্নলিখিত দুইটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায়—

(i) সঠিক কার্যের জন্য প্রতি কোষের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম প্রয়োজন (ইহা প্রতি প্রজাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)।

(ii) কোষে যত ক্রোমোসোম থাকে তাহাদের আকৃতি ও আচরণ একরূপ নহে।

বোভারীর আগে ক্রোমোসোমের এই গুণগত পার্থক্য অজানা ছিল। সুতরাং বোভারীর পরীক্ষা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইল যে এই গুণগত পার্থক্যের জন্য প্রতিটি কোষে অন্ততপক্ষে বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি সম্পন্ন দুই প্রস্থ ক্রোমোসোম প্রয়োজন।

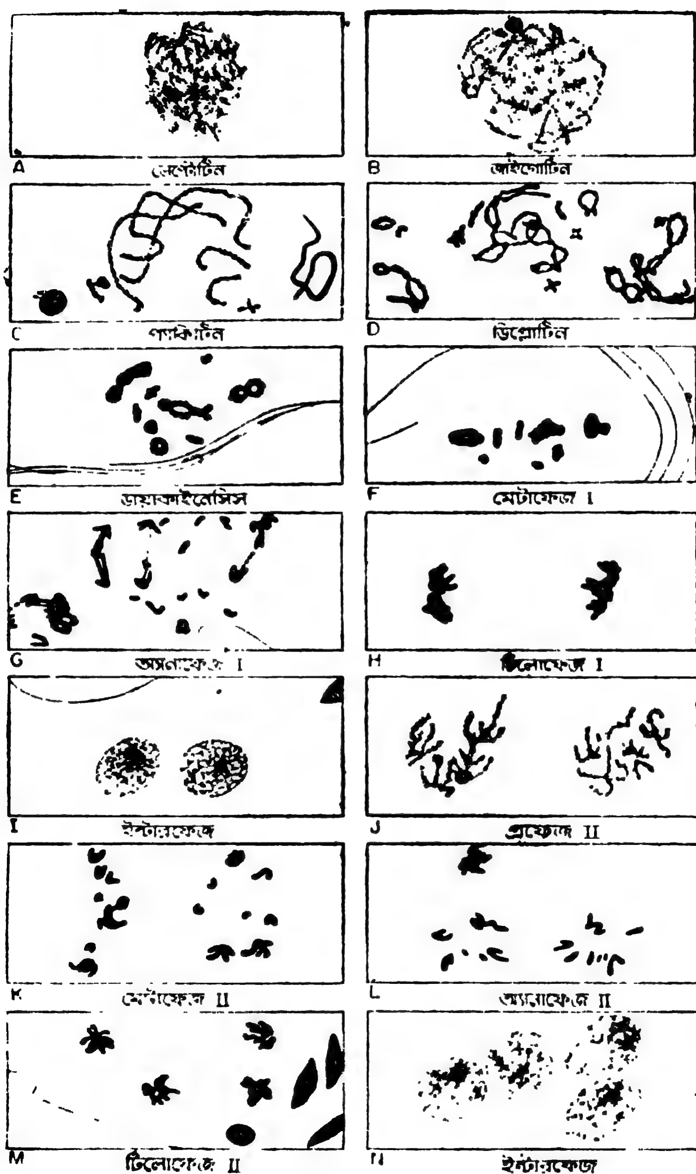
এইভাবে প্রতি কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট কেন থাকে তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ঠিক একই সময়ে বিখ্যাত কোষতত্ত্ববিদ উইলসনের (E. B. Wilson) সুযোগ্য ছাত্র সাটন (Walter Sutton—1902 ও 1903) পুরুষ ফড়িং-এর শুক্রাণু প্রস্তুতির সময়ে ক্রোমোসোমের ব্যবহার সংক্রান্ত দুইটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারা যায়।

(1) জননকোষে মাইটোসিস ও মিয়োসিস উভয়প্রকার কোষ বিভাজন দেখা যায় (চিত্র 4.3)। মাইটোসিস্ পদ্ধতিতে স্পারমাটোগোনিয়া হইতে স্পারমাটোসাইট উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস্-এর ফলে স্পারমাটোসাইট হইতে স্পারমাটিড উৎপন্ন হয় এবং স্পারমাটিড রূপান্তরিত হইয়া শুক্রাণুতে পরিণত হয়।

(2) মাইটোসিসের সময়ে প্রতিটি কোষে মোট 17টি ক্রোমোসোম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি ক্রোমোসোমের সুনির্দিষ্ট আকৃতি থাকে এবং উহাদের সনাক্ত করা যায়। আরও দেখা যায় যে একই রকম আকৃতিবিশিষ্ট ক্রোমোসোম দুইটি করিয়া থাকে অর্থাৎ মোট 8 জোড়া ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। বাকি একটি ক্রোমোসোমের

কোন জোড়া নাই। ইহাকে অতিরিক্ত (Accessory chromosome) বলে। প্রতি জোড়া ক্রোমোসোমের একটিকে অপরটির হোমোলোগাস ক্রোমোসোম বলে।



চিত্র 4.8 পুরুষ গঙ্গাফড়িং (*Chorthippus* sp.) এর শুক্রাণু কোষে মিয়োসিস ($2n = 17$)। চারটি জননকোষের দুইটিতে 8টি করিয়া ও দুইটিতে 9টি করিয়া ক্রোমোসোম থাকে।

(3) প্রথম মিয়োসিসের প্রফেজ দশায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগলবন্ধ হইয়া বাইভ্যালেণ্ট উৎপন্ন করে এবং পরিশেষে যুগলবন্ধ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটি এক অপত্যকোষে এবং অপরটি অন্য অপত্যকোষে যায়।

হোমোলোগাস ক্রোমোসোম যুগলের একটি পিতৃ উৎস হইতে এবং অন্যটি মাতৃ উৎস হইতে আসে। একটি জননকোষে মাত্র একপ্রস্থ ক্রোমোসোম থাকে (হ্যাপ্লয়েড $= n$) এবং নিষেকের পরে পুনরায় দুই প্রস্থ (ডিপ্লয়েড $= 2n$) হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে মাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহের সমস্ত কোষ উৎপন্ন হয়।

(4) সমস্ত দেহকোষে পিতৃ ও মাতৃ উৎসের সকল ক্রোমোসোমগুলি একত্রে থাকে এবং কোষের শারীরবৃত্তীয় কার্য পরিচালনা করে। কেবলমাত্র জনিতৃকোষে পিতৃ ও মাতৃ উৎসের ক্রোমোসোম পাশাপাশি আসে এবং পরে পৃথক হইয়া যায়। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা জননকোষে যায়। .

মিয়োসিস, জননকোষ উৎপাদন ও নিষেক পর্যালোচনা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে মিয়োসিস ও নিষেকে ক্রোমোসোমের আচরণ মেণ্ডেল বর্ণিত নির্ধারকের আচরণের সমান্তরাল। অতএব বলা যাইতে পারে যে মেণ্ডেল বর্ণিত জীন ক্রোমোসোম ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাটনের এই প্রস্তাবের কারণগুলি নিম্নরূপ—

(i) ক্রোমোসোম যেরূপ যুগলে থাকে মেণ্ডেল বর্ণিত নির্ধারকগুলিও সেইরূপ যুগলে থাকে।

(ii) মেণ্ডেলীয় নির্ধারকগুলি যেমন জনিতৃ জন্তুর জননকোষে পৃথক হইয়া যায় এবং অপত্য জন্তুতে পুনরায় একত্রিত হয় সেই একই ভাবে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি মিয়োসিসের সময় পরস্পর হইতে আলাদা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অপত্যকোষে যায় এবং নিষেক হইলে পুনরায় একত্রিত হয়।

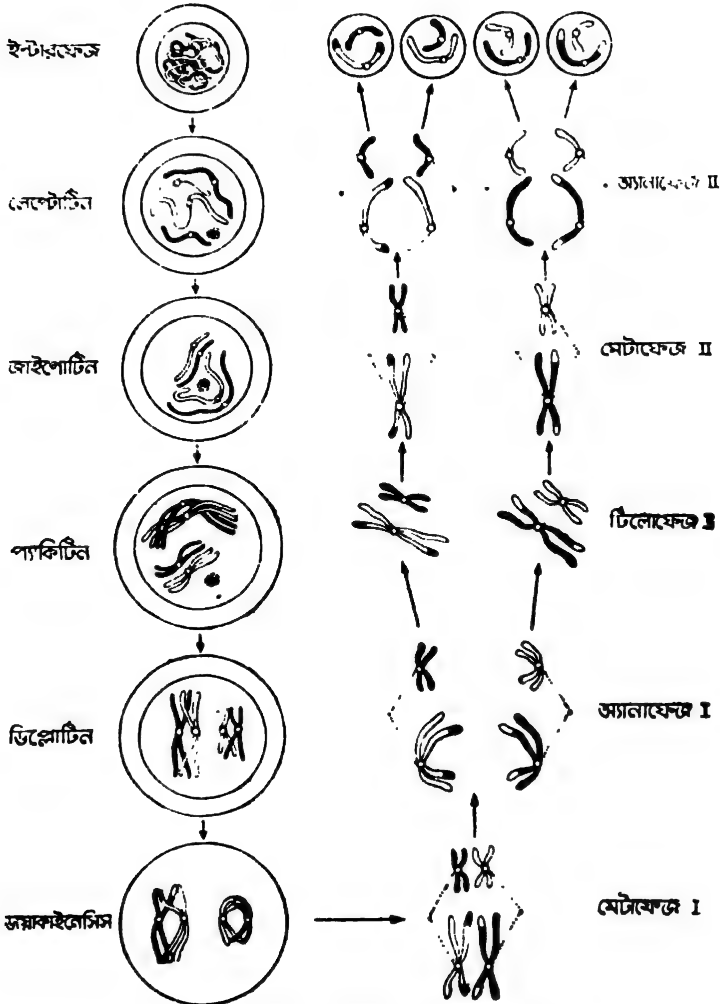
মেণ্ডেল-এর পরীক্ষায় ব্যবহৃত বীজত্বকের বৈশিষ্ট্য মসৃণ ও কুঞ্চিত যদি কোন একটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে প্রতিস্থাপিত করা যায়—তবে 3.10 চিত্রে প্রদর্শিত রূপে মেণ্ডেল-এর পৃথগীভবন সূত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবার দ্বিসংকর পরীক্ষার দুইটি বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যগুলি দুইটি বিভিন্ন হোমোলোগাস ক্রোমোসোম যুগলে প্রতিস্থাপিত করিলে স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র পাওয়া যায়।

বোভারী ও সাটন এই দুই বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্রোমোসোম বংশগতির ধারক ও বাহক এই সত্য প্রমাণ করেন বলিয়া বংশগতির ক্রোমোসোমীয় ভিত্তিকে সাটন-বোভারী ক্রোমোসোমীয় তত্ত্ব বলে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের বহু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে বংশগতির ক্রোমোসোমীয় তত্ত্ব বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

4.4 মিয়োসিস, জনন ও জীবনচক্র

যৌন জনন দ্বারা বংশধর সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে দুইটি জননকোষের মিলন হয় তাহাদের প্রতিটিতে একপ্রস্থ ক্রোমোসোম থাকে। জননকোষ প্রস্তুতির আগে মিয়োসিস

বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অর্ধেক হইয়া যায় (চিত্র 4.4)। এই বিভাজন পদ্ধতি না থাকিলে অপত্য জনুতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা জনিতৃ জনুর ক্রোমোসোম সংখ্যার দ্বিগুণ (4n) হইয়া যাইত। ফলে একই প্রজাতির সকল সভ্যের ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিতে:পারিত না।

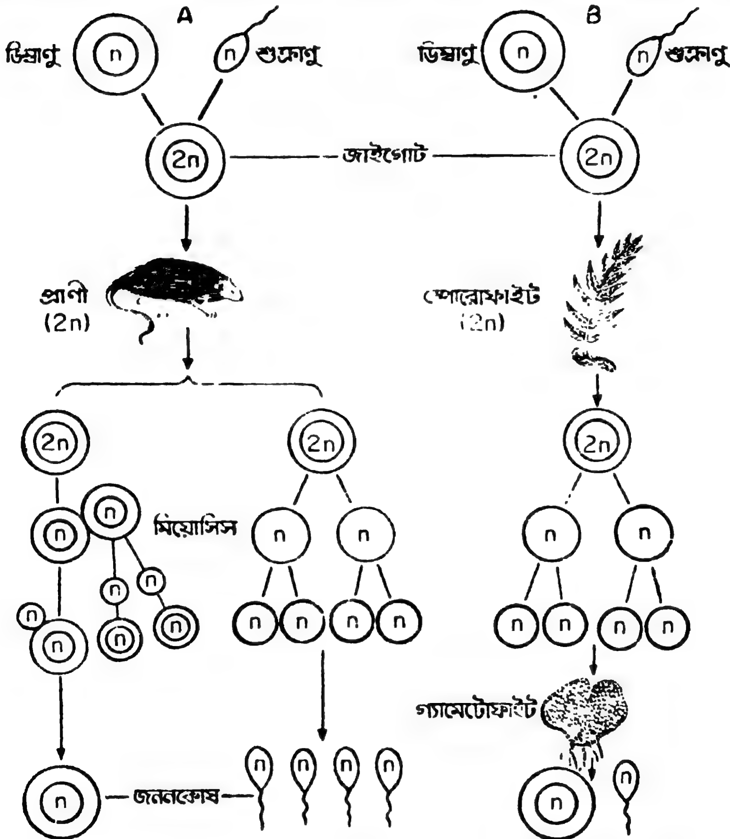


চিত্র 4.4 মিয়োসিস বিভাজনের বিভিন্ন দশার চিত্ররূপ।

অবশ্য ইউক্যারিওটিক জীবের জীবনচক্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন সর্বক্ষেত্রেই জননকোষ সৃষ্টির সময় হয় না—বিভিন্ন ধরনের জীবের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি সংঘটিত হইবার সময় বিভিন্ন হইতে পারে।

জীবনচক্রে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন কখন হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া ইউক্যারিওট জীবসমূহকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

a. **জনন কোষীয় বা প্রান্তিক মিয়োসিস** (Gametic or Terminai) —অনেক আদ্য প্রাণী, নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও বহুকোষী প্রাণীর জীবনচক্রে জনন কোষ সৃষ্টির সময় মিয়োটিক বিভাজন দেখা যায়। উচ্চতর পুরুষ প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাশয় (Testis) মধ্যস্থ স্পারমাটোগোনিয়া (Spermatogonia) হইতে মাইটোসিস পদ্ধতিতে প্রাথমিক শুক্রজনিতৃ কোষ (Spermatocyte) উৎপন্ন



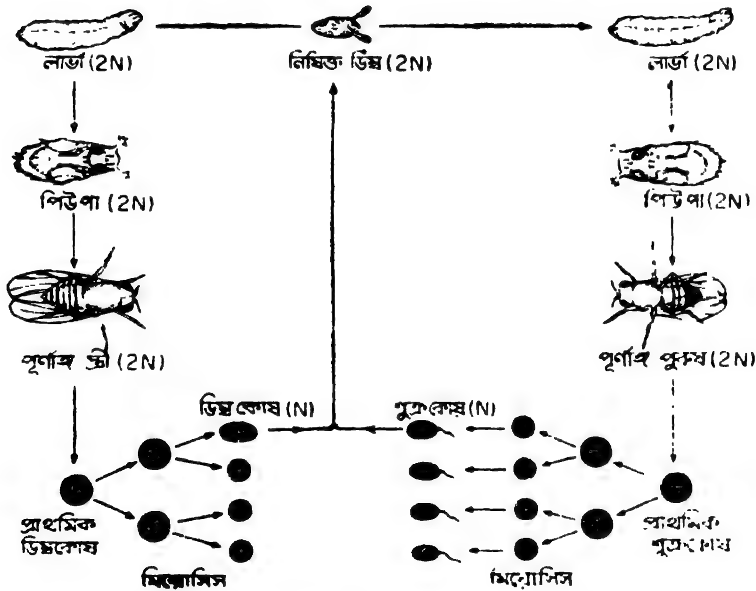
চিত্র 1.5 উচ্চতর প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনের সময়—
(A) প্রাণী, (B) উদ্ভিদ।

হয়। পরে প্রতিটি স্পারমাটোসাইটের মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি স্পার্মাটিড (Spermatid) উৎপন্ন হয়। স্পার্মাটিড বিশেষিত (Differentiated) হইয়া শুক্রকোষ বা শুক্রাণুতে (Sperm) পরিণত হয়। উচ্চতর স্ত্রী প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় (Ovary) মধ্যস্থ উগোনিয়া (Oogonia) হইতে মাইটোসিস পদ্ধতিতে

প্রাথমিক ডিম্বজনিত্ কোষ (Primary Oocyte) উৎপন্ন হয়। প্রতিটি প্রাথমিক ডিম্বজনিত্ কোষ মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া চারিটি ডিম্বকোষ বা ডিম্বাণু (Ovum) সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নষ্ট হইয়া যায় এবং একটিমাত্র কার্যকরী ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক ডিম্বজনিত্ কোষ মিয়োসিস পদ্ধতির প্রথম বিভাজনের প্রফেজ দশায় অনেকদিন থাকিতে পারে।

b. ভ্রূণ পশ্চাৎ বা সূচনাকালীন (Zygotic or Initial) মিয়োসিস—এইক্ষেত্রে নিষেকের অব্যবহিত পরে জাইগোট মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। কয়েকটি আদ্য প্রাণী ও শৈবালে এই ধরনের বিভাজন দেখা যায়। এই সমস্ত জীবের সকল দেহকোষ হ্যাপ্লয়েড (*n*) অবস্থায় থাকে অর্থাৎ জীবনচক্রের ডিপ্লয়েড (2*n*) দশা কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য জাইগোটের মধ্যে দেখা যায়।

c. স্পোর বা জীবনের মধ্য দশায় (Intermediate or Sporic) মিয়োসিস—সাধারণতঃ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভাজন দেখা যায় (চিত্র 4.5 B)। এই সকল জীবের ক্ষেত্রে মিয়োসিস বিভাজন জননকোষ প্রস্তুতি বা



চিত্র 4.6 ড্রসোফিলার জীবনচক্রে মিয়োসিস ও নিষেক।

প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই নিষেকের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না। এইসকল ক্ষেত্রে নিষেকের পর জাইগোট মাইটোসিস পদ্ধতির বিভাজনের দ্বারা ডিপ্লয়েড স্পোরোফাইট (Sporophyte) উৎপন্ন করে।

মিয়োসিস ও জীবনচক্র পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে যৌন জননের ফলে একই প্রজাতির দুইটি সত্তার বিভিন্ন জীনের অ্যালিলগত পার্থক্যগুলির পুনর্বিন্যাস হয়।

মিয়োসিস পদ্ধতিতে উৎপন্ন জননকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক (Haploid) হয়। নিষেকের মাধ্যমে ভ্রূণে পুনরায় পূর্ণসংখ্যা (Diploid) ফিরিয়া আসে (চিত্র 4.6 ও 4.7)। ইউক্যারিওটিক জীবের যৌন জননের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অ্যালিলগত পার্থক্যের পুনর্বিন্যাসের ফলে বিবর্তনের সম্ভাবনা বহুলাংশে বাড়িয়া যায়। কিন্তু অপরদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অমোঘ নিয়মে জীনবস্তুর প্রকরণ, জীনবস্তুর এক জনু হইতে অন্য জনুতে পরিবহণ পদ্ধতি ও হারের বৈষম্য প্রয়োজন অনুসারে সীমিত হইয়া যায়। যৌন জনন বিবর্তন পদ্ধতির একটি সুসংহত প্রকাশ। ইহারা দ্বারা জিনোটাইপগত বৈষম্যযুক্ত জননকোষের মিলনের ফলে পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার জিনোটাইপযুক্ত প্রজাতি উৎপন্ন হয়। এই ঘটনা যখন কোন জীবগোষ্ঠীর জনন হারের বিভিন্নতার সহিত যুক্ত হয় তখন বিবর্তন জনিত পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহা পরিবেশের চাপ ব্যতীতও হইতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে জিনোটাইপ ও পরিবেশের মধ্যে বিক্রিয়ার ভারসাম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অতি সহজেই ইহা একদিক হইতে অন্যদিকে পরিবর্তিত হইতে পারে। জীব জগতে বহুজীবের যৌন জনন পদ্ধতি অযৌন জনন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। ফলশ্রুতি হিসাবে ঐ সকল জীব উহাদের ভবিষ্যৎ বিবর্তনের জিনোটাইপগত পরিবর্তনশীলতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কারণ এই সকল জীবে যৌন জননের অনুপস্থিতি ও কিছু জীনের রক্ষণশীলতা উহাদের আপাত স্থায়িত্বের অনুকূল।

4.6 কয়েকটি বৈশিষ্ট্যময় জনন পদ্ধতি

বহু জীবের ক্ষেত্রে যৌন জনন পদ্ধতির উপস্থিতি ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও জটিল জনন পদ্ধতি থাকে ; এই পদ্ধতিগুলি থাকার ফলে ঐ সকল জীবে ক্রোমোসোমগত নানা বৈষম্যের উদ্ভব হয়।

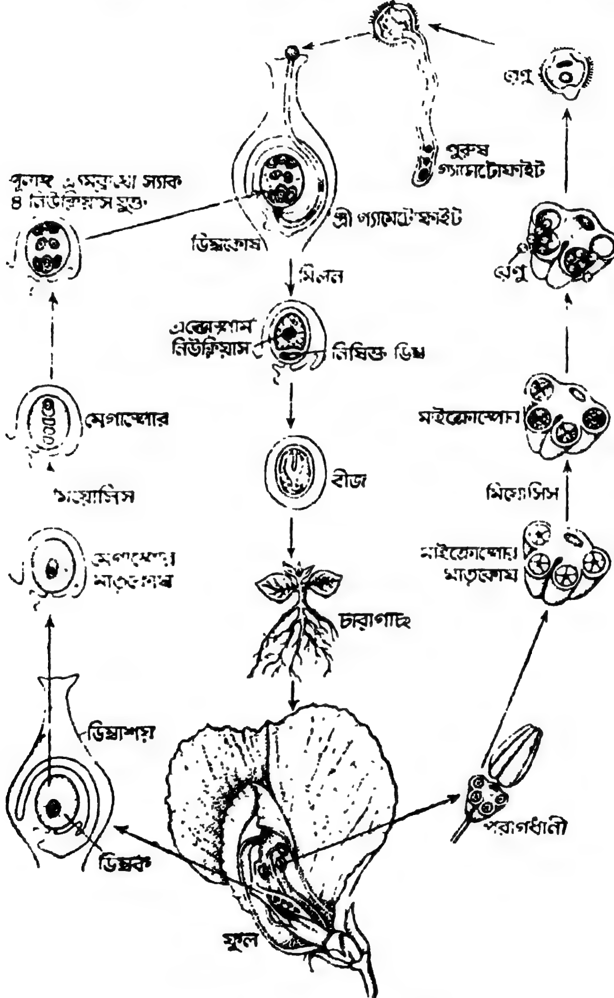
a. **অ্যাপোমিক্সিস**—বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অযৌন জনন যৌন জনন পদ্ধতিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত করে। এই প্রতিস্থাপিত জনন পদ্ধতিকে **অ্যাপোমিক্সিস** (Apomixis) বলে। অনিষিক্ত ডিম্বাণুর পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিস্ফুরণ বা পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) এক ধরনের অ্যাপোমিক্সিস।

উদ্ভিদের অ্যাপোমিক্সিস—উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দুই ধরনের অ্যাপোমিক্সিস দেখা যায়—(a) অঙ্গজ জনন ও (b) অ্যাগামোস্পারমি (Agamospermi)। উদ্ভিদের অঙ্গজ জননকে তখনই অ্যাপোমিক্সিস বলা হয় যখন দেখা যায় ইহাই জননের একমাত্র উপায় অর্থাৎ এই জননে মিয়োসিস ও নিষেক আদৌ হয় না অথবা উহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। স্ট্রবেরী (Strawberry) গাছের জনন ধাবকের সাহায্যে ঘটে কিন্তু ইহা অ্যাপোমিক্সিস নহে, কারণ ধাবক সৃষ্টিতে মিয়োসিস ও নিষেক ঘটে।

ইলোডিয়া কানাডেনসিস্ (*Elodea canadensis*)-এর ক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিস কখনও কখনও ঘটে কিন্তু সব সময় ঘটে না। কোন কোন বিশেষ পরিবেশে ইহারা

অঙ্গজ জনন ও অযৌন জননের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি ঘটায় কিন্তু উন্নততর পরিবেশে ইহারা যৌন জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। এইক্ষেত্রে পরিবেশ জনন পদ্ধতির নিয়ামক।

যে সকল ক্ষেত্রে অঙ্গজ জনন অ্যাপোমিক্সিস প্রকৃতির সেই সকল ক্ষেত্রে ফুলের বিভিন্ন অংশ প্রোপাগিউলস্ (Propagules) নামক অংশের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।



চিত্র 4.7 মটর গাছের জীবনচক্র।

এই প্রোপাগিউলস্ বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। ঘাসের বহু প্রজাতির ক্ষেত্রে এবং পিঁয়াজের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রোপাগিউল দ্বারাই জনন দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে জননের ফলে ঐ সকল গাছে বিবর্তনের নমনীয়তা বিশেষভাবে

হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কারণ জিনোটাইপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় এই বিশেষ পদ্ধতির জনন উহাদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম (*Lilium tigrinum*) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিস্ ও অ্যাম্ফিমিক্সিস্ (Amphimixis) উভয় প্রকার জনন দেখা যায়। বীজ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয় কিন্তু পাতার অক্ষে উৎপন্ন প্রোপাগিউল দ্বারাও বংশবিস্তার ঘটিয়া থাকে।

অ্যাপোমিক্সিসের ক্ষেত্রে বীজ নানাভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সামগ্রিকভাবে এই ঘটনাকে অ্যাগ্যামোস্পারমি (Agamospermi) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভ্রূণ সরাসরি ওভিউলের (Ovule) ডিপ্লয়েড কলা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। অনেক সাইট্রাস (Citrus) প্রজাতিতে এই ঘটনা দেখা যায়। এইক্ষেত্রে মাতৃ উৎসের জীনের বংশগতি প্রবাহিত হয়।

অ্যাপোমিক্সিস ঘটে এইরূপ প্রজাতির ক্ষেত্রে স্পোরোফাইট→গ্যামেটোফাইট এইরূপ জনক্রমের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু ভ্রূণ উৎপাদনে মিয়োসিস্ ও নিষেক পদ্ধতি থাকে না। এই ক্ষেত্রে গ্যামেটোফাইট সোমাটিক কোষ বা আরকোস্পোরিয়াল কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। আরকোস্পোরিয়াল কোষ হইতে উৎপন্ন হইলে মিয়োসিসের ফলে হ্যাপ্লয়েড ভ্রূণথলি (Embryo sac) উৎপন্ন হয় কিন্তু সোমাটিক কোষ হইতে উৎপন্ন হইলে ভ্রূণথলি ডিপ্লয়েড হয়।

প্রকৃতিতে যে সকল ক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিস দেখা যায় তাহার অধিকাংশই প্রাকৃতিক সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন হয় এবং ইহারা সাধারণতঃ পলিপ্লয়েড (Polyploid)।

অ্যাপোমিক্সিসের সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই। তবে পলিপ্লয়েড ও সংকরায়ণ ইহার কোনটিই প্রত্যক্ষ কারণ নয়। এলিয়াম কারিনেটাম (*Allium carinatum*)-এর ক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিস্ স্বাভাবিকভাবে ঘটিলেও একটি বিশেষ জীনের প্রভাবে ফুলের পরিবর্তে বালবিল (Bulbil) উৎপন্ন হয়।

৮. **প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারথেনোজেনেসিস্** (Parthenogenesis)—অনুন্নত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অঙ্গজ জননের ন্যায় কিছু কোষ হইতে জনন হইতে দেখা যায়। হাইড্রার কোরকোদ্গম এই ধরনের জনন। কিন্তু স্বাভাবিক যৌন জননের সাহায্যে যে সকল প্রাণীর জনন ঘটে তাহাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পারথেনোজেনেসিস্ দেখা যায়। পারথেনোজেনেসিস্ কৃত্রিম উপায়েও ঘটানো যাইতে পারে (যেমন ব্যাঙের ডিম)। বহু ক্ষেত্রে হ্যাপলয়েড অবস্থায় পারথেনোজেনেসিস্ লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিষিক্ত ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয় এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু পুরুষে রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি প্রাণীরাজ্যে ছয় হইতে সাতবার পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। রটিফেরা, অ্যাকারিণা, এবং পতঙ্গের চারিটি বর্গের (1) হাইমেনোপটেরা, ( ) হোমোপটেরা, (3) কলিওপটেরা, (4) থাইসানোপটেরা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ডিম্বাণু প্রস্তুতি স্বাভাবিক কিন্তু শুক্রাণুর প্রস্তুতি স্বাভাবিক পদ্ধতির নহে। এই ক্ষেত্রে প্রথম

মিয়োসিস বিভাজনের সময় ক্রোমোসোম সংখ্যার হ্রাস ঘটে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাজনে স্বাভাবিক এবং চারিটির পরিবর্তে দুইটি স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়।

সোমাটিক পারথেনোজেনেসিসের ক্ষেত্রে অনিষিক্ত ডিম্বক হইতে কেবলমাত্র স্ত্রী উৎপন্ন হয়। ইহা বাধ্যতামূলক হইলে ঐ গোষ্ঠীতে কেবলমাত্র স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। বহুক্ষেত্রে আংশিক অথবা চক্রাকার পারথেনোজেনেসিসের উপস্থিতির ফলে পারথেনোজেনেসিস্ ও যৌন জনন ক্রমপর্যায়ে আসে।

বাধ্যতামূলক পারথেনোজেনেসিস্ রুদ্ধ (Closed) জীনতন্ত্রের সৃষ্টি করে কারণ এই সকল ক্ষেত্রে মিয়োসিস্ ও জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটে না। এই ধরনের কোন জীবগোষ্ঠীকে অপরিবর্তনীয় জিনোটাইপ যুক্ত ক্লোন (Clone) বলে। এই সকল জীব সম্ভবত প্রকৃতির দয়াতেই বাঁচিয়া থাকে।

বাধ্যতামূলক পারথেনোজেনেসিস্ হয় এইরূপ প্রাণীর ক্ষেত্রে পলিপ্লয়েড জনিত ক্রোমোসোমীয় গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে ইহাদের রুদ্ধ জীনতন্ত্রে কিছু সহায়ক জিনোটাইপ উৎপন্ন হওয়ায় ইহারা বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিবেশে সক্রিয় ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

কিছু কিছু বাধ্যতামূলক পারথেনোজেনেসিস্ যুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে নিয়মিত মিয়োসিস দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা নানা ভাবে রক্ষিত হয়। কোথাও দেখা যায় ডিম্বকটি কোন একটি পোলার বডির সহিত মিলিত হয় এবং ডিপ্লয়েড সংখ্যা বজায় রাখে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্লিভেজের সময়ে দুইটি নিউক্লিয়াস মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড অবস্থা সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপে প্রকরণের সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে, কারণ মাতৃদেহ কোষে উদ্ভূত নূতন মিউটেশন এবং পূর্ব হইতেই হেটারোজাইগাস অবস্থা থাকার জন্য প্রকরণের সম্ভাবনা বেশী থাকে। চক্রাকার পারথেনোজেনেসিসে যৌন ও পারথেনোজেনেসিস্গত জননের আবর্তন ঘটে। আফিডস্ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের আবর্তিত জীবনচক্র দেখা যায়। টেট্রানিউরা উলমি (*Tetraneura ulmi*) নামক অ্যাফিডের ক্ষেত্রে দেখা যায় শীতকালে নিষিক্ত হওয়া ডিম্বকের কোন স্ফুরণ ঘটে না। শীতকালের পর যখন বসন্তকাল আসে তখন স্ত্রী নিম্ফগুলি ইউরোপীয় এলম্ গাছের পাতায় 'গল' সৃষ্টি করে। গলের মধ্যে নিম্ফ ডানাবিহীন পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহার পরে পারথেনোজেনেসিস্ পদ্ধতিতে ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ অ্যাফিড সৃষ্টি হয়। এই ডানাযুক্ত অ্যাফিড খাদ্য হিসাবে গ্রীষ্মকালীন ঘাসকে ব্যবহার করার জন্য পরিযান করে। এইখানে পুনরায় পারথেনোজেনেসিসের সাহায্যে জনন সাধিত হয়। ইহাদের শেষ জনু শীতের আগমনের ঠিক আগে উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের মধ্যে ডানাযুক্ত পুরুষ ও পারথেনোজেনেসিস্ জাত স্ত্রী থাকে। ইহারা পুনরায় এলম গাছে ফিরিয়া আসে। এই স্ত্রীগুলি পুনরায় পারথেনোজেনেসিস্ পদ্ধতিতে ডানাযুক্ত স্ত্রী উৎপন্ন করে। আগের জনুর ডানাযুক্ত পুরুষ এবং পরের জনুর ডানাযুক্ত স্ত্রীর মিলনে যৌন জনন ঘটে। ইহার ফলে যে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়

তাহারা সমগ্র শীতকালব্যাপী নিষ্ক্রিয় থাকে। এইরূপে ইহাদের জটিল জীবনচক্র আবর্তিত হয়।

4.6 জীবনচক্র ও ক্রোমোসোম

ইউক্যারিওট কোষযুক্ত জীবের জীবনচক্রের যৌন ও অযৌন জনন, মিয়োসিস এবং মাইটোসিসের গুরুত্ব ও ইহাদের সহিত ক্রোমোসোমের সংখ্যাগত, বিন্যাসগত ও কার্যগত সম্পর্ক প্রতিপন্ন করে যে ক্রোমোসোম জনু পরম্পরায় বংশগতি বহন করে।

প্রোক্যারিওট কোষযুক্ত জীবের ক্ষেত্রে জনন মূলতঃ মাইটোসিস পদ্ধতিতে ঘটিলেও জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটাইবার জন্য (যাহাতে বিবর্তনগত নমনীয়তা জন্মায়) বিশেষ ধরনের যৌন জনন দেখা যায়। আনবিক জীনতত্ত্বের পর্যালোচনায় প্রোক্যারিওট কোষ-যুক্ত জীবের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযুক্তিগত সুবিধা পাওয়া যায়; এইজন্যই আনবিক জীন-তত্ত্বের ক্ষেত্রে ইহাদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। জীনের আনবিক গঠন ও কার্য আলোচনার সময় ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের জীবনচক্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা স্পষ্ট যে ক্রোমোসোম ও জীবনচক্র অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ক্রোমোসোমাস্থিত বিভিন্ন জীনের পুনর্বিন্যাসের জন্য যৌন জননের প্রয়োজন। পুনর্বিন্যাস মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজনের সাহায্যে ঘটে। মিউটেশান জীনের পরিবর্তন ঘটায়। মিয়োসিস ও নিষেকের ফলে জীনের নানারূপ বিন্যাস ঘটে। এই বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিবেশে জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়তা করে—অর্থাৎ উহা বিবর্তনগত নমনীয়তা (Flexibility) আনিয়া দেয়। অযৌন জননের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস ঘটে না এবং জনিতৃ জনুতে কোন জীন পরিবর্তিত হইলে পরবর্তী অপত্য জনুতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে জীবের বিবর্তনগত নমনীয়তা উৎপাদনের জন্য যৌন জনন ও জীবনচক্রের আবর্তনের প্রয়োজন।

4.7 ক্রোমোসোম বংশগতির ধারক ও বাহক

একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রতি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। যৌন জননের দ্বারা যে সকল জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে সেই সকল জীবের ক্ষেত্রে ক্রোমো-সোমের সংখ্যা দুই ভাবে উপস্থিত থাকে :—(1) ডিপ্লয়েড ($2n$)—এই সংখ্যা দেহকোষে থাকে এবং (2) হ্যাপ্লয়েড (n)—এই সংখ্যা জননকোষে থাকে। অযৌন জনন পদ্ধতিতে যে সকল জীবের জনন ঘটে সেই সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি মৌল সংখ্যা পাওয়া যায়। এই মৌল সংখ্যাটি ডিপ্লয়েড অথবা হ্যাপ্লয়েড হইতে পারে। সংখ্যাটি ডিপ্লয়েড অথবা হ্যাপ্লয়েড দশায় থাকা ঐ প্রজাতির বিবর্তনগত উৎসের উপর নির্ভরশীল।

কয়েকটি জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা 59 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা নানা কারণে পরিবর্তিত হইতে পারে। বিভাজনগত ত্রুটির জন্য

ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে কোষ বিভাজনে ত্রুটি ঘটাইয়া ক্রোমোসোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটানো যায়। বিভিন্ন প্রকার রশ্মির বিকিরণের দ্বারা বা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিকের ব্যবহারের দ্বারা, এমনকি কোষের ভৌত পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়া ক্রোমোসোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটানো যায়।

ক্রোমোসোমের সংখ্যাগত পরিবর্তনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

(1) **ইউপ্লয়েড অবস্থা** (Euploid) ও (2) **অ্যানিউপ্লয়েড অবস্থা** (Aneuploid)।

(1) **ইউপ্লয়েড অবস্থা**—যখন ক্রোমোসোম গ্রন্থের সংখ্যা (Chromosome set) অভিন্ন থাকে তখন তাহাকে ইউপ্লয়েড অবস্থা বলে। যথা—হ্যাপ্লয়েড (n), ডিপ্লয়েড ($2n$), ট্রিপ্লয়েড ($3n$), টেট্রাপ্লয়েড ($4n$) ইত্যাদি। ক্রোমোসোম সংখ্যার (n) দুইএর বেশী গুণিতক অবস্থাকে পলিপ্লয়েড অবস্থা বলে।

(2) **অ্যানিউপ্লয়েড**—যখন ক্রোমোসোম সংখ্যা কোন গ্রন্থে কম বা বেশী থাকে তখন তাহাকে অ্যানিউপ্লয়েড অবস্থা বলে ; ইহাকে আবার নানা ভাগে ভাগ করা হয়।

(a) **মনোসোমিক**—ডিপ্লয়েড জীবের একটি ক্রোমোসোম কম থাকিলে মনোসোমিক অবস্থা হয়। অর্থাৎ ($2n-1$) অবস্থাকে মনোসোমিক বলে।

কোন ডিপ্লয়েড জীবের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম নয় এইরূপ দুইটি ক্রোমোসোম অনুপস্থিত থাকিলে ($2n-1-1$) উহাকে দ্বি-মনোসোমিক অবস্থা বলে। অনুরূপ-ভাবে ত্রি-মনোসোমিক, চতুর্মনোসোমিক ইত্যাদি পাওয়া যায়।

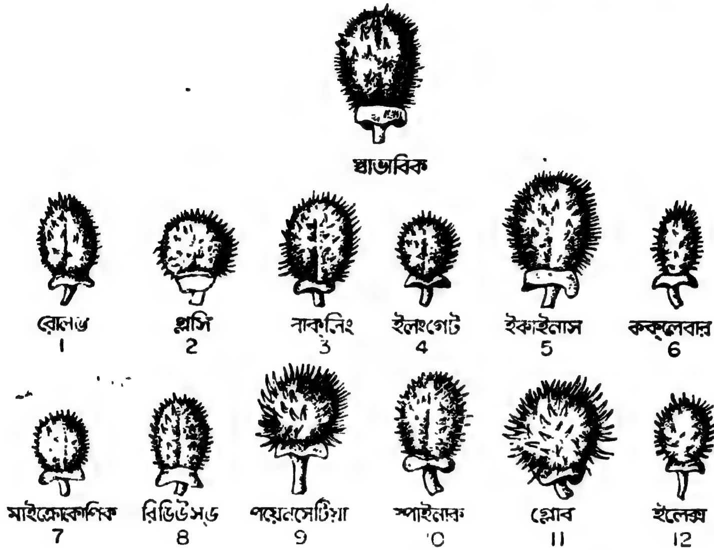
(b) **নালিসোমিক**—যখন কোন ডিপ্লয়েড জীবের কোন হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটিই অনুপস্থিত থাকে তখন তাহাকে নালিসোমিক ($2n-2$) বলে।

(c) **ট্রাইসোমিক**—যখন কোন ডিপ্লয়েড জীবের কোষে কোন একটি ক্রোমো-সোম বেশী থাকে তখন তাহাকে ট্রাইসোমিক ($2n+1$) বলে। অনুরূপভাবে যখন কোন ডিপ্লয়েড জীবের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সংখ্যা তিনটি হয় তখন তাহাকে দ্বি-ট্রাইসোমিক ($2n+1+1$) বলে। যখন কোন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সংখ্যা দুইটির স্থলে চারিটি থাকে তখন তাহাকে টেট্রাসোমিক ($2n+2$) বলে।

ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিলে একটি জীবের ফিনোটাইপের পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক সময় জীবটি বাঁচিয়া থাকিতে পাবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ক্রোমোসোম বংশগতির ধারক ও বাহক। শুধু তাহাই নহে, দেখা যায় যে বিশেষ ক্রোমোসোমের সংখ্যার তারতম্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ফিনোটাইপগত পরিবর্তন ঘটে। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে হোমোলোগাস নয় এইরূপ ক্রোমোসোমে বিভিন্ন জীন অবস্থিত এবং ঐ জীনগুলির ক্রিয়ার ফলে ক্রোমোসোমগুলি গুণগত ভাবে পৃথক হইয়া উঠে।

1924 খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যাকসলি ও বেলিং (Blakeslee ও Belling) ধ্তুরা গাছ লইয়া (*Datura stramonium*) পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন যে **ধ্তুরা ফলের আকৃতি একাধিক জীনের উপর নির্ভরশীল** এবং এই জীনগুলি বিভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থিত। ক্রোমোসোমের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিলে ফলের আকৃতির তারতম্য ঘটে।

ধ্তুরা গাছের কোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় 12 জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। উহারা পরীক্ষামূলক সংকরায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি ক্রোমোসোমের ট্রাইসোমিক অবস্থার

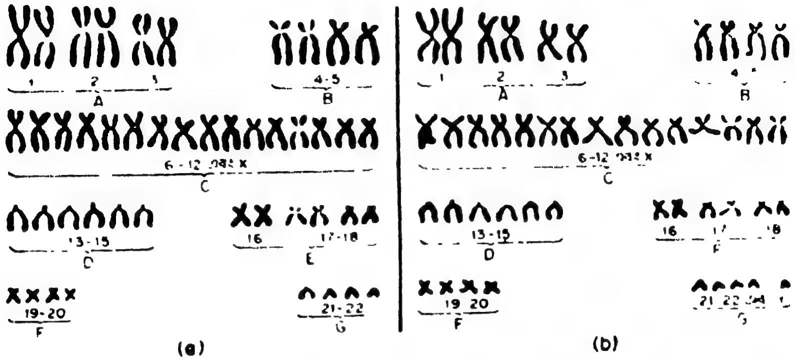


চিত্র 4.8 ধ্তুরার ট্রাইসোমি। চিত্রে স্বাভাবিক ফলের আকার এবং 12টি ক্রোমোসোমের প্রতিটির আলাদা আলাদা ট্রাইসোমি সৃষ্টি করিলে ফলের আকার কিরূপ পরিবর্তিত হয় তাহা দেখান হইয়াছে।

সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে মোট 12টি ট্রাইসোমিক অবস্থা পান। প্রতিটি ট্রাইসোমিকের ক্ষেত্রে আকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ বারটি ক্ষেত্রে 12 রকম ফিনোটাইপ পাওয়া যায় (চিত্র 4.8)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ফলের আকৃতিগত পরিবর্তনের জীনগুলি সকল ক্রোমোসোমে অবস্থিত। ট্রাইসোমিক অবস্থা ছাড়াও 12টি মনোসোমিক ও 12টি ন্যালিসোমিক অবস্থা পাওয়ার আশা করা যায় কিন্তু সেইগুলি বাঁচিয়া থাকে না বলিয়াই পাওয়া যায় না।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রজাতিতে অ্যানিউপ্লয়েড পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে অ্যানিউপ্লয়েড অবস্থা অত্যন্ত জটিল দৈহিক ও মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি করে। মানুষের ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা 46টি (Tjio এবং Levan 1956)। মানুষের দেহকোষের ক্রোমোসোম সাধারণতঃ মেটাফেজ দশায় পর্যালোচনা করা হয়। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলিকে তাহাদের তুলনামূলক আকার ও আকৃতি অনুযায়ী

সাজানো হয়। ক্রোমোসোমগুলির এই সজ্জাকে ইডিওগ্রাম (Ideogram) বলে (চিত্র 4.9)। পুরুষ ও মহিলার 22 জোড়া অটোসোম আকার ও আকৃতিতে



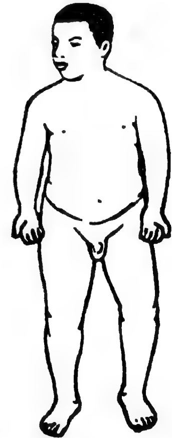
চিত্র 4.9 মানুষের ক্রোমোসোমের ইডিওগ্রাম। (a) = স্ত্রী, (b) = পুরুষ। লক্ষ্যণীয় দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ক্রোমোসোমগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

একই রকম কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে X ও Y ক্রোমোসোম এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে XX ক্রোমোসোম দেখা যায়। X ও Y ক্রোমোসোমকে সেক্স ক্রোমোসোম বলে।

অটোসোম ঘটিত অ্যানিউপ্লয়েড ও ফিনোটাইপগত বৈষম্য

ধুতরার ন্যায় মানুষের ক্ষেত্রেও ক্রোমোসোমের বিভিন্নতার জন্য ফিনোটাইপগত বিভিন্নতা দেখা যায়। বিবরণের সুবিধার জন্য ইহাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—অটোসোম ঘটিত ও সেক্স ক্রোমোসোম ঘটিত।

অটোসোম ঘটিত বৈষম্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ডাউন সিনড্রোমের (Down's syndrome) কথা জানা যায়। উহার অপর নাম মঙ্গোলিজম (Mongolism)। 1844 খ্রীষ্টাব্দে সেগুইন (Seguin) প্রথম ইহার বিবরণ দেন। 1959 খ্রীষ্টাব্দে লেজুনে (Lejune), টারপিন (Turpin) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ক্রোমোসোমের সহিত ইহার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ডাউন সিনড্রোমযুক্ত মানুষের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায় —



চিত্র 4.10 ডাউন সিনড্রোমযুক্ত মানুষের বাহ্যাকৃতি।

(1) ইহাদের মানসিক বৃদ্ধি ঘটে না, ঘটিলেও মানসিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত শ্লথ। বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে শিশু যে সকল জিনিস অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে শিখিয়া থাকে সেইগুলি ইহারা শিখিতে পারে না। অর্থাৎ ইহাদের আচরণ জড়বৎ হইয়া যায়।

(2) ইহারা দৈর্ঘ্যে বিশেষ বাড়ে না, হাত ও পা ছোট এবং তুলনামূলকভাবে মোটা (চিত্র 4.10)। হাতের তালুর রেখা সাধারণ মানুষের মত হয় না। জিহ্বা

ঝুলিয়া থাকে। হাত ও পায়ের প্রান্তে বানরের চামড়ার ন্যায় ভাঁজ দেখা যায়। চোখের পাতায় মঙ্গোলদের ন্যায় ভাঁজ (Epicanthic fold) থাকে।

(3) নানা প্রকার জন্মগত ত্রুটি বিশেষ করিয়া হৃদপিণ্ডের গঠন জনিত ত্রুটি প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেখা যায়।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয়শত শিশুর মধ্যে একটিতে ডাউন সিনড্রোম দেখা যায়। আমাদের দেশে সঠিক তথ্যের অভাবে এই হিসাব করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

মঙ্গোলিজমের ক্ষেত্রে 'ক্যারিওটাইপ' বা ক্রোমোসোমের আকৃতিগত বিশ্লেষণ করিয়া (অর্থাৎ মেটাফেজ ক্রোমোসোমের ছবি আকৃতি অনুযায়ী সাজাইয়া ইডিওগ্রাম প্রস্তুত করিলে) দেখা যায় যে 21-তম ক্রোমোসোম দুইটির পরিবর্তে তিনটি রহিয়াছে অর্থাৎ $(2n+1)$ বা ট্রাইসোমিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আকৃতিগতভাবে 21-তম ও 22-তম ক্রোমোসোম একরূপ হওয়ায় অবস্থাটি 21-তম ক্রোমোসোমের ট্রাইসোমিক অবস্থা অথবা 22-তম ক্রোমোসোমের ট্রাইসোমিক অবস্থা ইহা লইয়া সন্দেহ আছে। যাহা হউক 21 অথবা 22-তম ক্রোমোসোমের যে কোন একটির ট্রাইসোমিক অবস্থার জন্য মঙ্গোলিজম সৃষ্টি হইয়াছে ইহা অনুমান করা যায়।

মাতার বয়সের সহিত উহার সন্তানের মঙ্গোলিজম দশা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা জড়িত। বেশী বয়সে মাতৃত্বলাভ ঘটিলে জাত সন্তানদের মধ্যে এই সিনড্রোমের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু পিতার বয়সের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

অধিক বয়সের মায়ের জননকোষে অস্বাভাবিক মিয়োসিস ঘটার জন্য এই ট্রাইসোমিক অবস্থা ঘটে।

অন্যান্য অটোসোমের ক্ষেত্রেও ট্রাইসোমিক অবস্থা পাওয়া যায়। সেক্স ক্রোমোসোমের হ্রাসবৃদ্ধি জনিত ত্রুটিও পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতি অংশে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

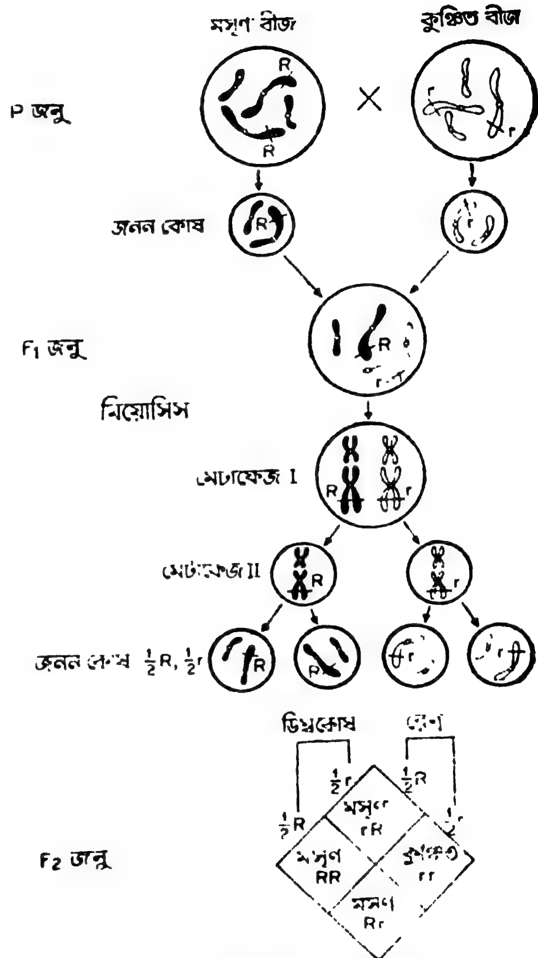
4.8 ক্রোমোসোমে জীনের উপস্থিতির প্রমাণ

মেন্ডেল বর্ণিত জীন ক্রোমোসোমে থাকে। কারণ ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে ফিনোটাইপের পরিবর্তন ঘটে। ইহা ছাড়া মিয়োসিস ও নিষেক পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমের আচরণ মেন্ডেল বর্ণিত জীন-এর ব্যবহারের অনুরূপ।

4.11 চিত্রের সাহায্যে সাটন-বোভারি-ক্রোমোসোমীয় তত্ত্বে কিভাবে জীনের ও ক্রোমোসোমের আচরণের সমতা ঘটে দেখান হইয়াছে।

আলোচ্য উদাহরণে একটি মসৃণ বীজ উৎপাদক গাছের সহিত একটি কুঞ্চিত বীজ উৎপাদক গাছের ইতর পরাগযোগ ঘটাইয়া মেন্ডেলের নীতি অনুযায়ী একসংকর পরীক্ষা ঘটাইলে ক্রোমোসোম কিভাবে ঐ নীতি অনুযায়ী এক জনু হইতে আর এক জনুতে যায় তাহা দেখান হইয়াছে। ক্রোমোসোম ও জীনের আচরণের সমতা প্রমাণ করে যে জীন ক্রোমোসোমে অবস্থিত। আলোচ্য উদাহরণে মাত্র একজোড়া ক্রোমোসোম

দেখান হইয়াছে ; ইহাদের যে কোন একটিতে R আছে এবং অন্যটিতে r আছে। মসৃণ মটর বীজের গাছে মিয়োসিসের ফলে উৎপন্ন জননকোষের প্রত্যেকটিতে R অ্যালিল থাকিবে ; অনুরূপভাবে কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের গাছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিতে r অ্যালিল থাকিবে। F_1 জনুতে দুইটি ক্রোমোসোমের একটিতে R ও অন্যটিতে r থাকে। এই F_1 জনুতে মিয়োসিসের ফলে যে জনন-কোষ উৎপন্ন হইবে তাহাদের প্রত্যেকটিতে একটি ক্রোমো-সোম থাকিবে এবং ইহাতে হয় R নতুবা r থাকিবে। এইভাবে দুই প্রকার জনন-কোষ 1 : 1 অনুপাতে উৎপন্ন হইবে। F_2 জনুতে উৎপন্ন জননকোষের যথেচ্ছ মিলনের ফলে 3 : 1 অনুপাতে মসৃণ ও কুঞ্চিত বীজের গাছ উৎপন্ন হইবে। দুইসংকর পরী-ক্ষাতে দুইজোড়া ক্রোমো-সোমের সহিত দুইজোড়া জীনের তুলনা করিলে কাম্য ফল পাওয়া যায় এবং এইরূপে একই সিদ্ধান্তে আসা যায়।



চিত্র 4.11 জীন ও ক্রোমোসোমের আচরণের সমতা।

মেণ্ডেল বর্ণিত স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রের সহিত দুইজোড়া ক্রোমোসোমের আচরণ কিভাবে সম্বন্ধযুক্ত তাহা দেখান যায় (চিত্র 3.10 দ্রষ্টব্য)। P_1 জনুতে মসৃণ, হলুদ (RR, YY) ও কুঞ্চিত সবুজের rr, yy মধ্যে দ্বিসংকরায়ণ ঘটানো হয়। যদি ধরা হয় একটি গাছের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের 1 জোড়ার প্রত্যেকটিতে R ও অপর জোড়ার প্রত্যেকটিতে Y আছে এবং অপর গাছের দুইজোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের 1 জোড়ার দুইটিতেই r এবং অপর হোমোলোগাস জোড়ার প্রত্যেকটিতে y আছে তবে F_1 জনুতে উৎপন্ন দ্বিসংকর গাছে একজোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটিতে

R ও অপরটিতে r থাকিবে। অন্য জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটিতে Y ও অপরটিতে y থাকিবে। F_1 জনুতে মিয়োসিসের সময় চারি প্রকার জনন-কোষ সমঅনুপাতে উৎপন্ন হইবে।

প্রথম মিয়োসিসের মেটাফেজ দশায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি একই বেমতন্তুর তন্তুতে আবদ্ধ হইবে কিন্তু যে মেরুর দিকে যে ক্রোমোসোম থাকিবে সেই ক্রোমোসোম সেইদিকে যাইবে এবং ইহার ফলেই চারি প্রকার সজ্জা উৎপন্ন হইবে। ইহার ফলে F_2 জনুতে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত পাওয়া যায় এবং এইরূপে ইহা মেণ্ডেল কর্তৃক প্রাপ্ত অনুপাতের সমান হয়।

এইরূপ জীন-ক্রোমোসোমের সমান্তরাল আচরণের মাধ্যমে ক্রোমোসোমে জীনের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই প্রমাণ অনেকখানি অনুমান নির্ভর; কারণ আলোচ্য উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে কোন্ ক্রোমোসোমে এবং ক্রোমোসোমের কোন্ স্থানে জীন অবস্থিত তাহা জানা যায় না। মরগান ও তাঁহার সহযোগীগণ সর্বপ্রথম কোন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট জীনের উপস্থিতি প্রমাণ করেন।

4.9 কোন তত্ত্বীয় ভাবে প্রমাণ করা যায় যে মেণ্ডেলের বংশগতি সূত্র মানুষের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য

আমেরিকার অ্যামিশ নামক (Amish Community of Lancaster County, Pennsylvania) একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীতে প্রায় শতকরা দশভাগ লোকের কোষের D গ্রুপের 14 নং ক্রোমোসোমে একটি তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বড় স্যাটেলাইট দেখা যায় (চিত্র 4.12)। সাধারণ ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইট আকারে অনেক ছোট। এইভাবে 14 নং হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটিতে যদি বড় স্যাটেলাইট ও অন্যটিতে যদি ছোট স্যাটেলাইট থাকে তবে এই আকৃতিগত পার্থক্যকে সনাক্তকরণ চি হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইহাদের বংশগতি অনুসরণ করা সম্ভব। মেণ্ডেল তাঁহার পরীক্ষায় সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য জীনের বিপরীত চরিত্রলক্ষণযুক্ত দুইটি অ্যালিল লইয়াছিলেন। এখন এই 14 নং ক্রোমোসোমের ক্ষেত্রে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম জোড়ার একটিকে মেণ্ডেল বর্ণিত কোন জীন যুগলের একটির সঙ্গে তুলনা করিয়া এবং অপর ক্রোমোসোমকে অপর অ্যালিল-এর সহিত তুলনা করিলে একই ধরনের অবস্থায় আসা যাইবে। দুই পর্যায় মিয়োসিসের মাধ্যমে জননকোষ হইতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এই সময়ে একজোড়া নির্দিষ্ট হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পরস্পর হইতে পৃথক হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অপত্য কোষে যায়। দ্বিরূপ যুক্ত হেটেরো-জাইগাস ক্রোমোসোম এইভাবে দুই প্রকার হ্যাপলয়েড জননকোষ উৎপন্ন করে: এক প্রকারের মধ্যে থাকে বড় স্যাটেলাইটযুক্ত 14 নং ক্রোমোসোম, অন্য প্রকারের মধ্যে থাকে স্বাভাবিক স্যাটেলাইটযুক্ত 14 নং ক্রোমোসোম। স্বাভাবিক ব্যক্তির সহিত দ্বিরূপ 14 নং ক্রোমোসোমযুক্ত নারীর বিবাহ হইলে F_1 জনুর সন্তানদের মধ্যে শতকরা 50 ভাগ ক্ষেত্রে 14 নং ক্রোমোসোমের দুইটিই স্বাভাবিক হইবে এবং অবশিষ্টের ক্ষেত্রে

ইহা দ্বিরূপ বিশিষ্ট হইবে : অর্থাৎ অনুপাত 1 : 1 হইবে। এই ধরনের বিবাহের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত জানা মোট 82 জন সন্তানের মধ্যে 47 জন দ্বিরূপ 14 নং ক্রোমোসোমযুক্ত পাওয়া গিয়াছে ; ইহা কাম্য ফল 50%-এর প্রায় কাছাকাছি।



চিত্র 4.12 অ্যামিশ জনগোষ্ঠীর একটি পুরুষের মেটাফেজ দশার ক্রোমোসোমসমূহ (a) তীর চিহ্ন দ্বারা বৃহৎ স্যাটেলাইটযুক্ত 14নং ক্রোমোসোম দেখান হইয়াছে। চতুর্থ গ্রুপের (D Group) ক্রোমোসোমের চিত্ররূপ (b)।

হেটারোজাইগাস × হেটারোজাইগাস বিবাহের ক্ষেত্রেও 1 : 2 : 1 ফল পাওয়া গিয়াছে (মেণ্ডেলের F_1 জনুর ক্রসের অনুরূপ)। উপরি-উক্ত জনগোষ্ঠীতে এই ধরনের একটিমাত্র ঘটনা পাওয়া গিয়াছে। এইক্ষেত্রে সন্তানের সংখ্যা ৪। ইহাদের মধ্যে সঠিক কাম্য অনুপাত পাওয়া গিয়াছে। এইভাবে কোষতত্ত্বীয় দিক হইতে মানুষের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের বংশগতির পৃথগীভবন সূত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

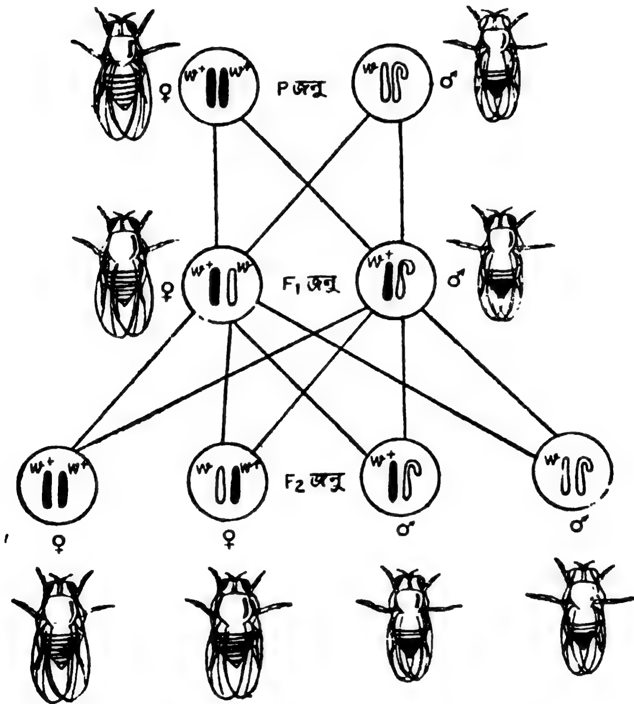
মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র—বংশগতির স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রও অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়। এইক্ষেত্রে একজোড়ার পরিবর্তে দুইজোড়া আকৃতিগত বিভিন্নতাযুক্ত ক্রোমোসোম লইয়া কোষতত্ত্বীয় ভাবে কুলপঞ্জীর বিশ্লেষণ করিতে হয়।

4.10 লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি

মেণ্ডেলীয় বংশগতি ধ্রুব সত্য নহে। ইহার বহু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতি এইরূপ একটি ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারে ব্যতিক্রমের সাহায্যেই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্ষেত্রেও মরগান, ব্রিজেস ও মরগানের অন্যান্য সহযোগীগণ সর্বপ্রথম লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতির সাহায্যে মেণ্ডেল প্রতিষ্ঠিত বংশগতির নিয়মগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেন।

ইহারা সর্বপ্রথম এমন একটি ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার গোষ্ঠী খুঁজিয়া পান যাহাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক লাল চোখের পরিবর্তে সাদা চোখ ছিল। সাদা চোখ পুরুষের সহিত সাদা চোখ স্ত্রী ড্রসোফিলার ক্রস ঘটাইলে সাদা চোখ ড্রসোফিলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাদা চোখ পুরুষ ড্রসোফিলার সহিত স্বাভাবিক (লাল) চোখ স্ত্রী ড্রসোফিলার ক্রসের ফলে উৎপন্ন অপত্যদের মধ্যে মেণ্ডেলীয় বংশগতি অনুযায়ী কাম্য ফল পাওয়া যায় না।

একটি স্বাভাবিক চোখ স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত সাদা চোখ পুরুষ ড্রসোফিলার ক্রস ঘটাইলে F_1 জনুতে উৎপন্ন সকল অপত্যই স্বাভাবিক চোখের হয় এবং ইহাই

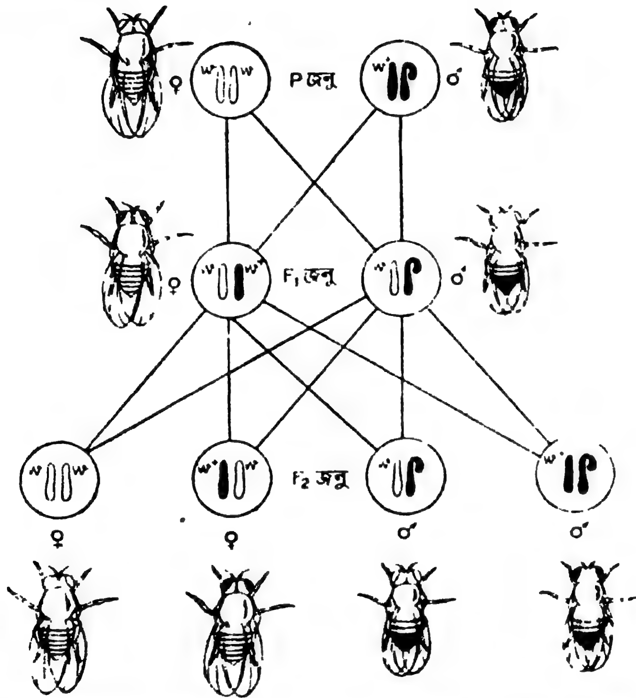


চিত্র 4.13 : ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটারের লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি। স্বাভাবিক লাল চক্ষু (W^+) স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত সাদা চক্ষু (w) পুরুষ ড্রসোফিলার ক্রশ ও ফলাফল।

মেণ্ডেলীয় বংশগতি অনুযায়ী কাম্য ফল ; কিন্তু F_1 জনুর উক্ত স্বাভাবিক চোখের ড্রসোফিলার পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে ক্রস ঘটাইলে F_2 জনুতে 3 : 1 অনুপাতে স্বাভাবিক চোখ ও সাদা চোখের অপত্য ড্রসোফিলা উৎপন্ন হয় (চিত্র 4.13)। ইহাও মেণ্ডেলীয় বংশগতি অনুযায়ী কাম্য ফল—কারণ স্বাভাবিক চোখ সাদা চোখের উপর প্রকট। কিন্তু এইক্ষেত্রে এই 3 : 1 অনুপাতের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—F_2 জনুর সকল স্ত্রী ড্রসোফিলা স্বাভাবিক চোখযুক্ত কিন্তু অর্ধেক পুরুষ ড্রসোফিলা সাদা চোখযুক্ত ও বাকি অর্ধেক লাল চোখযুক্ত। মেণ্ডেলীয়

বংশগতি অনুযায়ী স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের এক-তৃতীয়াংশ সাদা চোখযুক্ত হওয়াই কাম্য কিন্তু তাহার পরিবর্তে সাদা চোখ কেবলমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

অন্য একটি ব্যতিক্রম হইল যে F_2 জনুতে দুই শ্রেণীর স্ত্রী ড্রসোফিলার উৎপত্তি—একটি বিশুদ্ধ লাল চোখযুক্ত এবং অপরটি সংকর লাল চোখযুক্ত। পুরুষের ক্ষেত্রে সাদা ও লাল চোখ উভয়ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ। জিনোটাইপের এই বৈষম্য পরীক্ষা ক্রসের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়।



চিত্র 4.14 ড্রসোফিলার লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি – সাদা চক্ষু (w), স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত স্বাভাবিক লাল চক্ষু W⁺ পুরুষের ক্রস ও ফলাফল।

যদি P_1 জনুতে সাদা চোখ স্ত্রী ড্রসোফিলা ও লাল চোখ পুরুষ ড্রসোফিলা লওয়া হয় তবে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার ফল পাওয়া যায় (চিত্র 4.14)।

F_1 জনুর অপত্যদের সবাই লাল চোখযুক্ত না হইয়া অর্ধেক লাল চোখযুক্ত এবং বাকি অর্ধেক সাদা চোখযুক্ত হয়। যদি লাল ও সাদা প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্কযুক্ত হয় তবে মেন্ডেলীয় বংশগতি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে লাল চোখ হওয়া উচিত। আরও দেখা যায় যে লাল চোখের সকল ড্রসোফিলা স্ত্রী এবং সাদা চোখের সবগুলি পুরুষ ড্রসোফিলা। F_1 জনুর এই অপত্যদের মধ্যে ক্রস ঘটাইলে F_2 জনুতে এক-চতুর্থাংশ সাদা চোখযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে অর্ধাংশ সাদা চোখযুক্ত এবং বাকি অর্ধেক লাল চোখযুক্ত হয় এবং এইক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ক্ষেত্রে ইহা সমভাবে দেখা যায়।

মরগানের ব্যাখ্যা

মরগান উপরের পরীক্ষার ফলাফল নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করেন। (1) ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার প্রজাতিতে মোট চারিজোড়া ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। ইহাদের প্রথম জোড়া পুরুষের ক্ষেত্রে একটি X এবং অপরটি Y ক্রোমোসোম এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে দুইটিই X ক্রোমোসোম। বাকি তিনজোড়া অটোসোম উভয় ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ ক্রোমোসোম সূত্র স্ত্রীদের ক্ষেত্রে $3AA+XX$ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে $3AA+XY$ (A=অটোসোম)। এই ক্ষেত্রে চোখের বর্ণের জীন X ক্রোমোসোমে আছে এবং Y ক্রোমোসোমে এই জীন থাকে না। যদিও ক্রোমোসোম যুগলে থাকে এবং উহারা পরস্পর হোমোলোগাস কিন্তু এই ক্ষেত্রে আদৌ তাহা নয়। আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভাবে X ক্রোমোসোম Y ক্রোমোসোম হইতে ভিন্ন। X ক্রোমোসোম টিলোসেন্ট্রিক ও Y ক্রোমোসোম সাবমেটাসেন্ট্রিক।

(2) X ও Y ক্রোমোসোম নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। স্ত্রী ড্রসোফিলার দুইটি X ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি জনিতৃ জনুর মাতা ও অপরটি পিতার নিকট হইতে আসে এবং এই দুইটি X ক্রোমোসোমের একটি করিয়া পুরুষ ও স্ত্রী অপত্যদের প্রত্যেকের মধ্যে পরিবাহিত হয়। অপরপক্ষে পুরুষ ড্রসোফিলা তাহার X ক্রোমোসোমটি মাতৃ উৎস হইতে পায় এবং উহা কেবলমাত্র কন্যা সৃষ্টিতে পরিবাহিত হয়। ইহার ফলে কোন বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জীন X ক্রোমোসোমে থাকিলে তাহা ক্রিস ক্রস বংশগতি অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ পুরুষের ঐ বৈশিষ্ট্য কন্যার মাধ্যমে F_2 জনুর পুত্রে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু F_1 জনুর পুত্রদের মধ্যে প্রকাশিত হইবে না এবং ইহার ফলে উহাদের মধ্য দিয়া F_2 জনুর কন্যার মধ্যেও প্রকাশিত হইবে না। এইরূপে মরগান সিদ্ধান্ত করেন যে চোখের বর্ণের জীন 'X' ক্রোমোসোমে অবস্থিত এবং ইহাকে তিনি লিঙ্গ সংযোজিত জীন আখ্যা দেন।

কোন বিশেষ জীনের বংশগতি জনিত ব্যবহার ও কোন বিশেষ ক্রোমোসোমের বংশগতি জনিত ব্যবহার সমান্তরাল। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ইহা প্রণিধানযোগ্য হওয়ার ফলে বংশগতির ক্রোমোসোমীয় তত্ত্ব একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

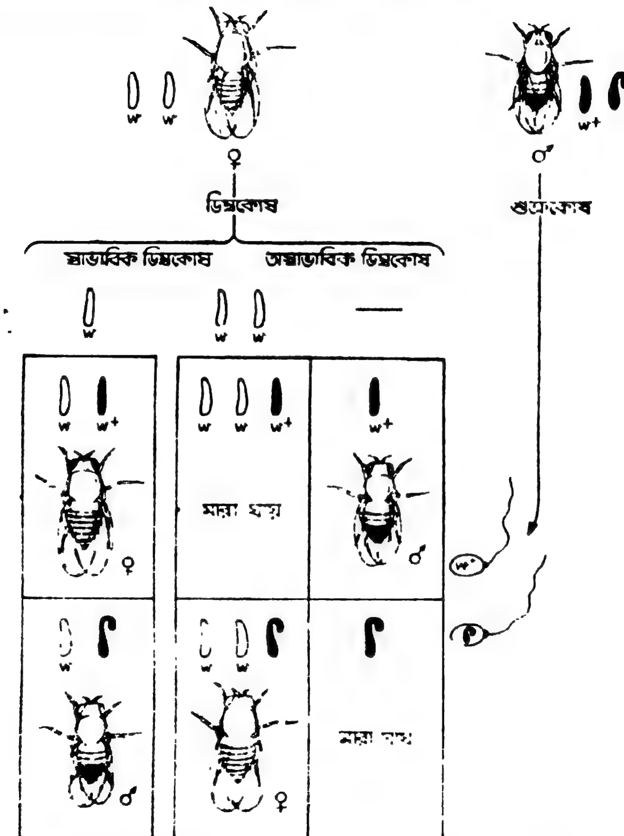
ছয় বৎসর বাদে ব্রিজেস সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে লিঙ্গ সংযোজিত জীন X ক্রোমোসোমে অবস্থিত।

X-ক্রোমোসোমের প্রাথমিক বিভাজনহীনতা (Primary Non-disjunction)

মরগানের লিঙ্গ সংযোজিত পরীক্ষায় সাদা চোখ স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত লাল চোখের পুরুষ ড্রসোফিলার ক্রস ঘটাইলে F_1 জনুতে সকল স্ত্রী অপত্য লাল চোখযুক্ত ও সকল পুরুষ অপত্য সাদা চোখযুক্ত হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় F_1 জনুতে উৎপন্ন প্রায় 2000 ড্রসোফিলার মধ্যে একটির ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত চোখযুক্ত ড্রসোফিলা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পুরুষ অপত্য সাদা চোখযুক্ত না হইয়া লাল চোখযুক্ত হয় এবং স্ত্রী অপত্য লাল চোখযুক্ত না হইয়া

সাদা চোখযুক্ত হয়। যেহেতু আগেই অনুমান করা হইয়াছে চোখের বর্ণের এই জীন X ক্রোমোসোমে থাকে, সেইজন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মেটাফেজ ক্রোমোসোমের কোনরূপ পরিবর্তন এই অনাকাঙ্ক্ষিত চোখযুক্ত ড্রসোফিলাতে থাকা সম্ভব এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সাদা চোখের স্ত্রী-অপত্যের দেহকোষে দুইটি X ক্রোমোসোম ও একটি Y ক্রোমোসোম আছে এবং লাল চোখের অপত্য পুরুষে একটিমাত্র 'X' ক্রোমোসোম আছে।

কিন্তু ক্রোমোসোমগত এই বৈষম্য কিরূপে ঘটিল ?

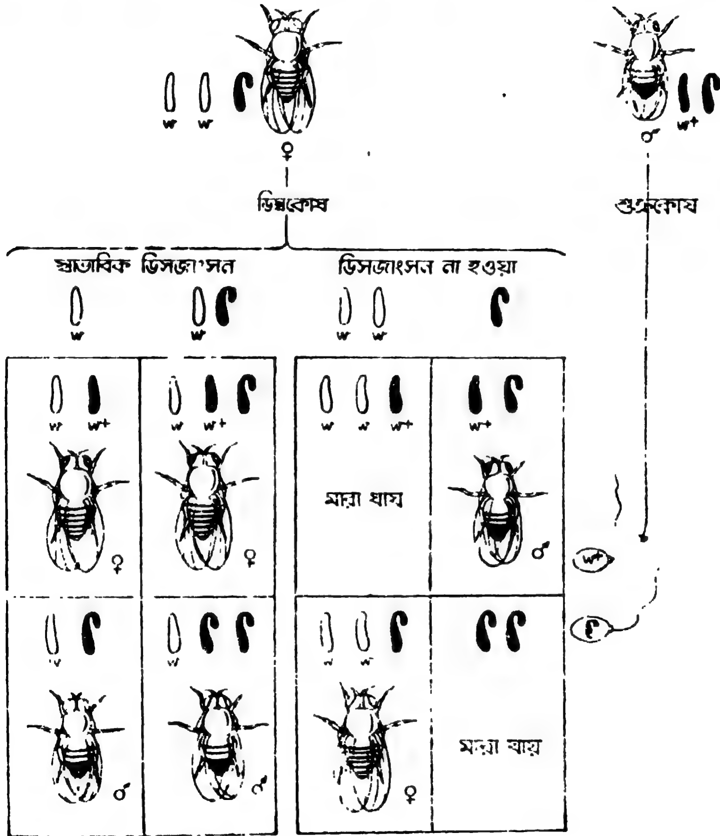


চিত্র 4.15 ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাস্টারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নন্-ডিসজাংসন। তুলনার জন্য বামদিকে স্বাভাবিক অবস্থা দেখান হইয়াছে।

ব্রিজেস্ প্রদত্ত ব্যাখ্যা : ব্রিজেস্ প্রস্তাব করেন যে অনাকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে XXY গঠন উৎপন্ন হয়। জনিতা স্ত্রী-ড্রসোফিলাতে প্রথম মিয়োসিসের সময় দুইটি X ক্রোমোসোম দুই মেরুতে যাওয়ার পরিবর্তে একই মেরুতে যায় এবং ইহার ফলে উৎপন্ন ডিম্বাণুর একশ্রেণীতে XX থাকে এবং অন্যটিতে কোন

X থাকে না। XX যুক্ত ডিম্বাণু 'Y' ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হইলে উৎপন্ন ড্রসোফিলা স্ত্রী হইবে এবং যেহেতু জনিতা স্ত্রী-ড্রসোফিলা সাদা চোখযুক্ত ছিল, সেইজন্য অপত্য XXY যুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার চোখ সাদা হইবে আবার XX ডিম্বাণু X যুক্ত শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হইলে বাঁচিয়া থাকে না এবং এই কারণে এই ধরনের কোন ড্রসোফিলা পাওয়া যায় না (চিত্র 4.15)।

আবার যখন X বিহীন ডিম্বাণু X ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয় তখন উৎপন্ন ভ্রূণাণু শুধুমাত্র X যুক্ত হয় এবং যেহেতু লাল চোখের অ্যালিলযুক্ত



চিত্র 4.16 ড্রসোফিলা মেলানো[illegible] [illegible] বিভাজন হীনতা : উহার সম্ভাব্য কারণ ও ফলাফল।

এই ক্রোমোসোম পিতৃসূত্র হইতে আসে, সেইজন্য উৎপন্ন ড্রসোফিলাটি লাল চোখ-যুক্ত পুরুষ হয়। ব্রিজেস্-এর প্রস্তাব সরল করিয়া প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী ড্রসোফিলা উভয় X ক্রোমোসোম তাহার মাতৃসূত্র হইতে লাভ

করে (এবং পিতৃসূত্র হইতে Y ক্রোমোসোম লাভ করে) ; এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষ ড্রসোফিলা তাহার X ক্রোমোসোম পিতৃসূত্র হইতে লাভ করে (এবং এই কারণে কোন Y ক্রোমোসোম থাকে না) ।

এইরূপে ক্রোমোসোমে জীনের উপস্থিতি প্রমাণ হয় এবং বংশগতির ক্রোমোসোমীয় তত্ত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় ।

গৌণ বিভাজনতা (Secondary Non-disjunction)

উপরের পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে Y ক্রোমোসোমবিহীন পুরুষ ড্রসোফিলা আকৃতিতে স্বাভাবিক হইলেও ইহারা জননক্ষম হয় না। কিন্তু XXY যুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলা আকৃতিতে স্বাভাবিক এবং জননক্ষম হয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সাদা চোখযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত ব্রিজেস্ লাল চোখযুক্ত স্বাভাবিক (XY) পুরুষ ড্রসোফিলার ক্রস ঘটান। ইহার ফলে দেখা যায় প্রায় 1% অপত্য স্ত্রী ড্রসোফিলা সাদা চোখযুক্ত হয়। এবং প্রায় 4% অপত্য পুরুষ ড্রসোফিলা লাল চোখযুক্ত হয়। প্রতি লিঙ্গের 96% ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে স্ত্রী অপত্যদের চোখ লাল এবং পুরুষ অপত্যদের চোখ সাদা হয়।

ব্রিজেসের প্রস্তাবানুযায়ী এই অনাকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষ পুনরায় জনিতা স্ত্রী ড্রসোফিলার জননকোষে মিয়োসিসের সময় X-ক্রোমোসোমের বিভাজনহীনতার ফলে উৎপন্ন হয় (চিত্র 4.16)।

ইহাকেই ব্রিজেস 'গৌণ বিভাজনহীনতা' নাম দেন, কারণ এই বিভাজনহীনতা ঘটে সেইসব স্ত্রী ড্রসোফিলাতে যেখানে 'প্রাথমিক বিভাজনহীনতা' ছিল (এবং ইহার ফলে দুইটি X ও একটি Y ছিল)।

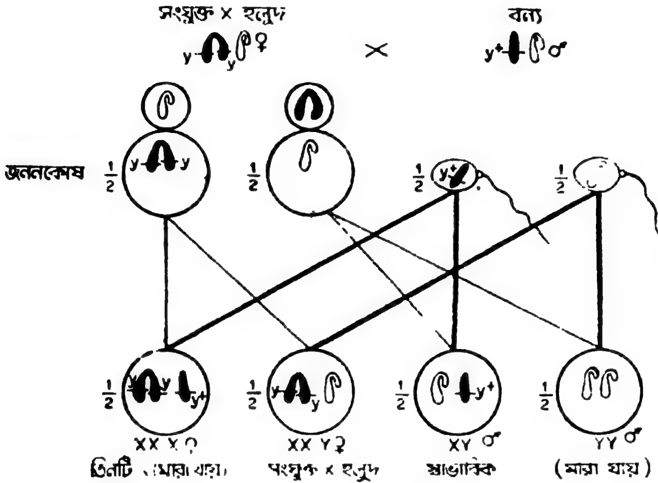
গৌণ বিভাজনহীনতা প্রতি 25টির মধ্যে একটিতে ঘটে কিন্তু প্রাথমিক বিভাজনহীনতা 2000টির মধ্যে একটিতে ঘটে অর্থাৎ গৌণ বিভাজনহীনতা প্রাথমিক বিভাজনহীনতা অপেক্ষা প্রায় 100 গুণ বেশী ঘটে।

সংযুক্ত XX (Attached X) ক্রোমোসোম সমন্বিত ড্রসোফিলার সাহায্যে প্রমাণ

ড্রসোফিলার X ক্রোমোসোম টিলোসেণ্ট্রিক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় X ক্রোমোসোম দুইটির সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হইয়া সংযুক্ত XX ক্রোমোসোম গঠিত হয়। 1983 খ্রীষ্টাব্দে মরগান এইরূপ একটি সংযুক্ত XX ক্রোমোসোমের ড্রসোফিলা গোষ্ঠী আবিষ্কার করেন (চিত্র 4.17)। ড্রসোফিলার হলুদ গাত্রবর্ণের y অ্যালিল একটি X-যুক্ত বা লিঙ্গ সংযুক্ত অ্যালিল। Y^+ অ্যালিল ইহার স্বাভাবিক অ্যালিল এবং ইহা y-এর উপর প্রকট। y জীনের প্রভাবে ড্রসোফিলার গাত্রবর্ণ হালকা হলুদ বর্ণের হয় কিন্তু ইহার স্বাভাবিক বর্ণ কিছুটা বাদামী হলুদ।

পরীক্ষায় দেখা যায় স্বাভাবিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত স্বাভাবিক পুরুষের ক্রস ঘটাইলে F^1 জনুতে কেবলমাত্র হলুদ স্ত্রী অপত্য উৎপন্ন হয়

এবং সব পুরুষ অপত্য স্বাভাবিক হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় হওয়া উচিত ছিল হলুদ অপত্য পুরুষ ও স্বাভাবিক অপত্য স্ত্রী। হলুদ অপত্য স্ত্রী প্রতিক্ষেত্রেই একই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ফল উৎপন্ন করে অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে স্ত্রী অপত্য হলুদ বর্ণের হয় এবং পুরুষ অপত্য স্বাভাবিক বর্ণের হয়। মেটাফেজ ক্রোমোসোম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই অনাকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী-



চিত্র 4.17 সংযুক্ত X ক্রোমোসোমের জন্য নন্-ডিসজাংসন। সংযুক্ত X ক্রোমোসোম ও হলুদবর্ণ যুক্ত স্ত্রী হইতে কেবলমাত্র দুই প্রকার ডিম্ব পাওয়া যায়, কারণ মিয়োসিসের সময় সংযুক্ত X ক্রোমোসোম দুইটি একসঙ্গে থাকে এবং একই মেরুতে যায়। X ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হইলে এই সকল ডিম্ব হইতে সৃষ্ট জাইগোট তিনটি X ক্রোমোসোম (মারা যায়) না হয় একটি X ও একটি Y ক্রোমোসোম যুক্ত স্বাভাবিক পুরুষ স্ফুরিত হয়। Y ক্রোমোসোম বাহক শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হইলে দুইটি সংযুক্ত X ও Y যুক্ত জাইগোট অথবা দুইটি Y ক্রোমোসোম বাহক জাইগোট উৎপন্ন হয়।

ড্রসোফিলার দুইটি X ক্রোমোসোম সেণ্ট্রোমিয়ার দ্বারা যুক্ত এবং এই ক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোমও থাকে।

এইরূপে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে X ক্রোমোসোমে y জীন অবস্থিত। X ক্রোমোসোমস্থিত অন্যান্য জীনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

এই পরীক্ষার দ্বারা আর একটি বিশেষ বিষয় প্রমাণিত হয়। একটি ক্রোমোসোমে একাধিক জীন উপস্থিত থাকিতে পারে। কিন্তু কোন ক্রোমোসোমে একাধিক জীন থাকিলে উহাদের এক জনু হইতে অন্য জনুতে একত্রে যাইবার সম্ভাবনা সমধিক। এই সকল জীন ক্রোমোসোমে কিভাবে থাকে তাহা বিশেষভাবে লিংকেজ অংশে আলোচনা করা হইয়াছে।

4.11 Y-ক্রোমোসোম ও লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি

যে সকল লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতি আলোচনা করা হইয়াছে তাহারা X ক্রোমোসোমে অবস্থিত এবং ইহাদের কোন অ্যালিল Y ক্রোমোসোমে থাকে না। এই কারণে পুরুষ (অথবা হেটারোগ্যামেটিক লিঙ্গ) এই সকল লিঙ্গ সংযোজিত জীনের ক্ষেত্রে হেমিজাইগাস এবং পুরুষের ক্ষেত্রে এই হেমিজাইগাস অবস্থার জন্য প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যে কোন অ্যালিলই নির্দিষ্ট ফিনোটাইপ প্রকাশিত করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে Y ক্রোমোসোমে কি কোন জীন থাকে না ? দেখা গিয়াছে X ক্রোমোসোমস্থিত অধিকাংশ জীনের কোন অ্যালিল Y ক্রোমোসোমে থাকে না। Y ক্রোমোসোম সম্পূর্ণভাবে জীনবিহীন নয়। Y ক্রোমোসোমের ক্ষেত্রে যে অল্পসংখ্যক জীন আছে তাহাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(1) যে সকল জীন কেবলমাত্র Y ক্রোমোসোমে অবস্থিত এবং (2) যে সকল জীন X এবং Y উভয় ক্রোমোসোমে উপস্থিত থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে পুরুষ হেটারোগ্যামেটিক লিঙ্গ সেই সকল ক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোম পিতৃজনিতা হইতে কেবলমাত্র অপত্য জনুর পুরুষে পরিবাহিত হয়। এইরূপ পিতা হইতে পুত্রে পরিবাহিত বংশগতিকে হোলান্ড্রিক বংশগতি বলে।

মানুষের ক্ষেত্রেও পুরুষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য Y ক্রোমোসোমের প্রয়োজন। যাহাদের ক্ষেত্রে একটি X থাকে কিন্তু Y থাকে না তাহারা ফিনোটাইপগতভাবে স্ত্রী, যদিও তাহারা জননক্ষম হয় না। ড্রসোফিলা Y ক্রোমোসোমবিহীন ও একটি X ক্রোমোসোমযুক্ত হইলে ফিনোটাইপগতভাবে পুরুষ হইবে কিন্তু জননক্ষম হইবে না। এইক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোমে শুক্রাণু প্রস্তুতির জীন অবস্থিত।

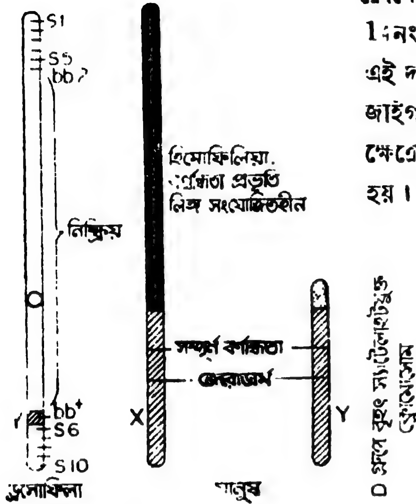
ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে কিছু জীন দেখা যায় যাহাদের অ্যালিল X এবং Y উভয় ক্রোমোসোমে উপস্থিত। Y ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীন এইরূপ একটি প্রচ্ছন্ন জীন যাহা ড্রসোফিলার রোম (Bristle = bb)-কে তুলনামূলকভাবে ছোট ও সরু করে।

এই bb জীনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহা অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে নিউক্লিওলাস-সংগঠক জীনের সহিত যুক্ত।

যদি ($X^{bb}X^{bb}$) যুক্ত হোমোজাইগাস স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত ($X^{bb^+}Y^{bb}$) যুক্ত হেটারোজাইগাস পুরুষের ক্রস ঘটানো যায় তবে দেখা যায় যে F_1 জনুর সকল স্ত্রী অপত্য স্বাভাবিক হইবে ($X^{bb}X^{bb^+}$) এবং সকল পুরুষ অপত্য ববড্ (Bobbed) হইবে ($X^{bb}Y^{bb}$)। যদি হেটারোজাইগাস পুরুষের Y ক্রোমোসোমে এই জীনের প্রকট অ্যালিল থাকে (অর্থাৎ $X^{bb}Y^{bb^+}$ হয়) তবে F_1 জনুর সব স্ত্রী অপত্য $X^{bb}Y^{bb}$ যুক্ত এবং ববড্ হইবে। আর সকল পুরুষ অপত্য স্বাভাবিক ($X^{bb}Y^{bb^+}$) হইবে।

মানুষের ক্ষেত্রে Y-ক্রোমোসোমস্থিত কয়েকটি জীন চিত্রে দেখান হইয়াছে (চিত্র 4.18)।

আমরা জানি পুরুষের ক্ষেত্রে 22 জোড়া অটোসোম ছাড়াও X ও Y ক্রোমোসোম থাকে এবং ইহারা আকৃতিগতভাবে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয়যোগ্য। এখন অ্যামিস জনগোষ্ঠীতে যদি কোন পুরুষের 14 নং ক্রোমোসোম দ্বিরূপযুক্ত থাকে তবে উক্ত ব্যক্তিকে 14নং ক্রোমোসোম এবং X ও Y ক্রোমোসোম এই দুই জোড়া ক্রোমোসোমের ক্ষেত্রে হেটারোজাইগাস বলিয়া বিবেচনা করা যায়। এই ক্ষেত্রে পুরুষের চারি প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। উক্ত পুরুষের সহিত স্বাভাবিক 14 নং ক্রোমোসোমযুক্ত মহিলার বিবাহ হইলে ফলাফল মেণ্ডেলের টেস্ট ক্রস-এর মত 1 : 1 : 1 : 1 হইবে। উপরি-উক্ত জনগোষ্ঠীর এই ধরনের 7টি বিবাহে 41 জন সন্তানের কোষতত্ত্বীয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল 4.19 চিত্রে দেখান হইয়াছে। অনুপাতের সামান্য পরিবর্তন এইক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।



চিত্র 4.18 ড্রসোফিলার Y ক্রোমোসোমস্থিত জীন ও মানুষের X ও Y ক্রোমোসোমের হোমোলোগাস অংশ।

D গ্রুপের স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোসোম	পুরুষ Y আছে	স্ত্রী Y নাই
থাকে	17	11
থাকে না	6	7

চিত্র 4.19 অ্যামিস জনগোষ্ঠীতে হেটারোজাইগাস পুরুষ ও হোমোজাইগাস স্বাভাবিক নারীর বিবাহে (7টি) প্রাপ্ত অপত্যসমূহ।

4.12 মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতি

X-লিংকেজ

X-ক্রোমোসোমস্থিত জীন অন্যান্য অটোসোমস্থ জীনের মত প্রকট বা প্রচ্ছন্ন হইতে পারে। মহিলাদের দেহকোষে X-ক্রোমোসোম কোন বিশেষ জীনের পরিপ্রেক্ষিতে হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকিতে পারে। ইহার ফলে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন ফিনোটাইপ প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে একটি X-ক্রোমোসোম থাকে, ফলে কোন নির্দিষ্ট জীনের একটিমাত্র অ্যালিল থাকিতে পারে। ইহাকে হেমিজাইগাস অবস্থা বলে। হেমিজাইগাস অবস্থায় প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যে কোন অ্যালিলই প্রকাশিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে X-ক্রোমোসোমস্থিত কোন

জীন মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক অনুসরণ করিলেও পুরুষের ক্ষেত্রে তাহা করে না। এই কারণে X-ক্রোমোসোমস্থিত জীন-এর বংশগতি লিঙ্গনির্ভর। এই জন্য X-ক্রোমোসোমস্থিত জীন-এর বংশগতিকে লিঙ্গ-সংযোজিত বংশগতি বলে। ইহা মেণ্ডেল-এর পৃথগীভবন সূত্র পালন করে না।

প্রথম মিয়োসিস্ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় ডিম্বাশয়ের উসাইট কোষের দুইটি হোমোলোগাস X-ক্রোমোসোম দুই বিপরীত মেরুতে যায় এবং ইহার ফলে প্রতিটি ডিম্বাণুতে একটি করিয়া X-ক্রোমোসোম থাকে। আবার শুক্রাশয়ে প্রথম মিয়োসিস এর অ্যানাফেজদশায় X ও Y ক্রোমোসোমের একটি এক মেরুতে এবং অন্যটি বিপরীত মেরুতে যায় এবং ইহার ফলে দুই শ্রেণীর শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এক শ্রেণীতে X-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি এবং অপর শ্রেণীতে Y-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ইহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তোলে। X-যুক্ত শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হইলে উৎপন্ন ভ্রূণ স্ত্রী এবং Y-যুক্ত শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হইলে পুরুষ হইবে। এইজন্য মাতৃজনিতার X-ক্রোমোসোমে কোন জীনের প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অ্যালিল থাকিলে উহা সর্বদাই অপত্য জনুর পুরুষে প্রকাশ পাইবে। অ্যালিলটি প্রচ্ছন্ন হেটারোজাইগাস হইলে ইহা মাতৃজনিতায় অপ্রকাশিত থাকে। আবার শুক্রাণুস্থ X ক্রোমোসোমের জীন অপত্য জনুর কন্যাতে পরিবাহিত হয়। অ্যালিলটি প্রকট হইলে তবে অপত্য কন্যাতে ইহা প্রকাশিত হয় এবং প্রচ্ছন্ন হইলে কেবলমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থায় কন্যাতে ইহা প্রকাশ পায়। (হোমোজাইগাস হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই কম থাকে)

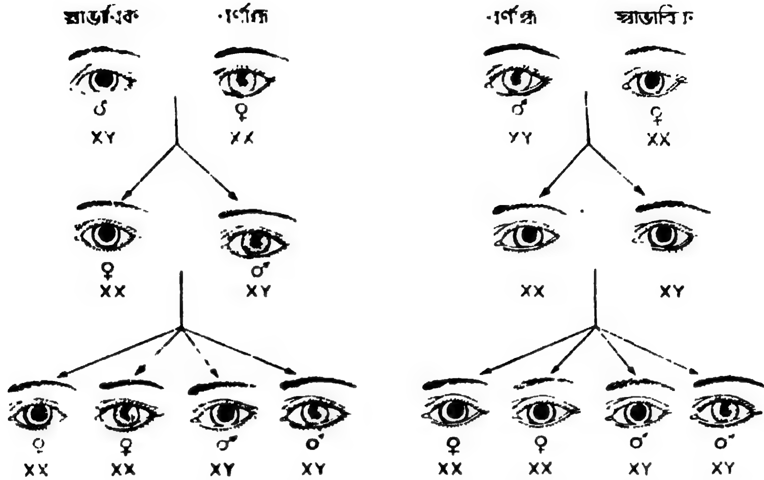
অতএব দেখা যাইতেছে X-ক্রোমোসোমস্থিত জীন জনিতা জনুর মাতা হইতে অপত্য জনুর কন্যাতে যায়, পুনরায় কন্যা হইতে পরবর্তী জনুর পুরুষে যায় এবং জনিতা জনুর পুরুষ হইতে অপত্য জনুর কন্যাতে যায়। এই বিশেষ ধরনের বংশগতিকে ক্রিস্ক্রস্ (Crisscross) বংশগতি বলে।

X-ক্রোমোসোমযুক্ত প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের বংশগতির দুইটি উদাহরণ (a) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা ও (b হিমোফিলিয়া।

(a) **লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা**: লিঙ্গ সংযোজিত জীনের বংশগতির ধারা ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে যেরূপ দেখা গিয়াছে, সেইরূপ বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে পুরুষ দুই শ্রেণীর জননকোষ উৎপন্ন করে এবং এইজন্য ইহাদের হেটারোগ্যামেটিক লিঙ্গ বলে। এই সকল X-ক্রোমোসোমস্থিত জীনের ক্ষেত্রে পুরুষদের হেমিজাইগাস বলা হয়, কারণ এই সকল জীনের ক্ষেত্রে তাহারা হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস কোনটাই নয়।

মানুষের ক্ষেত্রে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা মাতার দিক হইতে পুত্রে পরিবাহিত হয়—এই ঘটনা একশত বৎসর আগেই জানা ছিল। 1911 খ্রীষ্টাব্দে ই. বি. উইলসন্ সর্বপ্রথম মতপ্রকাশ করেন যে এই বর্ণান্ধতার বিশেষ বংশগতি বর্তমান এবং এই বৈশিষ্ট্যের অ্যালিল লিঙ্গ সংযোজিত ও স্বাভাবিক ফিনোটাইপের সহিত প্রচ্ছন্ন

সম্পর্কযুক্ত। শুধু তাহাই নয় এই বিশেষ ধরনের বংশগতিতে পুরুষে দুইপ্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয় (পুরুষ হেটারোগ্যামেটিক লিঙ্গ)। 4.20 চিত্রে এই বর্ণান্ধতার বংশগতি দেখান হইয়াছে এবং একইসঙ্গে ক্রোমোসোমগত গঠনও দেখান হইয়াছে। এখানে দেখা যায় বর্ণান্ধ মাতার সকল পুত্রই বর্ণান্ধ হয় এবং তাহার সকল কন্যা



চিত্র 4.20 লাল সবুজ বর্ণান্ধতার উত্তরাধিকার—লাল সবুজ বর্ণান্ধ মাতার সকল পুত্র বর্ণান্ধ ও সকল কন্যা বাহক। পুরুষের লাল সবুজ বর্ণান্ধতা উহার কন্যাদের মাধ্যমে অর্ধেক সংখ্যক নাতিতে পরিবাহিত হয়।

ইহার বাহক (অর্থাৎ হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে)। বর্ণান্ধ পুরুষ বর্ণান্ধতার জীন তাহার সকল কন্যার মধ্যে প্রেরণ করে এবং কন্যাদের মাধ্যমে তাহার নাতিদের অর্ধাংশের মধ্যে বর্ণান্ধতা দেখা যায়।

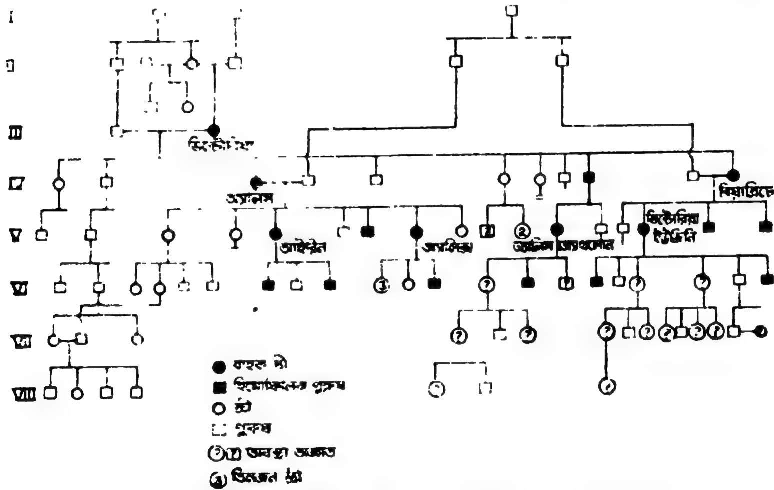
(b) **হিমোফিলিয়া**—হিমোফিলিয়ার প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের ক্রিসক্রস্ বংশগতি সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের কুলপঞ্জী বিশ্লেষণ করিয়া জানা যায়। মনে করা হয় মহারানী ভিক্টোরিয়া হিমোফিলিয়া অ্যালিলের বাহক। *X*-ক্রোমোসোমে অবস্থিত কোন প্রচ্ছন্ন অ্যালিল হেটারোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি হেটারোজাইগাস অবস্থায় এই অ্যালিলকে ধারণ করে তাহাকে বাহক (Carrier) বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা সভ্যরাই বাহক হয়, কারণ হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থা বিবাহের কারণে হইবার সম্ভাবনা খুব কম। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বাহক বলা হয় তাহার কারণ তাঁহার পিতা-মাতা বা কুল-সম্পর্কযুক্ত সমপর্যায়ের আত্মীয়ের ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়া প্রকাশিত হইতে দেখা যায় নাই। মহারাণীর এক পুত্র লিওপোল্ড্ যিনি আলবানির ডিউক ছিলেন, মাত্র 31 বৎসর বয়সে হিমোফিলিয়া জনিত কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহারাণীর

স্বামী রাজপুত্র অ্যালবার্টের হিমোফিলিয়া ছিল না এবং মিউটেশনের ফলে তাহার X-ক্রোমোসোমে উহা উৎপন্ন হইলেও অপত্য জনুর পুত্রে তাহা পরিবাহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপুত্র অ্যালবার্ট হইতে এই জীন পরবর্তী জনুতে আসে নাই ইহা সুনিশ্চিত।

কুলপঞ্জী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে অন্ততপক্ষে ভিক্টোরিয়ার দুই কন্যা এই হিমোফিলিয়া অ্যালিলের বাহক ছিলেন কারণ এই দুই কন্যার অধস্তন জনুর বহু পুরুষে হিমোফিলিয়া দেখা গিয়াছে।

রাশিয়ার শেষ জারের পুত্র জারেভিচ্ এবং স্পেনের রাজপুত্রদের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার হিমোফিলিয়া অ্যালিল বংশগতি সূত্রে আসার ফলে এক সময়ে অনেক রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল।

4.21 চিত্রে ভিক্টোরিয়ার কুলপঞ্জী বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে কোন পুরুষের কোন X-যুক্ত প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য পুত্রদের মধ্যে পরিবাহিত হয় না কিন্তু কন্যাদের মধ্যে পরিবাহিত হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে মাতা এই জীনের



চিত্র 4.21 মহারানী ভিক্টোরিয়ার কুলপঞ্জী—বংশধরদের মধ্যে হিমোফিলিয়ার উত্তরাধিকার দেখান হইয়াছে।

বাহক (হেটারোজাইগাস) বা এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত (হোমোজাইগাস) হইলে এই নীতি অনুসৃত হইবে না। X-যুক্ত জীনের পিতা-পুত্র পরিবহণ ঘটে না কারণ পিতার X ক্রোমোসোম কেবলমাত্র কন্যাতে পরিবাহিত হয়।

যদি কোন হিমোফিলিয়াযুক্ত পুরুষ কোন বাহক মহিলাকে বিবাহ করে তবেই তাহাদের কন্যা হিমোফিলিয়াযুক্ত হইতে পারে। তবে এই ধরনের হোমোজাইগাস অবস্থা অন্যান্য অটোসোমস্থিত প্রচ্ছন্ন জীনের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে সেইরূপ নিকট সম্পর্কযুক্ত বিবাহ হইলেই (Consanguinous matings) ঘটিতে দেখা যায়।

কখনও কখনও হিমোফিলিয়া হেটারোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশিত হইতে পারে।

মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় 70টি বৈশিষ্ট্য X-যুক্ত প্রচ্ছন্ন জীন দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই মানুষের ক্ষেত্রে রোগপ্রক্রিয় বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে (Pathologic)।

X-যুক্ত প্রকট জীনের বংশগতিতে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তবে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে তাহার পুত্র সন্তানের অর্ধেকের মধ্যে ও কন্যাদেরও শতকরা 50 ভাগের মধ্যে উক্ত জীন বাহিত ও প্রকাশিত হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে তাহার পুত্রদের মধ্যে উক্ত জীন পরিবাহিত হয় না, কেবলমাত্র সকল কন্যার মধ্যে উহা পরিবাহিত হয়। ভিটামিন D রোধী রিকেট্ বা হাইপোফস্‌ফাটেমিক রিকেট (Vitamin-D resistant rickets or hypophosphatemic rickets) এই শ্রেণীর একটি উদাহরণ। ইহার ফলে অস্থির গঠন বিকৃত হয় এবং রক্তে ফসফেট-এর পরিমাণ কম থাকে।

অনুচ্ছেদ 5

লিঙ্গ নির্ধারণ

5.1 লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination)

বংশ বিস্তার জীবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অযৌন ও যৌন এই দুই প্রকার পদ্ধতিতে জীব বংশ বিস্তার করে। উচ্চস্তরের জীব যৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে। যৌন পদ্ধতিতে পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে ভ্রূণ উৎপন্ন হয় এবং ভ্রূণ পরিস্ফুরিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শুক্রাশয়ে প্রাণীর পুরুষ জননকোষ বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে ডিম্বাশয়ে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। একটি প্রজাতির কিছু সভ্য কেবলমাত্র শুক্রাণু এবং বাকী সভ্য কেবলমাত্র ডিম্বাণু উৎপাদন করিতে পারে। একই প্রকার জননকোষ উৎপাদক প্রাণীকে **একলিঙ্গ** (Unisexual) প্রাণী বলে। শুক্রাণু উৎপাদক প্রাণীকে **পুরুষ** ও ডিম্বাণু উৎপাদক প্রাণীকে **স্ত্রী** বলা হয়। সুতরাং পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয় এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় মুখ্য **লিঙ্গ নির্ধারক বৈশিষ্ট্য**। ইহা ছাড়া কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ সভ্যের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈশিষ্ট্যগুলি ঐ প্রজাতির স্ত্রী সভ্যের মধ্যে দেখা যায় না। অনুরূপভাবে ঐ প্রজাতির স্ত্রী সভ্যের কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ঐ প্রজাতির পুরুষ সভ্যে পাওয়া যায় না। এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জনন-কোষের মিলনে বা নিষেকে সহায়তা করে এবং বহুক্ষেত্রে ভ্রূণের স্ফুরণে সহায়তা করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যৌন পদ্ধতির বংশবৃদ্ধিতে সহায়ক রূপে কাজ করে। বৈশিষ্ট্যগুলিকে **গৌণ লিঙ্গ নির্ধারক বৈশিষ্ট্য** বলে।

মেণ্ডেলীয় জীনতত্ত্ব হইতে জানা গিয়াছে যে প্রতি বৈশিষ্ট্য জীন দ্বারা নির্ধারিত হয়। পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ সৃষ্টি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের জটিল অথচ সুসংহত প্রকাশ মাত্র। সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে লিঙ্গ নির্ধারণে জীনের ভূমিকা প্রধান। কিন্তু কি ভাবে একটি ভ্রূণ স্ফুরিত হইয়া পুরুষ বা স্ত্রী প্রাণীতে পরিণত হয় তাহা এখনো সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই।

A. **ক্রোমোসোমভিত্তিক লিঙ্গ নির্ধারণ** (Chromosomal basis of sex determination)—প্রকৃতিতে উচ্চস্তরের প্রাণী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পুরুষ ও স্ত্রী সভ্যের সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকে। অবশ্য একাধিক কারণে এই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন প্রাণী গোষ্ঠীর পুরুষ সভ্যের সংখ্যাকে ঐ গোষ্ঠীর স্ত্রী সভ্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে ঐ প্রাণী গোষ্ঠীর ঐ নির্দিষ্ট সময়ের

লিঙ্গ অনুপাত (Sex ratio) বলে। সংখ্যাটি সাধারণতঃ এক (One) বা উহার কাছাকাছি।

লিঙ্গ অনুপাত এক (One) হইবার কারণ—উচ্চস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে হেটারোগ্যামেট উৎপাদক পুরুষ (XO বা XY শ্রেণী) বা স্ত্রী (ZO বা ZW শ্রেণী) এবং মনোগ্যামেট উৎপাদক স্ত্রী (XX শ্রেণী) বা পুরুষ (ZZ শ্রেণী) থাকায় লিঙ্গ অনুপাত এক (One) হইতে পারে।

(a) হেটারোগ্যামেট উৎপাদক পুরুষ (XO শ্রেণী) ও মনোগ্যামেট উৎপাদক স্ত্রী সভ্য থাকিলে

সাটন ও বোভারী 1903 খৃষ্টাব্দে গঙ্গাফড়িং জাতীয় কয়েকটি পতঙ্গের শুক্রাশয়ে মিয়োসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন নিরীক্ষা কালে একটি ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেন। (i) এই ক্রোমোসোমটি একা এবং ইহার কোন হোমোলোগাস সঙ্গী নাই; (ii) ইহা তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত রঞ্জক গ্রহণ করে; (iii) প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় এই ক্রোমোসোমটি অন্যান্য ক্রোমোসোমের তুলনায় আগে বা পরে একটি মেরুর দিকে যায়। উপরি উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার জন্য এই ক্রোমোসোমটির নাম দেওয়া হয় অ্যালো ক্রোমোসোম (Allo chromosome) বা হেটারো ক্রোমোসোম (Hetero chromosome) বা ইডিও ক্রোমোসোম (Idio chromosome), সেক্স ক্রোমোসোম (Sex chromosome) বা এক্স ক্রোমোসোম (X chromosome)। ইহাদের মধ্য হইতে এক্স ক্রোমোসোম (X chromosome) নামটি বহুল প্রচারিত।

এই এক্স ক্রোমোসোমের কোন হোমোলোগাস সঙ্গী না থাকায় শুক্রাশয়ে দুই প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোসোমের চলনের সময় যে কোন একটি মেরুতে উৎপন্ন অপত্য নিউক্লিয়াসে ইহাকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনে এই নিউক্লিয়াসটি হইতে এক্স ক্রোমোসোমযুক্ত দুইটি স্পার্মাটিড (Spermatid) তথা দুইটি শুক্রাণু উৎপন্ন হইবে। অপর পক্ষে মিয়োসিস বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় যে মেরুতে এক্স ক্রোমোসোম থাকিবে না সেই মেরুর অপত্য নিউক্লিয়াস হইতে দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের ফলে এক্স ক্রোমোসোমবিহীন দুইটি শুক্রাণু উৎপন্ন হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ধরনের পতঙ্গের শুক্রাশয়ে দুই শ্রেণীর শুক্রাণু (এক্স ক্রোমোসোমযুক্ত এবং এক্স ক্রোমোসোমবিহীন) উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের অনুপাত 1 : 1। দুই শ্রেণীর শুক্রাণু উৎপাদক পুরুষকে হেটারোগ্যামেট উৎপাদক পুরুষ বলা হয়।

মনোগ্যামেট উৎপাদক স্ত্রী (XX type)—সাটন ও বোভারী নিরীক্ষিত প্রজাতির স্ত্রী পতঙ্গের ডিম্বাশয়ের প্রতি কোষে একজোড়া এক্স ক্রোমোসোম (X chromosome) এবং ইহারা পরস্পরের হোমোলোগাস ছিল। প্রথম মিয়োসিস

বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় হোমোলোগাস এক্স ক্রোমোসোমের একটি এক মেরুতে এবং অন্যটি উহার বিপরীত মেরুতে যায়। ইহার ফলে দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনে উৎপন্ন সকল (চারিটি) নিউক্লিয়াসের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া এক্স ক্রোমোসোম উপস্থিত থাকে। এই চারিটি ডিম্বাণুর একটিমাত্র কার্যকরী হয়। বাকী তিনটি পোলার বডি (Polar body) সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে স্ত্রী পতঙ্গের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এক প্রকার ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় এবং ইহা এক্স ক্রোমোসোমযুক্ত। এক প্রকার ডিম্বাণু উৎপাদক স্ত্রীকে মনোগ্যামেট উৎপাদক স্ত্রী বলা হয়।

	শুক্রাশয়	ডিম্বাশয়
মিয়োসিস বিভাজনে	AA+XO	AA+XX
	↓	↓
উৎপন্ন জনন কোষ	AX, AO (দুই প্রকার শুক্রাণু)	AX, AX (এক প্রকার ডিম্বাণু)

(1) AX শুক্রাণু ও AX ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন ভ্রূণ = AA+XX = স্ত্রী।

(2) AO শুক্রাণু ও AX ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন ভ্রূণ = AA+XO = পুরুষ।

দুই শ্রেণীর শুক্রাণু সৃষ্টির এবং উহাদের প্রত্যেকের নিষেক করিবার সম্ভাবনা 50 : 50। সুতরাং পুরুষ সংখ্যা ÷ স্ত্রী সংখ্যা = 1।

AA = অটোসোম

উপরের ছক অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতেছে যে এক্স ক্রোমোসোমযুক্ত ও এক্স ক্রোমোসোমবিহীন শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত ডিম্ব হইতে AA+XX ও AA+XO এই দুই প্রকার ভ্রূণ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে AA+XX হইবে স্ত্রী ও AA+XO হইবে পুরুষ। AO ও AX যুক্ত শুক্রাণুর অনুপাত 1 : 1 হওয়ায় ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন পুরুষ ও স্ত্রী সংখ্যার অনুপাতও হইবে 1 : 1। এই ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ে দুই প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয় বলিয়া পুরুষকে হেটারোগ্যামেট উৎপাদক লিঙ্গ এবং ডিম্বাশয়ে কেবলমাত্র এক্স ক্রোমোসোম বহনকারী একই প্রকার ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় বলিয়া স্ত্রীকে মনোগ্যামেট উৎপাদক লিঙ্গ বলা হয়।

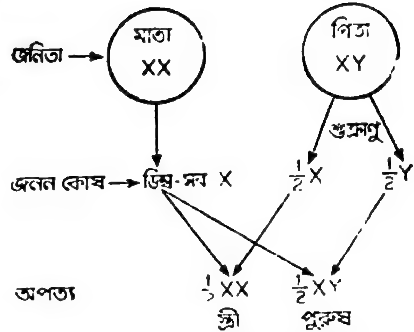
(b) হেটারোগ্যামেট (XY) উৎপাদক পুরুষ ও মনোগ্যামেট (XX) উৎপাদক স্ত্রী সত্তা থাকিলে

বহু জীবের পুরুষের দুইটি সেক্স ক্রোমোসোমের একটি X এবং অন্যটি Y এবং ইহারা পরস্পরের হোমোলোগাস নহে; যদিও প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সময় X ও Y ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগলবদ্ধতা ঘটে। ইহার ফলে প্রথম মিয়োটিক বিভাজনে X ক্রোমোসোম যে মেরুতে যায় Y ক্রোমোসোম সেই মেরুর বিপরীত মেরুতে

যায়। এইভাবে দুই প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয়—এক প্রকার শুক্রাণুতে X ক্রোমোসোম এবং অন্য প্রকার শুক্রাণুতে Y ক্রোমোসোম থাকে। ড্রসোফিলা, মানুষ এবং প্রায় সকল মেরুদণ্ডীর পুরুষ সভ্য এইভাবে দুই প্রকার শুক্রাণু উৎপাদন করে। অর্থাৎ ইহারা হেটারোগ্যামেট উৎপাদক। ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে X ক্রোমোসোম Y ক্রোমোসোমের আংশিক হোমোলোগাস। ইহাদের স্ত্রী সভ্যরা মনোগ্যামেট উৎপাদক। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ অনুপাত 1 : 1 হয় (চিত্র 5.1)।

(c) হেটারোগ্যামেট উৎপাদক স্ত্রী ও মনোগ্যামেট উৎপাদক পুরুষের ক্ষেত্রে

বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী হেটারোরোগ্যামেট ও পুরুষ মনোগ্যামেট উৎপাদক হয়। হেটারোগ্যামেট উৎপাদক স্ত্রী ZO অথবা ZW দ্বারা এবং মনোগ্যামেট উৎপাদক পুরুষ ZZ দ্বারা সূচিত হয়। এখানে X অক্ষর Z অক্ষর দ্বারা এবং Y অক্ষর W অক্ষর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হইয়াছে। মুরগী, প্রজাপতি, মথ, সাপ ইত্যাদির সেক্স ক্রোমোসোম এইভাবে চিহ্নিত। ইহাদের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ অনুপাত 1 : 1 হয়।

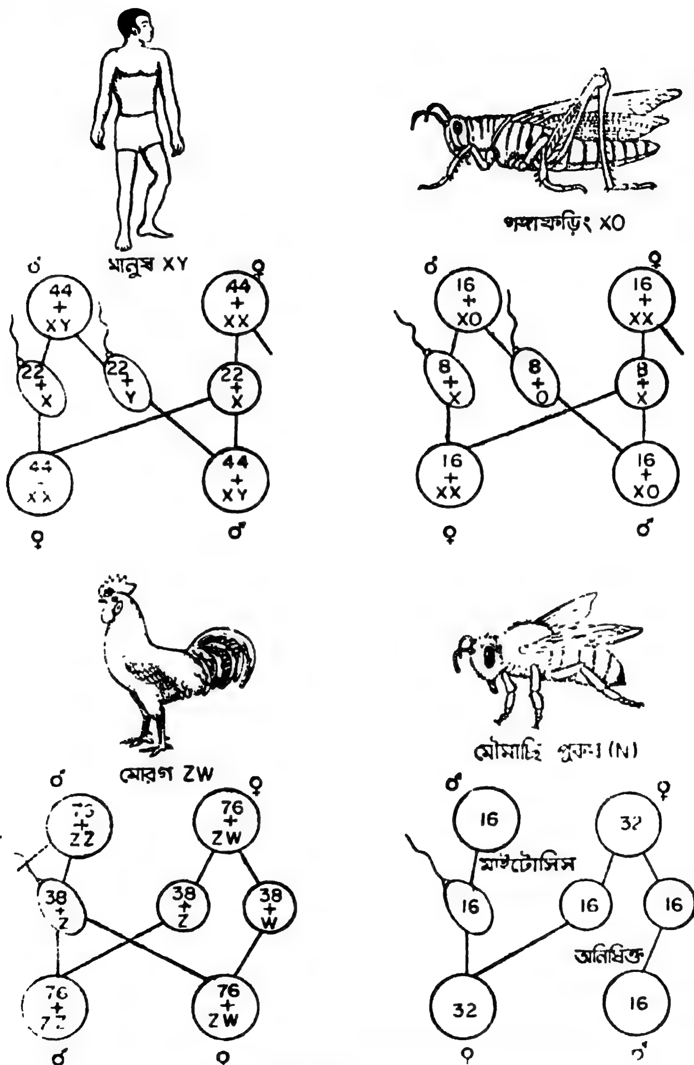


চিত্র 5.1 লিঙ্গ অনুপাত। মনোগ্যামেটিক ও হেটারোগ্যামেটিক সভাযুক্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত প্রায় এক (one)।

এখানে উল্লেখ্য যে উপরের উদাহরণগুলি হইতে ক্রোমোসোমগত ভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও কেবলমাত্র ক্রোমোসোমগত ভাবে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। জীনগত ভাবেও লিঙ্গ নির্ধারিত হয় এবং এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

B. হ্যাপলো ডিপ্লয়েড অবস্থায় (Haplo diploid) লিঙ্গ নির্ধারণ—পতঙ্গ শ্রেণীর পিপীলিকা ও মৌমাছিতে যে বিচিত্র উপায়ে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাহাকে হ্যাপলো ডিপ্লয়েড অবস্থার লিঙ্গ নির্ধারণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পিপীলিকা ও মৌমাছির সুনির্দিষ্ট কোন লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে না বা থাকিলেও উহা চিহ্নিত করা যায় না। তবে দেখা গিয়াছে ইহাদের ডিপ্লয়েড সংখ্যক ($2n$) ক্রোমোসোমধারী সভ্যের ফিনোটাইপ স্ত্রী এবং হ্যাপলয়েড সংখ্যক (n) ক্রোমোসোমধারী সভ্যের ফিনোটাইপ পুরুষ। স্ত্রী সভ্য নিষিক্ত ডিম্বক হইতে এবং পুরুষ সভ্য অনিষিক্ত ডিম্বক হইতে স্ফুরিত হয় (চিত্র 5.2)। এই সকল পতঙ্গের পুরুষ সভ্যরা পিতৃজনিতাহীন এবং ইহারা মাতামহের বংশগতি অর্জন করে। পুরুষদের শুক্রাণু

উৎপাদনে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন হয় না। কিন্তু ডিম্বাণু উৎপাদনে মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন হয়।

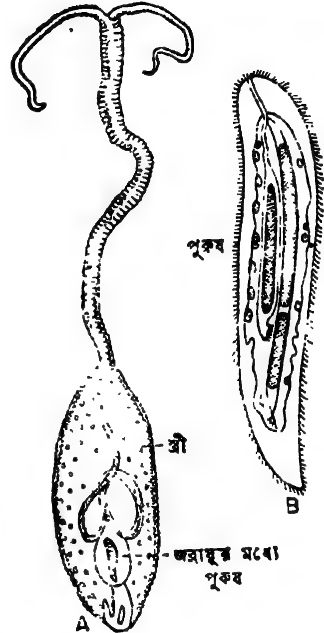


চিত্র 5.2 ক্রোমোসোমভিত্তিক লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতির প্রকারভেদ।

নিষিক্ত ডিম্বক হইতে স্ত্রী সভ্য উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা অধিক পুষ্টি লাভ করে তাহারা রাণী মৌমাছি বা রাণী পিপীলিকাতে রূপান্তরিত হয়। অধিক পুষ্টি লাভে বঞ্চিত স্ত্রী সভ্য 'কর্মী'তে রূপান্তরিত হয়।

C. **উভলিঙ্গ অবস্থা**—বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির একই সভ্যের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গ জনিত বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা উভয় লিঙ্গের কার্য সম্পাদন করে। এই অবস্থার জীবকে **উভলিঙ্গ** (Hermaphrodite) **জীব** বলে। অধিকাংশ উভলিঙ্গ জীবে স্বনিষেক পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটে। ইহার ফলে ইহাদের মধ্যে অযৌন জননের ন্যায় জীনগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিছু উভলিঙ্গ জীবে ইতর নিষেক হয়।

D. **লিঙ্গ নির্ধারণে পরিবেশের প্রভাব**—কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সামুদ্রিক বোনেলিয়ার (Bonellia) ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে যৌন জননে উৎপন্ন অপত্যগুলির মধ্যে যাহারা লার্ভা দশায় সন্তরণশীল ও স্বাধীনভাবে থাকে তাহারা স্ত্রী লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে (চিত্র 5.3)। পক্ষান্তরে যে সমস্ত লার্ভা পরিণত স্ত্রীদেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহগহ্বরে ডিম্বনালীর নিকট বা জরায়ুতে থাকে তাহারা পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য অর্জনের কারণ হিসাবে বলা হয় যে পরিণত স্ত্রীদেহ নিঃসৃত হরমোন এই ক্ষেত্রে প্রভাবকের কাজ করে।



চিত্র 5.3 বোনেলিয়ার যৌন দ্বিরূপতা ও লিঙ্গ নির্ধারণে বাহ্য পরিবেশের প্রভাব। A = স্ত্রী, B – পুরুষ (বহুগুণ বর্ধিত)।

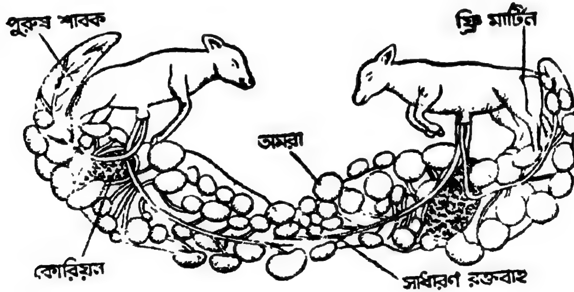
কোরাল রীফে (Coral reef) বসবাসকারী লাব্রয়িডিস ডিমিডিয়াটাস (*Labroides dimidiatus*) নামক মাছের মধ্যেও লিঙ্গ-নির্ধারণে পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই মাছগুলি দলবদ্ধ ভাবে থাকে। প্রতি দলে একটি পুরুষ মাছ ও অনেকগুলি স্ত্রী মাছ থাকে। কোন কারণে পুরুষ মাছটির মৃত্যু হইলে দলের সর্বাপেক্ষা বলবতী স্ত্রী মাছ অন্য একটি দল হইতে কোন পুরুষ মাছকে নিজের দলে আসিতে দেয় না। বাধাদান সার্থক হইলে স্ত্রী মাছটি পুরুষের ন্যায় আচরণ সুরু করে এবং এক পক্ষকালের মধ্যে পুরুষ মাছে রূপান্তরিত হইয়া শুক্রাণু উৎপাদনক্ষম হয়।

বীক্ষণাগারে ড্যাফনিয়া পালন কালে পালন পাত্রে ড্যাফনিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বেশী সংখ্যক পুরুষ জন্মায়। পালন পাত্রে খাদ্য ও অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিলে অ্যাফিড ও রটিফারের লিঙ্গ অনুপাত পরিবর্তিত হয়।

E. লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের প্রভাব—অনেক উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণে যৌন হরমোনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে এই হরমোনের প্রভাবে লিঙ্গ নির্ধারণের সোমাটিক (Somatic) পর্যায় প্রভাবিত হয় অর্থাৎ ইহাদের প্রভাবে লিঙ্গজনিত গৌণ চরিত্র লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়।

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে মোরগের শুক্রাশয়ের নির্যাস মুরগীর দেহে ইনজেকসন (Injection) করিলে মুরগীর মাথায় ঝুঁটি গঠিত হয়। পরিস্ফুরণরত স্ত্রী স্যালামাণ্ডারের দেহে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পুরুষ স্যালামাণ্ডারের শুক্রাশয় গ্রাফট (Graft) করিলে ডিম্বাশয় গঠন ব্যাহত হয়। ইহার বিপরীত গ্রাফটে শুক্রাশয় গঠন ব্যাহত হয়।

গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ফ্রি মার্টিন (Free martin) শাবক সৃষ্টি হরমোনের প্রভাবের ফল বলিয়া বিবেচিত। গবাদি পশুর একসঙ্গে একাধিক শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হওয়া যমজ শাবক কেবলমাত্র স্ত্রী, কেবলমাত্র পুরুষ অথবা পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও এইরূপ শাবক ভূমিষ্ঠ হয় যাহারা ক্লীবলিঙ্গ (Intersex)। এইরূপ শাবককে ফ্রি মার্টিন বলা হয় (চিত্র 5.4)। ফ্রি মার্টিন গঠনের ব্যাখ্যা হিসাবে লিটল (Little) যে বক্তব্য রাখিয়াছেন তাহা হইল একই সঙ্গে মাতার জরায়ুর মধ্যে গঠনরত শাবকদের আমরা



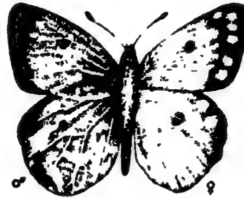
চিত্র 5.4 গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ফ্রি মার্টিন গঠন।

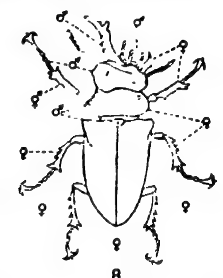
(Placenta) মাতার জরায়ু প্রাচীরে প্রোথিত হইলে গঠনরত শাবক দুইটির মধ্যে একই পথে রক্ত সংবাহিত হয়। শাবকদের মধ্যে যেটির পুরুষ লিঙ্গ (ক্রোমোসোমীয়) নির্ধারিত হইয়াছে সেইটি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। এই দ্রুত বর্ধনশীল পুরুষ শাবকটির দেহনিঃসৃত পুরুষ হরমোন অন্যটির (যেটি পূর্বে ক্রোমোসোমীয়ভাবে স্ত্রী) মধ্যে রক্ত সংবহনের মাধ্যমে যায়। পুরুষ যৌন হরমোনের প্রভাবে ডিম্বাশয় গঠিত হয় না। ফলে ক্লীবলিঙ্গের ও জননক্ষমতা বঞ্চিত ফ্রি মার্টিন গঠিত হয়।

F. অর্ধনারীশ্বর (Gynandromorphs)—কয়েকটি পতঙ্গের (ড্রসোফিলা, রেশম কীট) ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি সভ্য পাওয়া গিয়াছে যাহাদের দেহের অর্ধেক

(পাশাপাশি বা উপর নিচে) পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রীর ন্যায়। ইহাদের অর্ধনারীশ্বর বলা হয় (চিত্র 5.5)।

ব্রিজেস এবং মরগ্যান 1919 খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্গ নির্ধারণের ক্রোমোসোমীয় তত্ত্ব দ্বারা অর্ধনারীশ্বর গঠন ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে XX সমন্বিত জাইগোট হইতে সম্ভবতঃ অর্ধনারীশ্বর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যে জাইগোট স্ত্রী হইত সেইরূপ জাইগোট হইতে অর্ধনারীশ্বর সৃষ্টি হয়। পরিস্ফুরণের সময় জাইগোট বিভাজিত হয়। যদি বিভাজনের সময় কোন কারণে জনিতৃ কোষের দুইটি এক্স ক্রোমোসোমের একটি অপত্য কোষে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে দুই প্রকার অপত্য কোষ পাওয়া যায়। এক প্রকার অপত্য কোষে দুইটি এক্স ক্রোমোসোম থাকে পক্ষান্তরে অন্য প্রকার অপত্য কোষে একটি এক্স ক্রোমোসোম থাকে। দুইটি এক্স ক্রোমোসোমযুক্ত কোষগুলি দেহের অর্ধাংশে স্ত্রী লক্ষণ এবং একটি এক্স ক্রোমোসোমযুক্ত কোষগুলি দেহের বাকী অর্ধাংশে পুরুষ লক্ষণ প্রকাশ করে।





চিত্র 5.5 অর্ধনারীশ্বর প্রজাপতি (কোলিয়াস—*Colius*) A ও বিটল (লুকানাস -*Lucanus*) B। স্ত্রী ও পুরুষ লক্ষণ প্রচলিত চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

রেশম কীটে অর্ধনারীশ্বর সৃষ্টির কারণ হিসাবে গোল্ডস্মিড্ট ও কাটসুকি (Goldschimidt and Katsuki) অন্য ধরনের ব্যাখ্যা দেন। তাহারা বলেন একটি ডিম্বাণুতে যদি কোন কারণে দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং যদি নিউক্লিয়াস দুইটির একটি X বহনকারী শুক্রাণু ও অন্যটি Y বহনকারী শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয় এবং নিষিক্ত হওয়ার পর যদি নিউক্লিয়াস দুইটি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে জাইগোটে XY ও XX বহনকারী কোষ সৃষ্টি হয়। জাইগোটটি পরিস্ফুরিত হইলে দেহের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারীর ন্যায় হয়।

5.2 লিঙ্গ নির্ধারণে সেক্স ক্রোমোসোম, সাইটোপ্লাজম ও অটোসোম

ক্রোমোসোমভিত্তিক লিঙ্গ নির্ধারণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যৌন জননক্ষম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে X ক্রোমোসোম বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু X ক্রোমোসোম কেবলমাত্র লিঙ্গ নির্ধারণ করে বা X ক্রোমোসোম কেবলমাত্র লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ক্রোমোসোম—ইহা সত্য নহে। অন্যান্য ক্রোমোসোমের ন্যায় X ক্রোমোসোমেও বহু জীন অবস্থিত এবং এই জীনগুলি লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য স্ফুরণে নানাভাবে অংশ গ্রহণ করে।

লিঙ্গ নির্ধারণ মূলতঃ ক্রোমোসোমভিত্তিক হইলেও লিঙ্গ নির্ধারণে X ক্রোমোসোম ও সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং X ক্রোমোসোম ও অটোসোমের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া একাধিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে দুইটি নিম্নে আলোচনা করা হইল ·

A. লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী ফ্যাকটর ও উহাদের পরিমাণগত সম্পর্ক (Qualitative theory of sex determination depending on factors)—জিপসী মথ (Gypsy moth = *Lymantria dispar*) হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া গোল্ডস্মিড্ট (Goldschmidt) লিঙ্গ-নির্ধারণে ফ্যাকটর ও উহাদের পরিমাণগত সম্পর্ক কি ভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। জিপসী মথে পুরুষের দুইটি সেক্স ক্রোমোসোম ZZ দ্বারা এবং স্ত্রীর দুইটি সেক্স ক্রোমোসোমের একটি Z এবং অন্যটি W দ্বারা চিহ্নিত অর্থাৎ পুরুষ = ZZ এবং স্ত্রী = ZW। জিপসী মথের ক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ (Intersex) অবস্থা অত্যন্ত সহজলভ্য। ক্লীবলিঙ্গ দশা পুরুষ দশা ও স্ত্রী দশার মাঝামাঝি অবস্থা।

গোল্ডস্মিড্ট ধারণা করেন যে লিঙ্গ নির্ধারণে দুইটি ফ্যাকটর পরস্পরের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া অন্ততঃ জিপসী মথের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ করে। ফ্যাকটর দুইটির একটি হইল পুরুষ নির্ধারক (M) এবং ইহা Z ক্রোমোসোমে অবস্থিত। দ্বিতীয় ফ্যাকটরটি হইল স্ত্রী নির্ধারক (F) এবং ইহা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। জিপসী মথের স্ত্রী সভ্যের ক্ষেত্রে একটি F ফ্যাকটর একটি Z ক্রোমোসোমে অবস্থিত একটি M ফ্যাকটরের সহিত সমান কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে দুইটি Z ক্রোমোসোম থাকায় এবং দুইটি ক্রোমোসোমের প্রতিটিতে একটি করিয়া M ফ্যাকটর থাকায় দুই মাত্রায় (Dose) M ফ্যাকটর থাকে। দুই মাত্রার পুরুষ ফ্যাকটর সাইটোপ্লাজমস্থিত এক মাত্রার স্ত্রী ফ্যাকটরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

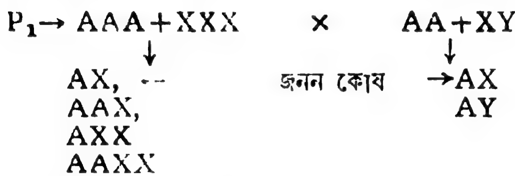
তিনি আরও বলেন লিঙ্গ নির্ধারণের ফ্যাকটরগুলির শক্তি বিভিন্ন স্থানের জিপসী মথে বিভিন্ন। জাপানের জিপসী মথে M ফ্যাকটর ইউরোপের জিপসী মথ অপেক্ষা বলশালী। সুতরাং ইউরোপীয় দুর্বল F ফ্যাকটরযুক্ত স্ত্রী জিপসী মথের সহিত জাপানের পুরুষ জিপসী মথের ক্রশ করাইলে স্ত্রী জনিতাসমূহ (ZW) ক্লীবলিঙ্গ হইয়া যায় কারণ Z ক্রোমোসোমস্থিত অধিক বলশালী M ফ্যাকটর সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত F ফ্যাকটরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু এই ধরনের ক্রশে পুরুষ জনিতাসমূহ স্বাভাবিক হয়।

লিঙ্গ নির্ধারণে ফ্যাকটরের উপস্থিতি ছাড়াও অ্যানড্রেজ (Andrase) ও গাইনেজ (Gynase) নামক কাল্পনিক উৎসেচকের কথা তিনি বলেন। ইহাদের মধ্যে অ্যানড্রেজ পুরুষ নির্ধারক ও গাইনেজ স্ত্রী নির্ধারক।

B. জীনের ভারসাম্য মতবাদ (Genic balance theory)—ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাস্টার হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রিজেস (Bridges) 1922

খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীনের ভারসাম্য মতবাদ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। সেক্স ক্রোমোসোম ও অটোসোমস্থিত জীনসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করিয়া এই মতবাদ রাখা হইয়াছে।

একটি ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী (AAA এবং XXX) ড্রসোফিলা এবং একটি স্বাভাবিক পুরুষ (AA এবং XY) ড্রসোফিলা হইতে যথাক্রমে চারি প্রকার স্ত্রী জননকোষ এবং দুই প্রকার পুরুষ জননকোষ পাওয়া যায়। উহাদের মিলনে লিঙ্গ লক্ষণে ভিন্নতাযুক্ত আট প্রকার অপত্য ড্রসোফিলা উৎপন্ন হইতে পারে :



	AX	AA XX	AXX	AAX
AX	AA XX স্বাভাবিক স্ত্রী X/A=1	AAA XXX ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী X/A=1	AA XXX সুপার স্ত্রী X/A=1·5	AAA XX ক্লীবলিঙ্গ X/A=0·67
AY	AA XY স্বাভাবিক পুরুষ X/A=0·50	AAA XXY Y যুক্ত ক্লীবলিঙ্গ X/A=0·67	AA XXY ডিপ্লয়েড XXY স্ত্রী X/A=1	AAA XY সুপার পুরুষ X/Y=0·33

লিঙ্গ সূচক = X/A = এক্স ক্রোমোসোম ও অটোসোমের অনুপাত।

উপরের ছক পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত ভাবে ক্রশ করিলে অটোসোমের প্রস্থসংখ্যা ও এক্স ক্রোমোসোমের সংখ্যা নানা রূপে প্রকাশ পায়। অটোসোমের প্রস্থসংখ্যা ও X ক্রোমোসোমের মোট সংখ্যা সমান হইলে ফিনোটাইপ স্ত্রী হয় (যথা, AAAXXX, AAXX)। পক্ষান্তরে অটোসোমের প্রস্থসংখ্যা X ক্রোমোসোমের মোট সংখ্যার দ্বিগুণ হইলে ফিনোটাইপ পুরুষ হয় (যথা, AAXY); অর্থাৎ বলা যায় অটোসোমের প্রস্থের সংখ্যা ও এক্স ক্রোমোসোমের সংখ্যার অনুপাত 1 হইলে স্ত্রী এবং 0·5 হইলে পুরুষ হয়। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে লিঙ্গ সূচক (XA) 0·67 এবং 0·33 অর্থাৎ 0·5 অপেক্ষা যথাক্রমে বেশী অথবা কম। এই সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য কি হইবে ? লিঙ্গ সূচক 1·5 হইলেই বা লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য কি হইবে ? ব্রিজেস দেখান যে লিঙ্গ সূচক 0·5 হইতে বেশী কিন্তু 1 হইতে কম হইলে ক্লীবলিঙ্গের অপত্য, 1 অপেক্ষা বেশী হইলে সুপার স্ত্রী অপত্য এবং 0·5 অপেক্ষা কম হইলে সুপার পুরুষ অপত্য উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে ব্রিজেস সিদ্ধান্ত করেন যে ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণের ক্রোমোসোমীয় পদ্ধতি XX (স্ত্রী) ও XY (পুরুষ) হইলেও ইহাদের লিঙ্গ নির্ধারণে অটোসোমের ভূমিকা আছে। স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জীনগুলি এক্স ক্রোমোসোমে এবং পুরুষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জীনগুলি অটোসোমে অবস্থিত। এক্স ক্রোমোসোমে ও অটোসোমে অবস্থিত জীনগুলির ভারসাম্যের (Balance) উপর লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভর করে। XY সেক্স ক্রোমোসোমযুক্ত ড্রসোফিলা পুরুষ, কারণ স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারক একটি এক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলি অটোসোমে অবস্থিত পুরুষ নির্ধারক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা শক্তিতে কম। পক্ষান্তরে XX সেক্স ক্রোমোসোম-যুক্ত ড্রসোফিলা স্ত্রী, কারণ দুইটি এক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলি একত্রে অটোসোমে অবস্থিত পুরুষ নির্ধারক বৈশিষ্ট অপেক্ষা শক্তিতে বেশী।

জীনের ভারসাম্য মতবাদে সংযোজন—ডবজানস্কী এবং সুজ (Dobzhansky and Schultz) পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাইয়াছেন যে ক্লীবলিঙ্গের (3A, 2X) ড্রসোফিলাতে এক্স ক্রোমোসোমের অংশ যোগ করিলে স্ত্রী চরিত্র লক্ষণগুলির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এক্স ক্রোমোসোমের অংশের আকার বৃদ্ধির সহিত চরিত্র লক্ষণগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণের ভারসাম্য তত্ত্ব হইতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা যায় :—

(i) বহু জীন দ্বারা ড্রসোফিলার লিঙ্গ নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ii) অটোসোমস্থিত জীন এবং এক্স ক্রোমোসোমস্থিত জীন প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন। এক্স ক্রোমোসোমস্থিত জীন অটোসোমের জীনের ক্রিয়ার দিক নির্দেশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

(iii) বহুক্ষেত্রে দেখা যায় লিঙ্গজনিত বৈশিষ্ট্য পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। 2X, 3A দশা ক্লীবলিঙ্গ সূচিত করে। উচ্চ তাপমাত্রায় 2X, 3A দশায় কিছু পরিমাণ স্ত্রী বৈশিষ্ট্যের আধিক্য এবং নিম্ন তাপমাত্রায় কিছু পরিমাণ পুরুষ বৈশিষ্ট্যের আধিক্য দেখা যায়। হিলড্রেথ (Hildrath) dsx (Double sex) নামক একটি জীন চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হোমোজাইগাস অবস্থায় ইহার উপস্থিতি স্বাভাবিক স্ত্রী (2X, 2A) বা স্বাভাবিক পুরুষ (XY, 2A) ড্রসো-ফিলাকে ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করে।

(iv) স্টারটিভ্যান্ট (Sturtevent) ড্রসোফিলার অটোসোমে tra নামক জীনের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। ইহা প্রচ্ছন্ন জীন হওয়ায় হেটারোজাইগাস দশায় নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু হোমোজাইগাস (tra/tra) দশায় স্বাভাবিক স্ত্রী ড্রসোফিলাকে (2X, 2A) প্রজননক্ষমতাহীন পুরুষে পরিণত করে।

(v) লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি জটিল এবং অটোসোম ও এক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত বহু জীনের সুসংহত সমন্বয়ে ইহা নির্ধারিত হয়।

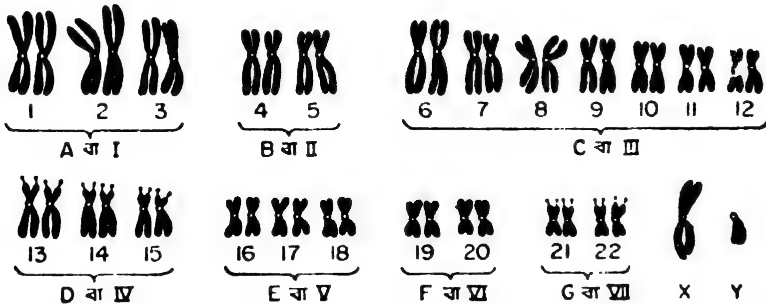
ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোসোমের ভূমিকা—ব্রিজেস পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে দেখাইয়াছেন যে ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণে Y

ক্রোমোসোমের কোন ভূমিকা নাই। কিন্তু Y বিহীন ড্রসোফিলার প্রজননক্ষমতা নাই। ষ্টার্ন (Stern) প্রমাণ করেন যে Y ক্রোমোসোম শুক্রাণুর চলৎশক্তি (Mobility) নির্ধারক। হেস ও মায়ার (Hess ও Meyer) Y ক্রোমোসোমস্থিত জীন কি ভাবে শুক্রাণুর চলৎশক্তি নির্ধারিত করে তাহা ড্রসোফিলা হাইডিয়াই (*Drosophila hydei*) প্রজাতিতে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন।

ড্রসোফিলার Y ক্রোমোসোম প্রায় জীনবিহীন। ইহাতে ববড্ (Bobbed = bb), নিউক্লিওলার সংগঠক (Nucleolar organiser = nor) ইত্যাদি অল্প সংখ্যক জীন আছে। Y ক্রোমোসোমকে একটি প্রায় বিনষ্ট এক্স ক্রোমোসোম বলিয়া গণ্য করা হয়। Y ক্রোমোসোমের লিঙ্গ নির্ধারক ও অন্যান্য জীন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বংশগতিতে ইহার কোন বিশিষ্ট ভূমিকা নাই। লিঙ্গ নির্ধারণে ইহা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।

5.3 মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্রোমোসোমীয় ভিত্তি ড্রসোফিলার ন্যায় অর্থাৎ ইহা XY—XX শ্রেণীর। কিন্তু মানুষ ও ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণের সাম্য নিতান্তই আপাত। অবশ্য এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে কারণ মানুষের ক্ষেত্রে জীনের বংশগতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা সহজসাধ্য নহে। মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্যযুক্ত কোষের সাঠক বিশ্লেষণের উপর ইহা নির্ভরশীল। কলাকৃষ্টি মাধ্যমে কোষকে পালন করিয়া উহার বৃদ্ধি ও বিভাজন পরীক্ষা করিয়া কোষের ক্রোমোসোমীয় ও জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়।



চিত্র 5.6 মানুষের দেহকোষের ক্রোমোসোমসমূহ আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে (Group) সজ্জিত। লক্ষণীয় সাতটি গ্রুপ ও A হইতে G গ্রুপে ক্রোমোসোমের ক্রমিক আকার হ্রাস।

মানুষের ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা 46। মানুষের দেহকোষের ক্রোমোসোমগুলি বিভাজনের মেটাফেজ দশায় কিরূপ দেখায় তাহা 5·6 চিত্রে দেখান হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ও সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমগুলিকে সাতটি (A—G বা I-VII) ভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। একটি ভাগের ক্রোমোসোমের সহিত অন্য

ক্রোমোসোমের আকৃতিগত পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ায় একটি ভাগের সভ্যদের অন্য ভাগের সভ্য হইতে পৃথক করা যায়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভাগের ক্রোমোসোমের সভ্যদের পৃথক ভাবে সনাক্ত করা কষ্টসাধ্য। বিশেষ ধরনের রঞ্জক ব্যবহার করিয়া ক্রোমোসোমকে রঞ্জিত করিলে ক্রোমোসোম দেহ কোথাও বেশী বা কোথাও কম রঞ্জিত হয়। ইহার ফলে ক্রোমোসোমের দেহে অনুপ্রস্থ গাঢ় বা হালকা দাগ (Band) দেখা যায়। একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের গাঢ় দাগগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় দাগের সংখ্যা ও অবস্থান পরীক্ষা করিয়া ক্রোমোসোমটিকে সনাক্ত করা যায়। ইহা ছাড়া অটোরেডিওগ্রাফ (Autoradiograph) ও অন্যান্য আণবিক জীনতত্ত্বীয় পদ্ধতির সাহায্যে ক্রোমোসোম সনাক্ত করা যায়। ক্রোমোসোমের স্যাটেলাইট, নিউক্লিও সংগঠক ইত্যাদি ক্রোমোসোম সনাক্তকরণে সাহায্য করে।

মানুষের X ক্রোমোসোম মাঝারি আকৃতির এবং গঠনে সাবমেটাসেন্ট্রিক। ইহাকে এই ধরনের অন্যান্য অটোসোমের (6—12) সহিত একত্রে C বা III বিভাগে স্থাপিত করা হইয়াছে। Y ক্রোমোসোম আকারে ছোট এবং ইহাকে G বা VII বিভাগে স্থাপিত করা হইয়াছে।

5.4 সেক্স ক্রোমোটিন বা বার বডি (Sex chromatin or Barr body)

স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের দেহকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা কোষের ইন্টারফেজ দশায় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে কোষে দুইটির পরিবর্তে একটি এক্স ক্রোমোসোম আছে এবং কোষের নিউক্লিয় আবরণীর কাছে একদলা ক্রোমাটিন বস্তু (Chromatin mass) আছে। বস্তুত বার এবং বার্ট্রাম (Barr and Bertram চল্লিশের দশকের শেষ দিকে স্ত্রী লোকের দেহকোষে এই ঘটনার উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করেন। নিউক্লিয় আবরণী নিকটবর্তী ক্রোমাটিন দলা বর্তমানে সেক্স ক্রোমাটিন বা বার বডি নামে পরিচিত (চিত্র 5.7)।

কোষতত্ত্বীয় পরীক্ষায় স্ত্রীলোকের বিভিন্ন দেহকলার কোষেই (Somatic cell) বার বডি পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য ধারণা করা হয় বার বডি অন্ততঃ ইন্টারফেজ দশায় সকল দেহকোষে উপস্থিত থাকে।

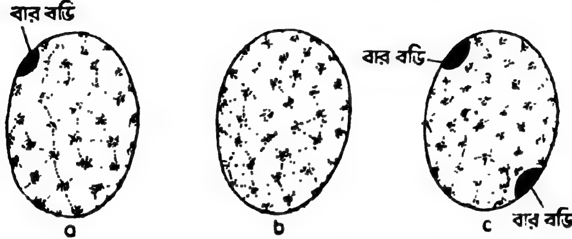
বার বডি কি

স্ত্রীলোকের দুইটি সেক্স ক্রোমোসোমই XX। ইহাদের মধ্যে একটি X ক্রোমোসোম নিষ্ক্রিয় হইয়া দলা পাকাইয়া নিউক্লিয় আবরণীর নিকট থাকে এবং বার বডি গঠন করে। একটি X ক্রোমোসোমই যে বার বডিতে রূপান্তরিত হয় তাহা নিম্নোক্ত নিরীক্ষণ হইতে প্রমাণিত—

(a) মাইটোসিস বিভাজনের প্রারম্ভিক দশায় বিভাজনরত কোষে রঞ্জক (Stain) প্রয়োগ করিলে দেখা যায় সকল অটোসোম এবং একটি এক্স ক্রোমোসোম একই রকম ভাবে রঞ্জিত হয়। কিন্তু একটি ক্রোমোসোম বেশী মাত্রায় রঞ্জক

গ্রহণ করে। এই গাঢ় রঙে রঞ্জিত (Heterochromatic) এক্স ক্রোমোসোমটি বার বডি গঠন করে।

(b) কোষ কৃষ্টি (Cell culture) করিবার সময় কৃষ্টি রসে ট্রাইটিয়াম (Tritium = ³H) চিহ্নিত থাইমিডিন (Thymidine) প্রয়োগ করিলে কোষের মধ্যে সংশ্লেষিত ডি এন. এ তে চিহ্নিত থাইমিডিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। স্ত্রী লোকের দেহকোষের কোষ কৃষ্টি রসে চিহ্নিত থাইমিডিন প্রয়োগ করিলে দুইটি এক্স ক্রোমোসোমের ডি এন. এ. সংশ্লেষে সময়ের ভিন্নতা প্রতিভাত হয়। গাঢ় রঙে রঞ্জিত



চিত্র 5.7 বার বডি বা সেক্স ক্রোমাটিন—স্বাভাবিক স্ত্রী (a) একটি বার বডি ; পুরুষ (b) বার বডি নাই ; XXX ও XXXY অবস্থায় দুইটি বার বডি (c)।

হইবার ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স ক্রোমোসোম দেরীতে ডি. এন এ. সংশ্লেষ করে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকের দেহকোষে তিনটি X ক্রোমোসোম অথবা তিনটি X ক্রোমোসোম ও একটি Y ক্রোমোসোম থাকে তাহাদের কোষ কৃষ্টি করিয়া দুইটি দেরীতে ডি. এন. এ সংশ্লেষক্ষম এক্স ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। এই সমস্ত স্ত্রীলোকের দেহকোষ যথাযথ-ভাবে পরীক্ষা করিলে কোষগুলিতে দুইটি বার বডি পাওয়া যায়।

(c) স্ত্রীলোকের মাতৃজনিত্ কোষে দুইটি এক্স ক্রোমোসোমই উপস্থিত থাকে—জননকোষে বার বডি পাওয়া যায় না।

বার বডির সংখ্যা

একটি স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের দেহকোষে একটিমাত্র বার বডি থাকে। কিন্তু সেক্স ক্রোমোসোমের সংখ্যার অস্বাভাবিকতা থাকিলে বার বডির সংখ্যা একের বেশী হইতে পারে। বার বডি সংখ্যা ও এক্স ক্রোমোসোমের সংখ্যা মোটামুটিভাবে নিয়মানুগ। সাধারণতঃ দেখা যায় কোষের বার বডির সংখ্যা এক্স ক্রোমোসোম সংখ্যা অপেক্ষা কম। অর্থাৎ কোষে 3টি এক্স ক্রোমোসোম থাকিলে বার বডির সংখ্যা হইবে দুই (ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনগত ভিন্নতার ফল—ছকটি দ্রষ্টব্য)।

জীনতত্ত্বে বার বডির উপযোগিতা

(a) বার বডির আবিষ্কারের ফলে জীনতত্ত্ববিদরা সহজেই কোষতত্ত্বীয় পরীক্ষার সাহায্যে সরল ও প্রত্যক্ষভাবে স্বাভাবিক পুরুষ ও নারীর এক্স ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারেন।

(b) বারবডির উপস্থিতির সাহায্য লইয়া জীনতাত্ত্বিকগণ স্তন্যপায়ী বিশেষতঃ মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিতে পারেন।

(c) লিঙ্গ তথা সেক্স ক্রোমোসোম সংক্রান্ত কোন অস্বাভাবিকতা বারবডির সংখ্যা পরীক্ষা করিলে সহজেই ধরা পড়ে। টার্নার্স সিনড্রোম (Turners syndrome) সমন্বিত মানুষের সেক্স ক্রোমোসোমের গঠন XO প্রকৃতির এবং ইহাদের যৌনাঙ্গের গঠন স্ত্রীলোকের ন্যায়। ইহাদের বারবডি থাকে না। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ ও সেক্স ক্রোমোসোমের মধ্যে সমতা নাই। কোষতত্ত্বীয় ভাবে বারবডির উপস্থিতি ও সংখ্যা পরীক্ষা করিলে ইহা সহজেই ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে ক্লেইন-ফেলটার্স সিনড্রোম (Kleinfelters syndrome) সমন্বিত মানুষের দুইটি X ক্রোমোসোম ও একটি Y ক্রোমোসোম থাকে এবং ইহাদের যৌনাঙ্গ পুরুষের ন্যায়। ইহাদের একটি বারবডি থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ফিনোটাইপ ও X ক্রোমোসোমের অসাম্য বার বডি পরীক্ষা করিলে সহজেই ধরা পড়ে।

(d) হেটারোক্রোমাটিক হওয়ার জন্য বারবড়ি প্রায় নিষ্ক্রিয়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দুইটি X ক্রোমোসোমের একটি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় পুরুষ ও নারী উভয়ের দেহকোষেই একটিমাত্র কার্যকরী X ক্রোমোসোম থাকে। নারীর ক্ষেত্রে দুইটি X ক্রোমোসোম ও পুরুষের ক্ষেত্রে একটি X ক্রোমোসোম থাকার অর্থ X ক্রোমোসোমে জীনের সংখ্যা ও কার্যের অসাম্য। নারীর ক্ষেত্রে একটি X ক্রোমোসোম নিষ্ক্রিয় হওয়ায় জীনের সংখ্যা ও কাজের অসাম্য দূর হইয়াছে।

(e) বর্তমানে ইহা জানা গিয়াছে যে নারীর যে সেক্স ক্রোমোসোমটি পরিবৃত্তি বা কোন কারণে ত্রুটিপূর্ণ হইয়া যায় সেইটিই বারবডিতে রূপান্তরিত হয়।

(f) স্ত্রী অপত্য একটি X ক্রোমোসোম উহার পিতা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। ইহাদের ক্ষেত্রে যে X ক্রোমোসোমটি নিষ্ক্রিয় হয় উহা মাতা বা পিতা হইতে অর্জিত যে কোনও একটি X ক্রোমোসোম হইতে পারে।

5.5 লিয়ন হাইপোথিসিস (Lyon hypothesis)

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দুইটি X ক্রোমোসোম ও পুরুষের ক্ষেত্রে একটিমাত্র X ক্রোমোসোম থাকে। দুইটি X ক্রোমোসোমে জীনের সংখ্যা ও কার্য একটি X ক্রোমোসোমের জীনের সংখ্যা ও কার্যের দ্বিগুণ। সুতরাং এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক যে পুরুষ ও স্ত্রীর X ক্রোমোসোমস্থিত জীনের সংখ্যা ও কার্যের মধ্যে নিশ্চিত অসাম্য আছে। কিন্তু ইহা প্রমাণিত যে পুরুষ ও স্ত্রীর X ক্রোমোসোমে সমসংখ্যক জীন থাকে এব জীনগুলির সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রায় একই। অসাম্য না থাকার ব্যাখ্যা হিসাবে লিয়ন 'মাত্রার ভরর্তুকি' (Dosage compensation) মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছেন। মতবাদটি নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ হইতে করা হইয়াছে—

(a) পরিস্ফুরণের প্রাথমিক দশায় স্ত্রী দেহকোষের দুইটি X ক্রোমোসোমের একটি জীনতত্ত্বীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় এবং ইন্টারফেজ দশায় বারবডিতে পরিণত হয়।

(b) পিতা বা মাতা হইতে অর্জিত কোন X ক্রোমোসোমটি নিষ্ক্রিয় হইবে তাহা নির্দিষ্ট নহে। উহাদের মধ্যে যে কোন একটি নিষ্ক্রিয় হইতে পারে।

(c) একটি নির্দিষ্ট দেহকোষে যে X ক্রোমোসোমটি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় ঐ দেহকোষ হইতে উৎপন্ন সকল কে ষে নিষ্ক্রিয় ক্রোমোসোম জাত ক্রোমোসোমও নিষ্ক্রিয় হয়।

5.6 কোষতত্ত্বীয়ভাবে বারবডি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

A. উপকরণ

(i) জিহ্বা চাপা যন্ত্র (Tongue depressor), (ii) পরিষ্কার কাঁচের স্লাইড ও কভার স্লিপ (Slide and cover slip), (iii) অ্যাসিটালকোহল (Acetalcohol), (iv) 1% অ্যাসিটো অরসিন দ্রবণ (Aceto Orcin solution), (v) ব্লটিং কাগজ (Blotting paper), (vi) সীল করিবার মোম (Sealing wax)।

B. অ্যাসিটালকোহল ও অ্যাসিটো অরসিন দ্রবণ প্রস্তুত পদ্ধতি—

(i) 1% অ্যাসিটো অরসিন—100 cc 50% অ্যাসেটিক অ্যাসিডে 1 গ্রাম গুঁড়া অরসিন গুলিতে হইবে। তাহার পর উহাকে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করার পর ফিলটার কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

(ii) তিন ভাগ 100% অ্যালকোহল ও এক ভাগ গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশাইলে অ্যাসিটালকোহল প্রস্তুত হইবে।

C. কোষতত্ত্বীয়ভাবে বারবডি পর্যবেক্ষণের জন্য যাহা করিতে হইবে—

(i) জিহ্বা চাপার যন্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকের মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী চাছিয়া লইতে হইবে।

(ii) সংগৃহীত কোষগুলি একটি পরিষ্কার স্লাইডে লইয়া স্লাইডের উপর কোষগুলি একস্তরে বিছাইতে হইবে।

(iii) এইবার কোষস্তরের উপর অ্যাসিটালকোহল প্রয়োগ করিয়া 1 মিনিট অপেক্ষা করিতে হইবে।

(iv) কোষস্তরের উপর 4 হইতে 5 ফোঁটা 1% অ্যাসিটো অরসিন দ্রবণ দিয়া স্লাইডটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে (10 মিঃ)।

(v) এইবার স্লাইডটি বাহির করিয়া কোষস্তরের উপর সন্তর্পণে কভার স্লিপ ঢাকা দিতে হইবে। অতিরিক্ত রঞ্জক ব্লটিং পেপার দ্বারা শোষিত করিতে হইবে।

(vi) সীল করিবার মোম দ্বারা কভার স্লিপের কিনারা বরাবর সীল করিতে হইবে।

(vii) অয়েল ইমারসন অবজেকটিভ ও 10X আইপিস (Oil immersion and 10X eye piece) ব্যবহার করিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষগুলি পরীক্ষা করিতে হইবে।

(viii) কোষের নিউক্লিয় আবরণীর নিকটবর্তী অঞ্চল ভালভাবে লক্ষ্য করিলে বারবডি দেখা যাইবে।

(ix) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের একটি পর্যবেক্ষণ স্থানে (Field) কোষের সংখ্যা ও কতগুলি কোষে বারবডি দেখা যাইতেছে তাহা গণনা করিতে হইবে।

(x) পাঁচটি বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ স্থানে ঐভাবে কোষের সামগ্রিক সংখ্যা ও বারবডি-যুক্ত কোষের সংখ্যা গণনা করিয়া ছকের আকারে ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

মানুষের ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনগত পরিবর্তন-জনিত ফল

	ক্রোমোসোম সংখ্যা	সেক্স ক্রোমোসোম-গত গঠন	বারবডি সংখ্যা	জনন ক্ষমতা	মন্তব্য
I. দেখিতে পুরুষের ন্যায়					
	46	XY	0	+	স্বাভাবিক পুরুষ
	47	XYY	0	+(-)	পুরুষ
	47	XXY	1	−	ক্লাইনফেল্টার্স' সিনড্রোম
	48	XXXY	2	−	মানসিক স্থবিরত্ব
	49	XXXXY	3	−	,,
	49	XXXYY	2	−	ক্লাইনফেল্টার্স' সিনড্রোমের ন্যায়
	48	XXYY	1	−	,,
II. দেখিতে স্ত্রীলোকের ন্যায়	46	XX	1	+	স্বাভাবিক স্ত্রী
	45	XO	0	−	টার্নার্স' সিনড্রোম
	47	XXX	2	+(−)	মানসিক স্থবিরত্ব
	48	XXXX	3	?	,,
	49	XXXXX	4	?	,,
III. মিশ্র লক্ষণযুক্ত	45/46	XO XY	0		পুরুষ বা স্ত্রী
	45/46	XO, XX	0·1	−	টার্নার্স' সিনড্রোম
	46	XX/XY	1/0	−	প্রকৃত উভলিঙ্গ
	46/47	XX/XXX	1/2	−	আংশিক প্রকৃত উভলিঙ্গ
	45/46/47	XO/XY/XXX	0/1/2	−	টার্নার্স' সিনড্রোমের ন্যায়
IV. বিবিধ	46	X, (X+আংশিক Y)	0	−	পুরুষ বা স্ত্রী
	46	X, (X+ আংশিক X)	1 (ছোট)	−	সামান্য মানসিক স্থবিরত্বযুক্ত স্ত্রী
	46	X, (X+আইসোক্রোমোসোম X)	1 (বড়)	−	টার্নার্স' সিনড্রোমের ন্যায়

5.7 মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে X ও Y ক্রোমোসোমের ভূমিকা

স্বাভাবিক পুরুষের দেহকোষে 22 জোড়া অটোসোম ও XY ক্রোমোসোম এবং স্বাভাবিক স্ত্রী দেহকোষে 22 জোড়া অটোসোম ও দুইটি X ক্রোমোসোম থাকে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে মানুষের দেহকোষের অটোসোম ও X এবং Y ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং হ্রাস বা বৃদ্ধি জনিত ঘটনায় ফিনোটাইপগত অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার জন্মের সহিত অর্জিত বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যকে সিনড্রোম (Syndrome) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবিষ্কারকের নামের সহিত সিনড্রোম শব্দটি যুক্ত করিয়া সিনড্রোমের নামকরণ করা হয়। যেমন, টার্নার্স সিনড্রোম (Turners syndrome), ক্লিয়েনফেল্টার্স সিনড্রোম (Kleinfelters syndrome) ইত্যাদি।

টার্নার্স সিনড্রোম—টার্নার্স সিনড্রোম যুক্ত মানুষের নিম্নোক্ত চরিত্রলক্ষণ দেখা যায়

1. বহিঃ জননাঙ্গের গঠন স্ত্রীলোকের ন্যায়।
2. দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে কম।
3. গলায় চামড়ার ভাঁজগুলি যুক্ত (Webbed neck)।
4. কাণের অবস্থান স্বাভাবিক অবস্থান অপেক্ষা একটু নিচে।
5. বক্ষপঞ্জর ঢালের ন্যায় অর্থাৎ সামনের দিকে উত্তল।
6. স্তনের অবস্থান স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু পাশের দিকে।
7. প্রাপ্তবয়স্কের স্তনগ্রন্থি অপরিণত।
8. প্রাপ্তবয়স্কের জরায়ু ছোট ও অপরিণত।
9. প্রকৃত ডিম্বাশয় নাই: ডিম্বাশয়ের স্থলে একগুচ্ছ সূত্রাকৃতি তন্তু থাকে।
10. কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে বামদিকের সাবক্লেভিয়ান ধমনী গঠনে সরু এবং ইহার ফলে দেহের ঊর্ধ্বাংশে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।
11. দেহকোষে বারবডি থাকে না।
12. ক্যারিওটাইপ (Karyotype) পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহাদের এক্স ক্রোমোসোম সংখ্যা একটি হওয়ায় মোট ক্রোমোসোম সংখ্যা 45। অর্থাৎ ইহারা XO প্রকৃতির।

ক্লিয়েনফেল্টার্স সিনড্রোম—চরিত্রলক্ষণসমূহ—

1. বহিঃ জননাঙ্গ পুরুষের ন্যায় কিন্তু শুক্রাশয় ক্ষুদ্রাকার।
2. দেহে লোম প্রায় থাকে না।
3. অনেক ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থি সুগঠিত হয় (Gynaecomastism)।
4. পদদ্বয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ।

5. ক্যারিওটাইপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহাদের মোট 47টি ক্রোমোসোম ; সেক্স ক্রোমোসোমগত গঠন XXY। তবে বহুক্ষেত্রে XXYY, XXXY, XXXXY ধরনের সেক্স ক্রোমোসোমগত গঠন দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ফিনোটাইপগত প্রকাশ ভিন্ন হইয়া যায়।

6. বারবডির সংখ্যা XXY-এর ক্ষেত্রে একটি, XXYY-এর ক্ষেত্রে একটি, XXXY এর ক্ষেত্রে দুইটি এবং XXXXY-এর ক্ষেত্রে তিনটি।

বারবডি X ক্রোমোসোমের সংকুচিত অবস্থা

টার্নার্স ও ক্লিয়েনফেল্টার্স সিনড্রোম পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই বারবডি সংকুচিত অবস্থায় থাকে। যতগুলি X ক্রোমোসোম থাকে তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি ব্যতীত সকলে বারবডি গঠনে অংশ গ্রহণ করে। Y ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বারবডির সংখ্যা বাড়ে না অর্থাৎ Y ক্রোমোসোম বারবডি গঠনে অংশ গ্রহণ করে না।

বারবডি সংকুচিত X ক্রোমোসোম হওয়ায় সাধারণ ক্রোমোসোমের ন্যায় সক্রিয় নয় ; ইহা নিষ্ক্রিয়। তথাপি সিনড্রোম দুইটির বারবডি পর্যালোচনা হইতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি করা যাইতে পারে—

1. স্ত্রী দেহকোষে দুইটি X ক্রোমোসোমের পরিবর্তে একটি X ক্রোমোসোম থাকিলে অসম্পূর্ণ স্ত্রী লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ দুইটি X ক্রোমোসোমে অবস্থিত লিঙ্গ নির্ধারক জীনগুলি সুসংহত ভাবে কাজ করিলে তবেই স্বাভাবিক স্ত্রী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

2. X ক্রোমোসোমের সংখ্যা দুই অপেক্ষা বেশী হইলে বারবডির সংখ্যা X ক্রোমোসোম সংখ্যা অপেক্ষা একটি কম হয়। এই সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইলেও বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক হয় না। ইহার অর্থ X ক্রোমোসোম স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্দেশক জীন বহন করে।

3. ক্লিয়েনফেল্টার্স সিনড্রোমে দেখা যায় যে X ক্রোমোসোম দুই বা ততোধিক হইলেও যদি Y ক্রোমোসোম উপস্থিত থাকে তাহা হইলে পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং Y ক্রোমোসোম পুরুষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারক কারণ X ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও Y ক্রোমোসোমের পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। তবে স্বাভাবিক পুরুষ বৈশিষ্ট্যের জন্য XY অবস্থার প্রয়োজন।

4. XYY সেক্স ক্রোমোসোম গঠনযুক্ত মানুষের ফিনোটাইপ পুরুষের ন্যায়। কিন্তু ইহারা মানসিক ভাবে অপরিণত। ইহাদের স্বভাব উগ্র এবং আক্রমণাত্মক।

5. X ক্রোমোসোমের অনুপস্থিতিতে কোন লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় না এবং কেবলমাত্র X ক্রোমোসোম থাকিলেই (XO, XX) স্ত্রী লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং X ক্রোমোসোম স্ত্রী লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু Y ক্রোমোসোম থাকিলেই ঘটনা পরিবর্তিত হয়। Y ক্রোমোসোমে অবস্থিত

লিঙ্গ নির্ধারকগুলি জীনের ক্রীয়াশীলতাকে পরিবর্তিত করিয়া পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

ডাউন সিনড্রোম নিম্নোক্ত চরিত্রলক্ষণ প্রকাশ করে—

1. অপরিণত মানসিক গঠন।

2. চোখের পাতায় মঙ্গোলদের ন্যায় ভাঁজ।

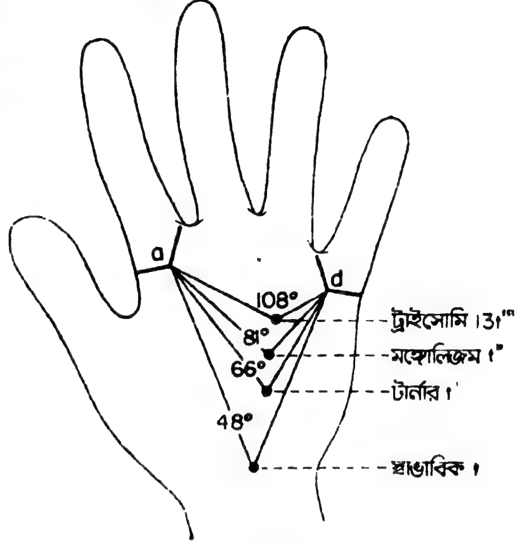
3. বামন আকৃতি।

4 হাত ও পা ছোট এবং মোটা (Stubby)।

5. হস্তরেখা স্বাভাবিক অপেক্ষা ভিন্ন (চিত্র 58)।

6. হৃৎপিণ্ডের গঠন ত্রুটিপূর্ণ।

7. ক্রোমোসোম সংখ্যা 47। সম্ভবতঃ 21 অথবা বিকল্প মতে 22 নম্বর অটোসোম দুইটির পরিবর্তে তিনটি থাকে (Trisomy)। ডাউন সিনড্রোম ও অন্যান্য অটোসোম ঘটিত সিনড্রোম পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় অটোসোম মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করে না। তবে অনুমিত হয় অটোসোমস্থিত অনেক জীন নিয়ন্ত্রক জীন হিসাবে লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে।



চিত্র 58 স্বাভাবিক ও অ্যানিউপ্লয়েড মানুষের হাতের atd কোণ। ট্রাইরেডিয়াস (t) একটি কল্পিত বিন্দু। হাতের যে কোন সুচিহ্নিত অঞ্চল (এস্থলে a ও d) হইতে টানা রেখা এই বিন্দুতে মিলিত হইয়া যে কোণ উৎপন্ন করে উহাকে atd কোণ বলে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লিঙ্গ নির্ধারণ

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিতে দুইটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় দেখা যায়। প্রথম পর্যায়কে **মুখ্য লিঙ্গ নির্ধারণ পর্যায়** এবং দ্বিতীয়টিকে **লিঙ্গ নির্ধারণের সোমাটিক** (Somatic) পর্যায় বলা হয়। ইহা ছাড়াও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোষের প্রাজমা পর্দার কিছু কিছু ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নিষিক্ত ডিম্বক হইতে উৎপন্ন ভ্রূণের স্ফুরণ ও বৃদ্ধির প্রাথমিক দশায় অবিশেষিত (Undifferentiated) জননাঙ্গের সৃষ্টি হয়। শুক্রাশয় কিংবা ডিম্বাশয় যে কোন প্রকার জননাঙ্গে রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা ইহার থাকে। ডিম্বাণু Y ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হইলে নিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন ভ্রূণে Y ক্রোমোসোম থাকে। Y ক্রোমোসোমে পুরুষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারক

কয়েকটি জীন থাকে। জীনগুলি ক্রীয়াশীল হইয়া অপরিণত ও অবিশেষিত জননাঙ্গকে শুক্রাশয়ে রূপান্তরিত করে। X ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন ভ্রূণে Y ক্রোমোসোম না থাকায় ভ্রূণের অবিশেষিত জননাঙ্গ ডিম্বাশয়ে পরিণত হয়।

প্রমাণিত হইয়াছে যে Y ক্রোমোসোমস্থিত জীনগুলি H—Y অ্যান্টিজেন নামক প্রোটিন সংশ্লেষ করে এবং এই সংশ্লেষিত প্রোটিন Y ক্রোমোসোম বহনকারী কোষের প্লাজমা পর্দায় থাকে। H—Y অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ইঁদুরের চামড়া 'গ্রাফট' (Graft) সংক্রান্ত পরীক্ষা হইতে সর্বপ্রথম জানা যায়। একটি নিষিক্ত ডিম্বক হইতে যমজ (Twin) উৎপন্ন হইলে দুইজনেরই জিনোটাইপ সর্বতোভাবে সমান হয়। সর্বতোভাবে সমান জিনোটাইপ যুক্ত অবস্থাকে আইসোজেনিক (Isogenic) অবস্থা বলে। জীনতত্ত্বের পরীক্ষায় আইসোজেনিক অবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। পরীক্ষাগারে আইসোজেনিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে একই জনিতৃ জনু হইতে উৎপন্ন অপত্য জনুর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রজনন করানো হয়। বহু জনু ধরিয়া এইভাবে প্রজনন করানো হইলে তবেই আইসোজেনিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। আইসোজেনিক অবস্থার ইঁদুরের মধ্যে চামড়া গ্রাফট পরীক্ষায় নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া গিয়াছিল—

(1) পুরুষ ইঁদুর অন্য পুরুষ ইঁদুর হইতে চামড়া লইতে পারে।
(2) স্ত্রী ইঁদুর অন্য স্ত্রী ইঁদুর হইতে চামড়া লইতে পারে।
(3) পুরুষ ইঁদুর স্ত্রী ইঁদুর হইতে চামড়া লইতে পারে।
(4) **স্ত্রী ইঁদুর পুরুষ ইঁদুর হইতে চামড়া লইতে পারে না।**

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পুরুষ ইঁদুরের চামড়ার কোষে এমন কিছু অ্যান্টিজেন থাকে যাহা স্ত্রী ইঁদুরকে চামড়া লইতে নিবৃত্ত করে। এই অ্যান্টিজেনকে H—Y অ্যান্টিজেনরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

8 কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণে H—Y অ্যান্টিজেন প্রথম সৃষ্টি হয়। ইহার অর্থ H—Y অ্যান্টিজেন গঠনকারী জীনগুলি ভ্রূণের স্ফুরণের প্রাথমিক অবস্থাতেই ক্রিয়াশীল হয়। সাধারণতঃ সব কোষেই এই অ্যান্টিজেন সৃষ্টি হয়। কিন্তু মনে করা হয় অবিশেষিত জননাঙ্গে সৃষ্ট অ্যান্টিজেন জননাঙ্গটিকে শুক্রাশয়ে রূপান্তরিত হইতে প্রভাবিত করে।

H—Y অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধাচারী অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করিয়া ও উহা মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুরুষ সভ্যের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অ্যান্টিজেনটির উপস্থিতি সমর্থিত করা হইয়াছে।

অবিশেষিত জননাঙ্গের শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়ে পরিণত হওয়া মুখ্য লিঙ্গ নির্ধারণের প্রথম পর্যায় রূপে গণ্য করা হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণের দ্বিতীয় বা সোমাটিক পর্যায় প্রকৃত পক্ষে প্রথমে পর্যায়ের ঘটনার ক্রমাবিস্তার। বিশেষিত হওয়ার পর শুক্রাশয় আরও

পরিস্ফুরিত হইতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় শুক্রাশয় হইতে স্টেরয়েড (Steroid) হরমোন টেস্টোস্টেরন (Testosteron) ক্ষরিত হয় এবং উহা ভ্রূণের সমস্ত কোষে পরিবাহিত হয়।

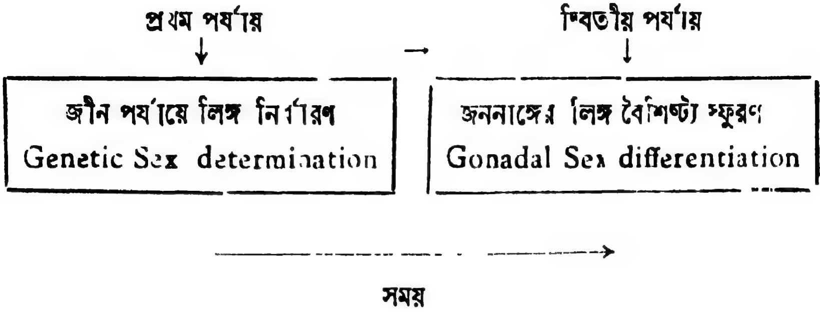
ইহার ফলে উহার সকল কোষে পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। হরমোন প্রদত্ত সংকেতের অভাব ঘটিলে বা অনুপস্থিতিতে দেহকোষগুলিতে ক্রমশঃ স্ত্রী লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে সুরু করে।

বর্তমানে প্রমাণিত যে পুরুষের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ X ক্রোমোসোমস্থিত Tmf^+ নামক জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই Tmf^+ জীন একটি বিশেষ প্রোটিন সংশ্লেষ করে। এই প্রোটিনটি নিয়ন্ত্রক প্রোটিন হিসাবে কাজ করে। এই নিয়ন্ত্রক প্রোটিন কেবলমাত্র টেস্টোস্টেরন হরমোনের সহিত মিলিত হইয়া তবেই কার্যকরী হয় এবং যৌগ গঠন করে। প্রোটিন-টেস্টোস্টেরন যৌগ নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের জন্য প্রয়োজনীয় জীনগুলিকে সক্রিয় করে।

Tmf^+ জীনের পরিবৃত্তির (Mutation) ফলে জাত Tmf জীন মানুষ-সহ বহু স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। Tmf^+ পরিবৃত্তির ফলে Tmf হইলে শুক্রাশয় নিজ বৈশিষ্ট্য হারায় এবং ক্রমশঃ প্রাণীটি স্ত্রী লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ঘটনাটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে টেষ্টিকুলার ফেমিনাইনজেশন (Testicular femininezation) নামক সিনড্রোম (Syndrome) বলে। কোন ভ্রূণের কোষের X ক্রোমোসোমে Tmf জীন ও স্বাভাবিক Y ক্রোমোসোম থাকিলে টেস্টোস্টেরন ঠিকই উৎপন্ন হয়; কিন্তু নিয়ন্ত্রক প্রোটিন সৃষ্টির অভাবে উহা কার্যকরী হইতে পারে না। ফলে পুরুষ লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণের শেষ পর্যায়ে ভ্রূণের পুরুষ বহিঃ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য (Male external sex characters) স্ত্রীলক্ষণযুক্ত হইয়া উঠে কিন্তু ভ্রূণের দেহাভ্যন্তরে শুক্রাশয় গঠিত হয়। অর্থাৎ বাহির হইতে স্ত্রীলক্ষণযুক্ত মনে হইলেও এই স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক স্ত্রী যৌন অঙ্গ যথা ফ্যালোপিয়ান টিউব, জরায়ু (Fallopian tube, Uterus) ইত্যাদি গঠিত হয় না। মনে করা হয় শুক্রাশয় কর্তৃক নিঃসৃত X ফ্যাক্টর (X factor) ঐ গুলির গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

XY বহনকারী কোষের ন্যায় XX বহনকারী কোষও টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করে এবং টেস্টোস্টেরন উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। XX ভ্রূণ বা শুক্রাশয় বর্জিত XY ভ্রূণকে বাহির হইতে টেস্টোস্টেরন দিলে পুরুষের বহিঃ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয় কিন্তু দেহাভ্যন্তরে শুক্রনালিকা ও ডিম্বনালিকা উভয়েই গঠিত হয়। ডিম্বনালিকা গঠন নিবারক শুক্রাশয় নিঃসৃত X ফ্যাকটর না থাকায় এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

স্তন্যপায়ীদের লিঙ্গ নির্ধারণ ও লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের পর্যায়ক্রম ও পারস্পরিক সম্পর্ক—



সময়

ড্রসোফিলা ও মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের পার্থক্য

1. ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে অটোসোম এবং X ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অটোসোম লিঙ্গ নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করে না।

2. ড্রসোফিলাতে X ক্রোমোসোমস্থিত লিঙ্গ নির্ধারক জীন ও অটোসোমস্থিত লিঙ্গ নির্ধারক জীনের ভারসাম্যের উপর লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রে জীনের এইরূপ ভারসাম্যের উপর লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভরশীল নহে।

3. মানুষের ক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোম পুংলিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক কিন্তু এই কার্যে X ক্রোমোসোমের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ ইহা স্ত্রীলিঙ্গ নির্ধারক X ক্রোমোসোমস্থিত জীনের ক্রিয়াশীলতাকে পরিবর্তিত করে এবং পুংলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোমের লিঙ্গনির্ধারক কোন ক্রিয়াশীলতা নাই। ইহা কেবলমাত্র শুক্রাণুর চলনশীলতার নিয়ামক অর্থাৎ পুরুষ ড্রসোফিলার জনন ক্ষমতার জন্য ইহা দায়ী।

অনুচ্ছেদ 6

মিয়োসিস ও পুনর্বিন্যাস

6.1 লিংকেজ

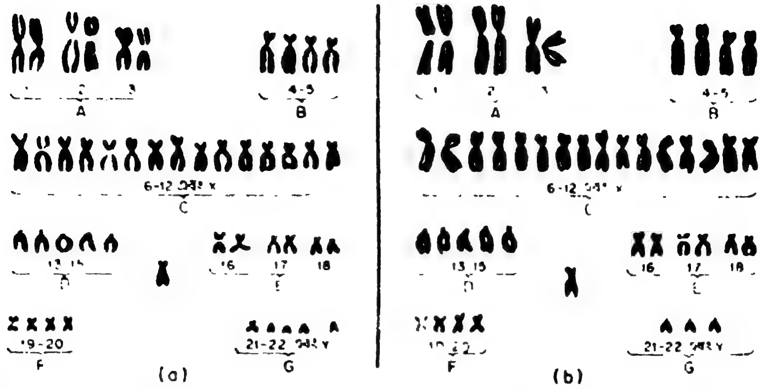
ক্রোমোসোম ও মেণ্ডেল বর্ণিত জীনের মধ্যে বংশগতিজনিত সম্পর্কের কথা সাটন (Sutton) 1903 খৃীষ্টাব্দে ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের প্রতি তিনি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন জীনের সামগ্রিক সংখ্যা অপেক্ষা ক্রোমোসোমের সংখ্যা অনেক কম। ড্রসোফিলায় মাত্র চারিজোড়া ক্রোমোসোম কিন্তু ড্রসোফিলার সামগ্রিক জীনের সংখ্যা (যাহারা বিভিন্ন বৈশিষ্টের নির্ধারক) ক্রোমোসোম সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই সত্য হইতে সাটন এবং তৎকালীন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে একটি ক্রোমোসোমে একাধিক জীন থাকে এবং কোন একটি ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনসমূহ পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সামগ্রিকভাবে একটি গ্রুপ (Group) বা গোষ্ঠী গঠন করে। মিয়োসিসের সময় স্বাভাবিক ভাবেই এই জীনগোষ্ঠীর একটি এক মেরুতে এবং অন্যটি উহার বিপরীত মেরুতে যায়। কোন ক্রোমোসোমে অবস্থিত একটি জীন গোষ্ঠী স্বাধীন বিন্যাস সূত্র অগ্রাহ্য করিয়া এক জনু হইতে অন্য জনুতে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পরিবাহিত হইলে ঘটনাটিকে **লিংকেজ (Linkage)** বলা হয়।

স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মেণ্ডেলকৃত পরীক্ষায় 7টি জীন যুগলের যে কোন যুগল সর্বদাই স্বাধীন বিন্যাস সূত্র অনুসরণ করিয়াছিল : কোন ক্ষেত্রেই ইহারা এক জনু হইতে অন্য জনুতে একত্রে পরিবাহিত হয় নাই। কি কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছিল ? পরবর্তী কালে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে মটর গাছের ডিপ্লয়েড দশার ক্রোমোসোম সংখ্যা সাতজোড়া এবং মেণ্ডেলের সৌভাগ্য যে তাঁহার ব্যবহৃত সাতজোড়া জীনের প্রতি জোড়ার একটি এক ক্রোমোসোম এবং অপরটি উহার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের হোমোলোগাস অংশে অবস্থিত ছিল। এক কথায় সাতজোড়া জীনের প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত ছিল।

6.2 লিংকেজ গ্রুপ ও ক্রোমোসোম সংখ্যা

কোন একটি জীবের হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোম সংখ্যা ও সেই জীবের লিংকেজ গ্রুপের সংখ্যা সাধারণতঃ সমান। এই হিসাবে কোন জীবের লিংকেজ গ্রুপের সংখ্যা হইতে সেই জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রে 23টি লিংকেজ গ্রুপ আশা করা যায় কারণ মানুষের হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা 23। মহিলাদের ক্ষেত্রে ইহা ঠিক কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে 24টি লিংকেজ গ্রুপ থাকে (চিত্র 6.1)। একটি লিংকেজ গ্রুপ বেশী হওয়ার কারণ Y ক্রোমোসোম।

Y ক্রোমোসোমে কয়েকটি মাত্র জীন থাকিলেও ইহা পৃথক একটি লিংকেজ গ্রুপ গঠন করে (লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি ও চিত্র 4.9 দ্রষ্টব্য)।



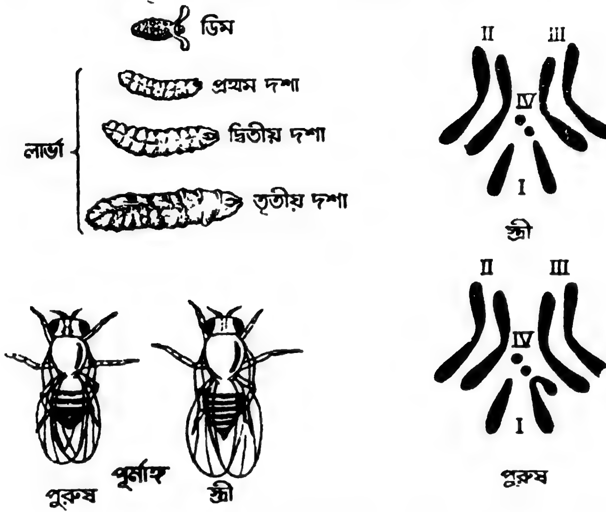
চিত্র .1 ট্রানস্লোকেসনের জন্য ডাউন সিনড্রোম যুক্ত মানুষের লিংকেজ গ্রুপ—(a) 46টি ক্রোমোসোম কিন্তু 15 নম্বর ক্রোমোসোম একা ; 21 নম্বর ক্রোমোসোম একজোড়া ও স্বাভাবিক 15 নম্বর ও 21 নম্বর ক্রোমোসোমের ট্রানস্লোকেশনের ফলে একটি বৃহদাকার ক্রোমোসোম সৃষ্টি হইয়াছে ; (b) উক্ত মানুষের মাতার লিংকেজ গ্রুপ ; 45টি ক্রোমোসোম লক্ষণীয় ; 15 নম্বর ও 21 নম্বর ক্রোমোসোম যুক্ত থাকায় সংখ্যা কম হইয়াছে।

পূর্ব আলোচনায় ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে দুইটি যুগল জীনের প্রত্যেকটি ইহাদের অ্যালিলের সহিত প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক যুক্ত হইলে উহাদের হেটারোজাইগাস জনিতৃ জনুর মিলনের ফলে 4 প্রকার ফিনোটাইপের অপত্য সৃষ্টি হয় এবং ইহাদের পারস্পরিক অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1 (অর্থাৎ AaBb × AaBb ক্রশ করিলে 9 AB : 3 Ab : 3 aB : 1 ab ফিনোটাইপ উৎপন্ন হয়। বেটসন ও প্যানেট (Bateson and Punnet) সর্বপ্রথম মটরগাছের ক্ষেত্রে এই বিন্যাসের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন। মটরগাছের ফুলের রং বিভিন্ন হইলে উহাদের পরাগরেণুর আকৃতিতে বিভিন্নতা দেখা যায়। এই দুই বৈশিষ্ট্যের হেটারোজাইগাস জনিতৃ জনুর মধ্যে ক্রশ করিলে অপত্য জনুতে জনিতৃ বিন্যাসের সংখ্যা পুনর্বিন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়। তাঁহারা এই ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

মরগ্যান ও তাঁহার সহযোগীরা ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে অ্যালিলগত পার্থক্যযুক্ত অনেক জীনের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। বহুক্ষেত্রে এই জীনগুলি একত্রে বা গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পূর্বেই ক্রোমোসোমে জীনের উপস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় প্রমাণিত যে w জীনের ন্যায় y, m, f এবং অন্য অনেক জীন ড্রসোফিলার X ক্রোমোসোমে অবস্থিত। অর্থাৎ এই জীনগুলি X-লিংকেজ গোষ্ঠী গঠন করিয়া থাকে এবং লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতি অনুসরণ করে। বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যে অন্যান্য ক্রোমোসোমেও যে জীন অবস্থিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

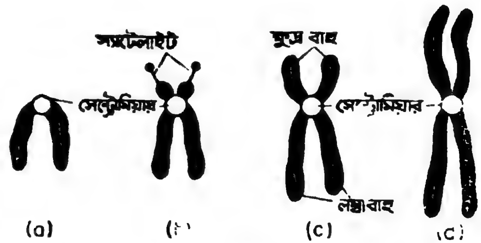
লিংকেজ দুই প্রকার হইতে পারে—(A) সম্পূর্ণ ও (B) অসম্পূর্ণ।

(A) সম্পূর্ণ লিংকেজ—সম্পূর্ণ লিংকেজ অধিকাংশ জীবে পাওয়া যায় না। কয়েকটি মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ লিংকেজ পাওয়া যায়। এইরূপ একটি উদাহরণ পুরুষ ড্রসোফিলা। ধ্রুপদী জীনতত্ত্বে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত প্রাণী ড্রসোফিলা (চিত্র 6.2)। ড্রসোফিলার যে কোন একটি ক্রোমোসোমে অনেক জীনের উপস্থিতি



চিত্র 6.2 ধ্রুপদী জীনতত্ত্বে ব্যবহৃত ড্রসোফিলার জীবন চক্রের বিভিন্ন দশা ও ক্রোমোসোম-সমূহ। লক্ষণীয় চতুর্থ ক্রোমোসোম (iv) বিন্দুবৎ

প্রমাণিত। ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার প্রজাতির পুরুষের তিনজোড়া অটোসোম এবং একটি X ও একটি Y ক্রোমোসোম এবং স্ত্রীর তিনজোড়া অটোসোম ও একজোড়া X ক্রোমোসোম আছে। X ক্রোমোসোমকে প্রথম ক্রোমোসোম (First chromosome) বলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রোমোসোম (চিত্র 6.3) সাব মেটাসেন্ট্রিক (Sub-metacentric) এবং চতুর্থ ক্রোমোসোম বিন্দুবৎ (Point chromosome) এবং আকারে সর্বাপেক্ষা ছোট। X ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলিকে এক-লিংকেজ গ্রুপ বা প্রথম লিংকেজগোষ্ঠী বলে। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলিকে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ



চিত্র 6.3 সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমের শ্রেণী বিন্যাস—(a) টিলোসেন্ট্রিক, (b) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, (c) সাবমেটাসেন্ট্রিক, (d) মেটাসেন্ট্রিক।

লিংকেজ গ্রুপ বলে। ড্রসোফিলার Y ক্রোমোসোম প্রায় নিষ্ক্রিয়। কেবলমাত্র শুক্রাণুর গমনশীলতার জন্য দায়ী কয়েকটি জীন ইহাতে থাকে। Y ক্রোমোসোমের কিছু অংশ X ক্রোমোসোমের সহিত সমসংস্থ বা হোমোলোগাস। এই সমসংস্থ অংশে bb (Bobbed) জীন ও নিউক্লিওলাস সংগঠক জীন (Nucleolar organiser gene) থাকে (চিত্র 4.18 দ্রষ্টব্য)। Y ক্রোমোসোমের দেহের অধিকাংশ অঞ্চল হেটারোক্রোমাটিন বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। Y ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলি Y লিংকেজ গ্রুপ গঠন করে।

ব্রিজেস (Bridges) পুরুষ ড্রসোফিলার দ্বিতীয় লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত *pr* ও *vg* জীন দুইটি সম্পর্কিত কিছু পরীক্ষা করেন। *pr* একটি প্রচ্ছন্ন জীন এবং হোমোজাইগাস বা হেমিজাইগাস অবস্থায় ইহা ড্রসোফিলার চোখের বর্ণকে পারপল (Purple) করে। pr^+ অবস্থা *pr* অবস্থার উপর প্রকট। *vg* একটি প্রচ্ছন্ন জীন। হোমোজাইগাস বা হেমিজাইগাস অবস্থায় ইহা উপস্থিত থাকিলে ড্রসোফিলার ডানার আকার ছোট হয়। vg^+ অবস্থা *vg* অবস্থার উপর প্রকট।

একটি স্বাভাবিক চোখ ও ডানাযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার $\left(\text{জিনোটাইপ } \frac{pr^+\ vg^+}{pr^+\ vg^+}\right)$ সহিত হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন পুরুষ ড্রসোফিলার $\left(\text{জিনোটাইপ } \frac{pr\ vg}{pr\ vg}\right)$ ক্রশ করিলে F_1 জনুতে হেটারোজাইগাস $\left(\text{জিনোটাইপ } \frac{pr^+.\ vg^+}{pr.\ vg}\right)$ ড্রসোফিলা পাওয়া যায়।

F_1 জনুতে এইভাবে পাওয়া হেটারোজাইগাস পুরুষ ড্রসোফিলার সহিত প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস স্ত্রী ড্রসোফিলার $\left(\text{জিনোটাইপ } \frac{pr\ vg}{pr\ vg}\right)$ পরীক্ষামূলক ক্রশ করিয়া পরবর্তী জনুতে ব্রিজেস নিম্নবর্ণিত ফিনোটাইপের ড্রসোফিলা পান—

1. স্বাভাবিক।
2. পারপল ভেস্টিজিয়াল।

পরীক্ষাটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$P_1 \quad \frac{pr.\ vg}{pr.\ vg}♂ \times \frac{pr^+ vg^+}{pr^+ vg^+}♀$$

{পারপল চোখ, ক্ষুদ্র ডানা} × (স্বাভাবিক)

$$F_1 \quad \frac{pr^+.\ vg^+}{pr.\ vg}$$ (হেটারোজাইগাস – স্বাভাবিক)

পরীক্ষা ক্রশ

$$\frac{pr^+ vg^+}{pr.vg}♂ \times \frac{pr\ vg}{pr\ vg}♀$$

F_2 (1) $\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$ (হেটারোজাইগাস, স্বাভাবিক)

(2) $\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$ (হেমিজাইগাস, পারপল ভেস্টিজিয়াল)

ফলাফলটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে পরীক্ষা ক্রশে প্রাপ্ত অপত্য জনুতে পুনর্বিন্যাস জাত কোন শ্রেণী পাওয়া যায় না। পুরুষ ড্রসোফিলায় $pr\ vg$ জীনের যে বিন্যাস (একটি ক্রোমোসোমে $pr^+\ vg^+$ এবং অন্যটিতে $pr\ vg$) পরীক্ষাক্রশে ছিল উহারা ঠিক ঐ ভাবেই অপত্য জনুতে বিন্যস্ত আছে। স্বাধীন বিন্যাসের ভিত্তিতে কাম্য ফল এখানে পাওয়া যায় নাই। স্বাধীন বিন্যাস হইল চারি প্রকার পুরুষ জনন কোষ সৃষ্টি হইত—(i) pr^+vg, (ii) $pr\ vg^+$, (iii) pr^+vg^+, (iv) $pr\ vg$ কিন্তু মাত্র এক প্রকার স্ত্রী জনন কোষ ($pr\ vg$) সৃষ্টি হইত। ইহাদের ফলে চারি প্রকার অপত্য জনু, যথা $\frac{pr^+vg}{pr\ vg}$ (ফিনোটাইপ স্বাভাবিক চক্ষু ও ক্ষুদ্রডানা),

$\frac{pr\ vg^+}{pr\ vg}$ (ফিনোটাইপ পারপল চক্ষু ও স্বাভাবিক ডানা),

$\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$ (ফিনোটাইপ স্বাভাবিক চক্ষু ও ডানা) এবং

$\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$ (ফিনোটাইপ পারপল চক্ষু ও ক্ষুদ্র ডানা) পাওয়া যাইত এবং ইহাদের সংখ্যা প্রতিক্ষেত্রে 25% হইতে পারিত। কিন্তু স্বাধীন বিন্যাস না হওয়ায় কেবল মাত্র দুই প্রকার অপত্য জনু - স্বাভাবিক চক্ষু ও ডানা এবং পারপল ও ক্ষুদ্র ডানা 1 : 1 অনুপাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরীক্ষায় ব্যবহৃত জীন দুইটি একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় লিংকেজ গ্রুপের অন্য জীন লইয়া পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য লিংকেজ গ্রুপের জীন লইয়া পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে যে পুরুষ ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে কোনরূপ পারস্পরিক অংশ বিনিময় হয় না। অর্থাৎ পুরুষ ড্রসোফিলায় লিংকেজ সম্পূর্ণ এবং জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটে না।

(B) **অসম্পূর্ণ লিংকেজ**—উপরের পরীক্ষার ন্যায় স্বাভাবিক কিন্তু হেটারোজাইগাস স্ত্রী ড্রসোফিলার $\left(\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}\right)$ সহিত দ্বিপ্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস পুরুষ ড্রসোফিলার $\left(\frac{pr\ vg}{pr\ vg}\right)$ পরীক্ষায় ক্রশ করিলে অসম্পূর্ণ লিংকেজ প্রতিষ্ঠাপিত করা যায়।

$P_1 \quad \frac{pr^+vg^+}{pr\ vg} ♀ \times \frac{pr\ vg}{pr\ vg} ♂$

চারিপ্রকার স্ত্রী জনন কোষ (1) pr^+vg^+, (2) $pr\ vg$, (3) pr^+vg, (4) $pr\ vg^+$ এবং কেবলমাত্র এক প্রকার পুরুষ জনন কোষ ($pr\ vg$) সৃষ্টি হয়। ইহাদের মিলনে নিম্নোক্ত প্রকার অপত্য পাওয়া যায়।

(i) $\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$ (স্বাভাবিক ফিনোটাইপ), (ii) $\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$ (পারপল, ক্ষুদ্র ডানা)

(iii) $\frac{pr^+vg}{pr\ vg}$ (স্বাভাবিক চক্ষু, ক্ষুদ্র ডানা), (iv) $\frac{pr\ vg^+}{pr\ vg}$ (পারপল, স্বাভাবিক ডানা)

পরীক্ষা ক্রশে দেখা যায় যে জনন কোষের জিনোটাইপগুলি সঠিক ভাবে অপত্য জনুতে পাওয়া ফিনোটাইপগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় কিন্তু প্রত্যেকের সম্ভাব্য হার (25%) সমহারে পাওয়া যায় না। ইহার অর্থ পরীক্ষা ক্রশে লব্ধ ফল সম্পূর্ণ লিংকেজ অথবা স্বাধীন বিন্যাসের নীতিতে পাওয়া ফলের ন্যায় নহে। সম্পূর্ণ লিংকেজ ও স্বাধীন বিন্যাসের ফল হইতে পরীক্ষা ক্রশে লব্ধ ফলের বিচ্যুতির কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার ; সম্পূর্ণ লিংকেজের ক্ষেত্রে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটির কোন অংশের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় বা ক্রসিং ওভার ঘটে না। ইহার ফলে হেটারোজাইগাস জনিতার pr^+vg^+ যুক্ত ক্রোমোসোম মিয়োসিস বিভাজনের সময় এক মেরুতে এবং $pr\ vg$ যুক্ত ক্রোমোসোম উহার বিপরীত মেরুতে যায়। ইহার অর্থ উৎপন্ন জনন কোষে জনিতা বিন্যাসের শ্রেণী দুইটিই পাওয়া যায়—পুনর্বিন্যাস জনিত শ্রেণী দুইটি পাওয়া যায় না। এই জন্যই অপত্য জনুতে জনিতার জনন কোষের বিন্যাস অনুযায়ী দুইটি শ্রেণী 50 : 50 হারে পাওয়া যায়।

আবার জীন দুইটি যদি একই লিংকেজ গ্রুপে না থাকে অর্থাৎ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থিত হয় তাহা হইলে জনিতা বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস জাত সম্ভাব্য চারিটি শ্রেণীই সমহারে পাওয়া যাইত। আলোচ্য পরীক্ষা ক্রশে সম্ভাব্য চারিটি শ্রেণী পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে আলোচ্য জীন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন লিংকেজ গ্রুপ বা ক্রোমোসোমে অবস্থিত নয়। ইহারা একই লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত এবং ইহাদের লিংকেজ সম্পূর্ণ নহে— আংশিক কারণ সম্পূর্ণ হইলে জীন দুইটির পুনর্বিন্যাসজাত কোন অপত্য পাওয়া যাইত না। আংশিক লিংকেজযুক্ত দুইটি যুগল জীন সকল উসাইটে (Oocyte) পুনর্বিন্যস্ত হয় না।

সম্পূর্ণ লিংকেজ ও আংশিক লিংকেজের পরীক্ষা ক্রশে প্রাপ্ত ফল পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকের আকারে দেওয়া হইল—

সম্পূর্ণ লিংকেজের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ক্রশে প্রাপ্তফল

জনিতা $\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$ ♂ × $\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$ ♀

(স্বাভাবিক হেটারোজাইগাস) × (পারপল ক্ষুদ্রডানা হোমোজাইগাস)

	অপত্য	প্রাপ্তফল	স্বাধীন বিন্যাসে কাম্য ফল	সিদ্ধান্ত
1.	$\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$	50%	25%	1 এবং 2 হইতে—স্বাভাবিক এবং পারপল ক্ষুদ্রডানা অর্থাৎ জনিতা বিন্যাস অপরিবর্তিত। 3 এবং 4 হইতে—পুনর্বিন্যাস হয় নাই
2.	$\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$	50%	25%	
3.	$\frac{pr^+vg}{pr\ vg}$	0%	25%	
4.	$\frac{pr\ vg^+}{pr\ vg}$	0%	25%	

আংশিক লিংকেজের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ক্রশে প্রাপ্তফল

জনিতা $\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$ ♀ × $\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$ ♂

(স্বাভাবিক হেটারোজাইগাস) × (পারপল ক্ষুদ্রডানা হোমোজাইগাস)

	অপত্য	প্রাপ্তফল	সম্পূর্ণ লিংকেজে কাম্য ফল	স্বাধীন বিন্যাসে কাম্য ফল	সিদ্ধান্ত
1.	$\frac{pr^+vg^+}{pr\ vg}$	1,339	1420 = 50%	710 = 25%	1 ও 2 হইতে —জনিতা বিন্যাস অপরিবর্তিত 3 ও 4 হইতে —পুনর্বিন্যাস হইয়াছে।
2.	$\frac{pr\ vg}{pr\ vg}$	1,195	1420 = 50%	710 = 25%	
3.	$\frac{pr^+vg}{pr\ vg}$	152	0	710 = 25%	
4.	$\frac{pr\ vg^+}{pr\ vg}$	154	0	710 = 25%	
		মোট সংখ্যা 2,840			

একই লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত দুইটি জীনের পুনর্বিন্যাস হার : বিভিন্ন লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত দুইটি জীনের পুনর্বিন্যাস হার 50%। কিন্তু

একই লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত যে কোন দুইটি জীনের পুনর্বিন্যাস হার 50% অপেক্ষা কম। এবং বিভিন্ন জীনের ক্ষেত্রে ইহা বিভিন্ন।

পরীক্ষা ক্রশে পুনর্বিন্যাসের হার (Recombination frequency) নির্ণয় করিতে হইলে পুনর্বিন্যাস জাত সংখ্যাকে জনিতা বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস জাত সংখ্যার যোগফল দ্বারা ভাগ করিতে হয়। পুনর্বিন্যাস হারকে 100 দ্বারা গুণ করিলে পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার (Percentage of Recombination) পাওয়া যায়।

উপরের উদাহরণে পুনর্বিন্যাস জাত শ্রেণী দুইটির যোগফল = 152 + 154 = 306

জনিতা বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস জাত চারিটি শ্রেণীর যোগফল = (1,339 + 1,195 + 152 + 154) = 2840।

সুতরাং পুনর্বিন্যাস হার = 306 ÷ 2840 = 0·107

এবং পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার = 0·107 × 100 = 10·7।

6.3 ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমস্থিত কয়েকটি জীনের পুনর্বিন্যাসের হার

ফিনোটাইপ	জীন চিহ্ন	পুনর্বিন্যাসের হার	পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার
হলুদ গাত্র বর্ণ এবং সাদা চক্ষু	*y* এবং w	0·010	1%
হলুদ গাত্র বর্ণ এবং সিন্দুর বর্ণ চক্ষু	*y* এবং v	0·322	32·2%
হলুদ গাত্র বর্ণ এবং ছোট ডানা	*y* এবং m	0·355	35·5%
সিন্দুর বর্ণ চোখ এবং ছোট ডানা	*v* এবং m	0·030	3%
সাদা চক্ষু এবং সিন্দুর বর্ণের চোখ	*w* এবং v	0·300	30%
সাদা চক্ষু এবং ছোট ডানা	*w* এবং m	0·327	32·7%
সাদা চক্ষু এবং অপরিণত ডানা	*w* এবং r	0·450	45%
সিন্দুর বর্ণের চক্ষু এবং অপরিণত ডানা	*v* এবং r	0·269	26·9%

ছকে প্রদত্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে X-ক্রোমোসোমস্থিত ভিন্ন ভিন্ন জীনের মধ্যে পুনর্বিন্যাসের হার বিভিন্ন। সকল আংশিক লিংকেজ যুক্ত জীনের ক্ষেত্রে এই হারে বিভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু যে কোন নির্দিষ্ট দুইটি জীনের ক্ষেত্রে হারের এই বিভিন্নতা থাকে না।

উপরের ছক হইতে জানা যায় যে *y* ও *w* জীনের পুনর্বিন্যাসের হার ·010 ; *y* ও *m* জীনের পুনর্বিন্যাসের হার 0·355 ; আবার *w* ও *m* জীনের পুনর্বিন্যাসের হার 0·327। *y* ও *m* জীনের পুনর্বিন্যাস হার সর্বাপেক্ষা বেশী। *y* ও *w* জীনের পুনর্বিন্যাস হারের সহিত *w* ও *m* এর হার যোগ করিলে যোগফল *y* ও *m*-এর হারের প্রায় সমান হয়।

অর্থাৎ *y* ও *m*-এর মধ্যে পুনর্বিন্যাস হার = *y* ও *w* এবং *w* ও *m*-এর মধ্যে পুনর্বিন্যাস হারের যোগফল। যে কোন লিংকেজ গ্রুপের যে কোন তিনটি জীনের

দুইটি করিয়া লইয়া পুনর্বিন্যাসের জন্য পরীক্ষা ক্রশ করিলে মোট তিনটি ফল পাওয়া যায় এবং এইরূপ তিনটি ফলের মধ্যে দুইটির যোগফল তৃতীয়টির সমান হয়। কোন ক্রোমোসোমের লিংকেজ গ্রুপে প্রাপ্ত জীনের সংখ্যা ক্রোমোসোমটির দৈর্ঘ্যের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

তুলনামূলকভাবে ড্রসোফিলার চতুর্থ লিংকেজ গ্রুপে জীনের সংখ্যা অন্যান্য গ্রুপ অপেক্ষা কম। এইক্ষেত্রে কেবলমাত্র ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশ গণনা করা হয়।

কোন লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত জীনের পুনর্বিন্যাস হার ক্রোমোসোমে জীনের সংখ্যা ও ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

6.4 ক্রোমোসোমের প্যাকাইটিন দৈর্ঘ্য, কায়াসমার হার এবং ক্রসওভার দৈর্ঘ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

ক্রোমোসোমের ক্রমিক সংখ্যা	প্যাকাইটিন দৈর্ঘ্য	কায়াসমার হার	ক্রসওভার দৈর্ঘ্য
1	100	3·65	187
2	86	3·25	163
3	78	3·00	150
4	76	2·95	148
5	76	2·95	148
6	53	2·20	110
7	61	2·45	123
8	61	2·45	123
9	53	2·20	110
10	44	1·95	98

ভুট্টার ক্ষেত্রে কায়াসমা ও ক্রসিংওভারের পারস্পরিক সম্পর্ক উপা ছকে দেখান হইয়াছে। প্রতিটি কায়াসমা চারিটি ক্রোমাটিডের দুইটির মধ্যে পারস্পরিক অংশ বিনিময় এবং প্রতিটি অংশ বিনিময় 50 ম্যাপ এককের সমান (জীন ঘটিত ক্রসিংওভারের ক্ষেত্রে)। গড়ে প্রতি বাইভ্যালেণ্টে 2টি কায়াসমা 100 ম্যাপ একককে সূচিত করে।

কোন নির্দিষ্ট দুইটি জীন—ধরা যাউক a ও b একটি ক্রোমোসোমের বিপরীত প্রান্তে আছে এবং ইহাদের অ্যালিল a^+ এবং b^+ উহার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে আছে। যেহেতু ক্রসিংওভার চারি সূত্র অবস্থায় অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে ঘটে, অতএব বলা যায় যে কোন একটি নির্দিষ্ট কোষে চারিটি ক্রোমাটিডের a ও b-এর মধ্যে মোট 2টি পারস্পরিক অংশ বিনিময় হওয়া সম্ভব। a ও b এর অবস্থান প্রান্তিক হওয়ার জন্য দুইটি ক্ষেত্রেই মিয়োসিসের ফলে যে রিটি হ্যাপ্লয়েড জনন কোষ উৎপন্ন হইবে তাহারা ক্রসওভারজনিত ফল হইবে। এইরূপ মোট 100 কোষের ক্ষেত্রে a ও b এর মধ্যে মোট 200 কায়াসমা দেখা যাইবে অর্থাৎ কায়াসমার হার এইক্ষেত্রে 2 অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবে না। এইভাবে কায়াসমার হারের সাহায্যে

ম্যাপ দূরত্ব মোটামুটি নির্ণয় করা সম্ভব। দশটি ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ক্রশওভার দৈর্ঘ্য কায়াসমা হারের হিসাব অনুযায়ী কাম্য ক্রশওভার দূরত্ব অপেক্ষা সর্বদাই কম। এই বৈষম্য আশা করা যায় কারণ সকল ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের সকল অংশের ম্যাপ যথাযথভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া ডাবল ক্রশওভার ঘটার জন্যও ইহা কমিতে পারে।

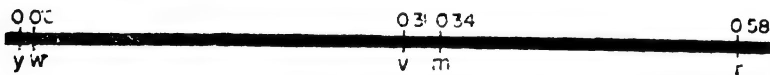
6.5 ক্রোমোসোম-ম্যাপ

জীনের পুনর্বিন্যাস পর্যালোচনা হইতে জানা যায় যে কোন নির্দিষ্ট দুইটি চিহ্নক জীনের পুনর্বিন্যাস হার সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে সমান থাকে। তবে চিহ্নক জীন দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশী হইলে উহাদের মধ্যে অবস্থিত ক্রোমোসোমের অংশে দুইবার ক্রসিংওভার হইতে পারে। ইহাকে D. C. O. বা ডাবল ক্রসিংওভার বলে। অনুরূপভাবে চিহ্নক জীনের অবস্থান গত দূরত্বের উপর নির্ভর করিয়া তিন, চার, বা ততোধিক বার ক্রসিংওভার ঘটিতে পারে। ফলে পুনর্বিন্যাসের হারের পরিবর্তন ঘটে। অনুরূপভাবে চিহ্নক জীন দুইটি কাছাকাছি থাকিলে দুই বা ততোধিক ক্রসিংওভারের সম্ভাবনা কমিয়া যায় অথবা একেবারেই থাকে না। ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার 10 অপেক্ষা কম হইলে ডবল বা অন্যান্য ক্রসিংওভার পাওয়া যায় না। পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার নির্ণয় করিয়া জীনের ক্রমসজ্জা ও উহাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। ইহাকে জীনের পুনর্বিন্যাস ম্যাপ বলে।

জীনের পুনর্বিন্যাসগত ম্যাপ নির্ণয়-পদ্ধতি :

6·4 চিত্রে ড্রসোফিলার *y*, *w*, *v*, *m* ও *r* জীনের পুনর্বিন্যাসগত ম্যাপ দেখান হইয়াছে। এই চিহ্নক জীনগুলির মধ্যে *y*, *w*, *m* জীনের সাহায্যে পুনর্বিন্যাসগত ম্যাপ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সর্বপ্রথম কয়েকটি চিহ্নক জীন যুক্ত ড্রসোফিলা গোষ্ঠী পালন মাধ্যমে পালন করিতে হইবে। চিহ্নক জীন ইহার সাধারণ অ্যালিলের সহিত প্রচ্ছন্ন বা প্রকট



চিত্র 6.4 ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের সর্বপ্রথম সৃষ্ট জীনগত ম্যাপ। পাঁচটি জীনের অবস্থান ম্যাপে নির্দেশিত হইয়াছে। y = সাদা গাত্রবর্ণ, w = সাদা চক্ষু, v = সিঁদুর বর্ণ চক্ষু, m = ক্ষুদ্র ডানা, r = লুপ্তপ্রায় ডানা। স্বেচ্ছাকৃত ভাবে y জীনের ক্রোমোসোমে স্থান শূন্য ধরা হইয়াছে।

সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে। তবে এই চিহ্নক জীনগুলি একই লিংকেজ গোষ্ঠী বা ক্রোমোসোমে অবস্থিত কিনা তাহা জানিতে হইবে। একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত চিহ্নক জীনগুলি লইয়া পরীক্ষা করিয়া উহাদের পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার পাওয়া যায়। আলোচ্য *y*, *w* ও *m* X-ক্রোমোসোমে অবস্থিত তিনটি প্রচ্ছন্ন জীন। ইহাদের স্বাভাবিক অ্যালিল যথাক্রমে y^+ w^+ ও m^+।

চিহ্নক জীনের পরীক্ষা ক্রশ :

$$\text{জনিতার জিনোটাইপ } \frac{y^+w^+m^+}{y\ w\ m} ♀ \times \frac{y\ w\ m}{(Y)} ♂$$

অপত্য জন্ম—আলোচ্য পরীক্ষায় স্ত্রী ও পুরুষ অপত্য ড্রসোফিলা সংখ্যা আলাদাভাবে গণনা করা হয় নাই। ইহাদের একত্রে গণন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র মাতৃজনিতার X-ক্রোমোসোমস্থিত চিহ্নক জীনের ও উহাদের স্বাভাবিক অ্যালিলের উপস্থিতি দেখান হইয়াছে।

জিনোটাইপ	বিন্যাসের শ্রেণী	সংখ্যা
$y\ w\ m$, $y^+w^+m^+$	জনিতা বিন্যাস	6,972
$y\ w\ m^+$, y^+w^+m — $w-m$	পুনর্বিন্যাস	3,454
$y\ w^+m^+$, $y^+w\ m$ — $y-w$	পুনর্বিন্যাস	60
$y^+w\ m^+$, $y\ w^+m$	দ্বি-পুনর্বিন্যাস	9
	মোট সংখ্যা	10,495

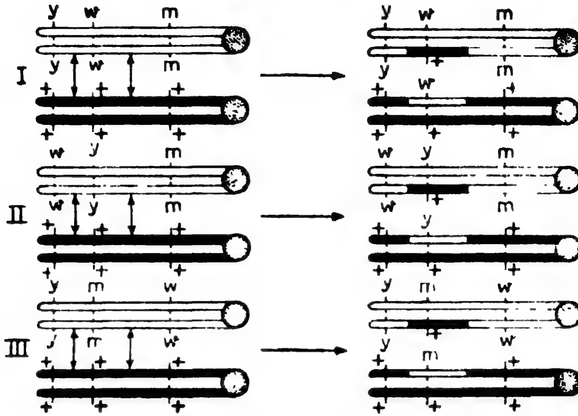
বিশ্লেষণ—তিনটি চিহ্নক জীনের পরীক্ষা ক্রশ নিম্নলিখিতরূপে দুই জীনের মধ্যে ক্রশ হিসাবে পর্যালোচনা করিলে —

চিহ্নকজীন	পুনর্বিন্যাসের হার	ম্যাপ দূরত্ব
w-m	$\frac{3454+9}{10,495}=0{\cdot}330$	33·0
y-w	$\frac{60+9}{10,495}=0{\cdot}007$	[illegible]
y-m	$\frac{3454+60}{10,495}=0{\cdot}335$	33·5

দুইটি জীনের পুনর্বিন্যাস হার উহাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য পরীক্ষাতে দেখা যায় যে y-m এবং w-m মধ্যবর্তী দূরত্ব অপেক্ষা y-w মধ্যবর্তী দূরত্ব অনেক কম অর্থাৎ y হইতে m অপেক্ষা w-এর অবস্থান নিকটতর। কিন্তু y, w ও m এর সজ্জাক্রম v-w-m অথবা m-w-y এই প্রশ্নের উত্তর এই পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয় (চিত্র 6.5)। এই ক্ষেত্রে অন্য চিহ্নক জীনের সাহায্যে পরীক্ষা ক্রশ করিয়া দেখা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে জীন সজ্জা y-w-m। নিকটবর্তী দুইটি লোকাসের (Locus) দূরত্ব উহাদের পুনর্বিন্যাসের শতকরা হার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কারণ কাছাকাছি থাকার ফলে উহাদের মধ্যে ডাবল বা অন্যান্য ক্রসিংওভার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বলিলেই চলে।

কোন ক্রোমোসোমে দুই জীনের দূরত্ব বেশী হইলে উহাদের পুনর্বিন্যাসের হার শতকরা 50 হইতে পারে। স্বাধীন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও পুনর্বিন্যাসের হার 50।

অর্থাৎ জীন দুইটি ভিন্ন লিংকেজ গোষ্ঠীতে অবস্থিত মনে হয়। প্রচলিত নিয়মে জীন ম্যাপ প্রস্তুতকালে 1% পুনর্বিন্যাসকে একক হিসাবে ধরা হয়। ইহাকে এক



চিত্র 6.5 দ্বি হেটারোজাইগাস মাতৃ জনিতার ক্রোমাটিডের প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের প্রথমে এবং দ্বি পুনর্বিন্যাস হওয়ার পরের অবস্থা। y, w ও m জীনের সম্ভাব্য সজ্জাক্রম I, II ও III দ্বারা নির্দেশিত। I সজ্জাক্রমের সহিত পাঠ্যাংশে ব্যাখ্যা করা পুনর্বিন্যাসের মিল আছে।

ম্যাপ একক বা এক সেন্টিমরগান (Centi Morgan) বলে। অর্থাৎ এক মরগান =100 শত ম্যাপ একক। এই হিসাবে y ও m মধ্যবর্তী ম্যাপ দূরত্ব 33·7 সেন্টিমরগান (0·7+33·0)। মনে রাখিতে হইবে যে y ও m এর মধ্যে প্রাপ্ত পুনর্বিন্যাসের হার 0·335। w জীনের অনুপস্থিতিতে y ও m হইতে প্রাপ্ত দূরত্ব 33·7 এর পরিবর্তে 33·5 সেন্টিমরগান ধরিতে হইত। উপরের সরণি হইতে—এই বিষয়টি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

পুনর্বিন্যাস রোধ (Genetic Interference) :—

একজোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটে। যখন কোন হোমোলোগাস যুগলের মধ্যে একাধিক পুনর্বিন্যাসগত ঘটনা স্বাধীনভাবে ঘটে তখন একটি ক্রসিংওভার একই ক্রোমোসোমের অন্যত্র ক্রসিংওভার ঘটাকে প্রভাবিত করে না। তবে ক্রসিংওভার খুব কাছাকাছি স্থানে ঘটিলে দেখা যায় যে একটি ক্রসিংওভার ঘটিলে অন্যটি ঘটিবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। ইহাকে পুনর্বিন্যাসগত রোধ বা Genetic Interference বলে। উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে y ও m এর মধ্যে একবার (S. C. O.) বা দুইবার (D. C. O.) ক্রসিংওভার ঘটিয়াছে। D. C. O. কে w জীনের সাহায্যে হিসাব করিতে হইয়াছে। D. C. O. ঘটিবার সম্ভাবনা, দুই S. C. O. ঘটিবার হারের গুণফল অর্থাৎ 0·330×0·007=0·0023। w জীনের সাহায্যে নির্ণীত y ও m এর মধ্যে প্রাপ্ত D. C. O. হার 9/10,495= 0·00086। দেখা যাইতেছে কাম্য ফল প্রাপ্ত ফল অপেক্ষা অনেক কম। অর্থাৎ

বলা যায় যে y ও m-এর মধ্যে D. C. O. ঘটিবার সম্ভাবনাকে S. C. O. বাধা দান করে বা রোধ সৃষ্টি করে। ইহাই জীনের পুনর্বিন্যাসগত রোধ।

সমঘটন (Co-incidence) :– যখন দুইটি ক্রসিংওভারের পারস্পরিক প্রভাবযুক্ত ঘটনা একসঙ্গে ঘটে তখন তাহাকে সমঘটন Co-incidence) বলে। কোন ক্রোমোসোমে দুইটি S. C. O. একত্রে ঘটিলে তাহাকে সমঘটন বলা হয়। আবার যখন একটি S. C. O. অপর একটি S. C. O. কে প্রভাবিত করে তখন প্রাপ্ত D. C. O. কাম্য D. C. O. অপেক্ষা কম হয়। প্রাপ্ত ও কাম্য D. C. O.-এর হারের অনুপাতকে সমঘটন অনুপাত বলে। উভয়েই সমান হইলে অনুপাত 1 হয়। আলোচ্য উদাহরণে সমঘটন অনুপাত—0·00086/0·0023 = 0·374.

এই অনুপাতকে অনেক সময় C দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে পুনর্বিন্যাসগত রোধ পূর্ণ বা 1 হইলে সমঘটনের অনুপাত 0 হইবে। অর্থাৎ পুনর্বিন্যাসগত রোধকে I দ্বারা প্রকাশ করিলে বলা যায় যে I = 1 – C.

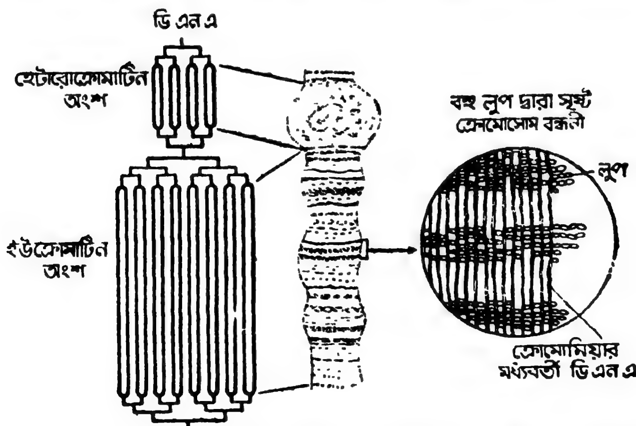
উপরের উদাহরণে I = 1 – 0·00086/0·0023

= 1 – 0·374 = 0·626.

I-এর মান বিভিন্ন লোকাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইয়া থাকে। দুইটি লোকাসের দূরত্ব যত কম হইবে ততই I-এর মান 1-এর দিকে যাইবে।

জীনের ক্রোমোসোমগত ম্যাপ :—

ড্রসোফিলা সহ সমস্ত ইউক্যারিওট কোষযুক্ত জীবের ক্রোমোসোম জীনগতভাবে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অংশ দ্বারা গঠিত। এই অংশ দুইটিকে যথাক্রমে

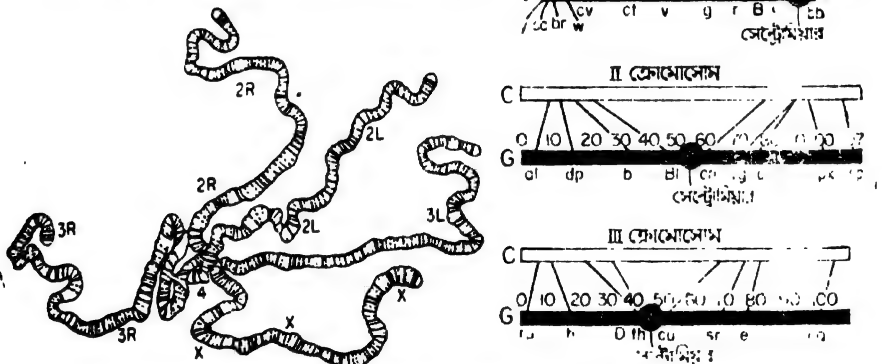


চিত্র 6.6 ড্রসোফিলার লালাগ্রন্থির পলিটিন X-ক্রোমোসোম। ইউক্রোমাটিন অংশে রেপ্লিকেশন, ব্যান্ড ও ইন্টার ব্যান্ড গঠন পদ্ধতি লক্ষণীয়।

ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন অংশ বলে। ড্রসোফিলার অধিকাংশ জীন ইউক্রোমাটিন অংশে অবস্থিত। ড্রসোফিলা ও অন্যান্য ডিপটেরা (Diptera) গোষ্ঠীর

পতঙ্গের কোন কোন দেহ কোষে তুলনামূলকভাবে বৃহদাকৃতি ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। ইহাকে পলিটিন (Polytene) ক্রোমোসোম বলে (চিত্র 6.6)। ইহা ড্রসোফিলার শূককীটের লালাগ্রন্থি কোষে (Salivary gland) বিশেষভাবে দেখা যায়। বিশেষ পদ্ধতিতে এই পলিটিন ক্রোমোসোম সৃষ্টি হয়। ইন্টারফেজ দশায় ক্রোমোসোমের আকৃতি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না। ইহার কারণ ক্রোমোটিন সূত্র এই সময় প্রসারিত হইয়া থাকে; জীনগুলি সক্রিয় হয় এবং রেপ্লিকেশান, ট্রান্সক্রিপসন্ ও ট্রানস্লেশন (Replication Transcription and Translation) ঘটে। অর্থাৎ নিউক্লিয়সটি 's' দশায় থাকে। ইহার পর ক্রমশঃ বিভাজন দশা উপস্থিত হয়।

কিন্তু ড্রসোফিলার শূককীটের লালাগ্রন্থি কোষের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় না এবং নিউক্লিয়াসটি সর্বদা 's' দশায় থাকে। ক্রোমাটিন সূত্র অনুদৈর্ঘ্য রেখায় প্রসারিত থাকে। ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের ক্রমাগত রেপ্লিকেশানের ফলে সূত্র সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা 1000 বা ততোধিক গুণ বেশী হইয়া যায়। অর্থাৎ একটি ক্রোমাটিন সূত্র একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি এইভাবে বহুসূত্র বা পলিটিন (Polytene) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ক্রোমাটিন সূত্রগুলি রেপ্লিকেশান হওয়ার পরে স্থানচ্যুত হয় না। ইহা ছাড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোম প্রথম হইতে যুগলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ইহার ফলে দেহকোষে যত জোড়া ক্রোমোসোম থাকে তত সংখ্যক পলিটিন ক্রোমোসোম

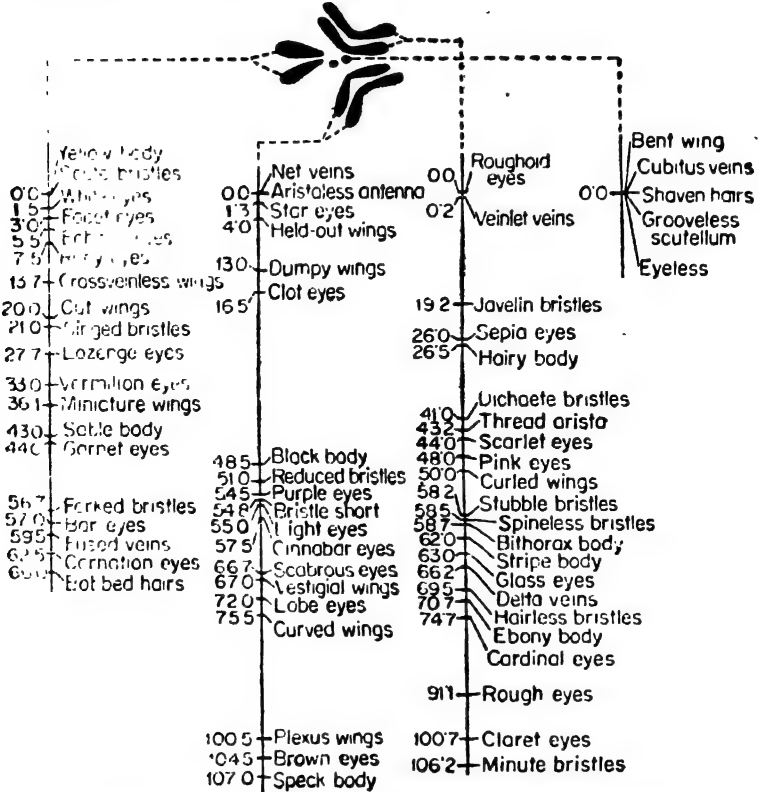


চিত্র 6.7 ড্রসোফিলার লালাগ্রন্থির পলিটিন ক্রোমোসোম (বাম) পাঁচটি বাহু লক্ষ্যণীয়। ড্রসোফিলার X, II এবং III ক্রোমোসোমের কোষতত্ত্বীয় (C) ও জেনেটিক (G) ম্যাপের তুলনামূলক চিত্ররূপ (দক্ষিণ)।

পাওয়া যায়। সেন্ট্রোমিয়ার মূলতঃ হেটারোক্রোমাটিন দ্বারা প্রস্তুত এবং প্রতিটি ক্রোমোসোম ক্রোমোসেন্টারে (Chromocentre) একত্রিত হইয়া যায়। ড্রসোফিলার পলিটিন ক্রোমোসোমের চিত্রে দেখা যায় যে ইহার পাঁচটি বাহু আছে (চিত্র 6.7)। স্ত্রী ড্রসোফিলাতে চারিজোড়া ক্রোমোসোম আছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রোমোসোম জোড়া মেটাসেন্ট্রিক হওয়ার জন্য 4টি বাহু সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে

ক্রোমোসেন্ট্রিক X একটি বাহু ও চতুর্থ ক্রোমোসোম বিন্দুর আকারে উপস্থিত থাকে। এইজন্য ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটারের ক্ষেত্রে পলিটিন ক্রোমোসোমের মোট পাঁচটি বাহু দেখা যায়।

পলিটিন ক্রোমোসোমে বহু অনুপ্রস্থ দাগ দেখা যায়। ইহাদের ব্যাণ্ড (Band) বলে। দুইটি ব্যাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত অংশকে ইণ্টার ব্যাণ্ড বলে। পলিটিন ক্রোমোসোমের প্রতিটি ক্রোমাটিন সূত্রের প্রতিটি ক্রোমোমিয়ার অনুপ্রস্থরেখায় পাশাপাশি থাকার ফলে এই ব্যাণ্ড ও ইণ্টার ব্যাণ্ড দেখা যায়।



চিত্র 6.8 ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটারের চারিটি ক্রোমোসোমের লিংকেজ বা জেনেটিক ম্যাপ। জীনগুলির নামের ইংরাজী শব্দগুলিই ব্যবহার করা হইয়াছে।

ক্রোমোসোমে জীনের প্রকৃত অবস্থান পলিটিন ক্রোমোসোমে সহজেই নির্ধারিত করা যায় এবং এইভাবে ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে জীনের প্রকৃত অবস্থানগত (Genetic map) বলে (চিত্র 6.8)। মেটাফেজ ক্রোমোসোমেও নানাভাবে জীনের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এই অবস্থান পলিটিন ক্রোমোসোমের মত সঠিক হয় না।

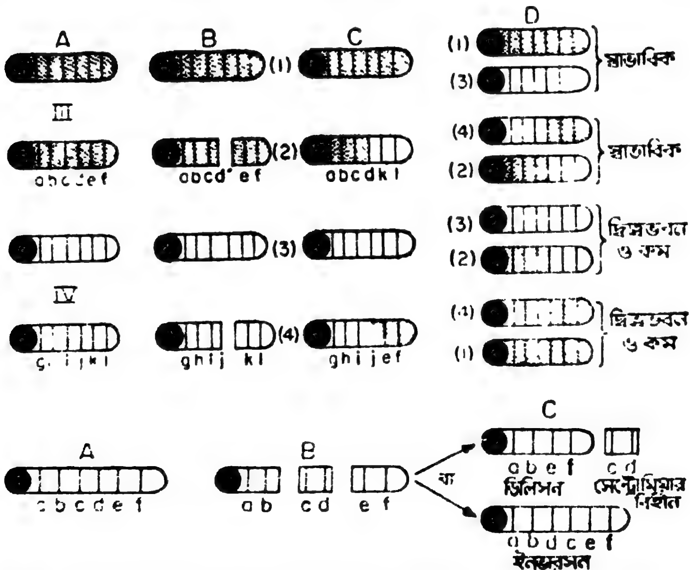
ক্রোমোসোমে জীনের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা হয় চিহ্নক জীন ও ক্রোমোসোম দেহের অপসারিত অংশের (Chromosomal abberation) সাহায্যে। রঞ্জন রশ্মি

ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কোষস্থ ক্রোমোসোমকে ভাঙিয়া ফেলা যায়। এই অবস্থায় ক্রোমোসোম স্থায়ী হয় না। তবে যেগুলি স্থায়ী হয় সেইগুলি জীনের অবস্থানগত ম্যাপ নির্ণয়ে সহায়ক হয়।

ক্রোমোসোম ভাঙ্গিয়া নানা অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে যেমন, ট্রান্সলোকেশান, ডুপ্লিকেশান, ডেফিসিয়েন্সি ও ইনভারসন্ (Translocation, Duplication, Deficiency, Inversion)।

ট্রান্সলোকেশন :—কোন ক্রোমোসোমের এক অংশ ভাঙ্গিয়া অন্য কোন ক্রোমোসোমের সহিত যুক্ত হইয়া ট্রান্সলোকেশান সৃষ্টি করে। ইহার ফলে জীনের লিংকেজ পরিবর্তিত হয়। চিহ্নক জীন ব্যবহার করিয়া ট্রান্সলোকেশানের দ্বারা লিংকেজের পরিবর্তন ঘটাইয়া চিহ্নক জীনের অবস্থান ক্রোমোসোমের কোন অংশে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। যদিও এই পদ্ধতিতে জীনের অবস্থিতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। হেটারোজাইগাস অবস্থায় পলিটিন ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধতা দেখিয়া ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়।

ডুপ্লিকেশন :—ক্রোমোসোমের কোন অংশ দ্বিগুণিত হইয়া ডুপ্লিকেশান সৃষ্টি করে। দ্বিগুণিত অংশ পাশাপাশি থাকিলে তাহাকে ট্যানডেম্ ডুপ্লিকেশান (Tandem duplication) বলে। ড্রসোফিলার চোখের আকৃতির B জীনের ক্ষেত্রে দেখা যায় পলিটিন ক্রোমোসোমের 16A অঞ্চলের 5টি ব্যাণ্ডের ট্যানডেম্ ডুপ্লিকেশান হইয়াছে।



চিত্র 6.3 ট্রান্সলোকেসন (I-IV), ইনভারসন ও মিয়োসিস বিভাজন জনিত ফলাফল।

ইহা ছাড়া চিহ্নক জীন যে স্থানে আছে সেই স্থানের ডুপ্লিকেশন ঘটিলে স্বাভাবিক ভাবে জীন ক্রিয়ার ও ক্রোমোসোমের আকৃতির বৈষম্য দেখা যাইবে এবং ইহার সাহায্যে উক্ত চিহ্নক জীনের উপস্থিতি নির্ণয় করিয়া ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়।

ইনভারসান :—ক্রোমোসোমের কোন অংশ ভাঙ্গার পর ঐ ভাঙ্গা অংশ 180° ঘুরিয়া পুনরায় একই ক্রোমোসোমের সহিত যুক্ত হইয়া ইনভারসান সৃষ্টি করে (চিত্র 6.9)। ইহার ফলে ইনভারসান যুক্ত স্থানে অবস্থিত চিহ্নক জীনের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটিলে উৎপন্ন কোষগুলিতে সেণ্ট্রোমিয়ার বিহীন এবং দুইটি সেণ্ট্রোমিয়ার যুক্ত অংশ সৃষ্টি হয় এবং কোনটি বাঁচিয়া থাকে না। ইহার ফলে অপত্য জনুতে ইনভারসানের মধ্যে অবস্থিত চিহ্নক জীনের অবস্থান নির্ণয় করিয়া ম্যাপ প্রস্তুত করা সম্ভব। পলিটিন ক্রোমোসোমে ইনভারসান হেটারোজাইগাস অবস্থায় লুপের আকৃতি ধারণ করে।

ডেফিসিয়েন্সি :—কোন ক্রোমোসোমের কোন অংশ নষ্ট হইলে ক্রোমোসোম দেহে ঐ স্থানের অভাব ঘটে। এই অবস্থাকে ডেফিসিয়েন্সি বলে। ডেফিসিয়েন্সি যুক্ত অংশে কোন প্রচ্ছন্ন জীনের স্বাভাবিক অ্যালিল এবং অন্য হোমোলোগাসে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল থাকিলে হেটারোজাইগাস অবস্থার প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় কারণ স্বাভাবিক অ্যালিল ডেফিসিয়েন্সির জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে না। এইভাবে ঐ জীনের অবস্থান [illegible]না সম্ভব। পলিটিন ক্রোমোসোমে ডেফিসিয়েন্সি অঞ্চলে একটি ছোট লুপ সৃষ্টি হয় এবং ইহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিয়া অবস্থানগত ম্যাপ তৈয়ারী করা হয়।

6.6 ক্রসিংওভারের কোষতত্ত্বীয় প্রমাণ

জনিতার একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলি একটি নির্দিষ্ট লিংকেজ গ্রুপ গঠন করে। এই লিংকেজ যদি সম্পূর্ণ লিংকেজ হয় তাহা হইলে জীনগুলির পুনর্বিন্যাস হয় না। কিন্তু লিংকেজ অসম্পূর্ণ হইলে জনিতার জীনগুলি ক্রসিংওভারের ফলে পুনর্বিন্যস্ত হয়। ক্রোমোসোমের কোন একটি ক্রোমাটিডের অংশবিশেষের সহিত ইহার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়ের ফলে ক্রসিংওভার সাধিত হয়। অভগিনী ক্রোমাটিডের পারস্পরিক অংশ বিনিময়কে (Reciprocal exchange of non-sister chromatids) ক্রসিংওভার বলে। ক্রসিংওভারের ফলে সৃষ্ট ক্রোমোসোমগুলিকে ক্রসওভারস (Crossovers) বলে। কোন লিংকেজ গ্রুপে অবস্থিত জীনের পুনর্বিন্যাসের জীনতত্ত্বীয় বিশ্লেষণ হইতে ক্রসিংওভারের ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাস্তবে এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটে কিনা তাহা সাধারণ উপায়ে বুঝিতে পারা যায় না কারণ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি আকৃতিগতভাবে দেখিতে একই প্রকার হওয়ায় অংশ বিনিময়ের ফলে উহাদের আকৃতিগত পরিবর্তন বুঝিতে পারা যায় না।

ম্যাক্লিংটক ও ক্রেটন ভুট্টার ক্ষেত্রে এবং স্টার্ন 1931 খ্রীষ্টাব্দে ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে ক্রসিংওভারের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময় ঘটে। সুবিধার জন্য এখানে স্টার্নের পরীক্ষার সহজবোধ্য বর্ণনা দেওয়া হইল। ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাস্টার

প্রজাতির 3 জোড়া অটোসোম ও একজোড়া X-ক্রোমোসোম (স্ত্রী ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে) অথবা একটি X ও Y-ক্রোমোসোম (পুরুষ ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে) থাকে। স্টার্ন এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রসিংওভারের সময় X-ক্রোমোসোম দুইটির মধ্যে অংশ বিশেষের স্থান বিনিময় প্রমাণ করেন। মনে রাখা প্রয়োজন পুরুষ ড্রসোফিলাতে ক্রসিংওভার ঘটে না। এই পরীক্ষার ধাপগুলি নিম্নরূপ :

(1) Car ও B মিউটেশানজাত ও X-ক্রোমোসোমস্থিত এই দুইটি জীনকে চিহ্নক-জীন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। Car এই প্রচ্ছন্ন জীনের ফিনোটাইপ হোমোজাইগাস বা হেমিজাইগাস অবস্থায় স্বাভাবিক লাল চোখের পরিবর্তে কারণেশান (Carnation) রং প্রকাশ করে। B প্রকট জীন এবং ইহার উপস্থিতি স্বাভাবিক গোলাকার চোখের পরিবর্তে দণ্ডাকৃতি চোখ উৎপন্ন করে। উভয়জীন একই X-ক্রোমোসোমে অবস্থিত। অপর X-ক্রোমোসোমে এই দুই জীনের স্বাভাবিক অ্যালিল Car^+ ও B^+ থাকে।

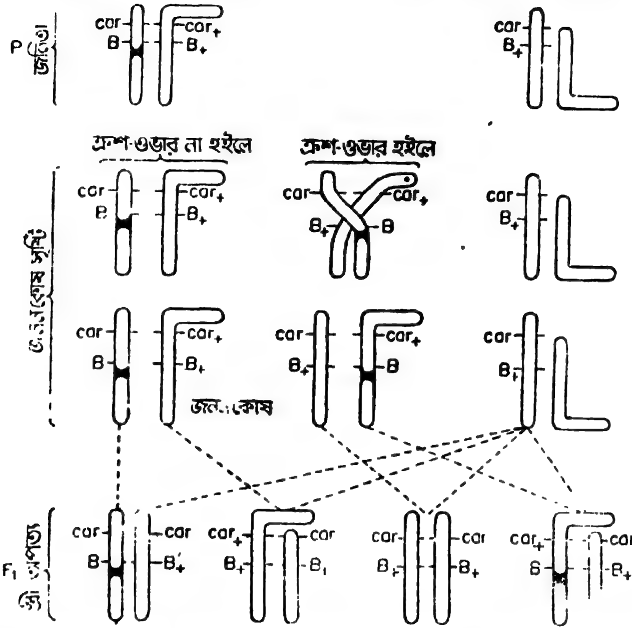
(2) দুইটি X-ক্রোমোসোমের প্রতিটির আকৃতি বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়। ফলে উভয় X-ক্রোমোসোমকে আলাদাভাবে চিনিতে পারা সম্ভব হয়। যে X-ক্রোমোসোম Car^+ ও B^+ জীন আছে সেই X-ক্রোমোসোমের সহিত Y-ক্রোমোসোমের কিছু অংশ জটিল পদ্ধতিতে এমনভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয় যে ক্রোমোসেন্ট্রিক X-ক্রোমোসোম পরিবর্তিত হইয়া সাব মেটাসেন্ট্রিক হইয়া যায়। অপর X-ক্রোমোসোমের (যে ক্রোমোসোমে Car ও B জীন রহিয়াছে) সেন্ট্রোমিয়ার হইতে দূরবর্তী প্রান্তটি ভাঙ্গিয়া দুইটি করা হয়। যেহেতু সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতিরেকে ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব নয় সেইহেতু অতি ছোট চতুর্থ ক্রোমোসোমের সহিত সেন্ট্রোমিয়ার বিহীন X-ক্রোমোসোম অংশে জুড়িয়া দেওয়া হয়। মনে রাখিতে হইবে যে যেহেতু Y-ক্রোমোসোম মূলত হেটারোক্রোমাটিন অংশ দ্বারা গঠিত এবং ইহা কেবলমাত্র শুক্রাণুর চলনশীলতার জীন বহন করে সেই হেতু Y-ক্রোমোসোমের কিছু অংশ X-ক্রোমোসোমের সহিত জুড়িয়া দিলে উক্ত ড্রসোফিলাতে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না অর্থাৎ জনন-ক্ষমতা, জননের হার ইত্যাদি ঠিক থাকে। অনুরূপভাবে চতুর্থ ক্রোমোসোমে X-ক্রোমোসোমের অংশবিশেষ যুক্ত করিলেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

অতএব সামগ্রিকভাবে এমন একটি স্ত্রী ড্রসোফিলা গোষ্ঠী পরীক্ষার জন্য লওয়া হয় যাহার দুইটি X-ক্রোমোসোম আকৃতিগতভাবে সম্পর্ক পৃথক। ফলে উহাদের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটিলে X-ক্রোমোসোমের আকৃতিগত বৈষম্যের জন্য উভয়কেই সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব।

(3) P_1 জনুতে উপরি যুক্ত X ক্রোমোসোম যুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার সহিত Car ও B^+ চিহ্নক জীনযুক্ত হেমিজাইগাস পুরুষ ড্রসোফিলার মিলন ঘটান হয়।

(4) হেটারোজাইগাস স্ত্রী ড্রসোফিলার Car, B জীন সমন্বিত X-ক্রোমোসোমের সহিত Car^+, B^+ জীন সমন্বিত X-ক্রোমোসোমটির ক্রশিংওভারের ফলে জীনের

পুনর্বিন্যাস ঘটিবে এবং ইহার ফলে চারি প্রকার ডিম্বাণু—(a) Car, B (b) Car^+, B^+ (c) Car, B^+ (d) Car^+, B উৎপন্ন হইবে। ইহাদের মধ্যে (a) ও (b) তে জনিতা বিন্যাস এবং (c) ও (d) তে চিহ্নক জীনের পুনর্বিন্যাস হইবে।



চিত্র 6.10 স্ত্রী ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে Car ও B জীনের পুনর্বিন্যাস। বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করায় দুইটি X-ক্রোমোসোমকে সহজেই চেনা যায়।

(5) Car ও B^+ চিহ্ন জীন সমন্বিত পুরুষ ড্রসোফিলাতে দুই প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হইবে। এক শ্রেণীর শুক্রাণুতে Car, B^+ চিহ্নকযুক্ত X-ক্রোমোসোম এবং অন্য শ্রেণীর শুক্রাণু Y-ক্রোমোসোম যুক্ত হইবে।

(6) চারি শ্রেণীর ডিম্বাণুর সহিত দুই শ্রেণীর শুক্রাণুর মিলনে F_1 জনুতে অপত্য নিম্নলিখিত রূপে সৃষ্টি হইবে—

(A) $\frac{\text{Car} \quad \text{B}}{\text{Car} \quad \text{B}^+}$ = কারনেশন দণ্ডাকৃতি চক্ষু স্ত্রী

$\frac{\text{Car} \quad \text{B}}{\quad}$ = কারনেশন দণ্ডাকৃতি চক্ষু, পুরুষ

(B) $\frac{\text{Car}^+ \quad \text{B}^+}{\text{Car} \quad \text{B}^+}$ = স্বাভাবিক স্ত্রী

$\frac{\text{Car}^+ \quad \text{B}^+}{\quad}$ = স্বাভাবিক পুরুষ

} জনিতৃ জনুর বিন্যাস রহিয়াছে।

(C) $\frac{Car \quad B^+}{Car \quad B^+}$ = কারনেশন স্বাভাবিক চক্ষু স্ত্রী

$\frac{Car \quad B^+}{\quad}$ = কারনেশন স্বাভাবিক চক্ষু পুরুষ

(D) $\frac{Car^+ \quad B}{Car^+ \quad B}$ = স্বাভাবিক ও দণ্ডাকৃতি চক্ষু স্ত্রী

$\frac{Car^+ \quad B}{\quad}$ = স্বাভাবিক ও দণ্ডাকৃতি চক্ষু পুরুষ

ক্রসিংওভারের ফলে চিহ্নক জীনের পুনর্বিন্যাস

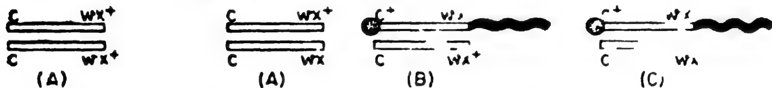
C ও D শ্রেণীতে চিহ্নক জীনের ক্রসিংওভারের ফলে পুনর্বিন্যাস ঘটিয়াছে। সুতরাং C ও D শ্রেণীর স্ত্রী ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে ইহাদের আকৃতিগত পরিবর্তন ধরা পড়িবে (চিত্র 6.10)। এই পরিবর্তনের কারণ Car ও B মধ্যবর্তী অংশ ভাঙ্গিয়া উহাদের হোমোলোগাস অংশের সহিত পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন (Reciprocal exchange) করিয়াছে। ফলে চিহ্নক জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রমাণিত যে ক্রসিংওভারের ফলে ক্রোমোসোমের হোমোলোগাস অংশের পারস্পরিক স্থান বিনিময় ঘটে (চিত্র 6.10)।

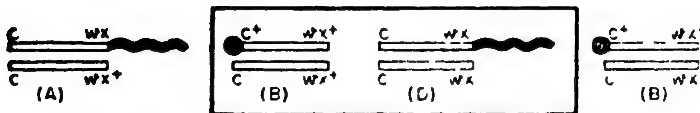
জনিতার জিনোটাইপ



জনিতার ন্যায় অপত্য (পুনঃ সংযুক্তি বিহীন)



জনিতা হইতে ভিন্ন অপত্য (পুনঃ সংযুক্তি)



চিত্র 6.11 কোষতত্ত্বীয় চিহ্নকের সাহায্যে ভৌত ও জীন বিনিময়ের সম্পর্ক নির্ধারণ। C এবং wx চিহ্নক জীন (Gene marker), গোল অংশ (Knob) এবং ঢেউ খেলানো কালো অংশ কোষতত্ত্বীয় চিহ্নক। পুনঃসংযুক্ত হইলে দুই প্রকার বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের কোষের ক্রোমোসোম পরীক্ষা করিলে কোষতত্ত্বীয় চিহ্নকে তফাৎ ধরা পড়ে। wx^+/wx^+ পরাগ রেণুর শ্বেতসার রঞ্জিত হইয়া যায়। A বর্ণগ্রাহী শ্বেতসার, B=বর্ণগ্রাহী শ্বেতসার, C–বর্ণগ্রাহী ওয়াক্সী (Waxy), D=বর্ণগ্রাহী ওয়াক্সী।

6.11 চিত্রে কোষতত্ত্বীয় চিহ্নকের সাহায্যে পুনর্বিন্যাসের ভৌত পদ্ধতি ও জীন বিনিময় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

6.7 ক্রসিংওভার কখন ও কোন অবস্থায় ঘটে :

স্টার্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে পারস্পরিক অংশ বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রসিংওভার ঘটে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কখন এই অংশ বিনিময় ঘটে ?

ক্রসিংওভারের সময় নির্ধারণে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়া যাইতে পারে :—

(A) যেহেতু ক্রসিংওভার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সম অংশের পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ঘটে, সেইহেতু বলা যাইতে পারে যে যখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটি পাশাপাশি আসে অর্থাৎ যখন যুগলবন্ধ (Synapsis) হয় তখনই ক্রসিংওভার ঘটা সম্ভব। হোমোলোগাস ক্রোমোসোম যুগলবন্ধ হয় প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সময়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ক্রসিংওভার প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সময় ঘটে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম যুগলবন্ধ হইলেই ক্রসিংওভার ঘটে না। পুরুষ ড্রসোফিলা মেলনোগাসটারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি প্রথম মিয়োসিস বিভাজনে যুগলবন্ধ হওয়া সত্বেও ইহাদের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটে না। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে হোমোলোগাস নয় এইরূপ ক্রোমোসোমও যুগলবন্ধ হয় যেমন '*X*' ও 'Y' ক্রোমোসোম ; কিন্তু এক্ষেত্রেও ক্রসিংওভার ঘটে না। অর্থাৎ বলা যায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধতা দুই শ্রেণীর : (a) ক্রসিংওভার ঘটে এমন যুগলবন্ধতা, (b) ক্রসিংওভার ঘটে না এমন যুগলবন্ধতা। যুগলবন্ধ হওয়া দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করে—ইহার একটি হইতেছে প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সময় একটি বেমতন্তুর সূত্রের সহিত একটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত করা ; যাহার ফলে ইহাদের একটি ক্রোমোসোম একটি মেরুতে এবং অপরটি অন্য মেরুতে যায়. শুধুমাত্র দুই মেরুতে সমভাবে পরিবেশনের জন্য যুগল ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধতা ঘটিলে উহাকে পরিবেশনগত যুগলবন্ধতা বলে। আবার যে যুগলবন্ধতার সাহায্যে ক্রসিংওভার ও পরিবেশন দুই সম্ভব হয় তাহাকে পরিবেশনগত ও ক্রসিংওভারগত যুগলবন্ধতা বলে।

(B) প্রথম মিয়োসিস বিভাজন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে প্রধানত জাইগোটিন দশায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধতা ঘটে কিন্তু ক্রোমোসোমগুলি অনুদৈর্ঘ্য রেখায় বিভাজিত হয় না—অর্থাৎ ক্রোমাটিডে বিভাজিত হয় না। এই অবস্থাকে ডাইএ্যাড (Diad) বলে। প্যাকাইটিন দশায় প্রতিটি ক্রোমোসোম অনুদৈর্ঘ্য রেখায় বিভাজিত হইয়া মোট চারিটি ক্রোমাটিড গঠন করে। এই অবস্থাকে টেট্রাড (Tetrad) অবস্থা বলে। ডিপ্লোটিন দশায় যুগলবন্ধদের মধ্যে আকর্ষণগত বল থাকে না, এইজন্য সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত অন্যত্র ক্রোমাটিড-গুলি পৃথক হইয়া থাকে। এই সময়ে দেখা যায় যে কোন একটি ক্রোমোসোমের

ক্রোমোটিডের সহিত উহার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড (Non-sister chromatid) 'λ'-এর ন্যায় আকৃতি গঠন করিয়া আছে। ইহাকে কায়াসমাটা (Chiasmata) বলে। কোন ক্রোমোসোমে জীনকে চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করিয়া যদি তাহাদের মধ্যে ক্রসিংওভার পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাইবে যে ক্রসিংওভার জীন দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কায়াসমার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক যুক্ত। যদি চিহ্ন জীন দুইটির মধ্যে কায়াসমার সংখ্যা কম থাকে তবে উহাদের ক্রসিংওভারের শতকরা হারও কম হয়। আবার উহাদের মধ্যে কায়াসমা সংখ্যা বেশী হইলে উহাদের মধ্যে ক্রসিংওভারও বেশী হইতে দেখা যায়।

এই ঘটনার দ্বারা অনুমান করা যায় যে কায়াসমা ক্রসিংওভারের ফলে ঘটিয়া থাকে। তবে কায়াসমা থাকিলেই যে সব সময় উহা ক্রসিংওভারের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা না হইতেও পারে।

কায়াসমা ও ক্রসিংওভারের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ক্রসিংওভার টেট্রাড অবস্থায় ঘটে। আবার যেহেতু কায়াসমা একই ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের মধ্যে না হইয়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের মধ্যে ঘটে সেইহেতু বলা যাইতে পারে যে ক্রসিংওভার একই ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের মধ্যে ঘটে না। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটির ক্রোমাটিডের সহিত সঙ্গী হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডের ক্রসিংওভার ঘটে।

অতএব সংক্ষেপে বলা যায় যে ক্রসিংওভার প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের টেট্রাড অবস্থায় অভগিনী (Non-sister) ক্রোমোটিডের মধ্যে ঘটে। এই যুক্তিনির্ভর অনুমানের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হইল —

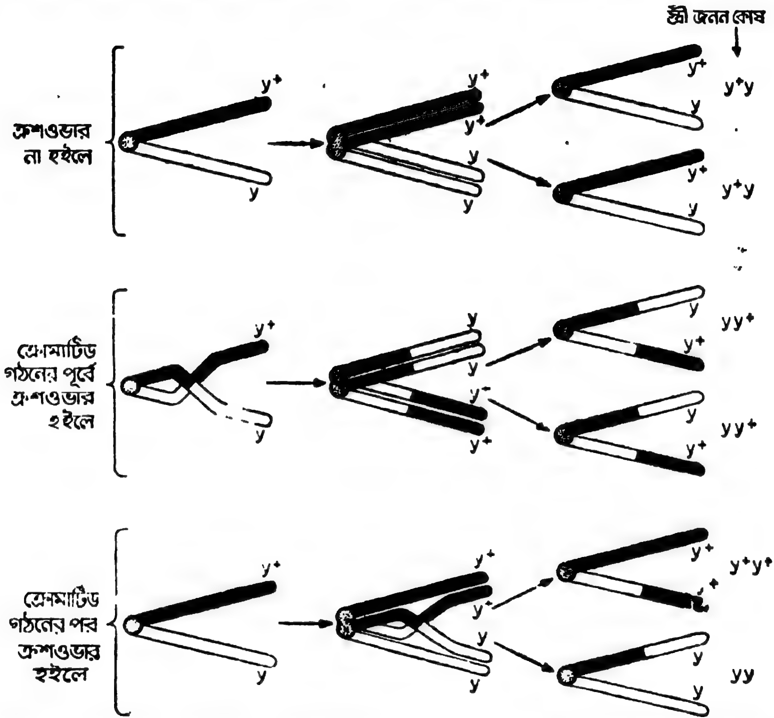
সংযুক্ত X-ক্রোমোসোম ড্রসোফিলার সাহায্যে প্রমাণ (Attached XX Chromosome) : ড্রসোফিলা মেলানোগাসটারের X-ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমটির একপ্রান্তে অবস্থিত। এই ধরনের ক্রোমোসোমকে অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক (Acrocentric) ক্রোমোসোম বলে। ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে দুইটি X-ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হইয়া সংযুক্ত XX-ক্রোমোসোম সৃষ্টি করে। যেহেতু দুইটি X-ক্রোমোসোম থাকিলে এবং অন্যান্য অটোসোম ঠিক থাকিলে ড্রসোফিলাটি স্ত্রী হইবে সেইহেতু সংযুক্ত XX ড্রসোফিলা সর্বদাই স্ত্রী ড্রসোফিলা হইবে।

এল. ভি. মরগ্যান সর্বপ্রথম এই ধরনের সংযুক্ত XX-ক্রোমোসোমের ড্রসোফিলার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন।

y জীন ড্রসোফিলার গাত্রবর্ণ নিয়ন্ত্রক একটি জীন। ইহার জন্য গাত্রবর্ণ হলুদ হয়। y^+ স্বাভাবিক অ্যালিল। ইহা X-ক্রোমোসোমে অবস্থিত। লিংকেজ ম্যাপ ও কোষতত্ত্বীয় ক্রোমোসোম ম্যাপের সাহায্যে জানা যায় যে এই জীনটি X-ক্রোমোসোমের এক প্রান্তে থাকে।

সংযুক্ত XX ক্রোমোসোম ড্রসোফিলার একটি X ক্রোমোসোমে *y* ও অন্যটিতে y^+ অ্যালিল থাকিলে ইহা হেটারোজাইগাস হইবে। ইহার সহিত স্বাভাবিক পুরুষ ড্রসোফিলার ক্রশ ঘটাইলে F_1 জনুতে হলুদ ও স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ এই দুইপ্রকার স্ত্রী ড্রসোফিলা পাওয়া যায়।

6.12 চিত্রে প্রদর্শিত রীতিতে যদি ডাইএ্যাড অবস্থায় ক্রসিংওভার ঘটে তবে সব স্ত্রী ড্রসোফিলা স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের হইবে। কিন্তু তাহা ঘটে না অর্থাৎ ডাইএ্যাড



চিত্র 6.12 মিয়োসিস বিভাজনে ক্রোমোসোমের চারি সূত্র (4 Strand) অবস্থায় ক্রশিং ওভার হইলেই হেটারোজাইগাস সংযুক্ত XX ক্রোমোসোম হইতে হোমোজাইগাস সংযুক্ত X ক্রোমোসোম সৃষ্টি হইতে পারে। সেন্ট্রোমিয়ার ও পরিবর্তিত জীনের মধ্যবর্তী অংশে ক্রশওভার হইয়াছে।

অবস্থায় ক্রসিংওভার ঘটে না। টেট্রাড অবস্থায় অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটিলে হলুদ ও স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের স্ত্রী ড্রসোফিলা পাওয়া যাইবে।

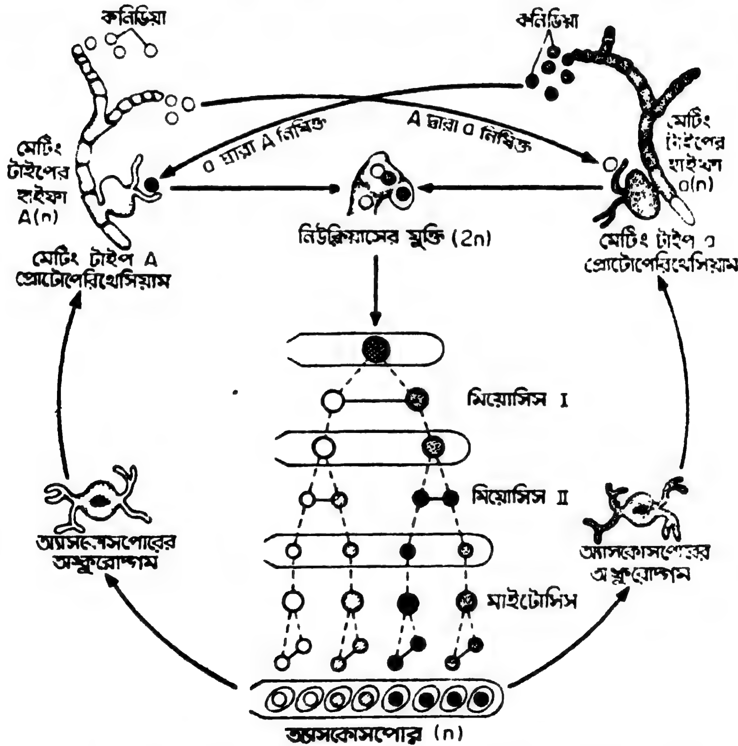
প্রকৃতপক্ষে ইহাই ঘটে; অতএব বলা যায় যে ক্রসিংওভার টেট্রাড অবস্থায় অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে ঘটে।

নিউরোস্পোরার টেট্রাড বিশ্লেষণ

যদিও ড্রসোফিলার সাহায্যে ক্রসিংওভারের সময় নির্দেশ করা সম্ভব তথাপি এই পদ্ধতিতে কয়েকটি অসুবিধা আছে। যেমন মিয়োসিসের পর একটি প্রাথমিক

উসাইট হইতে মোট চারিটি ডিম্বাণু উৎপন্ন হওয়ার পরিবর্তে একটি কার্যকরী ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় এবং বাকি তিনটি পোলার বডি সৃষ্টি করে। পোলার বডি ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট মিয়োসিসের ফলকে সরাসরি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতে পারে না। শুক্রাণুর ক্ষেত্রে যদিও একটি প্রাথমিক স্পারমাটোসাইট হইতে চারিটি শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তথাপি ইহারা যে সুনির্দিষ্টভাবে চারিটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করিবে তাহার সম্ভাবনাও থাকে না। ইহারা ছাড়া অন্য স্পারমাটোসাইট হইতে উৎপন্ন শুক্রাণু একত্রে থাকে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও মিয়োসিসের ফলে জাত সকল জীন বিন্যাস বিশ্লেষণ প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব হয় না।

কিন্তু নিউরোস্পোরার ক্ষেত্রে এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। নিউরোস্পোরা জীনতত্ত্বে বহুল ব্যবহৃত অ্যাসকোমাইসেটিস গোষ্ঠীর একটি ছত্রাক। ইহার জীবন



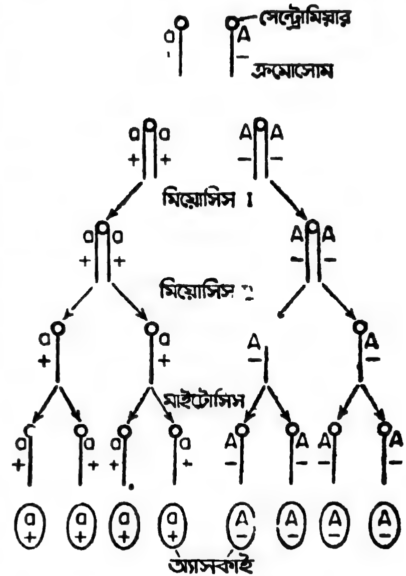
চিত্র 6.13 নিউরোস্পোরার জীবনচক্রে মিয়োসিস জনিত অ্যাসকাসের নিউক্লিয়াস বিন্যাস : অ্যাসকোস্পোরে অ্যাসকাসের বিন্যাস সুনির্দিষ্ট।

চক্রে যৌন ও অযৌন দুই প্রকার জনন দেখা যায়। সাধারণ মাইটোসিস বিভাজনের সাহায্যে সূতার আকৃতি বিশিষ্ট হাইফি বা মাইসেলিয়াম হইতে ইহার বৃদ্ধি হইতে পারে। মাইসেলিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি হ্যাপ্লয়েড এবং মোট 7টি ক্রোমোসোম

নিউক্লিয়াসে থাকে। কনিডিয়া (Conidia) নামক স্পোরের সাহায্যে ইহার অযৌন জনন সংঘটিত হয়। বিশেষ ধরনের হাইফা হইতে এই কনিডিয়া উৎপন্ন হয়। কনিডিয়াগুলি বায়ুর সাহায্যে স্থানান্তরিত হয়। যদি সুষ্ঠু পরিবেশে কনিডিয়া পড়ে তবে ইহা হইতে নূতন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন হয়। যৌন জনন সংঘটিত হয় ভিন্নধর্মী মাইসেলিয়ামের নিউক্লিয়াসের মিলনের মাধ্যমে (চিত্র 6.13)। মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড ভ্রূণাণু উৎপন্ন হয় এবং উহাতে 14টি ক্রোমোসোম থাকে।

যে কোষের মধ্যে ভ্রূণাণুর নিউক্লিয়াস থাকে তাহা ক্রমশ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া একটি আধার বা অ্যাসকাস্ (Ascus) উৎপন্ন করে। ভ্রূণাণুতে একই সময়ে মিয়োসিস ঘটিতে থাকে। ইহার ফলে মিয়োসিস বিভাজনের শেষে চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস পাশাপাশি অবস্থায় সজ্জিত থাকে। সমস্ত বিভাজনই অ্যাসকাসের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষতল বরাবর ঘটে এবং নিউক্লিয়াসগুলিও যে ক্রম অনুযায়ী উৎপন্ন হয় সেই ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত থাকে।

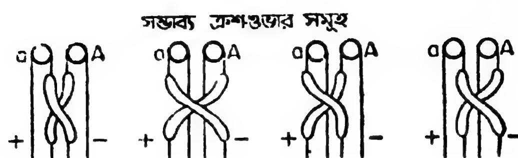
নিউক্লিয়াস বিভাজনের এই নিয়মনিষ্ঠা থাকার ফলে অ্যাসকাসের এক প্রান্তে অবস্থিত নিউক্লিয়াস দুইটি প্রথম মিয়োসিস্ বিভাজনে প্রাপ্ত দুইটি নিউক্লিয়াসের একটি হইতে উৎপন্ন হয়। অপর পক্ষে অ্যাসকাসের অন্য প্রান্তে অবস্থিত নিউক্লিয়াস দুইটি প্রথম বিভাজনে প্রাপ্ত অন্য-নিউক্লিয়াসের বিভাজনে উৎপন্ন হয়। ইহার পরে প্রতি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস আর একবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে। ইহার ফলে মিয়োসিস জাত প্রতি নিউক্লিয়াস দুইটি করিয়া পাওয়া যায়। প্রতি নিউক্লিয়াসের চারিপার্শ্বে একটি কঠিন আবরণী সৃষ্টি হয় এবং এইরূপে অ্যাস্কোস্পোর উৎপন্ন হয়। অ্যাসকাস উন্মুক্ত করিয়া অ্যাসকোস্পোর-গুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে অপসারণ করিয়া প্রতিটিকে আলাদা আলাদা পরীক্ষা-নলে পালন করা সম্ভব। বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে এইরূপ প্রতিটি অ্যাসকোস্পোরের জিনোটাইপ নির্ধারণ করা সম্ভব।

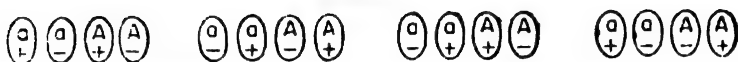


চিত্র 6.14 a+/A—জিনোটাইপ সমন্বিত ক্রোমোসোম যুগলের মিয়োসিস বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়। ক্রশিং ওভার না হওয়ার 4 : 4 অনুপাতে অ্যাসকাসের বিন্যাস।

এইভাবে অ্যাসকোস্পোরের সাহায্যে কখন ক্রসিংওভার ঘটে তাহা জানিতে পারা যায়। সরলতার জন্য মিয়োসিসের শেষে যে চারিটি অ্যাসকোস্পোর উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। মিয়োসিসের শেষে উৎপন্ন নিউক্লিয়াসের বিশ্লেষণকে টেট্রাড বিশ্লেষণ বলে।

6.14 চিত্রে নিউরোস্পোরার ভ্রূণাণুতে দুইটি ক্রোমোসোমে অবস্থিত দুইটি চিহ্নক জীনের সাহায্যে ক্রসিংওভার না ঘটিলে মিয়োসিসের শেষে কি কি ফল হইতে পারে তাহা দেখানো হইয়াছে। লিংকেজ যুক্ত চিহ্নক জীনের একটি 'A' ও উহার অ্যালিল '*a*' এবং অপরটি '+' ও উহার অ্যালিল '—' লওয়া হইয়াছে। 'A' ও '*a*'





চিত্র 6.15 চারিসূত্র অবস্থার নিউরোস্পোরার বিভিন্ন প্রকার ক্রশ ওভার ও মিয়োসিস বিভাজনের শেষে গঠিত অ্যাসকাই (মাইটোসিস দেখান হয় নাই)

মাইসেলিয়ামের মিলন শ্রেণী (Mating type) নির্দেশ করে কারণ মিলন-শ্রেণী (Mating type) সমধর্মী হইলে মিলন ঘটে না। "+" ও "−" অ্যালিল মাইসেলিয়ামে বর্ণ নির্ণয় করে। "+" অ্যালিল মাইসেলিয়ামের বর্ণের প্রকাশ ঘটায় এবং "−" অ্যালিল বর্ণহীনতা ঘটায়। '*a*' মিলন শ্রেণী "+" অ্যালিলের সহিত লিংকেজের ফলে যুক্ত এবং "A" মিলন শ্রেণী এবং "−" অ্যালিল একই লিংকেজে অবস্থিত।

6.15 ও 6.16 চিত্রে যেরূপ দেখানো হইয়াছে সেইরূপ ভাবে বিভিন্ন অ্যালিল যুগল হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বিভিন্ন বিন্দুতে যদি অবস্থিত থাকে তবে ক্রসিংওভার নির্ণয় করা সম্ভব। তাহা ছাড়া ইহার সাহায্যে ক্রসিংওভার কখন ঘটে অর্থাৎ দ্বি-সূত্র অবস্থায় অথবা চারি সূত্র অবস্থায় তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব।

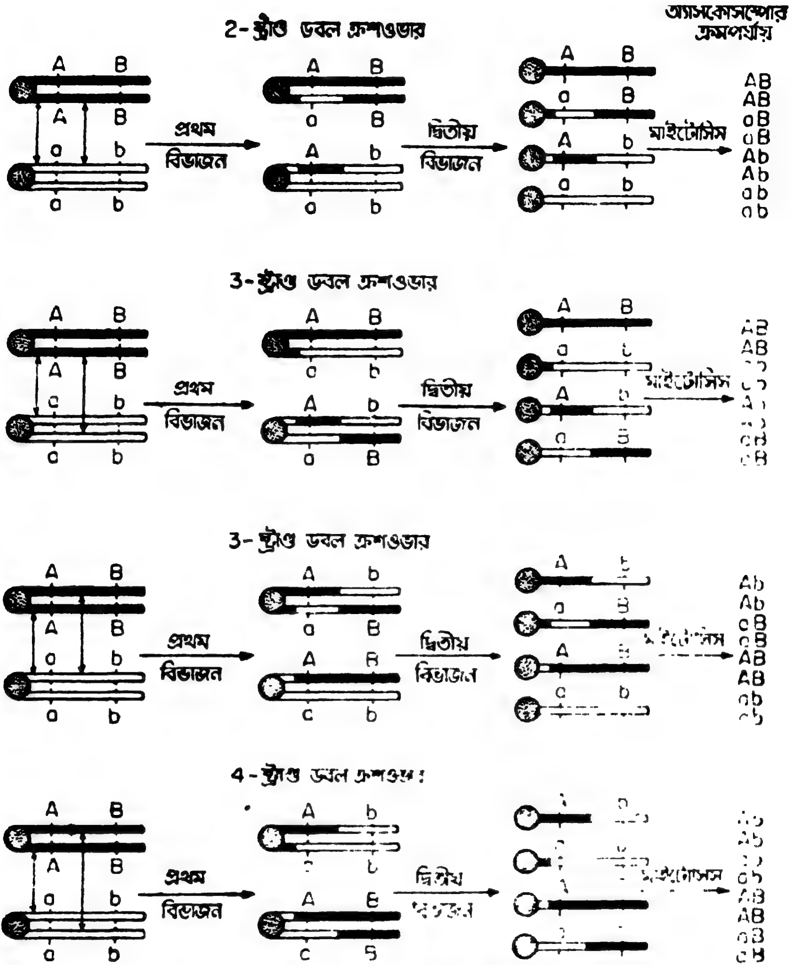
যদি ক্রসিংওভার দ্বিসূত্র অবস্থায় ঘটে তবে যে সকল অ্যাসকাসের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটে তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র চিহ্নক অ্যালিলের পুনর্বিন্যাস যুক্ত স্পোর দেখা যাইবে, জনিতা বিন্যাস কখনই পাওয়া যাইবে না (চিত্র দ্রষ্টব্য)। যদি ক্রসিংওভার চারিসূত্র অবস্থায় ঘটে অর্থাৎ চারিটি ক্রোমোটিডের দুইটি অভগিনী ক্রোমোটিডের মধ্যে ঘটে তবে যে সকল অ্যাসকাসের মধ্যে উহা ঘটে তাহাদের অ্যাসকোস্পোর চিহ্নকজীনের জনিতা বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাস উভয় প্রকার নির্দিষ্ট ক্রমসজ্জায় থাকিবে। 6.17 চিত্রে উক্ত চিহ্নক জীন লইয়া প্রকৃত একটি পরীক্ষা ক্রসের ফলাফল দেখানো হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে ক্রসিংওভার চারিসূত্র অবস্থায় ঘটে এবং চারিটি ক্রোমাটিডের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি কোন একটি নির্দিষ্ট ক্রসিংওভারে অংশ গ্রহণ করে।

যদি মিলন শ্রেণীর জীন ও মাইসেলিয়ামের বর্ণের জীনের মধ্যে একটি ক্রসিংওভার ঘটে তবে উৎপন্ন অ্যাসকোস্পোরের দুইটি হইবে জনিতা বিন্যাসযুক্ত এবং অপর দুইটি পুনর্বিন্যাস যুক্ত হইবে।

যদি এই ধরনের একটি ক্রসিংওভার প্রতিটি অ্যাসকাসের মধ্যে ঘটে তবে পুনর্বিন্যাসের হার শতকরা 50 ভাগ হইবে। স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে পুনর্বিন্যাসের হার (ম্যাপ দূরত্ব) ক্রসিংওভরের হারের অর্ধেক।

চিত্র 6.16 প্রথম ও দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনে অ্যাসকাসের অ্যালিলের পৃথগীভবন পর্যালোচনা। অ্যাসকোস্পোর হ্যাপ্লয়েড এবং প্রতি অ্যাসকোস্পোরের ফিনোটাইপ জীনোটাইপকে প্রতিফলিত করে। সেন্ট্রোমিয়ার ও Aa মধ্যবর্তী ক্রশ ওভার ও ফলাফল (II), Aa ও Bb মধ্যবর্তী ক্রশ ওভার ও ফলাফল (III)।

তবে ড্রসোফিলার লিংকেজ ম্যাপের চিত্র দেখিলে দেখা যাইবে যে বহুক্ষেত্রে দুইটি জীন মধ্যবর্তী দূরত্ব 50 ম্যাপ একক অপেক্ষা বেশী। এই অধিক ম্যাপ একক সংখ্যা নির্দেশ করে যে উহাদের লিংকেজ দূরত্ব অধিক এবং উক্ত দুইটি জীনের মধ্যবর্তী স্থানে যে সকল জীন আছে তাহাদের পুনর্বিন্যাসের মান যোগ করিয়া যে যোগফল পাওয়া যায় তাহা দ্বারা উক্ত দুইটি জীনের লিংকেজ দূরত্ব পাওয়া যায়।

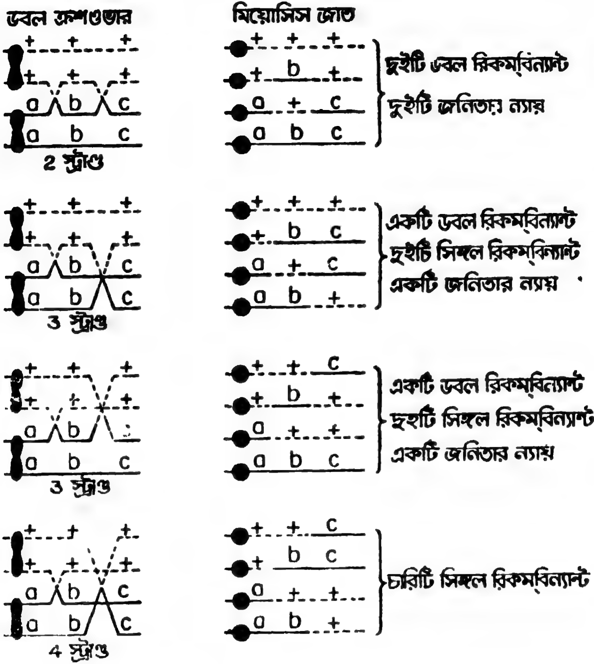


চিত্র 6.17 সুনির্দিষ্ট অ্যাসকাস বিন্যাস থাকায় নিউরোস্পোরায় চারিপ্রকার ক্রশওভার পাওয়া যায়।

6.9 ডবল ক্রসওভার (Double crossover)

প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের চারিসূত্র অবস্থায় চারিটি ক্রোমাটিডের যে-কোন দুইটি অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটে। ইহার ফলে ক্রসওভারের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যায়। পিতৃজনিতা বা মাতৃজনিতার ক্রোমাটিড দুইটির যে কোন একটির সহিত অভগিনী অপর যে কোন ক্রোমাটিডের মধ্যে একটি ক্রসিংওভার ঘটিলে উহার জীনগত ফলের কোন পরিবর্তন ঘটে না কারণ দুইটি ক্রোমাটিডই কোন একটি ক্রোমোসোম বিভাজিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর একই রকম হইয়াছে।

অপরপক্ষে ডবল ক্রসিংওভারের জীনগত ফল নানারূপ হইতে পারে—অর্থাৎ পুনর্বিন্যাস নানারূপ ঘটিতে পারে। দুইটি ক্রসিংওভারের ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দুইটি অভগিনী ক্রোমাটিড অংশ গ্রহণ করা অথবা বিভিন্ন



চিত্র 6.18 ডবল ক্রশওভার জনিত জীনের বিভিন্ন প্রকার সম্ভাবনা।

ক্রোমোটিডের অংশ গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিয়া সম্ভাব্য চারিপ্রকার ডবল-ক্রসওভার 6.18 চিত্রে দেখান হইয়াছে।

6.10. দেহকোষে ক্রশওভার (Somatic crossover)

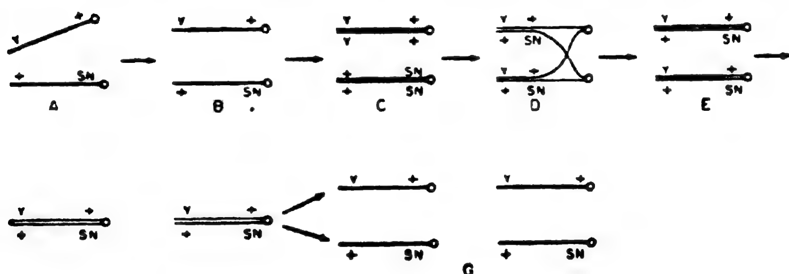
জনন কোষেই মিয়োসিস পদ্ধতির বিভাজন হয় সুতরাং জনন কোষেই হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যুগলবদ্ধতা ও অভগিনী ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকে। দেহকোষে মিয়োসিস বিভাজন হয় না সুতরাং দেহকোষের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে এবং অত্যন্ত অল্প ক্ষেত্রে ড্রসোফিলার দেহকোষের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়ের ঘটনা জানা গিয়াছে। ড্রসোফিলার পরিস্ফুরণের প্রথম দিকে একটি বা দুইটি কোষে ক্রশওভারের ঘটনা স্টার্ন (Stern) প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। ক্রশওভার হইয়াছে এইরূপ একটি বা দুইটি কোষ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া যে সকল কোষ উৎপন্ন করে সেগুলির চরিত্রলক্ষণ অন্যান্য

দেহকোষ হইতে ভিন্ন হয়। ক্রশ ওভার জাত ও ভিন্ন চরিত্রলক্ষণ যুক্ত কোষগুলি দলবদ্ধ হইয়া ড্রসোফিলার দেহে স্থানে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে ড্রসোফিলার দেহে কতকগুলি চিহ্নিত স্পট (Spot) দেখা যায়। অর্থাৎ ড্রসোফিলার দেহ সাধারণ দেহকোষ ও ক্রশওভার জাত দেহকোষ দ্বারা গঠিত একটি মোজেইক প্যাটার্ন (Mosaic pattern) গঠন করে।

জনিতা জনুতে সংঘটিত দেহকোষের কোনরূপ ক্রশওভার অপত্য জনুতে অনুধাবন করিলে ভুল হইবে কারণ দেহকোষ অপত্য সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে না। সুতরাং কোন প্রাণীর দেহকোষে ক্রশওভারের ঘটনা অনুধাবনের জন্য প্রাণীটিকেই ভালভাবে পরীক্ষা করিতে হয়। ড্রসোফিলার X ক্রোমোসোমে অবস্থিত দুইটি জীনের সাহায্যে দেহকোষের ক্রশওভারের ঘটনা প্রমাণিত হইয়াছে।

স্টার্ন হঠাৎ এমন একটি ড্রসোফিলা আবিষ্কার করেন যাহার দেহের কয়েকটি স্থান হলুদ বর্ণের এবং ঐ হলুদ বর্ণের নিকটবর্তী স্থানগুলি ছোট এবং কুঞ্চিত রোমযুক্ত। দেহের বাকী অংশ স্বাভাবিক। এই ধরনের ড্রসোফিলা কি ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যার জন্য স্টার্ন দেহকোষের ক্রশওভারের কথা বলেন। তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন—

ধরা যাউক হলুদ বর্ণের জন্য দায়ী জীন y এবং ছোট ও কুঞ্চিত রোমের জন্য দায়ী জীন sn (sn = singed bristle)। ইহারা প্রত্যেকেই পরিবর্তিত জাত



চিত্র 6.19 ড্রসোফিলার দেহকোষে সংঘটিত ক্রশওভারের কারণ ব্যাখ্যার চিত্ররূপ।

এবং প্রচ্ছন্ন। ইহাদের স্বাভাবিক অ্যালিল '+' দ্বারা চিহ্নিত। ইহারা প্রত্যেকেই X ক্রোমোসোমে অবস্থিত। y জীন যে X ক্রোমোসোমে অবস্থিত sn জীন সেই ক্রোমোসোমের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে অবস্থিত। দুইটি X ক্রোমোসোমই অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক। y সেণ্ট্রোমিয়ার হইতে দূরে এবং sn সেণ্ট্রোমিয়ারের নিকট অবস্থিত।

মনে করা যাউক পরিস্ফুরণের প্রাথমিক দশায় কোন একটি দেহকোষে $\left(\text{যাহার জিনোটাইপ } \frac{y+}{+sn} \right)$ ক্রশওভার ঘটিয়াছে এবং ক্রশওভার বিন্দুটি সেণ্ট্রোমিয়ার ও sn জীনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এইরূপ ক্রশওভার ঘটিলে যে কোন সেণ্ট্রোমিয়ারের সহিত যুক্ত থাকা ক্রোমাটিড দুইটির একটি হইবে y+ এবং অন্যটি

হইবে +sn। এখন বিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমাটিডগুলি বেমতন্তুতে যদি এমনভাবে সজ্জিত হয় যে y+ক্রোমাটিড দুইটি একমেরুতে এবং +sn ক্রোমাটিডগুলি উহার বিপরীত মেরুতে যায় তাহা হইলে বিভাজন শেষে উৎপন্ন অপত্য কোষ দুইটিতে X ক্রোমোসোমের গঠনগত ভিন্নতা আসিবে। একটি কোষের প্রতিটি X ক্রোমোসোম y+ এবং অন্যটির প্রতিটি X ক্রোমোসোম +sn হইবে (চিত্র 6.19)। y+ বহনকারী অপত্য কোষটি পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হইয়া যে কোষগুলি উৎপন্ন করিবে সেইগুলি হলুদ বর্ণের এবং +sn বহনকারী অপত্য কোষটি পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হইয়া যে কোষগুলি উৎপন্ন করিবে সেই কোষগুলি ছোট ও কুঞ্চিত রোমযুক্ত হইবে। একই জনিতা কোষ হইতে উৎপন্ন হওয়ার দরুন দুই প্রকার অপত্য কোষ কাছাকাছি থাকিবে এবং ইহার ফলে ড্রসোফিলার দেহে মোজেইক প্যাটার্ন দেখা যাইবে।

দেহকোষের ক্রশওভার কি জন্য হয় তাহা জানা যায় নাই।

6.11 সাইনাপ্টোনেমাল কমপ্লেক্স (Synaptonemal complex)

মিয়োসিসের সময় যুগলবদ্ধ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের অভগিনী ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় হওয়ায় জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগে তাহা হইতেছে কিভাবে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি ও উহাদের হোমোলোগাস অংশগুলি পাশাপাশি আসে এবং অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে সঠিক ভাবে অংশ বিনিময় ঘটে।

মিয়োসিসের লেপ্টোটিন দশায় ক্রোমোসোমগুলি দৃশ্যমান হয় যদিও ক্রোমাটিড তখনও গঠিত হয় না। এই দশায় ক্রোমোসোম দেহ ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতে থাকে এবং ক্রোমোসোম দেহ স্থানে স্থানে বর্তুলাকার হইয়া যায়। ক্রোমোসোম দেহের বর্তুলাকার অংশগুলিকে ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) এবং দুইটি ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী ক্রোমোসোম দেহকে আন্তঃ ক্রোমোমিয়ার (Inter chromomere) বলে। ক্রোমোমিয়ার অংশে ক্রোমোসোম দেহ বিশেষভাবে পাক খাওয়া (Coiled) অবস্থায় থাকে। লেপ্টোটিন দশায় ক্রোমোসোমগুলির সহিত নিউক্লিও আবরণীর সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। টিলোমিয়ার প্রান্তগুলি নিউক্লিও আবরণী সংলগ্ন থাকে। মনে করা হয় টিলোমিয়ার প্রান্তের সহিত নিউক্লিও আবরণীর এই সংযোগ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলিকে যুগলবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। বর্তমানে ইহা প্রমাণিত যে যুগল বদ্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের দেহের অনুদৈর্ঘ্য রেখা বরাবর এবং হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে হিস্টোন ধর্মী (Histone) প্রোটিন নির্মিত কিছু সূত্রবৎ গঠন সৃষ্টি হয়।

জাইগোটিন দশায় যুগলবদ্ধতা সম্পূর্ণ হয়। যুগলবদ্ধতা দুই পর্যায়ে সাধিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ক্রোমোসোম দুইটি পাশাপাশি আসে এবং ক্রোমোসোম দুইটির

মধ্যবর্তী দূরত্ব 3000A° থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রোমোসোম দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়া 1000A° হইয়া যায়। এক কথায় যুগলবন্ধ ক্রোমোসোমের দেহ অক্ষ বরাবর 1000A° দূরত্ব রক্ষিত হয়। এই অবস্থায় থাকা যুগলবন্ধ ক্রোমোসোমের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে যুগলবন্ধ ক্রোমোসোম মধ্যবর্তী স্থানে একটি সুস্পষ্ট গঠন দেখা যায়। গঠনটিকে সাইন্যাপ্টোনেমাল কমপ্লেক্স (Synaptonemal complex) বলে। গঠনটি মই সদৃশ। তিনটি অনুদৈর্ঘ্য এবং অপেক্ষাকৃত মোটা দণ্ড ইহার লম্বা অক্ষ গঠন করে। অক্ষ মধ্যবর্তী স্থানে অনেকগুলি সূত্রবৎ গঠন অনুপ্রস্থভাবে সজ্জিত থাকে। ফলে গঠনটিকে মই সদৃশ দেখায়।

সাইন্যাপ্টোনেমাল কমপ্লেক্সের কার্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নাই। যেহেতু ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধ হইবার সময় ইহা আবির্ভূত হয় এবং পুনঃসংযুক্তির পর ইহার আর অস্তিত্ব থাকে না সেইজন্য মনে করা হয় ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধতা ও পুনঃসংযুক্তিতে ইহার ভূমিকা আছে। অনেকে মনে করেন ইহার দ্বারা কেবলমাত্র ক্রোমোসোমের যুগলবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়; আবার অনেকে মনে করেন সাইন্যাপটোনেমাল কমপ্লেক্সের প্রোটিন কাঠামো হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যথাযথ সজ্জাবিন্যাস বা হোমোলোগাস অংশগুলিকে যথাযথভাবে ধরিয়া রাখে।

জীনগত বিষম বা হেটারোলোগাস (Heterologus) ক্রোমোসোমের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাইন্যাপটোনেমাল কমপ্লেক্স গঠিত হয়। এই ঘটনা হইতে আণবিক জীন তত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে ক্রোমোসোমস্থিত হোমোলোগাস ডি এন এ অণুকে সুস্থিত করা ইহার কাজ।

6.12 কায়াসমা ও ক্রসিংওভার ব্যাখ্যার মতবাদসমূহ

কায়াসমা ও ক্রসিংওভার পদ্ধতি ব্যাখ্যার জন্য একাধিক বিজ্ঞানী সচেষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদের মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মতবাদগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইল—

A. কায়াসমা গঠন সম্পর্কিত মতবাদ

(a) ধ্রুপদী মতবাদ (Classical theory)—বিজ্ঞানী স্যাক্স (Sachs) এই মতবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের প্রাথমিক দশায় প্রতিটি ক্রোমোসোম অনুদৈর্ঘ্যভাবে বিভক্ত হইয়া যায় এবং দুইটি ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে। ইহার পর অভগিনী ক্রোমাটিডগুলি পরস্পরকে পাকাইয়া ধরে। ইহাদের স্পর্শবিন্দু অঞ্চলগুলি ছিঁড়িয়া যাওয়ার ফলে অভগিনী ক্রোমাটিডদের মধ্যে অংশ বিনিময় সম্ভব হয়। এই মতবাদের অর্থ এই যে ক্রসিংওভারের ফলে কায়াসমা গঠিত না হইয়া কায়াসমার জন্যই ক্রসিংওভার হয়।

(b) কায়াসমা টাইপ মতবাদ (Chiasma type theory) বিজ্ঞানী জ্যানসেন (Janssen) কর্তৃক 1909 খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদ ঘোষিত হয়। এই মতবাদে বলা

হইয়াছে যে প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের প্যাকিটিন দশায় ক্রোমাটিডগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। পরে অভগিনী খণ্ডগুলি জোড়া লাগে এবং কায়াসমা গঠিত হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী ক্রসিংওভারের ফলে কায়াসমা গঠিত হয়। বেলিং এবং ডার্লিংটন পরবর্তীকালে এই মতবাদটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

(c) পুরোগামী মতবাদ (Frontier theory)– হোয়াইট (White) এই মতবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদে বলা হইয়াছে প্রতিটি ক্রোমোসোমে দুইটি নির্দিষ্ট অঞ্চল—ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল থাকে। ইহাদের মধ্যে ইউক্রোমাটিন অঞ্চল পুরোগামী হিসাবে অনুদৈর্ঘ্যভাবে দ্বিভাজিত হইয়া অভগিনী ক্রোমাটিড গঠন করে। বিকর্ষণ জনিত বলে অভগিনী ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিলেও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে উহারা যুক্ত থাকে। আবার অভগিনী ক্রোমাটিডগুলি পরস্পরকে পাকাইয়া থাকার ফলে কয়েকটি ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে উহারা একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে বা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। সংলগ্ন থাকা স্থান বা বিন্দুকে সীমান্ত (Frontier) বলা হয়। সীমান্ত বিন্দুতে কায়াসমা গঠিত হয়। এই বিন্দুগুলিতে অভগিনী ক্রোমাটিডগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। অভগিনী ক্রোমাটিডেদের মধ্যে বিপরীত সংযুক্তির ফলে ক্রসিংওভার ঘটে।

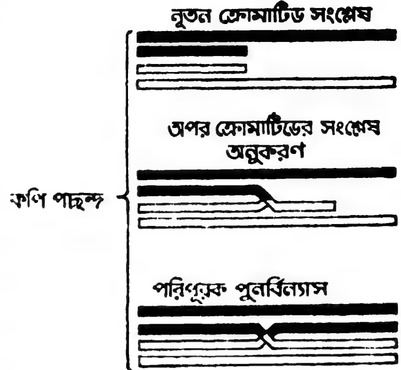
B. ক্রসিংওভার সম্পর্কিত মতবাদ

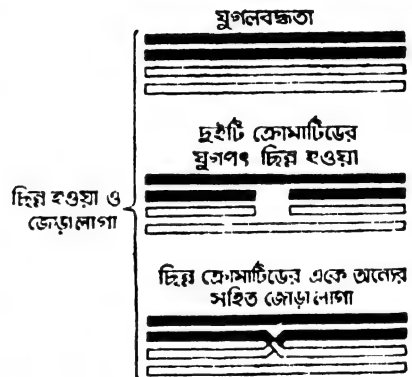
(a) কপি পছন্দ মতবাদ (Copy choice theory) কোষতত্ত্ববিদ বেলিং (Belling) 1931 খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদ দেন। পুনর্বিন্যাসের সহিত গঠনমূলক ও ক্রোমাটিড সংশ্লেষের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে ভগিনী ক্রোমাটিডগুলি জীন বস্তু সংশ্লেষ করে এবং অভগিনী ক্রোমাটিডগুলি যথেচ্ছভাবে তন্তু সংশ্লেষ করে। যেহেতু মিয়োসিস বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পরস্পরকে পাকাইয়া ধরে সেই হেতু মনে করা হয় যে অভগিনী ক্রোমাটিড কর্তৃক সংশ্লেষিত তন্তুগুলি পরস্পর স্থানে স্থানে জুড়িয়া যায়। তন্তুগুলির সাহায্যে জীনের পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে দুইটি জোরালো যুক্তি আছে। প্রথমতঃ ইহাতে বলা হইয়াছে যে কেবল মাত্র নবগঠিত ক্রোমাটিডের মধ্যেই ক্রসিংওভার সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে মিয়োসিস বিভাজনের সময়ই কেবলমাত্র জীনের সংশ্লেষ হয়। কিন্তু ইহা পরীক্ষিত সত্য যে ইণ্টারফেজ দশায় জীনের সংশ্লেষ হয়।

(b) ক্রোমাটিডের প্রথমে ছিন্ন হওয়া এবং পরে জোড়া লাগা মতবাদ (Breakage and Reunion theory)— ডার্লিংটন 1935 খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদ ঘোষণা করেন (চিত্র 6.20)। তিনি বলেন যে প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের সময় প্রতিটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম অনুদৈর্ঘ্য ভাবে বিভক্ত হইয়া দুইটি করিয়া ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে ; ফলে টেট্রাড (Tetrad) বা চারিসূত্র দশা (4 strand stage) গঠিত হয়। এই অবস্থায় ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে পাক দেখা যায়। পাক জনিত চাপের ফলে ক্রোমাটিডগুলি

স্থানে স্থানে প্রথমে ছিড়িয়া যায় এবং পরে জোড়া লাগে। ভগিনী ক্রোমাটিডদের মধ্যে ছেঁড়া ও জোড়ালাগা সাধিত হইলে কোনরূপ পুনর্বিন্যাস হয় না কিন্তু অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে ছেঁড়া ও জোড়া লাগা সাধিত হইলে পুনর্বিন্যাস হয়। এই মতবাদটি যুক্তি নির্ভর হওয়ায় গ্রহণযোগ্য।

(c) সংযোগ প্রথম (Contact first) মতবাদ—বিজ্ঞানী সেরিব্রোভস্কি (Serebrovosky) এই মতবাদের প্রবক্তা। তিনি বলেন যে যে-সকল ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিংওভার হইবার সম্ভাবনা আছে সেই সকল ক্রোমাটিডের মধ্যে প্রথমে স্থানে স্থানে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং উহারা কায়াসমা গঠন করে। সংযোগ বিন্দুতে ইহার পর ক্রোমাটিড দুইটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ক্রোমাটিড দুইটির মধ্যে অংশ বিনিময় হয়।





চিত্র 6.20 পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত দুইটি মতবাদের চিত্ররূপ।

(d) প্রথমে ভাঙ্গা (Breakage first theory) মতবাদ—মূলার (Muller) এই মতবাদের প্রবক্তা। তিনি বলেন যে যে-সকল ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিংওভার ঘটে প্রথমে তাহারা একাধিক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় ; ফলে একাধিক খণ্ডক সৃষ্টি হয়। খণ্ডক গুলি আবার জোড়া লাগে। অভগিনী ক্রোমাটডের দুইটির মধ্যে এইভাবে খণ্ডক বিনিময় হয়।

(e) আধুনিক মতবাদ (Modern Theory)—ক্রসিংওভারের পদ্ধতি ব্যাখ্যার জন্য বর্তমানে অনেক নূতন মতবাদ দেওয়া হইয়াছে। মতবাদগুলিতে উৎসেচক (Restriction enzyme) এবং টেট্রাডের বিভিন্ন ক্রোমাটিডের বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় হওয়ার [দুইটি ক্রোমাটিডের প্রারম্ভিক সক্রিয়তা (হোলিডে)], উভয় ক্রোমোসোমের প্রারম্ভিক সক্রিয়তা (মেসেলসন), বিপরীত মেরু মুখী ক্রোমাটিডের সক্রিয়তা (হোয়াইট হাউস), একটি ক্রোমাটিডের প্রারম্ভিক সক্রিয়তার (মেসেলসন ও র‍্যাডিং) উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

6.13 মিয়োসিস, ক্রোমোসোমের যুগলবদ্ধতা ও ক্রসিং-ওভারের পারস্পরিক সম্পর্ক :

ক্রসিংওভারের ফলে—

(1) হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের অভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে পারস্পরিক অংশ বিনিময় হয়।

(2) পারস্পরিক অংশ বিনিময়ের জন্য বিভাজনের মেটাফেজ দশার শেষ পর্যন্ত হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। ইহার ফলে অ্যানাফেজের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটি যথাযথভাবে পৃথক হইয়া একটি এক মেরুতে এবং অন্যটি বিপরীত মেরুতে যাইতে পারে।

বিজ্ঞানী গ্রেল (R. Grell) বিশ্বাস করেন যে পারস্পরিক অংশ বিনিময়ের যুগলবন্ধতা এবং হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের আলাদা আলাদা মেরুতে বিন্যস্ত হইবার জন্য যে যুগলবন্ধতা তাহারা এক নহে। একবার যুগলবন্ধ হইলেই ঘটনা দুইটি ঘটে না। প্রথমোক্ত কারণের জন্য প্রথমে যুগলবন্ধতা ঘটে আবার দ্বিতীয় কারণের জন্য দ্বিতীয়বার যুগলবন্ধতা ঘটে। ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোম ও Y ক্রোমোসোমের তুলনামূলক বিন্যাস অনুসরণের জন্য তিনি যে অভিনব পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তাহার সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট হইয়াছে।

6.14 লিংকেজের তাৎপর্য

লিংকেজের ফলে জীনের পুনর্বিন্যাস বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস এবং প্রতিটি ক্রোমোসোমে জীনবস্তুর (DNA) পরিমাণ বৃদ্ধিতে স্বাধীন বিন্যাস বাধা প্রাপ্ত হয়। একটি সরল গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাউক কোন প্রজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত দুইটি উপপ্রজাতি আছে। ইহাদের মধ্যে জনন স্বাভাবিকভাবে ঘটিতে পারে এবং ঘটিলে জননক্ষম অপত্যজনু সৃষ্টি হয় এবং দুইটি উপপ্রজাতির মধ্যে একশত অ্যালিলের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। আরও মনে করা যাউক যে উক্ত প্রজাতির হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা 12 এবং এই 12টি ক্রোমোসোমের মধ্যে ঐ একশত অ্যালিল ছড়াইয়া আছে। প্রথম জনুর অপত্যদের মধ্যে মিয়োসিসের সময়ে প্রতি জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে গড়ে 2 হইতে 3টি কায়াসমা গঠিত হয়। F_2 জনুতে এই 100 জীন যুগল স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হইলে মোট 2/100 রকমের পুনর্বিন্যাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু কার্যতঃ পুনর্বিন্যাস ইহার 1/500,000 ভাগের একভাগ মাত্র পাওয়া যায়। দুইটি উপপ্রজাতির মধ্যে 100 অ্যালিলে পার্থক্য নিতান্তই স্বাভাবিক।

ক্রোমোসোমের বিশেষ স্থানে কায়াসমার উপস্থিতি, কায়াসমার উপস্থিতির হারের হ্রাস (যেমন—ক্রোমোসোমে ইনভারসান, ট্রান্সলোকেশান থাকার ফলে কায়াসমা হ্রাস পায়), অথবা কায়াসমা কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গে সীমিত থাকিলে (যেমন পুরুষ

ড্রসোফিলা মেলানোগাসটারের ক্ষেত্রে কায়াসমা তৈয়ারী হয় না) পুনর্বিন্যাস আরও সীমিত হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া আরও নানা কারণে পুনর্বিন্যাস বাধাপ্রাপ্ত হয়।

লিংকেজের ফলশ্রুতি শুধু জীনের পুনর্বিন্যাসে সীমাবদ্ধ নয়। ইহার ফলে একই ক্রোমোসোমে পাশাপাশি অবস্থিত জীনগুলি নিয়মিতভাবে একত্রে এক জনু হইতে অন্য জনুতে যায় এবং ইহার ফলে কোষ বিভাজনের সময় কোষের মধ্যে যান্ত্রিক সহায়তা ঘটে অর্থাৎ প্রতিটি জীন যুগলের পৃথক পৃথক ভাবে বিভাজনের জন্য কোষের যে যান্ত্রিক জটিলতার প্রয়োজন তাহা অনেক খানি কমিয়া যায়। ইহার ফলে ঐ প্রজাতির বিবর্তনে তুলনামূলক চয়নমূল্যে (Selective value) অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইহা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ প্রজাতির ক্ষেত্রে লিংকেজের কার্যকরী সুবিধাও বিবর্তনের দিক হইতে অনেকখানি মূল্যবান। আমরা জানি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জীব বিবর্তনের মাধ্যমে গঠন ও কার্যগত অনেক জটিলতা অর্জন করিয়াছে এবং ইহার জন্য সমস্ত অংশের মধ্যে সমভাবে ঘনিষ্ঠ সুসংহতির প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অন্তঃকোষীয় তন্ত্রে ক্রমপরম্পরা রক্ষা করিয়া শক্তির (Energy transfer) যোগান দেওয়া হয়; কোনও জটিল জৈব অণুর সংশ্লেষ অনেকগুলি জৈব রাসায়নিক ধাপে সাধিত হয় এবং এই ধাপগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একত্রে থাকে। সাইটোপ্লাজমের মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ ভাবে সত্য (মাইটোকন্ড্রিয়ার সাইটোক্রোম অক্সিডেস সিসটেম, ক্লোরোপ্লাস্টের ফোটোসিনথেটিক সিসটেম)। বার্লির ক্ষেত্রে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্লাসটিডে অবস্থিত DNA-র জীন সংকেত ছাড়াও অন্ততঃ পক্ষে 250 হইতে 300 নিউক্লিয় জীন সক্রিয় ক্লোরোপ্লাস্ট প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে প্লাসটিডের জীন ও নিউক্লিয় জীনের মধ্যে কোন লিংকেজ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না কিন্তু বিবর্তনে ইহা ঘটা সম্ভব।

আগেই বলা হইয়াছে যে ক্রোমোসোমের গঠনগত স্থান পরিবর্তনের ফলে কোন প্রজাতির বিবর্তনগত চয়নমূল্য বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যামালতীতে (Oenothera) ট্রান্সলোকেসানের ফলে চয়নমূল্যগত সুবিধা ঘটে। অনুরূপভাবে ড্রসোফিলা সিউডোবসকুরার ক্ষেত্রে তৃতীয় ক্রোমোসোমের ইনভারসান ইহার চয়নমূল্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে শুধু যে জীনের পুনর্বিন্যাসই কেবলমাত্র হ্রাস পায় তাহা নয় এই সকল লিংকেজের ক্ষেত্রে জীনগত পার্থক্য ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া ক্রোমাটিনের একটি বিশেষ অংশ সৃষ্টি করে। এই বিশেষ অংশের উপর বিশেষ পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীল হয়।

বৃদ্ধির প্রকৃতি, কোষের বিভিন্নতা এবং বিভিন্ন ধরনের সংহতি ঘটাইবার পদ্ধতির দিক হইতে উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রাণী অনেক বেশী জটিল। এই জটিলতার পার্থক্য লিংকেজের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই জন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে জিনোটাইপ সাধারণ-ভাবে অনেক বেশী সুসংহত। যে সকল ক্রোমোসোমীয় স্থান পরিবর্তন (Alterations)

লিংকেজের পরিবর্তন ঘটায় সেই সকল ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত সুসংহতির অভাবের জন্য নানা বিরূপ ফল দেখা যায়। পতঙ্গের X-ক্রোমোসোম ও অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীদের Y ক্রোমোসোম এই ধরনের বিশেষ উদাহরণ। এই সকল ক্ষেত্রে জীনগুলি সুসংহতভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে যৌন বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ও প্রকাশ ঘটে। ইহা ছাড়া প্রাণীদের ক্ষেত্রে জীনের অবস্থানগত প্রভাব (Position effect) দেখা যায়। ইহা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে লিংকেজ কিছু জীনের যোগফল ছাড়াও অনেক কিছু। ভ্যারিগেটেড পোজিসন এফেক্টের (Varigated Position Effect) ক্ষেত্রে ইহা হেটারোক্রোমাটিন ইউক্রোমোটিনের কার্যের নিয়ন্ত্রণ ঘটায় এবং জীনের যত কাছে থাকে ততই ইহার ক্রিয়াশীলতার প্রভাববৃদ্ধি পায়; ইহাকে সঞ্চারী প্রভাব (Spreading effect) বলে। সালমোনেলার হিষ্টিডিন্ সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণকারী ওপেরণ (Operon) একাধিক লিংকড্ জীন দ্বারা গঠিত। এই জীনগুলি একত্রে যুক্ত হইয়া একটি *m*-RNA উৎপন্ন করে। ইহাকে multicistronic *m*-RNA বলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ট্রানশ্লেসন জনিত ফল (উৎসেচক) গুলি পৃথকভাবে বিভিন্ন রাইবোসোমে উৎপন্ন হয়। এই ধরনের পারম্পর্য যুক্ত সজ্জা উচ্চস্তরের জীবে দেখা যায় না। ড্রসোফিলা মেলানোগাসটারের ক্ষেত্রে Xanthine dehydrogenase উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন একক দ্বারা ইহারা X, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রোমোসোমে থাকে।

অনুচ্ছেদ 7

জীনতত্বে অনুজীব ও জীনবস্তু সনাক্তকরণ

7.1 জীনতত্ত্ব ও অনুজীব: আণবিক জীনতত্ব ব্যাখ্যায় ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি অনুজীব অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবের তুলনায় ইহাদের গঠন, জৈবক্রিয়া পদ্ধতি ও জীবনচক্র সরল হওয়ায় আধুনিক জীনতত্ব ব্যাখ্যায় ইহাদের প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়। জীনবস্তু সনাক্তকরণ ও জীনবস্তুর ক্রিয়া আলোচনার পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক আলোচনা নিম্নে করা হইয়াছে।

A. ব্যাকটিরিয়া

(i) আকার—এককোষী, অণুবীক্ষণিক। দেহ গোলাকার হইলে কক্কাস (Coccus), দণ্ডাকৃতি হইলে ব্যাসিলাস (Bacilus) এবং প্যাঁচানো হইলে স্পাইরিলাম (Spirillum) বলা হয়। কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া গ্রাম রঞ্জক গ্রহণক্ষম (Gram positive), আবার কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া গ্রাম রঞ্জক গ্রহণে অক্ষম (Gram negative)। ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর গঠনকারী রাসায়নিকের বৈষম্যের জন্য গ্রাম রঞ্জক গ্রহণে এই পার্থক্য দেখা যায়।

(ii) গঠন—ব্যাকটিরিয়ার দেহকে আবৃত করিয়া একটি জেলী সদৃশ আবরণী বা ক্যাপসুল (Capsule) থাকে। ক্যাপসুল পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত। প্রকরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্যাপসুলযুক্ত ব্যাকটিরিয়া ক্যাপসুলবিহীন হইয়া যায়।

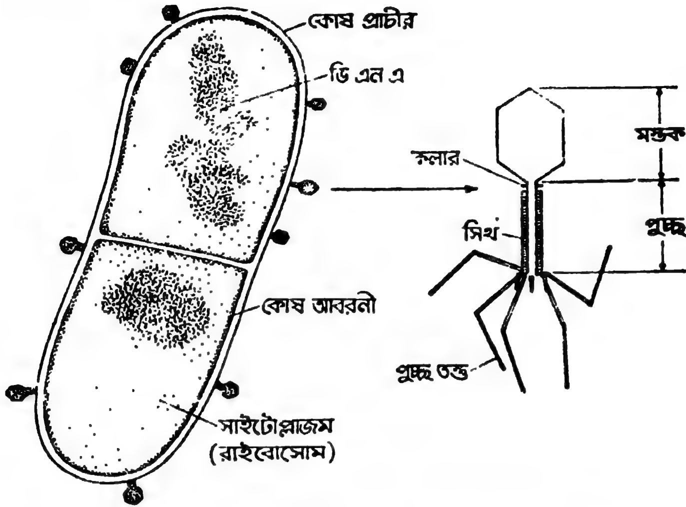
ক্যাপসুলের নিচে কোষ প্রাচীর থাকে।

গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ায় ইহা 15 হইতে 20 মিলিমাইক্রণ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ায় ইহা 10-15 মিলিমাইক্রণ পুরু। গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে হেক্সোস অ্যামাইন (Hexose amire) নামক পদার্থ বেশী কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। ইহাদের কোষ প্রাচীরে সুবাসিত (Aromatic) অ্যামাইনো অ্যাসিড আদৌ থাকে না। ইহা ছাড়া গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়াতে লিপিড জাতীয় পদার্থ ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকে। হেক্সোস অ্যামাইন জাত রাসায়নিকের জন্য গ্রাম-পজিটিভ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

কোষ প্রাচীরের নিচে থাকে কোষ বা প্লাজমা আবরণী (চিত্র 7.1)। ইউক্যারিওট কোষের প্লাজমা আবরণীর ন্যায় ইহার পছন্দযুক্ত ভেদ্যতা থাকে। ব্যাকটিরিয়ায় প্লাজমা আবরণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে শ্বসন উৎসেচকগুলি থাকে। ব্যাকটিরিয়ার প্রোটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া থাকে না।

প্রোটোপ্লাজম কোষ আবরণী দ্বারা আবৃত। তবে ইউক্যারিওট কোষের প্রোটোপ্লাজমের ন্যায় ইহাতে নির্দিষ্ট আবরণী বেষ্টিত নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিওয়েড (Nucleoid) নামক আবরণহীন গঠনই নিউক্লিয়াসের কার্য সমাধা করে।

বহু ব্যাকটিরিয়াতে প্রোটীনযুক্ত ফ্লাজেলা চলন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। কিছু কিছু ফ্লাজেলা বিশেষিত হইয়া পিলি (Pili) গঠন করে। পিলি জনন ও কোষদেহ বহিঃস্থ ডি. এন. এ সংগ্রহে সাহায্য করে।



চিত্র 7.1 ফাজ আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়া (বাম) ও ফাজের চিত্ররূপ (দক্ষিণ)।

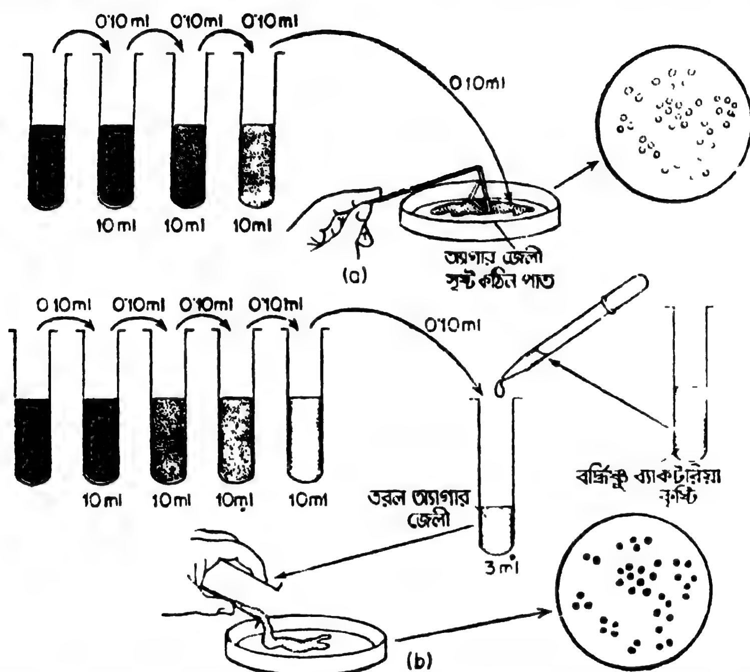
ব্যাকটিরিয়ার দেহ হইতে নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়। ইহারা অধিবিষ বা টক্সিন (Toxin) নামে পরিচিত। টক্সিন দুই প্রকার—এক্সোটক্সিন ও এন্ডোটক্সিন (Exotoxin and Endotoxin)। এক্সোটক্সিন কোষদেহ হইতে বাহির হইয়া আক্রান্ত জীবের দেহে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এন্ডোটক্সিন কোষের বাহিরে আসে না।

(iii) কৃষ্টি পদ্ধতি—সকল প্রকার ব্যাকটিরিয়াকে কৃষ্টি মাধ্যমে পালন করা যায়। ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টিগত চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্টি মাধ্যমের উপাদানের পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বা এমপিরিক্যাল (Empirical) কৃষ্টি মাধ্যমে মাংসের নির্যাস, কার্বন, নাইট্রোজেন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নানা প্রকার খনিজ পদার্থ ব্যবহৃত হয়। এই মাধ্যমে মাংসের নির্যাস ব্যতীত পেপটোন, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও নানা প্রকার ফসফেট ঘটিত লবণ ইত্যাদি থাকে। ফসফেট ঘটিত লবণ pH নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয়। তরল মাধ্যমকে কঠিন করার জন্য বহুক্ষেত্রে উপাদানগুলিকে আগার (Agar) বা জিলেটিনের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়।

কৃষ্টি মাধ্যমের উপাদানগুলির পরিমাণ সঠিকভাবে জানিয়া কৃষ্টি মাধ্যম প্রস্তুত করা হইলে উহাকে কৃত্রিম কৃষ্টি মাধ্যম বলে। জীন তত্বের গবেষণায় এই কৃত্রিম

কৃষ্টি মাধ্যমের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী কারণ ইহা ব্যাকটিরিয়ার ফিনোটাইপগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে বিশেষ সহায়তা করে (চিত্র 7.2)।

কৃত্রিম কৃষ্টি মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের জন্য অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azatobactor) নামক ব্যাকটিরিয়ার মলিবডেনাম প্রয়োজন। খনিজ লবণ কৃষ্টি মাধ্যমের pH রক্ষার জন্য, প্রোটোপ্লাজমের গঠন উপাদান এবং অনুঘটক (Catalyst) হিসাবে প্রয়োজন হয়।



চিত্র 7.2 কৃষ্টি মাধ্যমে প্রতিপালিত ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা নির্ধারণের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতি। কৃষ্টি মাধ্যমকে লঘু হইতে লঘুতর করা হয়। 100 কলোনী গঠিত হইলে ধরা হয় যে শেষ 0·10 ml তরলীকৃত কৃষ্টি মাধ্যমে 100 ব্যাকটিরিয়া ছিল। এই হিসাব মূল কৃষ্টি মাধ্যমে কোষের সংখ্যা = (100 কোষ প্রতি 0 10 ml) × 10² × 10² × 10² = 10⁹ কোষ/ml।

নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে কোন কোন ব্যাকটিরিয়ার কৃষ্টি মাধ্যমে খনিজ নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ ব্যবহার করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহু ব্যাকটিরিয়া প্রজাতির ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন বিশ্লেষী উৎসেচকের সাহায্যে প্রোটিনকে ভাঙিয়া উহার নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়।

ট্রিপটোফান (Tryptophane) একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো অ্যাসিড। বহু ব্যাকটিরিয়া ইহা সংশ্লেষ করিতে পারে এবং এই সকল ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে কৃষ্টি

মাধ্যমে ট্রিপটোফানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়া (টাইফয়েড ব্যাসিলাস) ট্রিপটোফান সংশ্লেষে অক্ষম। এই সকল ক্ষেত্রে কৃষ্টি মাধ্যমে ট্রিপটোফান যোগ করা হয়। বহু ট্রিপটোফান সংশ্লেষক্ষম ব্যাকটিরিয়া অ্যামোনিয়া হইতে ট্রিপটোফান সংশ্লেষ করিয়া লইতে পারে। ইহাদের কৃষ্টি মাধ্যমে অ্যামোনিয়া লবণ নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে থাকে। এইরূপে পুষ্টিগত দিক হইতে ব্যাকটিরিয়াকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(a) অটোট্রফ্ (Autotroph)—ইহাদের কেবলমাত্র অজৈব বস্তুর প্রয়োজন। ইহা হইতে এই সকল ব্যাকটিরিয়া প্রয়োজনীয় জৈব বস্তু উৎপাদন করিয়া লইতে পারে।

(b) হেটারোট্রফ্ (Heterotroph)—এই সকল ব্যাকটিরিয়া বহিঃ পরিবেশ হইতে উহাদের প্রয়োজনীয় জৈববস্তুসমূহ সামগ্রিক বা আংশিকভাবে সংগ্রহ করে কারণ ইহারা এই জৈব বস্তুগুলি সংশ্লেষে অক্ষম।

(c) প্রোটোট্রফ (Prototroph)—ইহারা কার্বন ঘটিত জৈব যৌগ সংশ্লেষ করিতে অক্ষম কিন্তু নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যৌগ বায়ুর নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করিয়া সংশ্লেষ করিতে সক্ষম। রাইজোবিয়াম (Rhizobium) এই প্রকার একটি ব্যাকটিরিয়া।

এসেরেচিয়া কোলাই (*E. coli*) জীনতত্ত্বে বহুল ব্যবহৃত একটি দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। ইহা মানুষের অন্ত্রে বাস করে কিন্তু কোন রোগ সৃষ্টি করে না। ইহা গ্রাম নেগেটিভ। নিম্নোক্ত উপাদানে প্রস্তুত কৃষ্টি মাধ্যমে ইহাদের পালন করা সম্ভব—

উপাদান	পরিমাণ
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)	1·0 gm
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$)	0·13 gm
পটাসিয়াম বাই ফসফেট (KH_2PO_4)	3·0 gm
ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (Na_2HPO_4)	6·0 gm
গ্লুকোজ (Glucose)	4·0 gm
পাতিত জল	1000 ml

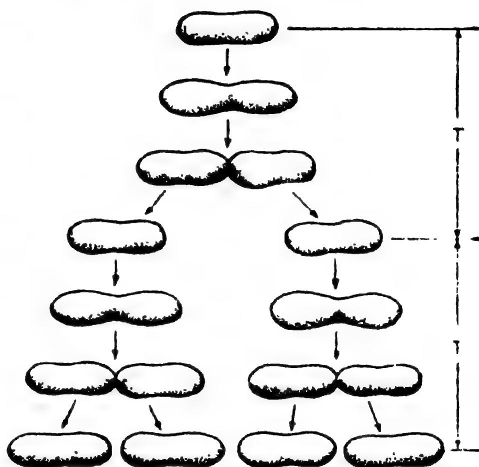
উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে গ্লুকোজ একমাত্র জৈব উপাদান আর বাকি সব অজৈব উপাদান। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ফসফেট লবণ কেবলমাত্র ফসফেট, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের উৎস হিসাবে কাজ করে না। ইহা কৃষ্টি মাধ্যমের

pH প্রশম অবস্থায় রাখে। বর্ধনশীল ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে এই লবণ দুইটি হইতে হাইড্রোক্সিল ও হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে মাধ্যমের প্রশমিত অবস্থা বজায় থাকে।

(IV) ব্যাকটিরিয়ার জনন ও জীবনচক্র

ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি মূলতঃ অযৌন জনন পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। অ্যামিবার ন্যায় দ্বিভাজন বা বাইনারী ফিশান পদ্ধতিতে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

দণ্ডাকৃতি ই কোলাই ব্যাকটিরিয়া দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইহার প্রস্থ বৃদ্ধি পায় না। এই ব্যাকটিরিয়ার দেহ দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য লাভ করিলে দেহের মধ্যরেখার অনুপ্রস্থতল সংকুচিত হইতে শুরু করে এবং শেষে দুইটি সম আকৃতির ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন হয়। ইহাই ব্যাকটিরিয়ার সাধারণ জনন পদ্ধতি। নবজাত দুইটি ব্যাকটিরিয়া আবার অনুদৈর্ঘ্য রেখা বরাবর বাড়িতে শুরু করে এবং দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য লাভ করিলে পুনরায় বিভাজিত হয় (চিত্র 7.3)।



চিত্র 7.3 ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি ও জনন পদ্ধতি। প্রথম গঠিত হইবার সময় হইতে শুরু করিয়া প্রথম বিভাজিত হওয়ার সময়টিকে জনুকাল (T) বলা হয়।

দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যাকটিরিয়াকে অন্যান্য জীব হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের একটি হইতেছে দ্রুত জনন ক্ষমতা এবং অন্যটি হইতেছে বিপাকীয় ক্রিয়ার উচ্চহার। অনুকূল পরিবেশে প্রায় সকল শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে অতি দ্রুত জনন ঘটিতে দেখা যায়। 20 হইতে 30 মিনিটের বেশী ইহাদের জনুকাল সীমাবদ্ধ থাকে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে অনুকূল অবস্থায় একটি ব্যাকটিরিয়া হইতে 6 ঘণ্টার মধ্যে 700,000 ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। ব্যাকটিরিয়ার বিপাকীয় হারের উচ্চতা বুঝিবার জন্য সবাত ব্যাকটিরিয়ার O_2 গ্রহণ ও জারণের তুলনা করা যাইতে পারে। কোন ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেনের সহায়তায় 24 ঘণ্টায় যে পরিমাণ জৈব বস্তুর জারণ ঘটায় তাহা ঐ ব্যাকটিরিয়ার ওজনের সমান কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঐ সময়ে নিজ ওজনের 100 ভাগের 1 ভাগ জারণ করে।

ব্যাকটিরিয়ার দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি বিশেষ কারণ এই যে উচ্চস্তরের জীবের বৃদ্ধির ন্যায় স্ফুরণ ইহার সহিত জড়িত নয়। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে স্ফুরণের সহিত তুলনীয় কোন ঘটনা দেখা যায় না। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে স্ফুরণ থাকিলেও তাহা খুব সংক্ষিপ্ত।

ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে যৌন-জননও দেখা যায়। ইহা বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং অবস্থায় ঘটে। ব্যাকটিরিয়ার যৌনদ্বিরূপতা উচ্চস্তরের জীবের স্ত্রী পুরুষের যৌন দ্বিরূপতার ন্যায় সুস্পষ্ট নয়। যৌন-জননের সাহায্যে কোন প্রজাতির দুইটি জীবের জীনবস্তুর পুনর্বিন্যাস ঘটে। ইহাদের সুস্পষ্ট যৌনদ্বিরূপতা না থাকিলেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ করা সম্ভব। যৌন-জননের সময় দুইটি ব্যাকটিরিয়া পাশাপাশি আসে। ফ্ল্যাজেলা আকৃতিবিশিষ্ট যৌন-পিলি যুক্ত হইয়া পরস্পরের সাইটোপ্লজমের সহিত সংযোগ নালিকা উৎপন্ন করে। এই নালিকার মধ্য দিয়া একটি ব্যাকটিরিয়া হইতে জীনবস্তু অন্য ব্যাকটিরিয়ার সাইটোপ্লাজমে যায় এবং জীনের পুনর্বিন্যাস ঘটায়। যে ব্যাকটিরিয়া হইতে জীনবস্তু অন্য ব্যাকটিরিয়াতে যায় তাহাকে দাতা এবং অন্যটিকে গ্রহীতা বলা হয়। মনে মনে রাখিতে হইবে **গ্রহীতার দাতা হওয়ার ক্ষমতা থাকে না।** দাতা হওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিশেষ ধরনের জীনবস্তুর উপর। ইহাকে F ফ্যাক্টর বলে। দাতাকে F^+ ও গ্রহীতাকে F^- দ্বারা সূচিত করা হয়। কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে কনজুগেশনের (Conjugation) হার অনেক বেশী এবং ইহা বিশেষ ধরনের F ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। ইহাকে Hfr বলে ; অর্থাৎ Hfr^+ হইতেছে দাতা, Hfr^- গ্রহীতা।

ব্যাকটিরিয়ার রোগক্রিয়তা (**Pathogenicity**) **ও মারাত্মকতা** (**Virulence**): দেহে প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া কোন ক্ষতি করে না। আবার কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া একই শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্ষতির সৃষ্টি করে। ইহাদের রোগক্রিয় (Pathogenic) ব্যাকটিরিয়া বলে। রোগক্রিয়তা পোষক দেহের আক্রান্ত কলার জৈব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যাকটিরিয়া নিজস্ব বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। ব্যাকটিরিয়া রোগক্রিয় হয় দুইটি কারণে—(1) ব্যাকটিরিয়ার দেহ হইতে নিঃসৃত এক্সোটক্সিন নামক বিষাক্ত পদার্থের জন্য এবং (2) আক্রান্ত কোষের মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার জনন ক্ষমতা ও ক্ষত উৎপাদন ক্ষমতার জন্য। ডিপথিরিয়া, বটুলিনাস, টিটেনাস্ ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়া জীবদেহের লক্ষ্য অংশ অবাত শ্বসনের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে এবং ধীরে ধীরে বংশ বিস্তার করে। এই সময় এক্সোটক্সিন নিঃসৃত করে। ইহা স্নায়ুকোষ এবং সময় সময় অন্যকোষ আক্রমণ করে।

টাইফয়েড, কোলন প্রভৃতি ব্যাসিলাসের দেহকোষ এক ধরনের লাইপোপলিস্যাকারাইডের উপস্থিতির জন্য পোষক দেহের ফ্যাগোসাইটের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। এই লাইপোপলিস্যাকারাইডের ক্ষরণের ফলে পোষকের দেহকোষের নানারূপ পরিবর্তন হয়। লাইপোপলিস্যাকারাইড কেবলমাত্র গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কিন্তু গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়া যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাসের (Streptococcus) ক্ষেত্রে ইহা থাকে না। তবে এই সকল ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ জৈব অনু ইহার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির জন্য দায়ী। আবার কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া যেমন স্টেফাইলোকক্কাসের (Staphylococcus) কোয়াগুলেজ (Coagulase) নামক উৎসেচক ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং ইহার ফলে এই সকল

ব্যাকটিরিয়া অনেক বেশী মারাত্মক হইয়া পড়ে। পোষকের স্পর্শকাতরতার সহিত ব্যাকটিরিয়ার মারাত্মক (Virulence) হওয়া সম্বন্ধযুক্ত। অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটিরিয়া ইঁদুরের ক্ষেত্রে রোগক্রিয় নয় কিন্তু প্লেগ ব্যাসিলাসের আক্রমণ ইহাদের পক্ষে মারাত্মক। অতএব দেখা যাইতেছে যে হেটারোট্রক্ ব্যাকটিরিয়া পরজীবী, মিথোজীবী ইত্যাদি হইতে পারে ; আবার অধিকাংশ পরজীবী ব্যাকটিরিয়া রোগক্ষিয়। এই রোগক্ষিয়তা বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়াতে বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। সাধারণভাবে ব্যাকটিরিয়ার রোগক্ষিয়তা জনুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এইজন্য ব্যাকটিরিয়ার রোগক্ষিয়তাকে জীন নির্ধারিত একশ্রেণীর ফিনোটাইপ আখ্যা দেওয়া যায় ; এই ফিনোটাইপের সহিত রোগ প্রতিরোধ শক্তিকেও একটি জীন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

(৮) জীনতত্ত্বে ব্যাকটিরিয়ার ব্যবহার

ইউক্যারিওট জীবের গঠন ও কার্যের জটিলতা বেশী হওয়ায় জীন-ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। জীনের মূল বৈশিষ্ট্য ও কার্যগুলি অনুধাবনের জন্য প্রযুক্তিগত নানা বাধা আছে। ব্যাকটিরিয়াকে জীনতত্ত্ব অনুধাবনের জন্য পরীক্ষণীয় বস্তু হিসাবে নিম্নোক্ত কারণের জন্য ব্যবহার করা হয়—

(a) বংশগতি অনুধাবনের জন্য বহু জনু পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক জনুর সময়কাল অনেক বেশী, কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এই সময়কাল অত্যন্ত কম। ড্রসোফিলার জীবনচক্র সমাধা হয় 10 দিনে, কিন্তু 10 দিনে ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়ার অসংখ্য জনু পাওয়া যায় - কারণ ইহাদের একটি জনুকাল প্রায় 20 মিনিটে শেষ হয়। আবার ব্যাকটিরিয়াকে কৃষ্টি মাধ্যমে সহজেই বীক্ষণাগারে পালন করা সম্ভব এবং ইহার জন্য অর্থ, সময় ও স্থানের প্রয়োজন অনেক কম।

(b) ব্যাকটিরিয়ার জনন হার অত্যন্ত বেশী হওয়ার জন্য ইহাদের মধ্যে পরিবৃত্তিজাত (Mutation) প্রকরণের সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার বিভিন্ন প্রকরণবিশিষ্ট ব্যাকটিরিয়া আলাদাভাবে পালন করিয়া প্রকরণযুক্ত বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া গোষ্ঠী পাওয়া যায়।

(c) ব্যাকটিরিয়ার দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত হওয়ার জন্য কোষস্থিত কোন জীনের ক্রিয়া অন্য কোষস্থ জীন-ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(d) ব্যাকটিরিয়ার বিপাকীয় হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হওয়ার জন্য আণবিক ও শারীরবৃত্তীয় স্তরে জীনবিদ্যা অনুধাবন অনেক সহজ হয়।

(e) অযৌন-জনন ব্যাকটিরিয়ার প্রধান জনন পদ্ধতি হওয়ার জন্য কোন ব্যাকটিরিয়ার জীনের পরিবৃত্তি ঘটিলে উহার অপত্য জনুতে উক্ত পরিবৃত্তি পরিবাহিত হয়। তাহা ছাড়া ঐ পরিবৃত্তির ফলে ফিনোটাইপের পরিবর্তন সকল অপত্য ব্যাকটিরিয়াতে দেখা যায়।

(f) ব্যাকটিরিয়ার জীন হ্যাপ্লয়েড (Haploid)। ইহার ফলে জীনের পরিবৃত্তি ঘটিলে ফিনোটাইপের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটে। জীন-ক্রিয়া অনুধাবনের ইহা একটি বিশেষ সুবিধা।

(g) অটোট্রফ্ অজৈব বস্তুকে জৈব যৌগে পরিণত করিতে পারে, প্রোটোট্রফ্ আংশিক ভাবে পারে আর হেটারোট্রফ্ মোটেই পারে না অর্থাৎ ইহাদের অন্য জীবের ন্যায় জৈব যৌগের উপর নির্ভর করিতে হয়।

পুষ্টিগত এই বৈশিষ্ট্যগুলি জীন নির্ধারিত ফিনোটাইপ, কারণ অটোট্রফ্ ব্যাকটিরিয়া হইতে সবসময় অটোট্রফ্ উৎপন্ন হয়। হেটারোট্রফ্ হইতে হেটারোট্রফ্ উৎপন্ন হয়। কিন্তু পুষ্টির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য কেন দেখা যায়? প্রকরণের জৈব রসায়নগত ভিত্তি ও উহার বংশগতি পর্যালোচনার দ্বারা জীন-ক্রিয়া ও শারীরবৃত্তীয় কার্যের বহু মৌল সমস্যার মূল সূত্রটি ধরা গিয়াছে।

(h) জীব দেহের রসায়নগত ভিত্তি নানা প্রকার মৌল পদার্থ। ইহাদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি প্রধান। তবে মনে রাখা উচিত যে এই মৌলগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রে যৌগ হিসাবে থাকে। এই মৌলগুলি বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া জীবের গঠন একক গঠিত হয়—যেমন, গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, রিবুলোজ, রাইবোজ ইত্যাদি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হইয়া পলিস্যাকারাইড গঠন করে। আবার অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি কার্বন. হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন. সালফার ইত্যাদির যৌগ। ইহা প্রোটিনের গঠন একক। অনুরূপ ভাবে ফ্যাটের গঠন একক ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল। অটোট্রফ্ ব্যাকটিরিয়া মৌল হইতে এই গঠন এককগুলি উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু হেটারোট্রফ্ আদৌ পারে না এবং প্রোটোট্রফ্ আংশিকভাবে ইহা উৎপাদনে সক্ষম।

হেটারোট্রফ্ অন্য জীবিত বা মৃত জীবের দেহের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, ফ্যাট ইত্যাদি হইতে এই গঠন এককগুলি পাইয়া থাকে। অতএব বলা যায় অটোট্রফ নিম্নস্তরের আণবিক ওজন বিশিষ্ট মৌল হইতে উচ্চতর আণবিক ওজন বিশিষ্ট যৌগ উৎপাদনক্ষম। হেটারোট্রফ ও প্রোটোট্রফের নিম্নতম স্তরের অজৈব বস্তু হইতে জৈব বস্তুর গঠন একক উৎপাদনের ক্ষমতা নাই, কিন্তু গঠন একক হইতে বৃহদণু গঠনের ক্ষমতা আছে। নিম্নে ছকের সাহায্যে ইহা বুঝান হইয়াছে।

গ্লুকোজ অ্যামোনিয়া অজৈব লবণ	→	অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিও-টাইড. শর্করা, ফ্যাটি অ্যাসিড	→	প্রোটীন, নিউক্লিক অ্যাসিড, পলিস্যা-কারাইড, লিপিড	→	কোষ অঙ্গাণু
প্রতি অণুতে 25টি অপেক্ষা কম পরমাণু থাকে		প্রতিটি অণুতে 60 অপেক্ষা কম পরমাণু থাকে		প্রতিটি অণুতে 1500টি অপেক্ষা বেশী পরমাণু থাকে		

উপরের ছক হইতে দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র অণু হইতে বৃহদণু এবং পরিশেষে কোষ অঙ্গাণু গঠন ও পুষ্টি বৃদ্ধির মূল কথা। আবার পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপর জনন নির্ভরশীল।

(i) ব্যাকটিরিয়া বহিঃস্থ জীনবস্তু গ্রহণক্ষম এবং ইহার ফলে ব্যাকটিরিয়াতে গৃহীত জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ইহাকে রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশান (Transformation) বলে। ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তরের সাহায্যে আণবিক জীনতত্ত্বের বহু সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইয়াছে।

ব্যাকটিরিয়ার উপর পরজীবি ভাইরাসকে ব্যাকটিরিওফাজ (Bacteriophage) বলে। এই ফাজ ভাইরাসের জনন পদ্ধতি হইতে পোষক পরজীবি সম্পর্কের জীনতত্ত্বীয় পর্যালোচনা সম্ভব।

ব্যাকটিরিয়ার ব্যবহারে একটি প্রধান অসুবিধা ইহাদের আণুবীক্ষণিক গঠন। আগারের সাহায্যে কঠিন কৃষ্টি মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া পালন করিলে অল্প সময়ের মধ্যে জননের দ্বারা ক্লোন (Clone) গঠিত হয়। এই ক্লোন খালিচোখে দেখা যায় এবং ইহার বৈশিষ্ট্য জানিতে পারা যায়। ক্লোন দেখিয়া ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাও হিসাব করা সম্ভব। এইভাবে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে জীনতত্ত্বের মূল দিকগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব।

(VI) ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা গণনা পদ্ধতি

ব্যাকটিরিয়ার জীবনচক্রের পর পর দুইটি বিভাজনের অন্তর্বর্তী সময়কে জনুকাল (Generation period) বলে। ধরা যাউক কোন কৃষ্টি মাধ্যমে N_0 সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া লইয়া কৃষ্টি শুরু করা হইল। এক জনুকাল পরে কৃষ্টি মাধ্যমে উৎপন্ন ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা হইবে $2N_0$। এইভাবে $2N_0$ সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং বিভাজিত হইয়া দ্বিতীয় জনুকাল পরে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইবে $2\times2\ N_0$। অনুরূপভাবে তৃতীয় জনুকাল পরে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা দাঁড়াইবে $2\times2\times2\ N_0$ এবং এইভাবে ক্রমশ সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে।

অতএব বলা যায় যে যদি g জনু পরে ব্যাকটিরিয়ার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় N তবে

$$N=(2\times2\times2\cdots\cdots g \text{ সংখ্যক 2 এর ক্রম গুণ ফল }) N_0$$

$$=2^g N_0\cdots\cdot(1)$$

এখন ধরা যাউক কৃষ্টি মাধ্যমে উক্ত ব্যাকটিরিয়ার জনুকাল = T মিনিট

∴ মোট t মিনিটে জনুর সংখ্যা হইবে t/T

অর্থাৎ $g=t/T\cdots$ (2)

(1) সমীকরণে (2) সমীকরণের g এর মান বসাইয়া

$$N=2^{t/T}N_0\ \ldots(3)$$

(3) সমীকরণে N_0 ও t এর মান নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য N এর মান t এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ t এর মান বৃদ্ধি পাইলে 2 এই ধ্রুবকের সূচকের মান বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে N এর মান 2 এর গুণিতকে বৃদ্ধি পায়—ইহাকে এক্সপোনেনশিয়াল (Exponential) বৃদ্ধি বলে। ইহার চারিটি অজ্ঞাত রাশির (N, N_0, t ও T) মধ্যে যে কোন তিনটির মান জানা থাকিলে অন্যটি সহজেই সমীকরণের সাহায্যে জানা

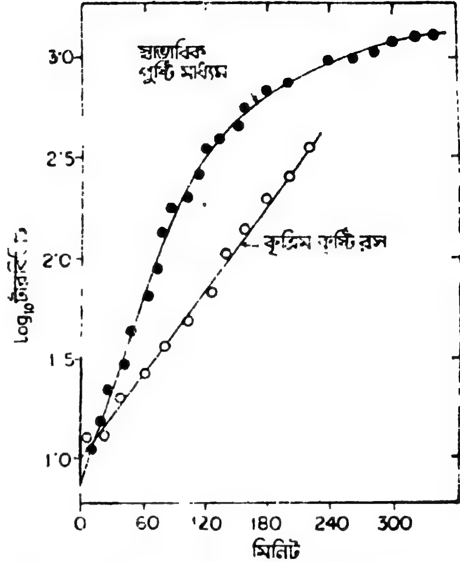
যায়। লেখ চিত্রে (Graph) সুবিধার জন্য উক্ত সমীকরণকে $\log_{10}$ এর আকারে প্রকাশ করা হয়।

তখন সমীকরণটির নিম্নলিখিত রূপ হইবে

$$\log_{10}N = (t/T)\log_{10}2 + \log_{10}N_0$$

$$\frac{0{\cdot}301}{T}\cdot t + \log_{10}N_0 \ldots (4)$$

যদি $\log_{10}N$ এর মান t এর বিপরীতে বসানো হয় তবে একটি সরলরেখা পাওয়া যায় (7.4 লেখচিত্র দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন কৃণ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধির বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন লেখচিত্র পাওয়া যায়। 7.4 লেখচিত্রে গ্লুকোজ কৃণ্টি মাধ্যমে ই. কোলাই-এর বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিযুক্ত এমপিরিকাল মাধ্যমে ই. কোলাই-এর বৃদ্ধির লেখচিত্র দেখানো হইয়াছে।



চিত্র 7.4 ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধির লেখচিত্র। 100 এককের টার্বিডিতে (Turbidity) ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা 10^8/ml বলিয়া অনুমিত।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে ব্যাকটিরিয়ার এই বৃদ্ধির হার পরিবেশগত নানা কারণে কমিয়া ক্রমশঃ 0 (Zero)-তে পরিণত হয়। অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়ার আর সংখ্যাগত বৃদ্ধি হয় না। ইহাকে স্থির দশা (Stationary phase) বলে।

(B) ভাইরাস

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অগ্রগতি প্রাসঙ্গিক রূপে জীববিদ্যাকে উন্নীত করিয়াছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারে অনুজীব বিশেষতঃ ভাইরাসের অস্তিত্ব ও গঠন সম্পর্কে দৃশ্যগত প্রমাণ ও নানা তথ্য পাওয়া গিয়াছে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তামাক পাতার মোজেয়িক রোগ সৃষ্টিকারী দণ্ডাকৃতি ভাইরাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জানা যায়। ইহার পরে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা প্রকার ভাইরাসের আকৃতি, গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।

অ্যানডারস্ (Anders) সর্বপ্রথম পালিত কোষের মধ্যে ভাইরাস পালনের প্রযুক্তিগত উপায় আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে ভাইরাসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যায়।

(a) ভাইরাস ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এবং সুনির্দিষ্ট আকারের।

(b) রাসায়নিক প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট।

(c) জীবিত কোষের মধ্যে প্রবেশ না করিলে ইহাদের জনন হয় না।

(d) মিলিমাইক্রন এককে ইহার পরিমাপ করা হয় এবং ভাইরাসের মাপ 10mμ হইতে 500 mμ পর্যন্ত হইতে পারে। ($1m\mu = \frac{1}{1000000}$ মিলিমিটার।)

ইহারা আকারে গোল, দণ্ডাকৃতি, ষড়ভুজাকৃতি ইত্যাদি হইতে পারে। ব্যাকটিরিও-ফাজের আকৃতি আরও জটিল ধরনের হইয়া থাকে।

(i) ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন

ভাইরাসের দেহ নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা নির্মিত। ইহাতে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন সুনির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। ভাইরাসের প্রোটিন মূলত ক্ষারীয়। ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড DNA অথবা RNA, অর্থাৎ অন্যান্য জীবকোষের মত DNA ও RNA একসঙ্গে কোন ভাইরাসে পাওয়া যায় না।

কোন কোন ভাইরাস দেহে সামান্য পরিমাণে লিপিড প্রকৃতির পদার্থ এবং অতি অল্প পরিমাণ তামা পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে ভাইরাসে কোন উৎসেচক থাকে না। অর্থাৎ ভাইরাস দেহে কোন বিপাকীয় ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। তবে কয়েকটি ভাইরাসে উৎসেচক পাওয়া যায়। ব্যাকটিরিওফাজের লেজের শেষ প্রান্তে অবস্থিত উৎসেচক পোষক ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরের সহিত বিক্রিয়া করিয়া ব্যাকটিরিয়ার প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ভাইরাসের DNA ব্যাকটিরিয়া দেহকোষে প্রবেশ করিতে পারে। কিছু কিছু ভাইরাস রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পরস্পরের সহিত জুড়িয়া দেয়। ইহাকে অ্যাগ্লুটিনেশান বলে। ভাইরাসের এই অ্যাগ্লুটিনেশান ক্ষমতার জন্য বিশেষ ধরনের উৎসেচক দায়ী বলিয়া মনে করা হয়।

(ii) ভাইরাসের জনন ও জীবনচক্র

ভাইরাসের জনন পদ্ধতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জনন ও বংশবিস্তারের জন্য অন্য জীবিত কোষে ইহার প্রবেশ প্রয়োজন। ভাইরাসের নিজস্ব কোন উৎসেচক না থাকার জন্য জনন ও দেহ গঠন তথা বৃদ্ধির জন্য জীবিত কোষের বিপাকীয় উৎসেচকের উপর ইহাকে নির্ভর করিতে হয়। শুধু তাহাই নয়, ইহার কোন কোষ অঙ্গাণু না থাকার জন্য পোষক কোষের কোষ অঙ্গাণু দ্বারা ইহারা নিজেদের সীমিত জৈব কার্য সমাধা করে।

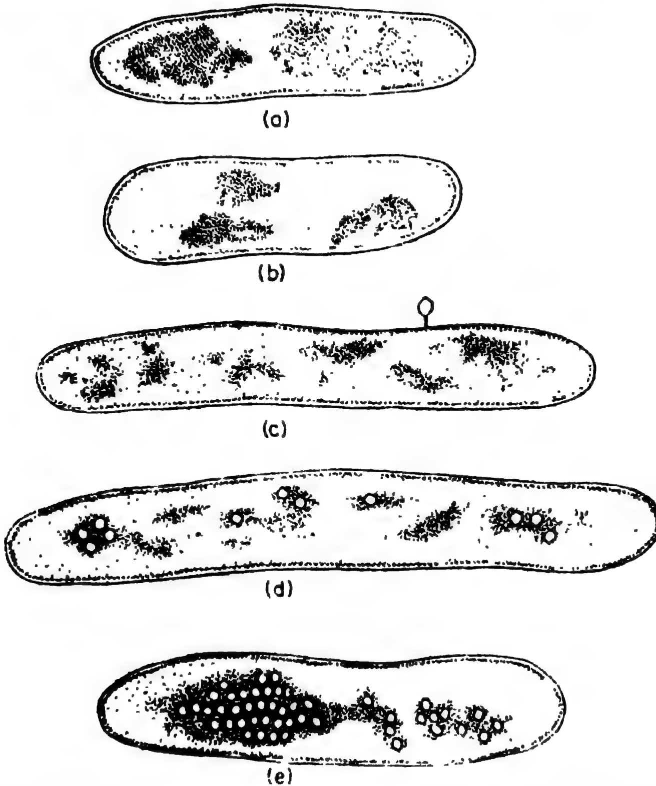
সকল ভাইরাস সকল জীবিত কোষকে জনন ও বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা ভাইরাসের নিজস্ব বিশেষ গঠন ও কোষের প্লাজমা আবরণী, কোষ প্রাচীর ইত্যাদির গঠনের উপর নির্ভরশীল। ভাইরাস বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যাকটিরিয়ার কোষ ব্যবহারকারী ভাইরাসকে ব্যাকটিরিওফাজ বা শুধু ফাজ বলে। প্রাণিকোষ আক্রমণকারী ভাইরাসকে জুফাজ (Zoophage) ও উদ্ভিদকোষ আক্রমণকারী ভাইরাসকে ফাইটোফাজ (Phytophage) বলে। জীনতত্ত্বে ব্যাকটিরিওফাজ সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হওয়ায় নিম্নে ব্যাকটিরিওফাজের জনন ও জীবনচক্রের আলোচনা করা হইল।

ব্যাকটিরিওফাজের দেহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—মস্তক ও লেজ। মস্তক বহুকোণবিশিষ্ট (Polyhedral) এবং লেজ অনেকটা ইনজেকশনের সুচের আকৃতিবিশিষ্ট। মস্তক ও লেজ অংশ বিশেষ প্রোটিন আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে (চিত্র 7.1)। মস্তকের প্রোটীন আবরণীর মধ্যে DNA অণু সংকুচিত অবস্থায় থাকে। প্রোটীন আবরণী DNA অণুকে রক্ষা করে। লেজের মুক্তপ্রান্তের প্রোটিনের দুইটি বিশেষ কাজ আছে—(1) ইহা বিশেষ ব্যাকটিরিয়ার কোষের উপরিভাগে ভাইরাসকে আটকাইতে সাহায্য করে। ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরের উপরিভাগে বিশেষ ধরনের গ্রাহক (Receptor) আছে। এই গ্রাহকের সহিত ভাইরাসের লেজের মুক্ত প্রান্তের রাসায়নিক বন্ধন ঘটে এবং ইহার ফলে ভাইরাস কোষ প্রাচীরে আটকাইয়া থাকে। এই গ্রাহকের জন্যই বিশেষ বিশেষ ভাইরাস বিশেষ বিশেষ ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে আটকাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু T_2 ভাইরাসের লেজের মুক্তপ্রান্তে ব্যাকটিরিয়া কোষ প্রাচীরকে গলাইয়া প্রবেশদ্বার প্রস্তুতির জন্য উৎসেচক থাকে। এই প্রবেশ পথ দিয়া মস্তকাংশের DNA ব্যাকটিরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং প্রোটিন আবরণী বাহিরে থাকে। ব্যাকটিরিয়ার সাইটোপ্লাজমে DNA প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি নিম্নরূপ :—যখন কোন ফাজ ভাইরাস সংবেদনশীল ব্যাকটিরিয়ার সংস্পর্শে আসে তখন ইহার লেজের মুক্তপ্রান্তে অবস্থিত ডাইসালফাইড– অ্যামাইনো অংশ (S—S—MN_2) ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরের গ্রাহকের জিংক (Zinc) আয়নের সহিত যুক্ত হয়। ইহার ফলে নালিকা আকৃতির লেজের শেষ প্রান্ত মুক্ত হয় এবং ইহা ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে অধিষ্ঠিত হয়। লেজের মস্তকপ্রান্তের আবরণীতে অবস্থিত সংকোচন প্রসারণশীল প্রোটিন অণুগুলির ক্রিয়ার ফলে লেজের অগ্রপ্রান্ত সংকুচিত হয়। এই সময় উৎসেচকের সহায়তায় সীমিত পাচন ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর গলিয়া যায় এবং DNA অণু কোষদেহে প্রবেশ করে।

ইহার কিছুক্ষণ পরে ব্যাকটিরিয়ার কোষদেহ বিশ্লিষ্ট হয় এবং কোষের সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন ফাজ ভাইরাস মুক্ত হয় (চিত্র 7.5) এবং পুনরায় অন্য ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে। অতি অল্প সংখ্যক ফাজ ভাইরাস আগার কৃষ্টি মাধ্যমে লালিত স্পর্শকাতর ব্যাকটিরিয়ার কলোনীতে মিশাইয়া দিলে প্রতিটি ফাজ ভাইরাস উক্ত ব্যাকটিরিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে আটকাইয়া যায়। ব্যাকটিরিয়ার দেহে উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং পুনরায় বিশ্লিষ্ট ব্যাকটিরিয়ার দেহ হইতে মুক্ত হইয়া উহার পার্শ্ববর্তী ব্যাকটিরিয়াকে আবার আক্রমণ করে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির ফলে আগার কৃষ্টি মাধ্যমের উপরতলের কিছু কিছু স্থান ব্যাকটিরিয়াহীন হইয়া যায়। ফাজ ভাইরাস দ্বারা বিশ্লিষ্ট ব্যাকটিরিয়ার শূন্য স্থানগুলি পরিষ্কার অঞ্চল সৃষ্টি করে। ইহাকে প্লেক (Plaque) বলে।

এক এক ধরনের ফাজ এক এক ধরনের প্লেক উৎপন্ন করে এবং কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্ষেত্রে গঠিত প্লেকের আকৃতি সর্বদাই নির্দিষ্ট। বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে

প্লেকের আকৃতি নানারূপ হইয়া থাকে। প্লেকের আকার ছোট বা বড় হইতে পারে অথবা প্লেকের কিনারাগুলি সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইতে পারে। এক কথায় প্লেকের আকৃতি ফাজ প্রজাতির একটি সুনির্দিষ্ট ফিনোটাইপ যাহা জীন নির্ধারিত। ফাজ ভাইরাসের এই ফিনোটাইপ ইহার জীনতত্ত্ব ও বংশগতি পর্যালোচনায় নানা কারণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। বিশেষ প্রকৃতির ফাজ বিশেষ বিশেষ ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে। পোষক ব্যাকটিরিয়ার যথাযথ চয়ন ফাজের একটি



চিত্র 7.5 ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে T_2 ফাজ আক্রান্ত ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়ার লম্বচ্ছেদের চিত্ররূপ (a) আক্রান্ত হইবার সময়, (b দুই মিনিট পরে, (c) দশ মিনিট পরে, (d) চতুর্দশ মিনিট পরে, (e) চল্লিশ মিনিট পরে – অসংখ্য অসম্পূর্ণ গঠিত ফাজ লক্ষণীয়।

জীন নির্ধারিত বংশগত বৈশিষ্ট্য। প্লেকের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া যেমন ফাজ সনাক্ত করা সম্ভব, তেমনি ইহার সাহায্যে যে ব্যাকটিরিয়ার কলোনীতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদেরও সনাক্ত করা সম্ভব। এইভাবে অণুবীক্ষণিক ব্যাকটিরিয়া ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট ফাজকে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সনাক্ত করা যায়। ফাজের কৃষ্টির লঘু দ্রবণকে সুনির্দিষ্ট গুণিতকে লঘুতর করিয়া কৃষ্টি মাধ্যমস্থিত

ব্যাকটিরিয়ার কলোনিতে আক্রমণের জন্য মিশাইয়া দিবার পর প্লেকের সংখ্যা, ব্যাকটিরিয়ার কলোনির সংখ্যা ইত্যাদির সাহায্যে পূর্বআলোচিত ব্যাকটিরিয়া গণনা করিবার মত পদ্ধতিতে ফাজের সংখ্যা গণনা সম্ভব।

যে ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস করে তাহাকে মারাত্মক ফাজ বা Virulent ফাজ বলে। ইহা ছাড়াও নিম্নোক্ত প্রকার ফাজ ভাইরাস পাওয়া যায় :—

টেম্পারেট ফাজ (Temperate)—এই ফাজ ভাইরাস পোষকের ক্ষতি না করিয়া বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পোষক ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে। এই ক্ষেত্রে পোষক ব্যাকটিরিয়া শুধু বাঁচিয়া থাকে তাহাই নহে, ইহারা কোষ বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি ঘটায় এবং সেই সঙ্গে উৎপন্ন অপত্য কোষেও ফাজ ভাইরাস অপত্যদের মধ্যে পরিবাহিত হয়। সময় বিশেষে টেম্পারেট ফাজ মারাত্মক হইয়া যায় এবং ব্যাকটিরিয়ার কোষদেহে সংক্রামক ক্ষমতাযুক্ত ফাজ উৎপন্ন করে। এই অনির্দিষ্টভাবে মারাত্মক হওয়ার ক্ষমতাযুক্ত ফাজ হইতে ব্যাকটিরিয়াতে ইহাদের উপস্থিতি জানা যায়।

প্রোফাজ (Prophage)—কোন কোন ফাজ ভাইরাস পোষক ব্যাকটিরিয়ার দেহে প্রবেশের পর কোন অজ্ঞাত কারণে মারাত্মক হইয়া উঠে না। ফাজহীন ব্যাকটিরিয়ার জীনের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহারা সুসংহত ভাবে উক্ত ব্যাকটিরিয়ার এক জনু হইতে অন্য জনুতে পরিবাহিত হয়। আবার এই ধরনের পোষক ব্যাকটিরিয়ার বিশ্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইহারা বিশ্লিষ্ট হয় না অথচ সম্ভাবনাটি জনুক্রমে সঞ্চারিত হয়—এই দশার পোষক ব্যাকটিরিয়াকে লাইসোজেনিক (Lysogenic) দশার ব্যাকটিরিয়া বলে। ফাজ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে সকল ব্যাকটিরিয়া বিশ্লিষ্ট হয় তাহাদের "নন-লাইসোজেনিক" ব্যাকটিরিয়া বলে। প্রোফাজ ব্যাকটিরিয়ায় জননের সহিত এমন সমন্বয়যুক্ত হয় যে উভয়ের জনন ও জীনবস্তুর দ্বিত্ব-ভবন একই সময়ে ঘটে ও লাইসোজেনিক ব্যাকটিরিয়া নূতন ফাজ দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হয় না। এই প্রতিরোধগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা লাইসোজেনিক ব্যাকটিরিয়াকে সনাক্ত করা যায়।

কিছু কিছু লাইসোজেনিক ব্যাকটিরিয়াকে অতি বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করিলে উহাদের মধ্যে ফাজ উৎপন্ন আরম্ভ হয় এবং ব্যাকটিরিয়ার কোষ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

(iii) জীনতত্ত্বে ভাইরাসের ব্যবহার

জীনতত্ত্বের গবেষণায় ব্যাকটিরিওফাজের প্রভূত ব্যবহার হয়। ইহার সরল গঠন জীনবস্তুর গঠন ও ক্রিয়াগত সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করে। দ্রুত-লয়ের জনন পদ্ধতির জন্য অল্প সময়ে যে বিপুল সংখ্যক অপত্য গোষ্ঠী পাওয়া যায় তাহাদের সাহায্যে জীনতত্ত্বের বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। ফাজ ভাইরাসের সহিত ইহার পোষক ব্যাকটিরিয়ার বিশেষ সম্পর্ক ফাজ ভাইরাসকে জীনতত্ত্বের গবেষণায় বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে ফাজের গঠন যতই সরল হউক না কেন ইহাদের জীনতন্ত্র উচ্চ স্তরের জীবের জীনতন্ত্রের সমতুল্য, কারণ :

(i) উচ্চস্তরের জীবের ন্যায় ইহাদের জীনেও পরিবৃত্তি ঘটে এবং ইহার ফলে ফিনোটাইপের প্রকরণ দেখা যায়।

(ii) ইহাদের জীনবস্তু উচ্চস্তরের জীবের ন্যায় পুনর্বিন্যস্ত হয়। কোন ব্যাকটিরিয়াকে দুইটি ফিনোটাইপগত পার্থক্যযুক্ত ফাজ দ্বারা আক্রান্ত করিলে বিশ্লিষ্ট ব্যাকটিরিয়া হইতে প্রাপ্ত ভাইরাসের ফিনোটাইপে উক্ত দুই শ্রেণীর ফিনোটাইপগত পার্থক্যের পুনর্বিন্যাস দেখা যায়। মূলতঃ ইহা ব্যাকটিরিয়ার জীনের পুনর্বিন্যাসের মত।

7.2 জীনবস্তুর সনাক্তকরণ

A. **জীনের জৈব ধর্ম**--যে কোন জীনের নিম্নলিখিত জৈব ধর্ম থাকে :--

(i) জীন স্বভাবতই রক্ষণশীল, কারণ একটি জীন একটি জনুতে যে ফিনোটাইপ নির্ধারণ করে পরবর্তী সকল জনুতে উহা সেই ফিনোটাইপ নির্ধারণ করে, অর্থাৎ জীন সাধারণতঃ পরিবর্তিত হয় না।

(ii) কোন বিশেষ কারণে কোন জীন পরিবর্তিত হইলে উহা পরিবর্তিত অবস্থাতেই এক জনু হইতে অন্য জনুতে পরিবাহিত হয়। এই পরিবর্তিত জীন দ্বারা নির্ধারিত ফিনোটাইপও পরিবর্তিত হয়। জীনের এই পরিবর্তনকে পরিবৃত্তি বলে।

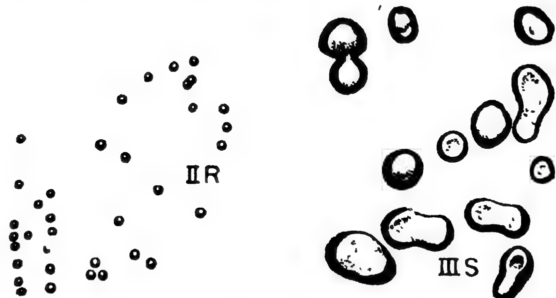
(iii) জীনের নির্দিষ্ট ফিনোটাইপ নির্ধারণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই নিয়মের যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটে।

(iv) প্রতি জীনের নিজস্ব প্রতিলিপি সংশ্লেষ ক্ষমতা আছে। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিসম্বাদী বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি জীব জননের সাহায্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে কিন্তু ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জনিতৃ-জনুর অনুরূপ হয়। জীন যেহেতু ফিনোটাইপ নির্ধারণ করে অতএব জীনের দ্বিত্ব-ভবনের ক্ষমতা আছে। একটি হোমোজাইগাস সবুজ বীজপত্রযুক্ত গাছ হইতে সর্বদাই সবুজ বীজপত্রযুক্ত গাছ জন্মাইবে। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জীনের নিজের প্রতিলিপি সংশ্লেষ ক্ষমতা আছে। ক্ষমতাটিকে অটোক্যাটালিসিস (Autocatalysis) বলা হয়।

B **জীনবস্তুর প্রকৃতি**—মেণ্ডেল বর্ণিত জীন ক্রোমোসোমে অবস্থিত। অর্থাৎ ক্রোমোসোম জীনবস্তুর ধারক ও বাহক। কিন্তু ক্রোমোসোম নিজেই বহু রাসায়নিক বস্তু দ্বারা গঠিত একটি কোষ অঙ্গাণু। ইহার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন অবস্থায় থাকে। শুধু তাহাই নহে, ইহার গঠন বিন্যাস সুনির্দিষ্ট। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে ক্রোমোসোমের কোন রাসায়নিক বস্তু জীন হিসাবে কার্য করে? ইহা ছাড়া সাইটোপ্লাজমেও কিছু জীনবস্তু আছে যদিও ইহা ক্রোমোসোমের ন্যায় সংগঠিত নয়। ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের ক্ষেত্রেও ক্রোমোসোম সুগঠিত কোষ অঙ্গাণু নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও জীনের

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে প্রকট। গঠনগত সরলতার জন্য ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসকে জীনের রাসায়নিক প্রকৃতি সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর (Transformation) একটি প্রমাণিত সত্য। পরিবৃত্তির ফলে জীনের পরিবর্তন হইলে ফিনোটাইপের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবৃত্তি জনিত পরিবর্তনের ন্যায় উহা জনুক্রমে প্রবাহিত হয়। ব্যাকটিরিয়ার ফিনোটাইপগত এই রূপান্তর যে রাসায়নিক বস্তুর জন্য ঘটে তাহাই জীনবস্তু হইবে। গ্রিফিথ সর্বপ্রথম ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তরের ঘটনা আবিষ্কার করেন এবং এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ম্যাকালওড ও তাহার সহযোগিগণ জীনের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করেন।

C. **রূপান্তর** (Transformation)—জীনের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে 1928 খ্রীষ্টাব্দে ধ্যানধারণা শুরু হয়। গ্রিফিথ (F. Griffith) মানুষের নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করাইয়া রোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিই (Streptococcus pneumoniae) নামক নিউমোনিয়া রোগের ব্যাকটিরিয়াকে সাধারণভাবে নিউমোকক্কাস বলে। দুইটি ব্যাকটিরিয়া একই পলিস্যাকারাইড নির্মিত ক্যাপসুল (Capsule) বা আবরণীর মধ্যে একত্রে থাকে বলিয়া ইহাকে ডিপ্লোকক্কাসও (Diplococcus) বলা হয়। নিউমোকক্কাস মানুষের দেহে প্রবেশ করিলে নিউমোনিয়া রোগ হয়। কিন্তু ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করিলে ইহা ভীষণভাবে মারাত্মক হইয়া উঠে। নিউমোনিয়া রোগীর থুথু একটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করাইবার 24 ঘণ্টার মধ্যে ঐ ইঁদুর মারা যায় এবং মৃত ইঁদুরের হৃৎপিণ্ড হইতে সংগৃহীত রক্ত পরীক্ষা করিলে উহাতে অসংখ্য নিউমোকক্কাস পাওয়া যায়। নিউমোকক্কাসের এই রোগসৃষ্টিক্ষমতার (Pathogenicity) জন্য ইহাদের কোষ আবরণীর বাহিরে অবস্থিত পলিস্যাকারাইড নির্মিত আবরণী দায়ী। গ্লুকোজ ও গ্লুকিউরণিক অ্যাসিড গঠিত পলিমার এই পলিস্যাকারাইড আবরণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই আবরণী থাকার জন্য আক্রান্ত ইঁদুরের দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস করিতে পারে না। আবার এই আবরণীর জন্যই ইহাদের কলোনী (Colony) দেখিতে মসৃণ হয় এবং চক্‌চক্ করে (চিত্র 7.6)। নিউমোকক্কাসের এই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে মসৃণ (S) বৈশিষ্ট্য বলে। অনেক সময় নিউমোকক্কাস এই S বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য ধরনের কলোনী (Colony) উৎপন্ন করে। ইহাদের মসৃণতা এবং চক্‌চক্ করিবার



চিত্র 7.6 কৃষ্টি মাধ্যমে নিউমোকক্কাসের R ও S স্ট্রেনের চিত্ররূপ।

বৈশিষ্ট্য থাকে না। ইহাদের কলোনী দেখিতে কুঞ্চিত (R)। ইহাদের ক্ষেত্রে আবরণীর পলিস্যাকাইডের সংশ্লেষক্ষমতা স্থায়ীভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। R শ্রেণীর নিউমোকক্কাসের রোগসক্রিয়তা থাকে না। বৈশিষ্ট্যের এই ধরনের স্থায়ী পরিবর্তনকে পরিবৃত্তি বলে। নিউমোকক্কাসের আবরণীর পলিস্যাকারাইডের মধ্যে অনেক সময় রাসায়নিকগত বিভেদ দেখা যায়। এই বিভেদের জন্য S বৈশিষ্ট্যকে আবার S I, S II, S III ইত্যাদি উপভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে 'R' বিশিষ্টের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিভেদ দেখা যায় এবং এগুলি R I, R II, R III ইত্যাদি উপভাগে বিভক্ত। 'S' বৈশিষ্ট্য হইতে পরিবৃত্তির ফলে R শ্রেণীর নিউমোকক্কাস উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু 'R' হইতে 'S' এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ বিপরীতমুখী পরিবৃত্তি ঘটে না। গ্রিফিথ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে S III ও R II নিউমোকক্কাস ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করান ও নিম্নোক্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন—

1. ইঁদুরের দেহে শুধু S III নিউমোকক্কাস প্রবেশ করাইলে 24 ঘণ্টার মধ্যে ইঁদুর মরিয়া যায় (চিত্র 7.7) এবং উহার হৃৎপিণ্ডের রক্তে যথেষ্ট সংখ্যক S III নিউমোকক্কাস পাওয়া যায়।

2. R II নিউমোকক্কাস প্রবেশ করাইলে ইঁদুর মরে না। যদিও ইহার হৃৎপিণ্ডের রক্তে যথেষ্ট পরিমাণ R II নিউমোকক্কাস পাওয়া যায়।

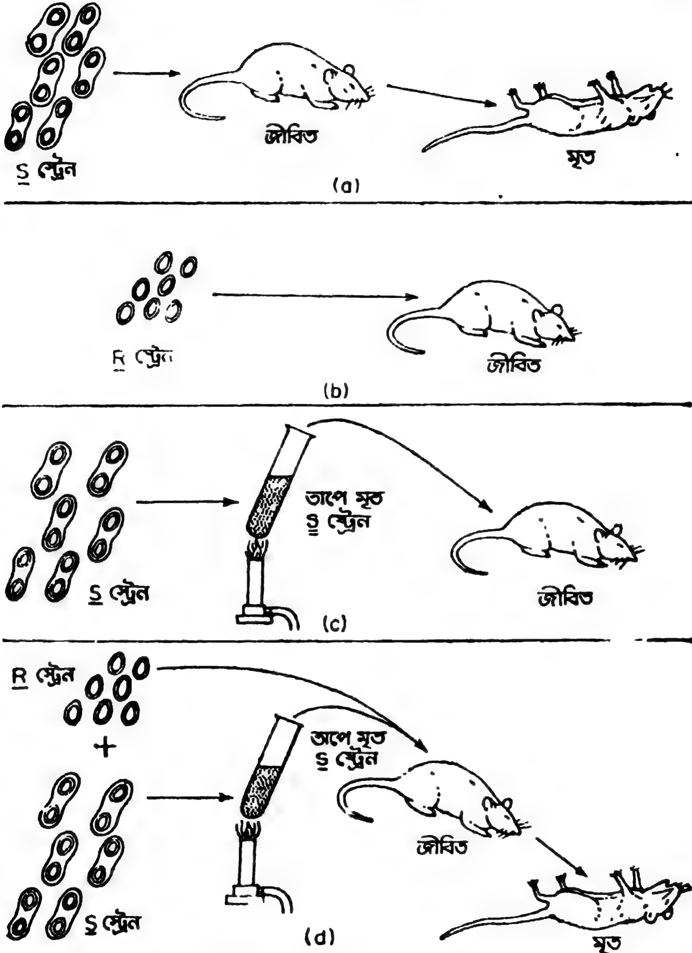
3. তাপের প্রভাবে মৃত S III নিউমোকক্কাস প্রবেশ করাইলে ইঁদুর মারা যায় না এবং ইহার হৃৎপিণ্ডের রক্তে কোনরূপ নিউমোকক্কাস পাওয়া যায় না।

4. R II নিউমোকক্কাসের সহিত তাপের প্রভাবে মৃত S III নিউমোকক্কাস 60°C তাপমাত্রায় মিশ্রিত করিয়া ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করাইলে 24 ঘণ্টার মধ্যে ইঁদুরটি মরিয়া যায় এবং ইহার হৃৎপিণ্ডের রক্তে কেবলমাত্র S III নিউমোকক্কাস পাওয়া যায়।

বিশ্লেষণ : S হইতে পরিবৃত্তির ফলে R উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু R হইতে কখনই S শ্রেণী উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মৃত S এর সহিত R এর মিশ্রণের ফলে S শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ R শ্রেণী S শ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কি ভাবে R শ্রেণী রূপান্তরিত হইয়া S শ্রেণী হইবে। যেহেতু মৃত S হইতে কখনই S উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে (পরীক্ষার ফল এই ধারণাকে সমর্থন করে) অতএব বলা যাইতে পারে যে মৃত S হইতে নির্গত কোন বস্তু R শ্রেণীকে S শ্রেণীতে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও কিছু সন্দেহ থাকিয়া যায় কারণ ইঁদুরের দেহের কোন বস্তু মৃত S এর দেহে কোন পদার্থের সহায়তায় এই রূপান্তর ঘটাইতে পারে। গ্রিফিথ এই বিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই।

D. রূপান্তরের স্বরূপ :—গ্রিফিথের পরীক্ষার পর তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার জনন ও জীবনচক্র সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। বিশেষ করিয়া ব্যাকটিরিয়া যে কৃষ্টি মাধ্যমে পালন করা যায় এই জ্ঞান আণবিক স্তরে জীনতত্ত্বের

রহস্য উদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়ক হয়। নিউমোকক্কাসকে কৃষ্টি মাধ্যমে পালন করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই ক্ষেত্রেও S হইতে পরিবর্তনের ফলে R উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু R হইতে S উৎপন্ন হয় না। আবার R এর সহিত মৃত S মিশ্রিত করিলে R রূপান্তরিত হইয়া S হয়। ইহার দ্বারা গ্রিফিথের পরীক্ষা পরিবর্ধিত হইয়া প্রমাণ

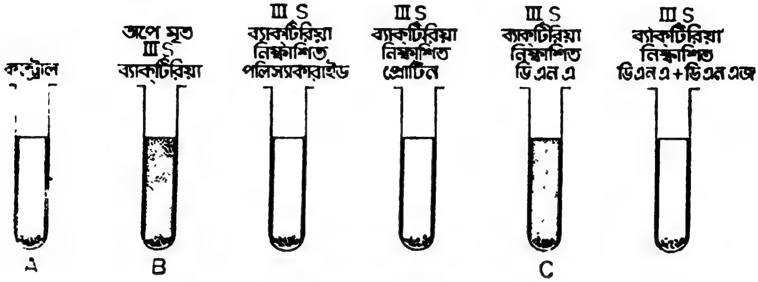


চিত্র 7.7 গ্রিফিথকৃত ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর পরীক্ষার চিত্ররূপ।

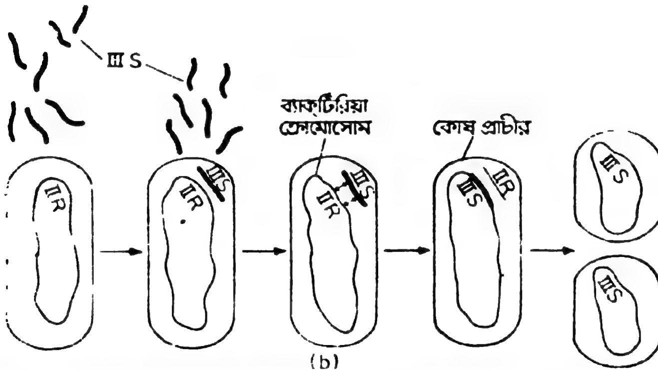
করে যে ইঁদুর এই রূপান্তরে কেবলমাত্র পালন পাত্র হিসাবে কাজ করে। রূপান্তরে ইহার কোন প্রভাব নাই। অর্থাৎ রূপান্তরে মৃত S এর দেহাস্থিত কোন বস্তু অংশ গ্রহণ করিতেছে। ইহার দুই বৎসরের মধ্যে জানা যায় যে S শ্রেণীর নিউমোকক্কাসের কোষ ভাঙিয়া নির্যাস বাহির করিয়া R শ্রেণীর সহিত মিশ্রিত করিয়া

কৃষ্টি মাধ্যমে রাখিয়া দিলে S শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে নির্যাসের মধ্যেই রূপান্তরের জন্য দায়ী রাসায়নিক বর্তমান।

যেহেতু S শ্রেণী হইতে সাধারণত S শ্রেণী উৎপন্ন হয় এবং R শ্রেণী হইতে R শ্রেণী উৎপন্ন হয় অতএব বলা যায় যে S ও R উভয়ের বৈশিষ্ট্যই জীন নির্ধারিত। S হইতে R শ্রেণীর উৎপত্তি উক্ত জীনের পরিবৃত্তির ফলে ঘটে। একথাও নিঃসন্দেহে বলা



(a)



(b)

চিত্র 7.8 ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর পর্যালোচনা (a) পুষ্টি মাধ্যমে অ্যান্টি II R সিরাম ও II R ব্যাকটিরিয়া একত্রে থাকায় অ্যাগ্লুটিনেশন হয় ও টেস্টটিউবে তলার দিকে II R ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় (A) ; তাপে মৃত III S ব্যাকটিরিয়া (B) বা III S ব্যাকটিরিয়া নিষ্কাশিত ডি. এন. এ. (C) যুক্ত করিলে II R রূপান্তরিত হইয়া III S হয় এবং আগ্লুটিনেশন না হওয়ায় উহাদের সমসত্ত্ব ভাবে টেস্টটিউবের সর্বত্র পাওয়া যায়। তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ টিউবে রূপান্তর জনিত ফল পাওয়া যায় না। (b) II R কোষের রূপান্তরের জন্য III S DNA-এর কোষের মধ্যে প্রবেশ এবং II R-এর জীনবস্তুর সহিত যুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

যায় যে মৃত S-এর দেহের যে রাসায়নিক বস্তু R কে S শ্রেণীতে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহাই জীনবস্তু, অর্থাৎ রূপান্তরক জীন বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মেন্ডেল জীন নির্ধারিত ফিনোটাইপের বিশ্লেষণ দ্বারা জীনের উপস্থিতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। জীনের বস্তুগত স্বরূপ ও প্রকৃতি সেই সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

ইউক্যারিওট কোষযুক্ত জীবের জনন ও জীবনচক্র পর্যালোচনা করিয়া পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে এককোষী ও বহুকোষী জীব উভয়ের ক্ষেত্রে কোষস্থিত নিউক্লিয়াস তথা ক্রোমোসোমই জীনের বাহক। ক্রোমোসোম জনিতৃ জনু হইতে অপত্য জনুতে জীন বহন করিয়া লইয়া যায়। আবার মাইটোসিস্ কোষ বিভাজনের দ্বারা জীন জনিতৃ কোষ জনু হইতে অপত্য কোষ জনুতে পরিবাহিত হয়। মিয়োসিস ও নিষেক এই দুই পদ্ধতির সাহায্যে জনিতৃ জনু ও অপত্য জনুর জীনের গুণগত ও পরিমাণগত সমতা বজায় রাখা হয়।

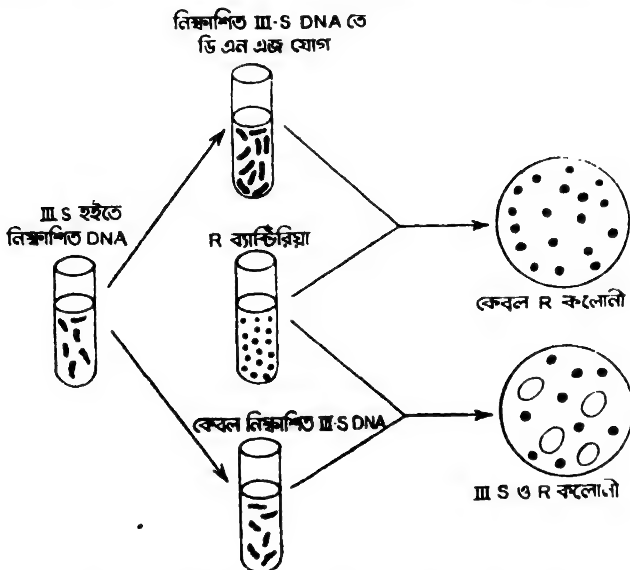
আভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাকার্টি 1944 খ্রীঃ গ্রিফিথের অনুমিত রূপান্তরককে রাসায়নিকভাবে সনাক্ত করিতে সচেষ্ট হন। আগেই বলা হইয়াছে ব্যাকটীরিয়ার গঠন সরল এবং ইহাতে ইউক্যারিওট কোষের সুগঠিত ক্রোমোসোমের ন্যায় কোন কোষ অঙ্গাণু নাই। কিন্তু ইহার ফিনোটাইপ জীন নির্ধারিত এবং রূপান্তরিত বৈশিষ্ট্যও জীন নির্ধারিত। অতএব বলা যায় ব্যাকটীরিয়ার কোষে ক্রোমোসোম না থাকিলেও আণবিক স্তরে ইহাতে জীনবস্তু বিদ্যমান। আভেরী ও তাহার সহযোগীগণ ব্যাকটীরিয়ার কোষের সমস্ত রাসায়নিক বস্তু পৃথক করিয়া ফেলেন। দেখা যায় কোষের মধ্যে শর্করা, প্রোটীন, ফ্যাট ও উহাদের বিপাকজাত বস্তু ছাড়াও DNA এবং RNA আছে। তাহারা কৃষ্টি মাধ্যমে R শ্রেণীর ব্যাকটীরিয়ার সহিত ইহাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করিয়া মিশ্রিত করেন (চিত্র 7.8)। দেখা গেল শুধুমাত্র DNA R শ্রেণীকে S শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে DNA জীনবস্তু। আভেরী ও তাহার সহযোগীদের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় বলা হয় যে তাহাদের নিষ্কাষিত DNA অণু যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ছিল না। কিন্তু তাহারা জৈবরসায়নগত ভাবে যতখানি বিশুদ্ধ DNA প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা করিয়াও দেখাইয়া দিলেন যে শুধু DNA ব্যতীত অন্য কোন রাসায়নিক জীন হিসাবে ক্রিয়াশীল হইতে অক্ষম। তাহারা DNAse নামক উৎসেচকের সাহায্যে DNAকে পাচিত করিয়া দেখান যে পাচিত DNA অণুর আর কোন জীনক্রিয়া থাকে না (চিত্র 7.9)।

আলোচ্য পরীক্ষায় ডিপ্লোকক্কাস নিউমানিই বহিঃস্থ DNA অণু গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাকটীরিয়ার ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র এই বহিঃস্থ DNA অণু গ্রহণক্ষমতা দেখা যায় এবং ইহার ফলে রূপান্তর সম্ভব হয়। আরও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বহিঃস্থ DNA অণু ব্যাকটীরিয়ার কোষ প্রাচীরে অবস্থিত বিশেষ গ্রাহকের (Receptor) সাহায্যেই কোষ অভ্যন্তরে নীত হয় [চিত্র 7.8(b)] এবং পরে ইহা ব্যাকটীরিয়ার নিজস্ব জীনরূপী DNA অণুর সহিত যুক্ত হয় এবং জীনবস্তু রূপে ক্রিয়াশীল হয়। ব্যাকটীরিয়া ব্যতীত আর কোন কোষের এই রূপান্তর ক্ষমতা এখনো পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

ব্যাকটীরিয়ার কোষ প্রাচীর লাইসোজাইমের সাহায্যে বিশেষ পদ্ধতিতে পাচিত করিলে ইহার প্রোটোপ্লাজম নগ্ন হইয়া যায়, তখন ইহাকে প্রোটোপ্লাস্ট বলে। এই

ধরনের ব্যাকটিরিয়ার কলোনীতে পেনিসিলিন বিশেষ পরিমাণে প্রয়োগের ফলে দেখা যায় অপত্য জন্র ব্যাকটিরিয়াতে আর কোষ প্রাচীর উৎপন্ন হয় না। এইভাবে উৎপন্ন প্রোটোপ্লাস্টকে আইসোটনিক কৃষ্টি মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবে পালন করা সম্ভব। যদি কৃষ্টি মাধ্যমের অসমোসিস জনিত চাপের বৈষম্য ঘটে তবে ব্যাকটিরিয়া মরিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে পেনিসিলিন আমাদের দেহে ব্যাকটিরিয়াকে মারিয়া ফেলে।

প্রোটোপ্লাস্ট লইয়া রূপান্তরের পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর সম্ভব হয় না। অর্থাৎ বহিঃস্থ DNA প্রবেশের জন্য কোষ



চিত্র 7.9 III S কোষ হইতে নিষ্কাশিত DNA দ্বারা II R ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর। নিষ্কাশিত DNA-এর সহিত ডি এন এজ যোগ করিলে DNA কার্যকরী থাকে না ফলে রূপান্তর হয় না।

প্রাচীর প্রয়োজন। অন্য জীব দেহের কোষে এই বিশেষ গ্রাহক বস্তু না থাকার জন্য রূপান্তর সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবকোষের DNA নিষ্কাশিত করিয়া ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর ঘটানো হইয়াছে।

তবে মনে রাখা উচিত যে ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তরিত হইবার ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। কোন বিশেষ জীনের DNA অণু প্রতি 1000 ব্যাকটিরিয়ার 1টি বা 2টি ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটায়। অর্থাৎ রূপান্তরের হার 0·02% এর বেশী নয়। তবে এইরূপে জীনবস্তু সনাক্ত করা হইলেও ইহা কিভাবে আত্মজনন (অটোক্যাটালিসিসগত কার্য) এবং কিভাবে ফিনোটাইপ (হেটারোক্যাটালিসিসগত কার্য) নির্ধারণ করে তাহা জানা প্রয়োজন।

DNA যে পদ্ধতিতে আত্মজনন ঘটাইয়া সঠিক প্রতিলিপি উৎপাদন করে তাহাকে রেপ্লিকেশান (Replication) বলে। DNA যে পদ্ধতিতে কোষের বৈশিষ্ট্য

নির্ধারণ করে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগকে ট্রান্সক্রিপশান (Transcription) ও দ্বিতীয় ভাগকে ট্রানস্লেশান (Translation) বলে। ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে DNA হইতে RNA উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন RNA জীন হইতে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী ট্রানস্লেশান পদ্ধতিতে পলিপেপটাইড গঠনকরে এবং উৎপন্ন পলিপেপটাইড সংগঠিত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর প্রোটিন গঠন করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা উৎসেচক হিসাবে কার্য করে। এই উৎসেচকের ক্রিয়ায় কোষের সমস্ত বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কোষের ফিনোটাইপ নির্ধারিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে রেপ্লিকেশান (Replication), ট্রান্সক্রিপশান ও ট্রানস্লেশান জীবের সকল ক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত। এইজন্য ইহাদিগকে একত্রে মূল ধারণা (Central dogma) বলে। নিউমোকক্কাস ছাড়াও বর্তমানে বহু রূপান্তর ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল ব্যাকটিরিয়াতেও DNA যে জীনবস্তু তাহা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

রূপান্তর ক্ষমতাসম্পন্ন ফিনোটাইপের ব্যাকটিরিয়ার বিবরণ :—

ক্যাপসুলের শ্রেণী		প্রজাতি
I, II, III, VI, VIII, XIV	——→	ডি. নিউমোনিই (D. pneumoniae)
a,b,c,d,e,f	——→	এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জী (H. influengae)
I, II	——→	এন. মেনিনজিটাইডিস (N. meningitidis)
সূত্রাকৃতিক বৃদ্ধি	——→	ডি. নিউমোনিই
ভেষজক্রিয়া প্রতিরোধী		
পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সালফাজিলামাইড এরিথ্রোমাইসিন.	——→	
স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্যাথোমাইসিন	——→	এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জী
উৎসেচক ক্রিয়া		
ম্যানিটল ব্যবহার ক্ষমতা স্যালিসিন, ফারমেণ্টেশান, মলটেজ, ল্যাকটিক অ্যাসিড, অক্সিডেজ	——→	ডি. নিউমোনিই
ইণ্ডোল, অ্যান্থানিলিক এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড ব্যবহার ক্ষমতা, সুক্রেজ, β-গ্যালাক্টোসাইডেজ	——→	বি. সাবটিলিস (B. subtilis)

7.3 হার্সে-চেজ পরীক্ষা

সাধারণভাবে উৎসেচক DNAse ফাজ ভাইরাস পাচনে অক্ষম। কারণ ফাজ দেহের প্রোটীন আবরণী এই উৎসেচকের দ্বারা পাচিত হয় না। টি. এফ অ্যান্ডারসন (T. F. Anderson) লক্ষ্য করেন যে যদি তরল কৃষ্টিমাধ্যমে স্পর্শকাতর (Sensitive) ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস একত্রে রাখিয়া যান্ত্রিক উপায়ে জোরে ঝাঁকানো যায় তবে দেখা যায় যে ব্যাকটিরিয়া ফাজ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এই ঘটনার ব্যাখ্যায় এ. ডি. হার্সে ও মার্থা চেজ পুনরায় উক্ত পরীক্ষা শুরু করেন। ইহার ফলে জানা যায় যে অসমোসিস জনিত চাপের জন্য ফাজ দেহ হইতে DNA ব্যাকটিরিয়ার কোষ দেহে প্রবেশ করে কিন্তু অধিকাংশ প্রোটীন আবরণী ব্যাকটিরিয়ার কোষ দেহের প্রাচীরের বাহিরে আটকাইয়া থাকে। প্রবিষ্ট DNA হইতে পুনরায় ফাজ উৎপন্ন হয় এবং ব্যাকটিরিয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া উহারা বাহিরে আসে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে DNA জীন বস্তু।

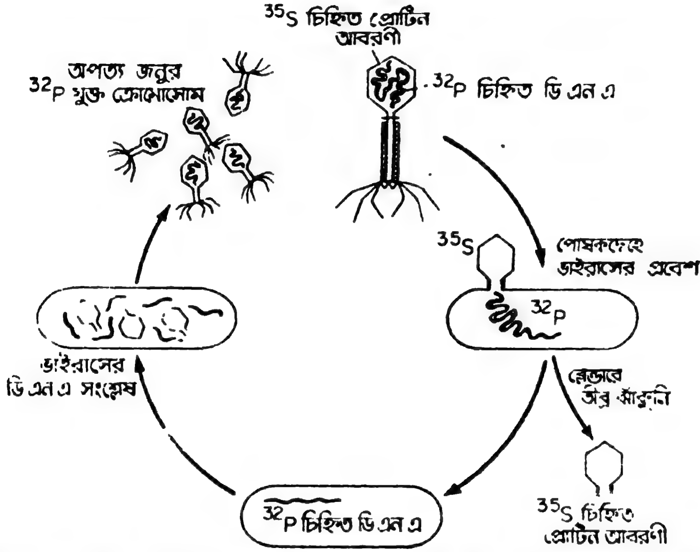
A. পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রথমে প্রয়োজনীয় নিম্নতম কৃষ্টি মাধ্যমে ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়াকে পালন করা হয় (ই. কোলাই পালন মাধ্যমের সরণী দ্রষ্টব্য)। এই কৃষ্টি মাধ্যমে ব্যবহৃত ফসফেট ও সালফেট লবণ ব্যাকটিরিয়ার ফসফরাস ও সালফারের উৎস। ইহা হইতে বৃদ্ধিরত ব্যাকটিরিয়া ফসফরাস ও সালফার গ্রহণ করিয়া ফসফরাস ও সালফার যুক্ত যৌগ উৎপাদন করে। যদি কৃষ্টি মাধ্যমে সাধারণ ফসফেট ও সালফেট লবণের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস লবণ (^{32}P) ও তেজস্ক্রিয় সালফার লবণ (^{35}S) ব্যবহার করা হয় তবে ইহারা কোষে ফসফরাস ও সালফার যুক্ত যৌগ প্রস্তুত করিবে। যদি এইরূপ ব্যাকটিরিয়া ফাজ দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে যে সকল অপত্য ফাজ এই ব্যাকটিরিয়ার দেহে উৎপন্ন হইবে তাহাদের দেহেও তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ও সালফার যুক্ত যৌগ পাওয়া যাইবে। মনে রাখা দরকার যে কোন মৌলের তেজস্ক্রিয় ও সাধারণ অণুর যৌগ উৎপাদনের ব্যবহারে কোন পার্থক্য নাই। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

ফাজ দেহে ফসফরাস ঘটিত যৌগ DNA এবং সালফার ঘটিত যৌগ সালফারযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড (মেথিওনিন, সিসটিন ইত্যাদি) ও অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিড তথা প্রোটীন গঠন করে। এইজন্যে ফাজ দেহের ডি. এন. এ.-তে ^{32}P ও প্রোটীনে ^{35}S পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটিকে তেজস্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিতকরণ বলে।

হার্সে ও চেজ এইভাবে T_2 ফাজকে পৃথক পৃথক ভাবে ^{32}P ও ^{35}S দ্বারা তেজস্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করেন (চিত্র 7.10)। পোষক কোষ গাত্রে এই চিহ্নিত ফাজকে সংলগ্ন হইবার জন্য কিছু সময় দিবার পরে আক্রান্ত কোষগুলিকে মুক্ত ফাজ হইতে স্বল্পগতির সেণ্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে তলানি ফেলিয়া পৃথক করা হয়।

ইহার পর উক্ত ব্যাকটিরিয়ার কোষগুলিকে ভীষণ জোরে ঝাকুনি দিবার যন্ত্র ওয়ারিং ব্লেন্ডর (Waring blender)-এর সাহায্যে ঝাকুনি দেওয়া হয়। ইহার ফলে আটকানো ফাজগুলি ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর হইতে বিচ্যুত হয় এবং ইহার পর ব্যাকটিরিয়াগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে আলাদা করিয়া কৃষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধি পাইতে দিলে আক্রান্ত কোষ হইতে উৎপন্ন ভাইরাস অন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে এবং শেষে প্লেক্ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন প্লেকের সংখ্যা



চিত্র 7.10 হার্সে ও চেজ কৃত পরীক্ষার চিত্ররূপ—T_2 ফাজ DNA আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়া হইতে T_2 DNA সমন্বিত জনু গঠন করে। তেজস্ক্রিয় চিহ্নক (প্রোটিনের জন্য ^{35}S এবং DNA-এর জন্য ^{32}P) দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে ফাজের প্রোটিন আবরণী আক্রান্ত কোষ প্রবেশ করে না।

দেখিয়া আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা পাওয়া যায়। একই সময়ে ব্লেন্ডারে ঝাকুনি দেওয়ার পর সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে ব্যাকটিরিয়াগুলিকে আলাদা করা হয়। ইহার ফলে ব্যাকটিরিয়া যুক্ত ও ব্যাকটিরিয়া মুক্ত অংশ পাওয়া যায়। এই দুই অংশ তেজস্ক্রিয়তা মাপক যন্ত্রের (Counter) সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষায় লব্ধ ফল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

(1) ব্লেন্ডারে ঝাকুনির ফলে আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়া মধ্যে ফাজ উৎপাদন ব্যাহত হয় না। (2) ঝাকুনির ফলে 75-80% ^{35}S আক্রান্ত কোষ হইতে মুক্ত হয়। (3) ^{32}P-এর 20-35% ইহার ফলে মুক্ত হয়। ইহার ফলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আক্রমণের শুরুতেই ফাজের অধিকাংশ DNA ব্যাকটিরিয়া দেহে প্রবেশ করে এবং অধিকাংশ ফাজ প্রোটিন কোষের বাহিরে প্রাচীরে লাগিয়া থাকে। ব্লেন্ডারে ঝাকুনিতে লেজ

অংশে ভাঙিয়া আলাদা হইয়া যায়। এই ফাজ দেহে কোন DNA থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ফাজ দেহ উৎপাদনে ফাজ প্রোটিনের কোন কার্য নাই। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে ফাজ দেহের DNA উহার জীন বস্তু। DNA ব্যাকটিরিয়া দেহে প্রবেশের পর উক্ত DNA জীনগত ভাবে ক্রিয়াশীল হয় ও ফাজ দেহের বিভিন্ন প্রোটিন উৎপন্ন হয় (হেটারোক্যাটালিসিস) ও উক্ত DNA অণুর প্রতিলিপি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইবার পর উক্ত অংশগুলি সুসংবন্ধ হইয়া (অটো-ক্যাটালিসিস) পূর্ণ ফাজ গঠন করে।

ফাজ DNA অণুর এই জননগত ক্রিয়া আভেরি ও তাহার সহযোগীদের আবিষ্কৃত রূপান্তর পরীক্ষায় DNA অণুর ক্রিয়ার অনুরূপ।

শুধু ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস নয় সমস্ত উচ্চস্তরের জীবের ক্ষেত্রে DNA জীনবস্তু হিসাবে ক্রিয়াশীল। আগেই আলোচনা করা হইয়াছে যে শামুক লিমনিয়ার মাতৃজনিতার আবর্ত বৈশিষ্ট্য অপত্য জনুতে প্রকাশিত হয়। প্যারামেশিয়ামের ক্যাপা ফ্যাক্টর (Kappa) অনুরূপ একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাইটোপ্লাজমস্থিত DNA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণভাবে ইউক্যারিওট কোষের বংশগতি নির্ধারক DNA ক্রোমোসোমে অবস্থিত। ক্রোমোসোমস্থিত DNA যে জীনবস্তু তাহা প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব।

অতএব সাধারণ ভাবে বলা যায় যে DNA অণুই জীনবস্তু। তবে ক্ষেত্র-বিশেষে RNA অণুও জীনবস্তু হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা কয়েক শ্রেণীর ভাইরাসের ক্ষেত্রে সীমিত।

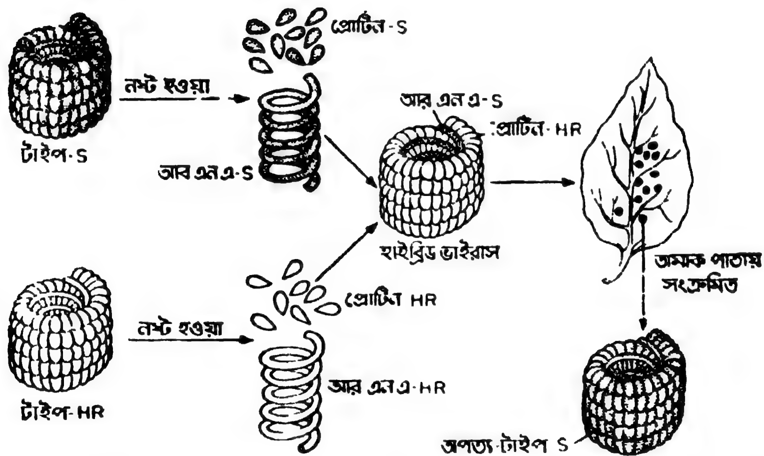
7.4 RNA অণু জীনবস্তু হিসাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে

আগেই প্রমাণিত হইয়াছে যে DNA জীনবস্তু এবং ইহার অটোক্যাটালিসিস ও হেটারোক্যাটালিসিস গত ক্রিয়ার ফলে জীনের দ্বিত্বভবন বা প্রতিলিপি প্রস্তুত ও ফিনোটাইপ নির্ধারণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বহু ভাইরাসের ক্ষেত্রে DNA এর পরিবর্তে RNA থাকে এবং ইহাদের ক্ষেত্রে RNA জীনবস্তু হিসাবে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে জীনগত কার্য RNA সমাধা করে। তামাকপাতার মোজাইক রোগ সৃষ্টিকারী TMV ভাইরাসের (Tobaco Mosaic Virus) ক্ষেত্রে RNA জীনবস্তু হিসাবে কাজ করে।

TMV-র গঠন : ইহার দেহ 95% প্রোটীন এবং 5% RNA দ্বারা গঠিত। ইহাকে অন্যান্য ভাইরাসের ন্যায় কেলাসে (Crystal) রূপান্তরিত করা যায়। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণে ইহাকে দণ্ডাকৃতি দেখায়। ইহার ব্যাস 18 mμ এবং দৈর্ঘ্য 300 mμ। রঞ্জন রশ্মি বিচ্ছুরণ (X-ray diffraction) ঘটাইয়া ইহার কেলাসের পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা 2130টি সমআকৃতি বিশিষ্ট প্রোটিন অণু দ্বারা গঠিত। 158টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত একটি পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খল

দ্বারা প্রতিটি প্রোটীন অণু গঠিত। এই প্রোটীন অণুগুলি পার্শ্বীয় ভাবে আয়নিক (Ionic) বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। এই বন্ধনী অ্যামাইনো অ্যাসিডের পার্শ্ব শৃঙ্খলে অবস্থিত, ফলে আকৃতিটি একটি ফাঁপা পাকানো নলের মত হয়। ফাঁপা অংশের ব্যাস 20A°। নলের দুইটি পাকের মধ্যবর্তী খাজে একসূত্র বিশিষ্ট নিউক্লিওটাইড (Single strand nucleotide) এবং 6400 নিউক্লিওটাইড দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট RNA অণু থাকে।

লঘু ক্ষার দ্রবণে TMV-র বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের (Basic amino acid) ধনাত্মক প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহার ফলে প্রোটিন উপএককগুলি (Subunits) খুলিয়া পড়ে। এই অবস্থায় তামাক পাতার কোষ আক্রমণের ক্ষমতা উহার থাকে না। যদি প্রশস্ত pH-এর মধ্যে আলাদা প্রোটিন উপএকক একত্রিত করা যায় এবং উহার সহিত বিশুদ্ধ TMV – RNA দেওয়া যায় তবে ভাইরাস পুনর্গঠিত হয় এবং শুধু তাহাই নহে, ইহার আক্রমণ ক্ষমতাও পুনরায় ফিরিয়া আসে।



চিত্র 7.11 বিভিন্ন TMV হইতে RNA ও প্রোটিন উপ-এককের উদ্ভব। একটি স্ট্রেনের RNA অন্য একটি স্ট্রেনের প্রোটিন উপ-এককের সহিত যুক্ত হইয়া সংকর RNA সৃষ্টি করে। সংকর TMV দ্বারা তামাক পাতা আক্রান্ত করিলে যে জনু পাওয়া যায় উহাতে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাহা উহার RNA নির্দেশিত অর্থাৎ উহা যে স্ট্রেনের প্রোটিন লওয়া হইয়াছিল তাহার অনুরূপ নহে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে TMV এর ক্ষেত্রে জীন বস্তু RNA।

একক বা আলাদাভাবে TMV প্রোটিনের কোন আক্রমণ ক্ষমতা থাকে না। 1956 খৃঃ ফ্রানকেল কনরাড্ প্রমাণ করেন যে কেবলমাত্র TMV-এর RNA অণুর সংক্রামণ ক্ষমতা আছে এবং ইহা অপত্য ভাইরাস উৎপাদন করে।

নানা গোষ্ঠীর TMV আছে। ইহাদের প্রোটিন আবরণীর মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রথমে ফ্রানকেল কনরাড দুইটি বিভিন্ন স্ট্রেনের TMV-র RNA ও প্রোটিন পৃথক করিয়া পরে উহাদের একটির প্রোটিনে অন্যটির RNA যুক্ত করিয়া TMV পুনর্গঠন করেন। পুনর্গঠিত TMV দ্বারা তামাক পাতায় মোজাইক রোগ সৃষ্টি করিতে দিলে দেখা যায় যে, যে স্ট্রেনের RNA পুনর্গঠিত TMVতে আছে সেই স্ট্রেনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী TMV ফিনোটাইপ উৎপন্ন হয়, প্রোটিন যে গোষ্ঠী হইতে লওয়া হইয়াছিল তাহার কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না (চিত্র 7.11)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে TMV-র ক্ষেত্রে জীনবস্তু RNA। RNAse উৎসেচক দ্বারা পুনর্গঠিত ভাইরাসকে পাচিত করিলে দেখা যায় যে ইহার আক্রমণ ক্ষমতা থাকে না।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কেবলমাত্র DNA জীনবস্তু নয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে RNAও জীনবস্তু হিসাবে ক্রিয়া করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবর্তন ও অভিযোজন

সময়ের স্রোতে আদি জীবনের সরলতা হইতে জটিলতার দিকে যে ক্রমিক উত্তরণ তাহাই বিবর্তন বা অভিব্যক্তি। জীবনের সৃষ্টি একবারই হইয়াছে। সৃষ্টির পর হইতে অনন্ত পথ পরিক্রমার পর আজ জীবনের প্রকাশ বহুমুখী। কিন্তু পরিক্রমা অব্যাহত। বিবর্তনের প্রমাণ এবং বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা এই অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে।

প্রতি জীব উহার পারিপার্শ্বিক ভৌত পরিবেশের সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশ ও জীব উভয়েই পরিবর্তনশীল। জীব নিজ ধর্ম অনুযায়ী পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। পরিবেশের সহিত সমতা বজায় রাখার জন্য জীবিত বস্তুর নানা প্রকার গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় রূপান্তর আসিয়া পড়ে। রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত সার্থক ও স্থায়ী পরিবর্তনকে অভিযোজন (Adaptation) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অভিযোজনজনিত পরিবর্তন ও পরিবর্তনগুলির প্রয়োজন সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের নবম অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ 8

বিবর্তন

8.1 বিবর্তন বা অভিব্যক্তি (Evolution)

ইংরাজী ইভোলিউশন শব্দের অর্থ **পরিবর্তন**। পার্থিব সবকিছুই পরিবর্তনশীল। অতীতের পৃথিবী আর বর্তমানের পৃথিবী এক নহে। পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেইরকম ভাবে সৌরমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মনুষ্য উদ্ভাবিত উড়োজাহাজ বা মোটরগাড়ী যে চেহারায় প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল এখন সেই চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে, জীবিত বস্তুরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

8.2 বিবর্তনের সংজ্ঞা

বিবর্তন বা অভিব্যক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল জীব-জগতের পরিবর্তন বা জীব অভিব্যক্তি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে **বর্তমানের প্রাণী ও উদ্ভিদ অতীত কালের প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিবর্তিত বংশধর**। অতীত কালের প্রাণী বা উদ্ভিদ আরও অতীত কালের প্রাণী বা উদ্ভিদের পরিবর্তিত বংশধর। এইভাবে অতীতের দিকে চলিলে জীবনসৃষ্টির আদি অবস্থায় পৌঁছান যায়। কিন্তু সেই আদি অবস্থা এখনো অজানা রহস্যে সম্পৃক্ত।

এখানে দুইটি শব্দ, **পরিবর্তিত** এবং **বংশধর** লক্ষ্যণীয়। মোটরগাড়ী বা উড়োজাহাজের প্রথম যে সংস্করণ বা মডেল (Model) ছিল তাহা এবং বর্তমানের মডেল সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে মডেলের পরিবর্তন সন্দেহাতীত। কিন্তু বর্তমানের মডেল অতীতের মডেলের পুত্র বা কন্যা নহে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বংশপরম্পরাজাত কোন সম্বন্ধ নাই। জীবিত বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা থাকায় অতীত এবং বর্তমানের জীবিত বস্তুর মধ্যে বংশপরম্পরাজাত সম্বন্ধ অতি স্পষ্ট। অজৈব এবং জৈব (inorganic and Organic) বস্তুর বিবর্তনের মধ্যে মূল পার্থক্য এইখানে।

8.3 বিবর্তনের ইতিহাস

বিবর্তন সম্পর্কীয় যে কোন আলোচনায় চার্লস ডারউইনের (Charles Darwin, 1809-82) নাম সর্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। বিবর্তনের সত্যতা ও পদ্ধতি হিসাবে ডারউইন যে মতবাদ রাখিয়াছেন (পুস্তকটির নাম Origin of Species by means of Natural Selection—প্রকাশকাল 1859 খ্রীষ্টাব্দ) তাহা চিন্তাবিদ্‌দের এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে ডারউইনের মতবাদ ও বিবর্তন প্রায় একীভূত হইয়া পড়ে।

কিন্তু জীব-জগতের পরিবর্তন বা বিবর্তন সম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসা বহু প্রাচীন কালেই সুরু হইয়াছিল। আদি মানুষের চিন্তাশক্তি উন্মেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। বিভিন্ন উদ্ভিদের

মধ্যে সমতা ও বৈষম্য এবং বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে সমতা ও বৈষম্য তাহার নজরে আসে। কিভাবে জীবিত বস্তুর মধ্যে সমতা ও বৈষম্যের উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধেও তাহার কিছু স্থূল ধারণা গড়িয়া উঠে। এই সমস্ত ধারণা অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির সহিত জড়িত। কিন্তু জীব-জগতের পরিবর্তনশীলতার অস্পষ্ট রূপরেখা এই সমস্ত ধারণার মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গ্রীক দার্শনিক **অ্যানাক্সিম্যান্ডার** (Anaximander) মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন মানুষ মাছ হইতে বিবর্তিত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন জলবাসী মাছ তাহাদের আঁইশের আবরণী ত্যাগ করিয়া স্থলবাসী হয় এবং মানুষে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ঘটনাটি যত সহজভাবে বলা হইয়াছে তত সহজে ঘটে নাই। তবে একথা অবিসম্বাদিত যে মাছ ও মানুষ বিবর্তনের সম্বন্ধপরতায় আবন্ধ।

জেনোফেনিস (Xenophanes) খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং বলেন ইহা একদা জীবিত প্রাণীর শিলীভূত অংশবিশেষ। স্থলে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্মের উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে-স্থলে এই জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে তাহা একদা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। তিন হাজার বৎসর পূর্বে জেনোফেনিসের ধারণার সহিত বর্তমানের ধারণার খুব একটা তফাৎ নাই।

বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনার আর একজন পুরোধা হইলেন গ্রীক দার্শনিক **এমপেডোক্লিস** (Empedocles)। তাঁহার বক্তব্য ছিল মাটি বা অজৈব পদার্থ হইতে প্রথমে উদ্ভিদ ও পরে প্রাণীর উদ্ভব হয়। সম্ভবত প্রাণিদেহের আংশিক বা অসম্পূর্ণ জীবাশ্ম হইতে তিনি অনুমান করেন সমগ্র প্রাণিদেহটি একেবারে সৃষ্টি হয় নাই। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা ভাবে গঠিত হয়। এই আলাদা অঙ্গগুলি যখনই সঠিকভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে তখনই সার্থক প্রাণিদেহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সার্থক সৃষ্ট প্রাণী ও তাহাদের বংশধররা ধরাতলে প্রাণীর সংখ্যা বাড়াইয়াছে। তবে অধিকাংশ সময়েই আলাদা আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সার্থক ভাবে সংস্থাপিত হইতে পারে নাই অথবা সংস্থাপনা সঠিক হয় নাই।



চিত্র 8.1 অ্যারিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব 384-322) জীবন-বিজ্ঞানের জনক।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সর্বকালের বরেণ্য গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (চিত্র 8.1) বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞান, বিশেষত জীব-বিজ্ঞানের নানান শাখায় তাঁহার মনীষার স্বাক্ষর রাখিয়া যান। বিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন প্রকৃতিতে বিভিন্ন বস্তুর বিন্যাস (Gradation) সুনির্দিষ্ট। ইহার সর্বনিম্ন ধাপে আছে অজৈব বস্তু (Inorganic substance)।

অজৈব বস্তুর রূপান্তরের (Metamorphosis) ফলে পৃথিবীতে জৈব বস্তু আসিয়াছে। জীব-জগতে তিন ধরনের জৈব বস্তু আছে। ইহাদের প্রথম স্তরে আছে উদ্ভিদ, দ্বিতীয় স্তরে রহিয়াছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাঝামাঝি কিছু না প্রাণী না উদ্ভিদ (Plant animal) এবং শেষ স্তরে আছে প্রাণী। স্পঞ্জ, সী অ্যানিমোন (Sponge, Sea anemone) ইত্যাদি তাঁহার ধারণা অনুযায়ী প্রাণী ও উদ্ভিদের একটি মাঝামাঝি দশা। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলেন ইহাদের বোধশক্তি অত্যন্ত প্রবল।

অ্যারিস্টটলের পর হইতে **ল্যামার্কের** (Lamarck, 1744-1829) সময় পর্যন্ত প্রায় 2000 বৎসরের মধ্যে বিবর্তন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার উন্নতির কথা কিছু জানা যায় নাই। আসলে এই সময়ে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে প্রকৃত অর্থে 'বিজ্ঞান' হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়টি মূলত তথ্য সন্ধানে অতিবাহিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পরই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সুরু। ল্যামার্কের পর হইতেই বিবর্তন জীব-বিজ্ঞানের এক তথ্যনির্ভর প্রয়োজনীয় শাখা হিসাবে পরিগণিত হয়।

8.4 বিবর্তনের প্রতিপাদ্য বিষয়

বিবর্তনমূলক আলোচনায় দুইটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়—একটি হইল বিবর্তনের **প্রমাণ** (Evidence) বা সত্যতা এবং অন্যটি হইল বিবর্তনের **পদ্ধতি** (Process) বা কিভাবে জীব-জগতে বিবর্তন আসিয়াছে।

A. বিবর্তনের প্রমাণ (Evidences of Evolution)

সৃষ্টির পর হইতে কোটি কোটি বৎসরের পরিক্রমার মধ্যে জীব-জগতে যে মন্থর অথচ ধারাবাহিক পরিবর্তন হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে। আলাদাভাবে এই সমস্ত প্রমাণের একটি বা দুইটি প্রমাণ হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা যথেষ্ট নহে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত প্রমাণ বিবর্তনের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। বিবর্তনের প্রমাণসমূহ নিম্নোক্তরূপ—

I. **অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ** (Morphological evidence)

II. **শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত প্রমাণ** (Evidence from classification)

III. **ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ** (Embryological evidence)

IV. **জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ** (Evidence from fossils)

V. **ভৌগলিক সংস্থান নির্দেশিত প্রমাণ** (Evidence from geographical distribution)

VI. **প্রাণ রসায়নঘটিত প্রমাণ** (Evidence from Biochemistry)

VI **রক্তের সম্বন্ধপরতা নির্দেশিত প্রমাণ** (Serological evidence)

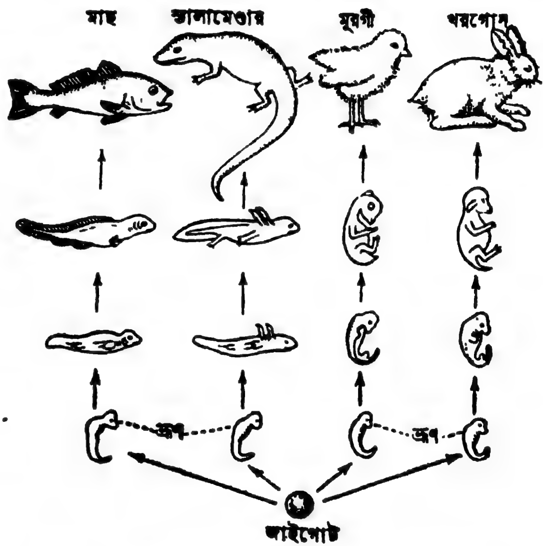
VIII গৃহপালিত জীবজন্তু নির্দেশিত প্রমাণ (Evidence from domestication of living organisms)

বর্তমান আলোচনায় সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত না করিয়া প্রধান চারিটি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। ভৌগোলিক সংস্থান নির্দেশিত প্রমাণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে।

A. ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ (Embryological evidences)

প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীদের মধ্যে অঙ্গ সংস্থাপনায় প্রচুর সমতা দেখা যায়। আবার ভ্রূণ অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণী বিশেষত মেরুদণ্ডীদের মধ্যে প্রচুর সমতা দেখা যায়। সেই হিসাবে দেখিলে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার সমতা এবং ভ্রূণ অবস্থার সমতা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কেন না ভ্রূণ অবস্থার গঠনমূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়া পূর্ণ গঠিত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের মধ্যে এত বেশী সমতা থাকে যে ভ্রূণগুলিকে প্রথমাবস্থায় আলাদা করিয়া চিনিয়া লওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রাণীর ভ্রূণগুলির মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় সমতা এত বেশী যে উহাদের একত্রে রাখিয়া দিলে কোনটি সরীসৃপের, কোনটি বা স্তন্যপায়ীর তাহা সহজে বাহির করা যায় না। পূর্ণগঠিত পাখী, সরীসৃপ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে তফাৎ থাকিলেও ভ্রূণ অবস্থায় ইহারা প্রত্যেকে প্রায় একই রকমের (চিত্র 4.2)।



চিত্র 4 2 বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ ব্যক্তিজনির প্রথমাবস্থায় দেখিতে প্রায় এক প্রকার।

উভচরের ভ্রূণের ব্যাঙাচি দশায় ফুলকা (Gill) থাকে। ফুলকা পূর্ণবয়স্ক মৎস্যের প্রয়োজনীয় শ্বসন অঙ্গ। সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণদশায় ফুলকা ও ফুলকা ছিদ্র থাকে। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে ভ্রূণতত্ত্ব হইতে ভ্রূণের সমতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি সাধারণ সত্য পাওয়া যায় :

a. ক্রাসতেশিয়া শ্রেণীর সকল সন্ধিপদ প্রাণী নপলিয়াস (Nauplius) লার্ভা রূপে জীবন সুরু করে।

b. প্রায় সকল একনালী প্রাণীদের প্লানুলা লার্ভা (Planula larva) থাকে।

c. অঙ্গুরীমাল পর্ব এবং শম্বুক পর্বের অনেক সভ্যের জীবনের সুরু হয় ট্রোকোফোর (Trochophore) লার্ভা রূপে।

d. উভচরের ব্যাঙাচি দশা পরিণত মৎস্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

e. সকল মেরুদণ্ডীর হৃৎপিণ্ডের গঠন একই ভাবে সুরু হয়।

f. যে সমস্ত মেরুদণ্ডী ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় করে (যথা—উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী) তাহাদের সকলেরই ভ্রূণ দশায় ছয় জোড়া অ্যাওর্টিক আর্চ (Aortic arch) থাকে।

g. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের উৎপত্তি একই রকম। প্রায় সকল ক্ষেত্রে পৃষ্ঠদেশীয় এক্টোডার্ম **নিউরাল প্লেটে** (Neural plate) পরিণত হয়। নিউরাল প্লেটে ক্রমে **নিউরাল গ্রুভ** (Neural groove) এবং পরিশেষে **নিউরাল টিউবে** (Neural tube) রূপান্তরিত হয়। সরল নিউরাল টিউব হইতে জটিল মস্তিষ্কের উদ্ভব হয়।

h. মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় মানবশিশুর দেহের সর্বত্র কোমল লোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই অবস্থার নাম **লানুগো** (Lanugo)।

i. ভ্রূণদশায় মানুষের সংক্ষিপ্ত লেজের উদ্ভব হয়। যদিও বিরল তথাপি কখনও কখনও মানুষের লেজ থাকে।

j. সরীসৃপ, পক্ষীকুল ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণাবস্থায় প্রোনেফ্রস, মেসোনেফ্রস ও মেটানেফ্রস ধরনের বৃক্কের ক্রমিক পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়।

k. মেরুদণ্ডের কশেরুকার উৎপত্তি একই উৎস হইতে হয় এবং একইভাবে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে উহা গঠিত হয়।

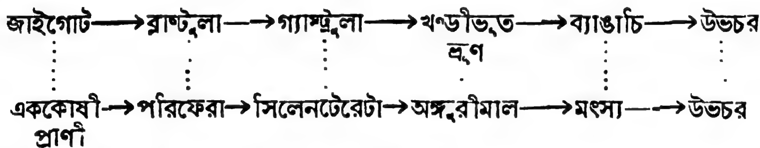
এখন প্রশ্ন হল গঠন সময়কালীন অবস্থা বা ভ্রূণ অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে (প্রোটোজোয়া ব্যতীত) এত সমতা থাকার কারণ কি ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত ও লুপ্ত প্রাণী পরস্পরের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। পূর্ণ-গঠিত দুই বিভিন্ন পর্বের বা শ্রেণীর প্রাণীকে দেখিতে আলাদা হইলেও ইহাদের ভ্রূণের প্রাথমিক গঠন অভিন্ন। এই অভিন্ন অবস্থা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই কথা বলা যায় যে প্রাণী দুইটি একই পূর্বপুরুষ হইতে বিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। পূর্বপুরুষের ভ্রূণ অবস্থার দশাগুলি উভয়েরই ভ্রূণ দশার মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু প্রাণী দুইটির বিবর্তনের ধারা ভিন্ন হওয়ায় তাহারা পূর্বপুরুষ হইতে এবং পরস্পর হইতে ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভ্রূণ দশায় তাহারা সেই পূর্বপুরুষের ভ্রূণ দশাকে খুব দ্রুত এবং সংক্ষেপিত রূপে স্মরণ (Recapitulation) করে। দুইটি প্রাণীর বৈসাদৃশ্য যত বেশী ইহাদের ভ্রূণ অবস্থার সাদৃশ্য থাকিবার সময়টি সেই অনুপাতে তত কম।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডীর ভ্রূণের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানী হেকেল [Haeckel, 1834-1919 (চিত্র 8.3)] একটি মতবাদ প্রচার করেন। মতবাদটিকে **বায়োজেনেটিক ল** (Biogentic law) বা **রিক্যাপিচুলেশন তত্ত্ব** (Recapitulation theory) বলা হয়। এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে, একটি প্রাণী নিজস্ব বিভিন্ন ভ্রূণ দশার মধ্য দিয়া উহার সকল পূর্বপুরুষের প্রাপ্তবয়স্ক দশাকে স্মরণ করে বা এক কথায় **ব্যক্তিজনি** (Ontogeny) **জাতিজনিকে** (Phylogeny) **স্মরণ করে** (Ontogeny repeats phylogeny)। যে কোন প্রাণীর ভ্রূণ দশার মধ্যে ইহার পূর্বপুরুষদের প্রাপ্তবয়স্ক দশা খুব দ্রুত এবং সংক্ষেপিত রূপে প্রতিফলিত হয়। ব্যাঙের পরিস্ফুরণ দশায় কিভাবে ইহা পূর্বপুরুষদের সকল দশাকে স্মরণ করে তাহা 8.4 চিত্রে দেখান হইয়াছে।



চিত্র 8.3 হেকেল—রিক্যাপিচুলেশন তত্ত্বের প্রবর্তক।

হেকেলের মতবাদ অভিব্যক্তির স্বপক্ষে ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করে। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন মেরুদণ্ডীদের ভ্রূণাবস্থায় সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম আছে :—



চিত্র 8.4 ব্যাঙের ব্যক্তিজনি-পরিস্ফুরণের সহিত জাতিজনির সম্পর্কের রূপরেখা দেখান হইয়াছে।

a. **থাইমাস গ্রন্থির উৎপত্তি** (Development of Thymus gland) : বিভিন্ন মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে থাইমাস গ্রন্থির উৎস ভিন্ন। রিক্যাপিচুলেশন তত্ত্বানুসারে বিভিন্ন মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে একই গ্রন্থির উৎস একই হওয়া বিধেয়।

b. **দাঁত ও জিহ্বার উৎপত্তিগত সম্পর্ক** (Developmental relationship between tooth and tongue) : মানুষের ক্ষেত্রে জিহ্বার পরিস্ফুরণ দাঁতের আগেই সংগঠিত হয়। কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক বিপরীত।

c. **প্রাথমিক জনিস্তরের পরিস্ফুরণ ক্ষমতা** (Development potencies of primary germ layers) : হেকেলের অভিমত অনুসারে মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গ তিনটি প্রাথমিক জনিস্তর (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম) হইতে একইভাবে উদ্ভূত হয়। ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। কিন্তু অধুনা ভ্রূণতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বাভাবিক পরিস্ফুরণের ধারার পরিবর্তন সম্ভব।

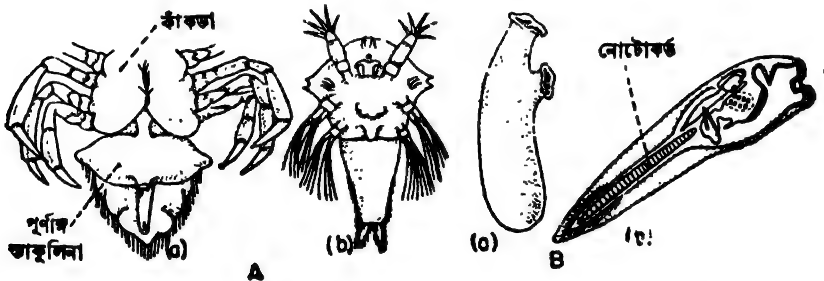
d. কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে [যথা : পেট্রোমাইজন (*Petromyzon*), লেপিডোসাইরেন (*Lepidosiren*) এবং অস্থিময় মাছ (Teleost)] ভ্রূণাবস্থায় মস্তিষ্কের উদ্ভব ভিন্নরূপ।

e. বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা ওয়াডিংটন (Wadington) প্রমাণ করিয়াছেন যে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী ভ্রূণাবস্থায় তিন প্রকার বৃক্কের (প্রোনেফ্রস, মেসোনেফ্রস ও মেটানেফ্রস) ক্রম-পরিস্ফুরণ পূর্বপুরুষদের প্রাপ্তবয়স্ক দশাকে স্মরণ করে না। স্বাভাবিক পরিস্ফুরণের জন্য এই ধরনের ক্রমিক পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন।

f. তিমির পূর্বপুরুষের পশ্চাৎপদ ছিল। কিন্তু তিমির ভ্রূণাবস্থায় পশ্চাদপদের কোন চিহ্ন থাকে না।

হেকেলতত্ত্বের বর্তমান অবস্থা (Modern status of Haeckel's theory)

বর্তমানে হেকেলের মতবাদ লইয়া অনেক বিতর্ক আছে। অনেকেই হেকেল-তত্ত্বের সত্যতা স্বীকার করেন না। একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণ একই রকম। কিন্তু কোন প্রাণীর ব্যক্তিজনি কখনই তাহার জাতিজনিকে স্মরণ করে না। কোন প্রাণীর ব্যক্তিজনি জাতিজনির ভ্রূণাবস্থাকে স্মরণ করে অর্থাৎ



চিত্র 8.5 স্যাকুলিনা (A) এবং অ্যাসিডিয়ার (B) পূর্ণাঙ্গ (a) ও লার্ভা (b) দশা। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রাণিসর্গে উভয়ের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও লার্ভা দশায় উহাদের সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ সম্ভব।

জাইগোট হইতে পরিস্ফুরণেকালে কোন একটি প্রাণী ভ্রূণ দশার মধ্য দিয়া তাহার পূর্বপুরুষদের ভ্রূণ দশাকে স্মরণ করে এবং কখনই পূর্বপুরুষদের প্রাপ্তবয়স্ক দশাকে স্মরণ করে না। হেকেলের মতবাদকে একটি ঘটনারূপে ধরা যাইতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে প্রতিস্থাপনে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। জাতিজনিগত যোগসূত্র থাকার জন্য প্রাণীদের ভ্রূণদশায় সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক।

তর্কবিতর্কের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া হেকেলতত্ত্বকে অন্য দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে জীব অভিব্যক্তির সত্যতা নিরূপণে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম।

1. হেকেলের মতবাদ ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনাকে তীব্রগতি আনিয়া দিয়াছে।
2. ইহা জীব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেয়।

ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনার সুফল হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসের কয়েকটি অসুবিধা দূর হইয়াছে। স্যাকুলিনা (*Saculina*), অ্যাসিডিয়া (*Ascidia*) প্রভৃতি প্রাণীর (চিত্র 8.5) সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ এই মতবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে ত্বরান্বিত হইয়া পড়ে।

B. জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ

বিবর্তনের স্বপক্ষে যত প্রমাণ আছে তাহাদের মধ্যে জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা সময়ের সঙ্গে জীবিত বস্তুর ক্রমিক পরিবর্তন সম্বন্ধে নির্ভুল সাক্ষ্য দেয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট না হইলেও জীবাশ্মগুলি জীবিত বস্তুর ক্রমিক প্রগতি ও জটিলতাকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করে।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা সকলে জীবিত নাই। বর্তমানের অনেক প্রাণী অতীতে ছিল না আবার অতীতের অনেক প্রাণী বর্তমানে বাঁচিয়া নাই। সুদূর অতীতের প্রাণীদের সামগ্রিক বা অংশবিশেষ যাহা বর্তমানে পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায় তাহাকে **জীবাশ্ম** (Fossil) বলে।

জীবাশ্ম প্রধানতঃ চারিপ্রকার, যথা—

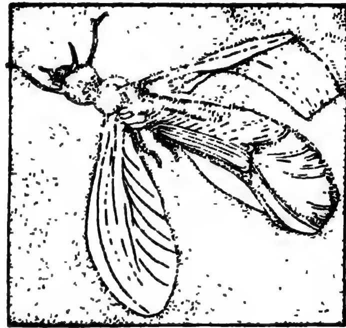
1. **পেট্রিফায়েড জীবাশ্ম** (Petrified fossil),
2. **পচন নিরোধিত অটুট জীবাশ্ম** (Preservation intact),
3. **ছাঁচ** (Cast or Mould
4. **ছাপ** (Imprint) ।

কোন প্রাণীর মৃত্যু হইলে দেহের নরম অংশগুলি শটনকারী (Decomposers) ব্যাক্টিরিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলে। অস্থি, খোলক ইত্যাদি দেহের শক্ত অংশগুলির উপর শটনকারীদের ক্রিয়া শ্লথগতিতে চলে। অনেক সময় দেহটি মৃত্যুর সংগেই মাটি চাপা পড়িয়া এমন পরিবেশের মধ্যে চলিয়া আসে যে ইহা পুরোপুরি নষ্ট হইতে পারে না। জলবাসী প্রাণীর জলে মৃত্যু হইলে এবং স্থলবাসী প্রাণীর হাড় বা খোলক বন্যার সময় নদীতে পড়িলে উহাদের নদী হইতে জলবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। জলে নিমজ্জিত থাকিলে ঐ সমস্ত শক্ত দেহগঠকগুলির পুরোপুরি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। হাড় বা খোলকের জৈব সংগঠকগুলি (Organic matter) স্বাভাবিক নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া হাড় বা খোলকে অনেক ছিদ্রের সৃষ্টি করে। ঐ ছিদ্রপথে জল অবিরত যাওয়া আসা করে এবং ছিদ্রগুলিতে ধীরে ধীরে জলে দ্রব খনিজ পদার্থ বিশেষত ক্যালসিয়াম (Calcium) এবং সিলিকন (Silicon) জমা হয়। হাড় বা খোলকের অজৈব পদার্থগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। আবার অনেক সময় হাড় বা খোলকের সংগঠক সমস্ত অণুর স্থানে অন্য অণু বিশেষত সিলিকন অণু আসিয়া পড়ে। এইভাবে পেট্রিফায়েড (Petrified) জীবাশ্মের সৃষ্টি হয় (চিত্র 8.6)।

• জীবাশ্ম সংক্রান্ত বিদ্যাকে প্রত্নজীববিদ্যা (Palaeontology) বলে।

ভূত্বকে পাললিক শিলা (Sedimentary rocks) স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। গ্রানাইট পাথরের (Granite) ভিত্তির উপর এই স্তরগুলি সজ্জিত। নদী বা বাতাস বাহিত মাটি, বালি ইত্যাদি অগভীর সমুদ্রে বা হ্রদে হাজার হাজার বছর ধরিয়া জমা হয়। মৃত সামুদ্রিক প্রাণীর হাড় বা খোলক এই মাটি বা বালির সহিত যুক্ত হয়। নদী বাহিত হইয়া স্থলচর প্রাণীর হাড়, খোলক ইত্যাদিও আসে। পাললিক মাটি স্তূপাকারে সজ্জিত হয়। স্তূপীকৃত এই পাললিক মাটি নিজের চাপে কঠিন পাললিক শিলায় পরিণত হয় এবং পাললিক শিলার স্তর সৃষ্টি করে। প্রতি স্তরেই কিছু না কিছু প্রাণীর হাড় বা খোলক পেট্রিফায়েড জীবাশ্মরূপে উপস্থিত থাকিতে পারে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Grand canyon) রূপে পরিচিত কলরেডো নদীর খাতে পাললিক





চিত্র 3.6 জীবাশ্ম—জীব অভিব্যক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। A = ট্রাইলোবাইট নামক সন্ধিপদ প্রাণীর পেট্রিফায়েড জীবাশ্ম, B = গাছের আঠায় আবদ্ধ পতঙ্গের সামগ্রিক জীবাশ্ম।

শিলার স্তরগুলি সুন্দরভাবে দেখা যায়। কিন্তু ভূত্বকের সর্বত্র পাললিক স্তর বয়স অনুযায়ী একের উপর অন্যটি পর পর সজ্জিত থাকে না। ভূমিক্ষয় (Erosion), ভূমিকম্প, পর্বত সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে পাললিক শিলার বয়স অনুযায়ী স্তরবিন্যাস বিঘ্নিত হয়। ভূতাত্ত্বিকগণ পাললিক শিলার পাঁচটি প্রধান স্তর চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রতিটি স্তর সৃষ্টি হইতে কত সহস্র বছর লাগিয়াছে তাহাও মোটামুটি ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। একটি স্তর সৃষ্টিতে যত সময় লাগিয়াছে সেই সময়কে **মহাযুগ** বা **এরা** (Era) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি মহাযুগকে আবার একাধিক **যুগ** বা **পিরিয়ডে** (Period) ভাগ করা হইয়াছে। মহাযুগ, যুগ এবং কোন কোন জীবিত বস্তু ঐ সময়ে পাওয়া গিয়াছিল তাহার ভূতাত্ত্বিক সময় তালিকায় দেওয়া হইল।

একটি নির্দিষ্ট পাললিক শিলার স্তরের বয়স জানিবার জন্য একাধিক পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল বলিয়া মনে করা হয় **ইউরেনিয়াম-লেড (Uranium-Lead) পদ্ধতিকে**। তেজস্ক্রিয় (Radio-active) ইউরেনিয়াম অস্থায়ী। ইহা তেজস্ক্রিয়তা হারাইয়া ক্রমে স্থায়ী লেড বা বা সীসায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের শতকরা

1 ভাগের স্হায়ী সীসায় পরিণত হইতে 6,60,00,000 বৎসর সময় লাগে। যে স্তরের বয়স নির্ণয় করিতে হইবে সেই স্তরে ইউরেনিয়াম ও সীসার তুলনামূলক পরিমাণ জানা থাকিলে ঐ স্তরের বয়স নির্ধারণ করা যায়। জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের আর একটি উল্লেখ্য পদ্ধতি হইল **তেজস্ক্রিয় কার্বন** (Radio-active Carbon or ^{14}C) পদ্ধতি। প্রত্যেক জীবিত বস্তুর কার্বনের প্রয়োজন হয়। জীবিত বস্তুরা জৈবিক প্রয়োজনে পরিবেশ হইতে যে কার্বন গ্রহণ করে তাহার কিছু অংশ তেজস্ক্রিয়। জীবিত বস্তুর মৃত্যুর পর তৎকর্তৃক গৃহীত তেজস্ক্রিয় কার্বন ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয়তা হারাইয়া সাধারণ নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে তেজস্ক্রিয় কার্বনের 50 শতাংশ 5,760 বৎসরে সাধারণ নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। সুতরাং কোন জীবাশ্মের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ও সাধারণ নাইট্রোজেনের অনুপাত জানা থাকিলে জীবাশ্মটির বয়স নির্ধারণ সম্ভব। তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে 44 হাজার বা তদূর্ধ্ব বয়সের জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা যায়। সাম্প্রতিক কালের জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণে এই পদ্ধতি কার্যকরী।

এখন ভূত্বকের পাললিক শিলার স্তরগুলির বয়স জানা আছে। যদি মনে করা যায় যে ভূস্তরের সজ্জা বিঘ্নিত হয় নাই তাহা হইলে কোনও স্তরে কোনও জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইলে স্তরটির বয়স যত হইবে জীবাশ্মটির বয়সও তত হইবে। আবার ভূস্তরের সজ্জার পরিবর্তন হওয়ার ফলে কোন জীবাশ্মের স্তরচ্যুতি ঘটিলেও জীবাশ্মটির বয়স তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত পদ্ধতিতে জানা সম্ভব। যদি ভূত্বকের পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরে পাওয়া জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করা যায় অথবা জীবাশ্মগুলিকে যদি বয়স অনুযায়ী পর পর সাজানো যায় তাহা হইলে জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাইবে। একটি স্তরে যে জীবাশ্ম পাওয়া যায় ঠিক তাহার উপরের স্তরের জীবাশ্মগুলির সহিত সেই জীবাশ্মের অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার অর্থ ঐ দুইটি স্তর সৃষ্টি হইতে যত সময় লাগিয়াছে সেই সময়ের মধ্যে জীবিত বস্তুদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। আবার বিভিন্ন স্তরে পাওয়া একই প্রাণীর জীবাশ্মগুলি যদি বয়স অনুযায়ী সজ্জিত করা যায় তাহা হইলে সময়ের সঙ্গে ঐ প্রাণীগুলির পরিবর্তন বা বিবর্তন সহজেই বোঝা যায়। হাতী, ঘোড়া বা উটের যে সমস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে সেগুলি বয়স অনুযায়ী সজ্জিত করিলে ঐ সকল প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে (চিত্র 8.8)।

পেটিফ্র্যাকসান ছাড়াও অন্য নানা ভাবে জীবাশ্মের সৃষ্টি হইতে পারে। কখনও কখনও কোনও প্রাচীন প্রাণী সামগ্রিকভাবে পচন নিরোধিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া জীবাশ্ম রূপে উপস্থিত থাকিতে পারে। সাইবেরিয়ার বরফ স্তূপে পাওয়া ম্যামথ (Mammoth) হাতীর এক পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম (চিত্র 8.7 A)। গাছের আঠায় অক্ষত অবস্থায় অনেক পতঙ্গের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে [Insect in amber (চিত্র 8.6B)]। এই সমস্ত জীবাশ্মকে **পচন নিরোধিত অটুট জীবাশ্ম** (Preservation intact) বলা হয়। ইহা ছাড়াও প্রাণীদের দেহ ও পায়ের ছাপ (Imprint), গর্তবাসী

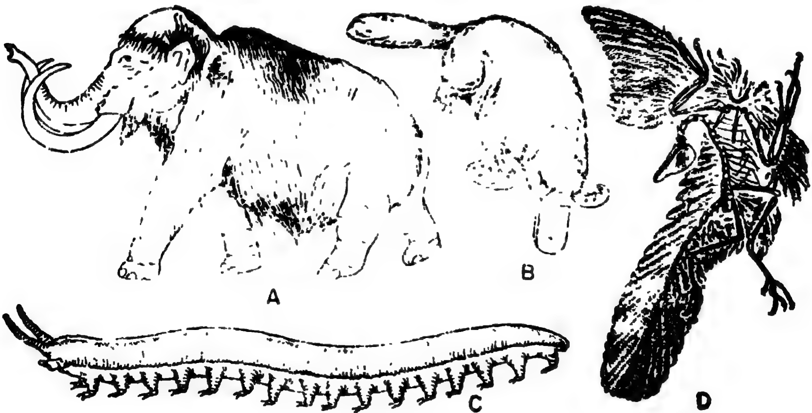
ভূতাত্ত্বিক সময় তালিকা

মহাযুগ (Era)	যুগ (Period)	ইপোক (Epoch)	প্রাণী জীবন
কেনোজোয়িক (Cenozoic) স্থায়িত্বকাল —6 কোটি বছর	কোয়াটারনারী (Quaternary)	রিসেন্ট (Recent)	মানুষের প্রাধান্য।
		প্লিস্টোসিন (Pleisto-cene)	অতিকায় কিছু স্তন্যপায়ীর বিলুপ্তি। নানা প্রাণীর বিস্তার।
		প্লিওসিন (Pliocene)	মানুষের উদ্ভব। স্তন্যপায়ীদের প্রতিষ্ঠা। সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী অধিকাংশই বর্তমানের ন্যায়।
		মিওসিন (Miocene)	উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্তন্যপায়ীদের প্রতিষ্ঠা। অ্যানথ্রোপয়েডরা (Anthrepoids) উন্নতির সোপানে।
		অলিগোসিন (Oli-gocene	সরীসৃপ শ্রেণীর কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদির প্রাধান্য। স্তন্যপায়ীর বিবর্তন বর্তমানের দিকে নির্দেশিত। পতঙ্গ শ্রেণী বর্তমানের ন্যায়।
		ইওসিন (Eocene)	বর্তমানের পক্ষী শ্রেণীর উদ্ভব। স্তন্যপায়ীরাই শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত। তিমি জলে অভিযোজিত।
মেসোজোয়িক (Mesozoic) স্থায়িত্ব কাল—12·5 কোটি বছর	ক্রিটেশিয়াস (Cretaceous)		অমরায়ুক্ত স্তন্যপায়ীর শুরু। অতিকায় সরীসৃপ এবং দাঁতসমন্বিত পক্ষীর বিলুপ্তি, ক্যাঙ্গারুদের আধিপত্য ও দিকে দিকে বিস্তার।
	জুরাসিক (Jurrasic)		অতিকায় সরীসৃপদের প্রাধান্য। দাঁত সমন্বিত পক্ষীর উদ্ভব। টিকটিকি ও কুমীর জাতীয় প্রাণীর প্রথম উপস্থিতি। উভচর ছোট আকারের।
	ট্রায়াসিক (Triassic)		প্রাচীন উভচরদের অবলুপ্তি। সরীসৃপদের প্রাধান্য। ডিম্ব প্রসবকারী এবং সরীসৃপ-সদৃশ স্তন্যপায়ীদের (Reptile-like mammals) উদ্ভব।

মহাযুগ (Era)	যুগ (Period)	ইপোক (Epoch)	প্রাণী জীবন
প্যালিও জোয়িক (Palaeo-zoic)—35 কোটি বছর স্থায়িত্বকাল	পারমিয়ান (Permian)		ট্রাইলোবাইট ও অস্ট্রাকোডামের বিলুপ্তি। স্তন্যপায়ীর আবির্ভাবের সূচনা। প্রাচীন উভচররা অবলুপ্তির পথে।
	পেনসিলভেনিয়ান (Pensyl-vanian)		অতিকায় পতঙ্গের উপস্থিতি। সরীসৃপ শ্রেণীর উপস্থিতি। উভচরদের সংখ্যাধিক্য অতিকায় হাঙ্গরের উপস্থিতি। কণ্টকত্বকের প্রাধান্য।
	মিসিসিপিয়ান (Mississipian)		মৎস্যকুলের বহুমুখীতা। অতিকায় হাঙ্গর। ফুসফুসধারী মাছ (Lung fish) ও উভচরদের আবির্ভাব।
	ডেভোনিয়ান (Devonian) সিলুরিয়ান (Silurian)		সামুদ্রিক মাছ—অস্ট্রাকোডার্ম ও প্যাকোডার্মের প্রাধান্য। অতিকায় বিছার উপস্থিতি মিলিপেড ও ডানাহীন পতঙ্গের উদ্ভব। বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রাহকের প্রথম উৎপত্তি।
	অরডোভিসিয়ান (Ordovician)		ট্রাইলোবাইটদের বিলুপ্তি। মিঠা জলের মাছের সৃষ্টি। শম্বুক ও কণ্টকত্বক প্রাণীর বিস্তার।
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		প্রায় সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণী সুপ্রতিষ্ঠিত। অতিকায় শামুক ও কেফালোপড (Cephalopod)।
প্রোটেরো-জোয়িক (Protero-zoic) স্থায়িত্ব—90 কোটি বছর			আবরণীযুক্ত প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণী, স্পঞ্জ ও সিলেনটারেটা পর্বের প্রাণী।
আর্কিও-জোয়িক (Archeo-zoic) স্থায়িত্ব—50 কোটি বছর			জীবাশ্ম নাই।

প্রাণী যে গর্তে বাস করে সেই গর্তের ছাঁচ (Cast), **প্রাণীর বিষ্ঠা** (Coprolite) ইত্যাদিও জীবাশ্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। অভিব্যক্তিবিদ্‌গণ মনে করেন একটি পর্ব-বিবর্তনের মাধ্যমে ইহার ঠিক উপরের পর্বের সৃষ্টি করে। জীবাশ্ম হইতে এই ধারণার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও এই ধরনের নিদর্শনের প্রাচুর্য নাই। দুই নিকটবর্তী পর্ব বা দুই নিকটবর্তী শ্রেণীর মধ্যবর্তী দশার এই ধরনের জীবাশ্মকে **সংযোগকারী যোগসূত্র** (Connecting links) বলা হয়। অভিব্যক্তিবিদ্‌গণ মনে করেন সরীসৃপ শ্রেণী হইতে বিবর্তন মাধ্যমে পক্ষী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। জার্মানির বেভেরিয়া অঞ্চল হইতে আরকিওপটেরিক্স নামক এক পক্ষীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। এই জীবাশ্মটির মধ্যে কয়েকটি চরিত্রলক্ষণ (যথা—দাঁত, ডানায় নখর ইত্যাদি) সরীসৃপ শ্রেণীর ন্যায় আবার কয়েকটি চরিত্রলক্ষণ (যথা—ডানা, পালক, হাড়ের সংস্থাপনা ইত্যাদি) বর্তমান পক্ষীর ন্যায়। আরকিওপটেরিক্সকে (*Archaeopteryx*) সেই কারণে সরীসৃপ হইতে পক্ষী উদ্ভবের এক দশা বা সংযোগকারী যোগসূত্র বলিয়া মনে করা হয় (চিত্র 8.7 D)।

জীবাশ্ম না হইলেও কতকগুলি জীবিত প্রাণী পর্ব হইতে পর্বের বা শ্রেণী হইতে শ্রেণীর উদ্ভবের নিদর্শন হিসাবে বর্তমান আছে। ইহাদের "জীবন্ত জীবাশ্ম" (Living fossil) বলা হয়। পেরিপেটাস (Peripatus) এই ধরনের একটি জীবন্ত জীবাশ্ম (চিত্র 8.7 C)। ইহার চরিত্রলক্ষণের কতকগুলি অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীর



চিত্র 8.7 A = ম্যামথ, B = প্লাটিপাস ; C = পেরিপেটাস—B ও C 'জীবন্ত জীবাশ্ম' এবং D = আরকিওপটেরিক্স।

ন্যায় আবার কতকগুলি সন্ধিপদ পর্বের প্রাণীর ন্যায়। ইহাদের মধ্যে অঙ্গুরীমাল পর্ব হইতে সন্ধিপদ পর্বের উদ্ভবের মধ্যবর্তী দশা বর্তমান। প্লাটিপাস (*Platypus*) এই ধরনের এক জীবন্ত জীবাশ্ম। ইহা নিম্নস্তরের এক স্তন্যপায়ী। ইহার কিছু চরিত্রলক্ষণ সরীসৃপ শ্রেণীর ন্যায় আবার কিছু চরিত্রলক্ষণ স্তন্যপায়ীর ন্যায়।

সরীসৃপ শ্রেণী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মধ্যবর্তী একটি দশা ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের বিবর্তনের জীবন্ত সাক্ষী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরে পাওয়া জীবাশ্মগুলি বিবর্তনের প্রমাণ হিসাবে নিম্নোক্ত সাক্ষ্য প্রদান করে :

1. সময়ের সঙ্গে প্রাণীদের আকৃতি ও গঠনগত পরিবর্তন আসিয়াছে।

2. প্রারম্ভিক যুগের প্রাণী গঠনের দিক দিয়া বর্তমান যুগের প্রাণী অপেক্ষা সরল (Simple) ছিল। সময়ের প্রবাহের সঙ্গে গঠনগত জটিলতা আসিয়াছে।

চিত্র 8.4 ঘোড়ার বিবর্তন দেখান হইয়াছে। ঘোড়ার পূর্বপুরুষের অগ্রপদে ও পশ্চাৎপদে যথাক্রমে চারিটি ও তিনটি অঙ্গুলি ছিল। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ধারায় অঙ্গুলির সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আধুনিক ঘোড়ার কেবলমাত্র একটি অঙ্গুলি আছে।

3. দুই পর্ব বা শ্রেণী মধ্যবর্তী দশার প্রাণী বিবর্তনের ধারাবাহিকতার পরিচায়ক।

4. ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ইয়োহিপ্পাস (*Eohippus*) বা হাতীর পূর্বপুরুষ ময়রিথেরিয়ামের (*Moeritherium*) বিবর্তনজনিত বিভিন্ন দশা জীবাশ্মগুলির মধ্যে স্পষ্ট (চিত্র 8.8)।

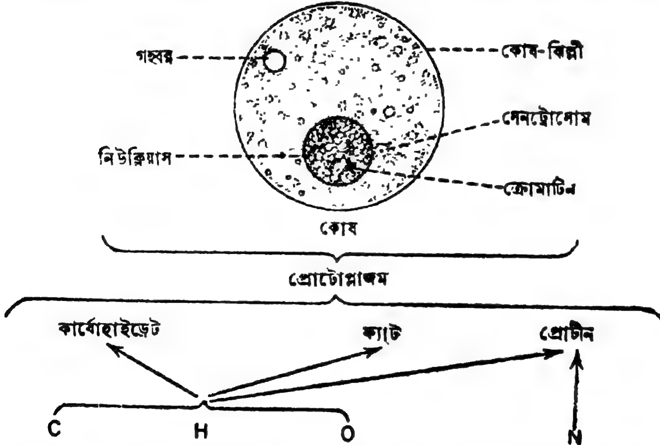
5. জীবাশ্ম সম্পর্কিত আলোচনা অতীতকালের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে।

6. কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের উৎস সন্ধানে ও মূল্যবান ধাতুর আকর অনুসন্ধানে জীবাশ্ম সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত কার্যকরী।

C. প্রাণ রসায়নঘটিত প্রমাণ

পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত ও জড় বস্তুর একটি রাসায়নিক সংগঠন আছে। 92টি মৌলিক পদার্থের (Element) কেবলমাত্র একটি বা কয়েকটি মিলিয়া জড় বস্তু সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক জীবিত বস্তুর রাসায়নিক গঠনে ঐ 92টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে চারিটির একত্র উপস্থিতি সর্বসময়ে পরিলক্ষিত হয়। পদার্থগুলি হইল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। মানুষ, অ্যামিবা সকলের দেহের উপাদানেই ঐ চারিটি মৌলিক পদার্থ থাকে। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের মধ্যে সালফার, ফসফরাস, আয়রণ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি জীবিত বস্তুর দেহ-গঠনে প্রয়োজন হইলেও ইহাদের একটির অভাব জীবিত বস্তুর দেহে তেমন ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কার্বন, হইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যে কোন একটির অভাব থাকিলে জীবিত বস্তুর চলে না। উহাদের উপস্থিতি সদা সত্য।

কার্বন, হাইড্রোজেন অক্সিজেন পরমাণুসমূহ মিলিত হইয়া কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড (ফ্যাট) সৃষ্টি করে। প্রোটিন সৃষ্টিতে নাইট্রোজেন পরমাণু যোগ দেয়।



চিত্র 4.9 প্রতিটি জীবের প্রোটোপ্লাজমের মৌলিক উপাদানগুলি একই রকম।

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, জল ও অন্যান্য কয়েকটি মৌলিক পদার্থ যুক্তভাবে **প্রোটোপ্লাজম** সৃষ্টি করে। প্রোটোপ্লাজম আবরণী সৃষ্টি করিয়া কোষে পরিণত হয় (চিত্র 8.9)। কোষ জীবিত বস্তুর গঠন ও কর্মের একক। অ্যামিবা বা মানুষ ইহাদের প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন হুবহু এক নহে যদিও মৌলিক উপাদানগুলি একই রকমের। এক না হইলেও ইহাদের প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক সাদৃশ্য এত বেশী

যে বৈসাদৃশ্যগুলি ঢাকা পড়িয়া যায়। সাদৃশ্য বেশী হওয়ার কারণ ইহাদের সকলেরই পূর্বপুরুষ এক। সেই পূর্বপুরুষ হইতে বিবর্তনের মাধ্যমে ইহারা আগে বা পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে।

প্রাণীদের দেহে প্রতিনিয়ত যে বিপাকীয় ক্রিয়া চলে সেই বিপাকীয় ক্রিয়াতে **উৎসেচকের** প্রয়োজন হয়। উৎসেচক নিজে প্রোটিন এবং ইহার উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ট্রিপসিন একটি প্রোটিন বিশ্লেষী উৎসেচক। ইহার উপস্থিতিতে জটিল প্রোটিন যৌগ অপেক্ষাকৃত সরল অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়।

অ্যামিবা হইতে সুরু করিয়া মানুষ পর্যন্ত প্রায় সকল প্রাণীতেই ট্রিপসিন পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ঠিক একই ধরনের উৎসেচক কোথা হইতে আসিল? প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে উৎসেচকের সৃষ্টি হইয়াছে মনে করার পরিবর্তে ইহা মনে করাই সঙ্গত যে একই পূর্বপুরুষ হইতে উহারা উৎসেচকটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর শরীরে যে **হর্মোন** (Hormone) পাওয়া যায় তাহা সংযুতি ও ধর্মের দিক দিয়া পুরোপুরি একই রকমের। অন্য স্তন্যপায়ীর দেহ হইতে নিষ্কাশিত **ইনসুলিন** (Insulin) নামক হর্মোন সেই কারণে মানুষের মধুমেহ রোগে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। থাইরয়েড হর্মোনের রাসায়নিক সংযুতি ও কাজ প্রত্যেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে একই রকমের। তৃণভোজী প্রাণীর থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে নিষ্কাশিত থাইরক্সিন মানুষের থাইরয়েড হর্মোনের অভাবজনিত রোগে ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়। ব্যাঙাচির থাইররেড গ্রন্থি কাটিয়া দিলে উহার রূপান্তর (Metamorphosis) বন্ধ হইয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে স্তন্যপায়ীর থাইরক্সিন প্রয়োগ করিলে আবার রূপান্তর সুরু হয়।

মাংসপেশীর সঙ্কোচনের সময় এডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) এডিনোসিন ডাইফসফেটে (ADP) পরিণত হয় এবং শক্তির উদ্ভব হয়। ডাইফসফেটকে পুনরায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় **ট্রাইফসফেটে** সংশ্লেষিত করিতে ফসফাজেন (Phosphagen) নামক এক জটিল যৌগের প্রয়োজন হয়। সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের ফসফাজেনের গঠন ও কাজ একই রকমের। অমেরুদণ্ডী কণ্ঠকত্বক পর্বের কোন কোন প্রাণীতে ফসফাজেন পাওয়া যায়। অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীতে ফসফাজেনের উপস্থিতি অমেরুদণ্ডী হইতে মেরুদণ্ডীর উদ্ভব নির্দেশ করে।

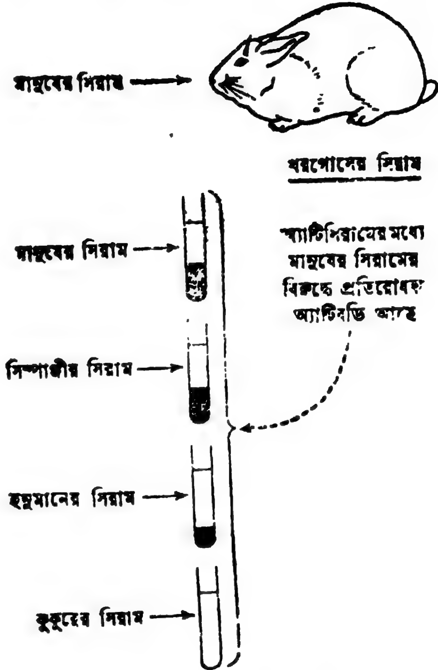
বিভিন্ন মেরুদণ্ডীর হর্মোন ও ফসফাজেনের রাসায়নিক সংযুতি ও কাজ একই হওয়ার পিছনে একটিমাত্র যুক্তি থাকিতে পারে। ইহারা প্রত্যেকে একই পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে এগুলি পাইয়াছে।

D. রক্তের সম্বন্ধপরতা নির্দেশিত প্রমাণ

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী বিশেষত স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তের সিরাম (Serum) তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করিলে বিবর্তনের সত্যতা সম্বন্ধে জানা যায়। জীব-

বিজ্ঞানের যে শাখায় রক্তের সম্বন্ধপরায়ণতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহাকে **সেরোলজী** (Serology) বলে।

রক্তের একটি প্রধান কার্য প্রতিরক্ষা। যখন কোন প্রোটিন নির্মিত বহিঃশত্রু, যথা—ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস দেহমধ্যে প্রবেশ করে তখন রক্তের প্রতিরক্ষা শক্তি সক্রিয় হইয়া পড়ে। প্রতিরক্ষার জন্য রক্তে তখন **অ্যান্টিবডি** (Antibody) নামক এক প্রোটিন নির্মিত প্রতিরক্ষী বাহিনী গড়িয়া ওঠে। প্রোটিন জাতীয় বহিঃশত্রুটিকে অ্যান্টিজেন (Antigen) বলা হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি উভয়েই প্রোটিন।



চিত্র 8.10 অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রেসিপিটিন টেস্ট দ্বারা প্রাণীদের সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে।

রক্ত নিজে প্রোটিন। একটি খরগোসের দেহে যদি অল্প পরিমাণ মানুষের সিরাম বা কোষ বিহীন রক্তের তরল অংশ ইঞ্জেকসন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে খরগোসের সিরামে মানুষের রক্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় (চিত্র 8.10)। মানুষের সিরাম এখানে অ্যান্টিজেন রূপে কাজ করে। এই রকম একটি খরগোসের রক্ত যাহাতে মানুষের সিরামের বিরুদ্ধাচারী অ্যান্টিবডি আছে তাহাকে মানুষের সিরামের **অ্যান্টিসিরাম** বলে। এখন এই রকম অ্যান্টিসিরামের কিছুটা একটি টেস্টটিউবে লইয়া উহাতে মানুষের সিরাম মিশাইলে খরগোসের রক্তের অ্যান্টিবডি মানুষের সিরামের সহিত বিক্রিয়া করে এবং টেস্ট টিউবের তলায় সাদা রঙের অধঃক্ষেপণ বা প্রেসিপিটেশন (Precipitation) জমা হয়।

ধরা যাউক চারিটি টেস্ট টিউব (A, B, C, D) লইয়া প্রতিটিতেই কিছু পরিমাণ খরগোসের দেহে সৃষ্ট মানুষের সিরামের বিরুদ্ধাচারী অ্যান্টিসিরাম রাখা হইয়াছে। যদি A টিউবে মানুষের সিরাম যোগ করা হয় তাহা হইলে A টিউবে কিছু অধঃক্ষেপণ পড়িবে।

এইবার B টিউবে যদি শিম্পাঞ্জীর সিরাম যোগ করা হয় তাহা হইলে B টিউবেও কিছু অধঃক্ষেপণ পড়িবে। কিন্তু B টিউবের অধঃক্ষেপণের পরিমাণ A টিউব হইতে খুব কম হইবে না।

অনুরূপভাবে যদি C টিউবে হনুমানের সিরাম এবং D টিউবে কুকুরের সিরাম যোগ করা যায় তাহা হইলে C টিউবে অধঃক্ষেপণ হইবে। কিন্তু C টিউবে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ A বা B টিউব হইতে কম হইবে। D টিউবে অধঃক্ষেপণ প্রায় হইবে না বা হইলেও এত কম পরিমাণে হইবে যে তাহা নয়নগোচর হইবে না।

A ও B টিউবের অধঃক্ষেপণের পরিমাণ প্রায় একই হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয় যে মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর সিরামের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে খুব বেশী সমতা আছে। আবার C টিউবে A ও B টিউব অপেক্ষা অধঃক্ষেপণের পরিমাণ কম হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয় যে মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর সহিত হনুমানের সিরামের রাসায়নিক গঠনের মিল একটু কম। D টিউবে অধঃক্ষেপণ না হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয় যে কুকুরের সিরামের রাসায়নিক সংগঠনের সহিত মানুষ, শিম্পাঞ্জী বা হনুমানের সিরামের গঠনের কোন মিল নাই।

এখন মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর মধ্যে চরিত্রলক্ষণগত অমিল আছে। কিন্তু উহাদের সিরামের রাসায়নিক সংগঠন প্রায় অভিন্ন। এই অভিন্ন হইবার কারণ কি? কারণ এই যে একই পূর্বপুরুষ হইতে মানুষ ও শিম্পাঞ্জী উহাদের রক্তের রাসায়নিক গঠন উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে এবং উহাদের রক্তের রাসায়নিক গঠন প্রায় অপরিবর্তিত বা রক্ষণশীল দশায় রহিয়াছে।

ঠিক একইভাবে হনুমান ও মানুষের সিরামের রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে অলিগোসিন (Oligocene) যুগে হনুমান এবং মানুষ একই পূর্বপুরুষ হইতে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। সেই পূর্ব-পুরুষ হইতে উভয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে একই ধরনের সিরাম উপাদান লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে হনুমানের নিজস্ব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার সিরামের রাসায়নিক গঠনের কিছু পরিবর্তন আসিয়া পড়ে। ফলে বর্তমানে মানুষ ও হনুমানের সিরামের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে কিছু পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে। কুকুর ও মানুষের সম্বন্ধ আরও সুদূর সেই কারণে রক্তের সিরামের উপাদানগুলি ভিন্ন হওয়ায় অধঃক্ষেপণ হয় নাই।

সিরামের রাসায়নিক উপাদানগুলি তুলনামূলক বিচারে বিবর্তনের সত্যতার স্বপক্ষে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে—

1. মেরুদণ্ডী বিশেষত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সিরামের গঠন উপাদানগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

2. সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা প্রমাণ করে যে সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য যত নিকট অধঃক্ষেপণের পরিমাণ তত বেশী বা অন্যভাবে সাদৃশ্যের নৈকট্য অধঃক্ষেপণের পরিমাণের সহিত সমানুপাতিক।

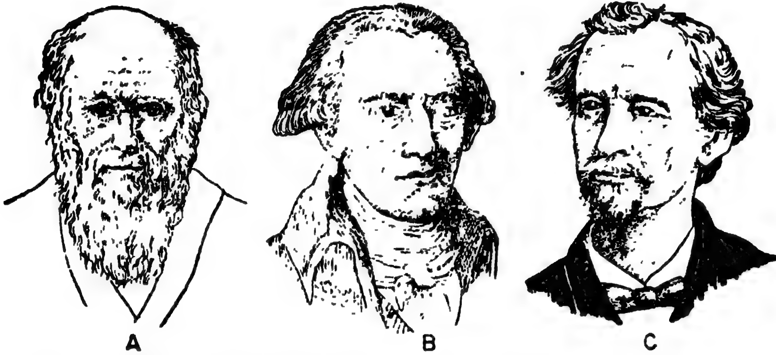
3. শ্রেণীবিন্যাসে গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিকে চরিত্রলক্ষণের সমতা অনুযায়ী আর্টিওড্যাকটাইলা (Artiodactyla) বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সেরোলজিক্যাল পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে গঠন উপাদান অনুযায়ী ইহাদের সিরামের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

4. বিভিন্ন মেরুদন্ডীর মধ্যে বিবর্তনজনিত সম্বন্ধপরতা নির্ধারণ সেরোলজিক্যাল পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

B. বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ (Theories of Evolution)

বিবর্তনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর দ্বিতীয় যে প্রাসঙ্গিক বিষয় আসিয়া পড়ে তাহা হইতেছে বিবর্তনের পদ্ধতি (Process or Mechanism) অর্থাৎ কি উপায়ে



চিত্র 8.11 তিন স্বনামধন্য বিবর্তনবিদ্—A = চার্লস ডারউইন, B—ল্যামার্ক, C—দ্য ভ্রিস।

প্রাণী বা উদ্ভিদ বিবর্তিত হইয়াছে। বিবর্তনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য একাধিক মতবাদ (Theory) প্রচলিত আছে। ইহাদের কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হইল।

I. ল্যামার্কের মতবাদ (Theory of Lamrack)

জাঁ ব্যাপটিস্ট দ্য ল্যামার্ক (Jean Baptiste de Lamarck 1744-1829) বিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন। 1809 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী জীববিজ্ঞানী ল্যামার্ক (চিত্র 8.11 B) জীব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ **ফিলোজফিক জুওলজিক** (Philosophic Zoologique) নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। ল্যামার্কের মতবাদকে **ল্যামার্কতত্ত্ব বা ল্যামার্কিজম** (Lamarckism) বলে। ল্যামার্কের মতবাদই বিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রকাশিত মতবাদ।

বিবর্তনের পদ্ধতি ব্যাখ্যার জন্য ল্যামার্ক চারিটি সাধারণ সত্যের (তাঁহার মতে) সাহায্য গ্রহণ করেন। এই চারিটি সাধারণ সত্য হইল -

1. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অজৈব বস্তু হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে জীবের গঠনের মধ্যে সরলতা ছিল ; পরে জীবের গঠনে জটিলতা আসিয়া পড়ে। জীবিত বস্তু সামগ্রিকভাবে অথবা ইহার অংশবিশেষ ধীরে ধীরে আকারে বড় হইয়াছে।

2. জীবিত বস্তুর মধ্যে গঠন পরিবর্তনের প্রবণতা আছে। গঠন পরিবর্তনের দাবী পরিবেশ হইতে আসে।

3. জীবের অঙ্গ ব্যবহারে সুগঠিত ও অব্যবহারে অপুষ্ট বা নষ্ট হইয়া যায়। এইভাবে চরিত্রলক্ষণের বিবর্তন হয়।

4. এক পুরুষের অর্জিত চরিত্রলক্ষণ পরের পুরুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়।

ল্যামার্কের প্রথম সাধারণ সত্যটি আংশিকভাবে সত্য। অজৈব বস্তু হইতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জৈব বস্তুর সৃষ্টি অবশ্যই হইয়াছে। কিন্তু প্রথম মতবাদের শেষাংশটুকু সাধারণ সত্য নহে। বিবর্তনের ধারায় অনেক প্রাণীর আকার বড় হইয়াছে, যথা—হাতী, ঘোড়া, উট। কিন্তু অনেক প্রাণী আছে যাহাদের মধ্যে বিবর্তনের ধারায় আকার বৃদ্ধির কোন লক্ষণ নাই, যথা—আদ্যপ্রাণী প্রোটোজোয়া। আবার অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত দিকই সত্য। বিবর্তনের ধারায় তাহাদের আকার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ল্যামার্কের দ্বিতীয় সাধারণ সত্যটিতে পরিবেশের দাবী সম্পর্কিত ধারণাটি নির্ভুল। প্রতিটি জীব পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকে মানাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট থাকে। পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজনের ফলে নানান প্রকার স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। ল্যামার্কের মতে জীবের কোন অঙ্গের পরিবর্তন জীবের সজ্ঞান প্রচেষ্টায় সম্ভব। ল্যামার্কের মতে জিরাফের প্রলম্বিত গ্রীবার উদ্ভব সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। সচেতনভাবে উঁচু গাছের শীর্ষস্থ পাতা আহরণের চেষ্টায় তাহাদের গ্রীবা লম্বা হইয়াছে। কিন্তু নিজস্ব সজ্ঞান প্রচেষ্টা (Conscious effort) প্রাণীদের গঠন পরিবর্তিত করিতে পারে না। ইহা সত্য হইলে যে কোন প্রাণী নিজস্ব সজ্ঞান প্রচেষ্টায় নিজেই নিজের গঠন পরিবর্তিত করিতে পারিত। ইহা সত্য হইলে মানুষের পক্ষে ডানা অর্জন করার মধ্যে অসম্ভব কিছু থাকিত না।

বিবর্তনবিদ্‌গণ ল্যামার্ক প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ সত্য দুইটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণ সত্য দুইটি একত্রে আলোচনা করেন। ইহারাই ল্যামার্কের মতবাদ বলিয়া প্রচলিত।

বর্তমানে ল্যামার্কের মতবাদের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দেওয়া হয়—**ব্যবহার বা অব্যবহারে জীবিত বস্তুর অঙ্গের গঠন পরিবর্তিত হয় এবং এইভাবে অর্জিত চরিত্র লক্ষণ একপুরুষ হইতে পরের পুরুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়।**

অঙ্গের ব্যবহারে যে অঙ্গের পরিবর্তন হয় তাহার প্রমাণ হিসাবে ল্যামার্ক একাধিক উদাহরণ দেন। প্রতিনিয়ত ব্যবহারের ফলে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ উন্নত ও সুগঠিত হয়। কর্মকার ও ব্যায়ামবিদের পেশী সবল ও সুগঠিত হয়। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পেশী উন্নত হইয়াছে। ল্যামার্ক জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ হিসাবে বলেন যে জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা লম্বা ছিল না। কিছু জিরাফ গাছের উঁচু ডালের পাতা খাইবার জন্য গলা লম্বা করিতে সুরু করে—ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের গলা খানিকটা লম্বা হইয়া যায়। ঐ জিরাফগুলির পরের পুরুষ

উত্তরাধিকার সূত্রে একটু লম্বা গলার অধিকারী হয় এবং তাহারা নিজেদের গলা আরও লম্বা করার চেষ্টা করে। ফলে কয়েক পুরুষ পরে সব জিরাফের গলা লম্বা হইয়া পড়ে (চিত্র 8.12)। জলচর পাখী বিশেষত হাঁসের পায়ের অঙ্গুলিগুলি একটি পাতলা চামড়ার পর্দা দ্বারা যুক্ত থাকে। ল্যামার্কের মতে হাঁসদের পূর্বপুরুষের পায়ে এই ধরনের কোন পর্দা ছিল না। জলে সাঁতার দিবার সুবিধার জন্য ইহাদের অঙ্গুলির মধ্যবর্তী স্থানে চামড়ার সৃষ্টি হয়।

অব্যবহারে অঙ্গের গঠন কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা প্রমাণের জন্যও ল্যামার্ক উদাহরণ ব্যবহার করেন। বর্তমান সাপের অগ্রপদ বা পশ্চাৎপদ নাই। সাপ গর্তে বাস করে। গর্তে প্রবেশ করিতে বা গর্ত হইতে বাহিরে আসিতে অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ বাধার সৃষ্টি করে। সে কারণে বর্তমান সাপের পূর্বপুরুষরা অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের ব্যবহার কমাইয়া দেয়। ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ অপুষ্ট হইয়া পড়ে। কয়েক পুরুষ পর সাপের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় এবং ক্রমে উহারা আর গঠিত হয় না। উটপাখীর পূর্বপুরুষেরা উড়িতে পারিত এবং ইহাদের ডানাদ্বয় সুগঠিত ছিল। কিন্তু বংশানুক্রমে ডানাদ্বয়ের অব্যবহারের ফলে উহা ক্রমে সংক্ষিপ্ত লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। ঘোড়ার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে পার্শ্বীয় অঙ্গুলির হ্রাস নিষ্ক্রিয়তার ফলে সম্ভব হইয়াছে। গুহার মধ্যে যে প্রাণীরা থাকে তাহারা অন্ধকারে থাকায় তাহাদের চোখ দেখার কাজে লাগে না. সেই কারণে তাহারা অন্ধ হইয়া যায়।

কয়েকজন বিজ্ঞানী লামার্কতত্ত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য লামার্কের মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। **উইলিয়াম বিবি** (William Beebe) পক্ষিকুলের সহজাত **প্রবৃত্তি** (Instinct) সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে পক্ষিকুলের প্রবৃত্তি জনিত বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বাহিত হয়; পল ক্যামারার (Paul Kammerer) স্যালাম্যান্ডার লইয়া পরীক্ষা করিয়া লামার্কতত্ত্বকে সমর্থন করেন। তিনি নানা রঙে রঞ্জিত বাক্সের মধ্যে স্যালাম্যান্ডারদের প্রতিপালন করিয়া দেখেন বাক্সের রঙ-অনুযায়ী স্যালাম্যান্ডারের গায়ের রঙ পরিবর্তিত হইয়াছে অর্থাৎ লাল রঙে রঞ্জিত বাক্সে রাখা স্যালাম্যান্ডারের গায়ের রঙ লাল, নীল রঙের বাক্সের স্যালাম্যান্ডারের গায়ের রঙ নীল বর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে ক্যামারারের পরীক্ষালব্ধ ফল সম্পূর্ণ ভুল। **ম্যাকডোগাল** (Mcdougall) কৃত ইঁদুর সম্পর্কীয় পরীক্ষার ফল ল্যামার্কতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে। তিনি একটি বিশেষভাবে গঠিত পাত্রে কয়েকটি ইঁদুরকে ছাড়িয়া দেন। পাত্র হইতে বহির্গমনের দুইটি পথ আছে। পথ দুইটির মধ্যে একটি পথ আলোকিত এবং অপরটি অন্ধকার। আলোকিত পথ দ্বারা বহির্গমনের সময় ইঁদুরগুলি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় কিন্তু অন্ধকার পথে কোন বাধা থাকে না। এইরূপভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়াছে ইঁদুরগুলি স্বাভাবিক-ভাবেই আলোকিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার পথটি বহির্গমনের উপায় হিসাবে বাছিয়া লইয়াছে। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে ইঁদুরগুলির বংশধরগণও একই

মানসিকতার অধিকারী। সুতরাং ম্যাকডোগালের অভিমত হইল অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হইতে অর্জিত গুণাগুণ সন্তান-সন্ততির মধ্যে বাহিত হয়। ম্যাকডোগালের পরীক্ষালব্ধ ফল লামার্কতত্ত্বের অনুকূলে রায় দেয়।

কিন্তু ক্রু (Crew) 1936 খ্রীষ্টাব্দে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইঁদুর সম্পর্কীয় ম্যাকডোগালের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সম্পূর্ণ ভুল। কালক্রমে অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহের বংশগতির বিপক্ষে নানান প্রতিবাদ উপস্থাপিত হয়। ল্যামার্কের মতবাদে আপাত সরলতা আছে। বিবর্তনের জটিল পদ্ধতিকে ল্যামার্ক অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ফলে তাঁহার মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁহার মতবাদকে যাচাই করিবার চেষ্টা করেন।

বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী টি. ডি. লাইসেঙ্কো (T. D. Lysenko) লামার্কতত্ত্বের অনুকূলে তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলকে কাজে লাগান। তিনি এবং তাঁহার সহযোগীরা পরিবেশ পরিবর্তন ঘটাইয়া বিভিন্ন উদ্ভিদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে সক্ষম হন। তাঁহার মতে লব্ধ পরিবর্তনগুলি উত্তর পুরুষে বর্তায়। কিন্তু পরবর্তীকালে লাইসেঙ্কোর ধারণা বৈজ্ঞানিক মহলে সমর্থিত হয় নাই।

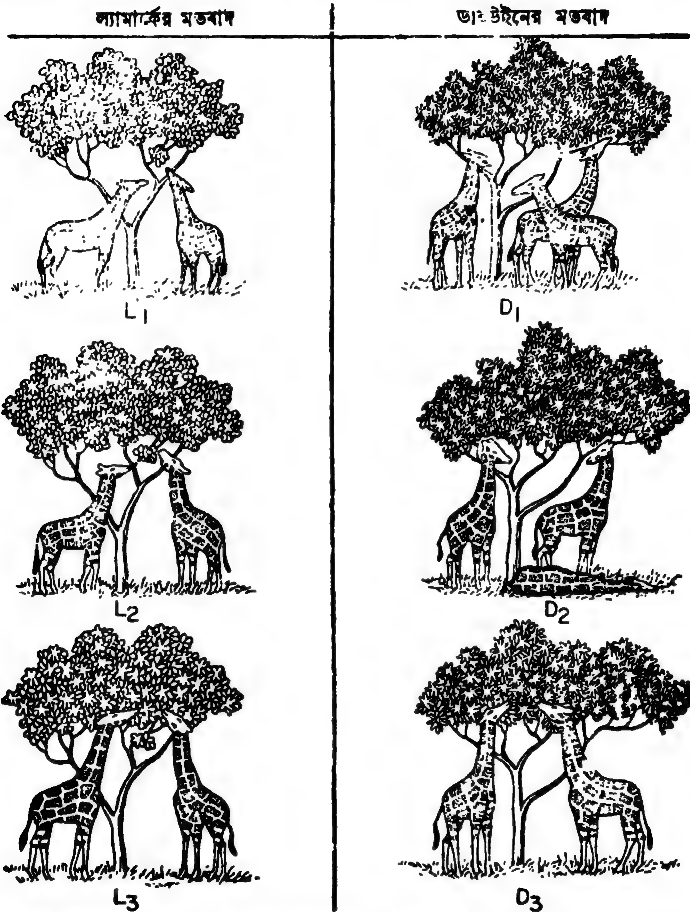
ওয়েসম্যান (Weismann, 1834-1914) ইঁদুরের উপর পরীক্ষা সুরু করেন। তিনি কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষ ইঁদুর লইয়া তাহাদের প্রত্যেকের লেজ কাটিয়া দেন। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন ল্যামার্কের মতবাদ সত্য হইলে এই লেজহীন স্ত্রী ও পুরুষ ইঁদুর প্রজননের মাধ্যমে লেজহীন সন্তান-সন্ততির জন্ম দিবে। লেজহীন প্রথম পুরুষ হইতে যে সন্তান-সন্ততি জন্মায় তাহাদের প্রত্যেকেরই লেজ ছিল। দ্বিতীয় পুরুষের সন্তান-সন্ততিদের লেজ কাটিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় পুরুষের লেজহীন স্ত্রী ও পুরুষ ইঁদুরের মিলনে যে সন্তান-সন্ততি হইল তাহাদেরও লেজ ছিল। এইভাবে লেজ কাটার পরীক্ষা ইঁদুরের 35 বংশপরম্পরায় (35-generations) করিয়াও ওয়েসম্যান লেজহীন ইঁদুর পাইলেন না।

ড্রসোফিলাকে (*Drosophila*) ল্যাবরেটরীতে লালনপালন করা যায়। পেইন (Payne, 1911) ড্রসোফিলার 69 পুরুষ (Generation) পরীক্ষামূলকভাবে অন্ধকার ল্যাবরেটরীতে লালনপালন করিয়াও অন্ধ ড্রসোফিলা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

ওয়েসম্যান 1892 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জার্মপ্লাজম (Germplasm) মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদে বলা হইয়াছে প্রাণী বা উদ্ভিদ দুই ধরনের কোষ লইয়া গঠিত। দেহকোষ (Body cell) এবং জনন কোষ (Germ cell)। পিতা ও মাতার জনন কোষের মিলনে সন্তানের জন্ম হয়। সুতরাং জনন কোষ বংশধারার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। দেহকোষগুলির উত্তরাধিকার প্রদানের কোন ক্ষমতা নাই।

ওয়েসম্যানের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ল্যামার্কের মতবাদের গুরুত্ব অনেক কমিয়া যায়। কেননা ল্যামার্ক যে পরিবর্তনের কথা বলিয়াছেন তাহা মূলত

দেহকোষজনিত পরিবর্তন। দেহকোষের পরিবর্তনের মধ্যে কোন কোন অঙ্গের গঠনের পরিবর্তনের-যোগ থাকিতে পারে। কিন্তু জনন কোষের সহিত ঐ অঙ্গের কোন যোগ না-থাকায় অঙ্গটি পরিবর্তিত রূপে উত্তরাধিকার-সূত্রে এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে যাইতে পারে না।



চিত্র 4.12 জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় ল্যামার্কতত্ত্ব L ও ডারউইনতত্ত্ব D।

L_1 = জিরাফের পূর্বপুরুষদের গ্রীবা সম্ভবত সংক্ষিপ্ত ছিল। উঁচু গাছের পাতার নাগাল পাইবার জন্য তাহারা গ্রীবা প্রসারিত করিতে বাধ্য হইত।

L_2 = ফলে অপত্য জিরাফদের গ্রীবা ক্রমশঃ প্রলম্বিত হইতে লা[illegible]।

L_3 = এইরূপ প্রসারণের ফলেই আধুনিক জিরাফের লম্বা গ্রীবার উদ্ভব হইয়াছে।

D_1 = জিরাফের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গ্রীবার দৈর্ঘ্য নানারূপ ছিল। ইহা পরিবৃত্তির ফলশ্রুতি এবং এই পরিবৃত্তি বংশপরম্পরায় বাহিত হয়।

D_2 = প্রাকৃতিক নির্বাচন লম্বা গ্রীবাযুক্ত জিরাফের নির্বাচন করে এবং ফলে

D_3 = লম্বা গ্রীবাযুক্ত জিরাফ যোগ্যতমরূপে অবস্থান করে।

ল্যামার্কের মতবাদ বর্তমানে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। সত্য না হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলি দায়ী—

1. ল্যামার্ক তাঁহার মতবাদ সমর্থনে বলিষ্ঠ প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই।

2. পরীক্ষামূলকভাবে ল্যামার্কের মতবাদের কোন কিছুই প্রমাণ করা যায় নাই।

3. নিম্নশ্রেণীর জীবিত বস্তুর ক্ষেত্রে ল্যামার্কের মতবাদ প্রযোজ্য হইতে পারে কেননা উহাদের দেহে দেহকোষ ও জনন কোষের পার্থক্য নাই। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীবিত বস্তুর দেহে দেহকোষ ও জনন কোষ সম্পূর্ণ আলাদা।

4. প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার বা অব্যবহারে অঙ্গের বৃদ্ধি বা হ্রাস যদিও বা সম্ভব হয়—উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উহা সম্ভব নয়। সুতরাং **ল্যামার্কের** মতবাদ সকল জীবিত বস্তুর পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

ল্যামার্কতত্ত্ব ও আধুনিক ধারণা

সুপ্রজননবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির ফলে বংশগতি সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা খুবই স্পষ্ট। পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে জীবদেহে পরিবর্তনের উদ্ভব হইতে পারে। পরিবেশের পরিবর্তন কোন জীবের অঙ্গকে পুষ্ট বা লুপ্ত করিলেও সেই অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশগতির ধারায় উত্তরপুরুষে বর্তায় না। বিবর্তন তত্ত্বের প্রথম পথিকৃৎ হইলেও ল্যামার্কের এই ধারণা সত্য নহে। ল্যামার্কের মতবাদ অনুসারে অর্জিত বৈশিষ্টসমূহ দেহকোষের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়। কিন্তু বংশগতির ধারায় দেহকোষের কোন ভূমিকা থাকে না। কেবলমাত্র যে সকল পরিবর্তন জনন কোষের পরিবর্তনে সক্ষম হয় সেই সকল পরিবর্তনজনিত অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। ল্যামার্ক যে পরিবর্তনের কথা বলিয়াছেন তাহা মূলত দেহকোষজনিত (Somatoplasm) পরিবর্তন। জনন কোষের (Germplasm) সহিত এই সকল পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক না থাকায় উক্ত পরিবর্তন উত্তর পুরুষে বর্তায় না। ল্যামার্কের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক হইলেও নতুন প্রজাতি উদ্ভবে তিনি পরিবেশ ও অভিব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করেন।

II. ডারউইনিজম বা প্রাকৃতিক নির্বাচন (Darwinism or the theory of Natural Selection)

বিবর্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে ইংরাজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন [Charles Darwin (1809-82)] তাঁহার **প্রাকৃতিক নির্বাচন** মতবাদ প্রকাশ করেন। মতবাদটি তাঁহার "অন দি অরিজিন অব্ স্পেসিস্ বাই মিনস্ অব্ ন্যাচারাল সিলেকসন" (On the Origin of Species by means of Natural Selection) নামক গ্রন্থে 1858-59 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিবর্তনের সত্যতা ও পদ্ধতির ব্যাখ্যায় একটি মৌলিক অবদান বলিয়া স্বীকৃত হয় ও সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া ওঠে। অনেকে পুস্তকটিকে বিবর্তনের বাইবেল (Bible)

আখ্যা দেন। মৌলিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে ডারউইনের মতবাদ ডালটনের (Dalton) আণবিক তত্ত্ব বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সমতুল্য।

ডারউইন তত্ত্বে প্রকৃতিকে (Nature) সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের পালক বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ পালক (Animal or Plant breeder) তাহার পালিত প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে সেইগুলিকে বাছিয়া লন যাহাদের মধ্যে তাহার পছন্দমত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি এই পছন্দ করা প্রাণী বা উদ্ভিদকে ইহাদের পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির জন্য পিতা ও মাতা রূপে কাজে লাগান। বাকী প্রাণী বা উদ্ভিদকে বংশধর সৃষ্টির জন্য তিনি ব্যবহার করেন না। প্রাণী বা উদ্ভিদ পালক সেই প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাছিয়া লন যাহার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য বা **প্রকরণ** (Variation) আছে এবং তিনি ইহাদের লালনে বিশেষ যত্ন নেন। প্রাণী বা উদ্ভিদ পালকের কাজের সহিত প্রকৃতির কাজকে তুলনা করা চলে। প্রাণী বা উদ্ভিদ পালকের ন্যায় প্রকৃতি সমগ্র প্রাণী বা উদ্ভিদ জগৎ হইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা প্রকরণযুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাছিয়া লন এবং তাহাদের সযত্নে লালন করেন। অনন্তকাল ধরিয়া প্রকৃতি এই নির্বাচন করিয়া চলিয়াছে। এই নির্বাচনে দুর্বল, অক্ষম বা অযোগ্য প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাদ দেওয়া হয়।

প্রকৃতিবিদ্ হিসাবে ডারউইন তাঁহার কর্মজীবন সুরু করেন। এইচ. এম. এস. বিগল (H.M.S. Beagle) নামক জাহাজে তিনি প্রকৃতিবিদ্ হিসাবে যোগদান করেন। জাহাজে করিয়া 1831 খৃষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ডারউইন দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী দ্বীপগুলি পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ কালে ঐ দ্বীপগুলির প্রাণী ও উদ্ভিদের সহিত মূল ভূখণ্ডের প্রাণী ও উদ্ভিদের চরিত্রলক্ষণের তফাৎ তিনি লক্ষ্য করেন। বিশেষ করিয়া গ্যালাপ্যাগোস নামক সামুদ্রিক দ্বীপটির প্রাণী ও উদ্ভিদের সহিত কাছাকাছি (প্রায় 500 মাইল) মূল ভূখণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণী ও উদ্ভিদের তফাৎ তাঁহাকে অভিভূত করে। সামুদ্রিক দ্বীপের কাছাকাছি ভূখণ্ড হইতে প্রাণী বা উদ্ভিদ পরিযান করিয়া সামুদ্রিক দ্বীপে আসে এবং সেখানে বসবাস সুরু করে। মূল ভূখণ্ডের প্রাণী ও উদ্ভিদের সহিত ঐ দ্বীপের উদ্ভিদ ও প্রাণীর চরিত্রলক্ষণের তফাৎ হইবার কারণ কি ? সামুদ্রিক দ্বীপের প্রাণী ও উদ্ভিদের আকার ও গঠন পরিবর্তিত। ইহার অর্থ প্রাণী ও উদ্ভিদের আকার ও গঠন পরিবর্তনশীল। তাহা হইলে বিশেষ সৃষ্টি (Special creation)—যাহাতে বলা হইয়াছে যে প্রাণী ও উদ্ভিদ যে যেমন অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছে নিশ্চয়ই সত্য নহে। বিশেষ সৃষ্টি যদি সত্য নয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন পদ্ধতি আছে যাহার দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিবর্তন বা বিবর্তন হয়। এই সমস্ত চিন্তায় আপ্লুত হইয়া ডারউইন ভ্রমণ শেষ করেন।

পরিভ্রমণ শেষ করার দিন হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডারউইন বিবর্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত থাকেন। পরিভ্রমণ কালে তিনি যে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলির বিশ্লেষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ম্যালথাস (Malthus) রচিত

'অন দি প্রিন্সিপাল অফ পপুলেশন' (On the Principle of Population) নামক পুস্তকটির বিষয়বস্তু ডারউইনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপ পরিভ্রমণ এবং ম্যালথাসের তত্ত্ব এই দুই প্রভাব ডারউইন তত্ত্বের জন্ম দেয়।

প্রকৃতিতে সংঘটিত কয়েকটি সাধারণ ঘটনা ডারউইনের চিন্তার আলোকে অসাধারণ হইয়া উঠে। ডারউইন তাঁহার অসাধারণ সমীক্ষা ও দার্শনিক চিন্তাধারায় সৌকর্যে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ ঘটনাগুলিকে আরোহণ ও অবরোহণ মূলক যুক্তিশাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলেন এবং ইহারই শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে। বিবর্তনের পদ্ধতি ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অতুলনীয়।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলি হইল—

1. **অত্যধিক জন্মহার** (Prodigality of reproduction) : জীবিত বস্তুর প্রধান ধর্ম অনুযায়ী তাহারা প্রত্যেকেই নিজের ন্যায় বংশধর সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জীবিত বস্তুই অসংখ্য বংশধরের জন্ম দেয়। জীবিত বস্তু জিয়োমেট্রিক্যাল প্রগেশন (Geometrical progression) রীতিতে বংশবৃদ্ধি করে। একটি সরিষা গাছ হইতে বৎসরে 730,000টি বীজ জন্মায়। প্রতিটি বীজ হইতে গাছ হইবার সম্ভাবনা আছে। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ এক প্রজনন ঋতুতে 28 মিলিয়ন ডিম পাড়ে। উভচর রানা ক্যাটস্‌বেনিয়া (*Rana catsbenia*) বছরে 28 হাজার ডিম পাড়ে। শম্বুক পর্বের কিছু প্রাণী এক ঋতুতে 114 মিলিয়ন ডিম পাড়িতে পারে। বৃহদাকার স্তন্যপায়ীর মধ্যে হাতীর জন্মহার অতি মন্থর। ডারউইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন একজোড়া হাতী হইতে 750 বছরে 19 মিলিয়ন বংশধর সৃষ্টি হইতে পারে।

2. **আহার্য ও বাসস্থান সীমিত** (Constancy of food and space) : উদ্ভিদরা সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে নিজেদের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিতে পারে। প্রাণীরা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। আহার্য বস্তুর উৎপাদন হার সীমিত। ঠিক সেইভাবে ভূপৃষ্ঠে বসবাসের স্থানও সীমিত।

3. **বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম** (Struggle for existence) : একদিকে জন্মের অত্যধিক হার অন্যদিকে আহার্য ও বাসস্থান সীমিত হওয়ার ফলে প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়কেই বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হয়। উদ্ভিদের সংগ্রাম সূর্যালোক ও উষ্ণতা সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। বাঁচিবার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদকে তিন ধরনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হয়। একই প্রজাতির সহিত (Intraspecific), অন্য প্রজাতির সহিত (Interspecific) এবং আবহাওয়ার সহিত (Environmental) প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদকে সংগ্রাম করিতে হয়।

4. **প্রকরণের** (Variation) **উপস্থিতি** : জীবিত বস্তুরা আকারে ও গঠনে সর্বসম হয় না। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাহারা সকলে দেখিতে একই রকম নহে। **জীবিত বস্তুদের মধ্যে প্রকরণ (Variation) থাকে। বাঁচিবার জন্য সংগ্রামে যাহাদের প্রকরণ সুবিধাজনক (Favourable) তাহারা অগ্রাধিকার পায়।**

5. **যোগ্যতমের জয়** (Survival of the fittest) : সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচিবার সংগ্রামে জয়ী হয়। জয়ী প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশধরগণ এই সুবিধাজনক প্রকরণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে।

6. **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) : প্রকৃতি যে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ আছে তাহাদের নির্বাচন করেন এবং তাহাদের লালন করেন। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ পরিবেশের সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশী হারে বংশবিস্তার করিতে পারে। ইহাদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে যায়। ইহাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশী থাকে প্রকৃতি আবার তাহাদের নির্বাচন করে। এইভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া নির্বাচিত করিয়া প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নূতন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

ডারউইনের মত অনুযায়ী জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। জিরাফের পূর্বপুরুষদের গলা ছোট ছিল এবং উহারা গাছের পাতা খাইত। এই পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রকরণজনিত কারণে একটি জিরাফের গলা অন্য জিরাফের তুলনায় একটু বড় হইয়া যায়। এই বড় গলাযুক্ত জিরাফটি অন্য জিরাফদের তুলনায় একটু বেশী সুবিধা ভোগ করিত। গাছের উঁচু ডালের পাতার সে সহজেই নাগাল পাইত। অন্যান্যদের তুলনায় সে বেশী আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিত ফলে অন্যান্যদের তুলনায় তাহার প্রজননক্ষমতা বেশী ছিল। তাহার সন্ততিরা উত্তরাধিকার সূত্রে লম্বা গলা পাইয়াছিল। প্রকৃতি লম্বা গলা জিরাফদের নির্বাচন করিয়াছিল (চিত্র 8.12)।

ডারউইনের মতবাদের সারাংশ নিম্নোক্ত উপায়ে প্রকাশ করা যায়—

ঘটনা প্রবাহ	সিদ্ধান্ত
1. অত্যধিক জন্মহার 2. আহার্য ও বাসস্থান সীমিত	বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম
3. বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম 4. প্রকরণের উপস্থিতি	যোগ্যতমের জয়
5. যোগ্যতমের জয় 6. যোগ্যদের প্রাকৃতিক নির্বাচন	নূতন প্রজাতি সৃষ্টি।

ডারউইনাতত্ত্ব সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। যুক্তিনির্ভর হইলেও ডারউইন এমন কতকগুলি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন যেগুলির ব্যাখ্যা বা যেগুলি সম্বন্ধে ঐ সময়ে সম্পূর্ণভাবে কিছু জানা ছিল না।

1. ডারউইন প্রকরণের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কিভাবে প্রকরণের উদ্ভব হয় তাহা ডারউইন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

2. ডারউইন ল্যামার্কের ন্যায় অর্জিত চারিত্রলক্ষণের উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করিতেন। এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় উহা ডারউইনতত্ত্বকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে।

3. প্রাকৃতিক নির্বাচন একমুখী (Unidirectional)। প্রকরণের একমুখী নির্বাচনে প্রাণী বা উদ্ভিদ বিশেষিত (Specialised) হইয়া পড়ে। বিশেষিত হইলে ধ্বংস অনিবার্য। স্যাবার টুথ বাঘের (Sabre tooth tiger) দাঁত এবং এলক হরিণের শিং বিশেষিত হওয়ার পর আকারে জটিল হইয়া পড়ে এবং সুবিধার পরিবর্তে ঐগুলি ইহাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে ইহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

4. পরজীবীদের অনেক অঙ্গ সম্পূর্ণ গঠিত হয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচন ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশে অপারগ।

নয়া-ডারউইনতত্ত্ব (Neo-Darwinism)

ডারউইনতত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পর একশত পঁচিশ বৎসরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জীবন-বিজ্ঞানের চর্চাও অনেক উন্নত ধরনের হইয়া উঠিয়াছে। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে বংশগতি বিজ্ঞান (Genetics) জন্মলাভ করিয়াছে। ক্রোমোসোম ও জীন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। বর্তমানে জানা গিয়াছে জীন বংশগতির ধারক ও বাহক, ইহার সাংগঠনিক পরিবর্তনে প্রকরণের সৃষ্টি হয়। মূলত বংশগতি বিজ্ঞান ডারউইনতত্ত্বের দুর্বল অংশগুলিকে নূতন জ্ঞানের আলোক সবল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্বলতাগুলি বাদ দিয়া ডারউইনতত্ত্ব বর্তমানে নয়া-ডারউইনতত্ত্ব নামে অধিক প্রচলিত। ডারউইন অভিযোজনের উদ্ভব এবং নূতন প্রজাতির সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর বেশী গুরুত্ব দেন। জীব অভিব্যক্তিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব জীবের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। সংক্ষেপে পরিবেশ পরিবর্তন জীবের মধ্যে প্রকরণের সৃষ্টি করে। প্রকরণের উৎপত্তির ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন নূতন জীব প্রজাতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। জীব ও পরিবেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রিয়া ভিন্ন। প্রাকৃতিক নির্বাচন তিনভাবে জন-সংখ্যার উপর কার্যকরী হয়, যথা :

স্টেবিলাইজিং সিলেক্‌শন (Stabilizing Selection): কোন জন-সংখ্যার (Population) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনেক সময় ধরিয়া স্থির বা অপরিবর্তিত থাকিলে এই ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন কার্যকরী হয়। এই ধরনের নির্বাচনের ফলে জনসংখ্যার মধ্যে বিশেষ কোন প্রকরণের উদ্ভব হয় না কারণ ইহাদের জীন-পুল (Gene-pool) অপরিবর্তিত থাকে।

ডাইরেক্‌শনাল সিলেক্‌শন (Directional Selection): যখন পরিবেশ একইদিকে ক্রমপরিবর্তিত হয় তখন এই ধরনের নির্বাচনের ফলে জনসংখ্যার মধ্যে ধারাবাহিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ইহা নূতন নূতন অভিযোজনের সৃষ্টির সুযোগ আনিয়া দেয়।

ডিস্‌রাপ্‌টিভ সিলেক্‌শন (Disruptive Selection) : যখন কোন অঞ্চলের জনসংখ্যার সমসত্ত্বতা প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিভেদিত ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন জনসংখ্যার মধ্যে ছোট ছোট দলের (Sub-population) সৃষ্টি হয় এবং ইহাদের মধ্যে জীনের সংগঠনের পার্থক্য দেখা দেয়।

সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতিভাত হয় যে জীব ও পরিবেশের অন্তঃক্রিয়াই (Organism—environment interaction) জীব অভিব্যক্তির মূল উৎস। আন্তঃক্রিয়ার ফলে কোন একটি জনসংখ্যায় জীনঘটিত পরিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়। জীব ও পরিবেশের জটিলতার ফলে ইহাদের আন্তঃক্রিয়া ভিন্নমুখী হয় ফলে জনসংখ্যা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। সকল ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করে। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন একাই জীব-অভিব্যক্তিকে অব্যাহত রাখিতে পারে না। পরিবেশের প্রভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে।

নয়া ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষতত্ত্ব (Synthetic theory) : বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে নয়া ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষতত্ত্বকে একই বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনার পটভূমি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে নয়া ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষ তত্ত্ব এক নহে। সিমসন তাঁহার 'দি মিনিং অব ইভোলিউসন (The Meaning of Evolution) নামক পুস্তকে এই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে নয়া ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষতত্ত্বকে এক বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। তাঁহার মত অনুযায়ী নয়া ডারউইনবাদ ধারণাটি ওয়েসম্যান (Weismann) এবং তাঁর সহকর্মীদের। নয়া ডারউইনবাদীরা (মুখ্যতঃ ওয়েসম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা) ডারউইন তত্ত্বের তীব্র বিরোধী ছিলেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন হয় ডারউইনবাদের এই মূল নীতিটুকু তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে নূতন প্রজাতি কিভাবে সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদকে তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। অভিযোজন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফলশ্রুতি এই মতবাদকে ওয়েসম্যান প্রাধান্য দেন নাই। তাঁর মতে অভিযোজনের একাধিক কারণ আছে এবং সেই কারণগুলির একটি হইল প্রাকৃতিক নির্বাচন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে নয়া ডারউইনবাদীরা বিবর্তনে পরিবৃত্তির (Mutation) গুরুত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সুতরাং নয়া ডারউইনবাদ অর্থে ডারউইনবাদের মার্জিত রূপ একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আসলে বিবর্তনের পদ্ধতি হিসাবে নয়া ডারউইনবাদ নিজেই অসম্পূর্ণ এবং আংশিক ভুল।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনে তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা এই শতাব্দীতে বংশগতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নবকলেবর লাভ করিয়াছে। বংশগতি ও জীনতত্ত্বের আলোক রশ্মিতে ডারউইনবাদ নূতন ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিবর্তন আলোচনার পটভূমিতে ডারউইনবাদ এবং বংশগতি ও জীনতত্ত্বের সংমিশ্রণে এক নূতন

তত্ত্বের জন্ম হইয়াছে। এই নূতন তত্ত্বের নাম সংশ্লেষতত্ত্ব। সংশ্লেষতত্ত্ব ডারউইন তত্ত্বের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে কিন্তু নয়া ডারউইন তত্ত্বে নহে।

বিবর্তনের সংশ্লেষতত্ত্ব (Synthetic theory of Evolution)

বিবর্তনের সংশ্লেষতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা ডবজানস্কি (Dobzhansky), ফিসার (Fisher), হ্যালডেন (Haldane), সোয়েল রাইট (Sewell Wright), মেয়ার (Meyr) এবং স্টেবিনস্ (Stebbins)।

বিংশ শতাব্দীতে বংশগতি ও জীনতত্ত্ব গবেষণায় প্রাপ্ত ফল ডারউইন তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ইহারা ডারউইন তত্ত্বকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ডারউইন তত্ত্বের এই নূতন ব্যাখ্যাকেই বিবর্তনের সংশ্লেষতত্ত্ব বলা হয়।

স্টেবিনস তাঁহার প্রসেস অফ অরগ্যানিক ইভোলিউসন (Proces of Organic Evolution) নামক পুস্তকে সংশ্লেষতত্ত্ব প্রতিস্থাপন করেন। তাঁহার মতে জীব বিবর্তনের জন্য কতকগুলি বিশেষ কারণ (Factor) দায়ী। এই কারণগুলি হইল—(a) জীনের পরিবৃত্তি (Gene mutation), (b) ক্রোমোসোমের সংখ্যা এবং গঠনের পরিবর্তন (Changes in the structure and number of chromosomes), (c) জীনের পুনর্বিন্যাস (Gene recombination), (d) প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) এবং (e) প্রজননের বিচ্ছিন্নতা (Reproductive isolation)। তাঁহার মতে ইহাদের প্রথম তিনটির জন্য জীনের প্রকরণ (Genetic variability) সৃষ্টি হয় এবং শেষের দুইটি বিবর্তনের গতিপথ (Direction) নিয়ন্ত্রণ করে।

সংশ্লেষতত্ত্ব সহজভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্টেবিনস একটি উপমার সাহায্য লইয়াছেন। এই উপমায় জীনের পরিবৃত্তিকে বিবর্তন রূপ মোটর গাড়ীর জ্বালানি, জীনের পুনর্বিন্যাসকে ইঞ্জিন, এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনকে চালকরূপে পরিচিত করা হইয়াছে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের পরিবর্তনকে গতির হ্রাসবৃদ্ধি কারক (Accelerator) এবং প্রজননের বিচ্ছিন্নতাকে বিবর্তনের রাজপথে বিভিন্ন চালকের দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিভিন্ন চিহ্ন (যথা—গতি, সীমা, দিকনির্দেশ) রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

সংশ্লেষতত্ত্ব সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

1. বিবর্তন পদ্ধতিতে মূল একক—পপুলেসন (Population)

2. পপুলেশসনের জীন পুলের (Gene pool) কোন পরিবর্তন ক্ষুদ্র বিবর্তনের (Microevolution) প্রারম্ভিক সূচনা।

3. ক্ষুদ্র বিবর্তনের জীনগত পরিবর্তনের (Genetic modification) হার ও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিবর্তনমুখী পপুলেসনটির অবস্থান (ইহার সভ্যসংখ্যা, নিকটবর্তী প্রজাতিদের সহিত ইহার প্রজনন বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি) প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

4. প্রাকৃতিক নির্বাচন, পপ্‌লেসনের গঠনের এলোমেলো পরিবর্তন, পপ্‌লেসনের আকার এবং ন্‌তন পরিবেশে পপ্‌লেসনটির অভিযোজিত হইবার ক্ষমতা সমবেত ভাবে ক্ষুদ্র বিবর্তনজনিত পরিবর্তনকে চালিত করে।

সংশ্লেষতত্ত্বের সার্থক প্রতিষ্ঠা একাধিক কারণের জন্য সম্ভব হইয়াছে, সেই কারণগুলি নিম্নোক্তরূপ—

1. বিবর্তন আলোচনায় পপ্‌লেসনকে ম্‌ল একক র্‌পে স্বীকৃতি দান ও উহার প্রতিষ্ঠা।

2. জীন ও জীনের পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঠিক বিশ্লেষণ এবং বিবর্তনের পদ্ধতি ব্যাখ্যায় উহার প্রয়োগ।

3. প্রজননের বিচ্ছিন্নতার উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব অরোপ।

III. দ্য ভ্রিসের পরিব্যক্তিবাদ (de Vries's Theory of Mutation)

ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হ্যুগো দ্য ভ্রিস (Hugo de Vries, 1848-1935) বিবর্তনের পদ্ধতি হিসাবে 1901 খ্রীষ্টাব্দে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন তাহা **পরিব্যক্তিবাদ** নামে খ্যাত। প্রাণী বা উদ্ভিদের চরিত্রলক্ষণের হঠাৎ পরিবর্তন এবং যে প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে এই পরিবর্তন হইয়াছে তাহাদের বংশধরের মধ্যে উত্তরাধিকারের ধারায় পরিবর্তিত চরিত্রটির বিস্তার হইলে ন্‌তন প্রজাতির সৃষ্টি হয়—ইহাই পরিব্যক্তিবাদের ম্‌ল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দ্য ভ্রিস সন্ধ্যামণি (Evening primrose = *Oenothera lamarckiana*) গাছ লইয়া অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরীক্ষার জন্য তাহাকে সন্ধ্যামণি গাছের চাষ করিতে হইত। একদল সন্ধ্যামণি গাছের মধ্যে তিনি এমন কয়েকটি সন্ধ্যামণি গাছ দেখিতে পাইলেন যাহারা স্বাভাবিক সন্ধ্যামণি গাছ হইতে ভিন্ন। এই পরিবর্তিত সন্ধ্যামণি গাছগুলির বংশধরদের মধ্যেও তিনি পরিবর্তিত চরিত্রলক্ষণগুলির উপস্থিতি দেখিতে পান।

শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে এই পরিবর্তিত সন্ধ্যামণি গাছগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় ইহারা ন্‌তন প্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে। যে গাছগুলি পরিবর্তিত হইয়াছিল তিনি তাহাদের **মিউট্যান্ট** (Mutant) আখ্যা দেন। আর পরিবর্তনটিকে বলেন **মিউটেশন বা সালটেশন** (Mutation or Saltation)। পরিব্যক্তিবাদ তত্ত্বে বলা হইয়াছে একটি প্রজাতিতে হঠাৎ আসা এই ধরনের পরিবর্তন যদি উত্তরাধিকারের নিয়ম মানিয়া চলে তাহা হইলে ঐ প্রজাতি হইতে ন্‌তন প্রজাতির সৃষ্টি হইতে পারে। এক কথায় পরিব্যক্তির ফলে ন্‌তন প্রজাতির সৃষ্টি হয় এবং পরিব্যক্তিই বিবর্তনের একমাত্র কারণ।

দ্য ভ্রিসের পরিব্যক্তিবাদ বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। পরিব্যক্তির ঘটনাটুকু সত্য কিন্তু প্রকৃতিতে পরিব্যক্তি দুর্লভ—সম্ভাবনা দশ লক্ষের মধ্যে মাত্র একবার। কৃত্রিম উপায়ে

মুলার (Muller, 1890-1957) পরিব্যাক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্সরে বা রাসায়নিক প্রয়োগে কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যাক্তি সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ পরিব্যাক্তির ফল মারাত্মক ধরনের। ইহা জীবিত বস্তুর মৃত্যু আনিয়া দেয়। দেহকোষে কোন পরিব্যাক্তি আসিলে উহার কোন মূল্য থাকে না। প্রজনন কোষের পরিব্যাক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়। পরিব্যাক্তি কি জন্য হয় সে সম্বন্ধে দ্য ভ্রিসের কোন ধারণা ছিল না। বর্তমানে অবশ্য জানা গিয়াছে যে ক্রোমোসোম সূত্র আংশিকভাবে নষ্ট (Chromosomal aberration) অথবা জীনের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তনের ফলে পরিব্যাক্তির সৃষ্টি হয়। দ্য ভ্রিস হঠাৎ উদিত পরিব্যাক্তিকে বিবর্তনের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন। ইহা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বক্তব্যের সহিত এক নহে বরং উহার বিপরীত। কেননা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে বলা হইয়াছে সুবিধাজনক পরিবর্তনগুলি নির্বাচিত হইবার পর সেইগুলি প্রকৃতি দ্বারা লালিত হয়। এই পরিবর্তনগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি কর্তৃক বহু বৎসর ও বহু পুরুষ ধরিয়া পালন করার ফলেই নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

অনুচ্ছেদ– 9

অভিযোজন

9.1 অভিযোজনের সংজ্ঞা

জীবকুলের কোন বিশেষ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বাস করিবার উপযোগী গঠনগত, শারীরবৃত্তীয়, স্বভাব ও প্রকৃতির স্থায়ী পরিবর্তনকে অভিযোজন বলে। একই পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে একই ধরনের অভিযোজন পরিলক্ষিত হয়। মাছ, তিমি, সীল প্রভৃতি প্রাণীদের বিবর্তনগত যোগসূত্র অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য বর্তমান। এই ধরনের রূপান্তরকে **একমুখী বা অভিসারী অভিযোজন** (Convergent adaptation) বলে। বিবর্তনগত যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসের জন্য একই শ্রেণীভুক্ত জীবদের মধ্যে ভিন্নমুখী বা **প্রতিসারী অভিযোজন** (Divergent adaptation) দেখা যায়।

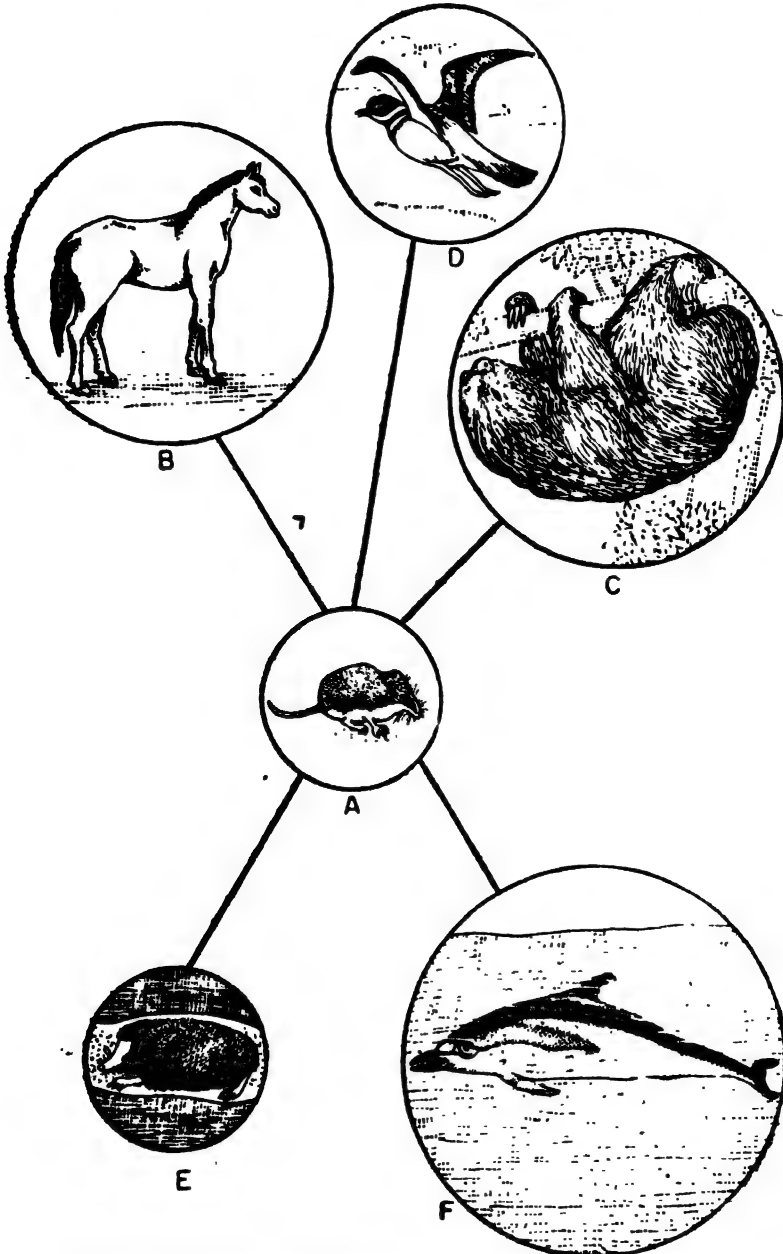
9.2 পরিবেশ ও প্রাণিকুল

জীব-জগতে বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে দৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন উহাদের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রাণীদের পরিবেশ বলিতে কেবলমাত্র ভৌত পরিবেশকে বোঝায় না। প্রাণীদের উপর ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বীয়, রাসায়নিক এবং জৈব পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। ইহাদের মধ্যে ভৌত পরিবেশের পরিবর্তন প্রাণীদের জীবন পদ্ধতি ও গঠনকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করে। আলোক, উষ্ণতা, বায়ু, লবণাক্ততা, জল, মাটির প্রকৃতি ও অন্যান্য ভৌত উপাদান প্রাণীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে।

9.3 প্রাণীদের অভিযোজন

পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রাণীরা নিজেদের মানাইয়া চলিতে পারে। প্রাণীরা এই বিশেষ ক্ষমতার বলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। অর্থাৎ স্বপরিবেশে গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় রূপান্তরের মাধ্যমে স্থায়ী সমতা রক্ষা অভিযোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাণীদের, বিশেষ করিয়া মেরুদণ্ডীদের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে অভিযোজনের মূলকথা স্পষ্ট হইয়া যায়। নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীরা (যথা— মাছ) জলবাসী পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্টি হইয়া জলেই বাস করিতেছে। সুতরাং মাছেদের অভিযোজন জলে বসবাসের উপযোগী। খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা এবং জলবাসী প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কিংবা প্রতিকূলতা হইতে রক্ষার জন্য প্রাথমিক জলবাসী প্রাণীদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের উদ্ভব হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে প্রাথমিক মেরুদণ্ডীদের মধ্যে ভিন্ন পরিবেশে

ছড়াইয়া পড়িবার প্রবণতা আসে (চিত্র 9.1)। উভচর প্রাণীরা সর্বপ্রথম জল



9.1 অভিযোজনের বিকিরণ—মূল অভিযোজন (A), কারসোরিয়াল (Cursorial) অভিযোজন (B), বৃক্ষাশ্রয়ী (C), নভশ্চর (D), গর্তবাসী (E), জল অভিযোজন (F) ।

পরিবেশ ত্যাগ করিয়া স্থলে চলিয়া আসে। ইহারা সম্পূর্ণভাবে ডাঙ্গায় অভিযোজিত নয়। কারণ প্রজননের প্রয়োজনে ইহাদের জল পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু উভচর হইতে বিবর্তিত সরীসৃপ প্রকৃত স্থলচর প্রাণী। ডাঙগায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইহাদের নানা প্রকার অভিযোজন সাধিত হইয়াছে। বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সরীসৃপ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সরীসৃপ হইতে কালক্রমে পক্ষিকুল ও স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব হইয়াছে। ডাঙগায় আসিয়া প্রাণীরা একই প্রাকৃতিক ঘটনার সম্মুখীন হয়। খাদ্য ও স্থানাভাবের জন্য স্থলচর প্রাণীদের উপযুক্ত পরিবেশের খোঁজে বিভিন্ন পরিবেশে ছড়াইয়া পড়িতে হয়। এই ধরনের বিস্তারণের ঘটনাকে প্রাণিবিদ্যায় **অভিযোজ্য বিকিরণ** (Adaptive Radiation) বলে। কয়েকটি স্থলচর প্রাণী স্থল ত্যাগ করিয়া পুনরায় জলে ফিরিয়া গিয়াছে, যথা—তিমি, সীল, কচ্ছপ প্রভৃতি। এই ধরনের জলবাসী জীবকে গৌণ জলবাসী প্রাণী বলে। একই পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্ট একাধিক প্রাণিগোষ্ঠী কিংবা ভিন্ন পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাণী একই বা ভিন্ন পরিবেশে আসিয়া অভিযোজিত হইতে পারে। এই ধরনের ঘটনা প্রাণীদের বিবর্তনের ইতিহাসে প্রচুর দেখা যায়। বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসের জন্য প্রাণীদের নানারূপ শারীরবৃত্তীয় ও গঠনগত অভিযোজন পরিলক্ষিত হয়। প্রাণিকুলের কয়েকটি প্রধান প্রধান অভিযোজন নিম্নে আলোচিত হইল।

1. মরু অভিযোজন

মরুভূমি এক বিশেষ শুষ্ক, জলহীন ও প্রতিকূল স্থল পরিবেশ। প্রতিকূল পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য প্রাণী নানাবিধ দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন দ্বারা সেখানে বাস করে। মরুবাসের জন্য স্থায়ী রূপান্তরকে মরু অভিযোজন (Desert adaptation) বলে। মরু অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে i. বালুকাময় মরুঅঞ্চল (Sandy desert), ii. তুষারময় মরুঅঞ্চল(Snowy desert), iii. স্বল্প-পুষ্টিদায়ী মরুঅঞ্চল (Low-nutrient desert), iv. অধিবিষজনিত মরুঅঞ্চল (Deserts due to toxication), v. অধিক লবণযুক্ত মরুঅঞ্চল (High-salt desert) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভূ-পৃষ্ঠের উপরি-উক্ত মরুঅঞ্চলের মধ্যে বালুকাময় মরু অঞ্চল এবং তুষারময় মরু অঞ্চলই প্রধান। **বালুকাময় মরুঅঞ্চলে** বৃষ্টিপাতের হার খুব কম। **তুষারময় মরুঅঞ্চল** বরফে আবৃত থাকে। মেরুঅঞ্চল ও আলপাইন অঞ্চলের তুষার আবৃত অঞ্চল আদর্শ তুষারময় মরুঅঞ্চল। এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীদের অভিযোজন প্রধানতঃ অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করার মধ্যে নিহিত।

কোন বিশেষ অঞ্চলের মৃত্তিকা অত্যধিক ব্যবহৃত হইলে মৃত্তিকার উর্বরতা ক্রমে

হ্রাস পায়। কালক্রমে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন উক্ত মৃত্তিকা চাষের অযোগ্য হইয়া যায় এবং উহাতে কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। ফলে অঞ্চলটি মুখ্যত মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ভূপৃষ্ঠের এই ধরনের অঞ্চলকে **স্বল্প-পুষ্টিদায়ী মরুঅঞ্চল** বলে। আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন অঞ্চলে অত্যধিক বিষাক্ত দ্রব্যের উপস্থিতির ফলে অঞ্চলটি প্রাণীদের বসবাসের পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই ধরনের অঞ্চলকে **অধিবিষজনিত মরুঅঞ্চল** বলে। নদীর মোহনা সংলগ্ন অঞ্চলের মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে লবণযুক্ত জল থাকায় প্রাণীরা সেই জল গ্রহণে অক্ষম হয় এবং অঞ্চলটি প্রতিকূল পরিবেশে পরিণত হয়। এই ধরনের বিশেষ স্থলভূমিকে **অধিক লবণযুক্ত মরুঅঞ্চল** বলে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উপরি-উক্ত মরুঅঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। বিশেষ অঙ্গ-সংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের জন্যই জীবকুল জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। সকল মরুঅঞ্চলের মধ্যে বালুকাময় মরুঅঞ্চলকে আদর্শ মরুঅঞ্চলরূপে গণ্য করা হয়।

বালুকাময় মরুঅঞ্চল

বালুকাময় মরুঅঞ্চল একটি বিশাল বালুকাময় স্থল পরিবেশ যেখানে—

i. বৃষ্টিপাত খুব কম, বৎসরে গড়ে 25 cm;

ii. অত্যধিক উত্তাপ অথবা শৈত্য ;

iii. জলের অভাব, অর্থাৎ অত্যধিক সৌর বিকিরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে জলীয় ভাগ কম থাকে ;

iv. দিনের বেলায় প্রায় সর্বক্ষণই বালু ঝড়ের প্রবাহ ;

v. গাছপালার অভাব (মরূদ্যান ব্যতীত)।

নানাবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বালুকাময় মরুঅঞ্চলে অনেক প্রাণী বাস করে। মরুবাসীদের নানাবিধ দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। মরুবাসীদের দৈহিক অভিযোজন অপেক্ষা শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন খুব প্রকট ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মরু অভিযোজনের মূলকথা

মরু অভিযোজন অভিযোজনের দুইটি দিক নির্দেশ করে। প্রথমত জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন প্রতিকূল ভৌত ও জৈব পরিবেশ হইতে নিজেদের রক্ষা করাই মরু অভিযোজনের প্রধান লক্ষ্য।

জল সংগ্রহ (Moisture-getting) : বিপাকীয় ক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রাণীদের জল অপরিহার্য। জল ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বাঁচিতে পারে না। কিন্তু মরুবাসী প্রাণীরা নানান অভিযোজনের দ্বারা প্রতিকূল মরুঅঞ্চলকে বসবাসের উপযোগী করিয়া সুষ্ঠুভাবে বাস করিতে সক্ষম হইয়াছে। বালুকাময় মরুঅঞ্চলে

জল অতি দুর্লভ উপাদান। বালুকাময় মরুঅঞ্চলে বাতাসের জলীয় ভাগ ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটাইতে পারে না, উহা কিন্তু শিশির বিন্দু রূপে পতিত হয়। শিশির বিন্দুর দ্বারা অনেক মরুবাসী প্রাণী নিজেদের বিপাকীয় ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হয়। অধিকাংশ মরুবাসী প্রাণীদের জলের প্রধান উৎস হইল উদ্ভিদরস এবং ইহারা উদ্ভিদ-রসের দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। মাংসাশী প্রাণীরা শিকারের রক্ত পান করিয়া জলের অভাব পূরণ করে। মরুবাসী প্রাণীরা অল্প পরিমাণ জলের দ্বারা বিপাকীয় ক্রিয়াদি সম্পাদনে অভ্যস্ত। মরুবাসী কয়েক ধরনের সরীসৃপের [যথা—মলক হরিদাস (*Moloch horridus*)] ত্বক জলাকর্ষী (Hygroscopic) হওয়ায় শোষক কাগজের (Blotting paper) ন্যায় বায়ুমণ্ডল হইতে জল শোষণ করিতে পারে।

জল সংরক্ষণ (Moisture conservation): বিপাকীয় ক্রিয়ায় উদ্ভূত জলকে শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করা মরুবাসীদের বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন। "মরুভূমির জাহাজ" উট আদর্শ মরুবাসী প্রাণী। পূর্বে অনেকেই মনে করিতেন উটের পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ গাত্রে থলির ন্যায় অসংখ্য প্রকোষ্ঠ (ওয়াটার সেল—Water cells) আছে। উট জল পানের সময় ওয়াটার সেলগুলি জলে পূর্ণ করিয়া লয়। মরুভূমি অতিক্রম কালে জলের প্রয়োজন হইলে উক্ত সঞ্চিত জল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। অধুনা প্রমাণিত হইয়াছে যে উটের শ্বসনকালে গ্লাইকোজেনের ভাঙনের ফলে উদ্ভূত জল (বিপাকীয় জল) পাকস্থলীর অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির মধ্যে, যোগ কলায় ও পেশীতে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজনে এই জল ব্যবহৃত হয়। উটের দেহে 100 গ্রাম ফ্যাট জারিত হইলে প্রায় 110 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। উটের কুঁজে (Hump) সঞ্চিত ফ্যাট সম্পূর্ণভাবে জারিত হইয়া প্রায় আট গ্যালন জল উৎপন্ন করিতে পারে। সকল স্থলচর স্তন্যপায়ীদের স্বেদগ্রন্থি (Sweat glands) হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। ঘর্ম নির্গমনের ফলে দেহ শীতল হয় এবং দেহ হইতে জল নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু জল সংরক্ষণের জন্য মরুবাসী স্তন্যপায়ীদের ঘর্মের ক্ষরণ বন্ধ থাকে। ফলে দেহের অভ্যন্তরে জল সংরক্ষিত হয় এবং জলের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ইহা মরুবাসী স্তন্যপায়ীদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন।

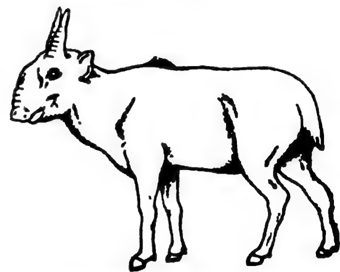
আত্মরক্ষার জন্য পরিবর্তন (Modifications for self-defence)

প্রতিকূল ভৌত পরিবেশ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য মরুবাসীদের আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যায়।

উষ্ণতা হইতে (From temperature): বালুকাময় মরু অঞ্চলে দিনের বেলার উষ্ণতা খুব বেশী ও অসহনীয় (প্রায় 182° ফারেনহাইট)। কিন্তু রাত্রে উষ্ণতা কমিয়া যায়। দিনের অসহনীয় উষ্ণতার কবল হইতে বাঁচিবার জন্য অধিকাংশ মরুচারী প্রাণী বড় পাথর খণ্ডের আড়ালে যায় কিংবা গর্তাশ্রয়ী হয়। মরুবাসী পতঙ্গকুলের উষ্ণতা

সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রকট। উত্তপ্ত পাথরের উপর (যাহা মানুষের পক্ষে স্পর্শ করা অসম্ভব) পতঙ্গ অনায়াসে চলাফেরা করে।

বালুকাবাহী বায়ুপ্রবাহ হইতে (From sand-storm): দিনের বেলায় বালুকাবাহী ঝড় হইতে আত্মরক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়—এই তিনটি প্রধান। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় তিনটিকে রক্ষণের জন্য মরুবাসীদের নানান ধরনের দৈহিক রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। আত্মরক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ ও আশ্রয়ের জন্য মরুবাসীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। উটের নেত্রপল্লবের কিনারায় অসংখ্য লম্বা ও ঘনসন্নিবিষ্ট রোম বিদ্যমান। ইহারা বালু হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে। সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের নেত্রপল্লবের পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় সকল মরুচারী সরীসৃপের নেত্রপল্লব প্রশস্ত শল্ক দ্বারা সুরক্ষিত। গর্তাশ্রয়ী মরুবাসী সাপ, টিপলপস্ (*Typlophs*) ইত্যাদির ক্ষেত্রে চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্রাকার এবং মস্তক অঞ্চলের বিশেষ শল্ক দ্বারা রক্ষিত। আগামা (*Agama*) এবং ফ্রাইনোসেফালাস (*Phrynocephalus*) নামক সরীসৃপের নেত্রপল্লব প্রসারিত এবং কিনারায় শল্ক সজ্জিত থাকে। টেরাটোসিনকাসের (*Teratoscincus*) ঊর্ধ্ব নেত্রপল্লবটি অপেক্ষাকৃত প্রসারিত এবং চক্ষুকে বালুকাবাহী ঝড় হইতে রক্ষা করে। মাবুইয়া (*Mabuia*) নামক সরীসৃপের প্রশস্ত নিম্ন নেত্রপল্লবের মধ্যস্থল স্বচ্ছ হইয়া জানালা সদৃশ হইয়া যায়। ফলে নেত্রপল্লব দুইটি বন্ধ হইলেও দর্শন-ক্রিয়া বিঘ্নিত হয় না। অ্যাব্লিফেরাস (*Ablepharus*) নামক সরীসৃপের সমগ্র নিম্ন নেত্রপল্লবটি স্বচ্ছ ঝিল্লীতে পরিণত হইয়া ঊর্ধ্ব নেত্রপল্লবের সহিত সংযুক্ত থাকে। উট বহিঃনাসারন্ধ্রদ্বয় ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ করিতে বা খুলিতে পারে। অধিকাংশ মরুবাসী সরীসৃপদের বহিঃনাসারন্ধ্রের আয়তন খুব কম এবং কপাটিকা সম্মুখ হওয়ায় ছিদ্রপথ জটিল হইয়াছে। সায়গা টারটারিকা (*Saiga tartarica*) নামক মরুবাসী স্তন্যপায়ীর মস্তকের নাসিকা অঞ্চল প্রবর্ধিত হওয়ায় বহিঃনাসারন্ধ্রদ্বয় পশ্চাৎমুখী (চিত্র 9.2)। ফলে বালুকা ঝড়ের সময় বালি নাসাবিবরে প্রবেশ করিতে পারে না। সরীসৃপদের কর্ণপটহ শল্ক দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।



9.2 সায়গা টারটারিকার ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্রদ্বয় পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত।

কয়েকটি মরুবাসী সরীসৃপের কর্ণকুহরের কোন ছিদ্র থাকে না। উটের কর্ণকুহর লোম দ্বারা রক্ষিত। উট এবং উটপাখীর গ্রীবা অতিরিক্ত লম্বা হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রিয় সমেত মস্তকটি ভূমি হইতে অনেক উচ্চে থাকে।

শত্রুদের নিকট হইতে (From enemies): অন্যান্য পরিবেশতন্ত্রের ন্যায়

মরু অঞ্চলেও জীবকুল খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের ভিত্তিতে অবস্থান করে। সবল প্রাণী দুর্বলদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং খাদকের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—

বর্ণগ্রহ ও অনুকৃতি (Colouration and Mimicry): অধিকাংশ মরুচারী প্রাণীদের গায়ের রঙ বালির রঙের ন্যায় হওয়ায় ইহারা পরিবেশের সহিত গাত্রবর্ণ মিলাইয়া আত্মরক্ষা করে। গ্যাজেল (*Gazelle*) নামক মরুচারীর বর্ণগ্রহ উল্লেখ্য। ইহাদের গায়ের রঙ বালির রঙের ন্যায়। গ্যাজেল নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলে খাদকের পক্ষে ইহার অস্তিত্ব নির্ধারণ করা দুরূহ। ইহা এক প্রকার রক্ষাবর্ণ (Protective colouration)। গিলা মনস্টার (*Gila monster*) নামক বিষধর গিরগিটির গায়ে হলুদ ও কালো বর্ণের সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। ইহা আক্রমণাত্মক বর্ণগ্রহের (Aggressive colouration) উদাহরণ।

দেহত্বকের পরিবর্তন (Modifications of body surface): শুষ্ক, কঠিন ও কণ্টকময় ত্বক মরুবাসী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত



9.3 ফ্রাইনোসোমা—মরুবাসী সরীসৃপ। ইহার দেহশল্ক কণ্টকে রূপান্তরিত।

করার জন্য অধিকাংশ মরুচারী সরীসৃপের ত্বকের শল্কগুলি কণ্টকে পরিণত হইয়াছে। ফ্রাইনোসোমা (*Phrynosoma*), মলক হরিদাস (*Moloch horridus*) ইত্যাদির দেহত্বক কণ্টকময় (চিত্র 9.3)।

বিষধর মরুচারী (Venomous desert dwellers): অধিকাংশ মরুচারী প্রাণী বিষধর। মরুবাসী সর্পকুল, পিঁপড়া, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণী বিষধর। মরুবাসী লাল পিঁপড়া (Red ants), কাঁকড়া বিছা (Scorpion) এবং ট্যারেনটুলা (*Tarantula*) নামক মাকড়সা ভয়ংকর বিষাক্ত হয়। মরুবাসী অধিকাংশ সাপ বিষধর। র‍্যাটেল সাপ (Rattle snake) একটি তীব্র বিষযুক্ত মরুবাসী সরীসৃপ।

বিকর্ষী গন্ধ (Repulsive odour): অধিকাংশ মরুবাসী প্রাণীদের বিকর্ষী গন্ধ উৎপাদনের ক্ষমতা এক বিশেষ ধরনের অভিযোজন। বিকর্ষী গন্ধের দ্বারা ইহারা খাদকের কবল হইতে রক্ষা পায়।

দ্রুত গমনের জন্য পরিবর্তন (Modifications for speed): মরুবাসী

প্রাণীদের দ্রুত গমনের প্রয়োজন আছে। বালুকাময় বিস্তীর্ণ এলাকায় ভ্রমণের সময় উপযুক্ত আশ্রয় ও নিরাপত্তা এবং খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের জন্য অধিকাংশ প্রাণীদের, বিশেষ করিয়া স্তন্যপায়ীদের দ্রুত স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। ফলে ইহাদের মধ্যে দ্রুত গতিসূচক অভিযোজন সাধিত হইয়াছে। উটের পদতল বালুর উপর দিয়া গমনে বিশেষভাবে অভিযোজিত।

II. ভোল্যাণ্ট অভিযোজন

জীবন-সংগ্রামের চাপে অনেক প্রাণীই আকাশচারী। আকাশে সুষ্ঠুভাবে উড়িবার জন্য এই সকল প্রাণীর নানা ধরনের আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। যে সকল রূপান্তর ও পরিবর্তনের ফলে আকাশচারীরা অন্তরীক্ষ জয়ে সমর্থ তাহাদের একত্রে **ভোল্যাণ্ট অভিযোজন** বলে। আকাশচারী প্রাণীরা খেচর বা নভশ্চর নামেও অভিহিত। কোন প্রাণী স্থায়ীভাবে আকাশে বাস করিতে পারে না। কিন্তু অনেকেই শূন্যে অনেকক্ষণ উড়ন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে।

ভোল্যাণ্ট অভিযোজনে দ্বিমুখীতা : প্রতিটি নভশ্চর প্রাণী সম্পূর্ণরূপে আকাশচারী নহে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দুইপ্রকার অভিযোজন পরিলক্ষিত হয়। অভিধানিক অর্থানুসারে ভোল্যাণ্ট শব্দটি যে সকল প্রাণী আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের নির্দেশ করে। কিন্তু ইহারা সকল সময়ই আকাশে উড়িয়া বেড়ায় না। বিশ্রাম, আহার, প্রজনন প্রভৃতি জৈব প্রয়োজনে ইহাদের গাছের ডালে কিংবা ডাংগায় ফিরিয়া আসিতে হয়। সেইজন্য ভোল্যাণ্ট প্রাণীদের মধ্যে দুইটি বিপরীতমুখী অভিযোজন প্রতিভাত হয়। একটির দ্বারা ভোল্যাণ্ট প্রাণীরা নিপুণভাবে আকাশে উড়িতে পারে। অন্যটির সাহায্যে ইহারা ডাংগায় এবং গাছের ডালে বা অন্য কোন পরিবেশে বাস করিতে পারে। পাখীরা আদর্শ ভোল্যাণ্ট প্রাণী। প্রকৃত ভোল্যাণ্ট প্রাণীদের আকাশে উড়িবার জন্য অভিযোজন অন্য সকল অভিযোজন অপেক্ষা অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নিপুণ।

নভশ্চর জীবনের অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী

আকাশে উড়িবার জন্য ভোল্যাণ্ট প্রাণীদের নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করিতে হয় :—

A. উড়িবার জন্য বিশেষ উড্ডয়ন অংগ,
B. হাল্কা অথচ মজবুত দেহ কাঠামো,
C. অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদন-ক্ষমতা,
D. দ্রুতগতিতে উড়িবার ক্ষমতা,
E. উড়িবার সময় দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

উপরি-উক্ত শর্তাবলী পূরণের উপর ভোল্যাণ্ট প্রাণীদের নভশ্চর জীবনের

সাফল্য নির্ভর করে। আদর্শ নভশ্চর প্রাণীরা (যথা—পক্ষিকুল) সকল শর্ত নানাবিধ আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন বা রূপান্তরের দ্বারা পূরণ করায় ইহারা প্রাণিকুলের **জীবন্ত উড়োজাহাজ** (Living aeroplane)।

আকৃতিগত রূপান্তর

ভোল্যান্ট অভিযোজনের মান বা তীব্রতা নভশ্চর প্রাণীদের উড়িবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সকল নভশ্চর প্রাণীর দৈহিক আকৃতি ও গঠন বিশেষ ধরনের হওয়ায় কোন প্রক্ষিপ্ত অঙ্গ কোন বাধা সৃষ্টি করে না। উড্ডুক্কু প্রাণীদের দুই ধরনের উড্ডয়ন বা উড়া (Flight) পরিলক্ষিত হয়, যথা—

a. **নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন** (Passive flight),

b. **সক্রিয় উড্ডয়ন** (Active flight)।

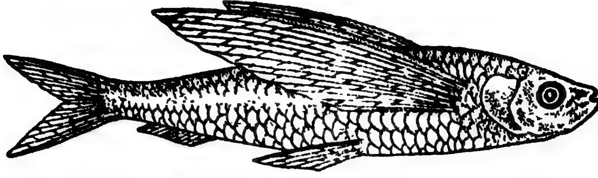
নিষ্ক্রিয় উড়ার সময় কোন প্রাণী পর্বতের চূড়া অথবা কোন বৃক্ষের উঁচু ডাল হইতে মাটিতে লম্ফনের সময় পৃথিবীর মহাকর্ষীয় শক্তির প্রভাবে কয়েক মিটার অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এই ধরনের প্রাণীদের আকাশে সক্রিয়ভাবে উড়িবার জন্য কোন বিশেষ অঙ্গ থাকে না। দেহের কোন অংগ বা অঞ্চল প্রসারিত হওয়ায় বায়ুতে দেহের প্লাবতা রক্ষিত হয়। কিন্তু পাখি, বাদুড় প্রভৃতি নভশ্চরদের আকাশে উড়িবার জন্য বিশেষ অঙ্গ আছে। **উড্ডয়ন অঙ্গের** (Organs for flight) ক্রিয়ার ফলে এই সকল প্রাণী সক্রিয়ভাবে আকাশে উড়িতে পারে। এই ধরনের উড়া মহাকর্ষীয় শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

A. **উড্ডয়ন অঙ্গ** (Organs for flight)

উড্ডয়ন অঙ্গের ক্রিয়ার দ্বারা অনেক প্রাণী নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়ভাবে আকাশে সাময়িকভাবে কিংবা অনেকক্ষণ উড়িতে পারে। নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় শক্তির প্রভাব এবং উচ্চস্থান হইতে লম্ফনের বল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধরনেব উড্ডয়নে ইচ্ছানুযায়ী দিক পরিবর্তন সম্ভব নহে : যে সকল প্রাণী নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নে সক্ষম তাহাদের ক্ষেত্রে দৈহিক রূপান্তর বাতাসে ভর করিয়া ভাসিয়া থাকিবার অঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত উড্ডয়নে সক্ষম প্রাণীরা উড্ডয়ন অঙ্গের সক্রিয় ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় শক্তির বিপক্ষে শূন্যে বিচরণ করিতে পারে।

a. **প্রসারিত বক্ষ-পাখনা** (Expanded pectoral fins): কয়েক ধরনের উড্ডুক্কু মাছ [পেগাসাস (*Pegasus*), প্যানটোডন (*Pantodon*), ড্যাকটাইলোপটেরাস (*Dactylopterus*), এক্সোসিটাস (*Exocoetus*)] উহাদের প্রসারিত বক্ষ-পাখনার সাহায্যে জলের উপরে প্রায় 180—280 মিটার অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে (চিত্র 9.4)। ইহাদের শ্রোণীপাখনা দুইটি তুলনামূলকভাবে

ক্ষুদ্রাকার। পুচ্ছ-পাখনার দুইটি খণ্ডের মধ্যে অংকীয় খণ্ডটি প্রসারিত এবং ইহার

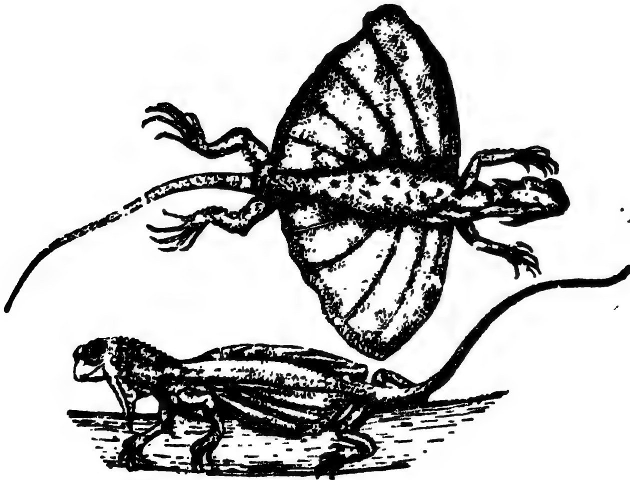


9.4 উড়ুক্কু মাছের (Exocoetus) বক্ষ-পাখনা প্রদর্শিত।

সাহায্যে দ্রুত সন্তরণ কালে লাফাইয়া শূন্যে উঠিতে পারে। প্রকৃত নভশ্চর প্রাণীদের মধ্যে উড়ুক্কু মাছগুলির অন্তর্ভুক্তি অবশ্য একটি বিতর্কিত বিষয়।

b. **লিপ্তপদ** (Webbed feet) ঃ র‍্যাকোফোরাস (*Rhacophorus*) নামক বৃক্ষবাসী ব্যাঙ লিপ্তপদের সাহায্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে বায়ুতে প্লাবতা রক্ষা করিয়া অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে। লিপ্তপদ ছাড়া দেহকাণ্ডের দুই পার্শ্বে অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী অংশের ত্বক প্রসারিত হইয়া সংক্ষিপ্ত প্যাটেজিয়া সৃষ্টি করে। গাছের ডাল হইতে কিংবা কোন উঁচু জায়গা হইতে লাফ দিয়া ইহারা প্যাটেজিয়াকে প্যারাসুটের ন্যায় ব্যবহার করিয়া কিছু অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ধীরে ধীরে মাটিতে ফিরিয়া আসে। সকল গেছো ব্যাঙের মধ্যে র‍্যাকোফোরাস পারডেলিস (*Rhacophorus pardalis*) প্রজাতির বাতাসে ভর করিয়া মাটিতে নামিয়া আসার ক্ষমতা খুব বেশী।

c. **প্যাটেজিয়া** (Patagia) ঃ প্যাটেজিয়া বস্তুত দেহ ত্বক হইতে সৃষ্ট



9.5 উড়ুক্কু সরীসৃপ (*Draco*)।

প্রসারিত ঝিল্লীর ন্যায় বিশেষ অংগ। ক্ষেত্রবিশেষে প্যাটেজিয়া (একবচন—প্যাটেজিয়াম = Patagium) কংকাল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ড্রেকো (*Draco*) বা উড়ন্ত ড্রাগন (Flying Dragon) নামক উড়ুক্কু গিরগিটি দেহের দুই পার্শ্বের প্যাটেজিয়ার দ্বারা সক্রিয়ভাবে আকাশে উড়িতে পারে (চিত্র 9.5)। প্রতিটি প্যাটেজিয়াম 5 অথবা 6-টি পর্শুকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। প্রসারিত পর্শুকাগুলি ছাতার শিকের ন্যায় প্যাটেজিয়ামকে উড়ন্ত অবস্থায় বিস্তৃত রাখিতে সহায়তা করে। যখন ব্যবহৃত হয় না তখন প্যাটেজিয়া দেহকাণ্ডের পার্শ্বে ভাঁজ হইয়া যায়। টাইকোজুন (*Ptychozoon*) নামক উড়ুক্কু গেছো গিরগিটি গ্রীবা, দেহকাণ্ড, লেজ এবং অগ্র ও পশ্চাৎ পদের অংগুলির পার্শ্বদেশ হইতে প্রসারিত প্যাটেজিয়া দ্বারা বাতাসে ভর দিয়া ড্রেকোর ন্যায় কিছু-দূর উড়িতে পারে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বহু প্রাণী উন্নত গঠনের প্যাটেজিয়ার দ্বারা উড়িতে পারে। পাখীদের ক্ষেত্রে পালকের আবির্ভাবের ফলে প্যাটেজিয়া লুপ্ত-প্রায় অংগে পরিণত হইয়াছে। ডানায় প্রি-প্যাটেজিয়াম (Pre-patagium) এবং পোস্ট-প্যাটেজিয়াম (Post-patagium)-এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। উড়ুক্কু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উড়ুক্কু লেমুর (Flying Lemur) বা গ্যালিওপিথিকাস (Galeopithecus) নামক খেচর প্রাণীর অভিযোজন অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের। ইহাদের প্যাটেজিয়াম মস্তকের পশ্চাৎদেশ হইতে গ্রীবার পার্শ্বদেশ বরাবর অগ্রপদের অংগুলি পর্যন্ত, অগ্রপদের অংগুলি হইতে দেহকাণ্ডের পার্শ্বদেশ বরাবর পশ্চাৎপদের অংগুলি পর্যন্ত এবং পশ্চাৎপদের অংগুলি হইতে লেজের পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত (চিত্র 9.6)। ইহাদের অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদও লিপ্তপদ। উড়ুক্কু কাঠবেড়ালীর (Flying squirrel) ক্ষেত্রে দেহকাণ্ডের দুই পার্শ্বের সুবিস্তৃত প্যাটেজিয়াম এবং লোমশ লম্বা লেজ ইহাদের আকাশে উড়িতে সাহায্য করে।



9.6 উড়ুক্কু লেমুর।

প্রসারিত বক্ষ-পাখনা, লিপ্তপদ এবং প্যাটেজিয়া প্রকৃত উড্ডয়ন অংগ নয়। এই সকল অংগের সাহায্যে প্রাণীরা শূন্যমার্গে কিছুদূরে বিচরণ করিতে পারিলেও এই সকল ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রকৃত উড্ডয়নক্ষম প্রাণীরা

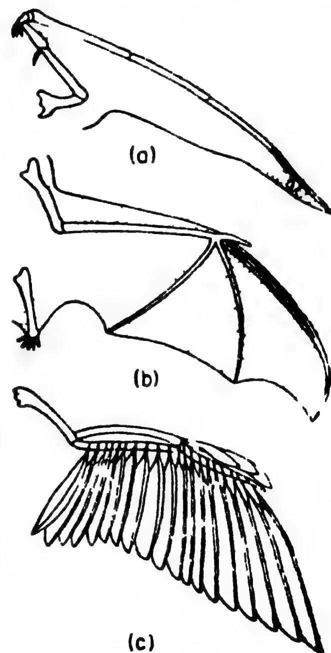
বায়ুস্তরে মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে উড়িতে পারে। এই সকল প্রাণীদের মধ্যে বাদুড় (Bats), অতীত কালের টেরোড্যাক্টাইল (Pterodactyl) এবং পাখী (Birds) প্রধান। ডানার (Wings) উৎপত্তি ইহাদের আদর্শ খেচর প্রাণীরূপে পূর্ণতা প্রদান করিয়াছে।

d. **পক্ষ বা ডানা** (Wings)—**উড়িবার অঙ্গের চরম পর্যায়**ঃ অগ্রপদদ্বয়ের রূপান্তরের ফলে সৃষ্ট ডানা প্রাণিজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ উড়িবার অঙ্গ। ডানার গঠন খুবই জটিল এবং নভশ্চর মেরুদণ্ডীদের তিন প্রকার ডানা দৃষ্ট হয় (চিত্র 9.7)—

(i) **বাদুড়ের ডানা** (Wings of Bat)ঃ বাদুড়ের ডানাদ্বয় প্যাটেজিয়া দ্বারা গঠিত এবং তিন বা চারিটি প্রলম্বিত অঙ্গুলি ইহার কাঠামো গঠন করে।

(ii) **টেরোড্যাক্টাইলের ডানা** (Wings of Pterodactyl)ঃ টেরোড্যাক্টাইল নামক অশ্মীভূত সরীসৃপের কেবলমাত্র চতুর্থ মেটাকারপ্যাল ছাড়া অন্য অঙ্গুলিগুলি খুবই সংকীর্ণ ও লুপ্তপ্রায়। ডানা-অঙ্গুলিটি সমগ্র প্যাটেজিয়ামটিকে ধারণ করিত।

(iii) **পাখির ডানা** (Avian wings)ঃ পাখির ডানার গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। সমগ্র অগ্রপদদ্বয়ের রূপান্তর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তঃকঙ্কালের পরিবর্তন খুবই প্রকট। হিউমেরাস (Humerus অস্থিটি অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং সুদৃঢ়। উড্ডয়ন-পেশীসমূহের (Flight muscles) সংযুক্তির জন্য হিউমেরাসের প্রবর্ধনগুলি সুস্পষ্ট ও উন্নত। রেডিয়াস (Radius) এবং আলনা (Ulna) সংকীর্ণ, দৃঢ় এবং কিঞ্চিৎ বক্র। কারপ্যাল ও অঙ্গুলির অস্থিসমূহ নানাভাবে একত্রে সংযুক্ত হইয়া একটি একক সৃষ্টি করিয়াছে। কেবলমাত্র তিনটি অঙ্গুলি থাকে (চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্গুলির কোন চিহ্ন থাকে না)। মণিবন্ধ, করতল ও অঙ্গুলির অস্থিখণ্ডগুলির সংযুক্তির ফলে উড়িবার সময় যান্ত্রিক ঘর্ষণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। প্যাটেজিয়া লুপ্তপ্রায় থাকে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের পালক (Feathers) বিশেষ রীতিতে ডানায় বিন্যস্ত থাকায় ডানার আয়তন বর্ধিত হয়। ডানায় সজ্জিত পালকগুলি খুবই প্রশস্ত ও লম্বা এবং ইহাদের রেমিজেস (Remiges) বলে। ডানার আকার ইংরাজী অক্ষর 'Z'-এর



9.7 মেরুদণ্ডীর ডানা—টেরোড্যাক্টাইল (a), বাদুড় (b), পাখী (c)।

ন্যায় এবং যখন ব্যবহৃত হয় না ডানা দুইটি দেহের পার্শ্বে ভাঁজ হইয়া থাকে। ডানাসংলগ্ন পেশীগুলি বিশেষভাবে পরিবর্তিত এবং শক্তিশালী (চিত্র 15.8, পৃষ্ঠা 408, প্রাণিবিদ্যা প্রথম খন্ড দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। উরঃফলকের অংকতলে অবস্থিত পেক্টোর‍্যালিস মেজর (Pectoralis major), পেক্টোর‍্যালিস্ মাইনর (Pectoralis minor), কোরাকো-ব্রেকিয়ালিস (Coraco-brachialis) প্রভৃতি পেশীর ক্রিয়া প্রধান।

পতঙ্গের ডানা (Wings of Insects): উপরি-উক্ত তিন ধরনের ডানার গঠন ও ক্রিয়া একই প্রকার এবং ইহারা প্রকৃত **সমসংস্থ অঙ্গ** (Homologous organs)। প্রাণিকুলে পতংগশ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ সভ্য বক্ষদেশ হইতে সৃষ্ট এক বা দুই জোড়া ডানার সাহায্যে সক্রিয়ভাবে উড়িতে পারে। পতংগের ডানার গঠন সম্পূর্ণ আলাদা এবং ইহাদের কোন অন্তঃকংকাল থাকে না। মেরুদন্ডীদের ডানা ও পতংগের ডানা **সমবৃত্তি অঙ্গ** (Analogous organs)।

দেহ হাল্কা অথচ মজবুত করিবার অভিযোজন (Adaptation for lightness and rigidity)।

দেহকে হাল্কা অথচ মজবুত করিবার জন্য নভশ্চর প্রাণীদের অংগসংস্থানিক অভিযোজন খুবই প্রকট। অন্তঃকংকালতন্ত্র বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ডানা-সংলগ্ন শক্তিশালী পেশীসমূহের ক্রিয়ার সময় সৃষ্ট প্রেষ প্রতিহত করিবার জন্য অধিকাংশ অস্থি খুবই সুগঠিত। পরিবর্তনের চরম অধ্যায় পক্ষিকুলে (যে সকল পাখি উড়িতে পারে) দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্রাকার অনেক অস্থির সংযুক্তি পাখিদের অন্তঃ-কংকালতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ফলে অল্পসংখ্যক অস্থির সমন্বয়ে গঠিত দৃঢ় কাঠামো অধিক চাপ ও নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারে। নভশ্চর পাখিদের অস্থির মধ্যে বাতাবকাশ (Pneumatic space) থাকায় দেহের ওজন হ্রাস পায় (চিত্র 15.25, পৃষ্ঠা 454, প্রাণিবিদ্যা প্রথম খন্ড দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। বাতাবকাশ থাকিলেও অস্থি কাঠামোর দৃঢ়তা হ্রাস পায় না। অস্থির বাহিরে একটি অতিরিক্ত আস্তরণ থাকে। ফুসফুস হইতে সৃষ্ট প্রধান ও আনুষংগিক বেলুনের ন্যায় বায়ুস্থলীর (Air sacs) মধ্যে উষ্ণ বায়ু আবদ্ধ থাকায় দেহ সামগ্রিকভাবে হাল্কা হয়, কারণ উষ্ণ বায়ু বায়ু-মণ্ডলের সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা (চিত্র 15.12, পৃষ্ঠা 420, প্রাণিবিদ্যা প্রথম খন্ড দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। নভশ্চর পাখিদের অনেক আন্তর অঙ্গ [যথা—পিত্তস্থলী, মূত্রস্থলী, দক্ষিণ পার্শ্বের ডিম্বাশয় (স্ত্রী পাখির) এবং লুপ্ত প্রায় দক্ষিণ ডিম্বনালী] অনুপস্থিত থাকে। করোটি অস্থিসমূহ খুবই পাতলা এবং ইহাদের সীবন (Suture) থাকে না।

অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ (Supply of extra energy)

জ্বালানির দহনের ফলে রাসায়নিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিবর্তিত হয়।

পাখিদের শ্বসনতন্ত্র এবং সংবহনতন্ত্র খুবই উন্নত মানের। উড্ডয়নকালে পাখিদের শ্বসন-হার বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসদ্বয় আকারে ছোট হইলেও বায়ুস্থলীসমূহ থাকার ফলে ইহাদের কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বর্ধিত হইয়াছে। দেহের উষ্ণতা (প্রায় 110°F) হওয়ায় ইন্ধনের দহন দ্রুতগতিতে ঘটে, ফলে অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদিত হয়। দেহের বাহিরে অপরিবাহী (Non-conducting) পালকের আচ্ছাদন থাকার ফলে দেহত্বক হইতে উত্তাপ বিনষ্ট হয় না। যদিও পাখির দেহে অপ্রয়োজনীয় আন্তর-অঙ্গের বিলুপ্তির আভাস পরিলক্ষিত হয় তথাপি অশোধিত ইন্ধনরূপে খাদ্যবস্তু অন্ননালী হইতে সৃষ্ট থলি, ক্রপের (Crop) মধ্যে সঞ্চিত থাকে। শ্বসনের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক দক্ষতার উপরই শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা অন্তর্নিহিত থাকে। অধিকাংশ নভশ্চর প্রাণীদের (বিশেষ করিয়া পাখিদের) হৃৎপিণ্ডের আকার দেহানুপাতে বড় এবং খুব শক্তিশালী।

দ্রুতবেগে উড়িবার অভিযোজন (Modifications for obtaining speed)

সকল নভশ্চর প্রাণীর ক্ষেত্রে দ্রুততা অপরিহার্য। দেহটি সাধারণত মূলাকার (Fusiform) হয় এবং দেহের কোন প্রক্ষিপ্ত অঙ্গ বায়ুর রোধ প্রতিহত করে না। ফলে ইহারা অনায়াসে বায়ু ভেদ করিয়া উড়িতে পারে। উড়িবার সময় প্রলম্বিত গ্রীবা সম্মুখদিকে প্রসারিত থাকে এবং পশ্চাৎপদ দুইটি উহাদের অংকদেশে সংস্থাপিত হয়। ফলে বিনা প্রতিরোধে ইহারা বায়ুর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে পারে। উড়িবার সময় সক্রিয় উড্ডয়ন পেশীসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে প্যাডের ন্যায় বায়ুস্থলীর অবস্থানের ফলে যান্ত্রিক ঘর্ষণ হ্রাস পায় এবং ইহারা পেশী-ক্রিয়ার দক্ষতা বাড়াইয়া দেয়।

ভারসাম্য রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের অভিযোজন (Adaptations for maintenance of balance and controlling)

আকাশে দ্রুতবেগে উড়িবার সময় দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজন। দেহ নিখুঁতভাবে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম হওয়ায় দেহের প্রতি পার্শ্বের ওজন প্রায় সমান। অপেক্ষাকৃত ভারী আন্তর অঙ্গগুলি উদর গহ্বরের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত এবং হাল্কা অঙ্গগুলি দেহের অগ্রাংশে সংস্থাপিত। এইরূপ অঙ্গসংস্থানের ফলে পাখিরা সাফল্যের সংগে আকাশে উড়িতে পারে এবং উড্ডয়নকালে দেহের ভারসাম্য রক্ষা সহজ হয়। উড়িবার সময় ডানাদ্বয়ের ভারসাম্যের সমতা আনিবার জন্য ডানার প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের অভ্যন্তরে বায়ুস্থলীগুলি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসমভাবে বিন্যস্ত থাকায় এক পার্শ্বের বায়ুস্থলী হইতে বায়ু অন্য পার্শ্বে স্থানান্তরিত করিয়া অতি সহজেই দেহের ভরকেন্দ্র (Centre of gravity) রক্ষা সম্ভব হয়। উড়িবার সময় লম্বা প্রসারিত পালক সমন্বিত লেজ দাঁড়ের কাজ করে। পাখার ন্যায় প্রশস্ত লেজের পালকগুলিকে রেকট্রিসেস (Rectrices) বলে। নভশ্চর প্রাণীদের

সেরিবেলাম (Cerebellum) সুগঠিত। কারণ সেরিবেলাম মস্তিষ্কের ভারসাম্য রক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত। ইহাদের দর্শন ক্ষমতাও খুব তীক্ষ্ণ এবং মস্তিষ্কের অপটিক লোব (Optic lobe) খুবই উন্নত। চক্ষুগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত পেকটেন (Pecten) নামক বিশেষ রক্তজালিকা সম্মুখ অগ্র দর্শন ক্রিয়ার নিপুণতা বৃদ্ধি করে। স্বল্প আলোকে, বিশেষ করিয়া জ্যোৎস্নায় বাদুড় ভাল দেখিতে পায়। ইহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়সমূহ খুবই উন্নত। বাদুড়ের কর্ণ ও মুখসংলগ্ন উপাঙ্গগুলি বিশেষভাবে সংবেদনশীল এবং উড্ডয়নকালে কোন বস্তুর সহিত সংঘর্ষের হাত হইতে ইহাদের রক্ষা করে। বাদুড় নিশাচর প্রাণী। রাত্রে উড়িবার সময় ইহারা দৃষ্টি অপেক্ষা শব্দতরঙ্গের উপর বেশী নির্ভর করে। উড়িবার সময় বিশেষ ধরনের শব্দ-তরঙ্গের অনুভূতির মাধ্যমে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম। পাখিদের গ্রীবা ট লম্বা ও সঞ্চরণশীল। চারিপার্শ্বে লক্ষ্য রাখিবার জন্য মস্তকটি 180° আবর্তিত হইতে পারে। গ্রীবা অঞ্চলের হেটারোসিলাস (Heterocoelous) সারভাইকাল কশেরুকাসমূহের জন্য মস্তকটির আবর্তন সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে মস্তকটি আবর্তিত হইলে যুগুলার শিরাদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইতে পারে সেইজন্য শিরাদ্বয় অগ্রভাগে পরস্পর লুপ দ্বারা যুক্ত (যুগুলার অ্যানাসটোমোসিস = Jugular anastomosis)।

III জল অভিযোজন

অগণিত প্রাণী খাদ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তার জন্য জলে বাস করে। জল পরিবেশেই প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জীব অভিব্যক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে জীবন সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সকল জীবের মধ্যে জলে বাস করিবার জন্য গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন সাধিত হইয়াছে। অসংখ্য অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী আজও জলে বাস করে। জল পরিবেশ পৃথিবী বসবাসযোগ্য অঞ্চলের প্রায় তিনভাগ অধিকার করিয়াছে। জলে সুষ্ঠুভাবে বাস করিবার জন্য জলচর প্রাণীদের নানাবিধ রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সকল রূপান্তরকে জল অভিযোজন বলে (Aquatic adaptation) বলে।

জলচর প্রাণীদের প্রকারভেদ

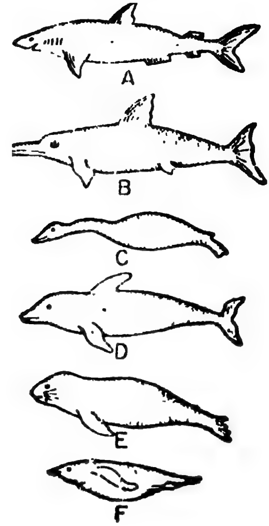
জলে বসবাসকারী প্রাণীদেব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

A, **প্রাইমারী জলচর প্রাণী** (Primary aquatic animals),

B, **সেকেন্ডারী জলচর প্রাণী** (Secondary aquatic animals)।

যে সকল প্রাণী জলে স্থায়ীভাবে বাস করে এবং যাদের পূর্বপুরুষেরাও জলচর তাহাদের **প্রাথমিক** বা **প্রাইমারী জলচর প্রাণী** বলে। মাছ প্রাথমিক জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। মাছের সৃষ্টি হয় জলে এবং জলচর পূর্বপুরুষ হইতে আজিকার মৎস্যকুলের আবির্ভাব হইয়াছে। উপযুক্ত অভিযোজনের ফলে মৎস্যকুল সুষ্ঠুভাবে জলে বাস

করিতে সক্ষম। মাছ ব্যতীত অনেক স্থলবাসী প্রাণী খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য ডাঙ্গা ছাড়িয়া জলে ফিরিয়া আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। এই ধরনের প্রাণীদের **গৌণ** বা **সেকেণ্ডারী জলচর প্রাণী** বলে। তিমি, শীল, ডলফিন প্রভৃতি আদর্শ সেকেণ্ডারী জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। জলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ইহাদের দেহের আকৃতি মাছের ন্যায় হইয়াছে। সকল জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্র স্পষ্ট না থাকা সত্ত্বেও একই পরিবেশে বসবাস করিবার জন্য দেহের গঠন ও কার্যকারিতায় নিবিড় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র 9.8)। এই বাহ্যিক সমতা একমুখী ক্রমবিকাশের (Convergent evolution) ফলশ্রুতি।



9.8 জলবাসী মেরুদণ্ডীদের বহিরাকৃতির একমুখীতা –হাঙ্গর (A), ইকথিওসরস (B), হেস পারনিস (C), ডলফিন (D), সীল (E), পেঙ্গুইন (F)।

মাছ—আদর্শ প্রাথমিক জলচর প্রাণী

মাছ একটি আদর্শ প্রাথমিক জলচর প্রাণী। মাছেদের দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন জলে বসবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে মাছেরা কখনও জল পরিবেশ ত্যাগ করিয়া স্থলে আসে নাই। ইহাদের জল অভিযোজন সর্বাত্মক এবং আদর্শ জল অভিযোজনরূপে গণ্য করা হয়। জলে সুষ্ঠু ও স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য যে সকল অভিযোজন দৃষ্ট হয় তাহাদের **প্রাথমিক বা মুখ্য জল অভিযোজন** (Primary Aquatic adaptation) বলে এবং মাছ প্রাথমিক বা মুখ্য জলচর প্রাণী। প্রাথমিক জল অভিযোজনের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

(1) মাছের দেহ লম্বাটে এবং দেহটি দুই পার্শ্বে চাপা। মসৃণ এবং শ্লেষ্মাসিক্ত দেহত্বক্ জলে সাঁতার কাটিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(2) মাছের মেরুদণ্ডটি বেশ নমনীয় এবং মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে পেশীসমূহ বিশেষ রীতিতে সজ্জিত থাকে। পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই মাছ জলে সুষ্ঠুভাবে সাঁতার কাটিতে পারে। যখন দেহের একদিকের পেশীগুলি সংকুচিত হয় তখন বিপরীতদিকের পেশীগুলি প্রসারিত হয়। এইরূপে বিপরীতধর্মী পেশীগুলির ক্রিয়ার ফলে দেহ তরঙ্গায়িত হয়, ফলে মাছ দ্রুতগতিতে জলে সাঁতার দিতে পারে। সাঁতারের সময় লেজ সংলগ্ন পেশীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাছের **যুগ্ম ও অযুগ্ম** পাখনাগুলি (Paired and unpaired

fins) পরোক্ষভাবে গমনক্রিয়ায় সাহায্য করে। পার্শ্বীয় তরঙ্গ সৃষ্টিতে লেজের বিশেষ গুরুত্ব থাকিলেও দিক পরিবর্তন, জলের মধ্যে অপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারণ ও দেহের ভারসাম্য রক্ষায় পাখনাগুলির সক্রিয় ভূমিকা আছে।

(3) অধিকাংশ মাছ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত গ্যাসপূর্ণ **পটকার** (Swimbladder) দ্বারা জলের মধ্যে ইচ্ছামত উচ্চতায় অবস্থান করিতে পারে।

(4) **মাছ ফুলকার** (Gills) সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য সমাধা করে। ফুলকাসমূহ পরিবেশ হইতে বাহিত জলস্রোতের সংস্পর্শে আসে। ফলে ফুলকা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহন করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। জিওল মাছদের আনুষঙ্গিক বায়ব শ্বাস অঙ্গ থাকে। ইহাদের সাহায্যে ইহারা বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং ফুলকাসমূহ মুখ্যতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনে সহায়তা করে। সুতরাং মাছেদের অভিযোজন জলে বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত এবং ইহাদের অভিযোজনকে জল অভিযোজনের মাপকাঠিরূপে গণ্য করা যায়।

সেকেণ্ডারী জলচর মেরুদণ্ডীদের জল অভিযোজন (Adaptations in secondary aquatic vertebrates)

ভূ-পৃষ্ঠে খাদ্য ও স্থানাভাবের ফলে স্থলচর প্রাণীরা কেহ কেহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে নিজেদের বাসভূমি (স্থল) ত্যাগ করিয়া জলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রাণী জলে অভিযোজিত হইয়াছে। প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রাণীদের লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অনেক স্থলচর ফুসফুসধারী মেরুদণ্ডী স্থল পরিবেশ ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে জলে বাস করে। ফলে এই সকল প্রাণীদের দেহে নানা ধরণের অভিযোজন প্রতিভাত হয়। সেকেণ্ডারী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জল অভিযোজন এমনই নিখুঁত যে, একমাত্র ফুসফুস (Lungs) ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের অভিযোজন পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের প্রাইমারী জলবাসী প্রাণী হইতে



9.9 অরসিনাসের বহিরাকৃতি।

পৃথক করা যায় না। তিমি (Whale) একটি আদর্শ গৌণ জলবাসী প্রাণী (চিত্র 9·9)। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তিমির জল অভিযোজন এতই নিখুত এবং

সার্থক যে ইহাকে সাধারণ ভাবে "তিমি মাছ" নামে অভিহিত করা হয়। **সকল** সেকেন্ডারী মেরুদন্ডী প্রাণীর মাছের ন্যায় দেহাকৃতি এক বিশেষ লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। **জলে** দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করিবার অক্ষমতা ইহাদের জলচর জীবনের প্রধান বাধাস্বরূপ। জলে বাস করিবার জন্য ইহাদের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন খুবই তীব্র ও প্রকট। খাদ্য অন্বেষণ ও সংগ্রহ এবং দ্রুতবেগে জলের মধ্যে গমন **জল** অভিযোজনের প্রধান উদ্দেশ্য। উভচরপ্রাণীদের মধ্যে জল অভিযোজন মুখ্যত গমন-অঙ্গের রূপান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু জলচর সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের অভিযোজন খুবই স্পষ্ট।

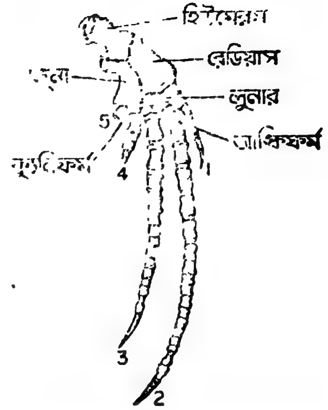
দ্রুতবেগে গমনের জন্য রূপান্তর

A. **দেহের আকৃতি** (Body contour) : দেহের আকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছের ন্যায় মাকু সদৃশ। দেহ হইতে সৃষ্ট সকল উপবৃদ্ধি আকারে গঠিত অঙ্গগুলির ক্রম বিলুপ্তি গৌণ জলবাসী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। ঘনতর মাধ্যম জলের মধ্যে দ্রুত সন্তরণের জন্যই এই ধরণের গঠনগত পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই (যথা : তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি) গ্রীবা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিংবা অনুপস্থিত। ফলে দেহের কাঠামো সুদৃঢ় হয়। তিমি, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি জলবাসী স্তন্যপায়ীদের দেহের অগ্রভাগের এক-তৃতীয়াংশ অধিক প্রশস্ত এবং দেহের পশ্চাদভাগ ক্রমশ সরু ও প্রলম্বিত। প্রলম্বিত সঞ্চারণশীল লেজ এবং স্থির ও সঞ্চারণে অক্ষম গ্রীবা গৌণ জলবাসী স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য। বক্ষদেশটি বেলনকার এবং অন্তর গহ্বরটি পশ্চাৎদিকে প্রসারিত। ফলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু ধারণের ক্ষমতা বহুলাংশে বর্ধিত হয়।

B. **অগ্র ও পশ্চাৎপদের রূপান্তর** (Modifications of fore and hindlimbs) : সেকেন্ডারী মেরুদন্ডী প্রাণীদের অগ্র ও পশ্চাৎপদ নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়ের (Oar) ন্যায় কাজ করে।

অগ্রপদ ও উরঃস্তম্ভ : তিমি, সীল প্রভৃতি জলচর মেরুদন্ডীদের অগ্রপদদ্বয় নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। অগ্রপদদ্বয়ের অস্থিগুলির রূপান্তর লক্ষ্যণীয়। সকল গৌণ জলবাসী স্তন্যপায়ীদের অগ্রপদের হিউমারাস (Humerus) ক্রমশঃ আকারে ছোট হইয়াছে। ক্লাভিকল (Clavicle) প্রায় সকল ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কিন্তু স্ক্যাপুলা (Scapula) খুবই সুগঠিত ও প্রলম্বিত। অগ্রপদের পেশীসমূহের সংযুক্তির জন্য স্ক্যাপুলা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। অধিকাংশ জলচর প্রাণীদের অগ্রপদদ্বয় লিপ্তপদ হয়। ফলে উহা জলে সাঁতার কাটিতে সাহায্য করে। পিনিপিডিয়া (Pinnipedia) উপবর্গভুক্ত প্রাণী এবং হংসচঞ্চুর লিপ্তপদ খুবই উন্নত। লিপ্তপদের উপস্থিতি জলে সন্তরণের পটুতা নির্দেশ করে।

সাইরেনিয়া (Sirenia) বর্গভুক্ত স্তন্যপায়ীদের অগ্রপদদ্বয় প্যাডেলে (Paddle) পরিণত হইয়াছে। অস্থিখণ্ডগুলি সংযুক্ত এবং সমগ্র অগ্রপদ একটি চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ফলে বাহির হইতে অগ্রপদের অঙ্গুলির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তিমির অগ্রপদ ফ্লিপারে (Flipper) পরিণত হইয়াছে এবং অঙ্গুলি ও অঙ্গুলি-নলকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে করতল অপেক্ষাকৃত বেশী প্রশস্ত হইয়াছে। ফ্লিপারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অঙ্গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি (চিত্র 9.10) বা (Hyperphalangy) এবং অঙ্গুলি-নলকের সংখ্যা বৃদ্ধি (Hyperdactyly) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্লিপার ও প্যাডেলের চর্মাচ্ছাদিত অস্থিখণ্ডগুলির সঞ্চালন ক্ষমতা অবলুপ্ত হওয়ায় সন্তরণ অঙ্গরূপে ইহাদের ক্রিয়া বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ডলফিনের (Dolphin) অগ্রপদের দুইটি কিংবা তিনটি অঙ্গুলি খুবই প্রলম্বিত এবং অপর অঙ্গুলিগুলি আকারে ক্ষুদ্র।



9.10 গ্লোবিকেফালায় অঙ্গুলি নলকের সংখ্যা বৃদ্ধি (Hyperdactyly)।

পশ্চাৎপদ ও শ্রোণীচক্র: অধিকাংশ জলচর মেরুদণ্ডীদের (যথা : তিমি, সাইরেনিয়া) পশ্চাৎপদ লুপ্তপ্রায় থাকে। কিন্তু কাইরোনেক্টিস (Chironectes), জলহস্তী (Hippopotamus), সীল বা ফোকা (Phoca), হংসচঞ্চু (Ornithorhynchus) প্রভৃতি জলচর প্রাণীদের পশ্চাৎপদযুগল উন্নত ধরনের এবং সাঁতারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে (চিত্র 9.11)। হংসচঞ্চু এবং ওটার গোত্রীয় (Otariidae) প্রাণীদের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দুইটি উন্নত।



9.11 সীলের পশ্চাৎপদযুগল সাঁতারের জন্য বিশেষিত।

জল পরিবেশে অভিযোজিত অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এবং শ্রোণীচক্রের ক্রম বিলুপ্তি ঘটে। যদিও বিরল তথাপি কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহাদের লুপ্তপ্রায়

চিহ্নরূপে একটি ক্ষুদ্রাকার অস্থির উপস্থিতি প্রদর্শিত হয়। অস্থিটি পেশীর মধ্যে প্রোথিত থাকে।

C. লাঙ্গুলের রূপান্তর (Modification of tail): জলবাসী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের লেজ সক্রিয়। সন্তরণের সময় নৌকার হালের ন্যায় লেজ দিক্-নির্ণয় ও দিক-পরিবর্তনে সহায়তা করে। কয়েকটি গৌণ জলবাসী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অযুগ্ম 'পাখনা' থাকে। কিন্তু পাখনার গঠন মাছের মত নহে। দেহের বাহিরে মসৃণ চর্মাবৃত উপবৃদ্ধির আকারের পাখনায় কোন 'ফিন্-রে' থাকে না। পৃষ্ঠ-পাখনাটি ক্ষেত্রবিশেষে ত্রিকোণাকার [যথা—বেলিনপটেরা ম্যাস্কুলাস (*Balaenoptera musculus*) নামক তিমি]। নিমজ্জিত খাদ্যবস্তু সংগ্রহকালে মস্তককে নিচের দিকে রাখিবার জন্য জলচর মেরুদণ্ডীদের লেজ হালের কাজ করে। জলহস্তীর লেজটি অনুভূমিকভাবে সংকীর্ণ হইলেও উল্লম্ব তলে প্রসারিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেজটি উল্লম্বতলে চ্যাপ্টা এবং অনুভূমিকতলে প্রশস্ত হয়। তিমি ও সাইরেনিয়ায় প্রশস্ত লেজটি দুইটি খণ্ডে (Fluke) বিভক্ত। গৌণ জলবাসী স্তন্যপায়ীরা দ্রুত জলে সাঁতার দেয়। সন্তরণকালে বেগ সঞ্চারে লেজের সক্রিয় ভূমিকা থাকে।

শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন (Physiological modifications)

A. ত্বকের পরিবর্তন (Modifications of integument)

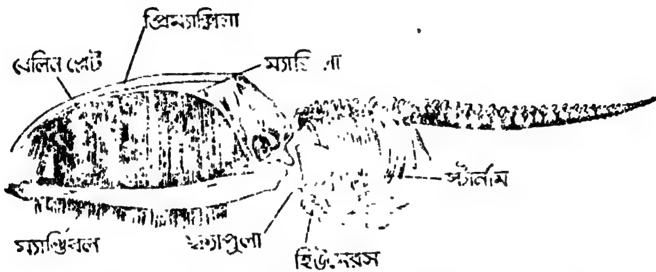
জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। বহিঃকঙ্কালের বিলুপ্তি জলচর মেরুদণ্ডীদের বৈশিষ্ট্য। জলবাসী স্তন্যপায়ীদের লোম (Hair) থাকে না। তুণ্ড সংলগ্ন কয়েকটি বড় বড় লোম ছাড়া তিমি ও সাইরেনিয়াদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় লোম থাকে না। ইহাদের ভ্রূণাবস্থায় লোম থাকিলেও অধিকাংশ তিমির [যথা—শ্বেত তিমি (White whale) এবং নারতিমির (Narwhales)] ভ্রূণ দশায় কোন লোম থাকে না। ইহাদের ত্বকের নিম্নের ব্লাবার নামক মেদ-স্তর লোমের বিকল্পরূপে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ব্লাবার (Blubber) দেহের উষ্ণতা সংরক্ষণ ও দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব রক্ষা করে। জলবাসী স্তন্যপায়ীদের ত্বকে স্বেদগ্রন্থি (Sweat glands) এবং সিবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous gland) থাকে না।

B. জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রক্ষণ (Protection of sense organs)

a. ঘ্রাণেন্দ্রিয়: জলচর মেরুদণ্ডীদের বহিঃনাসারন্ধ্র মস্তকের অগ্রাংশে অবস্থিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বহিঃনাসারন্ধ্র মস্তকের পৃষ্ঠতলের শীর্ষাগ্রে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। ফলে সমগ্র দেহটি জলে নিমজ্জিত থাকিলেও বহিঃনাসারন্ধ্র জলের উপরে অবস্থান করে। তিমির বহিঃনাসারন্ধ্র ম্যাক্সিলোন্যাসোলেবিয়ালিস পেশীর (Maxillonasolabialis muscle) ক্রিয়ার ফলে অনৈচ্ছিকভাবে বন্ধ হইয়া

যায়, কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী উন্মুক্ত হয়। বহিঃনাসারন্ধ্র নানা ধরনের প্যাড ও কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। সাইরেনিয়ার বহিঃনাসারন্ধ্র অর্ধচন্দ্রাকার। সাইরেনিয়া ও তিমির ক্ষেত্রে বহিঃনাসারন্ধ্র প্রশ্বাসের শেষে বন্ধ হইয়া যায় এবং নিঃশ্বাসের প্রারম্ভে খুলিয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে [যথা—ওডনটোসিটি (Odonto -ceti] বহিঃনাসারন্ধ্র অনুন্নত ধরনের, মধ্যরেখীয় এবং অযুগ্ম।

b. **শ্রবণেন্দ্রিয়ঃ** অধিকাংশ জলচর স্তন্যপায়ীদের কর্ণছত্র দুইটি বিলুপ্ত হয়। ইহারা কর্ণকুহরের রন্ধ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ করিতে পারে এবং রন্ধ্রটি আয়তনে খুব ছোট। সীলের ক্ষেত্রে কর্ণকুহরের ছিদ্রটি আলপিনের আয়তনের ন্যায়



9.12 বেলিনার (Balena) অস্থিতন্ত্র। বেলিন লক্ষণীয়।

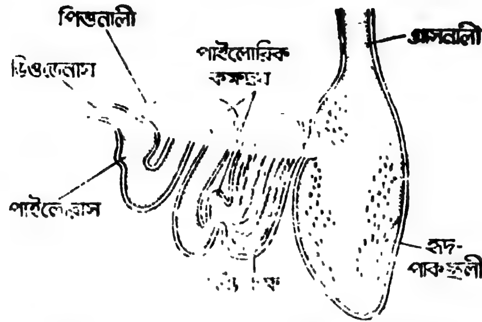
ক্ষুদ্রাকার। তিমির কর্ণদন্ডগুলি (Ear bones) কঠিন ও সুদৃঢ়। জলের চাপ প্রতিহত করিবার জন্যই এই ধরনের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

c. **দর্শনেন্দ্রিয়ঃ** জলচর স্তন্যপায়ীদের নেত্রপল্লবের ক্রম অবলুপ্তি পরিলক্ষিত হয়। তিমির নেত্রপল্লব থাকে না। উপপল্লবটি চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে। জলের মধ্যে দর্শনের জন্য চক্ষুর অভিযোজন সাধিত হইয়াছে। লেন্সটি গোলকাকার এবং ইহার প্রতিসরাংক (Refractive index) খুব বেশী। সমগ্র দর্শনেন্দ্রিয় জলের মধ্যে দেখার জন্য অভিযোজিত। অক্ষিপটে (Retina) কোন কোষ অপেক্ষা রড কোষের সংখ্যা খুব বেশী। ট্যাপেটাম লুসিডাম (Tapetum lucidum) খুবই উন্নত। কর্নিয়া চ্যাপ্টা এবং ইহার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু কোরয়েড স্তরটি অস্বাভাবিকভাবে উন্নত। স্ক্লেরা স্তরটি বেশ পুরু। চক্ষু সংলগ্ন তৈল উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলি উন্নত ধরনের।

C. পৌষ্টিক তন্ত্রের পরিবর্তন (Modifications of Digestive system)

সকল জলচর মেরুদন্ডীদের, বিশেষ করিয়া স্তন্যপায়ীদের দাঁতগুলি সরল ও তীক্ষ্ন। তীক্ষ্ন দাঁতের সাহায্যে ইহারা পিচ্ছিল এবং সন্তরণরত শিকার ধরিতে পারে। কয়েক ধরনের তিমির দাঁত থাকে না। বেলিন তিমির (Baleen whale) শিকার সংগ্রহ করিবার জন্য বেলিন প্লেট (Baleen plate) আছে (চিত্র 9.12)।

মুখ বিবর খুবই প্রশস্ত এবং পাকস্থলী কয়েকটি অংশে বিভক্ত (চিত্র 9.13)। জলচর স্তন্যপায়ীদের লালাগ্রন্থি লুপ্তপ্রায় কিংবা থাকে না।



চিত্র 9.13 ফোসিনার (Phocaena) পাকস্থলীর বৈশিষ্ট্য।

D. **শ্বসনতন্ত্রের পরিবর্তন** (Modifications of Respiratory system)

গৌণ-জলবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্বসন অঙ্গ ফুসফুস। বহিঃনাসারন্ধ্র পেশীময় কপাটিকা ও প্যাড দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় এই পথে জল ফুসফুসে প্রবেশ করিতে পারে না। নলাকার অলিজিহ্বার মাধ্যমে অন্তঃনাসারন্ধ্র পথে বায়ু সরাসরি ফুসফুসে ঢুকিতে পারে। দৃঢ়তা প্রদান করিবার জন্য শ্বাসনালীর সহ অন্যান্য জলচর স্তন্যপায়ীদের ফুসফুসদ্বয়ে তরুণাস্থির উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিমির ফুসফুসদ্বয়ের অভ্যন্তরীণ পেশীগুলি শক্তিশালী এবং ফুসফুসদ্বয় খুবই প্রশস্ত। স্থিতিস্থাপক বৃহদাকার ফুসফুসদ্বয়ে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিতে এবং সাময়িকভাবে জমা থাকিতে পারে। ফলে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের জন্য জলের উপরে বারবার আসিবার প্রয়োজন হয় না। জলচর স্তন্যপায়ীদের মধ্যচ্ছদার অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যচ্ছদার অবস্থানের ফলে ফুসফুস গহ্বর হইতে শ্বাস বায়ু সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। তিমি এবং সাইরেনিয়াদের ক্ষেত্রে মধ্যচ্ছদা অনুভূমিক হওয়ায় শ্বসন ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

E. **রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিবর্তন** (Modifications of Circulatory system)

জলচর স্তন্যপায়ীদের, বিশেষ করে তিমি ও সাইরেনিয়ার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ খুব বেশি। বিশেষ ধরনের রক্তজালক সমন্বিত **রেটিয়া মাইরাবিলিয়ার** (Retia mirabilia) উপস্থিতি তিমি ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীর রক্ত সংবহন-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

F. **রেচন ও জনন তন্ত্রের পরিবর্তন** (Modifications of Urinary and Genital systems)

জলচর স্তন্যপায়ীদের স্ক্রোটাম বা শুক্রাশয়-থলির (Scrotum) বিলুপ্তি

ঘটে। শুক্রাশয়দ্বয়ের অবস্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে শুক্রাশয়দ্বয় উদর গহ্বরে অবস্থিত নয়। ইংগুইনাল চক্র (inguinal ring) সংলগ্ন একটি থলির মধ্যে শুক্রাশয় থাকে।

G. স্তনের অবস্থান (Disposition of Mammae)

জলচর স্তন্যপায়ীদের স্তনের অবস্থান ভিন্নরূপ। তিমি ও সাইরেনিয়াদের ক্ষেত্রে একজোড়া স্তন ইংগুইনাল অঞ্চলে অবস্থিত। কয়েকটি সাইরেনিয়ার ক্ষেত্রে স্তন ফ্লিপারের পশ্চাৎ কিনারায় অবস্থিত। মায়োক্যাস্টার (Myocaster) নামক স্তন্যপায়ীর দুই জোড়া স্তন দেহকাণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।

H. দ্রুত মানসিক পূর্ণতা (Mental Precocity)

জলচর স্তন্যপায়ীদের মানসিক পূর্ণতালাভ অপেক্ষাকৃতভাবে তাড়াতাড়ি হয়। জন্মের পর বাচ্চারা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। ইহা জল অভিযোজনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

I. অন্তঃকঙ্কালের পরিবর্তন (Modifications of Endoskeleton)

জলচর মেরুদণ্ডীদের, বিশেষ করিয়া স্তন্যপায়ীদের, অন্তঃকঙ্কাল নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনে প্লাবতা ও জলপ্রেষ প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

a. করোটি (Skull) : অন্তঃকঙ্কালের মধ্যে করোটির পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্লাবতা ও জলপ্রেষের প্রভাবে জলচর স্তন্যপায়ীদের করোটির আকৃতি রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে করোটিক অঞ্চল সংক্ষিপ্ত এবং তুণ্ড অঞ্চল ক্রমশ লম্বাটে হইয়াছে। জাইগোম্যাটিক আর্চ (Zygomatic arch) লুপ্তপ্রায় অঙ্গরূপে প্রতিভাত। ডলফিন ও তিমির করোটির পশ্চাৎ অংশটি তুর্লাকার, কিন্তু সম্মুখভাগটি প্রলম্বিত হইয়া ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়াছে। করোটির মুখের সংকীর্ণ অংশটি রস্ট্রাম সদৃশ। খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতির ভিন্নতার জন্য করোটির বিমুখী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। যে সকল জলচর স্তন্যপায়ী (উদাহরণ—সাইরেনিয়া) জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের অস্থিমূহ ঘন নিরেট এবং ভারী। ফলে ইহারা জলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় নিমজ্জিত অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু প্লবমান স্তন্যপায়ীদের (উদাহরণ—তিমি) অস্থিসমূহের মধ্যে স্নেহপদার্থ-পূর্ণ গহ্বর থাকে। ফলে অস্থিসমূহ হাল্কা হয়।

b. মেরুদণ্ড (Vertebral column) : জলচর স্তন্যপায়ীদের মেরুদণ্ডের ক্রম সরলতা লক্ষ্যণীয়। গ্রীবা অঞ্চলের সারভাইক্যাল কশেরুকাগুলি অনমনীয়। মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলি সরল গঠনের। সকল স্তন্যপায়ীর গ্রীবা অঞ্চলের কশেরুকার সংখ্যা সাত। কিন্তু তিমির গ্রীবা অঞ্চলের কশেরুকা সংযুক্ত হইয়া একটি অস্থিময় একক গঠন করিয়াছে।

ম্যানাটির (Manatee) গ্রীবা অঞ্চলের কশেরুকার (সারভাইক্যাল কশেরুকা—Cervical vertebrae) সংখ্যা মাত্র ছয়। সঞ্চারণে অক্ষম খর্বাকৃতি গ্রীবার উপস্থিতির জন্য মস্তকটি দেহকাণ্ডের সহিত একীভূত হইয়াছে, ফলে জলে সাঁতারের সময় প্রতিরোধ বহুলাংশে হ্রাস পায়। দেহের পুচ্ছ অঞ্চল ব্যতীত সকল অঞ্চলের কশেরুকাসমূহের পেশীর সহিত গ্রথন প্রবর্ধনগুলি (Articulating process) অনুন্নত। যেহেতু পুচ্ছ অংশের পেশীগুলি গমনক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সেইজন্য পুচ্ছ কশেরুকাগুলির গ্রথন প্রবর্ধনগুলি প্রলম্বিত ও উন্নত।

জল পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বসবাসের জন্য জলচর প্রাণীদের বিশেষ করিয়া মেরুদণ্ডীদের, অঙ্গসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন খুব তীব্র ও প্রকট। জল পরিবেশে বসবাসের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মেরুদণ্ডীদের আকৃতি ও গঠনগত সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। জলচর সরীসৃপ, পক্ষিকুল ও স্তন্যপায়ীরা প্রাথমিকভাবে স্থলচর পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত। উপযুক্ত অভিযোজনের দ্বারা ইহারা প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল পরিবেশে পরিণত করিয়াছে। এই অভিযোজনের উপর জলচর প্রাণীদের সাফল্য অন্তর্নিহিত আছে।

IV. **গভীর সমুদ্রবাসীদের অভিযোজন** [Deep-sea Adaptatation)

সমুদ্রের জলে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। সমুদ্রের জলে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে জল অভিযোজন ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন বিশেষ সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাসের জন্য দেখা যায়। সূর্যালোকের প্রবেশ ক্ষমতা অনুযায়ী সমুদ্রকে মুখ্যত দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা : A. **নেরীটিক জোন** (Neritic Zone) এবং B. **ওসেনিক জোন** (Oceanic Zone)। মহীসোপানের উপর জলের অগভীর সমুদ্রকে নেরীটিক জোন বলে। এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যালোক থাকায় প্রচুর উদ্ভিদ জন্মায় এবং অসংখ্য প্রাণী এই অঞ্চলে বাস করে। মহীসোপানের নিচের সমুদ্রের গভীর অঞ্চলকে ওসেনিক জোন বলে। ওসেনিক জোনকে তিনটি উপাঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা (a) **বেথিয়াল জোন** (Bathyal Zone), (b) **অ্যাবাইস্যাল জোন** (Abyssal Zone) এবং (c) **হ্যাডাল জোন** (Hadal Zone)। অ্যাবাইস্যাল ও হ্যাডাল জোন দুইটিকে সাধারণতঃ **গভীর সমুদ্র** (Deep-Sea) বলা হয়। মহীসোপানের কিনারা হইতে 6000 ফুট নিচে পর্যন্ত বেথিয়াল জোনের বিস্তার। বেথিয়াল জোনের পর হইতে গভীর সমুদ্র আরম্ভ। গভীর সমুদ্রের প্রতিকূল পরিবেশে বিশেষ অভিযোজনের দ্বারা অনেক প্রাণী বাস করে।

গভীর সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of deep sea) : গভীর সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশের কয়েকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য :

(a) **সূর্যালোকের অনুপস্থিতি** (Absence of sunlight) ; সমুদ্রের

জলে 1200 ফুট পর্যন্ত সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে। 1200 ফুটের গভীরে সূর্যালোক পৌঁছায় না। ফলে অঞ্চলটি সম্পূর্ণ অন্ধকার।

(b) **নিশ্চলতা (Quiescence):** গভীরতার জন্য জলে কোন স্রোত থাকে না। পরিবেশ শান্ত।

(c) **শৈত্য (Coldness):** গভীর সমুদ্রে তাপমাত্রা অত্যন্ত কম এবং হিমাঙ্কের কাছাকাছি। তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না। দিন ও ঋতু পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।

(d) **জলের চাপ (Pressure of water):** গভীর সমুদ্রে জলের চাপ খুব বেশী। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপ বৃদ্ধি পায়।

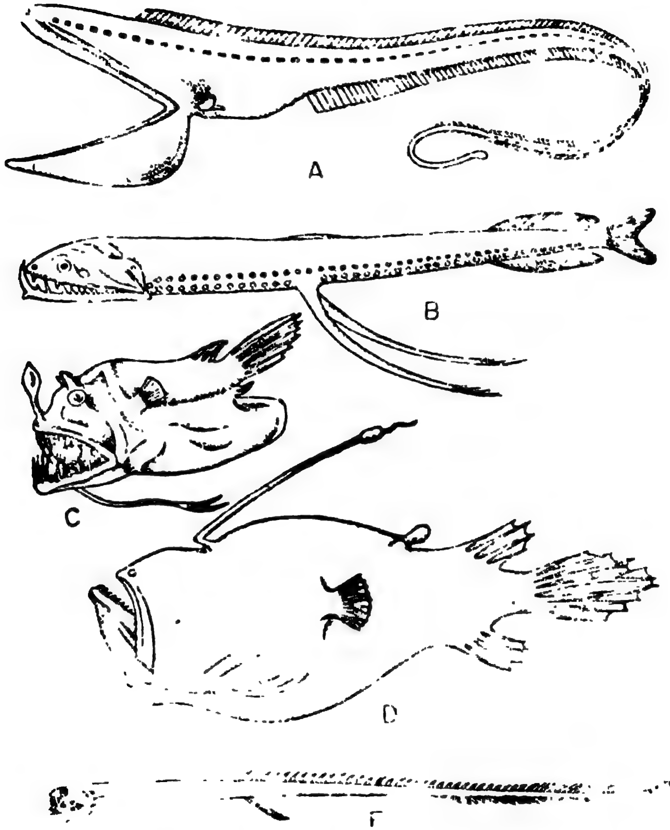
(e) **সবুজ উদ্ভিদের অনুপস্থিতি (Absence of green vegetation):** সূর্যালোকের অভাবহেতু গভীর সমুদ্রে কোন সবুজ উদ্ভিদ জন্মায় না কারণ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলো অপরিহার্য।

উপরি-উক্ত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গভীর সমুদ্রে অনেক সমুদ্রবাসী প্রাণী নানান আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের দ্বারা স্থায়ীভাবে বাস করে। বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হয় যে গভীর সমুদ্রের প্রাণীরা প্রাথমিকভাবে মুক্ত সমুদ্রের উপরিস্তরে বাস করিত। কালক্রমে ইহারা গভীর সমুদ্রে চলিয়া আসে এবং সেইখানে স্থায়ীভাবে অভিযোজিত হইয়া যায়। গভীর সমুদ্রের ভৌত পরিবেশে কোন পরিবর্তনশীলতা না থাকায় গভীর সমুদ্রবাসী প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য খুবই কম। গভীর সমুদ্রবাসী প্রাণীদের সাধারণ রূপান্তরগুলি নিম্নরূপ: (i) দেহ শীর্ণ ও দুর্বল। (ii) গায়ের রঙে সরলতার উদ্ভব। (iii) চক্ষুর পরিবর্তন দ্বিমুখী—কোন কোন প্রাণী অন্ধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ আলোকরশ্মি সংগ্রহণের জন্য দর্শন ইন্দ্রিয় শক্তিশালী ও দূরবিন সদৃশ। (iv) স্পর্শেন্দ্রিয় রূপে লম্বা লম্বা অনুভূতি অঙ্গের উৎপত্তি। (v) যে সকল গভীর সমুদ্রের মাছ পাচিত জৈব বস্তুর রসস্রাব শোষণ করিয়া পুষ্টিগ্রহণ করে তাহাদের চোয়ালদ্বয় লুপ্তপ্রায় এবং চর্বণ ক্ষমতা ক্ষীণ। অন্যান্য মাছেদের চোয়ালদ্বয় উন্নত ও শক্তিশালী। (vi) অসংখ্য বাচ্চা উৎপাদন করে এবং বাচ্চাদের লালন-পালনের কৌশল খুবই উন্নত। (vii) অধিকাংশ গভীর সমুদ্রবাসীর অনুপ্রভ অঙ্গ (Phosphorescent organs) থাকে। অনুপ্রভ অঙ্গের আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতা থাকে। (viii) দেহের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট।

গঠনগত রূপান্তর (Structural modifications)

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অগণিত সদস্য গভীর সমুদ্রে বাস করে। ইহাদের গঠনগত রূপান্তর বিবিধ হওয়ায় কেবলমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণীদের গঠনগত পরিবর্তন আলোচিত হইল।

গভীর সমুদ্রের মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হইল বিভিন্ন প্রকার মাছ। তরুণাস্থিময় মাছেদের মধ্যে স্পাইন্যাক্স নাইগার (*Spinax niger*) নামক হাঙর ছাড়া অন্য কোন হাঙর প্রজাতি দৃষ্ট হয় না। ইহাদের অনুপ্রভ অঙ্গ বর্তমান। কাইথেরয়েড গোষ্ঠীর তরুণাস্থিময় মাছেরা গভীর সমুদ্রে বাস করে এবং ইহাদের লেজ সমেত দেহটি শীর্ণ



[illegible] গভীর সমুদ্রে অভিযোজিত কয়েকটি মাছ। (A) গ্যাসট্রোস্টোমাস (*[illegible]*) (B) [illegible] (*[illegible]*), (C) লিনোফ্রাইনে (*[illegible]*), (D) ক্রিপ্টো-সারাস (*[illegible]*), (E) ইডিয়াকান্থাস (*Idiacanthus*)।

এবং প্রলম্বিত। চক্ষু দুইটি আকারে বড়। অস্থিময় মাছের মধ্যে সিটোমিনাস (*Cetominus*) একটি আদর্শ গভীর সমুদ্রের অধিবাসী। ইহার মুখছিদ্রটি প্রশস্ত এবং চোয়ালের কিনারায় ক্ষুদ্রাকার দাঁত থাকে। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্রাকার এবং দেহে আঁইশ অনুপস্থিত। ইপনপস (*Ipnops*) নামক অপর একটি মাছের চক্ষু থাকে না। পরিবর্তে মস্তকের পৃষ্ঠতলে দুইটি বড় অনুপ্রভ অঙ্গ বর্তমান। স্টোমিয়াটিড

(*Stomiatidae*) গোত্রভুক্ত মাছদের দেহ আঁইশবিহীন এবং অনুপ্রভ অঙ্গগুলি উন্নতমানের। ক্ষেত্রবিশেষে আঁইশ থাকিলেও আঁইশগুলি সূক্ষ্ম ও লুপ্তপ্রায়। গ্যাসট্রোসটোমাস (*Gastrostomus*) নামক গভীর সমুদ্রের মাছের দেহ লম্বাটে এবং শীর্ণ। ইহাদের দেহের পার্শ্বদেশে সারি সারি অনুপ্রভ অঙ্গ সজ্জিত থাকে (চিত্র 9.14)। মুখছিদ্র বৃহদাকার চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ। কড গোত্রীয় মাছের মুখছিদ্র ও দাঁত অনুন্নত। ইহাদের চক্ষু দুইটি বেশ বড়, দেহকান্ডটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু লেজটি ক্রমশ সরু হইয়া চাবুকের আকার ধারণ করে।

অ্যাঙ্গলার (Angler) মাছের গভীর সমুদ্রের অভিযোজন খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহাদের যুগ্ম পাখনাগুলি সমুদ্রের তলদেশে হামাগুড়ি দিয়া চলার জন্য অভিযোজিত এবং পৃষ্ঠপাখনার অগ্র ফিন-রেগুলি শিকার সংগ্রহের জন্য প্রলোভন অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। লিনোফ্রাইনে (*Linophryne*) নামক মাছের ফিন্‌-রেতে অনুপ্রভ অঙ্গ থাকে। ওনিরোডস (*Oneirodes*) গণের একটি প্রজাতি অন্ধ হইলেও ইহার অনুপ্রভ অঙ্গগুলি চক্ষুর বিকল্পরূপে কাজ করে। প্রোটোসটোমিয়াস (*Protostomias*) নামক গভীর সমুদ্রের মাছের দেহের পার্শ্বদেশে সারি সারি বিশেষ ধরনের আলোক-উৎপাদনকারী অঙ্গ থাকে।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে ব্যস করার জন্য ইহাদের প্রচন্ড জলের চাপ সহ্য করিতে হয়। দেহ ক্রমে চ্যাপ্টা হইয়াছে এবং মুখছিদ্রটি দেহের পার্শ্বদিকে প্রতিস্থাপিত। গভীর সমুদ্রের বিশেষ ভৌত পরিবেশের জন্য তথায় বসবাসকারী প্রাণীদের বিশেষ বিশেষ গঠনগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জীব-বিবর্তনের ইতিহাসে গভীর সমুদ্রবাসী প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত নবীন।

V. গুহাবাসীদের অভিযোজন (Cave Adaptation)

পৃথিবীর সকল স্থানে প্রাণীরা বাস করে। প্রাণিজগৎ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় কিছু কিছু প্রাণী গুহায় (Cave) সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত। গুহাবাসী প্রাণীদের সহিত গভীর সমুদ্রবাসীদের অনেক আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় সাদৃশ্য আছে। কারণ গভীর সমুদ্র ও গুহার ভৌত পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।

ভূ-পৃষ্ঠের চুনাপাথর অঞ্চলের কোন পরিত্যক্ত ভূনিম্নস্থ নদীর সুড়ঙ্গ বা নালাকে গুহা বলে। গুহা অনেক প্রাণীকে আশ্রয় দেয়। বিভিন্ন বাহ্য কারণে ভূ-ত্বকের নম্নীভবনের ফলে নানা প্রকার ভূগহ্বর (Caverns) সৃষ্টি হয় এবং উক্ত ভূগহ্বরে কিছু প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে। গুহায় বাস করার জন্য গুহাবাসী প্রাণীরা নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। গভীর সমুদ্রবাসীদের ন্যায় গুহাবাসীদের অভি-যোজন অপেক্ষাকৃত নবীন এবং ইহাদের পরিবর্তন মুখ্যত প্রতীপ।

সূর্যালোকের অনুপস্থিতি এবং তাপমাত্রার সমতা গুহার দুইটি প্রধান

ভৌত বৈশিষ্ট্য। ভৌত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গুহাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। অঞ্চল তিনটি যথাক্রমে—

(A) **সন্ধ্যালোক অঞ্চল** (Twilight zone) : গুহায় প্রবেশমুখে কিঞ্চিৎ আলোকের উপস্থিতি থাকায় ইহাকে সন্ধ্যালোক অঞ্চল বলে।

(B) **পরিবর্তনীয় তাপমাত্রা অঞ্চল** (Fluctuating temperature zone) : বিভিন্ন ঋতু ও দিনের বিভিন্ন সময়ের তাপমাত্রায় পরিবর্তন এই অঞ্চলে দেখা যায়।

(C) **অভ্যন্তরীণ গুহাঞ্চল** (Inner cave region) : গুহার এই অংশে আলো থাকে না এবং তাপমাত্রা নির্দিষ্ট।

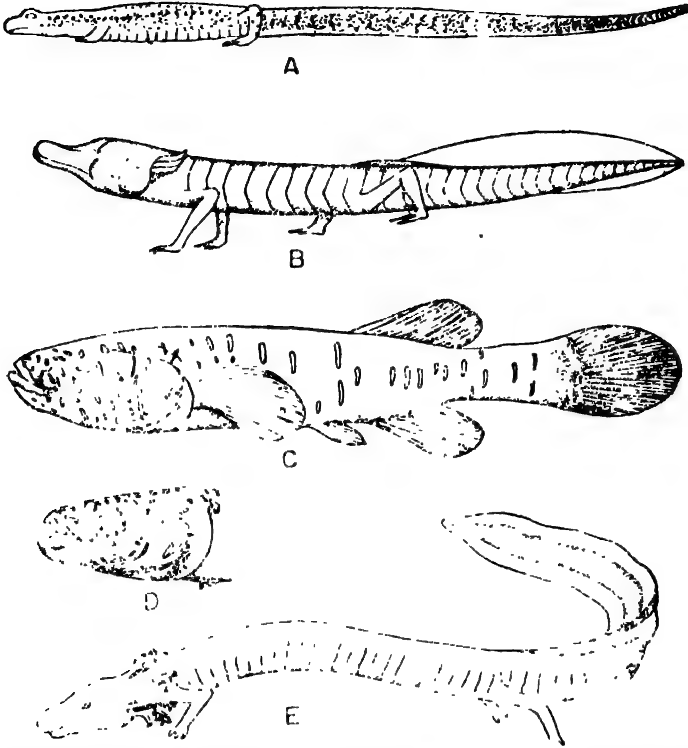
গুহাবাসী প্রাণীদের অভিযোজন মুখ্যত আলো ও খাদ্যের অভাবের বিরুদ্ধে। অপর বৈশিষ্ট্য হইল ভৌত পরিবেশের পরিবর্তনশীলতার অভাব। গুহাবাসী প্রাণীদের দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—**অস্থায়ী বাসিন্দা** (Temporary inhabitants) এবং **স্থায়ী বাসিন্দা** (Permanent inhabitants)। অস্থায়ী গুহাবাসীদের মধ্যে বাদামী বাদুড় (*Myotis lucifugius*) উল্লেখযোগ্য। স্থায়ী গুহাবাসীদের গঠনগত রূপান্তরগুলি নিম্নরূপ : (a) ত্বকে কোন রকম রঙ থাকে না, (b) দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রম বিলুপ্তি, (c) উচ্চ সংবেদী স্পর্শেন্দ্রিয়ের উদ্ভব, (d) উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্যবস্তুর অভাবে পৌষ্টিক তন্ত্রের পরিবর্তন এবং (e) শীর্ণ দেহ ও সংক্ষিপ্ত লুপ্তপ্রায় গমনাঙ্গ।

স্থায়ী গুহাবাসীদের অভিযোজন (Adaptations of permanent cave-dwellers)

গুহাবাসী মাছ (Cave-dwelling fishes) : গুহাবাসী মৎস্যকুলের মধ্যে নানা ধরনের আকৃতিগত রূপান্তর দেখা যায়। গ্রোনিয়াস নাইগ্রিলেবিস (*Gronias nigrilabris*) নামক গুহাবাসী ট্যাংরা জাতীয় মাছ অন্ধ। অন্যান্য গুহাবাসী মাছেদের চক্ষু লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। টিপ্‌লিক্‌থিস সাবটেরেনিয়াস (*Typhlishthys subterraneus*) নামক এক ধরনের ক্ষুদ্রাকার গুহাবাসী মাছের প্রথমাবস্থায় চক্ষু থাকে, কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়। অ্যামবিল্ওপ্‌সিস স্পেলিয়াস (*Amblyopsis spelaeus*) অন্ধ হইলেও ইহাদের উন্নত গঠনের স্পর্শেন্দ্রিয় গুহাবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গুহাবাসী উভচর (Cave-dwelling amphibia) : উভচর প্রাণীদের মধ্যে অসংখ্য স্যালাম্যান্ডার (Salamandar) গুহায় স্থায়ীভাবে বাস করে এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের বিলুপ্তির লক্ষণ দেখা যায়। টিপলোট্রাইটন স্পেলিয়াস (*Typhlotriton spelaeus*)-এর লার্ভা দশায় স্বাভাবিক চক্ষুর উদ্ভব হইলেও পূর্ণতা প্রাপ্তির সময় চক্ষু লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। নেত্রপল্লবগুলি যুক্ত হইয়া যায়

এবং অক্ষিপটে (Retina) রড ও কোন কোষ থাকে না। টিফ্লোমোলগি র‍্যাথবুনি (Typhlomolge rathbuni)-এর চক্ষুপেশী অনুপস্থিত এবং সমগ্র চক্ষু



9.15 গুহাবাসী কয়েকটি মেরুদণ্ডী : (A) স্টেরেপেস (*Sterepes*)—ইহার চক্ষু কার্যকরী, (B) টিফ্লোমোলগী (*Typhlomolgy*), (C) অ্যাম্ব্লিওপ্সিস (*Amblyopsis*), (D) কোলোগ্যাসটার (*Chologaster*), (E) প্রোটিয়াস (*Proteus*),—B হইতে E সকলেই চক্ষুহীন।

ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ফলে চক্ষু দুইটি নিষ্ক্রিয়। অগ্র ও পশ্চাৎ পদ খুবই সংক্ষিপ্ত ও সরু। প্রোটিয়াস আংগুইনাস (Proteus anguinus) নামক অপর গুহাবাসীর দেহ বর্ণহীন এবং ইহারা অন্ধ (চিত্র 9.15)। গুহার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ অন্ধকারে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য এই ধরনের পরিবর্তন। ইহারা বেশ কিছুদিন খাদ্য ছাড়া বাঁচিতে সক্ষম। অন্ধ হইলেও ইহাদের দেহ সংবেদনশীল।

গুহাবাসী সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী (Cave-dwelling Reptiles, Birds and Mammals) : সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রকৃত গুহাবাসী কেহ নাই। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে পেরোমিসকাস লিউকোপাস (Peromyscus leucopes) নামক শ্বেতপদযুক্ত নেংটি ইঁদুরের ক্ষেত্রে গুহাবাসের উপযোগী

কয়েকটি অভিযোজন দেখা যায়। উন্নত চক্ষু এবং মুখসংলগ্ন প্রলম্বিত স্পর্শ-সংবেদী লোম ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে গুহার পরিবেশ পরিবর্তনশীল নহে। পরিবর্তনশীলতার অভাব গুহাবাসীদের মধ্যে আকৃতিগত একমুখীতা দেখা যায়। সকল গুহাবাসী দুর্বল এবং ইহাদের সকল অভিযোজনই অপজাত্যমুখী। শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচার জন্য দুর্বল প্রকৃতির প্রাণীরা গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে যায়। আলোর অনুপস্থিতি এবং খাদ্যের অভাবের জন্য গুহাবাসীদের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় স্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভ্রূণতত্ত্ব, কলা, অঙ্গতন্ত্র ও কলাস্থান

জীবনের সূত্রপাতে একটিমাত্র কোষ থাকে। বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে কোষটি একটি নিষিক্ত ডিম্ব। বিভাজন, বিশেষণ ও বিভাজনে সৃষ্ট কোষসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রভৃতি জটিল পদ্ধতির মধ্য দিয়া এই নিষিক্ত ডিম্ব পরিস্ফুরিত হইয়া জীবটিকে পূর্ণ গঠিত করে।

বর্তমান অধ্যায়ে ভ্রূণতত্ত্বের জটিল পদ্ধতিসমূহ, কলা ও অঙ্গ এবং কলাস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ 10

ভ্রূণতত্ত্ব

10.1 ভ্রূণতত্ত্ব কাহাকে বলে

ভ্রূণতত্ত্ব বা এমব্রায়োলজির (Embryology) শব্দগত অর্থ হইল ভ্রূণ বা এমব্রায়ো (Embryo) সম্পর্কীয় আলোচনা অর্থাৎ জীববিদ্যার এই শাখা অধ্যয়ন করিলে কোন একটি বিশেষ জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ (Ontogenic Development) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। জাইগোট দশায় ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ সূচিত হয়। জাইগোট দুইটি জনন কোষের মিলনের ফলশ্রুতি। জাইগোট হইতে ক্রম-পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়া ভ্রূণ এবং ভ্রূণ হইতে জীবের পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে। জাইগোট হইতে ভ্রূণ অবস্থা প্রাপ্তি পর্যন্ত ভ্রূণতত্ত্বের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিলেও ব্যবহারিক অর্থে ভ্রূণতত্ত্বের পরিধি আরও ব্যাপক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের প্রকৃত সূত্রপাত হয় জনন কোষ সৃষ্টি দশায় এবং জীবের মৃত্যুতে হয় ইহার পরিসমাপ্তি। সেইজন্যই ভ্রূণতত্ত্বের আধুনিক নামকরণ পরিস্ফুরণজনিত জীববিদ্যা (Developmental Biology) অত্যন্ত যুক্তি সম্মত।

প্রতিটি জীব প্রজননের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে। জীবজগতে বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি মুখ্যত দুই প্রকার :—যৌন জনন (Sexual reproduction) ও অযৌন জনন (Asexual reproduction)। যৌন জননের ফলে দুইটি অসম জনন কোষ মিলিত হইয়া জাইগোট সৃষ্টি করে এবং জাইগোট (Zygote) হইতে নতুন অপত্য জীবের উৎপত্তি হয়। জাইগোট হইতে যে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ সংঘটিত হয় তাহাকে এমব্রায়োজেনেসিস (Embryogenesis) বলে। অযৌন প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট অপত্য জীব সংক্রান্ত বিষয়কে ব্লাসটোজেনেসিস (Blastogenesis) বলে। উৎপত্তিজনিত পার্থক্য থাকিলেও এমব্রায়োজেনেসিস ও ব্লাসটোজেনেসিস প্রক্রিয়া দুইটির মধ্যে সমতা বর্তমান। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের সকল দশা প্রদর্শিত হয়।

10.2 পরিস্ফুরণের প্রাথমিক ঘটনাসমূহ (Fundamental events in Development)

প্রজনন (Reproduction) প্রক্রিয়া পরিস্ফুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বাণু (Fertilised egg) বা জাইগোট (Zygote) বিভিন্ন দশার মধ্য দিয়া জনিতা জীব সদৃশ অপত্য জীবে পরিণত হয়। অপত্য জীব ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এইভাবে আত্মোৎপাদনের দ্বারা জীব জগতে জীবন প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের সময় তিনটি সুস্পষ্ট

ঘটনা সংঘটিত হয়, যথা : A. **কোষ বিভাজন** (Cell division) ও **বৃদ্ধি** (Growth), B. **মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকশন** (Interaction) এবং C. **বিভেদ বা ডিফারেন্শিয়েশন** (Differentiation)।

A. **কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধি** : জীবের পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয় এককোষী জাইগোট দশায়। এককোষী জাইগোট হইতে বিভাজনের দ্বারা অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। কোষ বিভাজন জীবের সারা জীবনব্যাপী সংঘটিত হয়। কোষ বিভাজন ও সংশ্লেষ হারের মধ্যে সমতা বর্তমান। অর্থাৎ কোষ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে সমান হারে কোষের সংগঠকগুলির সংশ্লেষ ঘটে। সংশ্লেষের হার পরিস্ফুরণের সকল স্তরে সমান নহে। পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক এবং প্রান্তিক দশায় সংশ্লেষের হার কম থাকে এবং সময় সময় ইহার হার বর্ধিত হয়।

B. **মিথস্ক্রিয়া** : পরিস্ফুরণকালে কোষের স্থান পরিবর্তন (Cell-movement), কোষ-সংযোগ (Cell-contact) এবং কোষ-আবেশ (Cell-induction) মিথস্ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

C. **বিভেদ** : কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমসত্ত্ব অবস্থা (Homogeneous state) হইতে অসমসত্ত্ব অবস্থার (Heterogeneous state) উদ্ভব হয়। এইভাবে কোষ-বিভেদের ফলে বিভিন্ন কলা, বিভিন্ন কলা হইতে বিভিন্ন অঙ্গ এবং বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে অঙ্গতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটে।

উপরি-উক্ত তিনটি প্রাথমিক ঘটনার ফলে একটি নির্দিষ্ট আকৃতির (Definite) pattern) উদ্ভব হয়। এই প্রক্রিয়াকে **মরফোজেনেসিস** (Morphogenesis) বলে। কিভাবে এককোষী অবস্থা (জাইগোট) হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গঠনগত ও প্রাণরাসায়নগত জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহা সঠিকভাবে আজও পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। মানুষের পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করিলে এই সত্য স্পষ্ট হয়। মানুষের ডিম্বাণুর আয়তন প্রায় 0·15 মিলিমিটার। নিষেকের সময় ডিম্বাণুর সহিত শুক্রাণুর (আয়তন প্রায় 0·005 মিলিমিটার এবং ওজন প্রায় 5×10^{-9} গ্রাম) মিলন ঘটে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্রমবিভাজন ও বিভেদের ফলে ভ্রূণ এবং ভ্রূণ হইতে নবজাত শিশুর জন্ম হয়। শিশুর ওজন প্রায় 2800 হইতে 4500 গ্রাম। ডিম্বাণু হইতে নবজাতকের পরিস্ফুরণে আপেক্ষিক ওজন বৃদ্ধি প্রায় এক মিলিয়ন গুণ। ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিও সমানুপাতে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ একটি কোষ হইতে সম্ভবত হাজার বিলিয়ন কোষের উদ্ভব হয়। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সামগ্রিক ওজন বৃদ্ধি ছাড়াও আরও অনেক জটিলতার উৎপত্তি হয়। চক্ষুর ন্যায় জটিল অঙ্গের পরিস্ফুরণ পর্যবেক্ষণ করিলে পরিস্ফুরণ-জনিত জটিলতা প্রতিভাত হয়। ইহার বিভেদকালে রাসায়নিক ও ভৌত পরিবর্তনের ক্রমিক জটিলতা তাৎপর্যপূর্ণ। চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রেও এই সত্য নির্দেশিত হয়।

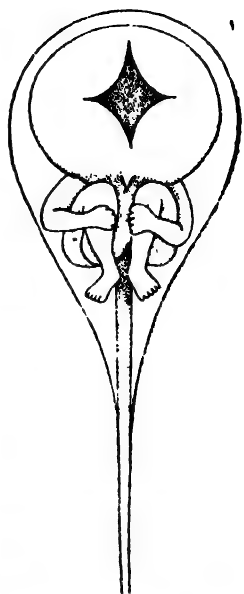
10.3 ভ্রূণতত্ত্বের ইতিহাস

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণকালে কিভাবে জাইগোট হইতে জটিল পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সৃষ্টি হয় সেই বিষয়টি অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাচীনকালের নিসর্গী দার্শনিকগণ পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়ার জটিলতা সমাধানে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য ছাড়াই নানান কাল্পনিক ব্যাখ্যার উপস্থাপনা করেন। বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে জীববিদ্যা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মধ্যে প্রাচীনতম এবং পরিস্ফুরণবিদ্যাও জীববিদ্যার সমসাময়িক বিজ্ঞানরূপে বৃদ্ধিলাভ করে। 1839 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান দেশের বিজ্ঞানী থিয়োডর স্যোন (Theodor Schwann, 1810-1882) এবং এম. জে. স্লাইডেন (M. J. Schleiden, 1804-1881) কর্তৃক সেল থিয়োরি (Cell theory) উপস্থাপিত হয়। উক্ত মতবাদ প্রকাশনের পর হইতে পরিস্ফুরণ সম্বন্ধে তৎকালীন ধারণার আমূল পরিবর্তন আসে। 1839 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পরিস্ফুরণ সম্বন্ধীয় সকল ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। দুইটি পৃথক গোষ্ঠী পরিস্ফুরণের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। তাঁহারা দুইটি মতবাদের উপস্থাপনা করেন। মতবাদ দুইটি .

I. থিয়োরী অফ প্রিফরমেশন (Theory of Preformation)
II. থিয়োরী অফ এপিজেনেসিস (Theory of Epigenesis)

I. **থিয়োরি অফ প্রিফরমেশন** : এই মতবাদ হইতে প্রতীয়মান হয় যে জনন কোষের মধ্যে (সম্ভবতঃ স্ত্রী জনন কোষে) পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর একটি নিখুঁত ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ (Perfect miniature form of an adult) উপস্থিত থাকে এবং ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণকালে উক্ত প্রতিরূপ তাহার বৃদ্ধিপর্ব সম্পূর্ণ করে। অর্থাৎ ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ মূলতঃ প্রাগ্‌গঠিত প্রতিরূপের ক্রমবৃদ্ধি মাত্র এবং নতুন কোন অঙ্গের উৎপত্তি ইহাতে হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে জনন কোষের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিরূপকে **হিউম্যানকিউলাস বা ক্ষুদ্র মানুষ** (Humanculus or little man) বলে। ডিম্বাশয়ের প্রতিটি ডিম্বাণুর মধ্যে একটি করিয়া হিউম্যানকিউলাস অবস্থান করে (চিত্র 10.1)। প্রিফরমেশন মতবাদের প্রবক্তারা অনুমান করেন যে একটি স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়ে অবস্থিত প্রতিটি ডিম্বাণুর মধ্যে একটি হিউম্যানকিউলাস থাকে এবং হিউম্যানকিউলাসের ডিম্বাশয়ের মধ্যে অবস্থানকারী প্রতিটি ডিম্বাণুর মধ্যে অনুরূপ একটি **সেকেণ্ডারী হিউম্যানকিউলাস** (Secondary humanculus) উপস্থিত থাকে। এইভাবে ক্রমপর্যায়ে হিউম্যানকিউলাসের উপস্থিতি অনুমান করা হয়। ইহাদের মতে মাতা ইভ (Mother Eve) প্রায় দুইশত লক্ষ জনু হিউম্যানকিউলাস বহন করেন এবং বিশ্বাস করা হয় যে সকল হিউম্যানকিউলাস ব্যবহৃত হইলে আর কোন মানবশিশুর জন্ম হইবে না। অর্থাৎ মানুষের জন্মের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ ডিম্বাণুর সহজাত ধর্ম এবং অনুকূল পরিবেশে ডিম্বাণুর স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। কিন্তু লিউয়েনহক (Leeuwenhock) কর্তৃক পুরুষের শুক্রাণুর (Spermatozoon) আবিষ্কার প্রিফরমেশন মতবাদে নতুন জটিলতা সংযোজিত করে। লিউয়েনহক শুক্রাণুকে অ্যানিমেলকিউল (Animalcule) নামে অভিহিত করেন। কালক্রমে পরিস্ফুরণে নিষেকের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের উপস্থাপনা ঘটে—হিউম্যানকিউলাস ডিম্বাণুর মধ্যে অবস্থান করে না শুক্রাণুর মধ্যে থাকে। 1700 খ্রীষ্টাব্দে হার্টসোয়েকার (Hartsoeker) নব আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মানুষের শুক্রাণুর মধ্যে হিউম্যানকিউলাসের উপস্থিতির বর্ণনা দেন। ফলে প্রিফরমেশন মতবাদের অনুরাগীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যথা: **অ্যানিমেলকিউলিস্ট** (Animalculist) বা **স্পারমিস্ট** (Spermist) এবং **ওভিউলিস্ট** (Ovulist)। স্পারমিস্ট দলভুক্ত অনুরাগীরা মনে করেন শুক্রাণুর মধ্যে হিউম্যানকিউলাস থাকে এবং ওভিউলিস্টদের মতে হিউম্যানকিউলাসের উপস্থিতি ডিম্বাণুর মধ্যে থাকে। জার্মপ্লাজম মতবাদের প্রবক্তা ভাইসম্যান (Weismann) ওভিউলিস্ট গোষ্ঠীর অধিনায়ক ছিলেন।



চিত্র 10.1 শুক্রাণুর মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হিউম্যানকিউলাস (Humanculus)। প্রিফরমেশন মতবাদে বিশ্বাসী হার্টসোয়েকারের কল্পিত চিত্রের চিত্ররূপ।

কিন্তু জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখার ক্রম অগ্রগতি ও উন্নতমানের মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কারের ফলে প্রিফরমেশন মতবাদের জনপ্রিয়তা বিলুপ্ত হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে হিউম্যানকিউলাস ধরনের কোন পূর্বগঠিত প্রতিরূপ উপস্থিত থাকে না। প্রিফরমেশন মতবাদ মূলতঃ কাল্পনিক এবং অবৈজ্ঞানিক।

II. **থিয়োরি অফ এপিজেনেসিস** : এপিজেনেটিক মতবাদ হইতে প্রতিভাত হয় যে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণকালে জনন কোষের মধ্যে কোন পূর্বগঠিত প্রতিরূপ বা অঙ্গ বর্তমান থাকে না। নিষেককালে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে উদ্ভূত জাইগোট হইতে ক্রমপরিবর্তন ও ক্রমবর্ধনের দ্বারা ভ্রূণের সৃষ্টি হয় এবং ভ্রূণ হইতেই পূর্ণাঙ্গ জীবের উৎপত্তি হয়। সমগ্র পদ্ধতিটিকে **এপিজেনেসিস** (Epigenesis) বলে। জাইগোট হইতে সৃষ্ট সমসত্ত্ব কোষগোষ্ঠী হইতে আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় বিভেদের দ্বারা অসমসত্ত্বতা সূচিত হয়। অ্যারিস্টটল (Aristotle) সর্বপ্রথম এপিজেনেসিসের ধারণা দেন। মুরগীর পরিস্ফুরণ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহা মুখ্যত এপিজেনেটিক (Epigenetic)। তাঁহার মতে জাইগোটের সুসংগঠিত বস্তু হইতে পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়। পরিস্ফুরণের প্রথম অবস্থায়

কোন অঙ্গ থাকে না। পরিস্ফুরণকালে বিভিন্ন অঙ্গের উদ্ভব হয় এবং ক্রমে গঠিত অঙ্গসমূহ যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করে। হার্ভে (Harvey) এবং উল্ফের (Wolf) পরিস্ফুরণ সম্বন্ধীয় সংযোজন এপিজেনেটিক মতবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। পাখী ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণের পরিস্ফুরণের উপর হার্ভের গবেষণা তাৎপর্যপূর্ণ। ভ্রূণবিদ্যার মৌলিক সূত্র "*Omne vivum ex ovo*" মতবাদ প্রবর্তনের জন্য আমরা হার্ভের নিকট ঋণী। জীববিদ্যার ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এপিজেনেটিক মতবাদও বিবর্তিত হইয়াছে। কিভাবে মুরগীর ভ্রূণে বিভিন্ন অঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উল্ফ প্রথম লিপিবদ্ধ করেন এবং তিনিই এপিজেনেটিক মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে উল্ফের মতবাদ কিঞ্চিত পরিবর্তিত হইয়াছে। শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ নৈপুণ্য এবং সুপ্রজননবিদ্যার অগ্রগতির ফলে পরিস্ফুরণের প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টতর হইয়াছে। পরিস্ফুরণ যে একটি এপিজেনেটিক প্রক্রিয়া সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

10.4 পরিস্ফুরণের বিভিন্ন পর্যায়

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। পরিস্ফুরণকালে পর্যায়সমূহ ক্রম পরম্পরায় আসে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় নিষেকের পূর্বেই প্রকৃত পরিস্ফুরণের সূত্রপাত হয়। পরিস্ফুরণের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ নিম্নরূপ :

I. **গ্যামেটোজেনেসিস্** (Gametogenesis) : স্ত্রী ও পুরুষের জনন অঙ্গ (Gonads) হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সৃষ্টির সঙ্গেই ভ্রূণের সৃষ্টিপর্ব অর্থাৎ ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়। যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গে প্রাইমরডিয়াল জার্ম সেল (Primordial germ cell) বা প্রাথমিক জনন কোষ হইতে জনন কোষ বা গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন হয় তাহাকে গ্যামেটোজেনেসিস্ বলে। গ্যামেটোজেনেসিস্ মুখ্যতঃ দুই প্রকার, যথা—স্পার্মাটোজেনেসিস্ (Spermatogenesis) এবং উজেনেসিস্ (Oogenesis)। শুক্রাশয়ে প্রাইমরডিয়াল জার্ম-সেল হইতে শুক্রাণু সৃষ্টির পদ্ধতিকে স্পার্মাটোজেনেসিস্ এবং ডিম্বাশয়ে প্রাই-মরডিয়াল জার্ম সেল হইতে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উজেনেসিস্ বলে।

II. **নিষেক** (Fertilization) : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন বা একত্রী-করণকে নিষেক বলে। নিষেক একটি জটিল জৈব প্রক্রিয়া। নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিস্ফুরণ শুরু হয়।

III. **ক্লিভেজ** (Cleavage) : নিষেক সংঘটিত হইবার পর জাইগোট কোষ-বিভাজনের দ্বারা অসংখ্য অপত্য কোষ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন অপত্য কোষসমূহকে ব্লাস্টোমিয়ার (Blastomere) বলে। ক্লিভেজ প্রক্রিয়া খণ্ডীকরণ (Segmentation) বা সেলুলেশন (Cellulation) নামেও অভিহিত। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায়

উৎপন্ন কোষসমূহ সম্মিলিত হইয়া একটি কোষনির্মিত বলের আকার ধারণ করে। বলের আকারবিশিষ্ট বহু কোষ নির্মিত গঠনকে **ব্লাস্টুলা** (Blastula) বলে। ব্লাস্টুলার কোষ-প্রাচীরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (Blastoderm) এবং উহার অন্তঃস্থ গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (Blastocoel) বলে। জাইগোট হইতে ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় বহুকোষী ব্লাস্টুলায় রূপান্তরকে **ব্লাস্টুলেশন** (Blastulation) বলে।

ক্লিভেজের সময় ও পরে সৃষ্ট ব্লাস্টোমিয়ারগুলিতে নানান পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে উক্ত ব্লাস্টোমিয়ারসমূহের মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্যের উদ্ভব বা বিভেদ (Differentiation) সৃষ্টি হয়। ব্লাস্টোমিয়ারসমূহের বিভেদের ফলেই কোষ হইতে কলা এবং কলা হইতে বিভিন্ন অঙ্গের উৎপত্তি হয়। ক্লিভেজ দশার পর ব্লাস্টুলা গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়।

IV. **গ্যাস্ট্রুলেশন** (Gastrulation): ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। এই অবস্থায় ভ্রূণকে **গ্যাস্ট্রুলা** (Gastrula) বলে। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় গ্যাস্ট্রুলার এক অংশ হইতে অন্যত্র কোষসমূহের পরিযান ঘটে এবং কোষসমূহ যথোপযুক্ত স্থানে আনীত ও প্রতিস্থাপিত হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রদান করে। এই ধরনের কোষ-পরিযানকে **মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট** (Morphogenetic movement) বলে। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় অপর উল্লেখ্য ঘটনা তিনটি **জারমিনাল বা জনিতৃ কোষস্তরের** (Germinal layers) উৎপত্তি। জারমিনাল কোষস্তর তিনটি : **এমব্রায়োনিক এক্টোডার্ম** (Embryonic ectoderm), **এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম** (Embryonic mesoderm) এবং **এমব্রায়োনিক এন্ডোডার্ম** (Embryonic endoderm)। উপরি-উক্ত তিনটি জনিতৃ কোষস্তর হইতে বিভিন্ন অঙ্গের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের "ব্লু-প্রিন্ট" (Blue print) সংস্থাপিত হয়।

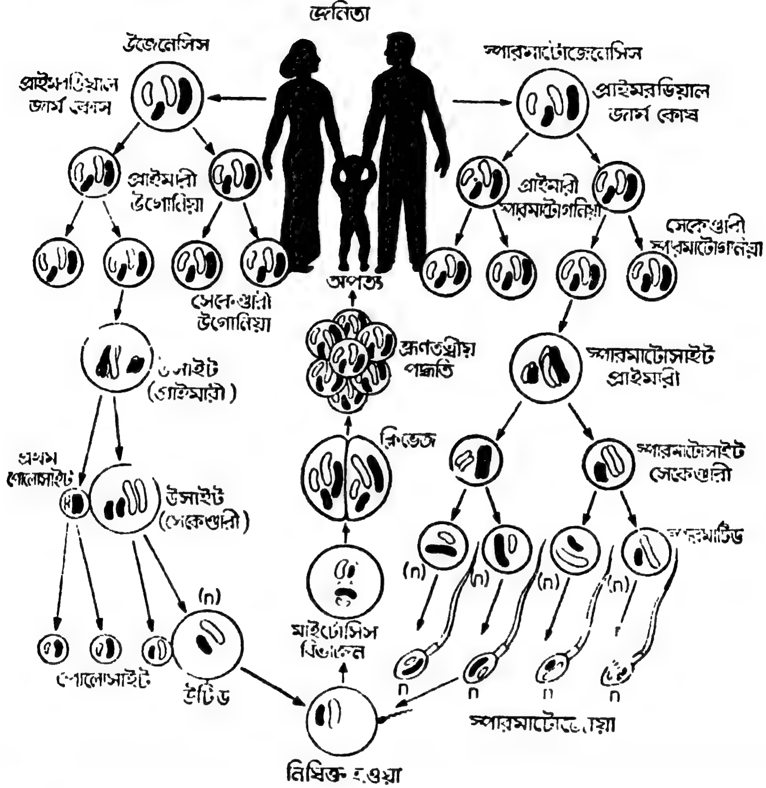
গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় গ্যাস্ট্রুলার মধ্যে একটি নতুন গহ্বরের সৃষ্টি হয়। গহ্বরটিকে **আরকেনটেরন** (Archaenteron) বা **প্রিমিটিভ গাট** (Primitive gut) বলে। ব্লাস্টোপোর (Blastopore) নামক ছিদ্রপথে আরকেনটেরন বাহিরে উন্মুক্ত হয়।

V. **অরগ্যানোজেনেসিস্** (Organogenesis): গ্যাস্ট্রুলেশনের সময়ে বিভেদিত তিনটি প্রাথমিক জনিতৃ কোষস্তর (Three primary germ layers) হইতে ভ্রূণদেহের বিভিন্ন অঙ্গের (Organs) উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন অঙ্গ ও দেহাংশের সৃষ্টি অরগ্যানোজেনেসিস্ নামে অভিহিত।

10.5 গ্যামেটোজেনেসিস্

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গ (Gonad) হইতে গ্যামেট (Gamete) বা জনন কোষের (Germ cell) উৎপত্তি হয় তাহাকে **গ্যামেটোজেনেসিস্** (Gametogenesis)

বলে (চিত্র 10.2)। প্রাণিজগতে যৌন প্রজননে দুইটি বিশেষ ধরনের অসম জনন কোষের প্রয়োজন। একটি পুরুষ জনন অঙ্গ বা শুক্রাশয়ে (Testis) সৃষ্টি হয় এবং অপরটির উৎপত্তি হয় স্ত্রী জনন অঙ্গ বা ডিম্বাশয়ে (Ovary)। শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়ে সৃষ্ট জননকোষকে যথাক্রমে শুক্রাণু বা স্পার্মাটোজুন (*Spermatozoon) এবং ডিম্বাণু (Egg) বা ওভাম (†Ovum) বলে।



চিত্র 10.2 গ্যামেটোজেনেসিস পদ্ধতির চিত্ররূপ—লক্ষণীয় যে স্পার্মাটোজেনেসিস পদ্ধতিতে একটি স্পার্মাটোসাইট হইতে চারিটি কার্যকরী শুক্রাণু উৎপন্ন হয় কিন্তু উজেনেসিসের ক্ষেত্রে একটি উসাইট হইতে একটি কার্যকরী ডিম্বাণু ও তিনটি পোলার বডি উৎপন্ন হয়।

জনন কোষ এক বিশেষ ধরনের কোষ। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণকালে জনন কোষ অন্যান্য দেহকোষ (Somatic cells) হইতে পৃথকভাবে বিভেদিত হয়। ভাইস্‌ম্যানের (Weismann) মতে বংশপরম্পরায় জনন কোষের অবিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়। ভাইস্‌ম্যানের দেওয়া জনন কোষের বংশগতি সম্পর্কীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর

* Plural : স্পার্মাটোজোয়া (Spermatozoa)

† Plural : ওভা (Ova)

ভ্রূণতত্ত্ববিদগণ জনন কোষের উৎপত্তি, স্থানান্তরণ, পরিবর্তন ও পরিণতি সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত হন। সমস্যাটি খুব জটিল হইলেও বর্তমানে বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে।

জনন কোষের উৎপত্তি (Development of germ cells): পরিস্ফুরণের সূত্রপাত হয় শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের পর। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জনন কোষ হইতে সৃষ্টি হয়। জনন কোষ হইতে শুক্রাণু কিংবা ডিম্বাণুর উৎপত্তিকালে নানা প্রকার পরিবর্তন বা রূপান্তর সূচিত হয়। ইহাই হইল উচ্চতর প্রাণীদের পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক দশা।

যে সকল প্রাণীদের দেহ কোষ (Somatic cells) এবং জনন কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা ভিন্নতর সেই ধরনের প্রাণীদের জনন কোষের উৎপত্তি সুস্পষ্ট। প্যারাস্‌কারিস ইকিউওরাম (*Parascaris equorum*) নামক এক প্রকার গোল কৃমির ক্ষেত্রে জনন কোষের বিভেদ প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। ইহার জাইগোটের দ্বিতীয় ক্লিভেজ (Second cleavage) দশায় চারিটি ব্লাস্টোমিয়ারের উৎপত্তি হয়। সৃষ্ট ব্লাস্টোমিয়ার চারিটির মধ্যে নিউক্লিয়াসের প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করে। ব্লাস্টোমিয়ার চারিটিকে A, B, C এবং P নামে চিহ্নিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে A, B এবং C চিহ্নিত ব্লাস্টোমিয়ার তিনটির ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিন বস্তুর (Chromatin material) অধিকাংশ সাইটোপ্লাজমে আসে এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিস্তৃত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **ক্রোমাটিন ডিমিনিউশন** (Chromatin diminution) বা **ক্রোমাটিন বস্তুর স্বল্পীকরণ** বলে। কিন্তু P-চিহ্নিত ব্লাস্টোমিয়ারটি অপরিবর্তিত থাকে। পরবর্তী ক্লিভেজকালে P-এর অপত্য ব্লাস্টোমিয়ার দুইটির মধ্যে একটি অপরিবর্তিত থাকে এবং অপরটিতে ক্রোমাটিন ডিমিনিউশন সংঘটিত হয়। পরের অর্থাৎ চতুর্থ ক্লিভেজের সময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং কেবল একটি ব্লাস্টোমিয়ারের (P_4) ক্রোমাটিন বস্তু অপরিবর্তিত থাকে। কেবলমাত্র P_4-ব্লাস্টোমিয়ার হইতে জনন কোষ এবং অপর ব্লাস্টোমিয়ারগুলি হইতে দেহ কোষের উৎপত্তি হয়।

জনন কোষের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে নানান মতবাদ বর্তমান। বিভিন্ন ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন ধরনের মতবাদ পোষণ করায় সমস্যাটি ক্রমে জটিল অবস্থা ধারণ করিয়াছে। ওয়ালডেয়ার (Waldeyer) 1870 খ্রীষ্টাব্দে এই অভিমত দেন যে জনন অঙ্গের সিলোমিক এপিথিলিয়াম (Coelomic epithelium) হইতে জনন কোষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু 1880 খ্রীষ্টাব্দে নুসবাম (Nussbaum) প্রমাণ করেন যে জনন কোষ জনন অঙ্গে সৃষ্টি হয় না। অন্যত্র সৃষ্ট জনন কোষ প্রকৃত উৎপত্তিস্থান হইতে স্থানচ্যুত হইয়া গমনক্রিয়ার সাহায্যে জনন অঙ্গে চলিয়া আসে এবং স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক অবস্থায় জনন কোষের পৃথকীকরণ সংঘটিত হয় এবং জনন অঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে জনন কোষের উৎপত্তি হয়। জনন কোষের পরিযানের ক্ষমতা থাকার

(Migration of germ cells) উহারা উৎপত্তিস্থান হইতে আসিয়া জনন অঙ্গের অংশরূপে অবস্থান করে। এখন প্রশ্ন কিভাবে জনন কোষের পরিযান ক্রিয়া সাধিত হয়।

জনন কোষের পরিযান : জনন কোষের পরিযান সম্বন্ধীয় মতবাদগুলিকে তিনটি ভাগে বর্ণনা করা যায়। ইহারা নিম্নরূপ : (1) অ্যামিবার ন্যায় অ্যামিবয়েড মুভমেণ্টের (Amoeboid movement) দ্বারা জনন কোষ উৎপত্তি স্থান হইতে জনন অঙ্গে আসে। (2) উৎপত্তি স্থান হইতে জনন কোষ রক্তস্রোতে দেহের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করিয়া পরিশেষে জনন অঙ্গে পৌঁছায় এবং তথায় অবস্থান করে। (3) ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে বিভিন্ন ধরনের ভাঁজের সৃষ্টি হওয়ায় জনন কোষ আদি উৎপত্তিস্থল হইতে জনন অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়।

জনন কোষের পরিণতি (Fate of germ cells) : জনন কোষের পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা : (1) প্রাথমিক জনন কোষগুলি জনন অঙ্গে পৌঁছানোর পর ইহাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং পরিবর্তে জনন অঙ্গ হইতে সৃষ্ট নতুন জনন কোষ হইতে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। (2) প্রাথমিক জনন কোষ জনন অঙ্গে পৌঁছানোর পর তথায় অবস্থান করে এবং সক্রিয় শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে পরিবর্তিত হয়। অধুনা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে দ্বিতীয় মতটির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

জনন কোষের পরিবর্তন (Transformation of germ cell) : জনন অঙ্গের মধ্যে অবস্থিত প্রাথমিক জনন কোষসমূহকে **প্রাইমরডিয়াল জার্ম সেল** (Primordial germ cell) বলে। প্রাইমরডিয়াল জার্মসেল হইতে নানা পরিবর্তন বা রূপান্তরের মাধ্যমে পুনর্গঠিত কার্যকরী গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন হয়। পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রক্রিয়াটি জটিল ও বিস্তারিত হইলেও ইহাদের তিনটি নির্দিষ্ট দশায় বিভক্ত করা সম্ভব, যথা :

I. **সংখ্যাবৃদ্ধি দশা বা ফেজ অফ মাল্টিপ্লিকেশন** (Phase of multiplication)

II. **বৃদ্ধি দশা বা ফেজ অফ গ্রোথ** (Phase of growth)

III. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা বা ফেজ অফ ম্যাচুরেশন** (Phase of maturation).

প্রথম দশায় একটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম সেল মাইটোটিক কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে দুইবার বিভক্ত হইয়া মোট চারিটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। প্রথম বিভাজনে সৃষ্ট দুইটি অপত্য কোষকে **প্রাইমারি গ্যামেটোগোনিয়া** (Primary gametogonia, plural of gametogonium) বলে। দ্বিতীয় বিভাজনে উদ্ভূত অপত্য কোষ **সেকেণ্ডারী গ্যামেটোগোনিয়া** (Secondary gametogonia) নামে অভিহিত। বৃদ্ধি দশায় প্রতিটি সেকেণ্ডারী গ্যামেটোগোনিয়াম সংশ্লেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্ধিত হয়। পরিবর্ধিত কোষটিকে **প্রাইমারি গ্যামেটোসাইট** (Primary gametocyte) বলে। পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় প্রতিটি প্রাইমারি গ্যামেটোসাইটে

মিয়োসিস কোষ বিভাজন সংঘটিত হয় এবং উদ্ভূত অপত্য কোষে পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। প্রথম মিয়োসিস বিভাজনে সৃষ্ট কোষকে **সেকেন্ডারী গ্যামেটোসাইট** (Secondary gametocyte) বলে। সেকেন্ডারী গ্যামেটোসাইট কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। সেকেন্ডারী গ্যামেটোসাইট হইতে পূর্ণগঠিত গ্যামেট উৎপন্ন হয়।

গ্যামেট উৎপাদনের বিভিন্ন দশায় মৌলিক সাদৃশ্য থাকিলেও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকে। শুক্রাণু উৎপত্তিকালে প্রতিটি প্রাইমারি গ্যামেটোসাইট হইতে চারিটি কার্যকরী শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে ডিম্বাণু সৃষ্টির সময় একটি প্রাইমারি গ্যামেটোসাইট হইতে তিনটি নিষ্ক্রিয় কোষ এবং কেবলমাত্র একটি কার্যকরী ডিম্বাণুর উৎপত্তি ঘটে।

10.6 স্পার্মাটোজেনেসিস্ (Spermatogenesis)

যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয়ে অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্মসেল হইতে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাহাকে **স্পার্মাটোজেনেসিস্** বলে। স্পার্মাটোজেনেসিস্ পদ্ধতি খুবই জটিল এবং শুক্রাণু উৎপত্তিকালে কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু ও ক্রোমোসোম সংখ্যার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্ণনার সুবিধার জন্য স্পার্মাটোজেনেসিসকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা :

I. **স্পার্মাটিডের উৎপত্তি** (Formation of Spermatid)
II. **স্পার্মাটিলিওসিস** (Spermateleosis)।

স্পার্মাটিডের উৎপত্তি

শুক্রাশয়ে অবস্থিত প্রাইমারী গ্যামেটোসাইট হইতে প্রথমে স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয় এবং স্পার্মাটিডের ক্রমিক রূপান্তরের ফলে পরিণত শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। স্পার্মাটিড উৎপত্তিকালে তিনটি প্রাথমিক দশা, যথা : **সংখ্যাবৃদ্ধি দশা** (Phase of multiplication), **বৃদ্ধি দশা** (Phase of growth) এবং **পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা** (Phase of maturation) বর্তমান।

সংখ্যাবৃদ্ধি দশা : শুক্রাশয়ের জার্মিনাল এপিথিলিয়াম (Germinal epithelium) কোষগুলিকে **প্রাইমরডিয়াল জার্ম সেল** বলে। প্রাইমরডিয়াল জার্ম সেলের নিউক্লিয়াসটিতে ডিপ্লয়েড্ (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। এই কোষগুলি দুইবার মাইটোটিক (Mitotic) পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া **স্পার্মাটোগোনিয়া** (Spermatogonia) উৎপন্ন করে। প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ হইতে প্রথম সমবিভাজনে দুইটি সদৃশ অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট কোষ দুইটিকে **প্রাইমারি স্পার্মাটোগোনিয়া** (Primary spermatogonia) বলে। প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোগোনিয়া হইতে সমবিভাজনের ফলে দুইটি **সেকেন্ডারী স্পার্মাটোগোনিয়ার** (Secondary spermatogonia) উৎপত্তি হয়। একটি প্রাইমরডিয়াল

জার্ম কোষ পরপর দুইবার মাইটোটিক কোষ বিভাজনের দ্বারা মোট চারিটি সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোগোনিয়া সৃষ্টি করে।

বৃদ্ধিদশা : প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়া কোষ পুষ্টি গ্রহণ করিয়া আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ইহাদের **প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট** (Primary spermatocyte) বলে। আয়তন বৃদ্ধি মূখ্যত প্রোটোপ্লাজমের সংশ্লেষের দ্বারা সাধিত হয়। প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। বৃদ্ধি দশার পরই পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা আরম্ভ হয়।

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা : প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা চারিটি কোষ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন কোষগুলিকে স্পার্মাটিড (Spermatid) বলে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট হইতে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন দ্বারা দুইটি **সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইট** (Secondary spermatocyte) সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনে প্রতিটি সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইট হইতে দুইটি সদৃশ ও হ্যাপ্লয়েড (n) স্পার্মাটিডের উৎপত্তি হয়। প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) হইতে মিয়োটিক কোষ বিভাজন দ্বারা সৃষ্ট চারিটি স্পার্মাটিড (n) উৎপত্তির পর পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশার সমাপ্তি ঘটে (চিত্র 10.3)। স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকিলেও ইহারা সক্রিয় পুংগ্যামেটরূপে কাজ করিতে অক্ষম। স্পার্মাটিড ক্রমিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে সক্রিয় ও পূর্ণগঠিত শুক্রাণুর সৃষ্টি করে। রূপান্তর প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল এবং ইহাকে স্পার্মাটিলিওসিস (Spermateleosis) বা স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis) বলে।



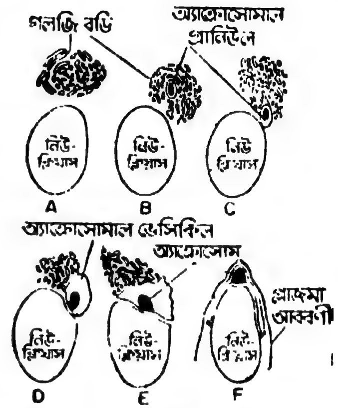
চিত্র 10.3 মানুষের শুক্রাশয়ের অণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ—সেমিনিফেরাস টিউবিউলে শুক্রাণু সৃষ্টির গঠনমূলক দশাসমূহ দেখান হইয়াছে।

স্পার্মাটিলিওসিস

স্পার্মাটিডের গঠন সাধারণ প্রাণিকোষের ন্যায়। ইহার পরিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট পূর্ণগঠিত শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। স্পার্মাটিডের সাইটোপ্লাজমে গলজি বডি, সেন্ট্রোসোম, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতি বর্তমান। ইহার নিউক্লিয়াসটির গঠন আদর্শ কোষের ন্যায় কিন্তু ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (n)।

স্পার্মাটিলিওসিস প্রক্রিয়ার আরম্ভে সেন্ট্রোসোমের সেণ্ট্রিওল (Centriole) বিভাজিত হইয়া দুইটি সেণ্ট্রিওলে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াসের নিকটস্থ সেণ্ট্রিওলকে-

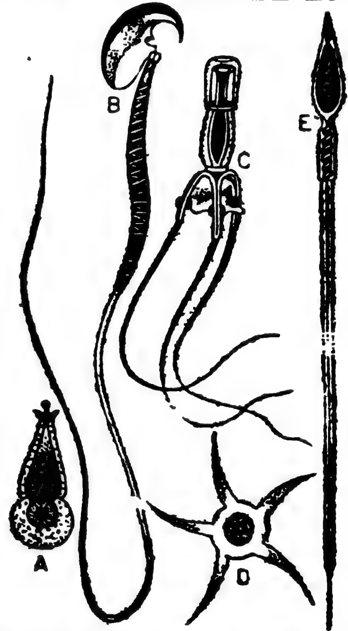
প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওল (Proximal centriole) এবং অপরটিকে **ডিস্টাল সেণ্ট্রিওল** (Distal centriole) বলে। স্পার্মাটিডের প্রাথমিক অবস্থায় গলজি বডি (Golgi body) জালকাকার অঙ্গাণুরূপে নিউক্লিয়াসের সন্নিকটে সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। গলজি বডির মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার থলির আবির্ভাব হয়। প্রতিটি থলির অভ্যন্তরে একটি করিয়া ক্ষুদ্র দানার উৎপত্তি হয়। দানাগুলিকে **প্রোঅ্যাক্রোসোমাল দানা** (Proacrosomal granules) বলে। ক্রমে ক্ষুদ্রাকার থলিগুলি একত্রে মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ থলিতে পরিণত হয়। থলিটিকে **অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকল্** (Acrosomal vesicle) বলে (চিত্র 10 4)। অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকল্ সৃষ্টির সময় প্রো-অ্যাক্রোসোমাল দানাগুলি একত্রিত হইয়া একটি বড় আকারের **অ্যাক্রোসোমাল গ্র্যানিউল** (Acrosomal granule) গঠন করে। অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকিলটি টুপির আকারে নিউক্লিয়াসের অগ্রভাগে প্রসারিত হয় অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকিল্সমেত নিউক্লিয়াসটি কোষের একপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় সেণ্ট্রিওল দুইটি কোষের প্লাজমালেমার (Plasmalemma) নিকটবর্তী হয় এবং একটি (ডিস্টাল সেণ্ট্রিওল) প্লাজমালেমার সহিত সংযোগ স্থাপন করে। এই স্থান হইতে একটি সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় গঠন উৎপন্ন হয় এবং ইহা কোষের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র ফ্লাজিলার আকারে প্রসারিত হয়। ইহাই শুক্রাণুর লেজের **অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্ট** বা **অক্ষীয় সূত্র** (Axial filament)। পরে সেণ্ট্রিওল দুইটি নিউক্লিয়াসের দিকে অগ্রসর হয় এবং একটি (প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওল) নিউক্লিয়াসের পশ্চাৎদিকে অবস্থিত খাঁজে যুক্ত হয়। নিউক্লিয়াস অভিমুখে গমনের সময় যে সেণ্ট্রিওলটি প্লাজমালেমার সহিত সংযুক্ত থাকে (ডিস্টাল সেণ্ট্রিওল) সেই সেণ্ট্রিওলটি প্লাজমালেমাসমেত নিউক্লিয়াস আবরণী পর্যন্ত পৌঁছায়। ফলে ফ্লাজিলাটি কোষের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া মনে হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে কোষের বাহিরে অবস্থিত এবং দুই স্তর প্লাজমালেমা দ্বারা পরিবৃত থাকে। প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওলটি নিউক্লিয়াসের পশ্চাৎদিকে প্রোথিত থাকে এবং ডিস্টাল সেণ্ট্রিওলটি প্লাজমালেমার ভাঁজসমেত কোষের পরিধিতে পুনরায় ফিরিয়া আসে। প্রক্সিমাল ও ডিস্টাল সেণ্টিওলদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশটি ক্রমে শুক্রাণুর মধ্যমাংশে



চিত্র 10.4 স্পারমাটীওসিসের সময় গলজি বডি হইতে অ্যাক্রোসোম সৃষ্টির ঘটনা প্রবাহ—(A) কেন্দ্রীয় গহ্বর বেষ্টন করিয়া গলজি বডির নালিকাসমূহ সজ্জিত ; (B) কেন্দ্রীয় গহ্বরের আকার বৃদ্ধি এবং গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে অ্যাক্রোসোম গ্রানিউল ; (C) অ্যাক্রোসোম গ্রানিউলের আকার বৃদ্ধি ; (D-B) অ্যাক্রোসোম গ্রানিউল সহ গহ্বরের নিউক্লিয়াসের সন্নিহিত হওয়া ; (F) গহ্বর কর্তৃক নিউক্লিয়াসের অগ্রাংশে আবরণী সৃষ্টি।

পরিণত হয়। মাইটোকনড্রিয়াগুলি সাধারণতঃ উভয় সেণ্ট্রিওল সংযোগকারী অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্টের চারিপার্শ্বে সন্নিবেশিত হয় ও সাঁপলাকার কুণ্ডলীর আকার ধারণ করে। ইহাকে **মাইটোকনড্রিয়াল স্পাইরাল** (Mitochondrial spiral) বলে। ডিস্টাল সেণ্ট্রিওলটি শুক্রাণু মধ্যমাংশের পশ্চাৎ সীমানা নির্ধারণ করে এবং চক্রাকার ধারণ করে। সেইজন্য ডিস্টাল সেণ্ট্রিওলের অপর নাম **রিং সেণ্ট্রিওল** (Ring centriole)। ক্রমবর্ধনের সময় শুক্রাণু প্রলম্বিত হয় এবং ইহার সাইটোপ্লাজম প্রায় নিঃশেষিত হয় এবং অবশিষ্ট সাইটোপ্লাজম (Residual cytoplasm) পরিশেষে পরিত্যক্ত হয়।

অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্টটি কোষের বাহিরে একটি দীর্ঘ ফ্লাজিলারূপে প্রসারিত হয়। প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওল হইতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম তন্তু অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্টকে আবৃত করে এবং শুক্রাণুর লেজ গঠনে অংশ গ্রহণ করে। স্পার্মাটিড হইতে শুক্রাণুর রূপান্তরের সময় নিউক্লিয়াসটি নিরুদিত ও প্রলম্বিত হয়। ফলে অ্যাক্রোসোম ভেসিকলটি সম্মুখভাগে শুক্রাণুর প্লাজমালেমার সন্নিহিত থাকে। এইরূপে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিণত শুক্রাণুর তিনটি অংশ, যথা: মস্তক (Head), মধ্যমাংশ (Middle piece) এবং লেজ (Tail) সৃষ্টি হয়। যদিও বিভিন্ন প্রাণীদের শুক্রাণুর গঠন ভিন্নরূপ তথাপি স্পার্মাটিলিওসিস প্রক্রিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।



চিত্র 10.5 বিভিন্ন প্রাণীতে শুক্রাণুর আকার বিভিন্ন—(A) অ্যাসকারিস; (B) ইঁদুর; (C) নেফরপ্স (*Nephrops*); (D) মাইয়া (*Maia*); (E) মানুষ।

শুক্রাণুর গঠন (Structure of Spermatozoa)

স্পার্মাটোজোয়া বা শুক্রাণুর আকৃতি বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। চিংড়ী জাতীয় সন্ধিপদীদের শুক্রাণু অ্যামিবা সদৃশ (Amoeboid)। মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণু ফ্লাজিলাযুক্ত (Flagellated) হইলেও ইহাদের আকৃতির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। একটি আদর্শ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণুর দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা: (A) মস্তক (Head), (B) মধ্যমাংশ (Middle piece) এবং (C) লেজ (Tail)। মস্তকের আকৃতি অনুসারে নিম্নে কয়েকটি শুক্রাণুর গঠন উল্লেখিত হইল (চিত্র 10.5):

(i) গোলাকার (Spheroidal)—অস্থিময় মাছ (Teleostean fish)

(ii) প্রলম্বিত বল্লম-সদৃশ (Lance-shaped)—উভচর (Amphibians)

(iii) সর্পিলাকার (Spirally twisted)—কয়েকটি পাখী
(iv) চামচের ন্যায় (Spoon-shaped)—মানুষ (Man)
(v) বঁড়শির ন্যায় (Hooked)—ইঁদুর (Rat)

উপরি-উক্ত বৈসাদৃশ্য থাকিলেও সকলক্ষেত্রে শুক্রাণুর মধ্যে গঠনগত সমতা আছে। সেইজন্য নিম্নে খরগোসের (*Oryctolagus cuniculus*) শুক্রাণুকে আদর্শ-রূপে বর্ণিত হইল। কারণ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে খরগোসের শুক্রাণু সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট। 8-10 মাইক্রণমিলিমিটার মস্তক সমেত একটি পূর্ণগঠিত খরগোসের শুক্রাণুর দৈর্ঘ্য প্রায় 60-70 মাইক্রণমিলিমিটার। শুক্রাণুর তিনটি নির্দিষ্ট অংশ, যথা : মস্তক, মধ্যমাংশ ও লেজ বর্তমান।

মস্তক : শুক্রাণুর শিরভাগকে মস্তক বলে। ইহাতে প্রধানতঃ **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) এবং **অ্যাক্রোসোম** (Acrosome) থাকে চিত্র 10.6 C)। মস্তকের অধিকাংশ স্থান নিউক্লিয়াস দ্বারা অধিকৃত। নিউক্লিয়াসটি লম্বাটে এবং পশ্চাৎপ্রান্তে একটি খাঁজ যুক্ত। নিউক্লিয়াসটি ঘন ক্রোমাটিন দ্বারা পূর্ণ থাকায় ইহার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে ডি. এন. এ. (DNA) এবং হিস্টোন (Histone) নামক প্রোটিন থাকে। নিউক্লিয়াসের অগ্রে একটি দুই-প্রাচীর বিশিষ্ট থলি টুপির ন্যায় অবস্থান করে। ইহাকে অ্যাক্রোসোম (Acrosome) বলে এবং অ্যাক্রোসোম গহ্বরে অ্যাক্রোসোম দানা (Acrosome granule) থাকে। অ্যাক্রোসোম নিউক্লিয়াসের সহিত যুক্ত থাকে। ইহার অগ্রভাগ উত্তল এবং পশ্চাৎভাগ চ্যাপ্টা ও সমতল। বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে অ্যাক্রোসোমের আকৃতি ও আয়তন ভিন্ন। অ্যাক্রোসোম হইতে নিঃসৃত উৎসেচক নিষেকের সময় ডিম্বাণুর আবরণ বিদীর্ণ করিতে সাহায্য করে। নিউক্লিয়াস ও অ্যাক্রোসোম ব্যতীত কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শুক্রাণুর [যথা : সি আর্চিন Sea-urchin) নামক কণ্টকত্বক্ প্রাণী] শিরভাগে **পারফোরেটোরিয়াম** (Perforatorium) থাকে। খরগোস ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের শুক্রাণুতে পারফোরেটোরিয়াম থাকে না। ইহা হইতে সৃষ্ট **অ্যাক্রোসোমাল ফিলামেন্ট** (Acrosomal filament) নামক সূত্র নিষেকের সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

মধ্যমাংশ : বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর এই অংশটির গঠন ও আকৃতি ভিন্নরূপ। প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওল হইতে রিং সেণ্ট্রিওল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে মুখ্যত শুক্রাণুর মধ্যমাংশ (Middle piece) বলে। অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্ট (Axial filament) পরিবৃত সর্পিলাকার স্প্রিং-এর ন্যায় মাইটোকনড্রিয়া এবং প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওল হইতে উত্থিত নয়টি সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা মধ্যমাংশ গঠিত। মধ্যমাংশে অবস্থিত মাইটোকনড্রিয়া হইতে উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে শুক্রাণুর গমনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেইজন্য শুক্রাণুর মধ্যমাংশকে "পাওয়ার প্লাণ্ট" (Power plant) বলে।

লেজ : এই বিশেষ অংশটির সঞ্চালনের ফলে শুক্রাণুর গমনক্রিয়া সম্ভব হয়। সি-আর্চিন-এর শুক্রাণুর লেজ সিলিয়া ও ফ্লাজিলার ন্যায় দুইটি কেন্দ্রীয় সূত্র ও নয়টি

সূক্ষ্ম সূত্রের চক্র দ্বারা পরিবৃত থাকে। খরগোসের শুক্রাণুর লেজের এইরূপ সূত্র-গোষ্ঠীকে অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্ট বলে এবং ইহা প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওল হইতে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু খরগোসের শুক্রাণুর লেজে অতিরিক্ত আর একটি নয় সূত্রের চক্র অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্টকে পরিবৃত করে। অর্থাৎ সূত্রগুলির সজ্জারীতি 2+9+9=20। নয়টি সূত্র অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং ইহারা লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে না। লেজের বিভিন্ন দূরত্বে ইহাদের পরিসমাপ্তি হয়। সেইজন্যই লেজের শেষ প্রান্তে কেবলমাত্র অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্ট থাকে। লেজের সূত্রগুলি সংকোচনশীল এবং ইহাদের বাহিরে একটি আবরণ থাকে।

শুক্রাণুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Spermatozoa)

পূর্ণগঠিত শুক্রাণুর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য -

(i) আদর্শ প্রাণিকোষের তুলনায় শুক্রাণুর আকৃতিগত গঠন ভিন্ন।

(ii) শুক্রাণুর অধিকাংশ নিউক্লিয়াস দ্বারা অধিকৃত এবং অবশিষ্ট সাইটোপ্লাজম পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া গমন ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে।

(iii) শুক্রাণুতে কোন সঞ্চিত খাদ্য এবং রক্ষাকারী কোন অতিরিক্ত আবরণ থাকে না।

(iv) ডিম্বাণু অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইলেও শুক্রাণুর সংখ্যাধিক্য তাৎপর্যপূর্ণ।

(v) ডিম্বাণুকে কর্মক্ষম ও উত্তেজিত করাই শুক্রাণুর প্রধান কাজ।

10.7 উজেনেসিস্

ডিম্বাশয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ হইতে স্ত্রী গ্যামেট বা ডিম্বাণুর (Ovum or Egg) উৎপত্তিকে উজেনেসিস বলে। ডিম্বাণু প্রধানতঃ দুইটি কার্য সম্পন্ন করে : (1) ইহার নিউক্লিয়াস মাতৃ-ক্রোমোসোম বহন করে এবং (2) ভাবী ভ্রূণের পরিস্ফুরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ইহাতে থাকে। উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য উজেনেসিস প্রক্রিয়াটি জটিল এবং ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল : (1) ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা হইতে হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াস সৃষ্টি, (2) প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার সংশ্লেষ, (3) সাইটোপ্লাজমের প্রাথমিক সংগঠন। শুক্রাণু উৎপত্তির ন্যায় উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় তিনটি দশা থাকে। দশা তিনটি : **সংখ্যাবৃদ্ধি দশা** (Phase of multiplication), **বৃদ্ধিদশা** (Phase of growth) এবং **পূর্ণতা-প্রাপ্তি দশা** (Phase of maturation)।

সংখ্যাবৃদ্ধি দশা : প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রতিটি কোষের দুইবার মাইটোটিক (Mitotic) পদ্ধতির ক্রম বিভাজনের ফলে চারিটি উগোনিয়া (Oogonia) উৎপন্ন হয়। প্রথম বিভাজনে সৃষ্ট দুইটি কোষকে প্রাইমারি উগোনিয়া (Primary Oogonia) বলে।

দ্বিতীয় বিভাজনে প্রতিটি প্রাইমারি উগোনিয়া হইতে যে দুইটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় উহাদের **সেকেণ্ডারী উগোনিয়া** (Secondary Oogonia) বলে।

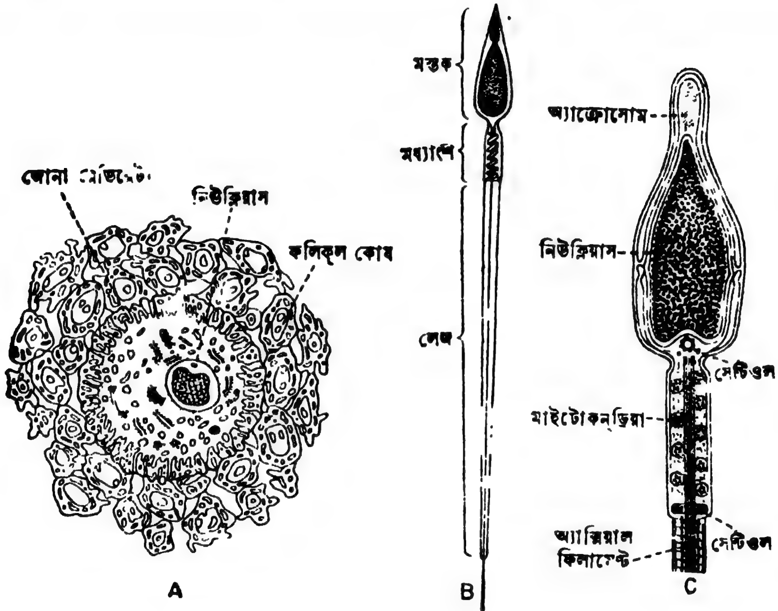
বৃদ্ধিদশা : প্রতিটি সেকেণ্ডারী উগোনিয়া পুষ্টি গ্রহণ করিয়া আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শুক্রাণুর বৃদ্ধি দশার তুলনায় উজেনেসিসের বৃদ্ধি দশা প্রলম্বিত। বৃদ্ধি দশা দীর্ঘসময় চলে এবং নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই কোষকে **প্রাইমারি উসাইট** (Primary Oocyte) বলে। ইহার নিউক্লিয়াসটি ভীষণভাবে স্ফীত হয় এবং থলির আকার ধারণ করে। ইহাকে **জার্মিনাল ভেসিকল** (Germinal vesicle) বলে। জার্মিনাল ভেসিকলটি যে তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহাকে **নিউক্লিয়ার স্যাপ** (Nuclear sap) বলে। এই সময় নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রস্তুতিপর্ব সংঘটিত হয়। সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলি লম্বা হইয়া সরু সুতার আকার ধারণ করে। প্রতিটি ক্রোমোসোমে প্রথমে একটি সূত্র থাকে এবং পরে ইহা দুইটিতে পরিণত হয়। ক্রোমোসোমে ক্রোমোমিয়ারগুলি স্পষ্টতর হয়। প্রতিটি ক্রোমোমিয়ার হইতে সূক্ষ্ম লুপের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ক্রোমোসোমগুলিকে **ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোসোম** (Lamp-brush chromosome) বলে। এই সময় সাইটোপ্লাজমে ডি. এন. এ. (DNA) নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা : বৃদ্ধি দশার পর পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশার সূরু হয়। প্রাইমারি উসাইট মিয়োসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা বিভাজিত হয়। প্রথম মিয়োটিক বিভাজনে দুইটি অসমান অপত্য কোষ তৈয়ারী হয়। উৎপন্ন কোষ দুইটির মধ্যে বড় কোষটিকে **সেকেণ্ডারী উসাইট** (Secondary Oocyte) এবং ছোটটিকে **প্রথম পোলোসাইট** (First Polocyte) বলে। প্রাইমারি উসাইটে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। কিন্তু সেকেণ্ডারী উসাইট ও প্রথম পোলোসাইটে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মিয়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজনে সেকেণ্ডারী উসাইট হইতে আবার দুইটি অসমান অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। উৎপন্ন কোষ দুইটির মধ্যে বড়টিকে **উটিড** (Ootid) এবং ছোটটিকে **দ্বিতীয় পোলোসাইট** (Second Polocyte) বলে। প্রথম পোলোসাইট বিভাজিত হইয়া দুইটি সম মাপের পোলোসাইট উৎপন্ন করে।

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় উৎপন্ন চারিটি হ্যাপ্লয়েড (n) কোষের মধ্যে কেবলমাত্র উটিড সক্রিয় ডিম্বাণুতে (Ovum) পরিণত হয়। পোলোসাইট তিনটি (পোলার বডি—Polar body নামেও পরিচিত) নিষ্ক্রিয় এবং বিনষ্ট হইয়া যায়। উটিড হইতে ডিম্বাণুর পরিণতির সময় সাইটোপ্লাজমে নানা প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল সাইটোপ্লাজমে ভাবী ভ্রূণের পুষ্টির জন্য সঞ্চিত খাদ্য বস্তু **কুসুম** (Yolk) সঞ্চয়। কুসুম **ফসফোপ্রোটিন** (Phosphoprotein) বা **ভাইটেলিন** (Vitellin) এবং **লিপিড** (Lipids) দ্বারা গঠিত।

ডিম্বাণুর গঠন (Structure of Ovum)

বিভিন্ন প্রাণীদের ডিম্বাণুর আকৃতি ও গঠন ভিন্নরূপ। কুসুমের পরিমাণ ও ডিম্বাণুর বাহিরের আবরণের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। শুক্রাণু অপেক্ষা ডিম্বাণু আয়তনে বড় এবং গমনশক্তিহীন। ডিম্বাণুর আয়তন মুখ্যত কুসুমের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। সরীসৃপ, পাখী এবং হংসচঞ্চু নামক স্তন্যপায়ীদের ডিম্বাণুতে কুসুম ছাড়া অ্যালবুমেনের (Albumen) আবরণ থাকে। ডিম্বাণুকে রক্ষা ছাড়াও ইহা পুষ্টি যোগায়। প্রতিটি ডিম্বাণু প্লাজমা মেমব্রেণ (Plasma membrane) দ্বারা পরিবৃত। প্লাজমা মেমব্রেণ দ্বারা আবদ্ধ সাইটোপ্লাজমকে **ভাইটিলাস** (Vitellus) বলে। ভাইটিলাসের মধ্যে অবস্থিত **নিউক্লিয়াস** (Nucleus)



চিত্র 10.6 মানুষের জনন কোষের চিত্ররূপ—(A) ডিম্বাণু; (B) শুক্রাণু; (C) শুক্রাণুর মস্তকাংশের বর্ধিত চিত্ররূপ।

বেশ স্পষ্ট এবং আকারে সাধারণ প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের তুলনায় 200—300 গুণ বড় (চিত্র 10.6 A)। নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বড় **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus) থাকে এবং ইহা মুখ্যত আর এন এ দ্বারা গঠিত। নিউক্লিওলাস ক্রোমাটিন দ্বারা পরিবৃত থাকে। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ সংলগ্ন সংকীর্ণ সাইটোপ্লাজমের স্তরকে **কর্টেক্স** (Cortex) বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্টেক্সে এক বিশেষ ধরনের দানা থাকে। দানাগুলিকে **কর্টিক্যাল গ্রানিউল** (Cortical granules) বলে। নিষেকের সময় দানাগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাইটোপ্লাজমে মাইটো-

কনড্রিয়া, গলজি বডি এবং কুসুম নামক সঞ্চিত খাদ্য থাকে। কুসুমের উপস্থিতির জন্য ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম ডিউটোপ্লাজম (Deutoplasm) নামে অভিহিত।

কুসুম সংশ্লেষ: উওসাইট অবস্থা হইতে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুম সংশ্লেষিত হয়। কুসুম সংশ্লেষের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি দ্রবণীয় অবস্থায় রক্তের মাধ্যমে ডিম্বাণু পরিবৃত ফলিকল্ কোষে (Follicle cells) জমা হয়। ফলিকল্ কোষসমূহ হইতে ডিম্বাণুর মাইক্রোভিলাইয়ের সাহায্যে পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় উক্ত উপাদানগুলি ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে আসে। সাইটোপ্লাজমের মাইটোকনড্রিয়া হইতে উৎপন্ন এনজাইম দ্বারা কুসুম উপাদানগুলি অদ্রবণীয় কুসুম প্লেটলেটে (Yolk platelets) পরিণত হয়। কুসুম প্লেটলেট হইতে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণ পুষ্টি গ্রহণ করে।

কয়েকটি ঝিল্লী দ্বারা ডিম্বাণু পরিবৃত থাকে। এই ঝিল্লীগুলিকে **ডিম্বাণু ঝিল্লী** বা এগ্ মেমব্রেণ (Egg membranes) বলে। বিভিন্ন প্রাণীদের ডিম্বাণু-ঝিল্লী ভিন্নরূপ। ইহাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা :

1. **প্রাইমারি মেমব্রেণ** (Primary membrane): যে সকল ঝিল্লী ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদের প্রাইমারি মেমব্রেণ বলে। প্রাইমারি মেমব্রেণ নিম্নরূপ: (a) **ভাইটেলাইন মেমব্রেণ** (Vitelline membrane): নিষেকের পূর্বে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণের সংলগ্ন এই ঝিল্লীটি প্রায় সকল ডিম্বাণুর ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। (b) **কোরিয়ন** (Chorion): স্টাইলিয়া (*Stylea*) নামক প্রাণীর ডিম্বাণুর এই শক্ত আবরণটি ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন হয়। (c) **জোনা রেডিয়েটা** (Zona radiata): হাঙ্গর, অস্থিময় মাছ, উভচর ও সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণীদের ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেণ ও প্লাজমা মেমব্রেণের মধ্যবর্তী স্থানে এই সরেখ আবরণটি থাকে। পাখীদের ক্ষেত্রে এই স্তরটি অস্পষ্ট। (d) **জোনা পেলুসিডা** (Zona pellucida): স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে জোনা রেডিয়েটা স্তরটি স্বচ্ছ ও অরেখ এবং ইহাকে জোনা পেলুসিডা বলে। ইহার প্রকৃত উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্নমত আছে। অনেক প্রাণিবিদ্ ইহাকে সেকেণ্ডারী মেমব্রেণের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্তন্যপায়ীদের ডিম্বাণুর বাহিরে (অর্থাৎ জোনা পেলুসিডার বাহিরে) এক প্রকার বিশেষ ফলিকল্ কোষ (Follicle cells) ঘনভাবে বিন্যস্ত থাকে।

প্রাইমারি মেমব্রেণ পরিস্ফুরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। নিষেকের পর ভাইটেলাইন মেমব্রেণ ডিম্বাণুর মধ্যে অতিরিক্ত শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ রোধ করে এবং অনিষিক্ত অবস্থার অরীয় প্রতিসম অবস্থা হইতে ভ্রূণকে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম হইতে সহায়তা করে।

2. **সেকেণ্ডারী মেমব্রেণ** (Secondary membrane): ডিম্বাশয়ের কোষসমূহ হইতে সৃষ্ট এই ঝিল্লীময় আবরণ অনেক প্রাণীর ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেণকে আবৃত রাখে। সরীসৃপ ও পাখীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের আবরণ থাকে

না। বিভিন্ন ডিম্বাণুর কাইটিনময় খোলক, ব্যাঙের ডিম্বকের বাহিরের আবরণ ও স্তন্যপায়ীদের গ্রাফিয়ান ফলিকল কোষসমূহ এই ধরনের স্তর গঠন করে।

সেকেণ্ডারী মেমব্রেণের কাজ মুখ্যত ডিম্বাণুকে রক্ষা করা। সংলগ্ন অঞ্চল হইতে ডিম্বাণুর জন্য পুষ্টির উপাদান সংগ্রহে ইহারা সাহায্য করে।

3. **টারসিয়ারী মেমব্রেণ** (Tertiary membrane) : ডিম্বনালী এবং ডিম্বনালী সংলগ্ন গ্রন্থিসমূহ হইতে এই ধরনের আবরণ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয় হইতে ডিম্বাণু বাহির হইবার পর এই আবরণী সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে টারসিয়ারী মেমব্রেণে বৈচিত্র্য দেখা যায়। অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীদের এই আবরণী থাকে না। সরীসৃপ ও পাখীদের অ্যালবুমিন (Albumen), সেল মেমব্রেণ (Shell membrane) এবং ক্যালকেরিয়াস সেল (Calcareous shell) ডিম্বনালীর অন্তর্গাত্রে অবস্থিত বিশেষ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়।

জৈব খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা টারসিয়ারী মেমব্রেণের কাজ।

ডিম্বাণুর প্রকারভেদ (Types of Egg)

বিভিন্ন প্রজাতির ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ ভিন্নরূপ। ডিম্বাণুর আয়তন মুখ্যত কুসুমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ডিম্বাণুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :

I. **আলেসিথাল** (Alecithal) : অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীদের ডিমে কুসুম থাকে না। কুসুমবিহীন ডিমকে আলেসিথাল ডিম বলে।

II. **মাইক্রোলেসিথাল** (Microlecithal) : যখন ডিমে কুসুমের পরিমাণ খুব কম। একনালী প্রাণীদের ডিম আদর্শ মাইক্রোলেসিথাল ধরনের। অ্যাম্ফিঅক্সাসের মাইক্রোলেসিথাল ডিমের সাইটোপ্লাজমে কুসুম সমসত্ত্বভাবে বিস্তৃত থাকে। সেইজন্য এই ধরনের ডিমকে **হোমোলেসিথাল** (Homolecithal) বা **আইসোলেসিথাল** (Isolecithal) বলে।

III. **মেসোলেসিথাল** (Mesolecithal) : উভচর প্রাণীদের ডিমের সাইটোপ্লাজমে পরিমিত কুসুম থাকায় ইহাদের মেসোলেসিথাল বলে।

IV. **মেগালেসিথাল** (Megalecithal) : সরীসৃপ, পাখী ও হংসচঞ্চু প্রভৃতি প্রাণীদের ডিমে প্রচুর পরিমাণ কুসুম থাকে। এই ধরনের মেগালেসিথাল ডিমে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একধারে থাকে এবং কুসুম একধারে সঞ্চিত থাকে। ডিমের একধারে কুসুমের অবস্থানের জন্য এই ধরনের ডিমকে **টিলোলেসিথাল** (Telolecithal) বলে।

স্পার্মাটোজেনেসিস্ ও উজেনেসিস্— তুলনামূলক আলোচনা

স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিস-এর সংখ্যাবৃদ্ধি দশাটি (Phase of multiplication) মূলত একই প্রকার হইলেও পরবর্তী ঘটনাবলী ভিন্নরূপ। ইহাদের পার্থক্য পরবর্তী পৃষ্ঠার সরণিতে প্রদত্ত হইল :

স্পার্মাটোজেনেসিস্	উজেনেসিস্
1. বৃদ্ধি দশায় প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে সংশ্লেষ ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম।	1. বৃদ্ধি দশায় প্রাইমারি উওসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে সংশ্লেষ ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্পার্মাটোসাইট অপেক্ষা বহুলাংশে বেশী।
2. পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট হইতে চারিটি সম আয়তনযুক্ত স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়। স্পার্মাটিড হইতে শুক্রাণুর সৃষ্টি হয়।	2. পূর্ণতা প্রাপ্তি দশায় প্রতিটি প্রাইমারি উওসাইট হইতে একটি কার্যকরী বৃহৎ উওটিড এবং তিনটি নিষ্ক্রিয় ক্ষুদ্রাকার পোলোসাইট উৎপন্ন হয়। কেবলমাত্র উওটিড হইতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।
3. পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় (i) নিউক্লিয়াস ক্ষুদ্রাকার থাকে। স্পার্মাটিলিওসিসের সময় নিউক্লিয়াসটি ঘনতর ও প্রলম্বিত হয়। (ii) নিউক্লিয়ার ফ্লুইডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। (iii) সাইটোপ্লাজমের বিভেদের পূর্বেই নিউক্লিয়াস পূর্ণ গঠিত হয়।	3. পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় (i) নিউক্লিয়াসের আকার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। (ii) নিউক্লিয়ার ফ্লুইডের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। (iii) সাইটোপ্লাজমের বিভেদ এবং নিউক্লিয়াসের পরিপূর্ণতা একই সঙ্গে সংঘটিত হয়।
4. কোষের অনুদৈর্ঘ্য বা অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষের দুই মেরুতে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম প্রতিস্থাপিত হয়। নিউক্লিয়াস অগ্রাংশে অবস্থিত থাকে।	4. সাধারণতঃ নিউক্লিয়াস কোষের অ্যানিম্যাল পোলের দিকে এবং সাইটোপ্লাজম ভেজিট্যাল পোলের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়।
5. সাইটোপ্লাজমে অতিরিক্ত কোন খাদ্য সঞ্চিত থাকে না।	5. সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে।
6. সাইটোপ্লাজমের বেশীর ভাগ পরিত্যক্ত হয় এবং গলজি বস্তুর কিছু অংশ, মাইটোকন্ড্রিয়া ও সেন্ট্রিওল বর্তমান থাকে।	6. সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
7. নিষেকে সহায়ক অ্যান্ড্রোগ্যামিক বস্তু নিঃসৃত হয়।	7. নিষেকে সাহায্যকারী গাইনোগ্যামিক বস্তু নিঃসৃত হয়।
8. নিষেকের পূর্বেই সক্রিয় বিপাকীয় ক্রিয়া সংঘটিত হয়।	8. নিষেকের পূর্বে বিপাকীয় কার্যের হার স্তিমিত হয়।

10.8 নিষেক

নিষেক ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের দ্বিতীয় দশা। নিষেকের সময় হইতেই ভ্রূণের পরিস্ফুরণ সূচিত হয়। নিষেকের সময় শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে। গ্যামেট-দ্বয়ের মিলন অসংখ্য ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনার সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। ডিম্বাণুর সক্রিয় হওয়া ও অপত্য জীবে পিতামাতার বংশগতিজনিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ নিষেকের ফলশ্রুতি।

নিষেকের প্রাথমিক একক : ডিম্বাণু ও শুক্রাণু হইল নিষেকের দুইটি প্রয়োজনীয় একক। নিষেক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন : (1) পরিণত ডিম্বাণু ও শুক্রাণু এবং (2) মিলনক্রিয়ার প্রারম্ভে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর পরস্পর সম্মুখীন হওয়া। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে গ্যামেটোজেনেসিসের দ্বারা পরিণত গ্যামেট উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের সংযোগ সাধনের জন্য প্রয়োজন যৌন প্রজনন ক্রিয়া।

নিষেকের প্রকারভেদ : নিষেককালে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সম্মুখীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রাণিজগতে দুই প্রকার নিষেক প্রদর্শিত হয়, যথা—

(A) **বাহ্য নিষেক** (External Fertilization) : অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে (যথা : মাছ, উভচর এবং অধিকাংশ জলবাসী অমেরুদণ্ডী প্রাণী) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন (অর্থাৎ নিষেক) পুরুষ ও স্ত্রী দেহের বাহিরে জলে সংঘটিত হয়। এই ধরনের নিষেককে বাহ্য নিষেক বলে।

(B) **অভ্যন্তরীণ নিষেক** (Internal Fertilization) : সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু স্ত্রীদেহের ডিম্বনালীর গহ্বরে অবস্থান করে এবং যৌন মিলনের সময় যৌন অঙ্গের মাধ্যমে পুরুষ দেহ হইতে শুক্রাণু স্ত্রী দেহের নির্দিষ্ট অংশে নিক্ষেপিত হয়। দেহমধ্যে সংঘটিত নিষেককে **অভ্যন্তরীণ নিষেক** বলে।

নিষেকের ঘটনাপ্রবাহ (Events in Fertilization)

নিষেক একটি জটিল প্রক্রিয়া। নিষেককালীন বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনাসমূহকে কয়েকটি প্রধান পর্যায়ে বর্ণনা করা যায়। ইহারা নিম্নরূপ :

I. **শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসা** (Approximation of Sperm and Ovum),

II. **গ্যামেটদ্বয়ের সংযোগস্থাপন ও অ্যাগ্লুটিনেশন** (Contact of Gametes and Agglutination),

III. **অনুপ্রবেশ** (Penetration),

IV. **সক্রিয়তা অর্জন** (Activation),

V. **প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের সঞ্চালন** (Movement of Pronuclei) এবং **অ্যাম্ফিমিক্সিস** (Amphimixis)

I. **শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসা** : নিষেককালে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর পরস্পর সম্মুখীন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নানান পদ্ধতিতে গ্যামেটদ্বয় পরস্পরের কাছাকাছি আসে। বাহ্য নিষেকের ক্ষেত্রে জল মাধ্যমে গ্যামেটদ্বয়ের মিলন ঘটে এবং ইহাদের আকর্ষণের জন্য রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি স্বীকৃত। নিষেককালে প্রচুর সংখ্যায় শুক্রাণু পরিণত ডিম্বাণুর নিকটবর্তী হয়। যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়াও কিমোট্যাকসিসের (Chemotaxis) গুরুত্ব উক্ত ঘটনায় তাৎপর্যপূর্ণ।

II. **গ্যামেটদ্বয়ের সংযোগস্থাপন ও অ্যাগ্লুটিনেশন** : ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সংযোগস্থাপন নিষেকের প্রাথমিক ঘটনা। পরিণত ডিম্বাণুর আবরণী হইতে ক্ষরিত নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ একই প্রজাতির শুক্রাণুকে ডিম্বাণুগাত্রে আটকাইয়া রাখে। নিষেকের সময় অনেকগুলি শুক্রাণু ডিম্বাণুগাত্রে যুক্ত হয়। শুক্রাণুসমূহের এই ধরনের সমবেত হইবার প্রক্রিয়াকে অ্যাগ্লুটিনেশন (Agglutination) বলে।

ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর আকর্ষণ, সংযোগ ও মিলনের ঘটনাটি খুবই জটিল। ভৌত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই উক্ত ঘটনা সম্পাদিত হয়। লিউয়েনহক (Leeuwenhock) সর্বপ্রথম শুক্রাণুর গঠন বর্ণনা করেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটিলে পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ নিষেকের পর পরিস্ফুরণ ঘটে।

নিষেকের সময় ডিম্বাণু অভিমুখে শুক্রাণু আকর্ষণের জন্য একাধিক রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি প্রমাণিত। 1919 খ্রীষ্টাব্দে এফ. আর. লিলি. (F. R. Lillie) সর্বপ্রথম শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন কালে ভৌত ঘটনার সহিত রাসায়নিক ঘটনার উপস্থিতি প্রমাণ করেন। সী আর্চিনের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ মুখ্যত দুই প্রকার জটিল রাসায়নিক বস্তুর সহক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়। রাসায়নিক বস্তু দুইটি : **ফার্টিলাইজিন** (Fertilizin) এবং **অ্যান্টিফার্টিলাইজিন** (Antifertilizin)।

ফার্টিলাইজিন : পরীক্ষাগারে সী-আর্চিনের কয়েকটি ডিম্বাণু সমুদ্রের জলে কিছু সময় রাখার পর ডিম্বাণুগুলি অপসারিত করিয়া উক্ত দ্রবণে শুক্রাণু উপস্থাপন করিলে শুক্রাণুসমূহের মধ্যে অ্যাগ্লুটিনেশন (Agglutination) দৃষ্ট হয়। শুক্রাণুসমূহের এইরূপ সমবেত হইবার ক্ষমতা অর্জন ডিম্বাণুসমূহের জেলী আবরণী হইতে ক্ষরিত এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা সাধিত হয়। রাসায়নিক পদার্থটির নাম ফার্টিলাইজিন। জেলী আবরণী হইতে সৃষ্ট ফার্টিলাইজিন সমুদ্রের জলে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়। ফার্টিলাইজিন এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন (Glycoprotein) এবং ইহার আণবিক ওজন 82,000-অপেক্ষা বেশী। ইহাতে কয়েক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড ও পলিস্যাকারাইড সংযুক্ত থাকে।

অ্যান্টিফার্টিলাইজিন : সমসংস্থ শুক্রাণুসমূহের অ্যাগ্লুটিনেশন ফার্টিলাইজিন এবং অ্যান্টিফার্টিলাইজিন নামক রাসায়নিক বস্তুদ্বয়ের বিক্রিয়ার ফলে ঘটে। শুক্রাণু

হইতে নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তুকে অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বলে এবং ইহা একপ্রকার আম্লিক প্রোটিন (Acidic protein)।

নিষেকে ফার্টিলাইজিন—অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া (Fertilizin—Antifertilizin reaction during fertilization): অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার ন্যায় ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া প্রজাতি-নির্দিষ্ট (Species specific), অর্থাৎ ডিম্বাণুর বহিরাবরণ হইতে সৃষ্ট ফার্টিলাইজিন উক্ত প্রজাতির শুক্রাণুসমূহকে ডিম্বাণুর গাত্রে সংলগ্ন রাখিতে সাহায্য করে। দ্রব অবস্থায় ফার্টিলাইজিন হইল মাল্টিভ্যালেন্ট (Multivalent) এবং ইহার অণুগুলি একাধিক শুক্রাণুকে আটকাইতে সমর্থ হয়। ফার্টিলাইজিনের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া ইউনিভ্যালেন্ট (Univalent) হইলে ফার্টিলাইজিন শুক্রাণুগুলির অ্যাগ্লুটিনেশনে অক্ষম হয়। ফলে নিষেক সংঘটিত হয় না। সুতরাং নিষেকের সময় বিপরীতধর্মী গ্যামেটের সংযোগ স্থাপনে শুক্রাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ হইতে উৎপন্ন অ্যান্টিফার্টিলাইজিন এই ডিম্বাণুর আবরণী হইতে সৃষ্ট ফার্টিলাইজিনের বিক্রিয়া প্রয়োজন।

III. **অনুপ্রবেশ**. যখন শুক্রাণু পরিণত ডিম্বাণু স্পর্শ করে তখন শুক্রাণু-সমূহের গমনক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ মুখ্যত অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়। স্তন্যপায়ীদের শুক্রাণু হইতে নিঃসৃত হায়ালুরোনিডেজ (Hyaluronidase) নামক লাইটিক এজেন্ট (Lytic agent) ডিম্বাণু আবরণী ভেদ করিয়া শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে সক্রিয় সাহায্য করে। উক্ত লাইটিক এজেন্টকে স্পার্মলাইসিন (Spermlysin) বলে।

অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়া এবং অনুপ্রবেশ (Acrosome Reaction and Penetration)

ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে নানা মতবাদ বর্তমান। 1959 খ্রীষ্টাব্দে টাইলার (Tyler) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে নিষেককালে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ দ্বারা শুক্রাণুর মস্তকাংশ অধিগৃহীত হয়। নির্দিষ্ট পিনোসাইটোসিস (Specific pinocytosis) দ্বারা উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে 1961 খ্রীষ্টাব্দে এ এল. কলউইন (A. L. Colwin) এবং এল. এইচ. কলউইন (L. H. Colwin) ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। নিম্নে স্যাক্কোগ্লসাস (*Saccoglossus*) নামক অমেরুদণ্ডী কর্ডেট এবং হাইড্রয়ডিস (*Hydroides*) নামক অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের নিষেককালীন অনুপ্রবেশের ঘটনা প্রদত্ত হইল :

(i) শুক্রাণুর মস্তকাংশ ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেণের সংস্পর্শে আসে।

(ii) শুক্রাণুর মস্তকের প্লাজমা মেমব্রেণ এবং অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের মেমব্রেণ পরস্পর সংযুক্ত হইলে ইহাদের মধ্যাংশ ভাঙ্গিয়া যায়।

(iii) ফলে অ্যাক্রোসোম গ্র্যানিউল ভাইটেলাইন মেমব্রেণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং স্পার্মলাইসিন (Spermlysin) নামক এক প্রকার উৎসেচক উৎপন্ন করে।

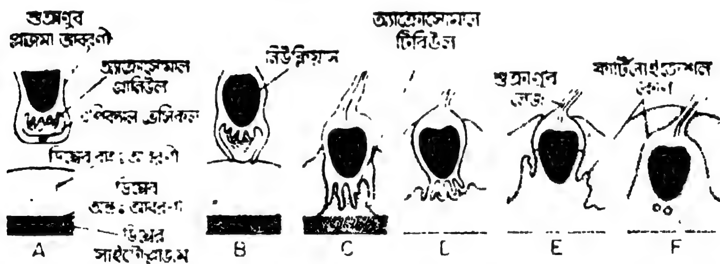
(iv) স্পার্মলাইসিন নামক উৎসেচক ডিম্বাণুর আবরণীকে দ্রবীভূত করে এবং দ্রবীভূত অংশের মধ্য দিয়া শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে সহায়তা করে।

(v) অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের প্লাজমা মেমব্রেণ হইতে একটি (স্যাক্কোগ্লসাসের ক্ষেত্রে) বা অনেকগুলি (হাইড্রয়ডিসের ক্ষেত্রে) উপবৃদ্ধি আকারে বর্ধিত হইয়া লম্বা **অ্যাক্রোসোমাল টিউবিউল** (Acrosomal tubule) সৃষ্টি করে। সৃষ্ট টিউবিউল ভাইটেলাইন মেমব্রেণ ভেদ করিয়া ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ সংলগ্ন হয়।

(vi) ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ হইতে অনুরূপভাবে একটি অথবা অনেকগুলি অঙ্গুলিসদৃশ ভিলাই উৎপন্ন হয়।

(vii) ক্রমে অ্যাক্রোসোমাল টিউবিউল ও ভিলাই পরস্পর যুক্ত হইয়া ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে।

(viii) ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম প্রসারিত হইয়া প্রথমে শুক্রাণুর মস্তক এবং পরে মধ্যমাংশ ও লেজকে পরিবৃত করে। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের উত্থিত অংশকে **ফার্টিলাইজেশন কোন** (Fertilization cone) বলে।



চিত্র 10.7 নিষেককালীন ঘটনা প্রবাহ – শুক্রাণুর ডিম্বাণুর নিকট আসা (A), ডিম্বাণু আবরণীর সংস্পর্শে আসা শুক্রাণুর শীর্ষে পরিবর্তন (B), প্রক্ষিপ্ত অ্যাক্রোসোমাল প্রাচীর ( ) জনন কোষদ্বয়ের প্লাজমা-মেমব্রেণের সংযুক্তি (D), ফার্টিলাইজেশন কোনের উৎপত্তি (E), শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ (F)।

(iv) পরিশেষে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ ও শুক্রাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ একীভূত হইয়া জাইগোটের মেমব্রেণ সৃষ্টি করে (চিত্র 10.7)।

স্যাক্কোগ্লসাস ও হাইড্রয়ডিসের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে। কয়েকটি প্রাণীর অ্যাক্রোসোম হইতে **অ্যাক্রোসোমাল ফিলামেন্ট** (Acrosomal filament) সৃষ্টি হয় এবং ইহা ডিম্বাণুর আবরণী ভেদ করিয়া শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ পথ সৃষ্টি করে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নিষেকের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় নিষেক সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্বে মনে করা হইত যে নিষেককালে কেবলমাত্র শুক্রাণু-নিউক্লিয়াস

ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ইহা স্পষ্ট যে নিষেকের সময় দুইটি জনন কোষের সম্পূর্ণ সংযুক্তি ও মিলন ঘটে।

অনুপ্রবেশ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া: ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ মুখ্যত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। লিলির (Lillie) ফার্টিলাইজিন অ্যান্টিফার্টিলাইজিন মতবাদ উপস্থাপনার পর হইতে বিভিন্ন ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ অনুপ্রবেশে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্বন্ধে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সচেষ্ট হন। টাইলার (Tyler) এই মত পোষণ করেন যে শুক্রাণু হইতে ক্ষরিত হায়ালুরোনিডেজ নামক স্পার্মলাইসিন ডিম্বাণুর আবরণীর স্থানিক দ্রবীভবন করে, ফলে ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি হয়। কিন্তু রথস্‌চাইল্ড (Rothschild) এবং রুনষ্ট্রম (Runnstrom), হার্টম্যান (Hartmann) প্রভৃতি বিজ্ঞানী নিষেকে অংশগ্রহণকারী সকল রাসায়নিক পদার্থকে সামগ্রিকভাবে গ্যামোনস্ (Gamones) আখ্যা দেন। শুক্রাণু হইতে সৃষ্ট গ্যামোনকে অ্যান্ড্রোগ্যামোনস্ (Androgamones) এবং ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন গ্যামোনকে গাইনোগ্যামোনস্ (Gynogamones) বলে। উক্ত দুইপ্রকার গ্যামোনের ভারসাম্যের উপর স্বাভাবিক নিষেক নির্ভর করে। গ্যামেটসমূহের আবরণীতে সঞ্চিত আর. এন. এ.-এর ঘনত্ব হইতে প্রমাণিত হয় যে আর. এন. এ. যৌগ হইতে গ্যামোনস্ উৎপন্ন হয়।

শুক্রাণুর আবরণী হইতে অ্যান্টিফার্টিলাইজিন নিঃসৃত হয় এবং সেই সময় ডিম্বাণুর আবরণী হইতে ফার্টিলাইজিন ক্ষরিত হয়। ফার্টিলাইজিন শুক্রাণুসমূহকে সক্রিয় করে এবং পজিটিভ কিমোট্যাক্সিস (Positive chemotaxis) দ্বারা ইহাদের আকর্ষণ করে। ফলে ডিম্বাণু গাত্রে শুক্রাণুগুলি আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ডিম্বাণু গাত্রে আবদ্ধ শুক্রাণুসমূহের মধ্য হইতে একটি ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ডিম্বাণু আবরণী ভেদ করিতে হায়ালুরোনিডেজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই সময় শুক্রাণুর বিপাকীয় সাম্য রক্ষায় গ্লুটাথিয়োনের (Glutathione) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

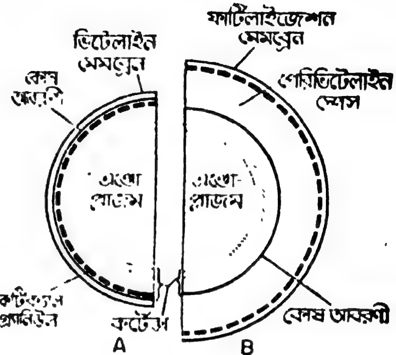
IV. **সক্রিয়তা অর্জন** নিষেকের পূর্বে ডিম্বাণুর বিপাকীয় ক্রিয়াদি ন্যূনতম অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিষেকের সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর ক্রিয়া বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সুপ্ত ডিম্বাণু হঠাৎ সক্রিয় হইয়া পড়ে। ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের পর ডিম্বাণুর সংগঠনিক পরিবর্তন বহুমুখী। কর্টিক্যাল রিঅ্যাক্সন ও ফার্টিলাই-জেশন মেমব্রেণ সৃষ্টি পরিবর্তনসমূহের মধ্যে উল্লেখ্য।

কর্টিক্যাল রিঅ্যাক্সন এবং ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ সৃষ্টি (Cortical reaction and formation of fertilization membrane)

নিষেকের সময় কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং উভয়ে একীভূত হইয়া জাইগোট (Zygote) গঠন করে। যদিও নিষেককালে অনেকগুলি

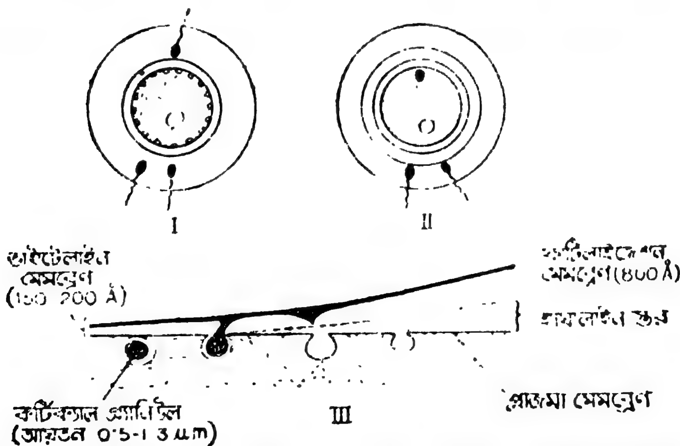
শুক্রাণু ডিম্বাণু সংলগ্ন হয়। অবশিষ্ট ও বিলম্বে উপনীত শুক্রাণুগুলি ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ডিম্বাণুর একটি বিশেষ আবরণ—**ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ** সৃষ্টির ফলেই ডিম্বাণুর মধ্যে একাধিক শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ প্রতিহত হয়।

ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ নিষেকের পর ডিম্বাণুর **সক্রিয়তার** (Activation of Ovum) প্রথম **সূচক** হইল **কর্টিক্যাল রিঅ্যাক্সন** (Cortical reaction) এবং **ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণের** (Fertilization membrane) উৎপত্তি (চিত্র 10.8)। অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটিলেও কণ্টকত্বক্ প্রাণীদের ক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া সী-আর্চিনের নিষেককালে) কর্টিক্যাল রিঅ্যাক্সন ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ সৃষ্টি সুস্পষ্ট।



চিত্র 10.8 কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলের ক্রিয়া নিষেকের পূর্বে (A), নিষেকের পরে (B)।

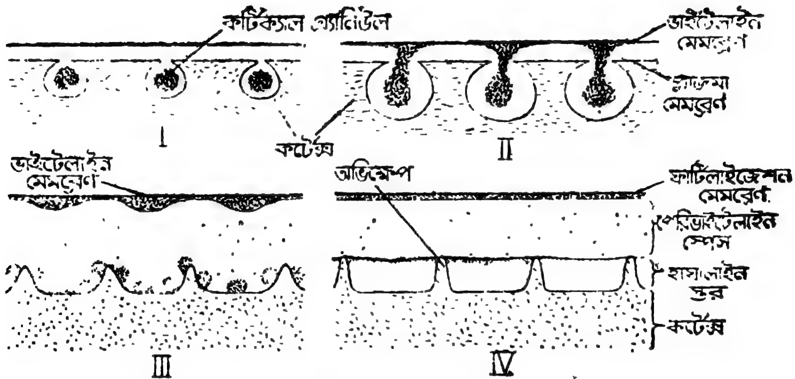
সী-আর্চিনের ডিম্বাণুর (অনিষিক্ত অবস্থায়) আবরণীটি যৌগ ধরনের এবং প্রায় 150—200Å পুরু। ইহা দুইটি ঝিল্লী দ্বারা গঠিত। বাহিরের ঝিল্লীটিকে **ভাইটেলাইন মেমব্রেণ** (Vitelline membrane) এবং ভিতরেরটিকে **কোষ আবরণী** (Plasma membrane) বলে। প্লাজমা মেমব্রেণের তলদেশে



চিত্র 10.9 সী-আর্চিনের নিষেক—কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলের বিস্ফোরণ এবং ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণের স্থান পরিবর্তন দেখান হইয়াছে।

0·5—1·3 μm আয়তনবিশিষ্ট অসংখ্য **কর্টিক্যাল গ্র্যানিউল** (Cortical granule) **সঞ্চিত** হয়। কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলগুলি প্লাজমা মেমব্রেণ নির্মিত থলির

মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আপাতদৃষ্টিতে কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলগুলি প্লাজমা মেমব্রেণের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হইলেও ইহারা প্রকৃতপক্ষে প্লাজমা মেমব্রেণের বাহিরে অবস্থিত (চিত্র 10.9)। ডিম্বাণুর ভাইটিলাসের সহিত শুক্রাণুর সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলসমূহের পরিবর্তন সূচিত হয়। কর্টিক্যাল গ্র্যানিউল স্ফীত হইয়া প্লাজমা মেমব্রেণ থলির মধ্যে বিস্ফোরিত হয় (চিত্র 10.10)। সকল কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলের মধ্যে এই ধরনের বিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ইহারা মিউকোপ্রোটিন (Mucoprotein) দ্বারা গঠিত এবং উপাদানগুলি ভাইটেলাইন মেমব্রেণের সহিত সংযোজিত হইয়া ঝিল্লীটিকে পুরু করে। সৃষ্ট ঝিল্লীটিকে **ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ** বলে এবং ইহার নিম্নে বিশেষ ধরনের তরল পদার্থের সঞ্চয়ের ফলে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ হইতে উহা ক্রমে পৃথক হইয়া যায়। প্লাজমা মেমব্রেণ হইতে সূক্ষ্ম অভিক্ষেপের উপস্থিতির

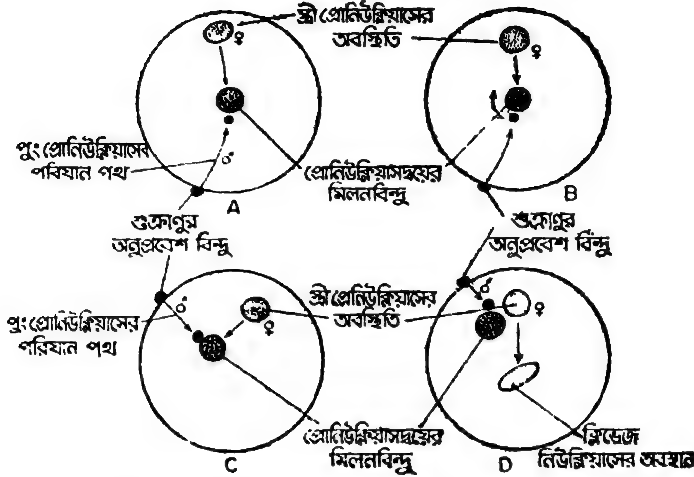


চিত্র 10.10 কর্টিক্যাল ক্রিয়া ও ফার্টিলাইজেসন মেমব্রেণের উৎপত্তিকাল। না প্রবাহ।

জন্য ইহার প্রাথমিক মসৃণতার অবলুপ্তি ঘটে এবং ইহা একটি সমসত্ব স্তরের (হায়ালাইন স্তর = Hyaline layer) দ্বারা পরিবৃত হয়। এই সময় ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণটি পূর্ণগঠিত হইয়া প্রায় 800 Å পুরু হয়। ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ ও হায়ালাইন স্তরের মধ্যবর্তী স্থানটিকে **পেরিভাইটেলাইন স্পেস** (Perivitelline space) বলে।

ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণের তাৎপর্য সম্বন্ধে নানান অভিমত থাকিলেও ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য একাধিক শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে বাধা (Barrier) সৃষ্টি করা। নিষিক্ত ডিম্বাণুর বহিঃস্থ শুক্রাণুগুলি অভেদ্য ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ অতিক্রম করিতে অক্ষম। বহু শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে বাধাদানকে **ব্লক টু পলিস্পার্মি** (Block to Polyspermy) বলে। অনেকে মনে করেন ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ ডিম্বাণুকে রক্ষা করে। ইহার অনুকূলে প্রমাণাদির অভাবে বিষয়টি বিতর্কিত। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে বহু শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে জোনা পেলুসিডাও (Zona pellucida) বাধাদান করে।

V. প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের সঞ্চালন ও অ্যাম্ফিমিক্সিস : ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জনের পরবর্তী ঘটনা হইল ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে সাইটোপ্লাজমের সেতু স্থাপনের পর সেই সেতু-পথে শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (চিত্র 10.11)। প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের



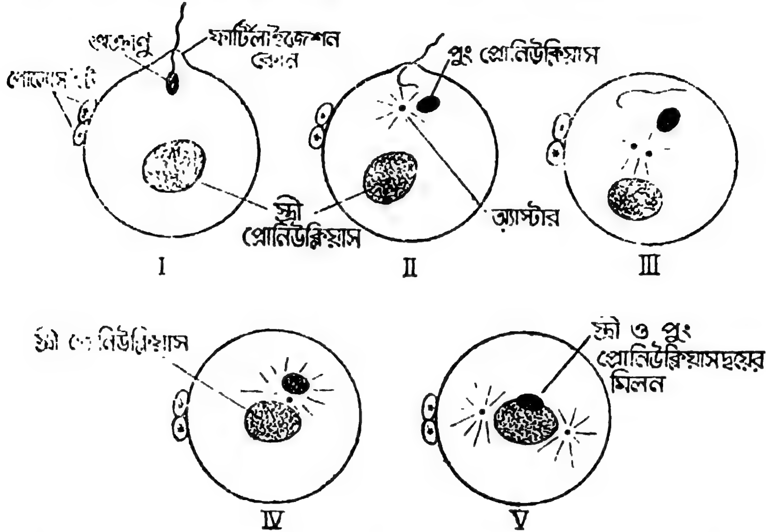
চিত্র 10.11 নিষেকের সময় স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের পরিযান পথ।

মিলন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হয় এবং কয়েক ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমগুলি সরাসরি বেমতন্তু বরাবর সজ্জিত হয়। নিম্নে কোলা ব্যাঙের নিষেককালে প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের সঞ্চালন ও মিলন পদ্ধতি প্রদত্ত হইল—

শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যমাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করিবার পর ডিম্বাণুর মিয়োসিস বিভাজন সম্পূর্ণ হয় এবং সেমিট্রওলাট বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রবেশের পর শুক্রাণুর অংশ 180 আবর্তিত হয়। ফলে শুক্রাণুর মধ্যমাংশ অগ্রে এবং পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি (Male pronucleus) পশ্চাতে অবস্থান করে। এই সময় ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি অনিয়তভাবে সঞ্চালিত হয়। পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের পরিযানের পথটিকে **পেনিট্রেশন পথ** (Penetration path) বলে। স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসটি (Female pronucleus) ডিম্বাণুর পরিধির দিকে চলিয়া যায় এবং পরে **মিলন বিন্দুতে** (Point of Union) ফিরিয়া আসে। ইহার পর পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি নিয়ন্ত্রিতভাবে সঞ্চালিত হইয়া স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের সন্নিকটে আসে এবং উভয়ে মিলিত হয়। সঞ্চালনের এই পথটিকে **কপুলেশন পথ** (Copulation path) বলে।

ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের পর পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে। ইহা প্রথমে স্ফীত হয় এবং ক্রোমাটিন বস্তু জালকের আকার ধারণ করে। ইহার

প্রক্সিমাল সেণ্ট্রিওলকে ঘিরিয়া অ্যাস্টার (Aster) সৃষ্টি হয় (চিত্র 10.12)। পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের মিলন-বিন্দু অভিমুখে গমন ক্রিয়া অ্যাস্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনের পর নিউক্লিয়ার মেমব্রেণ বিলুপ্ত হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি সাইটোপ্লাজমে বিস্তৃত হইয়া যায়। মাইটোসিস কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার মেটাফেজ



চিত্র 10.12 আর্বেসিয়ার (*Arbacia*) নিষেক—ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যাংশের অনুপ্রবেশ (I), ইহার 180° আবর্তন (II), মধ্যাংশের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও অ্যাস্টারের উৎপত্তি (III), পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের দিকে আসা ও নিষেক (IV-V)।

দশার ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের ক্রোমোসোমগুলি নিরক্ষীয় তলে সজ্জিত থাকে। নিষেক পরিসমাপ্ত হইলে জাইগোটটি পরবর্তী দশার যা প্রস্তুত হয়।

নিষেকের তাৎপর্য (Significance of Fertilization)

নিষেকের ফলে প্রতিটি প্রজাতির নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম সংখ্যার পুনরুদ্ধার ঘটে (Restoration of normal chromosome number)। পুরুষ ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরিয়া আসে এবং আত্মোৎপাদনের মাধ্যমে প্রাণীদের নিজ নিজ প্রজাতির বংশবৃদ্ধি সম্ভব হয়।

প্রতি প্রজাতির প্রাণীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য উদ্দীপনার প্রয়োজন। দুইটি গ্যামেটের মিলনের ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তাহা প্রাণীদের পুনরুজ্জীবিত (Rejuvenate) করে।

গ্যামেট উৎপাদনের সময় নানা ধরনের জীনগত প্রকরণের (Genetic variation) সৃষ্টি হয়। নিষেকের সময় দুইটি গ্যামেটের মিলনের ফলে জীনগত প্রকরণের হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

10.10 ক্লিভেজ

ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে (অর্থাৎ নিষেকের ফলে) উদ্ভূত এককককে জাইগোট (Zygote) বলে। নিষেকের পরই জাইগোট মাইটোসিস পদ্ধতিতে দ্রুত বিভাজিত হয়। সৃষ্ট কোষসমূহ হইতে ক্রমে ভ্রূণ (Embryo) গঠিত হয়। সুতরাং যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট বিভাজিত হইয়া অসংখ্য অপত্য কোষ উৎপন্ন করে তাহাকে *ক্লিভেজ বলে। ক্লিভেজের দ্বারা সৃষ্ট কোষসমূহ ব্লাস্টোমিয়ার (Blastomere) নামে অভিহিত। প্রাথমিক অবস্থায় ব্লাস্টোমিয়ারগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে এবং ক্রমে ব্লাস্টোমিয়ারগুলি সজ্জিত হইয়া একটি ফাঁপা বলের আকার ধারণ করে। এই দশার নাম ব্লাস্টুলা (Blastula)। ব্লাস্টুলার এক কোষস্তর বিশিষ্ট আবরণীকে ব্লাস্টোডার্ম (Blastoderm) এবং ইহার কেন্দ্রীয় গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) বলে। ব্লাস্টুলায় রূপান্তরিত হইবার পর ক্লিভেজের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পারিস্ফুরণে ক্লিভেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অবস্থায় ভাবী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কোষ উৎপন্ন হয় এবং উহারা পরবর্তী দশার (গ্যাস্ট্রুলেশন) পটভূমি প্রস্তুত করে।

বিভিন্ন প্রাণীদের ক্লিভেজ পদ্ধতি ভিন্ন। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুমের পরিমাণ ও বিস্তৃতির উপর ক্লিভেজ পদ্ধতি নির্ভরশীল। ক্লিভেজে কুসুম প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন প্রাণীদের ক্লিভেজ বর্ণনা করিবার প্রারম্ভে ক্লিভেজ তল ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে ধারণা প্রয়োজন।

ক্লিভেজ—প্রকারভেদ (Types of Cleavage): ক্লিভেজের সময় জাইগোট ও জাইগোট হইতে সৃষ্ট ব্লাস্টোমিয়াসমূহের সজ্জারীতির পরিবর্তন হয়। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণের তারতম্যের উপর ক্লিভেজের প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। ক্লিভেজ পদ্ধতি নিম্নরূপ :

হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ (Holoblastic cleavage): ক্লিভেজের সময় জাইগোট বা ব্লাস্টোমিয়ার সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত বা বিভাজিত হইলে পদ্ধতিটিকে হলোব্লাস্টিক বা সম্পূর্ণ (Total) ক্লিভেজ বলে। হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দুই প্রকার, যথা—(a) সম (Equal) ও (b) অসম (Unequal)। সম হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজের দ্বারা উদ্ভূত ব্লাস্টোমিয়ারগুলি আয়তনে সমান হয়। অসম হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজে সৃষ্ট ব্লাস্টোমিয়ারগুলি আয়তনে অসমান। ক্ষুদ্রাকার ব্লাস্টোমিয়ারকে মাইক্রোমিয়ার (Micromere) এবং অপেক্ষাকৃত বড় ও কুসুম সমৃদ্ধ ব্লাস্টোমিয়ারকে ম্যাক্রোমিয়ার (Macromere) বা মেগামিয়ার (Megamere) বলে। সম আয়তনবিশিষ্ট ব্লাস্টোমিয়ারগুলি অরীয় প্রতিসম, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, সর্পিল প্রতিসম অথবা অনিয়ত হইতে পারে।

* ক্লিভেজের (Cleavage) অপর নাম : সেগমেন্টেশন (Segmentation) / সেলুলেশন (Cellulation) / ব্লাস্টুলেশন (Blastulation)।

মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ (Meroblastic cleavage): অসম্পূর্ণ বিভাজনকে (অর্থাৎ জাইগোটের একটি অংশে বিভাজন সীমাবদ্ধ থাকিলে এবং অবশিষ্ট অংশটি অবিভক্ত থাকিলে) মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ বলে। সরীসৃপ, পাখী এবং হংসচঞ্চুর ডিম্বকের ক্ষেত্রে এই ধরনের অসম্পূর্ণ বিভাজন সাধিত হয়। অ্যানিম্যাল পোলে অবস্থিত নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজমের ডিস্ক অর্থাৎ ব্লাস্টোডিস্ক (Blastodisc) সম্পূর্ণভাবে বিভাজিত হয় এবং ভেজিট্যাল পোলের কুসুমপূর্ণ অংশ অবিভাজিত থাকে। ব্লাস্টোডিস্কের মধ্যে বিভাজন সীমাবদ্ধ থাকে।

ক্লিভেজ তল (Cleavage planes): ক্লিভেজের সময় বিভাজন বিভিন্ন তলে সংঘটিত হয়। ক্লিভেজের সময় বিভিন্ন বিভাজন তলের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান। ক্লিভেজ তল নিম্নরূপ :

মেরিডিওনাল ক্লিভেজ (Meridional cleavage): যে বিভাজন ডিম্বাণুর **মধ্যতল** (Meridian) বরাবর অর্থাৎ অ্যানিম্যাল-ভেজিট্যাল **অক্ষ** (Animal-vegetal axis) বরাবর প্রসারিত হইয়া ডিম্বাণুকে দ্বিখণ্ডিত করে তাহাকে মেরিডিওনাল ক্লিভেজ বলে। অ্যানিম্যাল ও ভেজিট্যাল পোলের কেন্দ্র-বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাকে ডিম্বাণুর মধ্যঅক্ষ বা মিডিয়ান অ্যাক্সিস (Median axis) বলে। মেরিডিওনাল ক্লিভেজে দুইটি সমান ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়।

ভার্টিক্যাল ক্লিভেজ (Vertical cleavage): এই ধরনের বিভাজনে অ্যানিম্যাল পোল হইতে বিভাজন তল ভেজিট্যাল পোল অভিমুখে প্রসারিত হয় কিন্তু ডিম্বাণুর মধ্যঅক্ষ বরাবর প্রসারিত না হইয়া মধ্যঅক্ষের সমান্তরাল এবং পার্শ্ব বরাবর নিম্নমুখী হয়। ফলে অসম ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের উল্লম্বতলে সংঘটিত বিভাজনকে ভার্টিক্যাল ক্লিভেজ বলে।

ইকুইটোরিয়াল ক্লিভেজ (Equitorial cleavage): ক্লিভেজের সময় যখন বিভাজন তল জাইগোটের কাল্পনিক নিরক্ষরেখা বরাবর জাইগোট ও ব্লাস্টোমিয়ারকে দ্বিখণ্ডিত করে তখন তাহাকে ইকুইটোরিয়াল ক্লিভেজ বলে। বিভাজন তল ডিম্বাণুর মধ্যঅক্ষের সহিত সমকোণ (Right angle) উৎপন্ন করে।

ল্যাটিচুডিনাল ক্লিভেজ (Latitudinal cleavage): এই ধরনের ক্লিভেজে বিভাজন তল নিরক্ষরেখার উপর কিংবা নিম্নদেশ বরাবর প্রসারিত হয় এবং মধ্যঅক্ষের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে। ইহা অনুভূমিক বা **হরাইজন্টাল** (Horizontal) ক্লিভেজ নামেও অভিহিত হয়।

বিভিন্ন প্রাণীদের ক্লিভেজ (Cleavage in different animals)

ডিম্বাণুর আকৃতি ও গঠনগত ভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন প্রাণীদের ক্লিভেজ প্রক্রিয়া ভিন্ন। নিম্নে কর্ডাটা পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণীর ক্লিভেজ প্রক্রিয়া আলোচিত হইল :

অ্যাম্ফিঅক্সাসের ক্লিভেজ (Cleavage in Amphioxus)

অ্যাম্ফিঅক্সাসের [ব্রাঙ্কিওস্টোমা (*Branchiostoma*)] ডিম্বকটি হোমো-লেসিথাল (Homolecithal) প্রকৃতির হওয়ায় ক্লিভেজ প্রক্রিয়াটির মধ্যে ধারাবাহিকতা বর্তমান। অ্যাম্ফিঅক্সাসের পরিস্ফুরণ সমুদ্রের জলে সংঘটিত হয়। জাইগোটটি বারবার বিভাজনের দ্বারা অসংখ্য ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন করে। ইহাদের ক্লিভেজ হলোব্লাস্টিক ধরনের, বিভাজনের ফলে জাইগোট সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয়।

প্রথম ক্লিভেজ তলটি মেরিডিওনাল অর্থাৎ জাইগোট মধ্যরেখা বরাবর দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হয় (চিত্র 10.13A)। বিভাজন প্রথমে অ্যানিম্যাল পোলের কেন্দ্রবিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে মধ্যরেখা বা মধ্যঅক্ষ বরাবর ভেজিট্যাল পোলের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অগ্রসর হয় এবং বিভাজনের হার সর্বত্র সমান। দ্বিতীয় ক্লিভেজ তলটিও মেরিডিওনাল কিন্তু প্রথম ক্লিভেজ তলের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করিয়া দ্বিতীয় ক্লিভেজটি সম্পন্ন হয়। ফলে দ্বিতীয় ক্লিভেজ সম্পূর্ণ হইবার পর চারিটি (টি) সম আকৃতি ও আয়তনযুক্ত ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ক্লিভেজটি ল্যাটিচুডিনাল অর্থাৎ ব্লাস্টোমিয়ার চারিটির কাল্পনিক নিরক্ষরেখার কিঞ্চিৎ উপরিতলের অক্ষাংশ বরাবর বিভাজন সম্পাদিত হয়। ফলে আটটি 8টি ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ক্লিভেজ সমাপ্ত হইবার পর যে আটটি ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে চারিটি ক্ষুদ্রাকার এবং অপর চারিটি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। অ্যানিম্যাল পোলের দিকে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার ব্লাস্টোমিয়ারগুলিকে মাইক্রোমিয়ার এবং ভেজিট্যাল পোলের দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বড় ব্লাস্টোমিয়ারকে ম্যাক্রোমিয়ার বলে। চতুর্থ ক্লিভেজটি মেরিডিওনাল ধরনের। আটটি ব্লাস্টোমিয়ারই উহাদের মধ্যরেখা বরাবর বিভাজিত হয় এবং উৎপন্ন ষোলটি (16টি) ব্লাস্টোমিয়ারের মধ্যে আটটি মাইক্রোমিয়ার এবং আটটি ম্যাক্রোমিয়ার থাকে। পঞ্চম ক্লিভেজটি ল্যাটিচুডিনাল তলে সংঘটিত হয়। প্রতিটি মাইক্রোমিয়ার ও ম্যাক্রোমিয়ার উহাদের নিরক্ষরেখা তলে বিভাজিত হয় এবং মোট বত্রিশটি (ষোলটি মাইক্রোমিয়ার এবং ষোলটি ম্যাক্রোমিয়ার) ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন করে। ষষ্ঠ ক্লিভেজ তলটি প্রায় মেরিডিওনাল এবং বত্রিশটি ব্লাস্টোমিয়ারই মধ্যতল বরাবর বিভাজিত হইয়া চৌষট্টিটি (64-টি) ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কোষ-পুঞ্জের কেন্দ্র অংশে স্পষ্ট গহ্বর দৃষ্ট হয় এবং গহ্বরটি তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে।

ষষ্ঠ ক্লিভেজ পর্যন্ত বিভাজন প্রক্রিয়া নিয়ত এবং বিশেষ রীতি অনুসরণ করে। কিন্তু ষষ্ঠ ক্লিভেজের পর বিভাজন অনিয়ত হইয়া যায়। তবে ম্যাক্রোমিয়ার অপেক্ষা মাইক্রোমিয়ারগুলি দ্রুতহারে বিভাজিত হয়। ক্রমবিভাজনের ফলে ব্লাস্টোমিয়ারগুলি বিশেষ রীতিতে সুসজ্জিত হইয়া ব্লাস্টুলা (Blastula) দশায় উপনীত হয়। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে চৌষট্টিটি ব্লাস্টোমিয়ারযুক্ত অবস্থার কোষপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরটি বিশেষ তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। অষ্টম ক্লিভেজ সম্পন্ন হইবার পর [অর্থাৎ দুইশত ছাপান্নটি (256) ব্লাস্টোমিয়ারযুক্ত]

ব্লাস্টুলাটি লম্বাটে আকার ধারণ করে এবং ইহার মধ্যস্থ গহ্বর [ব্লাস্টোসিল (Blastocoel)] ক্রমে প্রশস্ত হয়। ব্লাস্টুলার পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্কদেশ যথাক্রমে মাইক্রোমিয়ার ও ম্যাক্রোমিয়ার দ্বারা গঠিত। ব্লাস্টুলার পৃষ্ঠতলকে এপিব্লাস্ট (Epiblast) এবং অঙ্কতলকে হাইপোব্লাস্ট (Hypoblast) বলে।

অ্যাম্ফিঅক্সাসের ক্লিভেজের সংক্ষিপ্তসার :

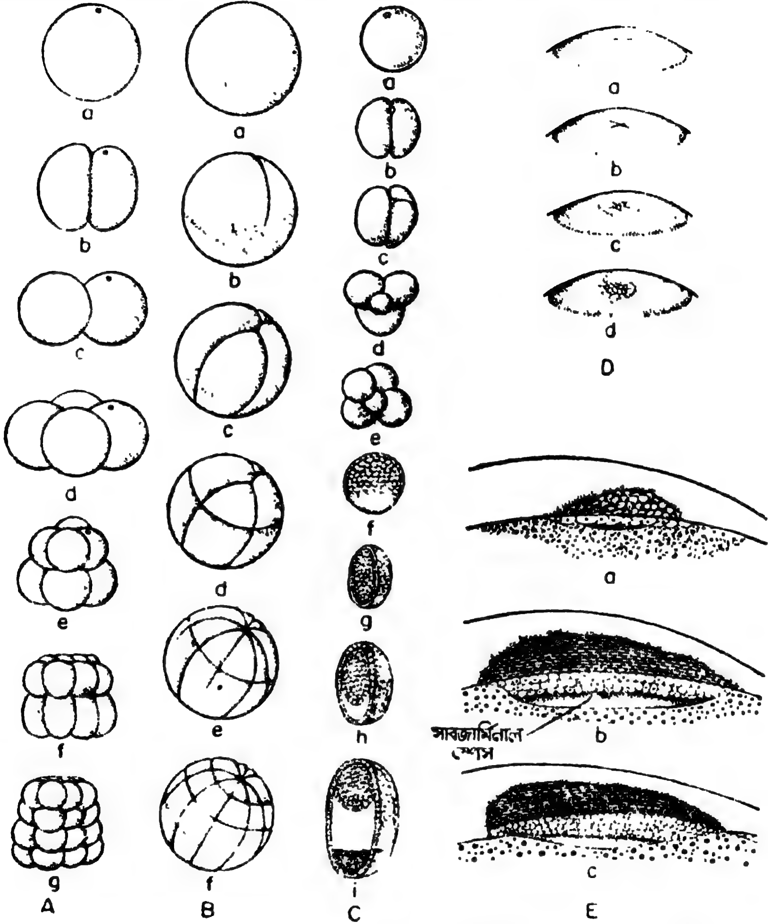
প্রথম ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল –2-টি ব্লাস্টোমিয়ার
দ্বিতীয় ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল –4-টি ব্লাস্টোমিয়ার
তৃতীয় ক্লিভেজ → ল্যাটিচুডিনাল—8-টি ব্লাস্টোমিয়ার
চতুর্থ ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল –16-টি ব্লাস্টোমিয়ার
পঞ্চম ক্লিভেজ → ল্যাটিচুডিনাল—32-টি ব্লাস্টোমিয়ার
ষষ্ঠ ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল—64-টি ব্লাস্টোমিয়ার
ষষ্ঠ ক্লিভেজের পর ক্লিভেজ অনিয়ত।

ব্যাঙের ক্লিভেজ (Cleavage in Frog)

ব্যাঙের ডিম্বকটি **টিলোলেসিথাল** ধরনের, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ কুসুম ইহার ভেজিট্যাল পোলের দিকে সঞ্চিত থাকে। অ্যাম্ফিঅক্সাসের ন্যায় ব্যাঙের ক্লিভেজ হলোব্লাস্টিক ধরনের হইলেও ক্লিভেজদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কুসুমের পরিমাণ ও ইহার বিস্তারণের জন্য এই ধরনের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

ব্যাঙের প্রথম ক্লিভেজ তল মেরিডিওনাল (চিত্র 10.13B)। নিষেকের প্রায় 3-3½ ঘণ্টার পর প্রথম ক্লিভেজ আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহা মুখ্যত নানান বাহ্য ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। অ্যানিম্যাল পোলের কেন্দ্র হইতে বিভাজন সুরু হইয়া ক্রমে ইহা ভেজিট্যাল পোলের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে ডিম্বটি সম দ্বিখণ্ডিত হয়। দ্বিতীয় ক্লিভেজটিও মেরিডিওনাল কিন্তু ইহা প্রথম ক্লিভেজ তলের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় ক্লিভেজে উদ্ভূত চারিটি (4-টি) ব্লাস্টোমিয়ার আকারে সমান হইলেও ইহাদের মধ্যে দুইটি ব্লাস্টোমিয়ার ভিন্নরূপ। চারিটির মধ্যে দুইটি ব্লাস্টোমিয়ার গ্রে-ক্রিসেণ্ট (Gray crescent)-এর অর্ধাংশ পায় এবং অপর দুইটিতে গ্রে-ক্রিসেণ্ট থাকে না। তৃতীয় ক্লিভেজটি ল্যাটিচুডিনাল অর্থাৎ নিরক্ষীয় রেখার কিঞ্চিৎ উপর দিয়া প্রসারিত। ফলে আটটি (8-টি) অসম ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়। অ্যানিম্যাল পোলের দিকের চারিটি মাইক্রোমিয়ার এবং ভেজিট্যাল পোলের দিকের চারিটি ম্যাক্রোমিয়ার। তৃতীয় ক্লিভেজ তলটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লিভেজ তলদ্বয়ের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে। চতুর্থ ক্লিভেজ মেরিডিওনাল। এই ক্লিভেজে প্রথমে মাইক্রোমিয়ারগুলি এবং পরে মন্থরগতিতে ম্যাক্রোমিয়ারগুলি বিভাজিত হয়। চতুর্থ ক্লিভেজের পর হইতেই অনিয়ত বিভাজন সূচিত হয়। কুসুমহীন মাইক্রোমিয়ারগুলি কুসুমযুক্ত ম্যাক্রোমিয়ার অপেক্ষা দ্রুত হারে বিভাজিত হয়।

তৃতীয় ক্লিভেজের সময় হইতেই (অর্থাৎ যখন আটটি ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি হয়) কোষপুঞ্জের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অস্পষ্ট গহ্বরের উদ্ভব হয়। পরিস্ফুরণের পরবর্তী অবস্থায় ব্লাস্টোমিয়ারগুলি সুসজ্জিত হইয়া ব্লাস্টুলা এবং গহ্বরটি স্পষ্ট ও প্রশস্ত



10.13 বিভিন্ন মেরুদণ্ডীর ক্লিভেজ—(A) অ্যাম্ফিঅক্সাস, (B) রাণা (*Rana*), (C) খরগোস (f হইতে i ব্যবচ্ছেদিত), (D) মুরগী, (E) মুরগী ব্যবচ্ছেদিত।

হইয়া ব্লাস্টোসিল গঠন করে। ব্যাঙের ব্লাস্টুলার অঙ্কদেশ ম্যাক্রোমিয়ার দ্বারা গঠিত হওয়ায় ব্লাস্টোসিলটি অ্যানিম্যাল পোলের দিকে অপসারিত হয়।

ব্যাঙের ক্লিভেজের সংক্ষিপ্তসার :

প্রথম ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল—2-টি ব্লাস্টোমিয়ার

দ্বিতীয় ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল—4-টি ব্লাস্টোমিয়ার

তৃতীয় ক্লিভেজ → ল্যাটিচুডিনাল—8-টি ব্লাস্টোমিয়ার
চতুর্থ ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল—16-টি ব্লাস্টোমিয়ার
চতুর্থ ক্লিভেজের পর ক্লিভেজ অনিয়ত।

মুরগীর ক্লিভেজ (Cleavage in Chick)

মুরগীর ক্লিভেজ আদর্শ মেরোব্লাস্টিক ধরনের। ক্লিভেজের সময় বিভাজন কেবলমাত্র ব্লাস্টোডিস্ক (Blastodisc) বা জার্মিন্যাল ডিস্ক (Germinal disc)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ মুরগীর ক্লিভেজ অসম্পূর্ণ। ভেজিট্যাল পোলে সঞ্চিত কুসুম সমৃদ্ধ অঞ্চল অখণ্ডিত থাকে।

প্রথম ক্লিভেজ মেরিডিওনাল এবং ব্লাস্টোডিস্কের কেন্দ্রাঞ্চলে একটি মধ্যতলীয় ভাজের সৃষ্টি হয় (চিত্র 10.13D)। বিভাজন ব্লাস্টোডিস্কের মধ্যে সীমিত থাকে এবং ভেজিট্যাল পোলের দিকে পৌঁছায় না। দ্বিতীয় ক্লিভেজ মেরিডিওনাল এবং প্রথম ক্লিভেজ তলের সহিত প্রায় সমকোণ সৃষ্টি করে। তৃতীয় ক্লিভেজটি ভার্টিক্যাল এবং প্রথম বিভাজন তলের সহিত সমান্তরালভাবে প্রসারিত হয়। চতুর্থ ক্লিভেজটিও ভার্টিক্যাল। বিভাজন মুখ্যত অনিয়ত। ফলে আটটি **কেন্দ্রীয় কোষ** (Central cells) ও বারটি **প্রান্তিক কোষ** (Marginal cells) সৃষ্টি হয়। চতুর্থ ক্লিভেজের পর হইতে বিভাজনের মধ্যে অনিয়ত ভাব স্পষ্টতর হয়। কেন্দ্রীয় কোষসমূহের নিম্নে কোষ মেমব্রেণ না থাকায় উহারা কুসুম প্রান্তে উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু প্রান্তীয় কোষগুলির মেমব্রেণ থাকে।

ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট কোষসমূহ একটি কোষস্তরে পরিণত হয় এবং ইহাকে **ব্লাস্টোডার্ম** (Blastoderm) বলে। ব্লাস্টোডার্মের নিম্নে একটি অনুভূমিক ফাটল সৃষ্টি হয়। ক্রমে ফাটলটি বর্ধিত ও প্রসারিত হইয়া গহ্বরে পরিণত হয় এবং ইহা **সাবজার্মিন্যাল ক্যাভিটি** (Sub-germinal cavity) গঠন করে। বিভাজনের ফলে ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলি ক্রমে একাধিক কোষস্তরে সজ্জিত হয়। কোষ বিভাজন অব্যাহত থাকে। ব্লাস্টোডার্মের প্রান্তীয় অংশটি নিম্নস্থ কুসুম সংলগ্ন থাকে এবং ইহা অনচ্ছ। কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশটি স্বচ্ছ এবং ইহার নিম্নে সাবজার্মিন্যাল ক্যাভিটি অবস্থিত। কেন্দ্রীয় অংশকে **এরিয়া পেলুসিডা** (Area pellucida) এবং প্রান্তীয় অংশকে **এরিয়া ওপেকা** (Area opaca) বলে। অর্থাৎ ব্লাস্টোডার্মের এরিয়া ওপেকার কোষগুলি প্রান্তীয় কুসুমের সহিত যুক্ত, দানাসমৃদ্ধ ও ঘনসন্নিবিষ্ট। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় এরিয়া পেলুসিডার কোষগুলিতে দানা কম। ক্রমে এরিয়া ওপেকার একপ্রান্তে কোষের সমাবেশ হয় এবং উক্ত প্রান্তটি ভাবী ভ্রূণের পশ্চাৎদিক নির্দেশ করে।

মুরগীর ক্লিভেজের ফলে উদ্ভূত ব্লাস্টুলাকে **ডিস্কোব্লাস্টুলা** (Discoblastula) বলে। কারণ ডিস্কের আকৃতিবিশিষ্ট ব্লাস্টুলা কুসুমের উপর অবস্থিত থাকে।

মুরগীর ক্লিভেজ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্তসার :

প্রথম ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল → 2-টি ব্লাস্টোমিয়ার
দ্বিতীয় ক্লিভেজ → মেরিডিওনাল → 4-টি ব্লাস্টোমিয়ার
তৃতীয় ক্লিভেজ → ভার্টিক্যাল → 8-টি ব্লাস্টোমিয়ার
চতুর্থ ক্লিভেজ → ভার্টিকাল → 20-টি ব্লাস্টোমিয়ার
(কিন্তু অনিয়ত ; 8-টি কেন্দ্রীয় এবং 12-টি প্রান্তীয় কোষ)

চতুর্থ ক্লিভেজ হইতেই বিভাজন অনিয়ত। পঞ্চম ক্লিভেজ হইতে বিভাজনের অনিয়তা বৃদ্ধি পায়।

খরগোসের ক্লিভেজ (Cleavage in Rabbit)

খরগোসের ডিম্বাণুর আকৃতি খুবই ছোট এবং ইহাতে কুসুম প্রায় অনুপস্থিত। ক্লিভেজ হলোব্লাস্টিক ধরনের। অনিয়ত ও অসমতা খরগোসের ক্লিভেজের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম ক্লিভেজ তল ভার্টিক্যাল (Vertical) অর্থাৎ জাইগোটটি উল্লম্বতলে বিভাজিত হইয়া দুইটি অসম ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন করে (চিত্র 10.13C)। দ্বিতীয় ক্লিভেজ ভার্টিকাল এবং প্রথমটির সহিত একটি সমকোণ করিয়া সংঘটিত হয়। তৃতীয় ক্লিভেজ হরাইজনটাল (Horizontal) অর্থাৎ বিভাজন নিরক্ষরেখার কিঞ্চিৎ উপরে অনুভূমিকভাবে ঘটে। তৃতীয় ক্লিভেজের পর হইতেই ব্লাস্টোমিয়ারগুলি দ্রুত কিন্তু অনিয়তভাবে বিভাজিত হইয়া একটি নিরেট কোষ-পুঞ্জ (Solid cell-mass) গঠন করে। ইহা মরুলা (Morula) নামে অভিহিত।

মরুলার মধ্যে দুইপ্রকার কোষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি কোষ আকারে ছোট এবং অবশিষ্ট কোষগুলি আকারে বড়। আকারে বড় কোষগুলি দানাযুক্ত এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সজ্জিত থাকে। কোষ-পুঞ্জের অভ্যন্তরে একটি গহ্বরের উদ্ভব হয় এবং গহ্বরটি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সজ্জিত বৃহৎ কোষগুচ্ছ একপার্শ্বে স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে উক্ত কোষগুচ্ছ অ্যানিম্যাল পোলের দিকের বাহিরের কোষস্তরের সহিত সংযুক্ত হয়। এই অবস্থাকে ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) দশা বলে। ব্লাস্টোসিস্ট দশায় কেন্দ্রীয় কোষগুচ্ছ ইনার সেল মাস (Inner cell mass) নামে পরিচিত এবং সৃষ্ট গহ্বরটিকে ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) বলে। ইনার সেল মাসের কোষসমূহের বিভাজনের ফলে ব্লাস্টোসিস্ট আকারে বর্ধিত হয় এবং ইনার সেল মাস অ্যানিম্যাল পোলের দিকে এমব্রায়োনিক নব (Embryonic knob) দ্বারা যুক্ত থাকে। এমব্রায়োনিক নব হইতে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। ব্লাস্টোসিল ও এমব্রায়োনিক নব ট্রোফোব্লাস্ট (Trophoblast) দ্বারা পরিবৃত হয়। উক্ত ট্রোফোব্লাস্ট অমরা (Placenta) গঠনে অংশ গ্রহণ করে। এমব্রায়োনিক নব সংলগ্ন ট্রোফোব্লাস্ট কোষসমূহকে রউবার বর্ণিত কোষ (Cells of Rauber) বলে।

কর্ডাটা পর্বভুক্ত কয়েকটি আদর্শ প্রাণীর ক্লিভেজ পদ্ধতির তুলনামূলক সরণি

বৈশিষ্ট্য	অ্যাম্ফিঅক্সাস	ব্যাঙ	মুরগী	খরগোস
1. ক্লিভেজের প্রকৃতি	হলোব্লাস্টিক	হলোব্লাস্টিক	মেরোব্লাস্টিক	হলোব্লাস্টিক
2. প্রথম ক্লিভেজ তল	মেরিডিওনাল	মেরিডিওনাল	মেরিডিওনাল	ভার্টিক্যাল
3. দ্বিতীয় ক্লিভেজ তল	মেরিডিওনাল—কিন্তু প্রথম বিভাজন তলের সহিত সমকোণ।	মেরিডিওনাল—প্রথম বিভাজন তলের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে।	মেরিডিওনাল—প্রথম বিভাজন তলের সহিত সমকোণ করিয়া থাকে।	ভার্টিক্যাল
4. তৃতীয় ক্লিভেজ তল	ল্যাটিচুডিনাল—নিরক্ষরেখার কিঞ্চিৎ উপরে।	অ্যাম্ফিঅক্সাসের ন্যায় ল্যাটিচুডিনাল।	ভার্টিক্যাল—প্রথম ক্লিভেজ তলের সহিত প্রায় সমকোণে সংঘটিত হয়।	হরাইজনট্যাল
5. চতুর্থ ক্লিভেজ তল	মেরিডিওনাল	মেরিডিওনাল	ভার্টিক্যাল—কিন্তু কিঞ্চিৎ অনিয়ত।	অনিয়ত
6. পঞ্চম ক্লিভেজ তল	ল্যাটিচুডিনাল	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
7. ষষ্ঠ ক্লিভেজ তল	প্রায় মেরিডিওনাল	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
8. ব্লাস্টুলার গঠন	লম্বাটে এবং একটি কোষস্তর দ্বারা গঠিত। ব্লাস্টোসিল প্রশস্ত এবং কেন্দ্রে অবস্থিত।	গোলাকার এবং ব্লাস্টোসিল অ্যানিম্যাল পোলের দিকে অবস্থিত।	ডিস্কোব্লাস্টুলা	গোলাকার ব্লাস্টোসিস্ট

খরগোসের ক্লিভেজের সংক্ষিপ্তসার

প্রথম ক্লিভেজ ——→ ভার্টিক্যাল
দ্বিতীয় ক্লিভেজ ——→ ভার্টিক্যাল
তৃতীয় ক্লিভেজ ——→ হরাইজনট্যাল
তৃতীয় ক্লিভেজের পর হইতে অনিয়ত বিভাজন আরম্ভ হয়।

ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় কুসুমের প্রভাব (Influence of Yolk on Cleavage)

অধিকাংশ নিষিক্ত ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুম থাকে। কুসুমের পরিমাণ ও ইহার বিস্তারণের বৈচিত্র্যের জন্যই ক্লিভেজতল ভিন্নরূপ হয়। ক্লিভেজের সময় কুসুম যান্ত্রিক প্রভাব বিস্তার করে। অ্যাম্ফিঅক্সাসের ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুমের পরিমাণ খুবই কম এবং উহা সমসত্ত্বভাবে বিস্তৃত। ফলে বিভাজন সম্পূর্ণ এবং দ্রুতহারে সংঘটিত হয়। সপ্তম ক্লিভেজ পর্যন্ত ক্লিভেজের প্রকৃতি ও বিভাজন নিয়ত। সপ্তম ক্লিভেজের পর হইতে অনিয়তা (Asynchronism) আরম্ভ হয়। অ্যাম্ফিবিয়ার (যথা—ব্যাঙ) ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুমের পরিমাণ পরিমিত এবং ভেজিট্যাল পোলের দিকে সীমাবদ্ধ। ফলে অ্যানিম্যাল পোলের দিকে বিভাজন দ্রুতহারে ঘটে এবং ভেজিট্যাল পোলের দিকে বিভাজনের হার মন্থর হয়। চতুর্থ ক্লিভেজ পর্যন্ত নিয়ত বিভাজন ঘটিলেও পঞ্চম ক্লিভেজ হইতে উহা অনিয়ত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু মুরগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কুসুমের উপস্থিতি ও ভেজিট্যাল পোলের দিকে ইহাদের অবস্থানের জন্যই কুসুম সমৃদ্ধ ভেজিট্যাল পোলে বিভাজন হয় না। অ্যানিম্যাল পোলের দিকে ব্লাস্টোডিস্কে বিভাজন সীমিত থাকে। খরগোসের ডিম্বাণুতে কুসুম প্রায় অনুপস্থিত। তথাপি এক্ষেত্রে বিভাজন অনিয়ত।

ক্লিভেজের হার ও প্রকৃতি কুসুমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিভাজনের সময় বেমতন্তু সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বাধাদানের জন্যই কুসুমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রাণীদের ক্লিভেজ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে প্রতিভাত হয় যে ক্লিভেজ প্রক্রিয়া কয়েকটি সূত্র অনুসরণ করে। সূত্রগুলি নিম্নরূপ :

1. **স্যাক্সের সূত্র** (Sach's law) : ক্লিভেজে ব্লাস্টোমিয়ারের বিভাজনের সময় সম অপত্য কোষ উৎপাদনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রতিটি বিভাজন তল পূর্ববর্তী বিভাজন তলের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে।

2. **হার্টউইগের সূত্র** (Hertwig's law) : নিউক্লিয়াসের অবস্থান ক্লিভেজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোষের সাইটোপ্লাজমের কেন্দ্রস্থলে নিউক্লিয়াস অবস্থান করে এবং বিভাজনে নিউক্লিয়াসের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভাজনের সময় বেমতন্তুর লম্ব অক্ষ (Long axis) কোষের সাইটোপ্লাজমের লম্ব অক্ষ পরস্পর সমান হয় এবং একইভাবে প্রসারিত থাকে। ক্লিভেজকালের বিভাজনে সাইটোপ্লাজমের লম্ব অক্ষকে অনুপ্রস্থভাবে ছেদ করিবার প্রবণতা দেখা যায়।

3. **বালফোরের সূত্র** (Balfour's law) : ক্লিভেজের হার ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের কুসুমের পরিমাণের ব্যস্তানুপাতিক (Inversely proportional)।

ক্লিভেজের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Cleavage)

পরিস্ফুরণে ক্লিভেজের ভূমিকা অপরিসীম। ক্লিভেজের ফলে ব্লাস্টুলার উৎপত্তি হয়। ব্লাস্টুলার কোষস্তরে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের প্রধান প্রধান অঙ্গ গঠনের এলাকাগুলি (Presumptive organ forming areas) পৃথক হইয়া নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়। ব্লাস্টুলার এই ধরনের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক অবস্থানের জন্যই পরবর্তী দশায় (অর্থাৎ গ্যাসট্রুলেশনে) প্রধান অঙ্গগঠনকারী কোষগুলির পরিযান সম্ভব হয়। সংক্ষেপে ক্লিভেজ দশায় ভ্রূণ গঠনের জন্য বিভিন্ন কোষের বিভেদের প্রস্তুতিপর্ব সংঘটিত হয়।

10.11 গ্যাসট্রুলেশন (Gastrulation)

ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে গ্যাসট্রুলেশন দশার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রক্রিয়ায় ভাবী ভ্রূণের অঙ্গসংস্থানিক সংগঠনের যথাযথ বিন্যাস ঘটে অর্থাৎ ভাবী ভ্রূণের সাংগঠনিক ব্লু-প্রিন্ট (Blue print) গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট হয়। ব্লাস্টুলেশনের সময় ব্লাস্টুলার স্তরে মুখ্য অঙ্গ-উৎপন্নকারী অঞ্চলগুলি (Major organ-forming areas) বিশেষ রীতিতে সজ্জিত থাকে। গ্যাসট্রুলেশনের সময় মুখ্য অঙ্গ-উৎপন্নকারী অঞ্চলগুলি পুনর্বিন্যস্ত হইয়া ভাবী ভ্রূণের যথোপযুক্ত স্থান দখল করে। ফলে বিশেষ প্রজাতির নির্দিষ্ট দেহ সংগঠন অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ সম্ভব হয়। পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের এক অংশ হইতে অন্য অংশে কোষ-সমষ্টির স্থানান্তরণ বা পরিযান গ্যাসট্রুলেশনের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্যাসট্রুলেশনের সময় ভ্রূণের এক অংশ হইতে অন্য অংশে কোষ-সমূহের এই প্রকার পরিযানকে মরফোজেনেটিক মুভমেণ্ট (Morphogenetic movement) বলে। কোষ পরিযান ব্যতীত গ্যাসট্রুলেশনের প্রধান ঘটনাগুলি হইল :

(i) তিনটি প্রাথমিক জারমিনাল স্তরের [(Three primary germinal layers), যথা—এক্টোডার্ম (Ectoderm), মেসোডার্ম (Mesoderm) এবং এণ্ডোডার্ম (Endoderm)] উদ্ভব ;

(ii) কোষসমূহের নিউক্লিয়াসের বিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

(iii) পরিস্ফুরণের উপর জীনের নিয়ন্ত্রণ সূচিত হয়।

গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় তিনটি কোষীয় ক্রিয়া, যথা—কোষ বিভাজন (Cell-division), কোষ সংযোগ (Cell-contact) ও কোষ পরিযান (Cell-movement) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উপরি-উক্ত ক্রিয়াদি গ্যাসট্রুলেশনের সময় সুষ্ঠু ও নিয়মিত ভাবে সংঘটিত হয়। ফলে পরিস্ফুরণ হয় নিখুঁত ও স্বাভাবিক।

গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

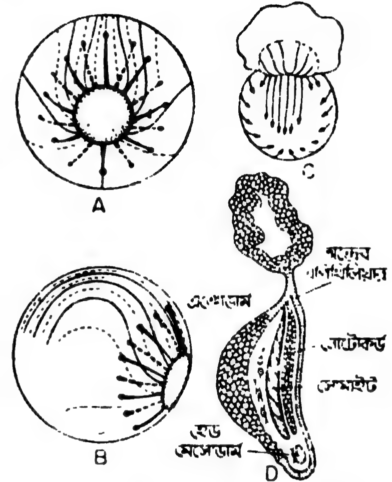
গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ নিরীক্ষণের জন্য কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার সাহায্য লওয়া হইয়াছে, যথা—

(1) ভাইটাল স্টেন মেথড (Vital stain method)

(2) কার্বন কণিকা সংযোজন পদ্ধতি (Application of carbon particles)

(3) রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ সংযোজন (Tagging of radioactive Isotopes)

1923 খ্রীষ্টাব্দে ভগ্ (Vogt) জেনাস গ্রীন (Janus green), নিউট্রাল রেড (Neutral red) প্রভৃতি ভাইটাল রঞ্জক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া গ্যাসট্রুলেশনের সময় ভ্রূণের একস্থান হইতে অন্যস্থানে চিহ্নিত মুখ্য অঙ্গগঠনকারী কোষ অঞ্চলগুলির পরিযান নিরীক্ষণে সক্ষম হন (চিত্র 10.14)। স্প্রাট (Spratt) 1946 খ্রীষ্টাব্দে সূক্ষ্ম কার্বন কণিকার সাহায্যে ভ্রূণের কোষকে চিহ্নিত করিতে সক্ষম হন এবং চিহ্নিত কোষসমূহের পরিযান লিপিবন্ধ করেন। জীবিত কোষের অভ্যন্তরে কার্বন কণিকার অনুপ্রবেশ ঘটে। অধুনা রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে গ্যাসট্রুলেশনের সময় মরফোজেনেটিক মুভমেণ্ট সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছে।



চিত্র 10.14 উভচরের গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষ পরিযান—স্বাভাবিক (A ও B), এক্সো-গ্যাসট্রুলেশন (C), এক্সোগ্যাসট্রুলেশন ব্যবচ্ছেদিত (D)।

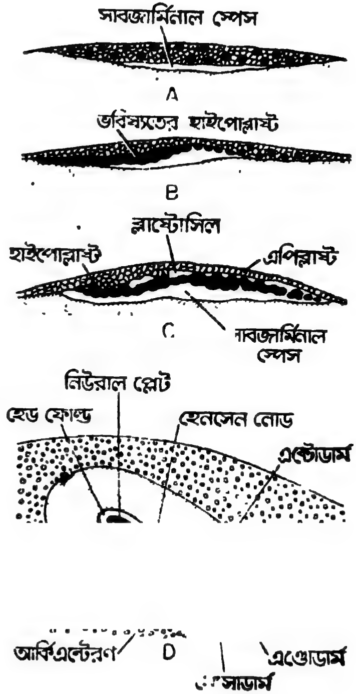
মুরগীর গ্যাসট্রুলেশন (Gastrulation in Chick)

ক্লিভেজ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ব্লাস্টোডার্মের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি নিম্নের কুসুম হইতে মুক্ত হয় এবং এরিয়া পেলুসিডা (Area pellucida) গঠন করে। ব্লাস্টোডার্মের এরিয়া পেলুসিডার বহির্ভূত ও কুসুমের সহিত যুক্ত অংশকে এরিয়া অপেকা (Area opaca) বলে। ব্লাস্টোডার্মের এরিয়া পেলুসিডার স্থূল পশ্চাৎ অংশটি এমব্রায়োনিক শীল্ড (Embryonic shield) গঠন করে। ইহা প্রায় তিন বা চার কোষ পুরু। এমব্রায়োনিক শীল্ডের অগ্রাংশ এক বা দুই কোষস্তরযুক্ত।

গ্যাসট্রুলেশন শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টোডার্ম দুইটি স্তরে বিভেদিত হয়। উপরের স্তরটি এপিব্লাস্ট (Epiblast) এবং নিম্নের স্তরটিকে হাইপোব্লাস্ট (Hypoblast) বলে। দুইটি স্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সংকীর্ণ ব্লাস্টোসিলের (Blastocoel) উদ্ভব হয় (চিত্র 10.15)। হাইপোব্লাস্ট ও কুসুম অঞ্চলের মধ্যে সৃষ্ট গহ্বরকে

প্রাইমরডিয়াল আরকেনটেরন (Primordial archenteron) বলে। **এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের পৃথকীকরণ গ্যাসট্রুলেশনের প্রথম পর্যায়।** এপিব্লাস্টে কয়েকটি মুখ্য অঙ্গ-উৎপাদনকারী কোষ অঞ্চলে সজ্জিত থাকে। ইহার পশ্চাতের বিস্তৃত অংশ ভাবী মেসোডার্ম (Mesoderm) অঞ্চল। ইহার অগ্রে অবস্থিত **ক্ষুদ্র নোটোকর্ড অঞ্চল** (Notochordal region) হইতে নোটোকর্ড তৈয়ারী হয়। নোটোকর্ড অঞ্চলের পরেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবী **নিউর‍্যাল কলা** (Presumptive neural tissue) এবং ইহার অগ্রাংশে বিস্তৃত ভাবী **এক্টোডার্মাল** (Presumptive ectodermal) অঞ্চল বর্তমান।

এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের বিভেদের পর গ্যাসট্রুলেশনের দ্বিতীয় ধাপ হইল **প্রিমিটিভ স্ট্রিকের উৎপত্তি** (Origin of primitive streak)। গ্যাসট্রুলেশনের সময় হাইপোব্লাস্টের পশ্চাৎ অঞ্চলের কোষসমূহ ভ্রূণের মধ্যরেখা বরাবর সম্মুখভাগে অগ্রসর হয়। হাইপোব্লাস্টের কোষ পরিযানের পরেই হাইপোব্লাস্টের উপরের এপিব্লাস্টের কোষগুলি নিম্নমুখী হইয়া হাইপোব্লাস্ট অভিমুখে চলিয়া আসে। শেষোক্ত কোষগুলি এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে এবং ক্রমে পার্শ্বে ও অগ্রাংশে প্রসারিত হয়।



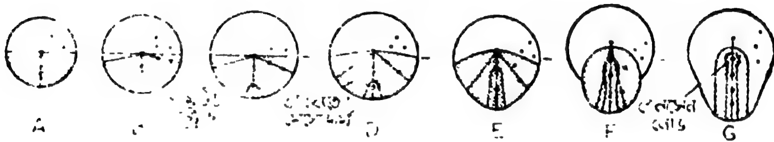
চিত্র 10.15 মুরগীর গ্যাসট্রুলেশন।

মুরগীর গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষ পরিযান পদ্ধতি 1946 খ্রীষ্টাব্দে স্প্রাট (Spratt) কার্বন কণিকা (Carbon particles) প্রয়োগ করিয়া নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করেন।

এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের কোষসমূহের পরিযান ও তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে এপিব্লাস্টের পশ্চাৎ অঞ্চলের ভাবী মেসোডার্ম কোষগুলি পশ্চাৎপ্রান্তে গমন করে এবং পার্শ্ব অঞ্চল হইতে উক্ত কোষগুলি পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের মধ্যঅক্ষ অভিমুখে কেন্দ্রীভূত ও জমায়েত হওয়ায় এরিয়া পেলুসিডার পশ্চাৎপ্রান্তের মধ্যরেখা বরাবর একটি স্থূল গঠন সৃষ্টি হয়। স্থূল গঠনের আবির্ভাব **প্রিমিটিভ স্ট্রিকের** (**Primitive streak**) উৎপত্তি সূচিত করে। প্রিমিটিভ স্ট্রিক বরাবর কোষগুলি নিম্নদিকে গমন করে এবং ইহারা আবর্তিত হইয়া এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যবর্তী স্থানের অগ্র ও পার্শ্ব অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ফলে একটি পৃথক মেসোডার্ম কোষস্তরের উৎপত্তি

হয়। কোষসমূহের আবর্তনের জন্য প্রিমিটিভ স্ট্রিকের দৈর্ঘ্য বরাবর একটি খাঁজের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট খাঁজকে **প্রিমিটিভ গ্রুভ** (Primitive groove) বলে। প্রিমিটিভ গ্রুভটি সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র গর্তে পরিসমাপ্ত হয় এবং গর্তটিকে **প্রিমিটিভ পিট** (Primitive pit) বলে। প্রিমিটিভ পিটের অগ্রে অবস্থিত স্ফীত গঠনটিকে **হেনসেন বর্ণিত নোড** (Hensen's node) বা **হেড প্রসেস** (Head process) বলে।

ইনকিউবেশনের প্রায় 18-19 ঘণ্টার পর প্রিমিটিভ স্ট্রিক পূর্ণগঠিত হয় (চিত্র 10.16)। প্রিমিটিভ গ্রুভ এবং ইহার পার্শ্বীয় **প্রিমিটিভ রিজ** (Primitive ridges) লইয়া প্রিমিটিভ স্ট্রিক গঠিত। অগ্রে প্রিমিটিভ পিট এবং পশ্চাতে প্রিমিটিভ **প্লেটের** (Primitive plate) মধ্যে প্রিমিটিভ স্ট্রিক বিস্তৃত থাকে। প্রিমিটিভ স্ট্রিকের প্রসারণের ফলে বৃত্তাকার এরিয়া পেলুসিডা ন্যাসপাতির আকার ধারণ করে।



চিত্র 10.16 মুরগীর গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষ পরিস্থান ও প্রিমিটিভ স্ট্রিকের সৃষ্টি।

হেনসেনের নোডের বাহিরের তলে একটি খাঁজের উৎপত্তি হয়। উক্ত খাঁজের পার্শ্বীয় অংশ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি নলের সৃষ্টি করে। এইভাবে খাঁজের উৎপত্তি ও ইহাদের ক্রমসংযুক্তির ফলে নলটি পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। সোয়েটারের জিপার (Zipper) বন্ধের ন্যায় ইহা সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে প্রসারিত হয় এবং পশ্চাতে একটি ছিদ্র ব্যতীত সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হয়। হেনসেনের নোডের পশ্চাৎ প্রসারণের ফলে প্রিমিটিভ স্ট্রিকের বিস্তার সীমাবদ্ধ হয় এবং ক্রমে ইহা আকারে ছোট হইতে থাকে। পরিশেষে প্রিমিটিভ স্ট্রিক অস্তিত্ব হারায়।

এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এণ্ডোডার্মের উৎপত্তি : পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্লাস্টোডার্ম হইতে বিভেদিত হাইপোব্লাস্ট হইতে এণ্ডোডার্ম এবং এপিব্লাস্ট হইতে এক্টোডার্ম ও মেসোডার্ম সৃষ্টি হয়। প্রিমিটিভ স্ট্রিক বরাবর যে সকল কোষ এপিব্লাস্ট হইতে নিম্নমুখী হইয়া এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যবর্তী স্থানে প্রসারিত হয় তাহারা মেসোডার্ম গঠন করে।

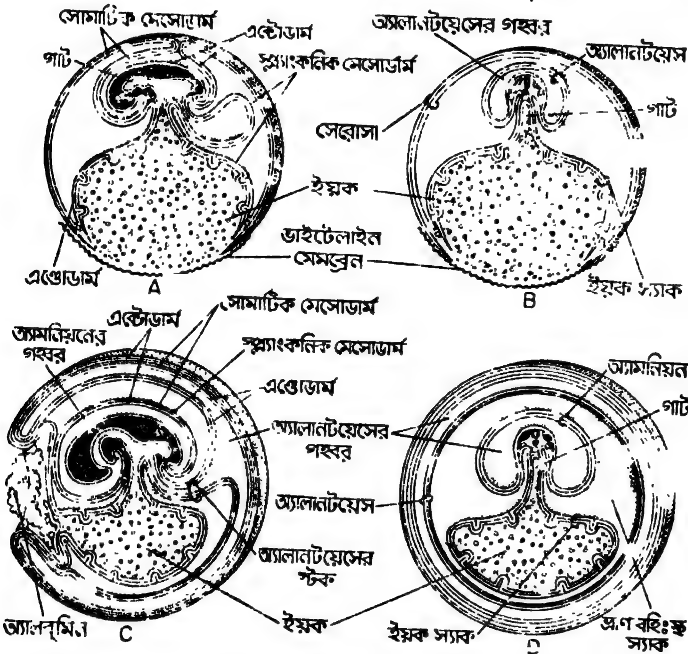
10.12 ফিট্যাল মেমব্রেণ (Foetal membranes)

সরীসৃপ পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভ্রূণ কয়েকটি বিশেষ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে। ঝিল্লীময় গঠনগুলি ভ্রূণদেহের বাহিরে অবস্থান করে। ভ্রূণবহিঃস্থ ঝিল্লীকে **এক্সট্রা-এমব্রায়োনিক মেমব্রেণ** (Extra-embryonic membranes) বা **ফিট্যাল মেমব্রেণ** বলে। ভ্রূণ-ঝিল্লীগুলি নিম্নরূপ (চিত্র 10.17) :

I, **কুসুম থলি বা ইয়োক স্যাক** (Yolk sac)

II. অ্যালানটয়েস (Allantois)
III. অ্যামনিওন (Amnion)
IV. *সেরোসা (Serosa)

উপরি-উক্ত প্রতিটি ভ্রূণ-ঝিল্লী দুইটি জার্মিনাল স্তর (Germinal layers) দ্বারা গঠিত। অ্যামনিওন ও সেরোসা এক্টোডার্ম (Ectoderm) এবং সোমাটিক মেসোডার্ম (Somatic mesoderm) দ্বারা গঠিত। ইয়োক স্যাক ও অ্যালানটয়েস এন্ডোডার্ম (Endoderm) এবং স্প্ল্যাংকনিক মেসোডার্মের (Splanchnic mesoderm) সমন্বয়ে গঠিত। মাছ ও উভচরদের ভ্রূণে ইয়োক স্যাক এবং অ্যালানটয়েস লুপ্তপ্রায় অবস্থায় উপস্থিত থাকে। কিন্তু সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীয় ভ্রূণে



চিত্র 10.17 মুরগীর ভ্রূণবহিঃস্থ ঝিল্লি পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক পর্যায়ের অনুদৈর্ঘ্য (A) ও অনুপ্রস্থ (B) চিত্ররূপ ; পরিস্ফুরণের মধ্য পর্যায়ের অনুদৈর্ঘ্য (C) ও অনুপ্রস্থ (D) চিত্ররূপ।

ইয়োক স্যাক ও অ্যালানটয়েস ব্যতীত দুইটি নবগঠিত ঝিল্লী ভ্রূণকে আবৃত রাখে। যাদের অ্যামনিয়ন ও সেরোসা বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে সরীসৃপ শ্রেণী হইতেই অ্যামনিয়ন ও সেরোসার আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। অ্যামনিয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা : (I) **অ্যামনিওটা** (Amniota) : অ্যামনিয়নযুক্ত

* স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণের ক্ষেত্রে সেরোসা কোরিয়ন (Chorion) নামে পরিচিত।

মেরুদণ্ডী প্রাণী (সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী এবং (২) অ্যানঅ্যামনিওটা (Anamniota): অ্যামিনিয়নবিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী (মাছ ও উভচর)।

মুরগীর ভ্রূণ-ঝিল্লী (Foetal membranes of Chick)

মুরগীর ক্রমপরিস্ফুরণরত ভ্রূণ ব্লাস্টোডিস্কের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বর্ধিত হয়। পরিস্ফুরণ চলাকালে এক্টোডার্ম ও নিকটবর্তী সোমাটিক মেসোডার্ম এবং এণ্ডোডার্ম ও নিকটবর্তী স্প্লাংকনিক মেসোডার্ম ভ্রূণের বহিরাঞ্চলে প্রসারিত হইতে থাকে। ভ্রূণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের ওজন বর্ধিত হয়। ফলে ভ্রূণটি নিম্নে কুসুমের মধ্যে যতই প্রবেশ করে ভ্রূণের অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব দিক হইতে উত্থিত খাঁজ (Folds) ভ্রূণকে ততই পরিবৃত করে। ফোল্ডগুলির পরস্পর সংযুক্তির ফলে নিম্নস্থ কুসুম হইতে ভ্রূণ পৃথক থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় ভ্রূণ-ঝিল্লীগুলি ভ্রূণকে রক্ষা করে এবং নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

I. **ইয়োক স্যাক**

ভ্রূণ পরিস্ফুরণকালে কুসুম (Yolk) হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করিলেও কুসুমকে ভ্রূণের অংশরূপে ধরা হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে কুসুমের পরিমাণ অত্যধিক বেশী, সেই সকল ক্ষেত্রে কুসুমকে সঞ্চিত রাখিবার জন্য এক বিশেষ থলির সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট থলিকে কুসুম থলি বা ইয়োক স্যাক বলে।

ভ্রূণের পরিস্ফুরণের সময় ব্লাস্টোডার্মের কিনারা বিস্তৃত হইয়া কুসুমের উপর প্রসারিত হইতে থাকে। প্রসারিত অংশটি দ্বিস্তরযুক্ত, অর্থাৎ ভিতরের স্তরটি এণ্ডোডার্ম এবং বাহিরের স্তরটি স্প্লাংকনিক মেসোডার্ম। পরিশেষে কুসুম সম্পূর্ণভাবে একটি থলির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অ্যামনিওনের পূর্ণ গঠনের ফলে ভ্রূণের অংকদেশের ভাজ পরস্পরের কাছাকাছি সরিয়া আসে এবং মধ্যবর্তী অংশে একটি নলের উৎপত্তি হয়। এক্টোডার্ম ও সোমাটিক মেসোডার্ম দ্বারা নলটি গঠিত। নলাকার এই গঠনকে সোমাটিক আম্বিলিকাস (Somatic umbilicus) বলে।

ইনকিউবশনের প্রায় 16 ঘণ্টার সময় মুরগীর ভ্রূণের অন্ত্র (Gut) প্রিমিটিভ স্ট্রিকের নিম্নে একটি গোলাকার গহ্বররূপে প্রতিভাত হয়। প্রায় 24 ঘণ্টার সময় গোলাকার গহ্বরের অগ্রাঞ্চল হইতে উপবৃদ্ধিরূপে উৎপন্ন ফোরগাট (Foregut) ভ্রূণের মস্তক অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ফোরগাট মেসোডার্ম পরিবৃত থাকে। প্রায় 48 ঘণ্টার সময় ফোরগাটের বিপরীত দিক হইতে উত্থিত হাইন্ডগাট (Hindgut) ভ্রূণের প্রসারণরত পশ্চাৎ অংশে বিস্তৃত হয়। ফোরগাট ও হাইণ্ডগাটের মধ্যবর্তী অন্ত্রের অবিভেদিত অঞ্চলটিকে মিডগাট (Midgut) বলে। মিডগাট অংশটি কুসুম থলিতে মুক্ত হয়। মিডগাটের গাত্র ও কুসুম থলির গাত্র সরাসরি যুক্ত হইয়া একটি সংকীর্ণ বৃন্ত সৃষ্টি করে। ইহাকে ইয়োক স্টক (Yolk stalk) বলে। ইয়োক স্টক সোমাটিক আম্বিলিকাস পরিবৃত থাকে।

কুসুম থলির মধ্যে আবদ্ধ কুসুম হইতে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণ পুষ্টি গ্রহণ করে। কুসুম ব্যবহৃত হওয়ায় কুসুম থলি ক্রমে ক্ষুদ্রাকার হয়। পরিস্ফুরণ সম্পূর্ণ হইবার পর কুসুম থলির সহিত ভ্রূণের অন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ বিলুপ্ত হয়। কুসুম থলি সংকুচিত হইয়া ক্ষুদ্র উপবৃদ্ধির আকারে ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে। পরিশেষে ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত মিলিত হয়।

কুসুম থলির এণ্ডোডার্ম স্তরের কোষ হইতে নিঃসৃত এনজাইম কুসুমের উপর ক্রিয়া করে। ফলে জটিল কুসুম ব্যাপনক্ষম সরল উপাদানে পরিণত হয়। ব্যাপনক্ষম সরল কুসুম উপাদান ভাইটেলাইন শিরাসমূহ (Vitelline veins) দ্বারা সংবাহিত হইয়া ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় এবং হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে ভ্রূণের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

II. অ্যামনিয়ন ও সেরোসা

ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে অ্যামনিয়ন ও সেরোসা একত্রে গঠিত হয়। পাতলা ঝিল্লীর ন্যায় অ্যামনিওন ভ্রূণকে আবৃত রাখে। ভ্রূণ আবরণকারী থলিসদৃশ অ্যামনিয়ন বাহ্য পরিবেশ হইতে ভ্রূণকে রক্ষা করে। ভ্রূণ ও অ্যামনিয়নের অন্তরবর্তী গহ্বরকে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি (Amniotic cavity) বলে। অ্যামনিওটিক গহ্বর লবণ দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ থাকে। উক্ত তরল পদার্থকে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড (Amniotic fluid) বলে।

ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের ওজন বৃদ্ধি পায়। ফলে ভ্রূণটি নরম কুসুমের মধ্যে ক্রমে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং ব্লাস্টোডার্ম ভ্রূণের উপর প্রসারিত হয়। ইনকিউবেশনের 30 ঘণ্টার পর ভ্রূণের মস্তকাংশ সম্মুখভাগে প্রসারিত হইয়া নিম্নের কুসুমের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। ফলে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাঁজের উৎপত্তি হয়। মস্তকাংশের উক্ত ভাঁজকে অ্যামনিওটিক হেড ফোল্ড (Amniotic head fold) বলে। হেড ফোল্ডটি প্রথমে এক্টোডার্ম দ্বারা গঠিত হয় এবং পরে সোমাটিক মেসোডার্ম ভাঁজটির ভিতরে এক্টোডার্মের নিম্নে অবস্থান করে। হেড ফোল্ডটির বৃদ্ধির ফলে ইহা ভ্রূণের মস্তকাঞ্চল আবৃত করিয়া পশ্চাৎদিকে প্রসারিত হইতে থাকে। প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের অগ্র পার্শ্ব হইতে পার্শ্বীয় অ্যামনিওটিক ফোল্ডের (Amniotic lateral folds) উৎপত্তি হয়। পার্শ্বীয় অ্যামনিওটিক ফোল্ড দুইটি ভ্রূণের পৃষ্ঠতলে উত্থিত হইয়া পরস্পর মধ্যরেখা বরাবর মিলিত হয় এবং সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় ভ্রূণটি ক্রমে কুসুমের মধ্যে আংশিক নিমজ্জিত হয়। ইনকিউবেশনের 48 ঘণ্টার পর ভ্রূণের পশ্চাৎপ্রান্ত হইতে অনুরূপ একটি ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং ইহা পশ্চাৎ দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া ভ্রূণকে আবৃত করে। এই ভাঁজটিকে অ্যামনিওটিক টেল ফোল্ড (Amniotic tail fold) বলে। ইনকিউবেশনের চতুর্থ দিনে হেড ফোল্ড ও টেল ফোল্ড ভ্রূণের পৃষ্ঠদেশে পরস্পরকে স্পর্শ করে। পরিশেষে ইহারা মিলিত হইয়া ভ্রূণের উপর ও পার্শ্বে দুইটি আবরণ

সৃষ্টি করে। ভিতরের আবরণটিকে অ্যামনিয়ন ও বাহিরেরটিকে সেরোসা বলে। হেড ও টেল ফোল্ডদ্বয়ের সংযোগস্থলটিকে সেরোঅ্যামনিওটিক যোজক (Seroamniotic connection) বলে।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে অ্যামনিওটিক ভাঁজগুলি দুইটি স্তর দ্বারা গঠিত। বাহিরের স্তরটি এক্টোডার্ম ও ভিতরের স্তরটি মেসোডার্ম। ভাঁজগুলির মিলনের ফলে সৃষ্ট বাহিরের আবরণকে সেরোসা (Serosa) এবং ভিতরের আবরণকে অ্যামনিওন (Amnion) বলে। সেরোসার ক্ষেত্রে এক্টোডার্ম বাহিরে এবং সোমাটিক মেসোডার্ম ভিতরের দিকে অবস্থান করে। কিন্তু অ্যামনিওনের ক্ষেত্রে ইহাদের পারস্পরিক অবস্থান বিপরীত, অর্থাৎ সোমাটিক মেসোডার্ম বাহিরে এবং এক্টোডার্ম ভিতরের দিকে থাকে। সেরোসা ও অ্যামনিওনের মধ্যবর্তী গহ্বরকে ভ্রূণ দেহ বহিঃস্থ বা এক্সট্রা এমব্রায়নিক সিলোম (Extra-embryonic coelom) বলে। প্রায় 15 দিন পরে সেরোসা প্রসারিত হইয়া কুসুম থলিকে আবৃত করিয়া রাখে।

অ্যামনিয়নের কাজ

(1) বাহিরের আঘাত হইতে ভ্রূণকে রক্ষা করে।

(2) অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে ভ্রূণ সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকে। ফলে ভ্রূণটি শুষ্কতা হইতে রক্ষা পায়।

(3) ভ্রূণের চারিপাশে জলীয় বস্তু থাকায় চাপ ভ্রূণের দেহের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হয়।

(4) অ্যামনিয়নের গাত্রে উপস্থিত পেশীর ক্রিয়ার ফলে ভ্রূণটি আন্দোলিত হয়। ফলে ভ্রূণটি অ্যামনিয়ন গাত্রে সংযুক্ত হয় না।

(5) অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের জন্য ঘর্ষণজনিত আঘাত বহুলাংশে হ্রাস পায়।

সেরোসার কাজ

অ্যামনিয়নকে রক্ষা করাই সেরোসার প্রাথমিক কাজ। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে উক্ত স্তরের (কোরিয়ন) বিশেষ অংশ অমরা গঠনে সক্রিয় অংশ নেয়।

ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার সময় অ্যামনিয়ন ও সেরোসা উভয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং ভ্রূণ অবস্থায় ইহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

III. অ্যালানটয়েস

সেরোসার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানটয়েসের সৃষ্টি হয়। অ্যালানটয়েসের প্রকৃতি অন্যান্য ভ্রূণ-ঝিল্লী হইতে ভিন্নরূপ। মুরগীর ক্ষেত্রে অ্যালানটয়েস ইহা ডিম হইতে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইবার পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় না। ইহার কিছু অংশ মূত্রস্থলী গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

ইনকিউবেশনের 72 ঘণ্টা পর মুরগীর ভ্রূণের হাইন্ডগাট হইতে অংকীয় উপবৃদ্ধি আকারে অ্যালানটয়েসের উৎপত্তি হয়। উপবৃদ্ধির গাত্র দ্বিস্তরযুক্ত। ভিতরের

স্তরটি এণ্ডোডার্ম এবং বাহিরের স্তরটি স্প্লাঙ্কনিক মেসোডার্ম। দ্রুতহারে অ্যালানটয়েসের বৃদ্ধি সংঘটিত হওয়ায় ইহা এক্সট্রা-এমব্রায়োনিক সিলোমের মধ্যে এবং কুসুম থলি, অ্যামনিওন ও সেরোসার মধ্যবর্তী গহ্বরে প্রসারিত হয়। অ্যালানটয়েসের মুক্ত প্রান্ত স্ফীত হয় এবং ইহা হাইণ্ডগাটের সহিত একটি সংকীর্ণ অ্যালানটয়িক স্টক (Allantoic slalk) দ্বারা যুক্ত থাকে। পরিস্ফুরণের শেষ দশায় অ্যালানটয়িক স্টক ইয়োক স্টকের সহিত একত্রিত হইয়া আম্বিলিকাল কর্ড (Umbilical cord) গঠন করে। এক জোড়া অ্যালানটয়িক ধমনী (Allantoic artery) এবং এক জোড়া অ্যালানটয়িক শিরা (Allantoic vein) দ্বারা অ্যালানটয়েস ভ্রূণ-ঝিল্লীর রক্ত সংবহনতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত।

অ্যালানটয়েসের ক্রিয়া: অ্যালানটয়েসকে "ভ্রূণ মূত্রস্থলী রূপে" বর্ণনা করা হয়। আংশিকভাবে অ্যালানটয়েস রেচনে অংশ গ্রহণ করে এবং ইহার মধ্যে ইউরিক অ্যাসিড সঞ্চিত থাকে। ভ্রূণের শ্বসনক্রিয়ার সুবিধার্থে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য অ্যালানটয়েস শ্বসনতন্ত্ররূপে কাজ করে। অ্যালবুমিন শোষণে অ্যালানটয়েসের সক্রিয় ভূমিকা আছে। অ্যালানটয়েসে রক্ত সংবহন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ডিম্ব-খোলক (Egg-shell) হইতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম শোষিত হয়। শোষিত ক্যালসিয়াম ভ্রূণের অস্থিগঠনে অংশ নেয়। ডিম্ব খোলকের ক্যালসিয়াম ব্যবহৃত হওয়ায় খোলক ক্রমশ পাতলা হইয়া যায়। ফলে অনায়াসেই খোলক ভাঙ্গিয়া শাবক বাহির সহজসাধ্য হয়।

10.13 অমরা (Placenta)

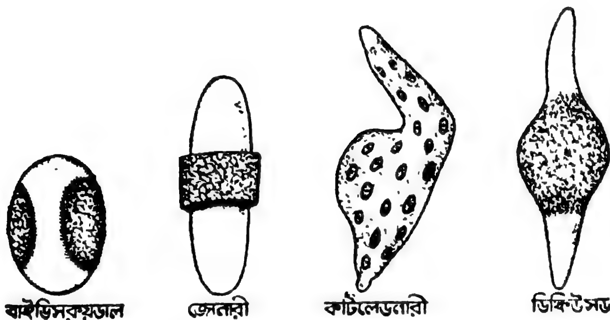
উন্নতস্তরের স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে (যথা : ইউথেরিয়ান ম্যামেল = Eutherian mammal) ভ্রূণ জরায়ু গহ্বরে বর্ধিত হয়। পরিস্ফুরণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভ্রূণ জরায়ুগাত্র সংলগ্ন থাকে। ভ্রূণ ও জরায়ুগাত্র সংযোগকারী। বিশেষ অংশকে প্লাসেণ্টা বা অমরা বলে। প্লাসেণ্টার উৎপত্তির সময় ভ্রূণ কলা ও জরায়ু কলার মধ্যে সহক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফলে ভ্রূণ ও জরায়ু গাত্রের মধ্যে খাদ্য, গ্যাস ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় বিনিময়ের জন্য বিশেষ ধরনের জৈব-সেতু সৃষ্টি হয়। উক্ত জৈব-সেতুর (Organic bridge) নাম প্লাসেণ্টা। মানুষের প্লাসেণ্টা গোলাকার এবং চ্যাপ্টা পিণ্ডবিশেষ। মানুষের প্লাসেণ্টার গঠন হইতে প্লাসেণ্টার নামকরণ হইয়াছে। গ্রীক শব্দ প্লাসেণ্টার অর্থ হইল চ্যাপ্টা কেক (Flat cake)। যে পদ্ধতিতে প্লাসেণ্টার পরিস্ফুরণ হয় তাহাকে সামগ্রিকভাবে **প্লাসেণ্টেশন** (Placentation) বলে।

প্লাসেণ্টার প্রকারভেদ (Types of Placenta)

উৎপত্তি, আকৃতি, গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে প্লাসেণ্টাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্লাসেণ্টার প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

I. ভ্রূণকলার সংযোজনের প্রকৃতি অনুসারে প্লাসেণ্টাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা: (a) **ইয়োক-স্যাক প্লাসেণ্টা** (Yolk-sac placenta) বা কুসুম থলি অমরা এবং (b) **কোরিও-অ্যালানটয়িক প্লাসেণ্টা** (Chorio-allantoic placenta)।

ইয়োক-স্যাক প্লাসেণ্টার ক্ষেত্রে অ্যালানটয়েস আকারে ক্ষুদ্র এবং মধ্যান্ত্র হইতে প্রসারিত সোমাটোপ্লুর কুসুম থলিকে পরিবৃত করে। উক্ত সোমাটোপ্লুর ট্রোফোব্লাস্টকে স্পর্শ করে। ট্রোফোব্লাস্ট স্তর জরায়ু গাত্রের সহিত যুক্ত হইয়া প্লাসেণ্টা সৃষ্টি করে। সংযোগস্থলে কিছু সংখ্যক অভিক্ষেপ বা ভিলাই উৎপন্ন হয়। জরায়ু ও ভ্রূণের মধ্যে রক্ত সংবহনের জন্য ক্রমে জরায়ুগাত্রের আবরকস্তরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফলে জরায়ু গাত্রের কিছু সংখ্যক রক্তবাহ প্লাসেণ্টার মধ্যে প্রবেশ করে। ইয়োক স্যাক প্লাসেণ্টার অপর নাম **কোরিও-ভিটেলাইন প্লাসেণ্টা** (Chorio-vitelline placenta)। কোরিও-অ্যালানটয়িক প্লাসেণ্টার ক্ষেত্রে হাইণ্ডগ্যাট হইতে উত্থিত অ্যালানটয়েস



চিত্র 10.18 ভিলাই গঠন নির্ভর অমরার প্রকারভেদ।

আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। ইহা প্রসারিত হইয়া কোরিয়নের (ট্রোফাব্লাস্ট) সহিত যুক্ত হয়। উভয়ে জরায়ু গাত্রের সহিত সংযোগ স্থাপনে অংশ গ্রহণ করে। সংযোগস্থলে ট্রোফোব্লাস্ট হইতে সৃষ্ট ভিলাই জরায়ুগাত্রে প্রবেশ করে। সংস্থাপনের চরম অবস্থায় ভিলাই ও জরায়ু গাত্রের আবরক কলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং জরায়ু গাত্রের রক্তবাহ ভিলাইয়ের মধ্যে প্রসারিত হয়। শেষোক্ত প্লাসেণ্টা অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় এবং ইহাকে প্রকৃত প্লাসেণ্টারূপে গণ্য করা হয়।

II. ভিলাই এর বিস্তারণের ভিত্তিতে প্লাসেণ্টাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা:

(A) ডিফিউসড প্লাসেণ্টা (Diffused placenta)—যখন ভিলাই-এর সংখ্যা বেশী এবং উহারা সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত থাকে। উদাহরণ: ঘোড়া, লেমুর, তিমি প্রভৃতি।

(B) **কটিলেডনারী প্লাসেণ্টা** (Cotyledonary Placenta)—ইহাতে ভিলাইগুলি কোরিয়নের গাত্রে অসমভাবে বিভিন্ন খণ্ডে (Patch) বিস্তৃত থাকে। একটি খণ্ডকে কটিলেডন (Cotyledon) বলে। উক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই প্রকার প্লাসেণ্টার নামকরণ হইয়াছে (চিত্র 10.18)। উদাহরণ : বিভিন্ন গবাদি পশু, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি।

(C) **জোনারী প্লাসেণ্টা** (Zonary Placenta): ইহাতে ভিলাইগুলি কোরিয়নের মধ্যাঞ্চলে বেল্টের ন্যায় চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। উদাহরণ : কুকুর, বিড়াল, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি।

(D) **ডিস্কয়ডাল প্লাসেণ্টা** (Discoidal Placenta): মানুষ, লাঙ্গুলবিহীন বানর, বাদুড়, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিলাই সর্বত্র বিস্তৃত থাকে। পরিশেষে ভিলাইগুলি জরায়ুগাত্র সংলগ্ন অংশে চাক্তির আকারে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। অবশিষ্ট অঞ্চলের ভিলাইগুলি অবলুপ্ত হইয়া যায়। এই ধরনের চাক্তির সংখ্যা একটি হইলে প্লাসেণ্টাকে **মনো-ডিস্কয়ডাল** (Mono-discoidal) এবং দুইটি চাক্তিযুক্ত প্লাসেণ্টাকে **বাই-ডিস্কয়ডাল** (Bi-discoidal) বলা হয়।

II. জরায়ুগাত্রের সহিত ভিলাই-এর সম্পর্কের ভিত্তিতে প্লাসেণ্টাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা :

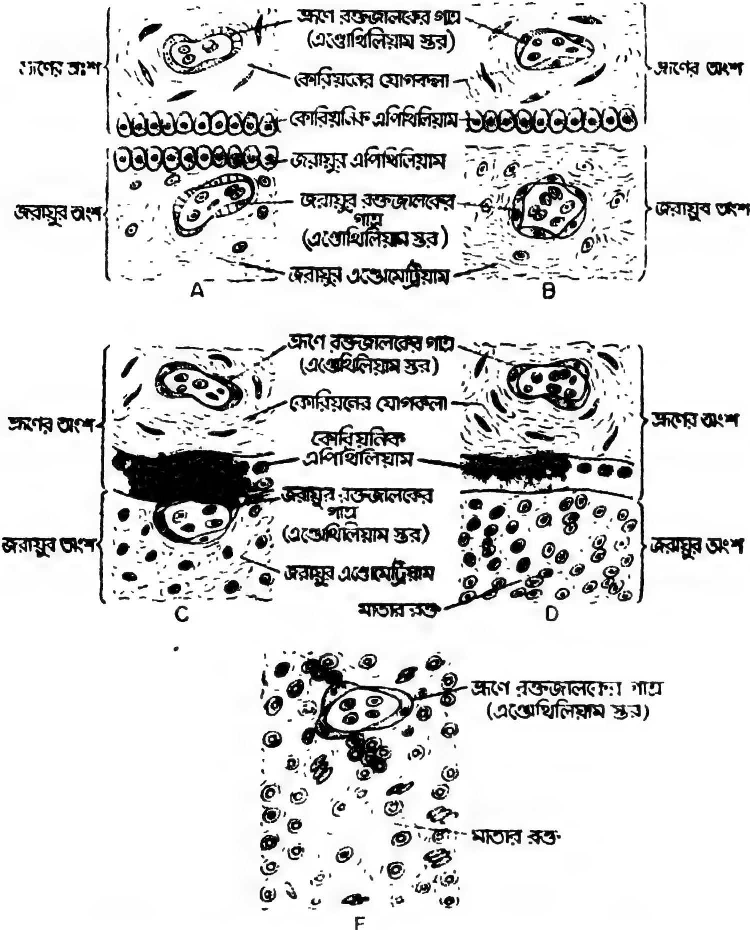
(A) **নন্-ডেসিডুয়েট প্লাসেণ্টা** (Non-deciduate Placenta): এই ধরনের প্লাসেণ্টায় ভিলাইগুলি জরায়ুর গাত্রের সহিত আলগাভাবে যুক্ত থাকে। প্রসবের সময় ভিলাইগুলি জরায়ুগাত্র হইতে বিচ্যুত হয় এবং জরায়ুগাত্রের কোষস্তরের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করে না। ফলে কোনরূপ রক্তক্ষরণ হয় না। উদাহরণ : গবাদি পশু, তিমি প্রভৃতি।

(B) **ডেসিডুয়েট প্লাসেণ্টা** (Deciduate Placenta): এই ধরনের প্লাসেণ্টার ক্ষেত্রে ভিলাইগুলি জরায়ুর গাত্রের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে। ভিলাইগুলি জরায়ুগাত্রের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে প্রসবের সময় জরায়ুগাত্র হইতে প্লাসেণ্টা বিচ্যুত হইবার সময় জরায়ু গাত্রের ক্ষতি হয় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। অধিকাংশ ইউথেরিয়ান স্তন্যপায়ীদের এই ধরনের প্লাসেণ্টা থাকে।

IV. ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার সংযোজনের প্রকৃতি অনুসারে অধুনা প্লাসেণ্টাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা :

(A) **এপিথিলিও-কোরিয়াল প্লাসেণ্টা** (Epithelio-chorial Placenta): এই ধরনের প্লাসেণ্টার ক্ষেত্রে জরায়ুর এপিথিলিয়াম (Uterine epithelium) এবং কোরিয়নিক এপিথিলিয়াম (Chorionic epithelium) উভয়েই অপরিবর্তিত থাকিয়া পরস্পর প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করে (চিত্র 10.19A)। সরল এই প্রকার প্লাসেণ্টা শূকর, ঘোড়া ও কয়েকটি গবাদি পশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

(B) **সিনডেসমো-কোরিয়াল প্লাসেন্টা** (Syndesmo-chorial Placenta): এই ধরনের প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে জরায়ুর এপিথিলিয়াম বিনষ্ট হওয়ায় ভ্রূণের কোরিয়ন প্রত্যক্ষভাবে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সহিত যুক্ত হয়। অন্যান্য কোষস্তর অক্ষত থাকে। উদাহরণ: ভেড়া।



চিত্র 10.19 ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার অংশগ্রহণ-নির্ভর অমরার 5বার ছেদ—এপিথিলিওকোরিয়াল (A), সিনডেসমোকোরিয়াল (B), এন্ডোথিলিওকোরিয়াল (C), হিমোকোরিয়াল (D), হিমোএন্ডোথেলিয়াল (E)।

(C) **এণ্ডোথিলিও কোরিয়াল প্লাসেন্টা** (Endothelio-chorial Placenta). এই প্রকার প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে জরায়ুর এপিথিলিয়াম ও এন্ডোমেট্রিয়াম স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ভ্রূণের কোরিয়নিক এপিথিলিয়াম জরায়ুর রক্তজালকের

এণ্ডোথিলিয়ামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। এই প্রকার প্লাসেণ্টা **ভ্যাসোকোরিয়াল প্লাসেণ্টা** (Vasochorial placenta) নামেও পরিচিত। উদাহরণ : কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি।

(D) হিমোকোরিয়াল প্লাসেণ্টা (Haemochorial Placenta) : উন্নত এই ধরনের প্লাসেণ্টার ক্ষেত্রে জরায়ুর এপিথিলিয়াম, এণ্ডোমেট্রিয়াম ও জরায়ুর রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়ামের বিলুপ্তি হওয়ায় ভ্রূণের কোরিয়ন মাতার রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। উদাহরণ : মানুষ, বাদুড় প্রভৃতি।

(E) হিমোএণ্ডোথিলিয়াল প্লাসেণ্টা (Haemoendothelial Placenta): হিমোকোরিয়াল প্লাসেণ্টার ন্যায় জরায়ুর এপিথিলিয়াম, এণ্ডোমেট্রিয়াম ও জরায়ুর রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াম অবলুপ্ত হয়। জরায়ুর এই সকল কলার অবলুপ্তির সহিত ভ্রূণের বাহিরের এপিথিলিয়াম ক্ষয়িত হয়। ফলে মাতা ও ভ্রূণের রক্ত সংবহনতন্ত্র কেবলমাত্র ভ্রূণের রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াম দ্বারা পৃথক থাকে। উদাহরণ : ইঁদুর, খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদি।

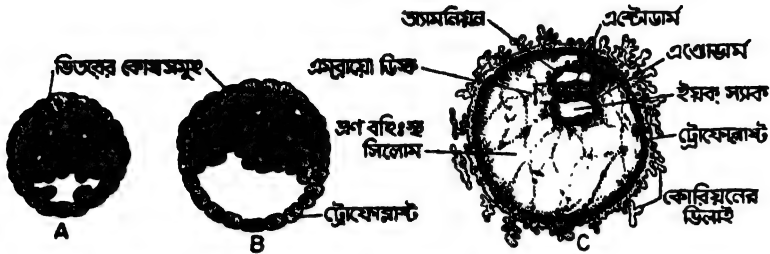
খরগোসের প্লাসেণ্টা (Placenta of Rabbit)

অন্যান্য প্লাসেণ্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীদের ন্যায় খরগোসের প্লাসেণ্টার পরিস্ফুরণকালে ভ্রূণের কোরিয়ন এবং জরায়ুর বিভিন্ন কলার পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমাবস্থায় ভ্রূণের কোরিয়ন স্তর জরায়ুগাত্রের সহিত আলগাভাবে সংযোগ স্থাপন করে এবং উভয় স্তরই অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ প্রথমে খরগোসের প্লাসেণ্টা **এপিথিলিও—কোরিয়াল** ধরনের হয়। ক্রমে সংযোগ স্থাপন গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে। সংযোগ গভীর হইতে থাকিলে জরায়ুগাত্রের এপিথিলিয়াম, এণ্ডোমেট্রিয়াম ও রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াম বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে কোরিয়ন প্রত্যক্ষভাবে মাতৃ রক্ত সংবহনতন্ত্রের সংস্পর্শে আসে (**হিমোকোরিয়াল ধরনের**)। পরিশেষে কোরিয়নের এপিথিলিয়াম ক্ষয়িত হওয়ায় ভ্রূণের রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াম স্তর দ্বারা ভ্রূণ ও মাতার রক্ত পৃথক থাকে। অর্থাৎ খরগোসের প্লাসেণ্টা **হিমোএণ্ডোথিলিয়াল** পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়।

খরগোসের প্লাসেণ্টার পরিস্ফুরণ পর্যালোচনা করিলে স্তন্যপায়ীদের প্লাসেণ্টার অঙ্গসংস্থানিক অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র 10.20 ও 10.22)। ভিলাই-এর সহিত জরায়ুগাত্রের সম্পর্ক ও ভিলাই-এর বিস্তারণের ভিত্তিতে খরগোসের প্লাসেণ্টা যথাক্রমে **ডেসিডুয়েট** (Desiduate) এবং **ডিস্কয়ডাল** (Discoidal) ধরনের। প্রথম অবস্থায় কোরিয়নের সর্বত্র ভিলাই উপস্থিত থাকে। পরে ভিলাইগুলি কেবলমাত্র এক পার্শ্বে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়।

খরগোসের ক্ষেত্রে ভ্রূণ প্রকৃতপক্ষে জরায়ু গাত্রের এণ্ডোমেট্রিয়ামের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। এণ্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে ক্রম অনুপ্রবেশের ফলে জরায়ুগাত্রের শ্লৈষ্মিক স্তর *কোরিয়ন থলির (Chorionic vesicle) উপর প্রসারিত হয়। এণ্ডো-

মেট্রিয়ামের যে অংশ প্রসারিত হইয়া কোরিয়ন থলিকে আবৃত করে তাহাকে **ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস** (Decidua capsularis) বলে। এন্ডোমেট্রিয়ামের অবশিষ্ট অংশকে (অর্থাৎ যে অংশ কোরিয়ন থলিকে আবৃত করে না) **ডেসিডুয়া ভেরা** (Desidua



চিত্র 10.20 নিষেক পরবর্তী প্রথম সপ্তাহে মানুষের অমরা গঠন পদ্ধতি।

vera) বা **ডেসিডুয়া প্যারাইট্যালিস** (Decidua parietalis) বলে। এন্ডোমেট্রিয়ামের যে অংশটুকু কোরিয়ন থলি হইতে সৃষ্ট ভিলাই দ্বারা যুক্ত থাকে তাহাকে **ডেসিডুয়া বেসালিস** (Decidua basalis) বলে।

খরগোসের প্লাসেণ্টা পরিস্ফুরণের ঘটনা

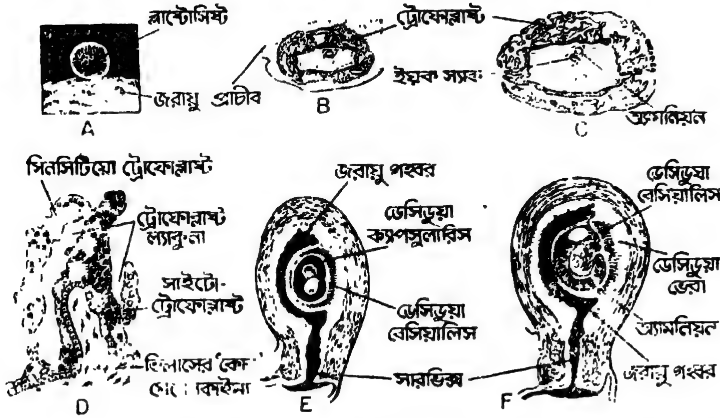
নিষেকের পর খরগোসের ডিম্বাণু অর্থাৎ জাইগোট জরায়ুগাত্রে একটি খাঁজের (Crypt of uterine wall) মধ্যে আটকাইয়া যায়। নিষেকের পরই ডিম্বাণুর চারিপার্শ্বের করোনা রেডিয়েটা হইতে সাবানের ফেনার ন্যায় এক প্রকার বস্তু ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত বস্তুকে **হিস্টোট্রফ** (Histotroph) বলে। হিস্টোট্রফ নিষিক্ত ডিম্বাণুকে পরিবৃত রাখে। প্রথমাবস্থায় ভ্রূণের পরিস্ফুরণের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি হিস্টোট্রফ হইতে গৃহীত হয়। এই ধরনের পুষ্টিকে **হিস্টোট্রফিক নিউট্রিশন** (Histotrophic nutrition) বলে।

হিস্টোট্রফ হইতে পুষ্টি গ্রহণ করিয়া ভ্রূণের পরিস্ফুরণ দ্রুত হারে সংঘটিত হয়। তিনটি প্রাথমিক জারমিনাল স্তরের (যথা : এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) বিভেদের পর জরায়ুগাত্রে তাৎপর্যপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। জরায়ুগাত্রের যে অংশে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণ সংযোগ স্থাপনের জন্য স্পর্শ করে সেই অংশ হইতে রক্তক্ষরণ ঘটে। বিশেষ ধরনের এনজাইমের ক্রিয়ার ফলেই জরায়ুগাত্র ক্ষয় হয়। এই স্থানটিকে "মেটারন্যাল সাইট অফ ইমপ্লানটেশন" (Maternal site of implantation) বলে। এই স্থানটি ক্রমে স্থূল, রক্তজালক সমৃদ্ধ ও স্পঞ্জ সদৃশ হওয়ায় প্লাসেণ্টা সৃষ্টি সহজসাধ্য হয়। জরায়ুর এই অংশের কলাকে **ট্রোফোস্পঞ্জিয়া** (Trophospongia) বলে। প্রথমে সংযোগ স্থাপন খুবই আলগা

---

* **কোরিয়ন থলি** (Chorionic Vesicle)—ভ্রূণ কোরিয়ন স্তর দ্বারা পরিবৃত থাকে। ফলে কোরিয়ন একটি থলির আকার ধারণ করে। ইহাকে কোরিয়ন থলি বা কোরিয়ন ভেসিকল্ বলে।

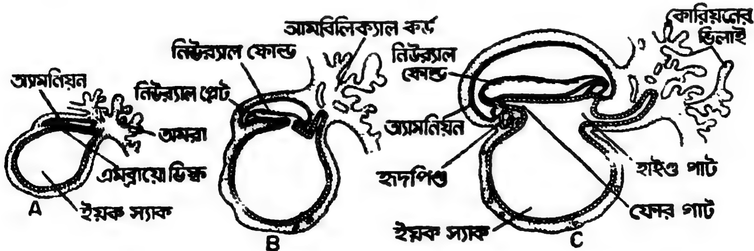
ধরনের হয় এবং পরে কোরিয়ন হইতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম অভিক্ষেপ বা ভিলাই (Villi plural of villus) ট্রোফোস্পঞ্জিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে (চিত্র 10.21)। ফলে সংযোগ গভীরতর হয়। কোরিয়নের যে অংশ প্লাসেন্টা স্থাপনে অংশ গ্রহণ করে সেই অংশের কলাকে সামগ্রিকভাবে ট্রোফোব্লাস্ট (Trophoblast) বলে। প্লাসেন্টার



চিত্র 10.21 মানুষের অমরা গঠন পদ্ধতি—ব্লাস্টোসিস্ট প্রোথিত (A), প্রোথিত হইবার 12 দিন পরে ব্যবচ্ছেদিত অবস্থার (B), 20 দিন পরে (C), গৌণ ভিলাই সৃষ্টি (D), বর্ধনরত ভ্রূণসহ জরায়ু গাত্র (E), জরায়ুর মধ্যে 6 সপ্তাহের ভ্রূণ (F)।

পরিস্ফুরণে ট্রোফোব্লাস্ট ও ট্রোফোস্পঞ্জিয়া পরস্পর নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে (চিত্র 10.23)।

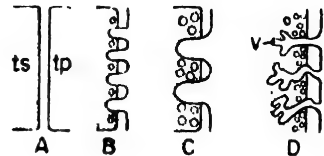
ভ্রূণ পরিবৃত কোরিয়নিক থলির গাত্র হইতে অভিক্ষেপিত ভিলাই জরায়ুগাত্রে প্রবেশ করে। ভিলাইগুলি প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র ট্রোফোব্লাস্ট স্তর দ্বারা গঠিত হয়।



চিত্র 10.22 স্তন্যপায়ীর অমরা গঠন পদ্ধতি – নিষেকের পর হইতে 3 সপ্তাহ পরের অবস্থা।

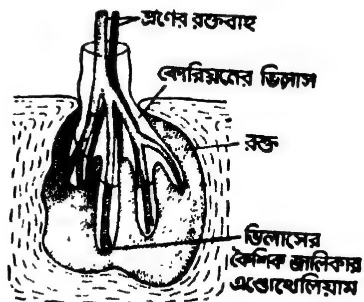
ক্রমে ইহাদের মধ্যে যোগ কলা ও রক্তবাহের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই ধরনের ভিলাই সমূহকে কোরিয়নিক ভিলাই (Chorionic villi) বলে এবং ইহাদের মধ্যে উপস্থিত রক্তবাহ প্রকৃতপক্ষে প্রসারিত অ্যালানটয়িক রক্তবাহ। কোমল কোরিয়নিক ভিলাইগুলি স্পঞ্জ সদৃশ ট্রোফোস্পঞ্জিয়ার গভীরে প্রবেশ করে এবং প্রত্যক্ষভাবে সংযোজিত হয়।

জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হইবার সময় ট্রোফোব্লাস্ট স্তরটির যে অংশ জরায়ুগাত্রের সংস্পর্শে আসে সেই অঞ্চলের কোষগুলি দ্রুত হারে বিভাজন আরম্ভ করে চিত্র 10.23)। ট্রোফোব্লাস্ট দুইটি স্তরে বিভেদিত হয়। ভিতরের দিকের স্তরটির কোষগুলির আণুবীক্ষণিক গঠন অক্ষুন্ন থাকে এবং ইহাকে **সাইটোট্রোফোব্লাস্ট** (Cytotrophoblast) বলে। সাইটোট্রোফোব্লাস্ট হইতে সৃষ্ট কোষসমূহ দ্রুত প্রসারিত হইয়া জরায়ুগাত্রে প্রবেশ করে। বিভাজন ক্রিয়া দ্রুত হারে সংঘটিত হওয়ায় একটি সিন্‌সিটিয়াম (Syncytium) উৎপন্ন হয়। এই স্তরকে সিন্‌সিটিওট্রোফোব্লাস্ট (Syncytiotrophoblast) বলে। সিন্‌সিটিওট্রোফোব্লাস্ট জরায়ুগাত্রে অনুপ্রবেশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সাইটোট্রোফোব্লাস্ট হইতে ক্রম বিভাজন ও সিন্‌সিটিওট্রোফোব্লাস্টের নিউক্লিয়াসসমূহের অ্যামাইটসিস (Amitosis) বিভাজনের ফলেই সিন্‌সিটিওট্রোফোব্লাস্ট প্রসারিত হয়। অনুপ্রবেশকালে সিন্‌সিটিওট্রোফোব্লাস্ট স্তরের মধ্যে অসংখ্য অনিয়ত গহ্বর সৃষ্টি হয়। গহ্বরগুলি **ট্রোফোব্লাস্টিক ল্যাকুনি** (Tropho blastic lacunae) নামে অভিহিত। পরে ট্রোফোব্লাস্টিক ল্যাকুনি পরস্পর মিলিত হইয়া বড় বড় গহ্বরে পরিণত হয় এবং সৃষ্ট গহ্বরগুলিকে **ইন্টারভিলাস স্পেস** (Intervillus .space) বলে।



চিত্র 10.23 অমরা গঠনের সময় ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার মধ্যে ধীরে ধীরে দৃঢ় সংযোগ স্থাপিত হয়—উভয় কলার কাছাকাছি আসা (A), মাতৃকলার ট্রোফোস্পঞ্জিয়া বিদীর্ণ হয় (B), ভিলাই (V) গঠন (C), ও ট্রোফোস্পঞ্জিয়ায় অনুপ্রবেশ (D), ts= ট্রোফোস্পঞ্জিয়া, tp=ট্রোফোব্লাস্ট।

ইন্টারভিলাস স্পেসের অন্তরবর্তী স্থানকে **প্রাথমিক বা প্রাইমারি ভিলাই** (Primary villi) বলে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে সোমাটিক মেসোডার্ম প্রসারিত হয়। মেসোডার্মযুক্ত ভিলাইকে **সেকেন্ডারী ভিলাই** (Secondary villi) বলে। পরিশেষে অভিক্ষেপিত অংশে রক্তবাহের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এবং সেকেন্ডারী ভিলাই-বিভক্ত হইয়া টারসিয়ারী ভিলাই (Tertiary villi)-এ পরিণত হয়। ভিলাইগুলি সরাসরি মাতৃরক্তের সংস্পর্শে আসে এবং মাতৃরক্তে নিমজ্জিত থাকে (চিত্র 10.24)। ট্রোফোস্পঞ্জি অতিমাত্রায় রক্তজালক সমৃদ্ধ হওয়ায় রক্ত সংবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।



চিত্র 10.24 খরগোসের হিমোএন্ডোথেলিয়াল অমরা, কোরিয়নিক এপিথেলিয়ামের অবলুপ্তি ও মাতৃরক্ত পরিবৃত ভিলাই লক্ষণীয়।

প্লাসেণ্টার ক্রিয়া (Functions of Placenta)

প্লাসেণ্টা প্রকৃতপক্ষে ভ্রূণ ও জরায়ুর মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় সেতু উৎপন্ন করে। প্লাসেণ্টার কাজ বহুমুখী, যথা—

(a) ক্রমবর্ধমান ভ্রূণকে জরায়ুর গাত্রের সহিত সংলগ্ন করিতে প্লাসেণ্টা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(b) প্লাসেণ্টার মধ্য দিয়া ভ্রূণ জরায়ুর রক্তস্রোত হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা গ্রহণ করে।

(c) ভ্রূণের রক্তে উপস্থিত রেচন পদার্থ প্লাসেণ্টার মাধ্যমে মাতৃ রক্ত সংবহনতন্ত্রে নিষ্কাশিত হয়। ফলে বিষক্রিয়া হইতে ভ্রূণ রক্ষা পায়।

(d) প্লাসেণ্টার মাধ্যমে শ্বসনের জন্য গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

(e) প্লাসেণ্টা হইতে ইস্ট্রোজেন (Estrogen) এবং প্রোজেস্টেরন (Progesterone) নামক দুইটি হরমোন নিঃসৃত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি ও মাতার স্তনের পরিবর্তনে হরমোন দুইটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(f) মাতৃরক্ত হইতে আগত জীবাণু যাহাতে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য প্লাসেণ্টা প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে। প্লাসেণ্টা প্রকৃতপক্ষে অর্ধভেদ্য পর্দা (Semipermeable membrane) হিসাবে কাজ করে। ভাইরাস ও অ্যাণ্টিজেন প্লাসেণ্টার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

(g) প্লাসেণ্টায় গ্লাইকোজেন, ফ্যাট এবং কয়েকটি অজৈব লবণ সঞ্চিত থাকে।

(h) অনেক স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে প্লাসেণ্টা পুষ্টি যোগায়। প্রসবের পর অনেক স্তন্যপায়ীর স্ত্রী-প্রজাতি খাদ্যরূপে প্লাসেণ্টাকে গ্রহণ করে।

প্লাসেণ্টার মাধ্যমে ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্তন্যপায়ীদের ডিম্বাণুতে (মোনোট্রিম ব্যতীত) কুসুম অনুপস্থিত থাকায় ভ্রূণ জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হয় এবং প্লাসেণ্টার দ্বারা মাতৃরক্ত হইতে ভ্রূণ পুষ্টি গ্রহণ করে। সংযোগ স্থাপিত হইলেও মাতৃরক্ত কখনও ভ্রূণ রক্ত সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে না। প্লাসেণ্টা ইহাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকরূপে (Barrier) অবস্থান করে। শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ হইতে প্লাসেণ্টা অর্ধভেদ্য পর্দারূপে কাজ করে। ইহার মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ উপাদানের পরস্পর আদানপ্রদান ঘটে। ভিটামিন, হরমোন এবং প্রোটিন মাতৃরক্তস্রোত হইতে প্লাসেণ্টা ভেদ করিয়া ভ্রূণের সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে। কয়েকটি রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু ও ভাইরাস প্লাসেণ্টা রূপ প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া ভ্রূণে প্রবেশে সক্ষম।

অনুচ্ছেদ 11

প্রাণিকলা (Animal tissue)

11.1 কলা কাহাকে বলে

বহুকোষী প্রাণীদের (Metazoan animals) দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। দেহ গঠনের একক এই সকল কোষ আলাদা ভাবে জীব দেহের সর্ব-প্রকার জৈব ক্রিয়া সম্পাদনের বিষয়ে স্বনির্ভর নহে। প্রাণীদের জীবনধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য দেহের বিভিন্ন প্রকার কোষ পরস্পরের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। বস্তুত একটি বহুকোষী প্রাণীর প্রয়োজনীয় সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সামগ্রিকভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য এক এক প্রকার কোষ এক বা একাধিক নির্দিষ্ট জৈব ক্রিয়া পরিচালনা করে। ফলে প্রাণিদেহে বিভিন্ন কোষের মধ্যে **কার্যগত শ্রমবিন্যাস** (Division of labour) দৃষ্ট হয়। বিশেষ এক ধরনের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রাণিদেহের বিশেষ প্রকার কোষসমূহের আকৃতি ও গঠনে সাদৃশ্য বর্তমান।

একই উৎস হইতে সৃষ্ট নির্দিষ্ট বা পৃথক আকারবিশিষ্ট কতকগুলি কোষ সংঘবদ্ধ-ভাবে একই ধরনের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সমাধা করিলে সেই কোষের সমষ্টিকে কলা (Tissue) বলে। লাটিন শব্দ Texo (অর্থে—বয়ন করা) হইতে Tissue শব্দটি আসিয়াছে। বিভিন্ন **কলার সমন্বয়ে অঙ্গ (Organ)**, বিভিন্ন **অঙ্গের সমন্বয়ে অঙ্গ-তন্ত্র (Organ system)** এবং বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্রের দ্বারা একটি **স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণিদেহ (Animal body)** গঠিত হয়। সুতরাং প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন সম্বন্ধে সঠিক পরিচিতির জন্য বিভিন্ন কলার আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্য সম্পর্কে জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন।

11.2 প্রাণিকলার প্রকারভেদ (Types of Animal tissue)

প্রাণিদেহের কলাসমূহকে প্রধানত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহারা নিম্নরূপ :

I. **আবরক কলা** (Epithelial tissue)
II. **যোগ কলা** (Connective tissue)
III. **পেশী কলা** (Muscular tissue)
IV. **নার্ভকলা** (Nervous tissue)

I. আবরক কলা

আবরক কলার কোষগুলি দেহের বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে **আচ্ছাদিত রাখিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন স্তর গঠন করে।** এই কলার কোষগুলি পরস্পর **ঘনসন্নিবিষ্ট থাকায় সংযোগকারী অন্তরকোষ স্থান খুব কম থাকে।** আবরক কলা

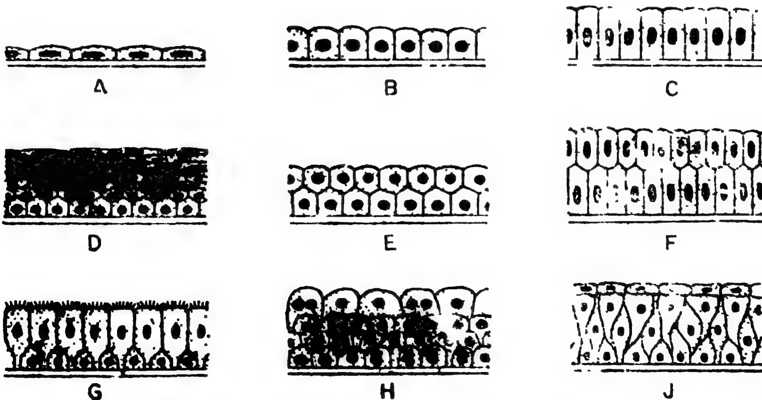
একটিমাত্র কোষস্তরে বিন্যস্ত হইলেও উক্ত স্তরের সকল কোষের একটি প্রান্ত মুক্ত এবং অপর প্রান্তটি একটি সূক্ষ্ম তান্তব ভিত্তিঝিল্লীর (Basement membrane) উপর সজ্জিত থাকে। বহুস্তরে সজ্জিত আবরক কলার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তরের কোষগুলি ভিত্তিঝিল্লী সংলগ্ন থাকে এবং সর্বাপেক্ষা উপরের স্তরের কোষগুলির একপ্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থাকে। ভিত্তিঝিল্লী থাকায় আবরক কলাস্তর নিম্নের অন্যান্য কলাস্তর হইতে পৃথক থাকে। **আবরক কলায় কোন রক্তবাহ বা লসিকা জালক থাকে না।**

ক্ষতিকর বাহ্য ফ্যাক্টর হইতে অন্যান্য কলাকে রক্ষা করা আবরক কলার প্রধান কাজ। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে আবরক কলার কোষগুলি রূপান্তরিত হইয়া বিশেষ ধরনের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে। বিশেষ কাজগুলি নিম্নরূপ : (i) ত্বকের আবরক কলা অভ্যন্তরস্থ কলার কোষগুলিকে **নিরূদন** (Dehydration) হইতে রক্ষা করে। (ii) **শোষণে** (Absorption) অন্ত্রের এবং নেফ্রনের আবরক কলা সহায়তা করে। (iii) স্থানবিশেষে নেফ্রনের আবরক কলা **রেচনে** (Excretion) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। (iv) বিভিন্ন গ্রন্থির আবরক কলা হইতে ক্ষরিত পদার্থ (Secretory products) বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে। (v) **উদ্দীপনা** গ্রহণ (Reception of stimuli) এবং বিভিন্ন পদার্থের পরিবহণ (Transportation) আবরক কলা দ্বারা সাধিত হয়।

আবরক কলার শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Epithelial tissue)

আবরক কলাকে প্রধানত নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় (চিত্র 11.1)—

A. **সরল আবরক কলা** (Simple epithelium)
B. **যৌগ আবরক কলা** (Compound epithelium)
C. **বিশেষ আবরক কলা** (Special epithelium)



চিত্র 11.1 আবরক কলার শ্রেণী বিভাগ—(A) সরল শল্কাকার (B) সরল সমমাত্র, (C) সরল স্তম্ভকাকার, (D) স্তরিত শল্কাকার, (E) স্তরিত সমমাত্র, (F) স্তরিত স্তম্ভকাকার, (G) ছদ্মস্তরিত রোমশ স্তম্ভকাকার, (H, J) স্তরিত ট্রানজিশনাল।

সরল আবরক কলা : এই ধরনের আবরক কলার কোষগুলি একটি স্তরে বিন্যস্ত এবং প্রতিটি কোষ ভিত্তিঝিল্লীর উপরে সজ্জিত থাকে।

যৌগ আবরক কলা : যৌগ আবরক কলার কোষগুলি কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত এবং কেবলমাত্র নিম্নের কোষস্তর ভিত্তিঝিল্লী সংলগ্ন থাকে।

বিশেষ আবরক কলা : আবরক কলা হইতে উৎপন্ন গ্রন্থিকলা ক্ষরণে অংশ গ্রহণ করে এবং দেহের অভ্যন্তরের রাসায়নিক সংযোজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

A. **সরল আবরক কলার প্রকারভেদ** : কোষের আকার অনুসারে সরল আবরক কলাকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

a. **শল্কাকার আবরক কলা** (Pavement or Squamous epithelium) এই ধরনের আবরক কলার কোষগুলি আঁইশের ন্যায় চ্যাপ্টা, অর্থাৎ কোষগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের তুলনায় বেধ খুবই কম। কোষগুলির পরিসীমা অনিয়ত অথবা বহুভুজাকার। ভিত্তিঝিল্লীর উপরে কোষগুলি পাশাপাশিভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া একটি পাতলা অবিচ্ছিন্ন স্তর গঠন করে। ইহাদের মুক্ততল সাধারণতঃ মসৃণ। কোষগুলির কেন্দ্রস্থলটি নিউক্লিয়াসের অবস্থানের জন্য স্ফীত। নিউক্লিয়াসটি ডিম্বাকার অথবা গোলাকার কিন্তু চ্যাপ্টা (চিত্র 11.1A)।

শল্কাকার আবরক কলার উপস্থিতি : ফুসফুসের বায়ুস্থলী (Pulmonary alveoli), বৃক্কের নেফ্রনের বাওম্যান্‌স ক্যাপসুল (Bowman's capsule) এবং হেনলে বর্ণিত লুপে (Loop of Henle), রক্তবাহের অন্তঃআবরণী (Endothelium of blood vessels), হৃৎপিণ্ডের অন্তঃআবরণী, হৃদ্‌ধরা ঝিল্লী (Pericardium) এবং ফুসফুসধরা-কলার (Pleura) অন্তর্গাত্রে শল্কাকার আবরক কলার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

শল্কাকার আবরক কলা বিভিন্ন অঙ্গে একটি পাতলা নিষ্ক্রিয় ঝিল্লী গঠন করে এবং ইহার মাধ্যমে ব্যাপন, অভিস্রবণ, পরিস্রবণ প্রভৃতি ভৌত ক্রিয়াদি সম্পাদিত হয়।

b. **সমমাত্র আবরক কলা** (Cubical epithelium) : এই ধরনের আবরক কলা *সমমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত (চিত্র 11.1B)। সমমাত্র কোষগুলি সাধারণতঃ বহুকোণবিশিষ্ট হয়। এই ধরনের আবরক কলা বৃক্কের সংগ্রাহক নালী, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, থাইরয়েড গ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, ডিম্বাশয়ের জার্মিনাল এপিথিলিয়ামে বর্তমান। সমমাত্র আবরক কলার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া ভিন্নরূপ। ইহা ক্ষরণ, গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ও রক্ষণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। বৃক্কের নেফ্রনের প্রক্সিম্যাল কনভলিউটেড টিবিউলের সমমাত্র কোষগুলি উহাদের মুক্ত কিনারায় অসংখ্য অণুবীক্ষণিক মাইক্রোভিলাই (Microvilli)-এর উপস্থিতির ফলে বুরুশের ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের কোষকে বুরুশ কিনারাযুক্ত সমমাত্র আবরক কলা (Brush-bordered cubical epithelium) বলে। মাইক্রোভিলাই-এর উপস্থিতির ফলে কোষগুলির মুক্তপ্রান্তের

* যে সকল কোষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সমান তাহাদের সমমাত্র কোষ বলে।

শোষণতল (Absorptive surface) বহুলাংশে বর্ধিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় বুরুশ কিনারাযুক্ত সমমাত্র আবরক কলার কোষগুলি শোষণক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে অভিযোজিত।

c. **স্তম্ভকাকার আবরক কলা** (Columnar epithelium) : এই ধরনের আবরক কলার কোষগুলির উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হওয়ায় কোষগুলি স্তম্ভকাকার ধারণ করে (চিত্র 11.1C)। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের, বিশেষ করিয়া মানুষের পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, পাকগ্রন্থি ও আন্ত্রিকগ্রন্থি, পিত্তস্থলীর ভিতরের স্তর, পিত্তনালী, শুক্রনালী ও শ্বসন অঙ্গের কয়েক স্থানে স্তম্ভকাকার কলার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের আন্ত্রিক ভিলাই (Intestinal villi)-এর স্তম্ভকাকার আবরক কলার মুক্ত কিনারা মাইক্রোভিলাই-এর উপস্থিতির ফলে বুরুশের ন্যায় দেখায়। সেইজন্য ইহাদের **বুরুশ কিনারাযুক্ত স্তম্ভকাকার আবরক কলা** (Brush-bordered columnar epithelium) বলে এবং ইহারা খাদ্যসার শোষণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। যে সকল স্তম্ভকাকার আবরক কলা ক্ষরণে সক্ষম (পাকগ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি) তাহাদের সাইটোপ্লাজমে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং গলগি বডি সুগঠিত। শ্বাসনালী ও অন্ত্রের কিছু সংখ্যক স্তম্ভকাকার আবরক কলার কোষ রূপান্তরিত হইয়া পানপাত্রাকার বা গবলেট কোষে (Goblet cells) পরিণত হয়। এই ধরনের বিশেষ কোষ হইতে শ্লেষ্মা (Mucus) নিঃসৃত হয়।

স্তম্ভাকাকার আবরক কলার কোষগুলি নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে। মানুষের স্বাদেন্দ্রিয়, জিহ্বায় অবস্থিত স্বাদ কোরকের অনেকাংশ স্তম্ভকাকার কোষ হইতে বিকশিত হইয়াছে। বাহ্য উদ্দীপনা গ্রহণক্ষম সংবেদনশীল কোষ স্তম্ভকাকার কোষের রূপান্তর মাত্র। প্রতিটি সংবেদনশীল কোষের এক প্রান্তে একটি করিয়া সংবেদনশীল রোম থাকে এবং অপর প্রান্তটি সংজ্ঞাবহ নার্ভ দ্বারা যুক্ত থাকে। এই ধরনের কোষ এককভাবে অথবা গুচ্ছাকারে দেহের অনুভূতিশীল অঙ্গে দৃষ্ট হয়।

d. **রোমশ আবরক কলা** (Ciliated epithelium) : এই ধরনের আবরককলার কোষগুলির মুক্ত প্রান্তের কিনারায় অতি সূক্ষ্ম রোম বা সিলিয়া (Cilia) থাকে। সাধারণত রোমশ আবরক কলার কোষগুলি স্তম্ভকাকার। ক্ষেত্র বিশেষে কোষগুলি সমমাত্র হইতে পারে। সিলিয়াযুক্ত বা রোমশ আবরক কলার উপস্থিতি নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী (Trachea), স্বরযন্ত্র (Larynx), জরায়ু, ফ্যালোপিয়ান নল (Fallopian tube), মস্তিষ্ক গহ্বর (Cerebral ventricles), সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় গহ্বর (Central canal of the spinal cord), শুক্রাশয়ের বহির্বাহী নালিকা প্রভৃতি অংশের অন্তঃস্থ কোষস্তরে দেখা যায়। এই

ধরনের রোমশ কোষের সিলিয়াসমূহের সঞ্চালনের দ্বারা শ্লেষ্মা, ডিম্বাণু, শুক্রাণু ও অন্যান্য উচ্ছিষ্ট বিশেষ দিকে স্থানান্তরিত হইতে পারে। পুংজননতন্ত্রের এপিডিডাইমিসের (Epididymis) আবরক কলার রোমগুলি সঞ্চালনে অক্ষম এবং ইহাদের স্টিরিওসিলিয়া (Stereocilia) বলে। ইহাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নাই।

c. **ছদ্মস্তরিত আবরক কলা** (Pseudostratified epithelium): এই ধরনের আবরক কলা প্রধানত শ্বাসনালী এবং লালাগ্রন্থির নালীতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর কলার কোষগুলি একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিঝিল্লীর উপর এক স্তরে বিন্যস্ত থাকে। কিন্তু কোষগুলির উচ্চতা ভিন্ন হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের একাধিক স্তরে সজ্জিত বলিয়া মনে হয়। ফলে এই আবরক কলাস্তরকে দ্বিস্তরবিশিষ্ট বলিয়া ভ্রম হয়। ভিত্তিঝিল্লীর উপরে সজ্জিত স্তম্ভকাকার কোষগুলি দীর্ঘ। দীর্ঘ কোষগুলির ফাঁকে ফাঁকে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব কোষগুলি একান্তরভাবে ভিত্তিঝিল্লীর গাত্রে সংলগ্ন থাকে অর্থাৎ হ্রস্ব কোষগুলির অপরপ্রান্ত কোষস্তরের বহিঃপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায় না। দুই ধরনের কোষের নিউক্লিয়াসগুলি দুইটি লাইনে সজ্জিত থাকে। লম্বা কোষগুলির কাজ রক্ষণ এবং হ্রস্ব কোষগুলি ক্ষরণ ক্রিয়ায় নিযুক্ত। শ্বাসনালীর অন্তর্গাত্রের লম্বা স্তম্ভকাকার কোষগুলি সিলিয়াযুক্ত এবং হ্রস্ব কোষগুলি শ্লেষ্মা উৎপন্ন করে। সেইজন্য ইহাকে **ছদ্মস্তরিত স্তম্ভকাকার রোমশ আবরক কলা** বলে।

B **যৌগ আবরক কলা** : এই ধরনের আবরক কলার কোষগুলি একাধিক স্তরে বিন্যস্ত। কেবল সর্বনিম্নের কোষস্তরের কোষগুলি ভিত্তিঝিল্লী সংলগ্ন থাকে। অন্যান্য কোষস্তর ভিত্তিঝিল্লীর সংস্পর্শে আসিতে পারে না। যৌগ আবরক কলা মুখ্যত দুই প্রকার, স্তরিত আবরক কলা (Stratified epithelium) এবং পরিবৃত্তীয় আবরক কলা (Transitional epithelium)।

a. **স্তরিত আবরক কলা** : এই শ্রেণীর আবরক কলা কয়েকটি কোষস্তর দ্বারা গঠিত। ভিত্তিঝিল্লী সংলগ্ন ভিতরের কোষস্তরের কোষগুলি স্তম্ভকাকার ধরনের এবং উহারা ভিত্তিঝিল্লীর উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত থাকে। ইহার পরবর্তী কয়েকটি কোষস্তরের কোষগুলি সমমাত্র এবং সূক্ষ্ম প্রোটোপ্লাজম নির্মিত গঠন দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। উপরের কোষস্তরের কোষগুলি আঁইশাকার ধরনের হয়। সেইজন্য স্তরিত আবরক কলাকে প্রকৃতপক্ষে **স্তরিত আঁইশাকার আবরক কলা** (Stratified squamous epithelium) বলে। স্তরিত আঁইশাকার আবরক কলা দুই প্রকার—(i) স্তরিত কেরাটিনযুক্ত আঁইশাকার আবরক কলা এবং (ii) স্তরিত কেরোটিনবিহীন আঁইশাকার আবরক কলা। ত্বক্ ও মুখবিবরে স্তরিত আঁইশাকার আবরক কলার উপরের কোষস্তরের আঁইশাকার কোষগুলি মৃত, কেরোটিন (Keratin) নামক অদ্রবণীয় প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং নিউক্লিয়াস সমেত অন্যান্য কোষ-অঙ্গাণুবিহীন।

কেরাটিন যুক্ত আবরক কলার মধ্য দিয়া জলের আদানপ্রদান হয় না। ফলে ইহা যান্ত্রিক আঘাত হইতে রক্ষা ও নিম্নস্থ কলায় জলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা অর্থাৎ নিরুদনে (Dehydration) সহায়তা করে। গলবিল, অন্ননালী, মুখবিবরের নিম্নাংশ, যোনি, কর্ণিয়া প্রভৃতি অংশের সিক্ত তলে স্তরিত আবরক কলার উপরিস্তরের আঁইশাকার কোষগুলি জীবিত, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং কেরাটিনবিহীন। সেইজন্য ইহাদের **স্তরিত কেরাটিনবিহীন আঁইশাকার আবরক কলা** (Stratified nonkeratinised squamous epithelium) বলে। রক্ষণ এই ধরনের কলার প্রধান কার্য।

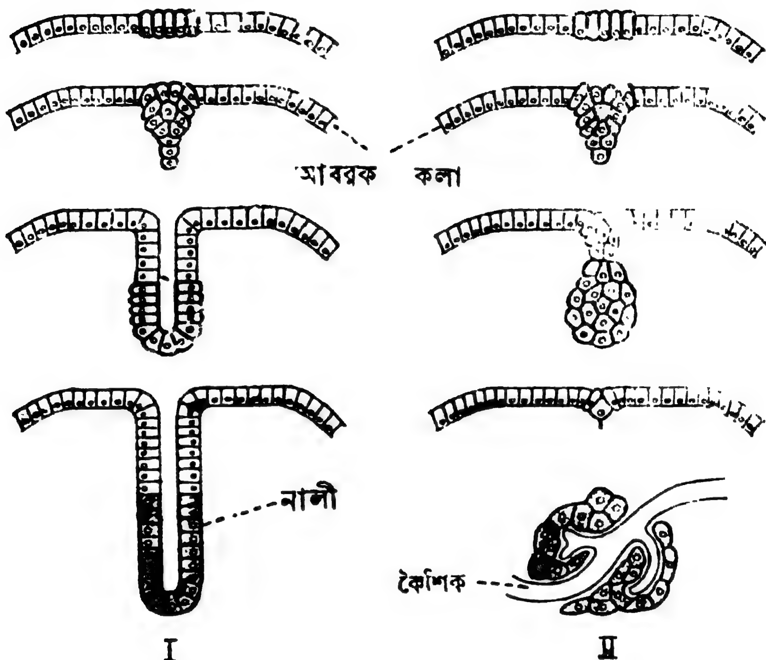
দেহের কয়েক স্থানে, যথা—শ্বাসনালী, কোমল তালু, পুরুষের মূত্রনালী, লালানালী, অগ্ন্যাশয় নালীর অভ্যন্তরের কোষস্তরে আঁইশাকার কোষের পরিবর্তে সমমাত্র অথবা স্তম্ভকাকার আবরক কলা বর্তমান। ইহাদের **স্তরিত সমমাত্র বা স্তম্ভকাকার আবরক কলা** (Stratified cubical or columnar-epithelium) বলে। কখনও উপরের স্তম্ভকাকার কোষ রোমশ হয়। ইহাকে **স্তরিত রোমশ স্তম্ভাকাকার আবরক কলা** (Stratified ciliated columnar epithelium) বলে।

b. **পরিবর্তীয় বা ট্রানজিশনাল আবরক কলা** (Transitional epithelium) : এই ধরনের কলা বৃক্কের পেলভিস অংশে, গবিনী, মূত্রস্থলী ও মূত্রনালীর উপরের অংশের অভ্যন্তরের স্তরে অবস্থিত। গঠনে ইহারা সরল আবরক কলা ও স্তরিত আবরক কলার মাঝামাঝি ধরনের হয়। ভিত্তিঝিল্লীর উপরে সজ্জিত তিন-চারিটি কোষস্তর লইয়া ট্রানজিশনাল আবরক কলা গঠিত। কোষস্তরের কোষগুলির আকার ভিন্নরূপ। ভিত্তিঝিল্লীর সহিত সরাসরি যুক্ত কোষগুলি বহুভুজাকৃতিবিশিষ্ট। ইহার উপরে সজ্জিত এক বা দুই কোষস্তরের কোষগুলি লম্বাটে। ইহাদের পশ্চাৎ প্রান্ত ক্রমশঃ সংকীর্ণ এবং অগ্রপ্রান্ত প্রশস্ত ও গোলাকার। উপরের কোষস্তরের কোষগুলি এক সারিতে সজ্জিত। কোষগুলি আকারে বড়, চ্যাপ্টা ও আয়তাকার। ইহাদের গোড়ার অবতল অংশ নিম্নস্থ লম্বাটে কোষের প্রশস্ত ও গোলাকার অংশের উপর প্রোথিত থাকে। উক্ত কোষস্তরের মধ্য দিয়া জলের অনুপ্রবেশ ঘটে না। ফলে রক্ষণ ছাড়াও এই কলা বর্জ্য দ্রব্য পুনঃশোষণ ও রক্ত এবং কলা হইতে জল শোষণ প্রতিহত করে। ইহার মধ্য দিয়া জল ও অন্যান্য বস্তু যাইতে পারে না বলিয়া মূত্রস্থলী, গবিনী প্রভৃতি হইতে মূত্রের উপাদানগুলি পুনরায় রক্তে শোষিত হইয়া যায় না এবং গাঢ় মূত্রের প্রভাবে চতুষ্পার্শ্বের কলা হইতেও জল শোষিত হইয়া মূত্রে আসিতে পারে না। ইহা ছাড়াও মূত্রস্থলীর অভ্যন্তরের উপরিস্তরের কোষগুলি প্রসারণক্ষম হওয়ায় ইহার মধ্যে মূত্র সঞ্চিত হইতে পারে এবং ইহা আয়তনে বর্ধিত হয়।

c. **গ্রন্থিময় আবরক কলা** : প্রায় সকল জীবিত কোষ হইতেই কোন না কোন বস্তু ক্ষরিত হয়। কয়েক ধরনের কোষ, যথা : গবলেট কোষ (Goblet cells) হইতে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। গ্রন্থি একটি বিশেষ ধরনের অঙ্গ এবং প্রাণীদের

দেহের এই অঙ্গটি রসস্রাবী কোষ দ্বারা গঠিত। গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত রসে উৎসেচক, হরমোন, শ্লেষ্মা, ফ্যাট প্রভৃতি থাকে।

গ্রন্থিগুলি আবরক কলা হইতেই উৎপন্ন হয় (চিত্র 11.2)। পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ গাত্রে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আচ্ছাদন হইতে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থিতে আবরক কলার স্তরটি ক্রমাগত ভাঁজ হওয়ায় গ্রন্থির উৎপত্তি অনুধাবন অস্পষ্ট হইয়া পড়ে।



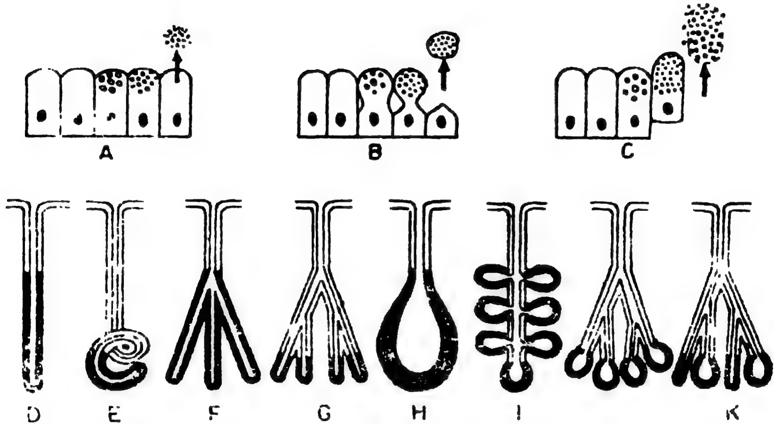
চিত্র 11.2 আবরক কলা হইতে বহিঃস্রাবী (I) ও অন্তঃস্রাবী (II) গ্রন্থির উৎপত্তি।

গ্রন্থির প্রকারভেদ: প্রাণিদেহে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি আছে। কয়েকটি গ্রন্থের নির্দিষ্ট নালী থাকে এবং উক্ত নালীপথে ক্ষরিত বস্তু বাহির হইয়া আসে। এই ধরনের গ্রন্থিকে বহিঃস্রাবী (Exocrine) গ্রন্থি বলে। উদাহরণ: লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ইত্যাদি। অন্য কয়েকটি গ্রন্থির কোন নালী থাকে না। ঐরূপ গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত বস্তু সরাসরি রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। ইহাদের অন্তঃস্রাবী (Endocrine) বা অনাল (Ductless) গ্রন্থি বলে। থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারি প্রভৃতি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। প্রাণিদেহে এমন কয়েকটি নালীযুক্ত গ্রন্থি থাকে যাহারা একই সঙ্গে বহিঃস্রাবী এবং অন্তঃস্রাবী। এই ধরনের গ্রন্থিকে মিশ্র (Mixed) গ্রন্থি বলে। অগ্ন্যাশয় একটি আদর্শ মিশ্র গ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃস্রাবী অংশ হইতে অগ্ন্যাশয় রস এবং অন্তঃস্রাবী অংশ হইতে হরমোন নিঃসৃত হয়।

ক্ষরণের প্রকৃতি অনুসারে প্রাণিদেহের গ্রন্থিকে তিনভাবে বিভক্ত করা হয়, যথা : (i) মেরোক্রাইন (ii) অ্যাপোক্রাইন এবং (iii) হলোক্রাইন গ্রন্থি (চিত্র 11.3)।

মেরোক্রাইন গ্রন্থি (Merocrine gland) : এই ধরনের গ্রন্থি কোষের গলগি বডি হইতে উৎপন্ন বস্তু প্রথমে কোষের মুক্ত প্রান্তের নিকট সঞ্চিত হয়। উক্ত বস্তু কোষ হইতে নিষ্কাশিত হয়। এই ক্ষরণ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থি কোষের সাইটোপ্লাজম বিনষ্ট হয় না এবং কোষের প্লাজমা মেমব্রেণও অক্ষত থাকে। উদাহরণ : লালাগ্রন্থি হইতে লালা ক্ষরণ, অগ্ন্যাশয়ের রসস্রাবী থলিকোষ হইতে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ ইত্যাদি।

অ্যাপোক্রাইন গ্রন্থি (Apocrine gland) : এই শ্রেণীর গ্রন্থি কোষে ক্ষরণকারী পদার্থ প্রারম্ভিক অবস্থায় কোষের মুক্তাগ্রে সঞ্চিত হয়। কোষের নিউক্লিয়াস,



চিত্র 11.3 গ্রন্থির প্রকারভেদ—(A) মেরোক্রাইন, (B) অ্যাপোক্রাইন, (C) হলোক্রাইন, (D) সরল নলাকার, (E) সরল পাক খাওয়া নলাকার, (F) সরল শাখান্বিত নলাকার, (G) যৌগ শাখান্বিত নলাকার, (H) সরল থলি আকার, (I) সরল শাখান্বিত থলির আকার, (J) যৌগ থলির আকার, (R) যৌগ নলাকার থলি সদৃশ।

সাইটোপ্লাজম এবং অন্যান্য কোষ-অঙ্গাণু কোষের অপর প্রান্তে অপসারিত হয়। পরে ক্ষরণ পদার্থ সমেত কোষের মুক্তাগ্র অংশটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত ক্ষরণ পদার্থ সমেত কোষের উক্ত অংশটি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই ধরনের ক্ষরণে কোষের সাইটোপ্লাজমের আংশিক অপচয় ঘটে। পুনরুৎপত্তির ফলে কোষের অবশিষ্ট অংশ হইতে কোষটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় ক্ষরণ ক্রিয়া সুরু করে। উদাহরণ : স্তন্যপায়ীদের স্তন হইতে এই প্রক্রিয়ায় দুগ্ধ নিঃসৃত হয়।

হলোক্রাইন গ্রন্থি (Holocrine gland) : এই ধরনের গ্রন্থির কোষের সর্বত্র ক্ষরণ পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং ক্ষরণের সময় গ্রন্থি কোষটি ধ্বংস হয়। উদাহরণ : স্তন্যপায়ীদের ত্বকের সিবেসিয়াস গ্রন্থি।

বহিঃস্রাবী গ্রন্থির প্রকারভেদ : ক্ষরণকারী অংশের আকৃতি ও নালীর প্রকৃতি অনুসারে বহুকোষী বহিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(i) **সরল নলাকার গ্রন্থি** (Simple tubular gland) : এই ধরনের গ্রন্থিতে রসস্রাবী কোষগুলি একটি শাখাবিহীন ঋজু অথবা প্যাঁচানো নলের ন্যায় নলাকার গ্রন্থি গঠন করে। এই নলাকার গ্রন্থি প্রত্যক্ষভাবে মুক্ততলে উন্মুক্ত হয়। উদাহরণ : ক্ষুদ্রান্ত্রে লিবেরকুন বর্ণিত গহ্বর গ্রন্থি (Crypts of Lieberkuhn) একটি সরল ঋজু নলাকার গ্রন্থিবিশেষ। বড় আকারের স্বেদগ্রন্থি এবং পাকস্থলীর কয়েকটি কার্ডিয়াক গ্রন্থি সরল প্যাঁচানো নলাকার গ্রন্থি।

(ii) **শাখাযুক্ত নলাকার গ্রন্থি** (Branched tubular grand) : এই নলাকার গ্রন্থির অভ্যন্তরের প্রান্তিক অংশ শাখা নলে বিভক্ত হয়। ফলে গ্রন্থিকে শাখান্বিত নলের ন্যায় দেখায়। প্রতিটি শাখা নল অবশ্যই প্রধান বহির্বাহী নলের মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়। উদাহরণ : পাকস্থলীর কয়েকটি পাইলোরিক গ্রন্থি (Pyloric glands)।

(iii) **সরল থলিসদৃশ বা অ্যালভিওলার গ্রন্থি** (Simple alveolar glands) : এই ধরনের গ্রন্থিতে রসস্রাবী আবরক কোষগুলি একটি গহ্বরের চারিপাশে সজ্জিত হইয়া গোলাকার অথবা ফ্লাস্কের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে। উদাহরণ শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি (Mucous gland)।

(iv) **শাখাযুক্ত অ্যালভিওলার গ্রন্থি** (Branched alveolar gland) : এই ধরনের গ্রন্থির নালী অনেকগুলি শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়। ক্ষুদ্রতম শাখানলটি থলির ন্যায় গ্রন্থির সহিত সংযোগ সাধন করে। অনেকগুলি থলি বা অ্যালভিওলাস এই শ্রেণীর গ্রন্থিতে থাকে এবং প্রতিটি অ্যালভিওলাস ক্ষুদ্রতম নলে উন্মুক্ত হয়। ক্ষুদ্রতম নলগুলি পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত স্থূল নলে এবং পরিশেষে একটি বড় সাধারণ নালীতে উন্মুক্ত হয় (চিত্র 11.১)। উদাহরণ : লালাগ্রন্থি, চক্ষুর ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি (Lacrymal gland) এবং অগ্ন্যাশয়ের বহিঃস্রাবী অংশ। এই ধরনের গ্রন্থিকে রেসিমোস গ্রন্থিও (Racemose gland) বলে।

(v) **যৌগ নলাকার অ্যালভিওলার গ্রন্থি** (Compound tubulo-alveolar gland) : এই ধরনের গ্রন্থির নালী অনেকগুলি শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। কয়েকটি শাখানালীর প্রান্তে নলাকার গ্রন্থি এবং অবশিষ্ট শাখানালীর প্রান্তে অ্যালভিওলার গ্রন্থি থাকে। গ্রহণীর ব্রুণার গ্রন্থি (Glands of Brunner in Duodenum), পাকস্থলীর কয়েকটি কার্ডিয়াক গ্রন্থি (Cardiac glands in stomach) ইহার উদাহরণ।

II. যোগকলা

যোগকলা প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে, যথাযোগ্য স্থানে ধরিয়া রাখে এবং ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

যোগকলায় কোষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কোষগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্তর-কোষ পদার্থ বা ধাত্র (Matrix) প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকায় কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। কোষগুলি হইতে নিঃসৃত নানান পদার্থ এই ধাত্রে থাকে। ধাত্রে কোষ ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার প্রোটিননির্মিত তন্তু (Fibres) ছড়াইয়া থাকে। সুতরাং যোগকলা মূলত কোষ, ধাত্র ও তন্তু দ্বারা গঠিত। ধাত্র ও তন্তু প্রকৃতপক্ষে কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। যোগকলার দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা ধাত্রে তন্তুর উপস্থিতির ফলে সম্ভব হয়। কখনও কখনও ধাত্রে নানান ধাতব লবণের অধঃক্ষেপণের ফলে যোগকলা সুদৃঢ়, কঠিন ও নিরেট হয়, যথা : অস্থি। এই ধরনের যোগকলা প্রধানত দেহের ভার বহনে অংশ গ্রহণ করে। অন্যান্য কলার সহিত তুলনা করিলে প্রতিভাত হয় যে যোগকলায় অন্তরকোষ পদার্থ (Intercellular materials) কোষ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে থাকে। যোগকলার ধাত্র গ্লাইকোপ্রোটিন (Glycoproteins) এবং মিউকোপলিস্যাকারাইড (Mucopolysaccharide) দ্বারা গঠিত।

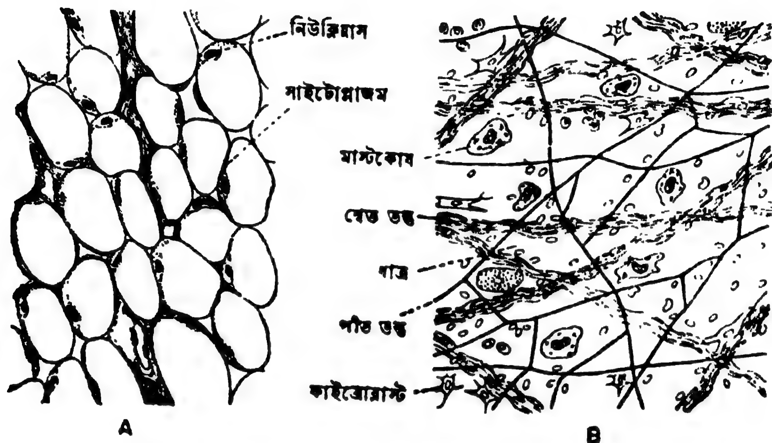
বিভিন্ন কলা ও অঙ্গের যোগসাধন ও দেহের ভারবহন ছাড়াও বিপাকের ফলে উদ্ভূত নানান পদার্থের পরিবহণ, ক্ষত নিরাময় প্রভৃতিতে যোগকলার বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনটি প্রাথমিক জনিত্র কোষস্তরের মধ্যে মেসোডার্ম (Mesoderm) হইতে যোগকলার উৎপত্তি হয়।

যোগকলার প্রকারভেদ (Types of Connective tissue): যোগ কলাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা :

a. অ্যারিওলার কলা (Areolar tissue)
b. অ্যাডিপোজ বা মেদকলা (Adipose tissue)
c. শ্বেত তান্তব কলা (White fibrous tissue)
d. পীত তান্তব কলা (Yellow fibrous tissue)
e. রেটিকুলার বা জালকাকার কলা (Reticular tissue)
f. তরুণাস্থি (Cartilage)
g. অস্থি (Bone)
h. রক্ত (Blood) এবং রক্তোৎপাদক কলা (Haemopoietic tissue)

a. **অ্যারিওলার কলা**: এই ধরনের আলগা যোগকলা প্রধানত ত্বকের নিম্নে, পৌষ্টিক নালীর গাত্রের সাবমিউকাস স্তরে, রক্তবাহের প্রাচীরে, আন্তর অঙ্গের গাত্রে, পেশীসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে, নার্ভের আবরণে থাকে। এরূপ যোগকলার ধাত্র জেলির ন্যায় অর্ধতরল। ধাত্রে কোষ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তন্তুর জাল থাকে (চিত্র 11.4B)। দুই ধরনের তন্তু, যথা : (i) শ্বেত কোলাজেন নির্মিত তন্তু (White collagenous fibres) এবং (ii) পীত স্থিতিস্থাপক তন্তু (Yellow elastic fibres) থাকে। শ্বেত কোলাজেন নির্মিত তন্তু কোলাজেন (Collagen) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলি সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপকতাহীন এবং শাখাবিহীন।

তন্তুগুলিতে গাঢ় ও হালকা অনুপ্রস্থ ছাপ একান্তরভাবে দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি তন্তু একত্রে সমবেত হইয়া গুচ্ছাকারে ধাত্রে বিস্তৃত থাকে। পীত স্থিতিস্থাপক তন্তু ইলাস্‌টিন (Elastin) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলি সূক্ষ্ম, শাখাযুক্ত এবং ইহাদের স্থিতিস্থাপকতা উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অনুপ্রস্থ ছাপ থাকে না। এক একটি স্বতন্ত্র তন্তু ধাত্রের মধ্যে প্রসারিত হইয়া সমগ্র কলার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।



চিত্র 11.4 মেদকলা (A) ও অ্যারিওলার কলার (B) চিত্ররূপ।

তন্তুগুলির মধ্যবর্তী স্থানে কয়েক প্রকার কোষ পরিলক্ষিত হয়। কোষগুলি (i) **ফাইব্রোব্লাস্ট** (Fibroblasts) : আকারে বড়, চ্যাপ্টা ও লম্বাটে এই কোষগুলির আকৃতি অনিয়ত। সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং কোষদেহ হইতে অনেকগুলি সূক্ষ্ম প্রলম্বিত অংশ সৃষ্টি হয়। ক্ষত নিরাময় ও কোলাজেন এবং ইলাস্‌টিন সংশ্লেষে ফাইব্রোব্লাস্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। (ii) **হিস্টিওসাইট** (Histiocytes) : অ্যামিবার ন্যায় অনিয়ত এবং আকারে বড়। ইহাদের ম্যাক্রোফাজেসও (Macrophages) বলে। নিউক্লিয়াসটি অনিয়ত পরিধিবিশিষ্ট। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় হিস্টিওসাইট কোষ কোলয়েড পদার্থ ও অন্যান্য মৃত কোষ এবং কলার অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করে। (iii) **মাস্ট কোষ** (Mast cell) : আকারে বড়, ডিম্বাকার বা গোলাকার এই কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট নিউক্লিয়াস অবস্থিত। সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য সুস্পষ্ট দানা বর্তমান। হেপারিণ, হিস্টামিন ও সেরোটোনিন মাস্ট কোষে সংশ্লেষিত ও সঞ্চিত হয়। (iv) **প্লাজমা কোষ** (Plasma cell) : প্লাজমা কোষগুলি ডিম্বাকার বা গোলাকার এবং দানাযুক্ত। এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পরিবৃত নিউক্লিয়াসটি কোষের এক প্রান্তে অবস্থিত। প্লাজমা কোষগুলি অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে।

অ্যারিওলার কলার প্রধান কার্য দৃঢ়তা প্রদান ও স্থিতিস্থাপকতা। ইহা যান্ত্রিক আঘাত হইতে অঙ্গসমূহকে রক্ষা করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের অতিক্রান্তি রোধ করে। বিভিন্ন কলার সংযোগ সাধন ও ক্ষত সংরোহণে অ্যারিওলার কলার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

ভ্রূণ অবস্থায় আম্বিলিক্যাল কর্ডে (Umbilical cord) এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় চক্ষুর পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে (ভাইট্রাস হিউমার) এক ধরনের জেলিসদৃশ যোগকলা (Jelly-like connective tissue) ও অপরিণত অ্যারিওলার কলা দেখা যায়। ইহার ধাত্রটি সমসত্ত্ব ও তন্তুবিহীন।

b. **অ্যাডিপোজ বা মেদকলা** : এই শ্রেণীর যোগকলার প্রাচুর্য ত্বকের নিম্নে (বিশেষ করিয়া উদর ও গ্রীবায়), দুগ্ধস্রাবী স্তনে, ধারণঝিল্লী (Mesentery), ওমেন্টাম (Omentum), অস্থির মজ্জায়, পেশীতন্তু গুচ্ছের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে, বৃক্ক সান্নিহিত অঞ্চলে, চক্ষুগোলকের চারিপার্শ্বে দেখা যায়। অ্যারিওলার কলার ন্যায় মেদকলার ধাত্রে ফাইব্রোব্লাস্ট, শ্বেত তন্তু ও পীত স্থিতিস্থাপক তন্তুর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার ধাত্রে এক বিশেষ ধরনের ডিম্বাকার, গোলাকার বা বহুকোণবিশিষ্ট কোষ দেখা যায় (চিত্র 11.4A)। ইহাদের সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট সঞ্চিত থাকে। এই কোষগুলিকে **ফ্যাট কোষ** (Fat cells) বলে। প্রারম্ভিক অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে অগণিত ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে ফ্যাটের উদ্ভব হয়। ক্রমে ফ্যাট বিন্দুসমূহ একত্রে মিলিত হইয়া আকারে বড় হয় এবং প্রায় সমগ্র কোষটি অধিকার করে। ফলে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম কোষের একপ্রান্তে সরিয়া যায়। মেদকলা আন্তর অঙ্গকে অভিঘাত (Shock) এবং আঘাত (Injury) হইতে রক্ষা করে। শীতের সময় দেহ হইতে তাপক্ষয় রোধ করিয়া তাপ অন্তরকের (Thermo-insulator) কাজ করে। প্রয়োজনে ফ্যাটের জারণের দ্বারা তাপ উৎপাদিত হয়। তাপ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে **থার্মোজেনেসিস** (Thermogenesis) বলে।

c. **শ্বেত তান্তব কলা** : এই ধরনের যোগকলা কণ্ডরা, বন্ধনী, করোটিক অস্থিসমূহের তান্তব সন্ধিস্থলে, পেরিঅস্টিয়ামে, পেশী পরিবৃত ফ্যাসিয়ায়, বৃক্ক ও লসিকাগ্রন্থির বহিরাবরণে ও মস্তিষ্কের বাহির আচ্ছাদন ডুরা ম্যাটারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার দৃঢ়তা খুবই বেশী কারণ এই কলা মুখ্যত অসংখ্য ঘনসন্নিবিষ্ট সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত কোলাজেন তন্তু দ্বারা গঠিত। কোলাজেন তন্তুগুচ্ছের অন্তরবর্তীস্থানে কয়েকটি ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থাকে। স্থিতিস্থাপকতা অনুপস্থিত হইলেও ইহার সংযোজন ক্ষমতা খুবই দৃঢ়। করোটিক অস্থিসমূহের তান্তব সন্ধিস্থল প্রায় অনড়।

d. **পীত তান্তব কলা** : এই শ্রেণীর কলা প্রধানত ধমনীর গাত্রে, ফুসফুসে, ব্রংকাসে, পৌষ্টিক নালীতে ও বিভিন্ন বন্ধনীতে থাকে। তন্তুগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে উপরি-উক্ত অঙ্গসমূহের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। ধাত্রে অবস্থিত

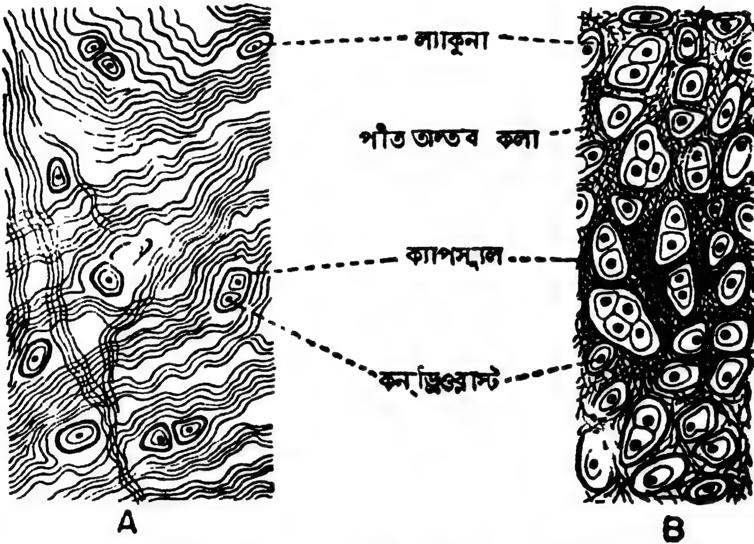
তন্তুগুলি পীত বর্ণের ও শাখাযুক্ত। বিভিন্ন পীত তন্তু হইতে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জালক সৃষ্টি করিতে পারে। তন্তুগুলি স্থিতিস্থাপক হওয়ায় ইহাদের **ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক তন্তু** বলে। ইলাস্টিন নামক প্রোটিন নির্মিত তন্তুগুলি সাধারণত গুচ্ছাকারে থাকে না। তন্তুসমূহের অন্তরবর্তী স্থানে কয়েকটি ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থাকে।

e. **রেটিকুলার কলা** : অ্যারিওলার কলার সহিত এই ধরনের কলার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও রেটিকুলার বা জালকাকার কলার নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। রেটিকুলার কলা প্রধানত প্লীহার স্ট্রোমায়, লসিকা পর্বে, অস্থির মজ্জায়, যকৃৎ এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক স্তরে অন্যান্য কলাকে একত্রে যুক্ত করিয়া রাখে। রেটিকুলার কলার ধাত্রে সূক্ষ্ম ও শাখাযুক্ত তন্তুজালকের প্রাচুর্য দেখা যায়। রেটিকুলার তন্তুর গঠন প্রায় শ্বেত তন্তুর ন্যায় হইলেও ইহারা শাখাযুক্ত এবং পেপ্সিন নামক এনজাইম দ্বারা পাচিত হয় না। কোলাজেন তন্তুর ন্যায় রেটিকুলার তন্তুতে একান্তর গাঢ় ও হালকা ব্যাণ্ড থাকে। তন্তুগুলি **রেটিকুলিন** (Reticulin) নামক এক প্রকার প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ইহাদের সিলভার অক্সাইড দ্বারা রঙ করা সম্ভব বলিয়া ইহাদের **আরজিরোফিল বা রৌপ্যগ্রাহী তন্তু** (Argyrophil fibres) বলে। তন্তুগুলির অন্তরবর্তী স্থানে চ্যাপ্টা শাখাযুক্ত রেটিকুলার কোষ (Reticular cells) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে।

f. **তরুণাস্থি** : এই ধরনের যোগকলার ঘনত্ব বেশী এবং ইহার ধাত্রটি নিরেট এবং ঈষদ্ স্বচ্ছ। ধাত্রটি মিউকোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। ইহাতে কন্ড্রয়টিন সালফেট (Chondroitin sulphates), হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (Hyaluronic acid) এবং অন্যান্য মিউকোপলিস্যাকারাইড (Mucopolysaccharide) বর্তমান। ধাত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুইটি কিংবা ততোধিক তরুণাস্থি কোষ বা কন্ড্রোসাইট (Chondrocytes) একত্রে ল্যাকুনি (Lacunae) নামক গহ্বরে অবস্থান করে। পরিণত কন্ড্রোসাইট আকারে বড়, গোলাকার/ডিম্বাকার/ত্রিকোণাকার কোষবিশেষ। ইহার নিউক্লিয়াসটি ডিম্বাকার অথবা গোলাকার এবং কোষদেহ হইতে ক্ষুদ্রাকার সাইটোপ্লাজমযুক্ত প্রবর্ধিত অংশ দৃষ্ট হয়। ল্যাকুনির আকৃতি ইহাদের মধ্যে আবদ্ধ কন্ড্রোসাইটের আকৃতির উপর নির্ভর করে। সজীব তরুণাস্থি কোষের সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ। তরুণাস্থি কোষের সংখ্যা ও ধাত্রের প্রকৃতি অনুসারে তরুণাস্থিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা : (i) **কাচিক তরুণাস্থি** (Hyaline cartilage), (ii) **শ্বেত তান্তব তরুণাস্থি** (White fibrocartilage) এবং (iii) **পীত স্থিতিস্থাপক তান্তব তরুণাস্থি** (Yellow elastic fibrocartilage)।

(i) **কাচিক তরুণাস্থি** : এই ধরনের তরুণাস্থির ধাত্র ঈষদস্বচ্ছ, মসৃণ এবং নমনীয়। ধাত্রে অবস্থিত কোলাজেন তন্তুসমূহ এতই সূক্ষ্ম যে আপাতদৃষ্টিতে তন্তুবিহীন বলিয়া ভ্রম হয়। ল্যাকুনীতে আবদ্ধ তরুণাস্থি কোষের সমষ্টি

(Cell-nests) ধাত্রের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। কাচিক তরুণাস্থি পেরিকনড্রিয়াম (Perichondrium) নামক এক প্রকার তান্তব আবরণ দ্বারা পরিবৃত থাকে। হিউমেরস, ফিমার প্রভৃতি দীর্ঘ অস্থির প্রান্ত সংলগ্ন এপিফাইসিয়াল তরুণাস্থি (Epiphysial cartilage), দুইটি সন্নিহিত অস্থির সংযোগস্থলে অবস্থিত আর্টিকুলার তরুণাস্থি (Articular carilage), স্টারনামের সহিত পর্শুকার সংযোগস্থানে উপস্থিত কস্টাল তরুণাস্থি (Costal cartilage), নাসিকা, কর্ণকুহর, শ্বাসনালী, ব্রংকাস, স্বরযন্ত্র প্রভৃতিতে কাচিক তরুণাস্থি দেখা যায়। কাচিক তরুণাস্থির নমনীয়তার ফলে সংশ্লিষ্ট দেহাংশ সীমিত সঞ্চালনক্ষম। এবং ইহা দৃঢ়তা প্রদান করে। ফলে ইহাদের অঙ্গ সংস্থানিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে। অস্থি গঠনে এবং অস্থির দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিতে কাচিক তরুণাস্থির সক্রিয় ভূমিকা আছে।



চিত্র 11.5 তরুণাস্থির চিত্ররূপ—(A) তান্তব তরুণাস্থি, (B) স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি।

(ii) **শ্বেত তান্তব তরুণাস্থি**: এইরূপ তরুণাস্থির ধাত্রে প্রচুর পরিমাণ ঘনসন্নিবিষ্ট সমান্তরাল শ্বেততন্তু বর্তমান (চিত্র 11.5A)। তরুণাস্থি কোষ ল্যাকুনি মধ্যে আবদ্ধ তন্তুগুচ্ছের অন্তরবর্তী স্থানে স্বতন্ত্র সারিতে সজ্জিত থাকে। ইহার পেরিকনড্রিয়াম অনুপস্থিত। দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী অন্তর কশেরুকা ফলক বা ইণ্টারভার্টিব্রাল ডিস্কে (Intervertebral dis), জানু সংযোগস্থলে, ম্যান্ডিবলের সন্ধিস্থলে এবং কণ্ডরায় এই ধরনের তরুণাস্থি দেখা যায়। শ্বেত তন্তুর উপস্থিতির ফলে কিঞ্চিৎ নমনীয় হইলেও ইহা যথেষ্ট দৃঢ় ও শক্তিশালী। যে সকল অস্থি-সংযোগস্থলে শ্বেত তান্তব তরুণাস্থি থাকে (যথা : অন্তর কশেরুকা ফলক) সেই অংশে সীমিত সঞ্চালনের মধ্যেও যথেষ্ট দৃঢ়তা বর্তমান।

(iii) **পীত স্থিতিস্থাপক তান্তব তরুণাস্থি** : এই প্রকার তরুণাস্থির ধাত্রের স্থিতিস্থাপক তন্তুর অন্তরবর্তী স্থানে ও ল্যাকুনির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তরুণাস্থি কোষ থাকে (চিত্র 11.5B)। এই ধরনের কলার নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়ই বর্তমান। কর্ণছত্র ও আলজিভে পীত স্থিতিস্থাপক তান্তব তরুণাস্থি দেখা যায়।

g. **অস্থি** : এই শ্রেণীর যোগকলার দ্বারা মেরুদণ্ডীর দেহের অন্তঃকঙ্কাল গঠিত হয়। সকল যোগকলার মধ্যে অস্থি কঠিনতম এবং নিরেট। ধাত্রের মধ্যে বৃহদাকার, চ্যাপ্টা অনিয়ত আকারবিশিষ্ট **অস্থি-কোষ** বা **অস্টিওসাইট** (Osteocytes) অনিয়ত গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। গহ্বরসমূহকে *ল্যাকুনি (Lacunae) বলে। প্রতিটি অস্টিওসাইটে একটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নিউক্লিয়াস এবং অনেকগুলি প্রলম্বিত ও সংকীর্ণ সাইটোপ্লাজম নির্মিত গঠন কোষদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্ম নালিকায় প্রসারিত হয়। প্রতিটি ল্যাকুনা হইতে সূক্ষ্ম নালিকা বা ক্যানালিক্যুলি (Canaliculi) বিস্তৃত হয়। ল্যাকুনি পরিবৃত ধাত্র শ্বেত কোলাজেন তন্তুর জালক ও অনিয়তাকার (Amorphous) সংযোগকারী পদার্থ দ্বারা গঠিত। সংযোগকারী পদার্থে মিউকোপলিস্যাকারাইড (Mucopolysaccharide) এবং মিউকোপ্রোটিন (Mucoprotein) বর্তমান। উপরি-উক্ত পদার্থ ছাড়াও ধাত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের অধঃক্ষেপণ হওয়ায় কঠিন অস্থিস্তর বা †ল্যামেলি (Lamellae) গঠিত হয়।

ঘনত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে অস্থিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা : (i) নিরেট অস্থি বা কম্প্যাক্ট বোন (Compact bone) এবং (ii) স্পঞ্জসদৃশ অস্থি বা স্পঞ্জী (Spongy bone)।

(i) **কমপ্যাক্ট বোন** : এই ধরনের অস্থি উর্বস্থি (Femur) ও প্রগণ্ডাস্থি (Humerus) গঠন করে। কমপ্যাক্ট বোন অনেকগুলি হ্যাভারশিয়ান তন্ত্র (Haversian system) দ্বারা একত্রে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি হ্যাভারশিয়ান তন্ত্রে একটি কেন্দ্রীয় নালী বা হ্যাভারশিয়ান ক্যানেলকে (Haversian canal) কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি চক্রাকারে সজ্জিত ল্যামেলি অবস্থান করে (চিত্র 11.6)। একটি হ্যাভারশিয়ান নালী এবং উহা বেষ্টনকারী 8-15টি ল্যামেলি লইয়া একটি হ্যাভারশিয়ান তন্ত্র গঠিত। হ্যাভারশিয়ান নালী অস্থির দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত এবং ইহা রক্তবাহ, লসিকাবাহ ও নার্ভ বহন করে। প্রতিটি ল্যামেলার তলে এক সারি অস্টিওসাইট পরিবৃত ল্যাকুনি সজ্জিত থাকে। প্রত্যেক ল্যাকুনা হইতে উত্থিত ক্যানালিক্যুলি হ্যাভারশিয়ান নালী ও নিকটবর্তী ল্যাকুনির দিকে প্রসারিত হয়। হ্যাভারশিয়ান তন্ত্রের কোণগুলিতে ও বিভিন্ন হ্যাভারশিয়ান তন্ত্রের অন্তরবর্তী স্থানে কয়েকটি অনিয়তভাবে সজ্জিত ল্যাকুনি যুক্ত ল্যামেলির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

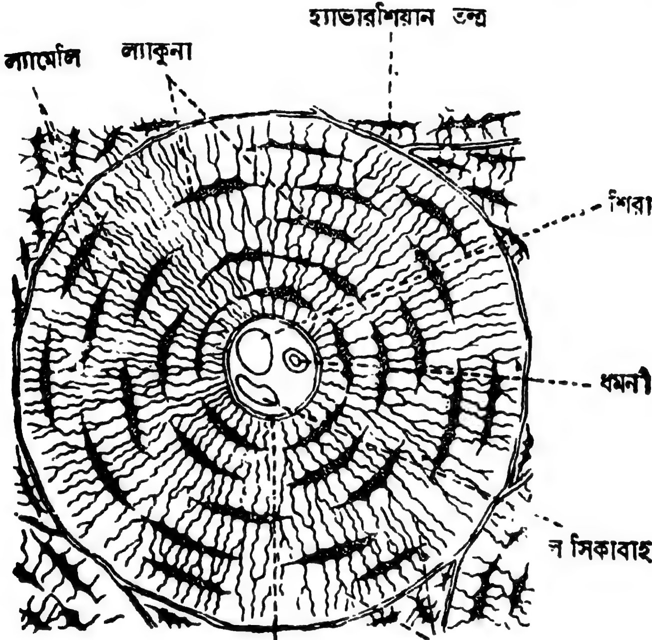
---

* ল্যাকুনি (Lacunae) = বহুবচন ল্যাকুনা (Lacuna) = একবচন

† ল্যামেলি (Lamellae) = বহুবচন ল্যামেলা (Lamella) = একবচন

এই ধরনের ল্যামেলিকে ইণ্টার হ্যাভারশিয়ান ল্যামেলি (Inter Haversian lamellae) বলে। বিভিন্ন হ্যাভারশিয়ান তন্ত্রের হ্যাভারশিয়ান নালীগুলি একত্রে মিলিত হইয়া অস্থির মধ্যস্থলে অবস্থিত মজ্জা গহ্বরে (Bone-marrow cavity) উন্মুক্ত হয়। মজ্জাগহ্বর মজ্জায় পূর্ণ থাকে।

(ii) স্পঞ্জী বোন: চ্যাপ্টা ও অনিয়ত অস্থির অভ্যন্তরে এবং লম্বাটে অস্থির প্রান্তীয় অংশে স্পঞ্জী বোন থাকে। ইহাতে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র অনুপস্থিত থাকে। ইহার ধাত্রে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম এবং ইহাতে অবস্থিত ল্যামেলি অনিয়তভাবে



চিত্র 11.6 অস্থির প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

বিস্তৃত এবং চক্রাকারে সন্নিবিষ্ট নহে। অস্টিওসাইট সমেত ল্যাকুনি ল্যামেলির মধ্যবর্তী অংশে থাকে। এই ধরনের অস্থির অভ্যন্তরে অসংখ্য সূক্ষ্ম ব্যবধায়ক বা সেপ্টাম থাকায় ইহা স্পঞ্জের আকার ধারণ করে।

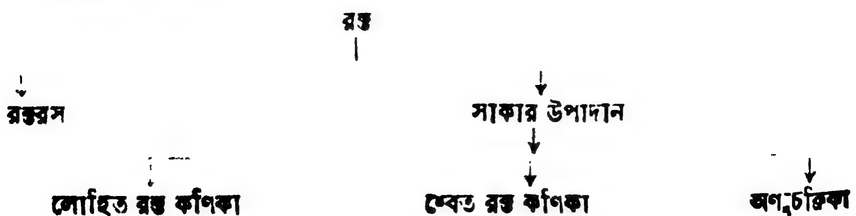
অস্থির ধাত্রে শতকরা 40 ভাগ জৈব পদার্থ ও বাকি 60 ভাগ অজৈব পদার্থ থাকে। জৈব অংশটি কোলাজেন তন্তু এবং অজৈব অংশ প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট (Calcium hydroxy apatite) দ্বারা গঠিত। পেরিঅস্টিয়াম (Periosteum) নামক একটি তান্তব যোগকলা নির্মিত ঝিল্লী দ্বারা সমগ্র অস্থিটি আচ্ছাদিত থাকে। অস্থিতে তিন প্রকার কোষ, যথা: (a) অস্টিওব্লাস্ট (Osteoblast),

(b) অস্টিওসাইট (Osteocyte) এবং (c) অস্টিওক্লাস্ট (Osteoclast) বর্তমান। অস্টিওব্লাস্ট হইতে অস্থির ধাত্র উৎপন্ন হয়। ল্যাকুনার মধ্যে ধাত্রে অবরুদ্ধ অস্টিওব্লাস্টকে অস্টিওসাইট বলে। অনুমান করা হয় যে অনেকগুলি অস্টিওব্লাস্ট একত্রে মিলিত হইয়া অস্টিওক্লাস্ট সৃষ্টি করে। অস্টিওক্লাস্ট কোষ আকারে বেশ বড় এবং প্রতি কোষে প্রায় 20টি নিউক্লিয়াস থাকে। অস্টিওক্লাস্ট হইতে সম্ভবত প্রোটিন পাচনক্ষম উৎসেচক ক্ষরিত হয় এবং ইহার প্রভাবে অস্থির ধাত্র দ্রবীভূত হয়। অস্থির ক্ষয় ও শোষণ অস্টিওক্লাস্টের প্রধান কার্য। ল্যাকুনার মধ্যে প্রলম্বিত শাখাপ্রশাখাযুক্ত অস্টিওসাইট অস্থি গঠন করে। এই ধরনের কোষের প্রলম্বিত অংশগুলি ক্যানালিক্যুলির মধ্যে প্রসারিত থাকে।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে সকল যোগকলার মধ্যে অস্থির দৃঢ়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। ধাত্রে ক্যালসিয়ামের অধঃক্ষেপণের ফলে অস্থির দৃঢ়তা ও কাঠিন্য সম্ভব হইয়াছে। অস্থির দ্বারা দেহের কাঠামো গঠিত হয়। ইহা দেহের ভার বহন করে, কোমল আন্তর অঙ্গের সুদৃঢ় আচ্ছাদন সৃষ্টি করিয়া দেহকে যান্ত্রিক আঘাত হইতে রক্ষা করে. বিভিন্ন ধাতব লবণ. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সঞ্চিত রাখে এবং সর্বোপরি অস্থি মজ্জায় অবস্থিত মজ্জা রক্ত কণিকা উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

রক্ত : মেরুদণ্ডীদের হৃদপিণ্ড ও রক্তবাহের মধ্য দিয়া নিয়ত সংবহনরত লাল বর্ণের তরলপদার্থকে রক্ত বলে। ইহা এক বিশেষ ধরনের যোগকলা। ইহার ধাত্র একটি তরল দ্বারা গঠিত। তরল ধাত্রটির নাম **রক্তরস** (Plasma)। রক্তরসে অগণিত **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত কণিকা** (Blood corpuscles) এবং **অণুচক্রিকা** (Blood platelets) ভাসমান অবস্থায় থাকে। সমগ্র রক্তের শতকরা 55 ভাগ হইল রক্তরস এবং অবশিষ্ট 45 ভাগ রক্ত কণিকা ও অণুচক্রিকা প্রভৃতি **সাকার উপাদান**। রক্ত তঞ্চিত হইবার পর যে পীতাভ রস পড়িয়া থাকে তাহাকে **রক্তমস্তু বা সিরাম** (Serum) এবং অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থকে ক্লট (Clot) বলে। সিরামে তঞ্চনক্ষম রক্তরস প্রোটিন ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন থাকে না। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1,050-1,060, উষ্ণতা 37°C (98°F) এবং সান্দ্রতা জল অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশী। ইহার pH 7·3-7·5। মানুষের দৈহিক ওজনের প্রায় $\frac{1}{11}$ অংশ রক্ত। রক্তের পরিমাণ সুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রে 5-6 লিটার এবং সুস্থ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে 4·5 লিটার।

রক্তের গঠন :



রক্তরস : রক্তরসে শতকরা 91/92 ভাগ জল এবং অবশিষ্ট 9/8 ভাগ দ্রবীভূত পদার্থ বর্তমান। ইহা সামান্য সান্দ্র ও মৃদু ক্ষারধর্মী। সাকার উপাদানগুলি, যথা : রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা রক্তরসে ভাসমান অবস্থায় থাকে। রক্তরসের দ্রবীভূত পদার্থগুলি :

(i) **রক্তরস-প্রোটিন** (Plasma-protein) : রক্তরসে প্রায় 7·5% প্রোটিন থাকে। ইহারা নিম্নরূপ :

প্রি-অ্যালবুমিন (Pre-albumin) = 0·03%, সিরাম অ্যালবুমিন (Serum albumin) = 3-4·5%, সিরাম গ্লোবিউলিন (Serum globulin) = 2·5-3%, ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen) = 0·3-0·5%।

প্রি-অ্যালবুমিনের অণুগুলি ক্ষুদ্রতম এবং ইহাদের গড় আণবিক ওজন 61000। অ্যালবুমিনের অণুগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং গড় আণবিক ওজন 69000। গ্লোবিউলিনের অণু বৃহত্তম। নানা প্রকার গ্লোবিউলিন, যথা : অ্যালফা$_1$ (α_1), অ্যালফা$_2$ (α_2), বিটা$_1$ (β_1), বিটা$_2$ (β_2), গামা (γ) রক্তরসে থাকে। গামা গ্লোবিউলিনের আণবিক ওজন 950000 পর্যন্ত হয়। উপবৃত্তাকার ফাইব্রিনোজেন অণুগুলির গড় আণবিক ওজন 400000। অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনের অণুগুলি গোলাকার। পূর্বেই নির্দেশিত হইয়াছে যে রক্তরস ও রক্তমস্তুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল রক্তমস্তুতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না। গামাগ্লোবিউলিন প্রধানতঃ লসিকাপর্বে, টনসিল, থাইমাস ও প্লীহায় উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন ও ফাইব্রিনোজেন মুখ্যত খাদ্য হইতে শোষিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাহায্যে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়।

(ii) **গ্লুকোজ** (Glucose) : রক্তরসের তথা রক্তের প্রধান শর্করা হইল গ্লুকোজ। ইহার পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় 80-120 মিলিগ্রাম প্রতি 100 মিলিলিটার।

(iii) **ফ্যাট, লিপিড ও স্টেরল** (Fat, Lipid and Sterol) : রক্তরসে প্রায় 0·1-0·15% ট্রাইগ্লিসেরাইড, 0·15-0·26% ফসফোলিপিড (কেফালিন, লেসিথিন প্রভৃতি), 0·1-0·2% মুক্ত এবং এস্টারে আবদ্ধ কোলেস্টেরল এবং 0·01% মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বর্তমান। লিপিডগুলির কিয়দংশ প্রোটিনের সহিত যুক্ত হইয়া লাইপোপ্রোটিন আকারে রক্ত বাহিত হয় এবং রক্তরসে ইহার গাঢ়তা প্রায় 0·4-0·8%।

(iv) **প্রোটিনেতর নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ** (Non-protein nitrogenous substance) : রক্তরসে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়াটিন, ক্রিয়াটিনিন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি প্রোটিনেতর নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তু (NPN) থাকে। প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তরসে ইহাদের পরিমাণ—ইউরিক অ্যাসিড = 3-5 মিলিগ্রাম ; ক্রিয়াটিনিনিন = 0·6-1·2 মিলিগ্রাম এবং ক্রিয়াটিন = 0·2-0·4 মিলিগ্রাম। প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে মোট নাইট্রোজেন ঘটিত প্রোটিনেতর পদার্থের পরিমাণ 25-35 মিলিগ্রাম।

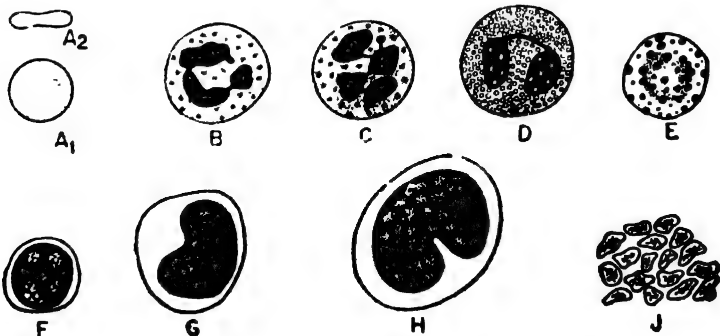
(v) **বিপাকজাত বস্তু, উৎসেচক, হরমোন ভিটামিন** (Metabolic substance, Enzyme, Hormone, Vitamin) : কার্বোহাইড্রেট হইতে সৃষ্ট ল্যাকটিক ও পাইরুভিক অ্যাসিড, ফ্যাটি-অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন কিটোনবর্গীয় বস্তু, হিমোগ্লোবিন বিপাকজাত বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন নামক পিত্তরঙ্গক, বিভিন্ন ভিটামিন, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোন, ফসফাটেজ, লাইপেজ প্রভৃতি উৎসেচক রক্তরসে থাকে।

(vi) **অজৈব লবণ** (Inorganic salts) : সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, তামা, লোহ প্রভৃতির ক্লোরাইড, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, সালফেট, আয়োডাইড প্রভৃতি লবণ রক্তরসে বর্তমান।

(vii) **গ্যাসীয় পদার্থ** (Gaseous substance) : অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অতি অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন রক্তরসে দ্রবীভূত থাকে।

রক্তের সাকার উপাদান : লোহিত রক্ত কণিকা (Red blood corpuscles or Erythrocytes), শ্বেত রক্ত কণিকা (White blood corpuscles or Leucocytes) এবং অণুচক্রিকা (Blood platelets or Thrombocytes) রক্তের তিন প্রকার সাকার উপাদান (চিত্র 11.7)।

লোহিত রক্ত কণিকা (RBC) : লোহিত রক্ত কণিকার অপর নাম এরিথ্রোসাইট। মানুষের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা উভাবতল, বৃত্তাকার এবং নিউক্লিয়াস-বিহীন। মানুষের লোহিত রক্তকণিকা প্রায় 7·5 মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট ও 2 মাইক্রন বেধবিশিষ্ট। সুস্থ মানুষের প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে প্রায় 45-55 লক্ষ লোহিত রক্ত কণিকা থাকে। নারীদেহে পুরুষের তুলনায় লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা কম। শিশুদের রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা মাইক্রোলিটার প্রতি 60-70 লক্ষ এবং ভ্রূণ অবস্থায় উহার সংখ্যা প্রায় 40 লক্ষ। প্রত্যেক লোহিত রক্ত কণিকার ভল্যুম প্রায় ৪7 ফেমটোলিটার এবং ইহার মধ্যে প্রায় 29 পাইকোগ্রাম হিমোগ্লোবিন নামক লোহ ঘটিত রক্তবর্ণ রঙ্গক বর্তমান।



চিত্র 11.7 স্তন্যপায়ীর রক্তকণিকাসমূহ—(A_1) লোহিত রক্ত কণিকা, (A_2) লোহিত রক্ত কণিকার পার্শ্বীয় দৃশ্য, (B-C) নিউট্রোফিল, (D) ইয়োসিনোফিল, (E) বেসোফিল, (F-G) লিম্ফোসাইট, (H) মনোসাইট, (J) অনুচক্রিকা।

মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস, মাইটোকনড্রিয়া ও অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু থাকে না। কিন্তু মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখির লোহিত রক্ত কণিকায় সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে এবং ইহারা উভোত্তল ও ডিম্বাকার। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট ও লামার লোহিত রক্ত কণিকা বৃত্তাকার নহে, বরং ডিম্বাকার।

হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) এক বিশেষ ধরনের রক্তবর্ণের লৌহঘটিত শ্বাস-রঙ্গক। প্রতি 100 মাইক্রোলিটার রক্তে প্রায় 15 মিলিগ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। হিম (Haeme) নামক লৌহ-পরফিরিন যৌগ ও গ্লোবিন (Globin) নামক প্রোটিন মিলিয়া হিমোগ্লোবিন অণু গঠিত (হিম = 4% এবং গ্লোবিন = 96%)।

অক্সিজেন বহন করাই লোহিত রক্ত কণিকার প্রধান কাজ। কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহণেও লোহিত রক্ত কণিকার গুরুত্ব আছে। রক্ত কণিকা ভ্রূণের পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত যকৃত ও প্লীহায় উৎপন্ন হয়। তাহার পর হইতে লোহিত মজ্জায় লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। খাদ্যে লৌহ ও প্রোটিনের উপস্থিতি হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষে অপরিহার্য। ফোলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন B_{12} লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। এরিথ্রোপোয়েটিন (Erythropoietin) নামক রক্তরসে উপস্থিত গ্লাইকোপ্রোটিন লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা প্রদান করে। প্রায় 120/121 দিন রক্তে সংবাহিত হইবার পর পুরাতন লোহিত রক্ত কণিকাগুলিকে প্লীহা, যকৃৎ ও লোহিত মজ্জায় উপস্থিত ম্যাক্রোফ্যাজ জাতীয় কোষগুলি ক্ষণপদের সাহায্যে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাস ও ধ্বংস করে। এই প্রক্রিয়ায় হিমোগ্লোবিন অণু ভাঙ্গিয়া যায় এবং হিমোগ্লোবিন অণুর পরফিরিন অংশের অপচিতির ফলে পিত্তরঙ্গক (যথা : বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন) উৎপন্ন হয়। পরিশেষে পিত্তরঙ্গক পিত্তের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

শ্বেত রক্ত কণিকা (WBC) : শ্বেত রক্ত কণিকার মাপ লোহিত রক্ত কণিকা অপেক্ষা বড়, কিন্তু সংখ্যায় ইহারা অপেক্ষাকৃত কম। প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা প্রায় 6000-8000। রক্তে শ্বেত রক্ত কণিকা ও লোহিত রক্ত কণিকার অনুপাত 1 : 7। ইহাদের অপর নাম লিউকোসাইট (Leucocyte)। লিউকোসাইটের গড় জীবন 12 হইতে 23 দিন। ইহাদের সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন থাকে না, কিন্তু সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস উপস্থিত। সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি, নিউক্লিয়াসের গঠন ও আকৃতির তারতম্যের ভিত্তিতে শ্বেত রক্ত কণিকাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

শ্বেত রক্ত কণিকার প্রকারভেদ : (a) গ্রানুলোসাইট (Granulocyte) : ইহাদের ব্যাস প্রায় 10-12 মাইক্রন এবং নিউক্লিয়াসটি একাধিক পরস্পরযুক্ত খণ্ডে বিভক্ত। সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত দানাগুলি প্রশম, অম্লধর্মী অথবা ক্ষারধর্মী রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত হয়। রঞ্জিত হওয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া গ্রানুলোসাইটকে তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা : (i) নিউট্রোফিল (Neutrophil),

(ii) ইওসিনোফিল (Eosinophil) এবং (iii) বেসোফিল (Basophil)। নিউট্রোফিলের (আয়তন 10 হইতে 12 মাইক্রন) নিউক্লিয়াস 2-7টি খণ্ডযুক্ত এবং ইহাদের সাইটোপ্লাজমের দানাগুলি প্রশম রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত হয়। মানুষের রক্তে শ্বেত রক্ত কণিকার মধ্যে ইহাদের পরিমাণ প্রায় 55-70% এবং জীবনকাল 2-4 দিন। ইওসিনোফিলের (আয়তন 10 হইতে 12 মাইক্রন) নিউক্লিয়াসটি 2-3 খণ্ডযুক্ত এবং ইহার সাইটোপ্লাজমের সুস্পষ্ট দানাগুলি অম্লধর্মী রঞ্জকে (যথা : ইওসিন) রঞ্জিত হয়। ইওসিনোফিলের সংখ্যা মোট শ্বেত রক্ত কণিকার শতকরা 2 হইতে 4 ভাগ। ইহার জীবনকাল 8-12 দিন। বেসোফিলের (আয়তন 8 হইতে 10 মাইক্রন) নিউক্লিয়াস খণ্ডযুক্ত এবং দানাগুলির আকার অপেক্ষাকৃত বড়। বিভিন্ন আকারযুক্ত দানাগুলি ক্ষারধর্মী রঞ্জকের দ্বারা রঞ্জিত হয়। বেসোফিলের সংখ্যা মোট শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যার শতকরা 0·5 হইতে 1 ভাগ। ইহার জীবনকাল 12-15 দিন।

(b) **অ্যাগ্রানুলোসাইট** (Agranulocytes): এই শ্রেণীর শ্বেত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে না। **মোনোসাইট** (Monocyte) এবং **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) অ্যাগ্রানুলোসাইটের অন্তর্ভুক্ত। (i) **মোনোসাইট** : ইহার ব্যাস 16 হইতে 18 মাইক্রন এবং রক্তে ইহাদের সংখ্যা সমগ্র শ্বেত রক্ত কণিকার প্রায় 5-10%। প্রথমাবস্থায় ইহার নিউক্লিয়াস গোলাকার অথবা ডিম্বাকার থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে নিউক্লিয়াসটি বৃক্কের আকার ধারণ করে। (ii) **লিম্ফোসাইট** : ইহারা আকারে দুই প্রকার, যথা : ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট ও বৃহৎ লিম্ফোসাইট। লিম্ফোসাইটের সংখ্যা শতকরা প্রায় 25 হইতে 35। ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট সংখ্যায় বেশী এবং ইহাদের ব্যাস 7 হইতে 8 মাইক্রন। বৃহৎ গোলাকার অথবা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াসটি প্রায় সম্পূর্ণ কোষটিকে জুড়িয়া থাকে এবং কোষের পরিধিতে সংকীর্ণ বলয় সদৃশ সামান্য সাইটোপ্লাজম থাকে। বৃহৎ লিম্ফোসাইটের ব্যাস 12 হইতে 13 মাইক্রন এবং ইহারা সংখ্যায় কম। ইহাদের সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ অধিক। নিউক্লিয়াসটি গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা বৃক্কের আকার ধারণ করে।

লিম্ফোসাইট হইতে রূপান্তরিত প্লাজমা কোষে (Plasma cells) প্রচুর পরিমাণে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে এবং ইহারা গামা গ্লোবিউলিন অণু রক্তে প্রদান করে।

গ্রানুলোসাইটগুলি লোহিত মজ্জায় এবং অ্যাগ্রানুলোসাইটগুলি প্রধানতঃ থাইমাস, লসিকাপর্ব, টনসিল ও প্লীহায় উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ শ্বেত রক্ত কণিকা, যথা : নিউট্রোফিল ও মোনোসাইট অ্যামিবার ন্যায় ক্ষণপদের সাহায্যে চলাফেরা করিতে সক্ষম এবং অনভিপ্রেত বস্তুকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাস করিতে পারে। ইহাদের সামগ্রিক কাজ হইল দেহে প্রবিষ্ট হানিকর জীবাণু ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেহকে রক্ষা করা। জীবাণু ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিমফোসাইট ও প্লাজমা কোষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের দ্বারা সংশ্লেষিত গামা গ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডিরূপে কাজ করিয়া দেহের অনাক্রম্যতা (Immunity) বৃদ্ধি করে।

অণুচক্রিকা : মানুষের রক্তে 2 হইতে 5 মাইক্রন ব্যাস-বিশিষ্ট অসংখ্য নিউক্লিয়াসবিহীন গোলাকার অথবা ডিম্বাকার কোষ দৃষ্ট হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে প্রায় 300000 হইতে 400000 অণুচক্রিকা থাকে। অণুচক্রিকা হইতে নিঃসৃত বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া অণুচক্রিকার সেরোটোনিন ক্ষতস্থানের রক্তবাহকে সংকুচিত করে এবং রক্তপাত বন্ধ করে।

অণুচক্রিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নাই। সম্ভবত ইহা লোহিত মজ্জায় অবস্থিত বিশাল মেগাক্যারিওসাইট (Megakaryocytes) কোষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং রক্তবাহের মধ্যে প্রসারিত ইহাদের ক্ষণপদগুলি রক্তস্রোতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অণুচক্রিকায় পরিণত হয়। অর্থাৎ মেগাক্যারিওসাইট কোষের ক্ষণপদের বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত অংশ হইতে অণুচক্রিকার সৃষ্টি হয়। অণুচক্রিকার আয়ু প্রায় 8-10 দিন।

রক্তোৎপাদক কলা (Haemopoietic tissue)

রক্তোৎপাদক কলা দুই প্রকার, যথা : (a) **মাইলয়েড কলা** (Myeloid tissue) এবং (b) **লিম্ফ্যাটিক কলা** (Lymphatic tissue)।

মাইলয়েড কলা কশেরুকা, দীর্ঘ অস্থির প্রান্ত, করোটি এবং পশুকার অভ্যন্তরস্থ লোহিত মজ্জায় (Red marrow of ribs) থাকে। এই কলা হইতে লোহিত রক্ত কণিকা, গ্রানুলোসাইট ও অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। বিকাশমান লোহিত রক্ত কণিকাগুলির মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকায় এই মজ্জাকে রক্তবর্ণ দেখায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ অস্থিগুলির কেন্দ্রীয় নালীতে যে পীত মজ্জা থাকে তাহা বহু মেদ কোষের উপস্থিতিতে এবং লোহিত কণিকার অবর্তমানে পীতাভ দেখায়।

লিম্ফ্যাটিক কলা প্লীহা, থাইমাস ও লসিকা পর্বে পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয়।

রক্তের কার্য (Functions of Blood) : রক্ত সংবহনতন্ত্রের বাহকরূপে রক্ত নানান শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। প্রধান প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ :

1. **খাদ্যবস্তুর পরিবহণ** (Transport of Nutrients) : অন্ত্র হইতে শোষিত শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফসফোলিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন, লবণ প্রভৃতি ; যকৃত হইতে গ্লুকোজ ও ফসফোলিপিড এবং মেদকলা হইতে ফ্যাটি অ্যাসিড মুখ্যত রক্তরসের মাধ্যমে বিভিন্ন কলায় সংবাহিত হয়। নিম্ন দ্রাব্যতাবিশিষ্ট বস্তুগুলি (যথা : ভিটামিন-A, ক্যারোটিন, ট্রাইগ্লিসেরাইড, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, তামা, লৌহ, দস্তা প্রভৃতি) রক্তরসের অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিনের সহিত যুক্ত হইয়া যৌগের আকারে সংবাহিত হয়। খাদ্যবস্তুর পরিবহণে রক্তরসের ভূমিকাই সর্বাধিক।

2. **গ্যাসের পরিবহণ** (Transport of Gases) : শ্বসনকালে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় হয়। লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের লৌহ অংশের সহিত যুক্ত হইয়া শ্বাসঅঙ্গ হইতে অক্সিজেন কলায় বাহিত হয়। কার্বন-

বিঃ দ্রঃ মানুষকে আদর্শ প্রাণীরূপে ধরিয়া রক্তের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

ডাই-অক্সাইড লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন দ্বারা ও রক্তরসে বাইকার্বোনেটরূপে বাহিত হইয়া বিভিন্ন কলা হইতে শ্বাসঅঙ্গে আসে।

3. **ভিটামিন ও হরমোন পরিবহণ** (Transport of Vitamin and Hormone): রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন ভিটামিন পরিবাহিত হয়। বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত হরমোন রক্ত দ্বারা বাহিত হইয়া ঈপ্সিত (Target) অঙ্গের কলায় পৌঁছাইয়া তাহাদের প্রভাবিত করে। কয়েকটি হরমোন রক্তরসের প্রোটিনের সহিত যুক্ত হইয়া যোগ গঠন করে এবং যোগ আকারে নির্দিষ্ট কলায় আসে।

4. **বর্জপদার্থের পরিবহণ** (Transport of Waste products): বিপাকজাত বিভিন্ন পদার্থ কোষ হইতে রক্তের দ্বারা ভিন্ন অঙ্গের কলায় পৌঁছায়। বিভিন্ন কলায় বিপাকের ফলে উদ্ভূত ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড যকৃতে আরও পরিবর্তনের জন্য বাহিত হয়। বিপাকের ফলে উদ্ভূত বর্জপদার্থগুলি রক্তের মাধ্যমে বৃক্ক, ত্বক্ ও ফুসফুসে আসে এবং তথা হইতে রেচিত হয়।

5. **অনাক্রম্যতা** (Immunity): নিজ দেহ প্রোটিন ব্যতীত অন্য কোন প্রোটিন বস্তু অথবা কোন জীবাণু [সমষ্টিগতভাবে অ্যান্টিজেন (Antigen)] রক্তে প্রবেশ করিলে উহাদের নিষ্ক্রিয় ও বিনষ্ট করিবার জন্য রক্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্বেত রক্ত কণিকাসমূহের মধ্যে নিউট্রোফিল ও মোনোসাইট সরাসরি ক্ষণপদের সাহায্যে জীবাণু গ্রাস ও ধ্বংস করে। লিম্‌ফোসাইট নিঃসৃত গামাগ্লোবিউলিন অণু রক্তরসে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা অ্যান্টিবডি (Antibody) সৃষ্টি করে। অ্যান্টিবডি হানিকর জীবাণু ও তাহাদের অধিবিষ (Toxin) বিনষ্ট করে। ফলে দেহে অনাক্রম্যতার উদ্ভব হয় এবং দেহ সুরক্ষিত হয়।

6. **জলসাম্য রক্ষা** (Maintenance of Water balance): রক্তরস কলারস রূপে কলায় উপযুক্ত পরিমাণে জল রাখিতে সহায়তা করে। রক্তরস হইতে জল, অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড রক্তচাপের প্রভাবে পরিস্রুত হইয়া কলায় প্রবেশ করে। রক্তরসের প্রোটিনঅণুগুলি আয়তনে যথেষ্ট বড় হওয়ায় ইহারা পরিস্রুত হয় না এবং রক্তরসে থাকিয়া যায়। ফলে রক্তরসের প্রোটিনগুলি অভিস্রবণের দ্বারা কলারস হইতে কিছু জলকে শোষণ করিয়া রক্তরসে আনিতে সক্ষম হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে রক্তরস হইতে পরিস্রাবণ ও রক্তরসের প্রোটিনজনিত অভিস্রবণের দ্বারা জলসাম্য রক্ষিত হয়।

7. **অম্ল-ক্ষার সাম্য রক্ষা** (Maintenance of Acid-base balance): রক্তরস ও লোহিত রক্ত কণিকায় উপস্থিত বাফার বস্তুগুলি (Buffer substances) নানান অম্লধর্মী ও ক্ষারধর্মী বস্তুকে প্রশমিত করিয়া দেহে অম্ল ও ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে।

8. **তাপ নিয়ন্ত্রণ** (Temperature regulation): দেহের সর্বত্র রক্ত দ্বারা তাপ ছড়াইয়া যায়। ত্বকের জালকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্ত হইতে বিকিরণ, পরিচলন ও পরিবহণের মাধ্যমে তাপ দেহের বাহিরে যায়। রক্তরস উক্ত ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে এবং দেহে তাপসাম্য রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

9. **রক্ত-তঞ্চন** (Blood-coagulation): ক্ষতস্থান হইতে রক্তপাতকালে আহত কলা হইতে ক্ষরিত থ্রম্বোপ্লাসটিন (Thromboplastin) অনুচক্রিকা হইতে নির্গত কেফালিন ও অন্যান্য রাসায়নিক, রক্তরসের গ্লোবিউলিনবর্গীয় কয়েকটি প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম আয়নের প্রভাবে রক্তরসের প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin) থ্রম্বিনে (Thrombin) পরিণত হয়। থ্রম্বিন রক্তরসের ফাইব্রিনোজেনকে (Fibrinogen) অদ্রাব্য ফাইব্রিনে (Fibrin) রূপান্তরিত করে। ফাইব্রিন জালে রক্তকণিকাগুলি আটকাইয়া গিয়া ক্ষতস্থানে প্রাচীর সৃষ্টি করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়। ইহাকে রক্ত-তঞ্চন বলে। এইভাবে রক্ত-তঞ্চন দ্বারা অত্যধিক রক্তক্ষয় বন্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

10. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of Blood pressure): রক্তের পরিমাণ ও সান্দ্রতা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ব্লাডগ্রুপ (Blood groups)

কোন কারণে মানুষের দেহে রক্তের নির্দিষ্ট পরিমাণ হ্রাস পাইলে বাহির হইতে শিরার মাধ্যমে রক্ত প্রবেশ করানো প্রয়োজন হয়। বাহির হইতে দেহের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ত প্রবেশ করানোকে **ব্লাড ট্রান্সফিউশন** (Blood transfusion) বলে। দেহে কোন ব্যক্তির রক্ত প্রবেশ করাইবার পূর্বে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের শ্রেণী পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের রক্তকে প্রধানতঃ চারিটি, শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা —'A', 'B', 'AB এবং 'O'।

দেহ প্রোটিন ছাড়া অন্য কোন প্রোটিন (অ্যান্টিজেন) রক্তে প্রবেশ করিলে যে পদার্থের উদ্ভব হয় তাহাকে **অ্যান্টিবডি** বলে। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন (Antigen) এবং রক্তরসে অ্যান্টিবডি (Antibody) থাকে।

রক্তের শ্রেণী	অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি
A	A	b
	B	a
AB	A এবং B	অনুপস্থিত
O	অনুপস্থিত	a এবং b

AB শ্রেণীর রক্তযুক্ত ব্যক্তিকে সকল শ্রেণীর রক্ত দেওয়া যাইতে পারে, কারণ ইহাদের রক্তে অ্যান্টিবডি অনুপস্থিত। ইহাদের **সর্বজনীন গ্রহীতা** (Universal recipient) বলে। অপরপক্ষে 'O' শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তিকে **সর্বজনীন দাতা** (Universal donor) বলে, কারণ ইহাদের রক্তে অ্যান্টিজেন থাকে না।

কিন্তু Rh- ফ্যাক্টর আবিষ্কারের পর সর্বজনীন দাতা ও গ্রহীতার সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। রিসাস ফ্যাকটর (Rhesus Factor or Rh Factor) নামক এক প্রকার অ্যান্টিজেন মানুষের লোহিত কণিকায় পাওয়া যায়। কিন্তু

ইহাদের রক্তরসে কোন অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় না। অধিকাংশ মানুষের রক্তে (প্রায় 85%) Rh-factor বর্তমান (Rh-positive) এবং বাকী 15% মানুষের রক্তে Rh-factor অনুপস্থিত (Rh-negative)।

Rh-negative বিশিষ্ট রক্ত Rh-positive ব্যক্তির কোন ক্ষতি করে না। Rh-positive রক্ত Rh-negative রক্তবিশিষ্ট মানুষের দেহে প্রবেশ করাইলে 12 দিনের মধ্যে Rh-বিরোধী অ্যান্টিবডি রক্তরসে সৃষ্টি হয়। উক্ত ব্যক্তির দেহে দ্বিতীয়বার Rh-positive রক্ত প্রবেশ করাইলে লোহিত রক্ত কণিকা জমাট বাঁধিয়া হিমোলাইসিস (Haemolysis) ঘটায়। সুতরাং ব্লাড ট্রান্সফিউশনের পূর্বে রক্তের শ্রেণী ও Rh-factor পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

III. পেশীকলা:

মেসোডার্ম হইতে উৎপন্ন পেশীকলা কণ্ডরার দ্বারা অস্থির সহিত যুক্ত হয়। ইহারা হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে, রক্তবাহের গাত্রে, বিভিন্ন আন্তর অঙ্গে এবং পৌষ্টিক নালী, চক্ষু এবং দেহের অন্যান্য অংশে বর্তমান। সর্বত্রই পেশীকলার কাজ সঞ্চালন। পেশীকলা অসংখ্য সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ পেশীকোষ বা পেশীতন্তু (Muscle fibres) লইয়া গঠিত। প্রতি পেশীতন্তুতে একটি অথবা অনেকগুলি নিউক্লিয়াস থাকে।



চিত্র 11.8 বিভিন্ন প্রকার পেশীকলা ও উহাদের সংস্থাপনা।

পেশীতন্তুগুলি সংকোচনক্ষম। পেশীকলায় কোন উত্তেজক প্রয়োগ করিলে পেশী-তন্তুগুলি সংকুচিত হয়। ফলে সমগ্র পেশীটিও সংকুচিত হয়। উত্তেজকের প্রভাব অপসারিত হইলে পেশীতন্তুগুলি পুনরায় শিথিল ও প্রসারিত হয়। পেশীকলার সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারাই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সংঘটিত হয়। অস্থিসংলগ্ন পেশীসমূহের সংকোচন-প্রসারণের ফলে আমরা স্থানান্তরে গমন করিতে পারি।

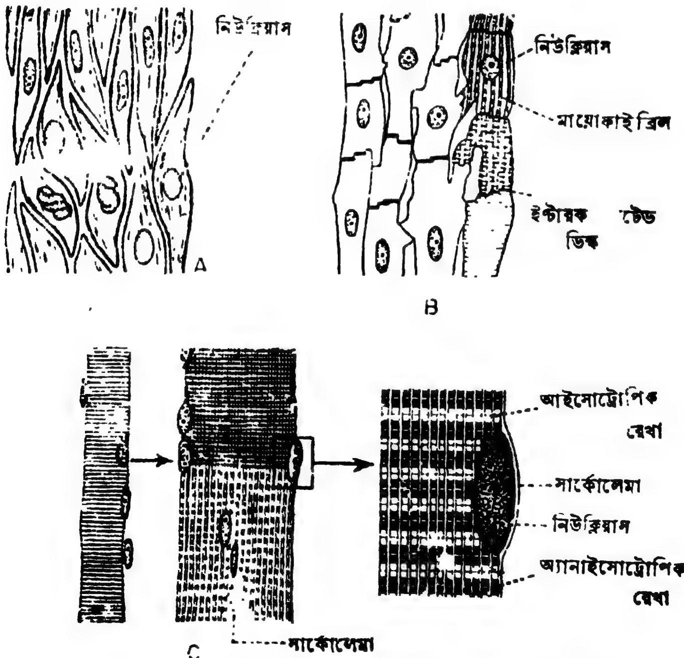
গঠন, অবস্থান ও কার্যের তারতম্যের ভিত্তিতে পেশীকলাকে তিন শ্রেণীতে (চিত্র 11.8) ভাগ করা হয়, যথা :

1. **সরেখ পেশী** (Striated muscle)
2. **অরেখ পেশী** (Non-striated muscle)
3. **হৃৎপেশী** (Cardiac muscle)

1. **সরেখ পেশী** : এই ধরনের পেশী মুখ্যত অন্তঃকংকালের অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে, সেইজন্য ইহাদের **স্কেলিটাল বা কংকাল পেশী** (Skeletal muscle) বলে। কিন্তু স্থান বিশেষে, যথা : অন্ননালীর প্রথম অংশে সরেখ পেশী অস্থিসংলগ্ন থাকে না। সরেখ পেশীর ক্রিয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে, সেইজন্য এই ধরনের পেশীর অপর নাম **ঐচ্ছিক পেশী** (Voluntary muscle)।

সরেখ পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে গমন, চলন ও অঙ্গের সঞ্চালন সম্ভব হয়। ইহারা দেহ ভঙ্গিমা ও দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সক্রিয় অংশ নেয়। এই ধরনের পেশীর ক্রিয়া ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিয়া উপরি-উক্ত কার্যগুলি সম্পন্ন করা যায়।

সরেখ পেশী অনেকগুলি প্রলম্বিত, নিরেট ও সূক্ষ্ম দণ্ড সদৃশ পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। প্রতিটি পেশীতন্তু বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বেলনাকার কোষ বিশেষ (চিত্র 11.9C)। পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য প্রায় 1-40 মিলিমিটার এবং ব্যাস 30-80 মাইক্রন। ইহা



চিত্র 11.9 বিভিন্ন প্রকার পেশীকলার বর্ধিত চিত্ররূপ—(A) অরেখ পেশী, (B) হৃৎপেশী, (C) সরেখ পেশী।

প্রোটোপ্লাজম নির্মিত এক বিশেষ ধরনের আবরণী দ্বারা পরিবৃত থাকে। এই আবরণীকে সার্কোলেমা (Sarcolemma) বলে। প্রতি সরেখ পেশীতন্তুতে অনুপ্রস্থভাবে, প্রায় সমব্যবধানে এবং পালাক্রমে সজ্জিত অনচ্ছ ও স্বচ্ছ রেখা বিদ্যমান। নিউক্লিয়াসগুলি ডিম্বাকার এবং পেশীতন্তুর পার্শ্বঅঞ্চলে ঠিক সার্কোলেমার নিম্নে অবস্থিত। সার্কোলেমা পরিবৃত অনেকগুলি সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমান্তরালভাবে সজ্জিত তন্তু সার্কোপ্লাজম (Sarcoplasm) নামক তরল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থান করে। তন্তুগুলিকে মায়োফাইব্রিল (Myofibril) বলে। পেশীতন্তুর ন্যায় মায়োফাইব্রিলেও অনুপ্রস্থ অনচ্ছ ও স্বচ্ছ রেখা বিদ্যমান। অনচ্ছ রেখাকে অ্যানাইসোট্রোপিক বা এ ব্যাণ্ড (Anisotropic or A Band) এবং স্বচ্ছ রেখাকে আইসোট্রোপিক বা আই ব্যাণ্ড (Isotropic or I Band) বলে। মায়োফাইব্রিলে পালাক্রমে সজ্জিত অনচ্ছ ও স্বচ্ছ রেখাগুলি মুখ্যত পেশী প্রোটিনের উপস্থিতির ফলশ্রুতি। অনচ্ছ রেখাঞ্চলে স্থূল অনুদৈর্ঘ্য মায়োসিন (Myosin) নামক পেশী প্রোটিনের উপস্থিতির জন্য এ-ব্যাণ্ডের সৃষ্টি হয়। স্বচ্ছ রেখাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অ্যাক্টিন (Actin) নামক পেশী প্রোটিনের জন্যই আই-ব্যাণ্ড দৃষ্ট হয়। মায়োফাইব্রিলের আই-ব্যাণ্ডের কেন্দ্রে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি সূক্ষ্ম অনচ্ছ রেখা থাকে। ইহাকে জেড-লাইন (Z line) বলে। একটি জেড-লাইন হইতে পরবর্তী জেড-লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে সার্কোমিয়ার (Sarcomere) বলে। প্রতিটি সার্কোমিয়ার সমগ্র মায়োফাইব্রিলের ক্রিয়াগত এককরূপে (Functional unit) কাজ করে। সার্কোমিয়ারে জেড-লাইন হইতে উত্থিত সূক্ষ্ম অ্যাক্টিন ফিলামেণ্ট অপর সার্কোমিয়ারের আই-ব্যাণ্ডের মধ্য দিয়া এ-ব্যাণ্ডে প্রসারিত হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। পরিসমাপ্তিস্থানে অ্যাক্টিন ফিলামেণ্ট কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখে। ফলে এ-ব্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে কেবলমাত্র স্থূল মায়োসিন ফিলামেণ্ট উপস্থিত থাকে এবং দুই কিনারায় অ্যাক্টিন ফিলামেণ্টগুলি মায়োসিন ফিলামেণ্টের সহিত যুক্ত হয়। ইহার জন্যই এ-ব্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থল কিঞ্চিৎ হালকা দেখায়। এ-ব্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত হালকা কেন্দ্রীয় অংশকে এইচ-ব্যাণ্ড (H Band) বলে। এইচ-ব্যাণ্ডের কেন্দ্রে একটি সূক্ষ্ম অনচ্ছ এম-লাইন (M line) বর্তমান। এ-ব্যাণ্ডে মায়োসিন ফিলামেণ্টগুলির সংযুক্তির ফলেই এম-লাইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

সরেখ পেশীর মায়োফাইব্রিলের অন্তর্বর্তী সার্কোপ্লাজমে অসংখ্য প্রলম্বিত মাইটোকনড্রিয়া [সার্কোসোম (Sarcosome)] থাকে। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল থলি ও নলের ন্যায় প্রণালিকা সমৃদ্ধ জটিল ঝিল্লীময় আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। ঝিল্লীময় জালকাকার গঠনগুলি প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরিত এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ইহাদের সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Sarcoplasmic reticulum) বলে। সরেখ পেশীতন্তুর সার্কোলেমা হইতে কতকগুলি সূক্ষ্ম নলের ন্যায় টি-টিবিউল (T tubule) সার্কোপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে। সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রতিটি মায়োফাইব্রিলে সছিদ্র পর্দার ন্যায়। টি-টিবিউলগুলি ইহাদের সহিত যুক্ত।

অনেকগুলি পেশীতন্তু **পেরিমাইসিয়াম** (Perimysium) নামক যোগকলা নির্মিত আবরণী দ্বারা গুচ্ছিত অবস্থায় থাকে। পেশীতন্তুর এই গুচ্ছকে **ফ্যাসিকিউলাস** (Fasciculus) বলে। একটি পেশীতে অনেকগুলি পেশীতন্তু থাকে এবং সমগ্র পেশীটি **এপিমাইসিয়াম** (Epimysium) দ্বারা পরিবৃত হয়।

2. **অরেখ পেশী** : এই ধরনের পেশী রক্তবাহের প্রাচীরে, আন্তর অঙ্গে, পৌষ্টিক নালীতে, চক্ষুর আইরিসে এবং সিলিয়ারি পেশীতে বর্তমান। এই ধরনের পেশীকলায় অনুপ্রস্থ রেখা অনুপস্থিত থাকায় ইহাদের **অরেখ পেশী** (Non-striated muscle) বা মসৃণ পেশী (Smooth muscle) বলে (চিত্র 11.9A)। ইহাদের কার্য প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না বলিয়া ইহাদের **অনৈচ্ছিক পেশী** (Involuntary muscle) বলে।

অসংখ্য লম্বাটে মাকুর আকার বিশিষ্ট পেশীতন্তুর সমন্বয়ে অরেখ পেশী গঠিত। প্রতিটি পেশীতন্তুর দুই প্রান্ত সরু, কিন্তু মধ্যস্থলটি স্থূল। পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য প্রায় 15 হইতে 300 মাইক্রন এবং কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র ডিম্বাকার বা প্রলম্বিত নিউক্লিয়াস থাকে। প্রতিটি পেশীতন্তু খুব সূক্ষ্ম সার্কোলেমা দ্বারা আবৃত এবং ইহার সাইটোপ্লাজমে অনেকগুলি অতি সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় মায়োফাইব্রিল দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। মায়োফাইব্রিলগুলি অর্ধতরল সার্কোপ্লাজমে অবস্থান করে। সমসত্ত্বতা ও গ্লাইকোজেনের প্রাধান্যই সার্কোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য। দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত মায়োফাইব্রিলের উপস্থিতির জন্য পেশীতন্তুতে অস্পষ্ট অনুদৈর্ঘ্য রেখা দেখা যায়। প্রতি মায়োফাইব্রিল প্রকৃতপক্ষে অ্যাকটিন নামক পেশী প্রোটিন দ্বারা গঠিত। মায়োফাইব্রিলের অন্তর্বর্তী সার্কোপ্লাজমে অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়া ও এণ্ডোপ্লাজমের জালক থাকে। অরেখ পেশীতে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অনুন্নত। মায়োসিন ক্ষুদ্রাকার অণুর সমষ্টি রূপে বর্তমান অথবা স্থূল মায়োসিন ফিলামেণ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্কোপ্লাজমে অবস্থান করে।

অরেখ পেশী প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—(a) **এক-একক অরেখ পেশী** (Single-unit non-striated muscle) এবং (b) **বহু-একক অরেখ পেশী** (Multi-unit non-striated muscle)।

এক-একক অরেখ পেশী ধমনিকার গাত্রে এবং গহ্বরযুক্ত আন্তর অঙ্গ, যথা : জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী, গবিনী ও পিত্তথলীতে থাকে। এই অংশের পেশীতে পেশীতন্তুগুলি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। ইহাতে উত্তেজনা একটি তন্তু হইতে অপর তন্তুতে সহজেই প্রবাহিত হয়। ফলে অধিকাংশ পেশীতন্তু একই সঙ্গে সংকুচিত হইতে পারে এবং সমষ্টিগতভাবে একটি এককরূপে কাজ করে। বহু একক অরেখ পেশী চক্ষুর আইরিসে, বড় ধমনী ও শিরায় দেখা যায়। পেশীতন্তুগুলির কাজ স্বতন্ত্র এবং ইহাদের সংকোচনও পৃথকভাবে সংঘটিত হয়।

3. **হৃৎপেশী** : বিশেষ ধরনের এই অনৈচ্ছিক পেশী হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের প্রাচীর গঠন করে। গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে হৃৎপেশী প্রায় সরেখ

পেশীর ন্যায় (চিত্র 11.9 B)। কিন্তু হৃৎপেশীর পেশীতন্তুগুলি শাখাবিশিষ্ট এবং শাখার সাহায্যে ইহারা একে অপরের সহিত সংযুক্ত থাকে। পেশীতন্তুগুলি সংক্ষিপ্ত ও বেলনাকার। ইহাদের ব্যাস প্রায় 10-20 মাইক্রন এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 60-80 মাইক্রন। প্রতি পেশীতন্তুতে একটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস, অনেক মাইটোকনড্রিয়া এবং পালাক্রমে সজ্জিত অনচ্ছ এ-ব্যান্ড এবং স্বচ্ছ আই-ব্যান্ড বর্তমান। কিন্তু ব্যান্ডগুলি সরেখ পেশী অপেক্ষা অস্পষ্ট। সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং টি-নালিকা উপস্থিত থাকে।

পেশীতন্তুগুলি পরস্পর সংযুক্ত। একটি পেশীতন্তু হইতে সৃষ্ট শাখা নিকটবর্তী পেশীর শাখাতন্তুর সহিত যুক্ত হয়। প্রতি জোড়া শাখাতন্তুর প্রান্ত দৃঢ়ভাবে নিবেশিত ফলক বা ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক (Intercalated disc) দ্বারা যুক্ত। সংযোগস্থলের কোষঝিল্লী ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া সোজা অথবা আঁকা-বাঁকা অনুপ্রস্থ রেখার ন্যায় নিবেশিত ফলক সৃষ্টি করে। এই অংশে পেশীতন্তুর সাইটোপ্লাজম বিশেষভাবে ঘন। ফলে পেশীতন্তুগুলি এক-এককরূপে কাজ করিতে পারে। পেশীতন্তুগুলির সংকোচনের জন্য কোন বাহ্য নার্ভীয় ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না এবং হৃৎপেশীর মধ্যেই উদ্দীপনা কেন্দ্র বর্তমান।

তিন প্রকার পেশীর তুলনামূলক বিবরণ

সরেখ পেশী	অরেখ পেশী	হৃৎপেশী
1. ঐচ্ছিক পেশী, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পেশীক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।	1. অনৈচ্ছিক পেশী, অর্থাৎ পেশী ক্রিয়া ইচ্ছার অধীন নহে।	1. অনৈচ্ছিক পেশী।
2. সার্কোলেমা উপস্থিত।	2. সার্কোলেমা উপস্থিত।	2. সার্কোলেমা উপস্থিত।
3. মায়োফাইব্রিলে সুস্পষ্ট A এবং I-ব্যান্ড থাকে।	3. মায়োফাইব্রিল বর্তমান, কিন্তু কোন অনুপ্রস্থ ব্যান্ড থাকে না। অনুদৈর্ঘ্য রেখা দৃষ্ট হয়।	3 মায়োফাইব্রিলে A এবং I-ব্যান্ড বর্তমান।
4. অনেকগুলি লম্বাটে বেলনাকার পেশীতন্তুর দ্বারা সরেখ পেশী গঠিত।	4. অনেকগুলি প্রলম্বিত মাকুর ন্যায় পেশীতন্তু দ্বারা অরেখ পেশী গঠিত।	4. পেশীতন্তুগুলি সংক্ষিপ্ত ও বেলনাকার।
5. পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য 1—40 মিলিমিটার এবং ব্যাস 30—80 মাইক্রন।	5. পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য 15-300 মাইক্রন এবং 8-10 মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট (স্থূল অংশের)।	5. পেশীতন্তুগুলি 60-80 মাইক্রন দৈর্ঘ্য এবং 10-20 মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট।
6. পেশীতন্তু শাখাবিহীন।	6. পেশীতন্তু শাখাবিহীন।	6. পেশীতন্তু শাখাযুক্ত এবং শাখাগুলি পরস্পর সংযুক্ত।
7. পেশীতন্তু বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং নিউক্লিয়াসগুলির অবস্থান পার্শ্বীয়।	7. পেশীতন্তুর কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে।	7. প্রতি পেশীতন্তুতে একটি কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস বর্তমান।

সরেখ পেশী	অরেখ পেশী	হৃৎপেশী
8. ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক অনুপস্থিত।	8. এক-একক পেশী তন্তুতে ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক সদৃশ গঠন বর্তমান। কিন্তু বহু-একক পেশীতে ইহা অনুপস্থিত।	8. পেশীতন্তুর প্রান্ত ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক দ্বারা যুক্ত।
9. সুগঠিত T-নালিকা উপস্থিত।	9. T-নালিকা অনুন্নত অথবা অনুপস্থিত।	9. সুগঠিত T-নালিকা উপস্থিত।
10. প্রচুর মাইটোকনড্রিয়া থাকে।	10. প্রচুর মাইটোকনড্রিয়া থাকে।	10. প্রচুর মাইটোকনড্রিয়া থাকে।
11. সংকোচনের ক্ষমতা দ্রুত ও শক্তিশালী।	11 সংকোচন ক্ষমতা মন্থর।	11. সংকোচন ক্ষমতা পরিমিতভাবে দ্রুত। সংকোচনের মধ্যে হৃৎপেশীর বিশ্রাম দশা থাকে।
12. প্রধানত অস্থিসংলগ্ন থাকে এবং অঙ্গ সঞ্চালন ও গমন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। অন্যান্য অংশে, যথা : অন্ননালীর প্রথম অংশে সরেখ পেশী থাকে।	12. পৌষ্টিক নালীর প্রাচীরে, গহ্বরযুক্ত আন্তর অঙ্গে, গ্রন্থির নালীতে এবং রক্তবাহে এই ধরনের পেশী থাকে।	12. হৃৎপেশীর প্রকোষ্ঠ-গুলির গাত্র এই ধরনের পেশী দ্বারা গঠিত।
13. সংকোচনের উদ্ভব নার্ভীয় (Neurogenic)।	13. এক-একক পেশীতে সংকোচনের উদ্ভব পেশীমধ্য হইতে (Myogenic)। কিন্তু বহু-একক পেশীর সংকোচন নার্ভীয়।	13 পেশীর মধ্যেই সংকোচনের উদ্ভব হয় (Myogenic)।

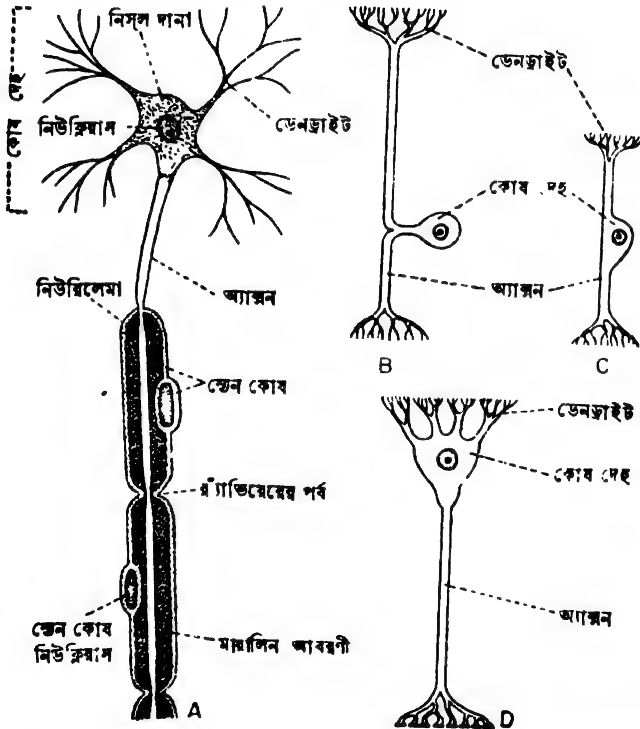
IV. নার্ভকলা

নার্ভকলা মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড, প্রান্তীয় নার্ভ, স্বতঃক্রিয় নার্ভ ইত্যাদি গঠন করে। নার্ভকলায় প্রধানত দুই প্রকার কোষ থাকে, যথা : (1) **নিউরোন** (Neurone) এবং (2) **নিউরোগ্লিয়া কোষ** (Neuroglia cell)।

1. **নিউরোন** : নিউরোন বা নার্ভকোষে দুইটি **অংশ** আছে, যথা : **কোষদেহ** (Cell-body) বা **পেরিক্যারিয়ন** (Perikaryon) এবং কোষদেহ হইতে সৃষ্ট অনেকগুলি **প্রলম্বিত অংশ** (Elongated processes)। পেরিক্যারিয়নের ব্যাস 5 হইতে 120 মাইক্রন এবং আকৃতি পিরামিড অথবা মাকু অথবা ত্রিকোণাকার অথবা ডিম্বাকার অথবা গোলাকার অথবা তারকাসদৃশ অথবা অনিয়ত হইতে পারে। কোষদেহ হইতে উত্থিত প্রোটোপ্লাজম নির্মিত প্রলম্বিত অংশগুলির দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন হইতে এক মিটার পর্যন্ত হইতে পারে। প্রলম্বিত অংশগুলির মধ্যে একটি কোষ দেহ হইতে নার্ভবাহিত তড়িৎ-তরঙ্গ বহন করে এবং কয়েকটি স্ফীত প্রান্তিক গঠন সৃষ্টি করিয়া অন্য পেরিক্যারিয়ন অথবা পেশীকোষ অথবা গ্রন্থিকোষের সন্নিকটে পরিসমাপ্ত হয়। ইহাকে **অ্যাক্সন** (Axon) বলে (চিত্র 11.10A)।

অ্যাক্সন ছাড়া নিউরোনে একটি অথবা অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত ডেনড্রাইট বা ডেনড্রন (Dendrites or Dendrons) থাকে। ইহারা পেরিক্যারিয়নের দিকে নার্ভবাহিত তড়িৎ-তরঙ্গ বহন করিয়া আনে। অ্যাক্সন শাখাবিহীন এবং ডেনড্রন অপেক্ষা লম্বা। একটি ডেনড্রন বা একটি অ্যাক্সনকে নার্ভতন্তু (Nerve fibre) বলা হয়।

নিউরোনের প্রকারভেদ : নিউরোনের পেরিক্যারিয়ন হইতে সৃষ্ট অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের সংখ্যা অনুসারে নিউরোনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় (চিত্র 11.10 B, C, D), যথা : (a) **একমেরু নিউরোন** (Unipolar neurone) : পেরিক্যারিয়ন হইতে কেবলমাত্র অ্যাক্সন ছাড়া অন্য কোন প্রলম্বিত অংশ থাকে না। একটি ডেনড্রন



চিত্র 11.10 বিভিন্ন প্রকার নার্ভ কোষ (A) আদর্শ নার্ভ কোষ, (B) অপ্রকৃত ইউনিপোলার (C) বাইপোলার, (D) মাল্টিপোলার।

এবং একটি অ্যাক্সন একত্রে পেরিক্যারিয়নের একই মেরু হইতে বাহির হইয়া পরে পরস্পর পৃথক হইয়া যায় এবং ছদ্ম-একমেরু বা সিউডো-ইউনিপোলার নিউরোন (Pseudo-unipolar neurone) গঠন করে। (b) **দ্বিমেরু নিউরোন** (Bipolar

neurone) : পেরিক্যারিয়নের দুইটি বিভিন্ন বিন্দু হইতে অ্যাক্সন ও ডেনড্রন বাহির হইয়া দ্বিমেরু বা বাইপোলার নিউরোন গঠন করে। (c) **বহুমেরু নিউরোন** (Multipolar neurone) : পেরিক্যারিয়ন হইতে একটি অ্যাক্সন এবং অনেকগুলি ডেনড্রন অনেকগুলি বিন্দু হইতে বাহির হইয়া বহুমেরু বা মাল্টিপোলার নিউরোন গঠন করে।

অ্যাক্সনের দৈর্ঘ্য অনুসারে নিউরোনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে নিউরোনের অ্যাক্সনটি সংক্ষিপ্ত এবং মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের গ্রে-ম্যাটারের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয় তাহাকে **গলগি-II নিউরোন** (Golgi II Neurone) বলে। অ্যাক্সনটি যখন লম্বা হয় এবং গ্রে-ম্যাটার অতিক্রম করিয়া হোয়াইট ম্যাটারে প্রবেশ করে তখন সেই নিউরোনকে **গলগি-I নিউরোন** (Golgi I Neurone) বলে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন নিউরোনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন গলগি-II নিউরোন দ্বারা সংঘটিত হয়। অপরপক্ষে গলগি-I নিউরোন প্রধানত প্রান্তীয় নার্ভ গঠন করে।

নিউরোনের গঠন : নিউরোনের পেরিক্যারিয়ন লাইপোপ্রোটিন নির্মিত কোষ-ঝিল্লী দ্বারা পরিবৃত থাকে। সাইটোপ্লাজমে একটি গোলাকার অথবা ডিম্বাকার কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস বর্তমান। সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়া আছে। নিউরোনের বিভিন্ন অংশে মাইটোকনড্রিয়ার আকার ভিন্নরূপ। সাইটোপ্লাজমে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং একটি সেণ্ট্রোসোম থাকে। পরিণত নার্ভকোষ বিভাজিত হয় না। সুতরাং বেমতন্তু উৎপাদনের প্রয়োজন সেণ্ট্রোসোমের হয় না। কিন্তু অণুনালিকা (Microtubules) পুনরুৎপত্তিতে সেণ্ট্রোসোম সক্রিয় অংশ নেয়। অণুনালিকাগুলি সেণ্ট্রোসোম সন্নিহিত অঞ্চল হইতে সমগ্র কোষদেহ এবং প্রলম্বিত অংশেও প্রসারিত হয়। অণুনালিকাসমূহ কোষদেহের আকার নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিউরোনের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করে। নিউক্লিয়াস সংলগ্ন অংশে এবং ডেনড্রনে **বিস্তৃত গলগি জালক** (Golgi network) নিউরোসিক্রিসনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। নিউরোনের সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য সূক্ষ্ম **নিউরোফাইব্রিল** (Neurofibrils) ডেনড্রন প্রান্ত হইতে অ্যাক্সনের প্রান্ত পর্যন্ত পেরিক্যারিয়নের মধ্য দিয়া প্রসারিত থাকে। নিউরোফাইব্রিলগুলি কোষদেহের সাইটোপ্লাজমে জালক সৃষ্টি করে। পেরিক্যারিয়নের সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য সুস্পষ্ট RNA সমৃদ্ধ দানাদার বস্তু বা **নিসল দানা** (Nissil granules) থাকে। ডেনড্রনের মধ্যে নিসল দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম বিস্তৃত থাকিলেও অ্যাক্সনের মধ্যে নিসল দানা অনুপস্থিত। নিউরোনের প্রোটিন সংশ্লেষে নিসল দানা অংশ গ্রহণ করে।

নার্ভতন্তু : কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গ্রে-ম্যাটারের মধ্যে **অ্যাক্সোলেমা** (Axolemma) নামক লাইপোপ্রোটিন ঝিল্লী নার্ভতন্তুকে আবৃত রাখে। অ্যাক্সোলেমা

পেরিক্যারিয়নের কোষঝিল্লীর সহিত যুক্ত। গ্রে-ম্যাটার হইতে বাহির হইয়া যখন নার্ভতন্তুটি হোয়াইট ম্যাটারে প্রবেশ করে তখন ইহা আরও একটি লাইপোপ্রোটিন স্তর দ্বারা পরিবৃত হয়। ইহাকে **মায়ালিন আবরণ** (Myelin sheath) বলে।

মায়ালিন আবরণযুক্ত নার্ভতন্তুকে **মায়ালিনেটেড বা মেডালেটেড নার্ভতন্তু** (Myelinated or Medullated nerve fibres) বলে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় নার্ভ প্রধানতঃ এই ধরনের নার্ভতন্তু দ্বারা গঠিত। অপরপক্ষে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া হইতে উত্থিত সূক্ষ্ম নার্ভতন্তুর মায়ালিন আবরণ থাকে না। এই ধরনের মায়ালিনবিহীন নার্ভতন্তুকে **নন্‌মায়ালিনেটেড বা নন্‌মেডালেটেড নার্ভতন্তু** (Non-myelinated or non-medullated nerve fibres) বলে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্তু হইতে বাহির হইয়া প্রান্তীয় কলায় আসার পর উভয় প্রকার নার্ভতন্তু অপর একটি পাতলা কোষনির্মিত ঝিল্লী দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এই আচ্ছাদনকে **নিউরিলেমা** (Neurilemma) বলে। নিউরিলেমা **স্যোন কোষ** (Schwann cell) দ্বারা গঠিত এবং ইহাদের নিউক্লিয়াস নিউরিলেমার নিম্নে অবস্থিত। মায়ালিনযুক্ত নার্ভতন্তুর মায়ালিন আবরণী অবিচ্ছিন্ন নহে। নিয়মিত দূরত্ব অন্তর এই আবরণীটি বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ উক্ত স্থানে নিউরিলেমা আবরণী নার্ভতন্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে চলিয়া আসে। নার্ভতন্তুর এই মায়ালিন আবরণীবিহীন অংশকে **নোড অফ্ র‍্যাভিয়ে** (Node of Ranvier) বলে।

2. **নিউরোগ্লিয়া কোষ** : নিউরোন ব্যতীত কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে অপর এক-প্রকার কোষ দৃষ্ট হয়। ইহারা নার্ভীয় তড়িৎ-তরঙ্গ বহনে অংশ নেয় না, কিন্তু নিউরোনগুলিকে ধরিয়া রাখে এবং রক্ষা করে। নার্ভকলা হইতে হানিকর এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ইহারা গ্রাস ও ধ্বংস করে। নার্ভকলার বিপাকীয় ক্রিয়ায় ইহাদের গুরুত্ব আছে। নিউরোগ্লিয়া কোষ বিভাজনে সক্ষম। নিউরোগ্লিয়া কোষ প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা : (a) **মাইক্রোগ্লিয়া কোষ** (Microglia cells), (b) **অ্যাস্ট্রোসাইট** (Astrocytes) এবং (c) **অলিগোডেনড্রোগ্লিয়া কোষ** (Oligodendroglia cells)।

নার্ভকলার কার্য : বাহ্য বা দেহাভ্যন্তরীণ পরিবেশ হইতে সৃষ্ট বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রভাবে দেহে যে সাড়া জাগে, তাহার পরিবহণ নার্ভকলার মাধ্যমেই সম্ভব হয়। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ নার্ভকলার মাধ্যমেই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ নার্ভকলা পরিবেশ ও প্রাণীর মধ্যে এবং প্রাণিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সুষ্ঠু সমন্বয় স্থাপন করে। নার্ভকলা হইতে নিঃসৃত নিউরোহরমোন (Neurohormones) প্রাণিদেহে নির্দিষ্ট জৈব ক্রিয়া সম্পাদন করে।

প্রাণিকলার সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিভাগ

প্রাণিকলা

- আবরক কলা
  - সরল আবরক কলা
    - শল্কাকার আবরক কলা
    - সমমাত্র আবরক কলা
    - স্তম্ভকাকার আবরক কলা
    - রোমশ আবরক কলা
    - ছন্দসহিত আবরক কলা
  - যৌগ আবরক কলা
    - স্তরিত আবরক কলা
    - পরিবর্তীয় আবরক কলা
  - বিশেষ আবরক কলা
    - গ্রন্থিল আবরক কলা
- যোগকলা
  - অ্যারিওলার কলা
  - অ্যাডিপোজ কলা
  - শ্বেত তান্তব কলা
  - পীত তান্তব কলা
  - রেটিকুলার কলা
  - তরুণাস্থি
  - অস্থি
  - রক্ত এবং রক্তোৎপাদক কলা
- পেশীকলা
  - সরেখ পেশী
  - অরেখ পেশী
  - হৃৎপেশী
- নার্ভকলা
  - নিউরোন
  - নিউরোগ্লিয়া কোষ

অনুচ্ছেদ 12

অঙ্গ-তন্ত্র ও কলাস্থান

12.1 অঙ্গতন্ত্রের পরিচয়

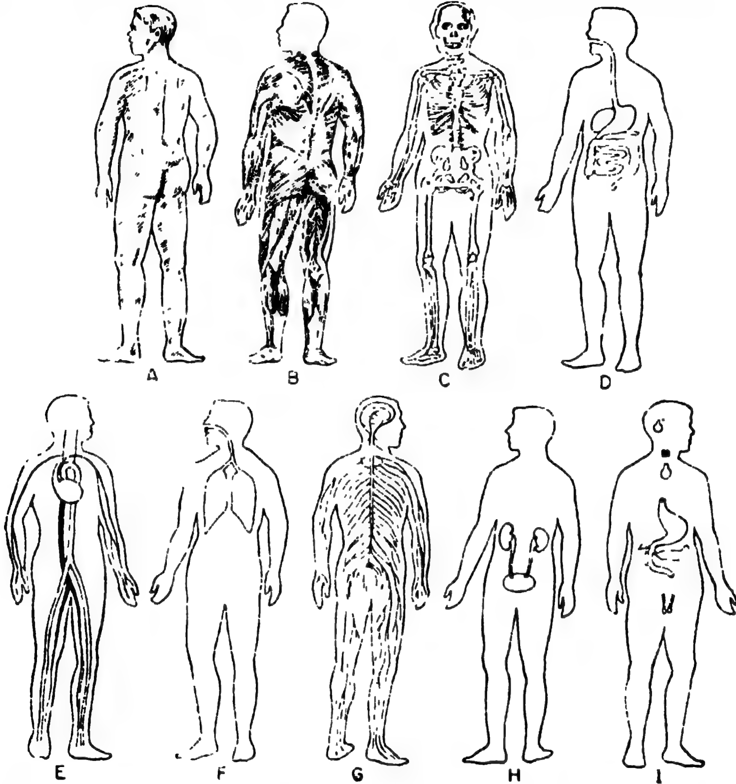
উন্নত প্রাণিদেহের সামগ্রিক প্রয়োজনে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ নির্দিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া এক-একটি মুখ্য শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদন করে। এইরূপে দেহের অঙ্গসমূহ কয়েকটি অঙ্গসমষ্টিতে বিভাজিত হইয়া অঙ্গতন্ত্র গঠন করে এবং পুষ্টি (Nutrition), শ্বসন (Respiration), সংবহন (Circulation), রেচন (Excretion) প্রজনন (Reproduction) প্রভৃতি এক-একটি মুখ্য শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া এক-একটি অঙ্গ-তন্ত্র সম্পাদন করিয়া সামগ্রিকভাবে প্রাণিদেহ সক্রিয় ও প্রাণবন্ত রাখে। সকল উন্নত স্তরের অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহ অনেকগুলি অঙ্গ-তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গ-তন্ত্রের মধ্যে গঠনগত বৈসাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে কার্যগত সাদৃশ্য বর্তমান। মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডীর দেহের অঙ্গ-তন্ত্রসমূহ নিম্নরূপ (চিত্র 12.1) :

A. **ত্বক-তন্ত্র** (Integumentary system) ত্বক্ (Skin) এবং ত্বক্ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন গঠন, যথা—লোম (Hair), শল্ক (Scales), পালক (Feather), নখর (Claw), নখ (Nail), ক্ষুর (Hoof) প্রভৃতি ত্বক-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দেহকে রক্ষা করা ত্বক-তন্ত্রের প্রধান কার্য হইলেও ইহা অন্যান্য কার্যে নিয়োজিত থাকে। .

B. **পেশী-তন্ত্র** (Muscular system) : প্রধানতঃ তিন ধরনের পেশীর সমন্বয়ে গঠিত পেশী-তন্ত্র আয়তনে অন্যান্য অঙ্গ-তন্ত্র অপেক্ষা সর্ববৃহৎ। এই অঙ্গ-তন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে দেহের সঞ্চালন ও গমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পেশীর বিন্যাসের উপর প্রাণীদের আকৃতি নির্ভর করে। পেশীতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ঐচ্ছিক পেশীসমূহের (Voluntary muscles) সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই মেরুদণ্ডীদের অগ্রপদ, পশ্চাৎপদ, গ্রীবা প্রভৃতির সঞ্চালন ও গমন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রক্তবাহ মধ্য দিয়া রক্ত সংবহন, পৌষ্টিকনালীর মধ্য দিয়া খাদ্যবস্তুর ক্রমসংকোচন-জনিত স্থানান্তরণ প্রভৃতি অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের (Involuntary muscle) সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা সংঘটিত হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হৃৎপেশীর (Cardiac muscle) ক্রিয়ার ফলে সম্ভব হয়।

C. **কঙ্কাল-তন্ত্র** (Skeletal system) : দেহের ভিতরের কোমল অঙ্গগুলিকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করা, দেহের নির্দিষ্ট আকৃতি বজায় রাখা এবং অঙ্গ-সঞ্চালন ও গমনে অংশ গ্রহণ করা কঙ্কাল-তন্ত্রের কার্য। কঙ্কাল-তন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—বহিঃকঙ্কাল-তন্ত্র (Exoskeletal system) এবং

অন্তঃকঙ্কাল-তন্ত্র (Endoskeletal system)। দেহের বাহিরে অবস্থিত কঙ্কাল, যথা—সন্ধিপদ প্রাণীদের কাইটিনময় বহিরাবরণ, শম্বুকজাতীয় প্রাণীদের দেহাবরণ (খোলক), মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শল্ক, লোম, নখর, ক্ষুর প্রভৃতি বহিঃকঙ্কাল-তন্ত্রের অন্তর্গত। অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে বহিঃকঙ্কালের নবীকরণ সংঘটিত হয়। এই



চিত্র 12.1 মানবদেহের নয়টি অঙ্গতন্ত্র—(A) ত্বকতন্ত্র, (B) পেশীতন্ত্র, (C) অস্থিতন্ত্র, (D) পাচনতন্ত্র, (E) সংবহন তন্ত্র, (F) শ্বসনতন্ত্র, (G) স্নায়ুতন্ত্র, (H) রেচনতন্ত্র, (I) অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতন্ত্র।

নবীকরণ প্রক্রিয়াকে নির্মোচন (Moulting or Ecdysis) বলে। বহিঃকঙ্কাল নির্জীব পদার্থ দ্বারা গঠিত। প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত অস্থি তরুণাস্থি, কণ্ডরা প্রভৃতি সজীব অঙ্গ দ্বারা গঠিত কঙ্কাল অন্তঃকঙ্কাল-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কণ্ডরা ও পেশীর সাহায্যে অস্থি ও তরুণাস্থি সমূহ পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া দেহের নির্দিষ্ট কাঠামো বজায় রাখে।

D. **পাচন-তন্ত্র** (Digestive system): এই তন্ত্রটি দ্বারা প্রাণিদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র প্রভৃতি পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ এবং পৌষ্টিক নালী সংলগ্ন

লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি পাক-গ্রন্থিসমূহের সমন্বয়ে পাচন-তন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্র দ্বারা খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, পাচিত ও সরলীকৃত খাদ্য ও জল শোষণ, খাদ্যের অপাচ্য ও অসার অংশ ধারণ ও বহিষ্করণ সম্পাদিত হয়। সামগ্রিকভাবে পাচন-তন্ত্র প্রাণিদেহের পুষ্টি সাধন করে এবং বিবিধ জৈব ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শক্তি স্থৈতিক শক্তিরূপে আহরণ করে।

E. **শ্বসন-তন্ত্র** (Respiratory system) : শ্বসন-তন্ত্রের দ্বারা শ্বসন ক্রিয়া সাধিত হয়। নাসারন্ধ্র, নাসাবিবর, শ্বাসনালী ও ফুসফুস লইয়া স্থলবাসী মেরুদণ্ডীদের শ্বসন-তন্ত্র গঠিত। ফুসফুসের সাহায্যে বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয়। কিন্তু জলবাসী মেরুদণ্ডী (যথা —মাছ) ফুলকার দ্বারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন সংগ্রহ করে। গৃহীত অক্সিজেনের দ্বারা খাদ্যমধ্যে সঞ্চিত স্থৈতিক শক্তিকে গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করাই শ্বসনের মুখ্য শারীরবৃত্তীয় উদ্দেশ্য ।

F. **সংবহন-তন্ত্র** (Circulatory system) : প্রাণিদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের মধ্যে রাসায়নিক সহযোজন (Chemical co-ordination) সংবহন-তন্ত্রের প্রধান কাজ। উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন-তন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—**রক্ত সংবহন-তন্ত্র** (Blood vascular system) এবং **লসিকা সংবহন-তন্ত্র** (Lymphatic system)। হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তবাহ লইয়া রক্ত সংবহন তন্ত্র গঠিত এবং লসিকাপর্ব, লসিকা ও লসিকাবাহ লইয়া লসিকা সংবহন-তন্ত্র গঠিত। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ধমনীর মাধ্যমে পৌঁছায়। ধমনী বিভক্ত হইয়া প্রথমে ধমনিকা এবং পরে ধামনিক জালকে পরিণত হয়। পরিশেষে ধামনিক জালক শিরা-জালকের সহিত মিলিত হয়। শিরা-জালক সংযুক্ত হইয়া শিরাণু এবং শিরাণুসমূহ মিলিত হইয়া শিরা গঠন করে। শিরার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। ফুসফুস ধমনী ব্যতীত সকল ধমনীর মধ্য দিয়া অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত সংবাহিত হয়। ফুসফুস শিরা ছাড়া সকল শিরার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত বাহিত হয়।

G. **রেচন-তন্ত্র** (Excretory system) : প্রাণিদেহে বিপাকীয় ক্রিয়ায় উদ্ভূত নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন রেচন-তন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃক্ক, গবিনী, মূত্রথলি প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা রেচন-তন্ত্র গঠিত। বৃক্কের একক নেফ্রন দ্বারা রক্ত হইতে নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ ও প্রয়োজনাতিরিক্ত জল নিষ্কাশিত হয় এবং গবিনীর দ্বারা বাহিত হইয়া উহা মূত্ররূপে মূত্রথলিতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। মূত্রথলি হইতে মূত্রছিদ্রের দ্বারা মূত্র বহিষ্কৃত হয়।

H. **নার্ভ-তন্ত্র** (Nervous system) : মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড, নার্ভ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা নার্ভ-তন্ত্র গঠিত। নার্ভ-তন্ত্রের দ্বারা প্রাণিদেহের নার্ভীয় সহযোজন (Nervous co-ordination) সাধিত হয়। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের সুসংবদ্ধ কার্য ও বিপাকীয় ক্রিয়া উক্ত তন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বাহ্য অনুভূতি গৃহীত হয় এবং উহা নার্ভের দ্বারা

মস্তিষ্কে বাহিত হয়। মস্তিষ্ক অনুভূতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া নার্ভের সাহায্যে দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলিকে চালনা করে এবং নার্ভীয় ভারসাম্য রক্ষা করে।

I. **প্রজনন-তন্ত্র** (Reproductive system): প্রজনন বা বংশ বৃদ্ধি ও বংশানুক্রম রক্ষা করাই প্রজনন-তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়, শুক্রনালী, শুক্রথলি, পুংজননেন্দ্রিয় প্রভৃতি অঙ্গের সমন্বয়ে পুংজনন-তন্ত্র (Male reproductive system) গঠিত। ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, জরায়ু, যোনি প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা স্ত্রীজনন-তন্ত্র (Female reproductive system) গঠিত। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় হইতে যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। অন্যান্য অঙ্গসমূহ জনন-কোষ (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) ধারণ ও পরিবহণ, ভ্রূণ ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

J. **এণ্ডোক্রিন-তন্ত্র** (Endocrine system): উচ্চস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এণ্ডোক্রিন-তন্ত্র পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, অগ্ন্যাশয়, জনন-অঙ্গ প্রভৃতি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ এক বা একাধিক হর্মোন নিঃসরণ করে। হর্মোন একপ্রকার জৈব রাসায়নিক বার্তাবহ। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ হইতে হর্মোন সরাসরি রক্তে ক্ষরিত হয়। রক্ত দ্বারা বাহিত হর্মোন প্রাণিদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের বৃদ্ধি, লার্ভা দশা হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রূপান্তর, রক্তে শর্করার পরিমাণের ভারসাম্য, প্রজনন প্রভৃতি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পিটুইটারী নামক অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি এণ্ডোক্রাইন-তন্ত্রের অধিনায়ক। বস্তুত নার্ভতন্ত্র ও এণ্ডোক্রাইন-তন্ত্র একত্রে প্রাণিদেহের সকল বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

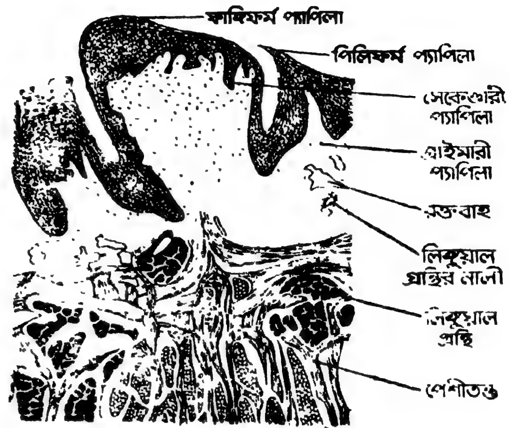
উপরি-বর্ণিত দশটি অঙ্গ-তন্ত্র একত্রে সুসংবদ্ধভাবে কার্য সম্পাদন করিয়া দেহযন্ত্রকে সচল ও প্রাণবন্ত রাখে। সুতরাং সকল প্রাণীর জীবন-প্রক্রিয়া প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্রের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

12.2 কলাস্থান

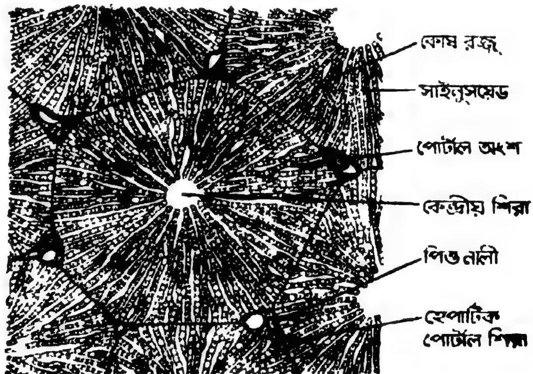
বহুকোষী প্রাণীদের দেহ বিভিন্ন কলা দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার জন্য শ্রম-বিন্যাসের (Division of labour) উদ্ভব হইয়াছে। এক-একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার কলা একত্রে সংযোজিত হইয়া এক-একটি অঙ্গ (Organ) গঠন করিয়াছে। পাকস্থলী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, যকৃৎ, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয় প্রভৃতি এক-একটি অঙ্গ। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন কলার সমন্বয়ে সৃষ্ট এবং প্রাণিদেহের জৈব প্রয়োজনে এক-একটি সুনির্দিষ্ট কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। পাকস্থলীর শারীরস্থানিক গঠন পর্যবেক্ষণ করিলে প্রতিভাত হয় যে ইহাতে আবরক কলা, পেশীকলা, যোগকলা ও নার্ভকলা বর্তমান। বিভিন্ন অঙ্গের কার্য নির্দিষ্ট। বৃক্ক নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ শোষণ করে, লালাগ্রন্থি হইতে লালা নিঃসৃত হয়, অগ্ন্যাশয়ের বহিঃস্রাবী অংশ হইতে অগ্ন্যাশয় রস এবং অন্তঃস্রাবী অংশ হইতে হর্মোন ক্ষরিত হয়, জনন-অঙ্গ হইতে জনন-কোষ উৎপন্ন হয়।

কয়েকটি অঙ্গের অণুবীক্ষনিক কলাস্থান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল :

A. **জিহ্বা (Tongue)** : মুখবিবরের অংকতলে অবস্থিত এই অঙ্গটি প্রধানতঃ স্বাদ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। জিহ্বার সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে নিম্নবর্ণিত অংশগুলি দৃষ্ট হয়—জিহ্বার এপিথিলিয়াম স্তরিত আঁইশাকার আবরক কলা দ্বারা গঠিত। এপিথিলিয়ামের স্থানে স্থানে পিড়কার (Papilla)—সৃষ্টি হইয়াছে। পিড়কাগুলিকে লিংগুয়াল পিড়কা (Lingual papillae) বলে এবং ইহারা সাধারণতঃ তিন প্রকার, যথা—(i) ফিলিফর্ম পিড়কা (Filiform papilla)—সংখ্যায় বেশী এবং ইহাতে স্বাদ-কোরক (Taste bud) থাকে না। (ii) ফাঙ্গিফর্ম পিড়কা (Fungiform papilla)—ব্যাঙের ছাতার ন্যায় এই ধরনের পিড়কাগুলিতে স্বাদ-কোরক থাকে। (iii) সারকামভ্যালেট পিড়কা (Circumvallete papilla)—আকারে বড় এই ধরনের পিড়কাগুলি গর্তের মধ্যে প্রোথিত থাকে। পিড়কাসমূহের অভ্যন্তরে আলগাভাবে বিন্যস্ত অ্যারিওলার যোগকলা থাকে (চিত্র 12.2)। স্বাদ-কোরকে দুই প্রকার কোষ, যথা—গ্যাসটেটরি (Gustatory) এবং সাবটেন্টাকিউলার (Subtentacular) বর্তমান। জিহ্বায় সরেখ পেশীতন্তুর গুচ্ছ নানান দিকে বিন্যস্ত থাকে।



চিত্র 12.2 জিহ্বার প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।



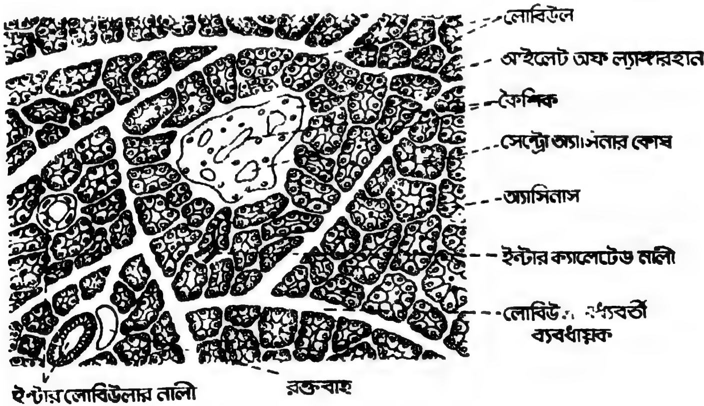
চিত্র 12.3 যকৃতের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

B. **যকৃৎ (Liver)** : বৃহত্তম পাকগ্রন্থি। ইহা হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ইহা বিপাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। যকৃৎ অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার লোব দ্বারা গঠিত।

ইহাদের যকৃতের একক বা লিভার লোবিউল (Liver lobules) বলে। প্রতিটি লোবিউল যোগকলা নির্মিত আবরণ দ্বারা পরিবৃত থাকে। একটি লোবিউল পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে একটি কেন্দ্রীয় নালী ইহার মধ্যস্থলে রহিয়াছে। যকৃত শিরার একটি শাখা ইহা গঠন করে। লোবিউল মধ্যস্থিত বহুভুজাকার কোষগুলিতে একটি অথবা দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে। প্রতিটি লোবিউলের সহিত একটি পোর্টাল নালীর সহঅবস্থান লক্ষ্যণীয় (চিত্র 12.3)। প্রতিটি পোর্টাল নালী পোর্টাল ধমনী, পোর্টাল শিরা ও পিত্তনালী দ্বারা গঠিত। ইহারা সামগ্রিকভাবে যোগকলা নির্মিত গ্লিসনস্ ক্যাপসুল (Glisson's capsule) দ্বারা পরিবৃত।

C. **অগ্ন্যাশয় (Pancreas) :** দুই ধরনের গ্রন্থিকলার সংযোজনে অগ্ন্যাশয় গঠিত। মিশ্র প্রকৃতির এই গ্রন্থির বহিঃস্রাবী (Exocrine) অংশ হইতে অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juice) নিঃসৃত হয় এবং অন্তঃস্রাবী (Endocrine) অংশ হইতে হর্মোন (Hormone) ক্ষরিত হয়।

বহিঃস্রাবী অংশে অসংখ্য অ্যালভিওলাস (Alveolus) থাকে। প্রতিটি অ্যালভিওলাস গাত্র শিখরীয় কোষ (Acinus) দ্বারা গঠিত। কোষসমূহের নিউক্লিয়াস ভিত্তি ঝিল্লীর (Basement membrane) দিকে অবস্থান করে। সাইটোপ্লাজমে সুস্পষ্ট জাইমোজেন দানা (Zymogen granules) থাকে। অ্যালভিওলাসের গহ্বরে কয়েকটি করিয়া চ্যাপ্টা সেন্ট্রো-অ্যাসিনার কোষ (Centro-acinar cell) অবস্থান করে।



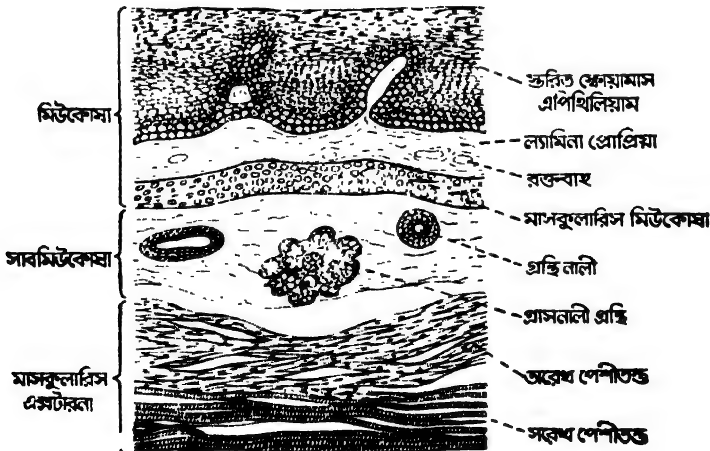
চিত্র 12.4 অগ্ন্যাশয়ের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

অন্তঃস্রাবী অংশটিকে আইলেটস্ অফ্ ল্যাঙ্গারহ্যানস্ (Islets of Langer-hans) বলে (চিত্র 12.4)। আইলেটস্ অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস অ্যালভিওলাসসমূহের অন্তর্বর্তী অংশে অবস্থিত রক্তজালক ও জালকাকার কলাসমৃদ্ধ অসমাঙ্গ পিণ্ড।

ইহারা ক্যাপসুল দ্বারা আবৃত থাকে না। পরিবর্তে জালকাকার তন্তু দ্বারা পৃথক থাকে। তিন ধরনের কোষ, যথা—অ্যালফা (Alpha), বিটা (Beta) এবং গামা (Gamma) দ্বারা আইলেটস্ গঠিত। তিন ধরনের কোষ ব্যতীত মানুষের অগ্ন্যাশয়ে ডেলটা (Delta) নামক চতুর্থ ধরনের কোষ বর্তমান। বিটা ধরনের কোষ হইতে ইনসুলিন (Insulin) নামক হর্মোন নিঃসৃত হয়।

D. **প্লীহা** (Spleen): প্লীহা একটি লসিকা-অঙ্গ (Lymphatic organ)। ইহার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বহুমুখী। ইহা (i) নিষ্ক্রিয় লোহিত রক্ত-কণিকা ধ্বংস করে, (ii) অতিরিক্ত লোহিত রক্তকণিকা সঞ্চয় করে, (iii) লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন করে, (iv) অ্যান্টিবডি (Antidody) উৎপন্ন করে এবং (v) ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে প্লীহার সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে একটি যোগকলা নির্মিত ক্যাপসুল প্লীহাকে আবৃত করিয়া রাখে। স্থানে স্থানে ক্যাপসুল (Capsule) প্লীহার অভ্যন্তরে প্রসারিত হয় এবং ট্রাবিকিউলি (Trabeculae) সৃষ্টি করে। দুইটি অঞ্চলে প্লীহা বিভক্ত। কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিকে মেডালা (Medulla) এবং বাহিরের অঞ্চলটিকে কর্টেক্স (Cortex) বলে। মেডালায় শ্বেত পাল্প (White pulp) এবং লোহিত পাল্প (Red pulp) বর্তমান।

E. **অন্ননালী** (Oesophagus): পৌষ্টিক নালীর এই নলাকার অংশের মাধ্যমে মুখবিবর হইতে খাদ্য পানীয় পাকস্থলী গহ্বরে পৌঁছায়। অন্ননালীর গাত্রের



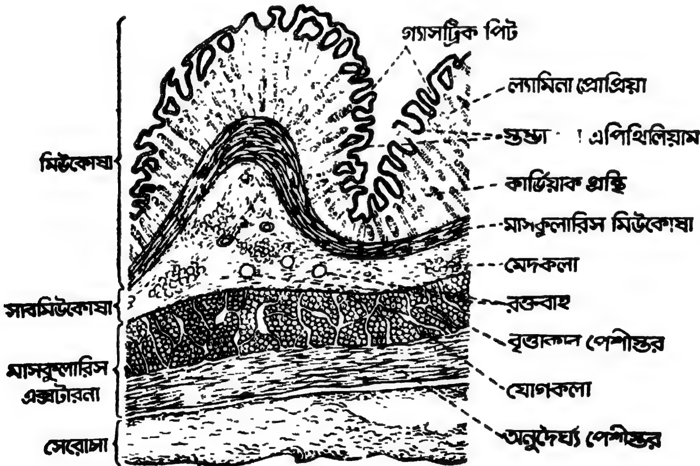
চিত্র 12। অন্ননালী প্রাচীরের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

প্রস্থচ্ছেদে চারিটি প্রধান স্তর দৃষ্ট হয়। বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকে সজ্জিত স্তর চারিটি যথাক্রমে—মাসকুলারিস এক্সটারনা (Mascularis externa) বা সেরোসা (Serosa), টিউনিকা মাসকুলারিস (Tunica muscularis), টিউনিকা

সাবমিউকোষা (Tunica submucosa) এবং টিউনিকা মিউকোষা (Tunica mucosa)। সেরোসা যোগকলা এবং টিউনিকা মাসক্যুলারিস অরেখ পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। টিউনিকা সাবমিউকোষা স্তরে কোলাজেন তন্তু, রক্তবাহ এবং মেস্‌নার প্লেক্সাস (Meissner's plexus) থাকে। টিউনিকা মিউকোষা স্তর (i) আবরণ তল (Surface epithelium), (ii) ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া (Lamina propria) এবং মাসক্যুলারিস মিউকোষা (Muscularis mucosa) দ্বারা গঠিত (চিত্র 12.5)।

আবরণ তল হইতে অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে রেখান্বিত শল্কাকার আবরক কলা থাকে। ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া স্তরে প্রচুর কোলাজেন তন্তু বর্তমান। পিড়কা এবং কিছু সংখ্যক গ্রন্থির অবস্থান লক্ষ্যণীয়। মাসক্যুলারিস মিউকোষা অনুদৈর্ঘ্য পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। ইহাতে অভিক্ষেপ থাকে না। সাবমিউকোষা স্তরে শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি উপস্থিত। টিউনিকা মাসক্যুলারিস স্তরে স্থূল অনুদৈর্ঘ্য ও সূক্ষ্ম চক্রপেশী-তন্তু পরিলক্ষিত হয়।

E. পাকস্থলী (Stomach) : পৌষ্টিক নালীর এই থলির ন্যায় অঙ্গটির মুখ্য কাজ হইল খাদ্যবস্তুর সাময়িক সঞ্চয় এবং পাচন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা। অন্ননালীর ন্যায় পাকস্থলীর গাত্রে চারিটি স্তর, যথা—সেরোসা, টিউনিকা মাসক্যুলারিস, টিউনিকা সাবমিউকোষা এবং টিউনিকা মিউকোষা বর্তমান (চিত্র 12.6)। টিউনিকা মিউকোষার

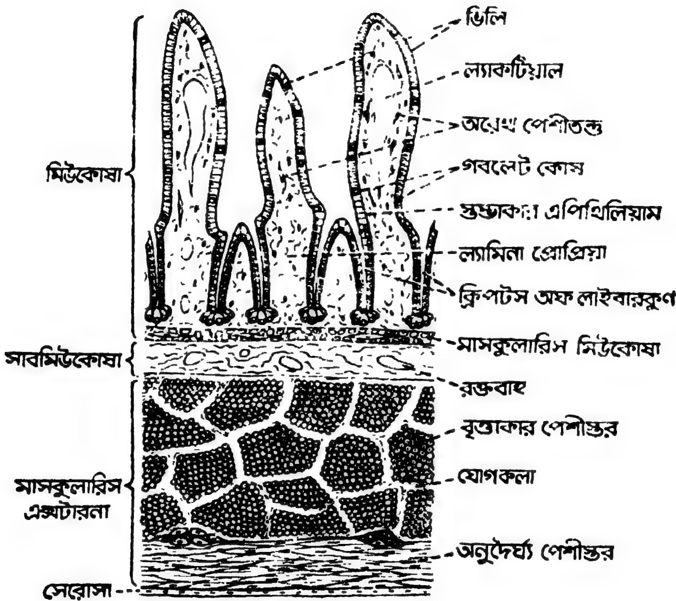


চিত্র 12.6 পাকস্থলী প্রাচীরের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

আবরণ তল সরল আবরক কলা দ্বারা গঠিত। ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া আলগা যোগকলা এবং ঘন সন্নিবিষ্ট গ্রন্থির সমন্বয়ে সৃষ্ট। মাসক্যুলারিস মিউকোষায় দুইটি পেশী-স্তর থাকে। বাহিরের স্তরটি অনুদৈর্ঘ্য পেশী এবং ভিতরের স্তরটি চক্রপেশী দ্বারা

গঠিত। ইহা অভিক্ষেপবিহীন কিন্তু লসিকা কলা সমৃদ্ধ। সাবমিউকোষা স্তরের ভাঁজগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। টিউনিকা মাসক্যুলারিস স্তরে তিন প্রকার পেশী বর্তমান। অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী ব্যতীত ভিতর দিকে তির্যক পেশী (Oblique muscle) সজ্জিত থাকে। গ্রন্থিসমূহ সুস্পষ্ট ও তিন প্রকার।

G. **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small Intestine) : পৌষ্টিক নালীর এই নলাকার অংশে খাদ্যবস্তুর পাচন এবং খাদ্যসার শোষণ সম্পাদিত হয়। পাকস্থলীর ন্যায় ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে যথারীতি চারিটি স্তর বর্তমান। টিউনিকা মাসক্যুলারিস স্তরে কেবলমাত্র অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী থাকে (চিত্র 12.7)। টিউনিকা মিউকোষার আবরণ তল সরল স্তম্ভকাকার কোষ দ্বারা গঠিত। অভিক্ষেপ থাকে। লসিকা কলা পর্যাপ্ত পরিমাণে



চিত্র 12.7 ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের (ডিওডিনাম) সাবমিউকাস স্তরে ব্রুনারের গ্রন্থি (Glands of Brunner) থাকে। অবশিষ্ট অংশের ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ায় পায়ারের প্যাচ (Peyers patches) আছে।

H. **বৃহদন্ত্র** (Large Intestine) : পৌষ্টিক নালীর এই অংশে জল শোষিত হয় এবং খাদ্যের অসার অংশ সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। বৃহদন্ত্রের কলাস্থান পর্যবেক্ষণ করিলে ক্ষুদ্রান্ত্রের কলাসজ্জার সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অভিক্ষেপ অনুপস্থিত। স্থূলে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ায় অসংখ্য নলাকার গ্রন্থি এবং

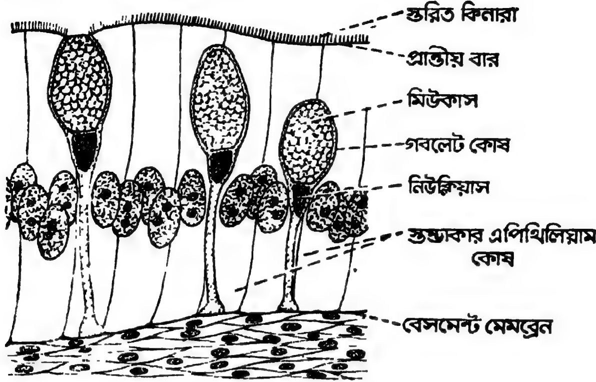
পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশের কলাস্থানের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	অন্ননালী	পাকস্থলী	ক্ষুদ্রান্ত্র	বৃহদন্ত্র
আবরণ তল (Surface epithelium)	রেখান্বিত শল্কাকার আবরক কলা দ্বারা গঠিত। অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজের সৃষ্টি হইয়াছে।	সরল স্তম্ভকাকার আবরক কলা দ্বারা গঠিত।	সরল স্তম্ভকাকার আবরক কলা দ্বারা গঠিত।	সরল স্তম্ভকাকার আবরক কলা দ্বারা গঠিত। মল-নালীর কোষ রেখান্বিত শল্কাকার কলায় রূপান্তরিত হইয়াছে।
ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া (Lamina propria)	কোলাজেন তন্তুর প্রাধান্য থাকে। গ্রন্থির সংখ্যা কম। পিড়কা (Papillia) থাকে।	আলগা যোগকলা নির্মিত এবং অসংখ্য ঘন সন্নিবিষ্ট গ্রন্থি থাকে।	অভিক্ষেপের মধ্যে প্রসারিত এবং রক্তজালক সমৃদ্ধ। অরেখ পেশী-তন্তু ও গ্রন্থি থাকে। লসিকা পর্বসমূহ একত্রিত হইয়া স্থানে স্থানে পেয়ার্স প্যাচ (Payer's patch) সৃষ্টি করে।	স্থূল স্তরটিতে অসংখ্য নলাকার গ্রন্থি এবং লসিকা পর্ব আছে।
মাস্কিউলারিস মিউকোষা (Muscularis mucosa)	স্থূল এবং পেশী তন্তুসমূহ অনুদৈর্ঘ্যভাবে বিন্যস্ত।	দুই স্তরযুক্ত। বাহিরের স্তরটি অনুদৈর্ঘ্য এবং ভিতরের স্তরটি চক্র পেশী দ্বারা গঠিত।	দুইটি স্তরযুক্ত।	স্পষ্ট নহে, স্থানে স্থানে অনুপস্থিত থাকে।
অভিক্ষেপ (Villus)	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	উপস্থিত	অনুপস্থিত
লসিকা কলা (Lymphatic tissue)	কম	বেশী	বেশী	বেশী

পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশের কলাস্থানের তুলনা

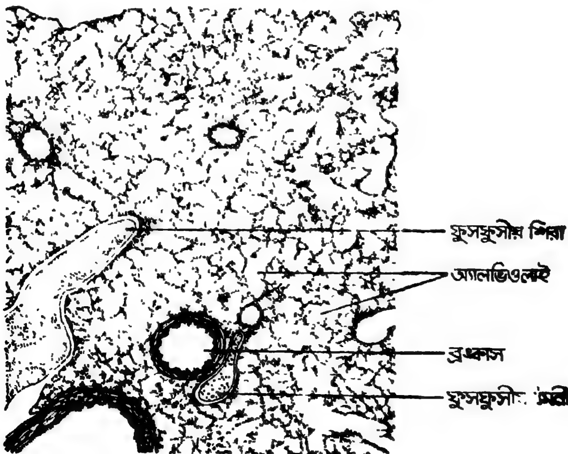
বৈশিষ্ট্য	অন্ননালী	পাকস্থলী	ক্ষুদ্রান্ত্র	বৃহদন্ত্র
সাবমিউকোষা (Submucosa)	শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি (Mucous gland) থাকে।	বড় ভাঁজ সৃষ্টি করে।	সৃষ্ট চক্রাকার ভাঁজগুলিকে প্লিকি সারকুলারিস্ (Plicae circularis) বলে।	প্লিকি অনুপস্থিত। লসিকা পর্ব প্রসারিত।
পেশীস্তর (Muscle layer)	দুই স্তরযুক্ত বাহিরের স্থূল স্তরটি অনুদৈর্ঘ্য পেশী এবং ভিতরের স্তরটি চক্রপেশী দ্বারা গঠিত। উপরি অংশে সরেখ এবং নিম্নাংশে অরেখ পেশী থাকে।	তিন স্তরযুক্ত। বাহিরের অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী স্তরের ভিতরের দিকের স্তরটি তির্যক পেশী দ্বারা গঠিত। অরেখ পেশীতন্তু দ্বারা পেশী গঠিত।	দুই স্তরযুক্ত। অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী স্তর অরেখ পেশী দ্বারা গঠিত।	দুই স্তরযুক্ত। অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী স্তর অরেখ পেশী দ্বারা গঠিত।
গ্রন্থি (Gland)	শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি	তিনপ্রকার গ্রন্থি, যথা; কার্ডিয়াক (Cardiac) ফান্ডিক (Fundic) এবং পাইলোরিক (Pyloric) গ্রন্থি থাকে।	ব্রুনার গ্রন্থি (Brunner's glands) থাকে।	গবলেট কোষের (Goblet cells) সংখ্যা ক্রমে নিম্নদিকে বেশী হয়।
পাকক্রিয়া (Digestive functions)	নাই	খাদ্য তরলীকৃত হয় এবং প্রোটিন খাদ্যের পাচন আরম্ভ হয়।	প্রোটিন ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের পাচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। খাদ্যসার শোষিত হয়।	জল শোষিত হয়।

সুস্পষ্ট লসিকা পর্ব আছে। মাসকুলারিস মিউকোষা অস্পষ্ট। **গবলেট কোষ** (Goblet cells) থাকে (চিত্র 12.8)।



চিত্র 12.8 গবলেট কোষসমূহের বহুগুণ বর্ধিত চিত্ররূপ।

I. ফুসফুস (Lungs). ইহা মেরুদণ্ডীদের প্রধান শ্বসন-অঙ্গ। সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ হইতে ফুসফুসের রেখাচিত্রে অসংখ্য বৃত্তাকার অসমাঙ্গ অ্যালভিওলাস দৃষ্ট হয় (চিত্র 12.9)। প্রত্যেকটি অ্যালভিওলাসের গাত্র চ্যাপ্টা আঁইশাকার আবরক কোষ দ্বারা গঠিত। অ্যালভিওলাসের গহ্বরে বেশ কিছু সংখ্যক অ্যালভিওলাস গাত্র হইতে

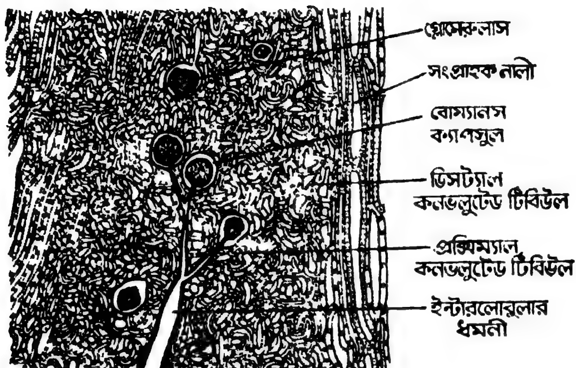


চিত্র 12.9 ফুসফুসের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ

বিচ্যুত কোষ পরিলক্ষিত হয়। এই কোষগুলির সাইটোপ্লাজমে ধূলিকণা অন্তরীণ থাকে। অ্যালভিওলাসের গাত্র রক্তবাহ সমৃদ্ধ।

J. **বৃক্ক** (Kidney) : ইহা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন অঙ্গ। ইহার দ্বারা রক্ত হইতে বিপাকজাত নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহার অণুবীক্ষণিক রেখাচিত্র নিম্নরূপ :

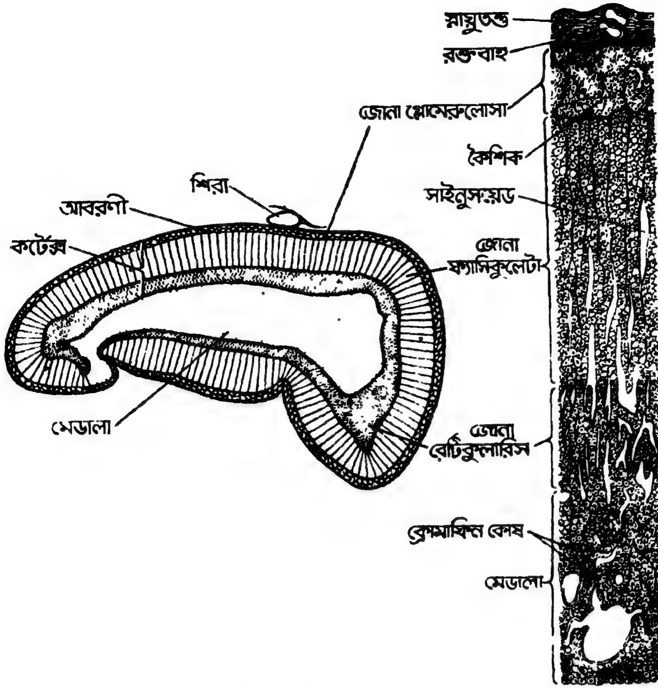
বৃক্কের দুইটি অঞ্চল কর্টেক্স (Cortex) এবং মেডালা (Medulla)। বৃক্কের মধ্যাঞ্চল (মেডালা) কর্টেক্স দ্বারা পরিবৃত। কর্টেক্স অঞ্চলে ম্যালফিজিয়ান কর্পাসেলস্ (Malpighian corpuscles) বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি



চিত্র 12.10 বৃক্কের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

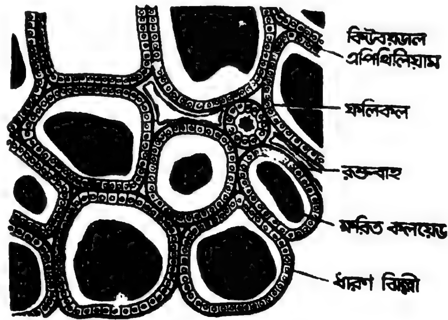
ম্যালফিজিয়ান কর্পাসেল দ্বিস্তরবিশিষ্ট কাপের (Double-walled cup-like) ন্যায় বাওম্যানস্ ক্যাপসুল (Bowman's capsule) এবং ইহার অবতল খাঁজে ধামনিক জালকের জট, গ্লোমারুলাস (Glomerulus) দ্বারা গঠিত (চিত্র 12.10)।

K. **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি** : ইহা একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বৃক্কের সম্মুখভাগে অবস্থিত। এইরূপ অবস্থানের জন্য ইহাকে সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Suprarenal gland) নামেও অভিহিত করা হয়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে নিম্নবর্ণিত অংশগুলি প্রতিভাত হয়। গ্রন্থিটি দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত। বাহিরের অঞ্চলটিকে (চিত্র 12.11) কর্টেক্স (Cortex) এবং ভিতরের অঞ্চলটিকে মেডালা (Medulla) বলে। কর্টেক্স অঞ্চলের বাহিরে যোগকলা নির্মিত ক্যাপসুল (Capsule) বর্তমান। কর্টেক্স অঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—জোনা গ্লোমেরুলোসা (Zona glomerulosa), জোনা ফ্যাসিকিউলাটা (Zona fasiculata) এবং জোনা রেটিকুলারিস (Zona reticularis)। কর্টেক্স হইতে কর্টিন (Cortin) নামক হর্মোন নিঃসৃত হয়। মেডালা অঞ্চল ক্রোমাফিন কোষ (Chromaffin cells) দ্বারা গঠিত এবং এই অঞ্চল হইতে অ্যাড্রিনালিন (Adrenalin) নামক হর্মোন ক্ষরিত হয়।



চিত্র 12.11 অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির লম্বচ্ছেদ (বাম) ও প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ (দক্ষিণ) ।

L. **থাইরয়েড গ্রন্থি** (Thyroid gland) : গ্রীবা অঞ্চলে অবস্থিত অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিদ্বয় থাইরয়েড হইতে থাইরক্সিন (Thyrox) নামক হর্মোন নিঃসৃত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি অসংখ্য বৃত্তাকার অথবা ডিম্বাকার অ্যালভিওলাস (Alveolus) দ্বারা গঠিত। প্রতিটি অ্যালভিওলাসের গাত্র সমমাত্র আবরক কলার সমন্বয়ে গঠিত। কয়েকটি অ্যালভিওলাসের গহবর শূন্য হইলেও অধিকাংশের গহবর কলয়েড পদার্থ (Colloid material) দ্বারা পূর্ণ থাকে (চিত্র 12.12)। সমগ্র গ্রন্থিটি তান্তব আবরক কলা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ইহা হইতে সৃষ্ট ট্রাবিকিউলি (Trabeculae) গ্রন্থির অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়।



চিত্র 12.12 থাইরয়েড গ্রন্থির প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা

মানুষ স্বার্থহীনভাবে বিজ্ঞানচর্চা করে না। প্রকৃতির বিভিন্ন জীব সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই লব্ধ জ্ঞানকে নিজের প্রয়োজনে সার্থকভাবে ব্যবহার করাই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রাণী এবং প্রাণিজ বস্তুসম্ভার কিভাবে কাজে লাগান যায় তাহা প্রাণিবিদ্যা আলোচনার একটি অংশ। অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যায় কোন কোন প্রাণী মানুষের উপকার করে এবং কোন কোন প্রাণী মানুষের অপকার করে তাহাদের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়। উপকারী প্রাণীদের সনাক্তকরণ এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যথোপযুক্ত উপায়ে ঐ সকল প্রাণী হইতে উপকার আদায় করা এবং অন্যদিকে অপকারী প্রাণীদের সনাক্তকরণ, প্রয়োজনে তাহাদের নিধন অথবা তাহাদের হাত হইতে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করাই অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য।

অনুচ্ছেদ 13

রেশম শিল্প

13.1 রেশম শিল্প কাহাকে বলে (Sericulture)

প্রাকৃতিক রেশম বা সিল্ক (Silk) রেশম পোকা বা রেশম মথের (Silk-worm or Silk-moth) গুটি বা কোয়া বা কোকুনের (Cocoon) আবরণী হইতে পাওয়া যায়। রেশম পোকা পালন, রেশমগুটি হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ এবং রেশম পোকার খাদ্যের চাষকে সামগ্রিকভাবে রেশম শিল্প বলা হয়।

13·2 রেশম শিল্পের ইতিহাস

রেশম পোকার গুটি হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ একটি বহু প্রাচীন শিল্প। অনুমান করা হয় চীনদেশে 3500 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম রেশম পোকার গুটি হইতে রেশম সুতা সংগ্রহের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। আবার অনেকে মনে করেন হিমালয় পর্বতের পূর্বাঞ্চলের কোনও এক দেশে সম্ভবত রেশম শিল্পের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। তবে একথা স্বীকৃত যে চীনদেশের বন্য রেশম মথ (*Bombyx mandarina*) হইতেই বর্তমান পৃথিবীর সর্বদেশের গৃহপালিত রেশম মথের উদ্ভব হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব 555 বৎসরে দুইজন ইউরোপীয় ধর্মযাজক কোথা হইতে রেশম পাওয়া যায় তাহা জানিতে পারেন এবং একরকম চুরি করিয়াই চীনদেশ হইতে কিছু রেশম মথের ডিম ও মালবেরী বা তুঁত (Mulberry) গাছের বীজ লইয়া কনসতানতিনোপোলে (Constantinopole) আসেন। এইভাবে ইউরোপে রেশম চাষের সূত্রপাত হয়।

গ্রীক ও রোমানরা রেশম বস্ত্র ব্যবহার করিত। আরব ব্যবসায়ীরা প্রাচ্যদেশ হইতে রেশম বস্ত্র সংগ্রহ করিত এবং গ্রীক ও রোমানদের নিকট হইতে রেশম বস্ত্রের জন্য সম ওজনের সোনা মূল্য হিসাবে গ্রহণ করিত। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে এইভাবে সেই যুগে একটি "সিল্ক রোড" বা রেশম ব্যবসায়ের জন্য রাস্তা (Route) গঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে পরিব্রাজক মার্কো পোলো (Marco Polo) সিল্ক রোড বরাবর প্রাচ্যে আসিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সম্ভবত ইতিহাস-পূর্ব যুগে রেশম শিল্পের সূচনা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক রাজা পারস্য সম্রাটকে খ্রীষ্টজন্মের 1000 বৎসর পূর্বে রেশম বস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্যগুলিতে রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। পূর্ব-ভারতের অনেক অঞ্চলে রেশম শিল্প প্রায় কুটির শিল্পে পরিণত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অনেক লোকের রেশম শিল্পই মুখ্য উপজীবিকা।

ভারতবর্ষে মূলত মালবেরী বা চাইনীজ রেশম মথের চাষ হয়। কর্ণাটক, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে রেশম শিল্প সুগঠিত। অপরিমার্জিত রেশম সুতা (Raw silk) উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের 50 লক্ষ লোকের রুজি-রোজগার রেশম শিল্পের মাধ্যমে হয়। সেই হিসাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর রেশম শিল্পের প্রভাব অনেক।

খ্রীষ্টজন্মের 200 বৎসর পরে জাপান রেশম চাষ শুরু করে। বর্তমানে 21টি দেশে রেশম মথের চাষ হয়। ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান ছাড়াও ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন ও গ্রীস দেশে রেশম চাষ হয়। রাশিয়া ও ব্রেজিল সাম্প্রতিক কালে রেশম চাষ সুরু করিয়াছে।

পৃথিবীতে যত পরিমাণ সুতাবস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহার প্রায় 2 শতাংশ রেশম বস্ত্র। এই দুই শতাংশের মধ্যে 63 শতাংশ জাপান, 15 শতাংশ চীন, 8 শতাংশ রাশিয়া, 4 2 শতাংশ ইটালী এবং 4 শতাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়।

রেশম শিল্প গরীবের শিল্প যদিও রেশম "সুতার রাণী" হিসাবে অধিষ্ঠিতা। ভারতবর্ষের ন্যায় উন্নতিকামী দেশের রেশম সুতার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। রেশম শিল্পের সহিত 50 লক্ষ লোক জড়িত। সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেশম শিল্পের ভূমিকা কম নহে। রেশম শিল্পের দরুন যে-সমস্ত উপজাত বস্তু পাওয়া যায় তাহা হইল সার্জিক্যাল অপারেশনে (Surgical operation) ব্যবহৃত সুতা। শূককীটের তৈল (Pupal oil) মাছের খাদ্য এবং পোলট্রির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকার কর্তৃক সেই কারণে রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম কৃষকদের অর্থ সাহায্য, রেশম মথের খাদ্য মালবেরী গাছের চাষবৃদ্ধি, গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন, রেশম চাষীদের উন্নত ও নিরোগ রেশম মথের ডিম বিতরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম পরিকল্পনায় ভারত সরকার 20 কোটি টাকার রেশম রপ্তানির লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন।

13.3 কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেশম মথ

বেশ কয়েক ধরনের বন্য, আধা-গৃহপালিত এবং গৃহপালিত রেশম মথের গুটি হইতে রেশম সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষে চারি প্রজাতির রেশম মথ প্রতিপালিত হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষে যে যে প্রজাতির রেশম মথ প্রতিপালন করা হয় তাহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল—

A. **মালবেরী সিল্ক ওয়ার্ম বা চাইনীজ সিল্ক ওয়ার্ম** (Mulberry or Chinese silkworm)—ইহাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম বোমবিক্স মোরি (*Bombyx mori*)। চীনদেশ এই রেশম মথের আদি বাসস্থান হইলেও বর্তমানে ইহাদের পৃথিবীর বহুদেশে সার্থক ভাবে অভিযোজিত করা হইয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া গৃহপালিত থাকার ফলে ইহাদের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে বনে ছাড়িয়া দিলে

ইহারা বাঁচিতে পারে না। ইহাদের গুটি হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের রেশম সুতা পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী করা হয়। ইহাদের লার্ভা কেবলমাত্র মালবেরী (*Morus indica*) বা তুঁত গাছের পাতা খায়।

B. **তসর বা তাসা সিল্কওয়ার্ম** (Tussore or Tussah silkworm) —ইহাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম অ্যানথেরেইয়া মিলিট্টা এবং অ্যানথেরেইয়া পাফিয়া (*Antheraea mylitta and Antheraea paphia*)। চীন, ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কায় ইহাদের পাওয়া যায়। ইহাদের গুটির সুতা হইতে তসর বস্ত্র তৈয়ারী করা হয়। ইহাদের লার্ভা শাল (*Shorea robusta*), ওক (*Quercus serrata*), কুল (*Zizyphus jujuba*), অর্জুন (*Terminalia arjuna*) ইত্যাদি গাছের পাতা খায়।

C. **মুগা সিল্কওয়ার্ম** (Muga silkworm)—ইহার বিজ্ঞানসম্মত নাম অ্যানথেরেইয়া আসামেনসিস (*Antheraea assamensis*)। ইহাদের প্রায় বন্য বা আধা-গৃহপালিত দশায় পূর্ব হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গুটি হইতে পাওয়া সুতায় মুগা বস্ত্র নির্মিত হয়। লার্ভা অবস্থায় ইহারা চাঁপা (*Machilus bombycina, Michelia champaka*), সিনামন (Cinnamon) ইত্যাদি গাছের পাতা খায়।

D. **এড়ি সিল্ক মথ** (Eri silkmoth)—ইহাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম ফাইলোসেমিয়া রেসিনি (*Philosamia racini*)। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া এবং আসামে ইহাদের বন্য বা গৃহপালিত অবস্থায় পাওয়া যায়। লার্ভা অবস্থায় ইহারা রেড়ি (Castor or *Ricinus communis*), টোপিয়োকা (*Manihot utilissima*) গাছের পাতা খায়। রেড়ি মজবুত কিন্তু কর্কশ অবয়বের (Rough texture) রেশম বস্ত্র।

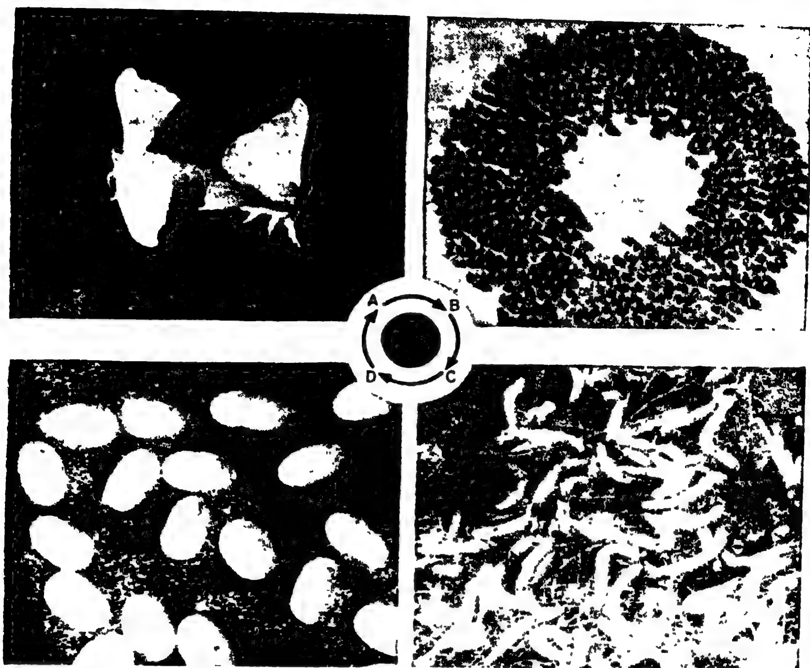
13.4 মালবেরী রেশম মথের জীবন বৃত্তান্ত

রেশম মথের জীবন বৃত্তান্ত চক্রাকার [(Cyclic) চিত্র 13.1)]। ডিম অবস্থায় জীবন শুরু করিয়া পুনরায় পরিণত বয়সে ডিম পাড়িতে স্ত্রীমথের প্রায় দুইমাস সময় লাগে।

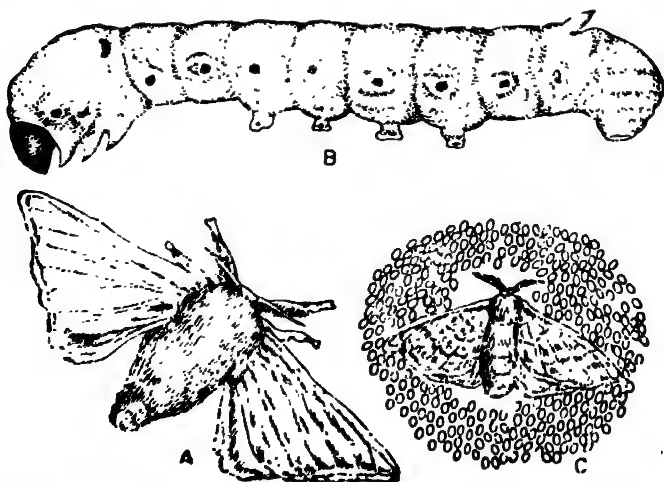
ডিম : স্ত্রীমথ তুঁত গাছের পাতায় অথবা পরীক্ষাগারে ব্লটিং কাগজে 300 হইতে 500 ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ছোট, হলুদ বর্ণের ও আলপিনের মাথার ন্যায় দেখায়। ডিমগুলির বাহিরে একটি কাইটিন নির্মিত কঠিন আবরণী থাকে। ডিমগুলিকে স্ত্রীমথ বিশেষ গ্রন্থি নিঃসৃত একরকম আঠালো পদার্থ দ্বারা তুঁত পাতায় আটকাইয়া দেয়। সব ডিম পাড়িতে স্ত্রীমথের 24 ঘণ্টার মত সময় লাগে। 10 হইতে 12 দিন পরে ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হয়। লার্ভাকে ক্যাটারপিলার (Caterpillar) বলা হয়। ইহার প্রচলিত নাম পলু (চিত্র 13.2)।

লার্ভা : সদ্যনির্গত লার্ভা চুলের ন্যায় সরু এবং লম্বায় প্রায় 3 মিলিমিটার। ইহার দেহ বাদামী বর্ণের ও রোমযুক্ত। দেহ লম্বা এবং তিনটি অংশে বিভক্ত—

মাথা, বক্ষ এবং উদর। বক্ষ 3 খণ্ডকযুক্ত এবং উদর 10 খণ্ডকযুক্ত। মস্তকে মুখছিদ্র



চিত্র 13.1 রেশম মথের জীবনচক্র।



চিত্র 13.2 বোম্বিক্স মোরির পূর্ণাঙ্গ দশা (A), লার্ভা (B), ডিম্ব প্রসবরত স্ত্রী (C)।

এবং উপর ও নিচের চোয়াল আছে। পলু অত্যন্ত চঞ্চল। লার্ভা অবস্থায় ইহারা মালবেরী (তুঁত) পাতা খায় এবং চারিবার খোলস ত্যাগ করে। প্রথমবার খোলস ত্যাগের পূর্বে ইহারা প্রচুর তুঁত পাতা খায়। রেশম কীটপালকগণ এই অবস্থার লার্ভাকে কচি এবং টুকরা করিয়া কাটা তুঁত পাতা খাইতে দেয়। পরবর্তী দশাগুলিতে ইহাদের কচি পাতা না দিলেও চলে। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় লার্ভার ওজন সদ্যনির্গত লার্ভার তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পূর্ণগঠিত লার্ভা সদ্যনির্গত লার্ভা অপেক্ষা প্রায় 10,000 গুণ ওজনে বাড়ে। সদ্যনির্গত লার্ভা হইতে পূর্ণ গঠিত লার্ভা অবস্থায় আসিতে একটি লার্ভা নিজের দেহের ওজনের 30,000 গুণ পাতা ভক্ষণ করে।

পূর্ণ গঠিত লার্ভার একটি উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গ হইল বুনন বা সিল্ক গ্রন্থি (চিত্র 13.3)। দেহের চতুর্থ হইতে অষ্টম দেহখণ্ডের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া সিল্ক গ্রন্থি থাকে। ওজনে ইহা সমগ্র দেহের ওজনের দুই তৃতীয়াংশ।

চতুর্থবার খোলস ছাড়ার পর লার্ভা সিল্ক গ্রন্থি হইতে লালার ন্যায় একরকম রস বাহির করে। এই রস বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়াই শক্ত হইয়া যায় এবং সিল্ক বা রেশম সুতার সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রাকৃতিক রেশম সুতা রেশম কীটের পূর্ণ গঠিত লার্ভার রেশম গ্রন্থি নিঃসৃত রস। এই রস জলীয় অবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন হইয়া রেশম সুতায় পরিণত হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে রেশম সুতা দুই প্রকার প্রোটিন মিলিত হইয়া সৃষ্টি করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় রেশম সুতার একটি কেন্দ্রীয় অক্ষ (Axis) থাকে এবং এই অক্ষকে বেষ্টন করিয়া একটি স্তর থাকে। কেন্দ্রীয় অক্ষটি ফাইব্রোইন (Fibroin) নামক প্রোটিন এবং বাহিরের স্তরটি তিন প্রকার সেরিসিন (Sericin) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ফাইব্রোইন সাদা এবং সেরিসিন রক্তাভ। সিল্ক সুতার 70—80% ফাইব্রোইন এবং 20--30% সেরিসিন। রেশম সুতা স্থিতিস্থাপক এবং সর্বদা উজ্জ্বল থাকে। ব্লিচিং (Bleaching) করিয়া ইহাকে নানা রঙে রঞ্জিত করা যায়। লার্ভা নিজেকে বেষ্টন করিয়া যে রেশম সুতার খোলক তৈয়ারী করে প্রচলিত অর্থে তাহাকেই গুটি বা কোকুন বলে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, একটি গুটি সৃষ্টিতে একটি লার্ভা তাহার মাথা 60,000 হইতে 30,0000 বার নাড়ে। 15 সেন্টিমিটার সিল্ক সুতা প্রস্তুত করিতে ইহার এক মিনিট সময় লাগে। কোকুন গঠিত হইতে 3 হইতে 5 দিন সময় লাগে।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে খোলক হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ করা হয়।

পিউপা : লার্ভা হইতে কোকুনের মধ্যে [illegible] অবস্থায় পিউপা সৃষ্টি হয়। পিউপা দশায় রেশম মথ কিছু খায় না।

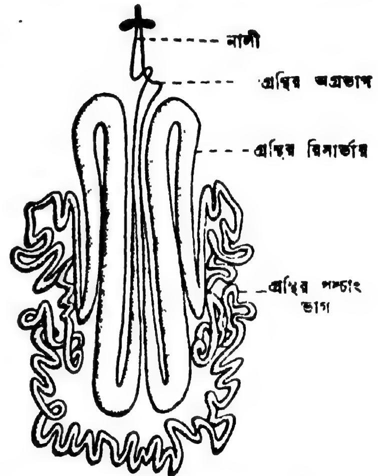
পূর্ণাঙ্গ মথ : পিউপা অবস্থায় প্রায় দশ দিন থাকার পর কোকুনের খোলক ছিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ মথ বাহির হয়। দেখা গিয়াছে পুরুষমথ স্ত্রীমথ অপেক্ষা আগে কোকুন ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসে।

রেশম মথের জীবনচক্র একাধিক ভৌত শর্তের উপর নির্ভরশীল। বাতাসের আর্দ্রতা, উষ্ণতা, আলোকের তীব্রতা ইত্যাদি ভৌত শর্তের অন্তর্গত। এই শর্তগুলি একদিকে রেশম মথের লার্ভার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে রেশম সুতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। একচক্রী রেশম মথের জীবনচক্র উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধিতে সহজেই প্রভাবিত হইয়া যায়।

13.5 রেশম মথ প্রতিপালন

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রেশম মথ প্রতিপালন যথেষ্ট সতর্কতার সহিত করা হয়। রেশম মথ প্রতিপালনে তি[illegible] বি[illegible] পর্যায় আছে।

প্রথম পর্যায়: যে সমস্ত দেশে রেশম মথ প্রতিপালন করা হয় সেই সমস্ত দেশের সরকার উপযুক্ত স্থানে মথের জন্য প্রজনন বা ব্রিডিং কেন্দ্র (Breeding centre) স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রগুলিতে সরকার-নিয়োজিত কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী থাকেন। তাঁহারা সতর্কতার সহিত বিভিন্ন জাতের রেশম মথের প্রজনন করান। প্রজনন করানোর পর কাগজের কার্ডের উপর বা ব্লটিং কাগজের উপর রাখা কাঁচের ছোট বলয়ের (Ring) মধ্যে প্রতিটি স্ত্রীমথকে অন্তরীণ রাখা হয়। কাঁচের বলয়টিকে সেলিউল (Cellule) বলে। ঐ বলয়ের মধ্যবর্তী স্থলে স্ত্রীমথ ডিম পাড়ে।



চিত্র 13.3 সিল্ক গ্রন্থির গঠন।

দ্বিতীয় পর্যায়: এই পর্যায়ে পূর্বোক্ত ডিমগুলিকে লালন করা হয়। ডিমগুলি হইতে প্রথমে লার্ভা ও পরে কোকুন দশার উদ্ভব হয়। কোকুনগুলিকে কোকুন বীজ কেন্দ্রে (Cocoon seed station) স্থানান্তরিত করা হয়। বীজ কেন্দ্রে কোকুনগুলি হইতে পূর্ণাঙ্গ রেশম মথ বাহির হইলে ঐ মথগুলির মধ্যে আবার প্রজনন করানো হয়। প্রজনন করানোর পূর্বে স্ত্রীমথগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কেন না স্ত্রীমথগুলির অনেক সময় পেব্রাইন (Pebrine) নামক এক ধরনের রোগ হয়। সুস্থ ডিমগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে নির্বীজিত মোড়ক (Sterilized packet) রাখা হয়। একটি মোড়কের ওজন প্রায় 20 গ্রাম এবং ইহাতে আনুমানিক 16,000 ডিম থাকে। ইহা হইতে 20 কিলো কোকুন পাওয়া যায়। মোড়কগুলি চাষীদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়: রেশম চাষীরা ডিমগুলি পালন করে। ডিম ফুটিয়া লার্ভা

বাহির হইলে লার্ভাগুলিকে বাঁখারী নির্মিত ট্রে (Tray) বা ডালার মধ্যে রাখিয়া তুঁত গাছের পাতা খাইতে দেওয়া হয়। তুঁত পাতাগুলি অতি সকালে সংগ্রহ করার ফলে বাষ্পমোচনজনিত কোন পরিবর্তন পাতায় হইতে পারে না। প্রয়োজনে তুঁত পাতা 20°C ও 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা যুক্ত স্থানে সংরক্ষিত করা হয়। তুঁত গাছের পাতা খাইয়া লার্ভাগুলি বড় হয়। চলতি কথায় লার্ভাকে পলু বলে। লার্ভাগুলি চারিবার খোলস ছাড়ার পর খাওয়া বন্ধ করে এবং সিল্কগ্রন্থি হইতে লালা নিঃসৃত করিয়া নিজেদের কোকুন বা গুটির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। পিউপা পালনের জন্য বাঁখারী নির্মিত ট্রে "চন্দ্রাকী" বা খড় নির্মিত "মাবুশি" ব্যবহার করা হয়। কোকুনগুলিকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভিতরের পোকাটিকে মারিয়া ফেলা হয়। এই কোকুন হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ করা হয়।

রেশম কীট পালনে যে ঘরে রেশম কীট রাখা হয় তাহাকে কীটঘর বা পলুঘর বলে। পলুঘরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় তাপ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity) নিম্নে দেওয়া হইল :—

বয়স (লার্ভার)	তাপ	আপেক্ষিক আর্দ্রতা
প্রথম অবস্থা (1st Instar)	26—27°C	80—90%
দ্বিতীয় অবস্থা (2nd Instar)	25—26°C	75—85%
তৃতীয় অবস্থা (3rd Instar)	24—25°C	70—80%
চতুর্থ অবস্থা (4th Instar)	23—24°C	65—75%
পঞ্চম অবস্থা (5th Instar)	22—23°C	60—70%

রেশম কীটের কোন্ বয়সে কত খাবার লাগে এবং বয়সের সহিত ওজন ও দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিতালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বয়স	খাদ্য পরিমাণ	ওজন (গ্রাম)	কতগুণ ওজন বৃদ্ধি হয়	গড় দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার	কতগুণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়
প্রথম অবস্থা	4-5টি কচি পাতার টুকরা	0·54	12·75	0·675	1·90
দ্বিতীয় অবস্থা	5-6টি পাতা	2·65	68·31	1·152	3·80
তৃতীয় অবস্থা	8-10টি পাতা	14 88	343 28	2 748	7·26
চতুর্থ অবস্থা	4-5টি পাতা	80 22	1818·22	4·279	14·12
পঞ্চম অবস্থা	8-10টি পাতা	356·44	9126	7·222	23 84

13.6 কোকুন রেশম সুতার উৎস

রেশম মথ জীবনচক্রের পিউপা দশায় নিজেকে যে খোলকে আবৃত করিয়া রাখে সেই খোলক বা কোকুন হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ করা হয়। কোকুন গোলাকার, ডিম্বাকার

অথবা মধ্যস্থলে চাপা (Waisted) ইত্যাদি নানা ধরনের হয়। দুইটি পলু একত্রে কখনও কখনও দ্বিত্ব কোকুন (Double cocoon) গঠন করে। কিন্তু ইহা অভিপ্রেত নহে। কোকুনের আকার মথের জাতি (Race) অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। জাতি অনুযায়ী ইহার বর্ণ সাদা, গোলাপী, স্বর্ণাভ, হলুদ ও সবুজ হইতে পারে। কোকুনের বর্ণ ক্যারোটিনয়েড (Carotenoid) ও ফ্লাভোন (Flavone) এই দুইটি রঙ্গকের (Pigments) উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। রঙ্গকগুলি লার্ভার রক্ত হইতে সিল্ক গ্রন্থিতে যায় এবং তথা হইতে রেশম সুতায় পৌঁছায়।

কোকুনের ওজন লিঙ্গনির্ভর। যে কোকুনের মধ্যে স্ত্রী পিউপা থাকে তাহা পুরুষ পিউপার কোকুন অপেক্ষা ওজনে বেশী। কিন্তু পুরুষ পিউপার কোকুন হইতে বেশী পরিমাণ রেশম সুতা পাওয়া যায়। লার্ভা অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ করা যায়। স্ত্রী লার্ভার শরীরের পশ্চাৎ দিকের 11 এবং 12 খণ্ডকে একজোড়া করিয়া দাগ (Spot) থাকে। দাগগুলিকে হাসওয়াটার্সের (Hashwater's) পয়েন্ট বলে। পুরুষ লার্ভার ক্ষেত্রে একটিমাত্র দাগ থাকে। দাগটিকে হেরল্ডসবাড (Herolds bud) বলা হয়।

কোকুন হইতে পূর্ণাঙ্গ মথ নির্গত হইবার পূর্বেই কোকুনকে জলে সিদ্ধ করা হয়। ইহার পর কোকুন হইতে সুতা সংগ্রহ (Reeling) করা হয়। রিলিং করিবার জন্য চরকা, বিদ্যুত চালিত চরকা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

রিলিং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া করা হয়। একটি কোকুনের সমস্ত রেশম সুতা রীল করিবার পর অন্য একটি কোকুনের রেশম সুতার সহিত যুক্ত করিয়া দ্বিতীয়টিকে রীল করা হয় এবং এইভাবে সুতার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। প্রয়োজন বোধে একাধিক কোকুনের সুতা একত্রে রীল করা হয় বা সুতাগুলিকে পাকাইয়া রীল করা হয়। এক একটি কোকুন হইতে 400 হইতে 600 মিটার রেশম সুতা পাওয়া যায়। কোকুন হইতে সুতা লইবার পর পিউপাকে মুরগী বা মাছের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

13.7 রেশম কীটের রোগসমূহ

রেশম কীটের নানা ধরনের রোগ হয়। সার্থক রেশম কীট পালনে এই সমস্ত রোগ প্রতিবন্ধক হইয়া অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে। রেশম কীট পালকদের সেইজন্য রেশম কীটের রোগ ও রোগের উপসর্গগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

রেশম কীটের রোগের কারণগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

A. অনুজীব ঘটিত রোগ।

B. বিপাকীয় ক্রিয়ায় বিঘ্নজনিত রোগ।

C. পতঙ্গ শ্রেণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া জনিত রোগ।

A. অনুজীব ঘটিত রোগ

1 ফ্লেচেরি (Flacherie) বা কালাশিরা : ঠিক কি কারণে রেশম কীটের

ফ্লেচেরি রোগ হয় তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বর্তমানে ইহা প্রতিষ্ঠিত যে রেশম কীটের পাচনতন্ত্রে একাধিক কারণে এই রোগ হয়। স্ট্রেপটোকক্কাস, স্টেফাইলো-কক্কাস, ব্যাসিলাস প্রডিজিওসাস (*B. prodigiosus*) প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়। আবার অনেকে মনে করেন বিপাকীয় ক্রিয়ায় কোন কারণে বিঘ্ন ঘটার পর এই সমস্ত অনুজীব রেশম মথকে আক্রমণ করে। **লক্ষণ**: এই রোগে আক্রান্ত রেশম কীটেরা প্রথমে খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। পরে ইহাদের গাত্রচর্ম নরম হইয়া যায় এবং সর্বশেষে দেহ পচিয়া যায়।

প্রতিকার: এই রোগের কোন ঔষধ নাই। রোগাক্রান্ত লার্ভার অপসারণ সুস্থ লার্ভাগুলির আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হ্রাস করিতে পারে। প্রতিপালনের প্রতিস্তরে (সতেজ তুঁত পাতা সরবরাহ, সঠিক তাপমাত্রা ও আদ্রর্তা নিয়ন্ত্রণ) সতর্ক থাকিলে এই রোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

II. **গ্রাসেরি** (Grassarie) **বা রসা**: এই রোগের সঠিক কারণ জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন ইহা বোরেলিনা (Borrelina) নামক ভাইরাসজনিত রোগ। **লক্ষণ**: এই রোগে আক্রান্ত হইলে রেশম কীটের গাত্রচর্ম পাতলা হইয়া যায় এবং চর্মের নিচে পুঁজের ন্যায় কিছু বস্তু জমা হয়। **প্রতিকার**: লার্ভার দেহে কোন কারণে কোন ক্ষত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

III. **মাস্কারডাইন** (Muscardine) **বা চুণা কাঠি**: বিউভেরিয়া বেসিয়ানা (*Beauvaria bassiana*) নামক একপ্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়। **লক্ষণ**: এই রোগে আক্রান্ত হইলে রেশম কীটগুলি খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কীটগুলির গায়ে কালো কালো দাগ ফুটিয়া উঠে। কীটগুলির মুখ ও পায়ু হইতে একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। শেষে কীটগুলি মরিয়া যায়। **প্রতিকার**: আক্রান্ত লার্ভাগুলিকে অপসারণ করিলে ছত্রাকের রেণু বিস্তার বন্ধ হইতে পারে। পালন ঘর ও পালনের যন্ত্রগুলি নির্বীজন (Disinfect) করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা কম হয়। নির্বীজন করিবার জন্য 2·7% ফর্মালিন ব্যবহার করা হয়।

IV. **পেব্রাইন** (Pebrine) **বা কাটা**: নোসিমা বোম্বিসিস (*Nosema bombycis*) নামক একপ্রকার পরজীবী এককোষী প্রাণীর (Protozoa) আক্রমণে এই রোগ হয়। প্রথমে এককোষী নোসিমা কীটগুলির মুখগহ্বরকে আক্রমণ করে ও ধীরে ধীরে সর্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে। **লক্ষণ**: রোগাক্রান্ত কীটগুলির দেহ লম্বা ও সরু হইয়া যায় এবং গায়ে কালো কালো দাগ দেখা যায়। স্ত্রীমথ একইস্থানে একটির উপর একটি ডিম পাড়ে। পলুর খোলস ছাড়া অনিয়মিত হইয়া পড়ে। মাতৃ স্ত্রীমথ হইতে জনিতৃ স্ত্রীমথে এই রোগ সংক্রামিত (Transovarine) হয়। **প্রতিকার**: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্পোর দেখা যাওয়া মাত্রই রোগাক্রান্ত লার্ভাগুলিকে অপসারিত ও ধ্বংস করিতে হয়। ডিম পাড়ার কাগজগুলিকে 2% ফর্মালিন দ্রবণে রাখিয়া ও পরে জলে ধুইয়া নির্বীজিত করিলে সুফল পাওয়া যায়।

B. **বিপাকীয় ক্রিয়ায় বিঘ্নজনিত রোগ :** পরজীবি ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে রেশমকীট লার্ভার বিপাকীয় ত্রুটির জন্য নানা প্রকার রোগ হয়। এইরূপ দুইটি রোগের নাম—কোর্ট (Court) বা লালী এবং গ্যাটাইন (Gattine)। কোর্ট রোগে লার্ভা সুস্থ থাকে কিন্তু রেশম গ্রন্থি সুগঠিত না হওয়ায় কোকুন সৃষ্টি হয় না। গ্যাটাইন রোগে লার্ভার চর্ম স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং দেহের অসম বৃদ্ধি হয়।

C. **পতঙ্গ শ্রেণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া জনিত রোগ :** একাধিক পেস্টের আক্রমণে রেশম চাষের ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য পেস্ট হইল (a) উজি মাছি (*Tricholyga bombycis*)—ইহাদের স্ত্রী মাছি তৃতীয় বা চতুর্থ দশার লার্ভার গায়ে ডিম পাড়ে। মাছির ডিম হইতে উদ্ভূত ম্যাগট লার্ভার শরীরে প্রবেশ করে এবং উহারা লার্ভার কলা (Tissue) খাইয়া বর্ধিত হয়। (b) ডার্মাটিড বীটল (Dermatid beetle) —কলিওপটেরা (Coleoptera) বর্গের এই বীটলগুলি রেশম পোকার কোকুনে প্রবেশ করে ও পিউপা ভক্ষণ করে। (c) পেডিকুলয়ডিস (Pediculoides) গণের (শ্রেণী অ্যারেকনিডা) মাইট (Mite) পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মথের ক্ষতি করে। ইহা ছাড়াও পিঁপড়া, হেক্সামারনিস (Hexamarnis) নামক গোল কৃমি, টিকটিকি, ইঁদুর ও কাঠবেড়ালী, কাক, চড়াইপাখী প্রভৃতি রেশম শিল্পের ক্ষতি করে।

13.8 রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

I. **তুঁতগাছের চাষ**—রেশম কীট বিশেষত মালবেরী রেশম কীট তুঁত গাছের (*Morus indica*) পাতা খায়। একটি কীট পাতা খাইয়া নিজের ওজন প্রায় 10,000 গুণ বৃদ্ধি করে এবং নিজের দেহের ওজনের 30,000 গুণ ওজনের পাতা খায়। সুতরাং রেশম কীট প্রতিপালনের জন্য তুঁত গাছের পাতা প্রয়োজন। সব মাটিতে তুঁত গাছ জন্মায় না। যে সমস্ত জমিতে 30 শতাংশ খনিজ পদার্থ, 20 শতাংশ জল এবং 10 শতাংশ জৈব পদার্থ থাকে এবং যে জমির pH 6·5 সেই জমিতে তুঁত গাছ ভালভাবে জন্মায়। তুঁত গাছ যৌন ও অযৌন উভয় উপায়েই বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। নূতন জমিতে তুঁতগাছের আবাদের জন্য প্রথমে জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়। কম্পোস্ট সার, পুকুরের পাঁক, কচুরীপানা, খইল ইত্যাদি সার রূপে ব্যবহার করা হয়। ইহার পর 4-5 বৎসর বয়স্ক তুঁতগাছের ডাল কাটিং (Cutting) হিসাবে বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ জমিতে লাগান হয়। কাটিংগুলি 1" ব্যাস বিশিষ্ট এবং 6" লম্বা হইলে চাষ ভাল হয়।

কর্ণাটকে 2 লক্ষ 25 হাজার একর জমিতে তুঁত গাছের আবাদ করা হয় এবং ঐ স্থানের বাৎসরিক রেশম উৎপাদনের পরিমাণ 2 হাজার টন। পশ্চিমবঙ্গে 17·5 হাজার একর জমিতে তুঁত গাছের আবাদ করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে 300 টন রেশম উৎপাদিত হয়। পঞ্চম যোজনার শেষে পশ্চিমবঙ্গে তুঁত গাছের আবাদের জন্য আরও 2·5 হাজার একর জমি ব্যবহার করা হইবে। অনুমিত হয় ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের রেশম উৎপাদন বৎসরে আরও 200 টন বাড়িয়া 500 টন হইবে।

II **দ্বিচক্রী (Bivoltine) রেশম মথের প্রতিপালন**—রেশম মথের জীবন-চক্র 1 বৎসরে একবার আবর্তিত হইলে ঐ রেশম মথকে একচক্রী (Univoltine) বলা হয়। কোনও কোনও রেশম মথের জীবনচক্র বৎসরে দুইবার আবর্তিত হয়। ইহাদের দ্বিচক্রী (Bivoltine) রেশম মথ বলে। আবার কোনও কোনও রেশম মথের জীবনচক্র বৎসরে অনেকবার আবর্তিত হয়। ইহাদের বহুচক্রী (Multivoltine) বলা হয়।

আমাদের দেশে প্রধানত বহুচক্রী রেশম কীট প্রতিপালন করা হয়। বহুচক্রী রেশম কীটের সুতা সরু এবং স্থিতিস্থাপকতাহীন। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বিচক্রী রেশম কীট প্রতিপালন বেশী লাভজনক। দ্বিচক্রী রেশম কীট প্রতিপালনে প্রতিপালকদের উৎসাহ ও ওয়াকিবহাল করিলে রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে।

III. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংকর জাতের রেশম মথ সৃষ্টি এবং সুলভে প্রতিপালকদের ডিম বিক্রয় অবশ্য করণীয়। রেশম কীটের রোগ ও রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে রেশম প্রতিপালকদের শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত।

IV. রেনডিটা (Rendita) নির্ণয়ে তৎপর থাকিলে চাষের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায়। রেনডিটা বলিতে কত কিলোগ্রাম কোকুন ব্যবহার করিলে 1 কিলোগ্রাম রেশম সুতা পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। রেনডিটা 20 বলিলে বুঝিতে হইবে 20 কিলোগ্রাম কোকুন হইতে 1 কিলোগ্রাম সুতা পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থে রেনডিটা রেশম চাষের শ্রীবৃদ্ধির সূচক।

V. রেশম চাষীদের সরকারী ঋণ বা ব্যাংক ঋণ (Bank loan) দেওয়ার পদ্ধতি সরলতর করা উচিত। প্রয়োজন এবং পরিমাণ মত ঋণ যথাসময়ে পাইলে রেশম চাষীরা ভালভাবে রেশম চাষ করিতে পারিবে। ইহার ফল চাষীদের এবং সামগ্রিক ভাবে দেশের অর্থনীতি ভাল হইবে।

VI. সরকার পরিচালিত ব্রিডিং কেন্দ্র (Breeding centre)-গুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সুশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ এবং ঐ কর্মীদের দ্বারা সময় সময় চাষীদের পলুঘর-গুলির পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কর্মীদের পরামর্শ চাষীদের অহেতুক অর্থ-ক্ষতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ 14

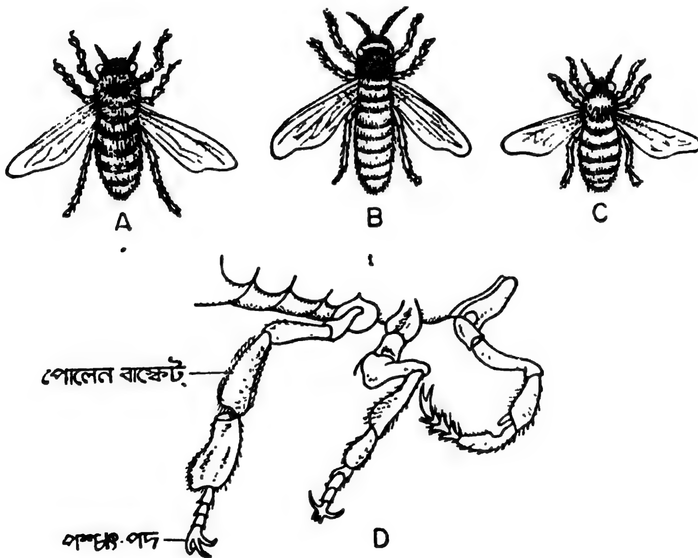
মৌমাছি প্রতিপালন

14.1 মৌমাছি প্রতিপালনের (Apiculture) ইতিহাস

মৌমাছি ও মৌমাছি কর্তৃক উৎপাদিত মধুর সহিত মানুষের পরিচয় বহুযুগের। চিনি বা শর্করা উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে মধুই ছিল মানুষের জানা একমাত্র মিষ্টদ্রব্য। বেদ এবং রামায়ণে মধুর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় মধুর সহিত মানুষের পরিচয় বহুযুগ পূর্বেই হইয়াছে।

14.2 কি ভাবে প্রাকৃতিক মধু উৎপন্ন হয়

কর্মী মৌমাছি বিভিন্ন ফুল হইতে মকরন্দ (Nectar) এবং পরাগ রেণু (Pollen grain) সংগ্রহ করে (চিত্র 14.1)। এইগুলি তাহারা নিজেদের খাদ্যনালীর ক্রপ বা হনি



14.1 একটি মৌচাকের মৌমাছিদের প্রকার ভেদ -(A) পুরুষ, (B) রাণী, (C) কর্মী, (D) কর্মী মৌমাছির একপাশের পদসমূহ—পশ্চাৎ পদে পোলেন বাস্কেটের অবস্থান লক্ষ্যণীয়।

স্টমাকে (Crop or Honey stomach) লইয়া যায়। তথায় উৎসেচকের বিক্রিয়ার ফলে ঐগুলি ডেক্সট্রোজ ও লেভুলোজে (Dextrose and Levulose) রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই পরিবর্তিত অংশটুকু কর্মী মৌমাছি মৌচাকের কয়েকটি বিশেষিত কক্ষে বমন করে। এই বমন করা বস্তুই মধু। মধুতে শতকরা 17 ভাগ জল, 78

ভাগ শর্করা (ডেক্সট্রোজ ও লেভুলোজ), কিছু খনিজ পদার্থ (Minerals) এবং উৎসেচক থাকে। প্রাকৃতিক মধু কেবলমাত্র মৌমাছিই তৈয়ারী করিতে পারে। মধুর উপাদান জানা থাকিলেও মানুষ কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক মধুর ন্যায় মধু সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

14.3 মধু ও মোমের ব্যবহার

মধু বীজাণু নিরোধক (Antiseptic)। বীজাণু বিশেষ করিয়া ব্যাক্টিরিয়া নিরোধক হওয়ায় মধু নিজে পচিয়া যায় না। প্রাচীনকালে বহুদেশে ক্ষতস্থানে মধুর প্রলেপ দেওয়া হইত। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় মধুর প্রভূত ব্যবহার আছে। মিষ্টদ্রব্য হিসাবে এবং অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করিতে মানুষ মধু ব্যবহার করে। মধু সহজপাচ্য।

মৌমাছির বাসা বা মৌচাক মৌমাছির মোম (Bee's wax) দ্বারা প্রস্তুত (চিত্র 14.2)। কর্মী মৌমাছির উদরের শেষ চারিটি খণ্ডকের অঙ্কীয় দেশে এক বিশেষ ধরনের গ্রন্থি [মোম গ্রন্থি বা ওয়াক্স গ্ল্যাণ্ড (Wax gland)] আছে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রস ছিদ্র দ্বারা বাহির হইয়া উদরের অঙ্কীয় দেশে জমা হয়। কর্মী মৌমাছিরা এই সঞ্চিত মোমকে মাপ অনুযায়ী কাটিয়া লইয়া মৌচাকের কক্ষগুলি গঠন করে।



চিত্র 14.2 একটি আংশিক ব্যবচ্ছেদিত মৌচাকের চিত্ররূপ।

মৌমাছির মোম প্রধানত প্রসাধন দ্রব্য (লিপস্টিক, মুখে মাখার ক্রিম, পমেড) প্রস্তুতে এবং ক্যাথোলিকদের গির্জায় ব্যবহৃত মোমবাতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। বাটিকের কাজে মৌমাছির মোম ব্যবহার করা হয়।

14.4 মধু উৎপাদক মৌমাছি

মৌমাছি পতঙ্গ শ্রেণীর এপিস (*Apis* গণভুক্ত। এপিস গণের অন্তর্গত চারি প্রজাতির মৌমাছি মধু উৎপাদনে দক্ষ। ইহাদের মধ্যে তিন প্রজাতির মৌমাছি বন্য দশায় ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ এসিয়ায় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের মধু উৎপাদনকারী মৌমাছির বিজ্ঞানসম্মত নাম এপিস মেলিফেরা বা মেলিফিকা (*Apis mellifera* or *mellifica*)। ভারতবর্ষে যে তিন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায় তাহাদের নাম এবং পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হইল—

a **এপিস ডরসাটা** (*Apis* or *Megaphis dorsata*) : ইহারা বৃহদাকৃতি মৌমাছি বা বোমবারা নামেও পরিচিত। ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত মৌচাকের ক্ষেত্রফল প্রায় $1 \times 1\frac{1}{2}$ বর্গ মিটার। ইহারা গাছের ডালে, গুহার মধ্যে বা বাড়ীর দেওয়ালে মৌচাক তৈয়ারী করে।

b. **এপিস ফ্লোরি** (*Apis* or *Microaphis florae*) : এই প্রজাতির কর্মী মৌমাছিরা আকারে ছোট এবং ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত মৌচাকও আকারে ছোট। ইহারা গাছের কোটরে বা ডালে এবং বাড়ীর দেওয়ালে মৌচাক প্রস্তুত করে। মৌচাক আকারে ছোট ($\frac{1}{8}\times\frac{1}{8}$ বর্গ মিটার) এবং একটি মৌচাক হইতে খুব কম পরিমাণ মধু পাওয়া যায়।

c. **এপিস ইনডিকা** (*Apis indica*) : এই প্রজাতির মৌমাছিদের আমরা সচরাচর দেখি। ভারতবর্ষের পাহাড় ও সমতল অঞ্চলে ইহাদের পাওয়া যায়। ইহারা গাছের কোটরে, ডালে, গুহায় বা বাড়ীর দেওয়ালে মৌচাক তৈয়ারী করে।

পাশ্চাত্যের মেলিফেরা প্রজাতির মৌমাছি এবং প্রাচ্যের ইনডিকা প্রজাতির মধ্যে প্রচুর সমতা আছে এবং ইহারা উভয়েই প্রায় গৃহপালিত হইয়া উঠিয়াছে।

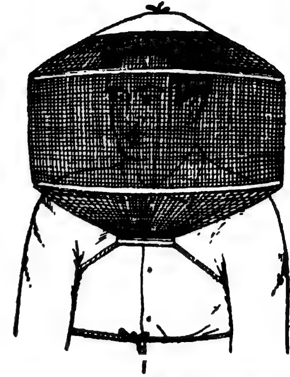
1970 সালে কয়েকটি দেশে মৌমাছি কর্তৃক উৎপাদিত মধু ও মৌমাছির মোমের পরিমাণ, তাহাদের মূল্য এবং কত লোক এই কার্যে নিয়োজিত তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

দেশ	মধুর পরিমাণ কিলোগ্রাম	মৌমাছির মোম কিলোগ্রাম	মূল্য কোটি টাকা	মৌচাকের সংখ্যা	প্রতিপালকের সংখ্যা
আমেরিকা	10,08,74,000	27,24,000	25	4,756,000	500,000
কানাডা	2,31,54,000	2,72,000	12	400,000	32,000
ভারতবর্ষ	40,86,000	90,800	0·5	?	?

উপরের তালিকা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ বিশেষত আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের তথ্য দেওয়া হয় নাই) মৌমাছি প্রতিপালনের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়া উঠিয়াছে। মৌমাছি প্রতিপালন ব্যয়সাপেক্ষ নহে কিন্তু ইহা প্রতিপালন করিয়া আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়। মৌমাছি প্রতিপালন কুটির শিল্প রূপে কাজে লাগাইয়া ভারতবর্ষের ন্যায় উন্নতিকামী দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করিয়া তোলা সম্ভব। ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে (Community Development Project) সেই কারণে মৌমাছি প্রতিপালনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মৌমাছি প্রতিপালন পদ্ধতির উন্নতি ও অসুবিধাসমূহ দূর করিবার জন্য নয়াদিল্লীর ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (Indian Agricultural Research Institute) গবেষণার কাজ চলিতেছে। নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনও মৌমাছি প্রতিপালনে উৎসাহ ও সাহায্য দান করে।

14.5 মধু ও মৌচাক সংগ্রহের প্রাচীন পদ্ধতি

মধুসংগ্রহকারীরা সাধারণত বন-জঙ্গলে মৌচাকের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৌচাকের সন্ধান পাইলে তাহারা মশাল জ্বালাইয়া সেটিকে মৌচাকের নিচে ধরে। আগুনের উত্তাপে মৌমাছিরা পলাইয়া যাইবার পর তাহারা মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু ও চাক হইতে মৌমাছির মোম সংগ্রহ করে। এই প্রাচীন পদ্ধতি (চিত্র 14 3) নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য গ্রহণযোগ্য নহে।



চিত্র 14 3 মৌমাছি প্রতিপালকদের জন্য জালের আবরণী।

a. বন-জঙ্গলে মৌচাক থাকে ঠিকই তবে মৌচাকের সংখ্যার কোন স্থিরতা থাকে না। সুতরাং মধু সংগ্রহকারীরা সকল সময় পরিশ্রম অনুযায়ী মধু সংগ্রহ করিতে পারে না।

b. মৌচাক হইতে মধু নিষ্কাশন করার পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত নহে। কেননা এই পদ্ধতিতে যে মধু নিষ্কাশিত হয় তাহা খাঁটি নহে, মৌমাছির লার্ভার দেহনিঃসৃত রস, মৌমাছিদেহের ছিন্ন অংশ, পরাগরেণু এবং ধূলাবালি এই মধুর সহিত থাকে।

c. মধু সংগ্রহের সময় অনেক মৌমাছির অকারণ মৃত্যু ঘটে।

14.6 মৌমাছি প্রতিপালনের আধুনিক পদ্ধতি

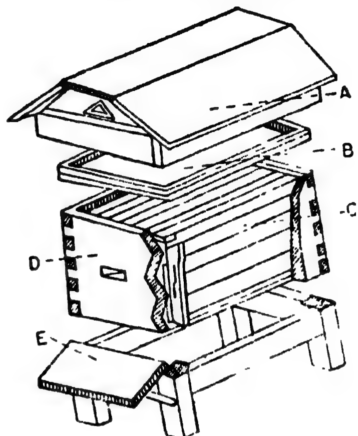
ঊনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মৌমাছি প্রতিপালনের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত এবং পরিগৃহীত হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি প্রতিপালনের ব্যবস্থাদি 1882 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে অবিভক্ত বাংলাদেশে এবং পরে পাঞ্জাবে গ্রহণ করা হয়। তবে সাফল্যের হার খুব বেশী হয় নাই।

আধুনিক পদ্ধতিতে দুইটি মূল বিষয় আছে। একটি হইল বিশেষভাবে নির্মিত বাক্সের ভিতর মৌমাছি প্রতিপালন এবং অন্যটি হইল মধু নিষ্কাশন ও মৌমাছির মোম সংগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা ও কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

1851 খ্রীষ্টাব্দে ল্যাঙ্গস্ট্রথ (Langstroth) নামক একজন ধর্মযাজক মৌমাছি প্রতিপালনের জন্য এক বিশেষ ধরনের বাক্স উদ্ভাবন করেন (চিত্র 14.4)। কিছু পরিবর্তিত হইলেও তাঁহার উদ্ভাবিত মৌমাছি প্রতিপালন পদ্ধতি বর্তমানে পৃথিবীর নানাদেশে ব্যবহৃত হয়। ল্যাঙ্গস্ট্রথ উদ্ভাবিত মৌমাছি পালন বাক্সে একটি কাঠের কাঠামো থাকে। এই কাঠামোয় লাগান অথবা খোলা যায় এই ধরনের কয়েকটি ফ্রেম থাকে। কয়েকটি বিশেষিত ফ্রেম ব্রুড চেম্বার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ব্রুড চেম্বারে মৌমাছির সংখ্যা বেশী হইলে উহাদের থাকিবার জন্য সুপার (Super) নামক কয়েকটি ফ্রেম থাকে। এই বাক্সে মৌমাছির প্রবেশ ও প্রস্থানের বন্দোবস্ত রাখা হয়।

14.7 কিভাবে মৌমাছি প্রতিপালন করা যাইতে পারে

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে বিশেষত উত্তরপ্রদেশে গৃহনির্মাণের সময় গ্রামবাসীরা গৃহের দেওয়ালে আয়তাকার জায়গা রাখে। এইস্থানে মৌমাছিরা মৌচাক তৈয়ারী করে, এবং গৃহস্থ ঐ চাক হইতে মধু সংগ্রহ করে। খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা ফাঁপা গাছের ডাল (লম্বায় 1 মিটার) বা ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখে। ঐ ফাঁপা গাছের ডাল বা ভাঙ্গা মৃৎপাত্রে মৌমাছি মৌচাক প্রস্তুত করিলে ঐ মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়।



চিত্র 14.4 ল্যাংস্ট্রথ উদ্ভাবিত মৌমাছি প্রতিপালন বাক্স। (A) উপরের ঢালু ঢাকনা, (B) ভিতরের ঢাকনা, (C) ভিতর-বাহির-যোগ্য ফ্রেম, (D) ব্রুড চেম্বার (Brood Chamber), (E) মৌমাছি বসিবার স্থান।

মৌমাছি প্রতিপালন খুব কষ্টসাধ্য নহে। মৌমাছি প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন বিশেষভাবে নির্মিত কাঠের বাক্স। এই ধরনের কাঠের বাক্স পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মৌমাছি প্রতিপালন সমবায় সমিতি বিক্রয় করে। খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনও এই প্রতিপালন বাক্স বিক্রয় করে। মৌমাছি সহ এক একটি বাক্সের আনুমানিক মূল্য 100 টাকা। একটি বাক্সে একটি রাণী মৌমাছি ও কয়েক সহস্র কর্মী মৌমাছি রাখা হয়।

মৌমাছি সমেত বাক্সটিকে ছায়াছন্ন গাছের নিচে রাখিতে হয়। যে স্থানে মৌমাছি প্রতিপালন করা হইবে সেই স্থানের 1 মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ফল-ফুলের গাছ থাকা প্রয়োজন কেননা কর্মী মৌমাছিরা ঐ সমস্ত গাছের ফুল হইতে মকরন্দ এবং পরাগ সংগ্রহ করে।

বৎসরের ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিলে (মোটামুটিভাবে বসন্তকাল) মৌমাছিরা সর্বাপেক্ষা বেশী মধু উৎপাদন করে। ঐ সময়টিকে মধুঋতু বলা হয়। মৌমাছি প্রতিপালনে মস্ত সুবিধা এই যে মৌমাছি পালকদের মৌমাছিদের খাওয়া বাবদ কোন খরচ করিতে হয় না। তবে বর্ষাকালে বাক্সে প্রতিপালিত মৌমাছির মৌচাকের নিকট কিছু চিনির জল রাখিয়া দিতে হয়।

একটিমাত্র বাক্সে প্রতিপালিত মৌমাছিদের কেবলমাত্র মৌমাছি প্রতিপালনের জন্য উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইয়া একাধিক মৌচাক গঠন করানো সম্ভব। ইহার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত বাক্সের প্রয়োজন হয়। এই বাক্সে প্রথমে প্রতিপালিত মৌচাক হইতে একটি রাণী মৌমাছি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং প্রথম মৌচাক হইতে কয়েক সহস্র কর্মী মৌমাছি উহাতে ছাড়িয়া দিতে হয়।

মৌমাছি প্রতিপালনের আধুনিক ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় এবং কুটির শিল্পে পরিণত করার চেষ্টা ভারতবর্ষে করা হইয়েছে। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে 1975 সালে খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের তত্ত্বাবধানে গঠিত 5টি জেলার মৌমাছি প্রতিপালন সমবায় সমিতির 8,870 জন সভ্য মৌমাছি প্রতিপালন করে। 5টি জেলার 2,458টি গ্রামে 33,500টি মৌমাছি প্রতিপালন বাক্স হইতে 1,16,000 কে. জি. মধু পাওয়া গিয়াছে। 1 কে. জি. মধুর বাজার দর 20 টাকা। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে মৌমাছি প্রতিপালন বেশ লাভজনক এবং ইহা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে সমর্থ।

14.8 মৌমাছিদের শত্রু ও রোগ

মৌমাছি প্রতিপালকদের মৌমাছির শত্রু ও রোগ সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মৌমাছি ও মৌচাকের প্রধান শত্রু হইল মোম মথ (Wax moth = *Galleria* sp.)। স্ত্রী মোম মথ মৌচাকে একসঙ্গে প্রায় 1,000 ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি হইতে পরিস্ফুরিত লার্ভা মৌচাকের মধু ও মোম খাইয়া মৌচাকের ক্ষতি করে। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য মৌমাছি প্রতিপালনের বাক্সের গঠন এমন করা উচিত যাহাতে মোম মথ মৌচাকে ঢুকিতে না পারে। ইহা ছাড়াও মোম বীটল (Wax beetle = *Platybolium sp.*), বোলতা (*Vespa*), সাদা ও কালো পিপড়া (*Dorlys sp.*), পাখীদের মধ্যে মধুপায়ী পাখী (*Merops sp.*) ও ফিঙা মৌচাকের ক্ষতি করে।

মৌমাছি এবং মৌমাছিদের লার্ভার ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস ও প্রোটোজোয়া ঘটিত অনেক রোগ হয়। তবে ইহাদের দ্বারা সংঘটিত সংক্রামক রোগের প্রকোপ পাশ্চাত্যের মৌচাকে বেশী হয়। ভারতে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মৌমাছিদের ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস ঘটিত রোগ কম হয়।

অনুচ্ছেদ 15

লাক্ষা চাষ

15.1 লাক্ষা চাষের ইতিহাস

পতঙ্গ শ্রেণীর অনেক প্রাণী কর্তৃক সংগৃহীত বা উহাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু মানুষের অনেক প্রয়োজনে লাগে। লাক্ষা পতঙ্গ কর্তৃক উৎপাদিত লাক্ষা এইরূপ একটি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু। লাক্ষার সহিত মানুষের পরিচয় বহুদিনের। অথর্ব বেদে লাক্ষার উল্লেখ এবং লাক্ষা উৎপাদনকারী স্ত্রী পতঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। লাক্ষার ব্যবসায়িক উপযোগিতার উল্লেখ আইন-ই-আকবরী (Ain-i-Akbari)-তে পাওয়া গিয়াছে। লাক্ষা উৎপাদনকারী পতঙ্গের বিজ্ঞানভিত্তিক বিবরণ কের (Kerr) 1762 খ্রীস্টাব্দে দেন।

15.2 লাক্ষা উৎপাদনকারী কীট

লাক্ষা উৎপাদনকারী কীট বা লাক্ষা কীটের (Lac insect) বিজ্ঞানসম্মত নাম ট্যাকারডিয়া ল্যাক্কা (*Tachardia lacca*)। এই কীটের একাধিক স্ট্রেন (Strain) আছে। প্রাণিসর্গে লাক্ষা কীটের স্থান নিম্নোক্ত রূপ—

পর্ব—আর্থ্রোপডা
উপপর্ব—ম্যান্ডিবুলাটা
শ্রেণী—ইনসেকটা
বর্গ—হেমিপটেরা
গোত্র—ট্যাকারিডি
গণ—ট্যাকারডিয়া
প্রজাতি—ল্যাক্কা।

15.3 লাক্ষা পতঙ্গের বিভিন্ন স্ট্রেন (Strain)

ভারতবর্ষে লাক্ষা চাষের জন্য দুই প্রকার স্ট্রেন ব্যবহার করা হয় :

(a) কুসুম স্ট্রেন—কুসুম স্ট্রেনের জীবনচক্র বৎসরে দুইবার আবর্তিত হয়। ইহার ফলে কুসুম স্ট্রেন হইতে বৎসরে দুইবার লাক্ষা সংগ্রহ করা যায়। যে মাসে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয় সেই মাসের নামের হিন্দি প্রতিশব্দ হইতে লাক্ষা সংগ্রহের মাসের নামকরণ করা হইয়াছে। সেই অনুযায়ী কুসুম স্ট্রেন হইতে অগ্রহায়ণ মাসে একবার এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার লাক্ষা সংগ্রহ করা যায়। অগ্রহায়ণ মাসের সংগ্রহকে 'আগহনী' বা কুসমী বা নাগলী বলা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের

সংগ্রহকে 'জেঠুই' বলে। কুসুম কীট কেবলমাত্র কুসুম গাছেই জন্মায়। অন্য গাছে লাগাইলে ইহাদের জীবনচক্রের সময়কাল পরিবর্তিত হয়।

(b) **রঙ্গিনী ষ্ট্রেন**—রঙ্গিনী ষ্ট্রেনের জীবন চক্রও বৎসরে দুইবার আবর্তিত হয়। ফলে ইহা হইতে বৎসরে দুইবার লাক্ষা সংগ্রহ করা যায়। রঙ্গিনী ষ্ট্রেন হইতে বৈশাখ মাসের সংগ্রহকে **বৈশাখী** এবং কার্তিক মাসের সংগ্রহকে **কাতকী** বলে। কুসুম ছাড়া অন্য গাছে প্রতিপালিত লাক্ষা কীটকে রঙ্গিনী ষ্ট্রেন বলা হয়। রঙ্গিনী লাক্ষা কীট প্রতিপালনে কুল, পলাশ, খয়ের ইত্যাদি গাছ ব্যবহার করা হয়।

15.4 লাক্ষাকীটের পোষক

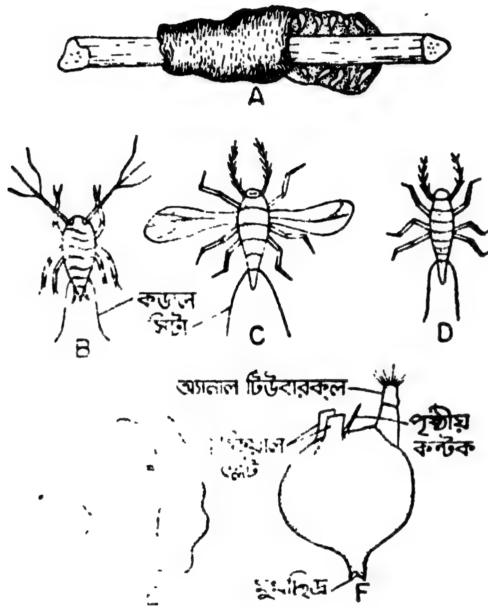
প্রায় 400 প্রজাতির উদ্ভিদ লাক্ষাকীটের পোষক উদ্ভিদের কাজ করিতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাক্ষা উৎপাদনের জন্য কয়েকটি নির্বাচিত উদ্ভিদকে লাক্ষাকীটের পোষক উদ্ভিদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লাক্ষাকীট পরজীবি হিসাবে এই সমস্ত গাছের কোষরস শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই উদ্ভিদগুলির মধ্যে প্রধান হইল পলাশ (*Butea monosperma*), কুসুম (*Carthamus tinctorius*), কুল, (*Zizyphus mauritiana*), খয়ের (*Acacia catechu*), অড়হর (*Cajanus cajan*)।

15.5 লাক্ষাকীটের জীবনচক্র

নিম্ফ (Nymph) রূপে লাক্ষাকীট ইহার জীবন সুরু করে। মাতা লাক্ষাকীটের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার পর ইহারা মাতা লাক্ষাকীটের এনাল টিউবারকুলার (Anal tubercular) ছিদ্র পথে দলে দলে বাহিরে আসে দলে দলে বাহির হইয়া আসাকে সোয়ার্মিং (Swarming) বলে। একটি মাতা লাক্ষাকীট হইতে এক পক্ষ কালের মধ্যে 130—100 নিম্ফ নির্গত হয়। সকালের 8 হইতে 12 ঘটিকা পর্যন্ত (Morning 8 a. m to 12 O'clock) বেশী সংখ্যায় নিম্ফ বাহির হইয়া আসে।

নিম্ফ নরম দেহ যুক্ত এবং ক্ষুদ্র (লম্বায় ·65-·70 mm এবং চওড়ায় ·25-·30 mm)। ইহারা ডিম্ব অথবা নৌকাকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদের বর্ণ সচরাচর লাল তবে ইহারা সাদা বা হলুদ বর্ণেরও হইতে পারে। নিম্ফ অপরিণত পুরুষ বা স্ত্রী লাক্ষাকীট। ইহারা প্রথমে খুব চঞ্চল থাকে এবং উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত আশ্রয় স্থলে (গাছের নরম ডালে) পৌঁছানোর পর ইহারা ঐ ডালের ফ্লোয়েম কলায় (Phloem) নিজেদের প্রোবোসিস (Proboscis) প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং ঐ স্থলে অনড় ভাবে থাকিয়া যায়। ফ্লোয়েম কলারস শোষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। উপযুক্ত

আশ্রয় স্থলে সংলগ্ন হইবার পর ইহারা দেহ হইতে রজন বা লাক্ষা নিঃসরণ করিতে সুরু করে। নিম্ফের দেহের ত্বকের নীচে লাক্ষা গ্রন্থি (Hypodermal lac gland) থাকে। রজন ঐ গ্রন্থিগুলি কর্তৃক নিঃসৃত হয়। মুখ, পায়ু এবং দুইটি শ্বাস ছিদ্র ব্যতীত দেহের সর্বত্রই লাক্ষা গ্রন্থি হইতে লাক্ষা নিঃসৃত হয় এবং এই নিঃসরণের ফলে নিম্ফের দেহের বাহিরে একটি লাক্ষার আবরণী সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিতে এই আবরণী নিম্ফকে প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।



চিত্র 15.1 লাক্ষাকীটের জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা—
(A) গাছের ডালে লাক্ষা আবরণী ; ইহা লাক্ষা বীজ রূপে ব্যবহৃত হয়, (B) নিম্ফ (Nymph), (C) ডানা যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পুরুষ, (D) ডানাবিহীন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ, (E) আবরণী মধ্যে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী, (F) আবরণী বহির্ভূত পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী।

কলারস শোষণ করিয়া নিম্ফ বড় হয় এবং তিনবার খোলস ত্যাগ করিয়া পরিণত পুরুষ বা স্ত্রী লাক্ষাকীটে রূপান্তরিত হয়। একটি মাতা লাক্ষাকীট হইতে যে সমস্ত নিম্ফ বাহির হয় তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ পুরুষ লাক্ষাকীটে পরিণত হয়। পুরুষ লাক্ষাকীটগুলি নিম্ফ হইতে সর্বাগ্রে নির্গত হয়। পুরুষ লাক্ষাকীট ডানাহীন বা ডানাযুক্ত উভয় প্রকারই হইতে পারে। পুরুষ লাক্ষাকীটগুলি লাক্ষার আবরণী হইতে বাহিরে আসে এবং স্ত্রী লাক্ষাকীটের সহিত মিলিত হইতে থাকে।

একটি পুরুষ লাক্ষাকীট একাধিক স্ত্রী লাক্ষাকীটের সহিত মিলিত হয়। আবরণী হইতে বাহির হইবার পর 3 হইতে 4 দিনের মধ্যে সকল পুরুষ লাক্ষাকীটের মৃত্যু হয়। স্ত্রী লাক্ষাকীট উহার আবরণী হইতে বাহিরে আসে না। নিষিক্ত হইবার পরও ইহারা আকারে বড় হয় এবং লাক্ষা নিঃসরণ করিতে থাকে। স্ত্রী লাক্ষাকীটের চেহারার পরিবর্তন হইতে থাকে। ইহাদের পা এবং শুঙ্গ (Antenna) নষ্ট হইয়া যায়, এনাল টিউবারকল নামক একটি নলাকৃতি গঠন সৃষ্টি হয় এবং দেহটি থলির ন্যায় দেখায় (চিত্র 15.1)। এই অবস্থায় স্ত্রী লাক্ষাকীট ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি ইহাদের দেহের নিচে চাপা থাকে। ডিমগুলি পরিস্ফুরিত হইয়া সরাসরি নিম্ফে পরিণত হয়। নিম্ফগুলি এনাল টিউবারকল দিয়া বাহির হইবার পর স্ত্রী লাক্ষাকীট মারা যায়।

15.6 লাক্ষা সংগ্রহ পদ্ধতি

লাক্ষাকীটগুলি খুব কাছাকাছি থাকিয়া নিজেদের দেহের বাহিরে লাক্ষার আবরণী সৃষ্টি করে, ফলে একটি টানা আবরণী পাওয়া যায়। লাক্ষাকীটের পরিত্যক্ত আবরণী সমেত গাছের ডালগুলি লাক্ষা চাষীরা সংগ্রহ করে। ইহার পর আবরণী সমেত ডালগুলিকে প্রথমে ভালভাবে জলে ধোওয়া হয় ও পরে রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। আবরণীগুলিকে এইবার যত্ন সহকারে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে ডাল হইতে চাঁছিয়া লওয়া হয়। ফলে আবরণী চূর্ণ হইয়া যায়। এই চূর্ণ আবরণীকে দানা লাক্ষা বলা হয়। দানা লাক্ষা এইবার থলির মধ্যে ভরা হয়। কাঠকয়লার আগুনের উপর থলিগুলি খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিলে লাক্ষা গলিয়া যায়। গলা লাক্ষা সমেত থলিটিকে নিংড়ানো হইলে থলির ভিতর অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি থাকিয়া যায় এবং কেবলমাত্র গালা বাহিরে আসে। অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিকে কিড়ী (Kiri) বলা হয়। জমাট বাঁধার পর গালা সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত গালাকে রাসায়নিক প্রয়োগে প্রথমে বর্ণহীন করা হয়। পরে উহাকে পছন্দমত রঙ করা হয়। গলিত অবস্থায় ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া ইহাদের প্রয়োজনমত আকার দেওয়া হয়। ছাঁচে আকারপ্রাপ্ত গালাকে সেলাক (Shellac) বলে।

15.7 লাক্ষার উপাদান

লাক্ষা লাক্ষাকীটের ত্বকনিম্নস্থ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত এক প্রকার প্রাকৃতিক রজন (Resin)। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে রজন, শর্করা, প্রোটিন, জলদ্রাব্য লবণ, বালি, উদ্বায়ী তৈল (Volatile oil) এবং তিন প্রকার রঞ্জক থাকে। রজনে অ্যালুইরিক (Aleuric) এবং জালারিক (Jalaric) অ্যাসিড থাকে।

15.8 ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাক্ষা চাষ

ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় 42 হাজার টন লাক্ষা উৎপাদিত হয়। সেই হিসাবে লাক্ষা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে ভারতের স্থান শীর্ষে। ইহার পরই

থাইল্যাণ্ডের স্থান। অন্যান্য লাক্ষা উৎপাদনকারী দেশসমূহ হইল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, জাভা, মালয়েশিয়া, চীন, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়া। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে লাক্ষা চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ধুলিয়ান, নিমতিতা এবং মালদহে লাক্ষা চাষ হয়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন সমগ্র লাক্ষার প্রায় 60% ছোটনাগপুরে হয়। বিহারে রাঁচীর নিকট নামকুমে ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (Indian Lac Research Institute) লাক্ষা চাষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। যথোপযুক্ত ভাবে লাক্ষা চাষ করিতে পারিলে উহা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সাধন করিতে পারে। লাক্ষা চাষ নিম্নোক্তভাবে করা হয় :—

(a) ডাল ছাঁটা (Pruning)—সময়মত এবং নিয়মমত পোষক উদ্ভিদের ডাল ছাঁটিলে নূতন ও শাখাপ্রশাখা যুক্ত অনেক নবীন ডালের সৃষ্টি হয়। নূতন ডালের ত্বক নরম ও ইহা রসসমন্বিত হওয়ায় লাক্ষাকীটেরা ইহাতে প্রতিস্থাপিত হয়। যে সমস্ত ডালের বেড় 2·5 সেণ্টিমিটার সেই ডাল ছাঁটিলে কোন কাজ হয় না।

(b) কুপ পদ্ধতি (Coup system) অবলম্বন—পোষক উদ্ভিদকে একবার ব্যবহার করিয়া পরের বারের চাষের সময় ঐ উদ্ভিদকে ব্যবহার না করার পদ্ধতিকে কুপ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে পোষক উদ্ভিদ যথেষ্ট বিশ্রাম পায় এবং লাক্ষা ফলনের উন্নতি হয়।

কুসুম গাছ দ্রুত বর্ধনশীল নহে। কুসুম লাক্ষা চাষে সেইজন্য যে কুসুম গাছগুলি ব্যবহৃত হইবে তাহাদের চারিটি অসম ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হয়। প্রতিটি ভাগকে এক বৎসর অন্তর লাক্ষাকীট দ্বারা আক্রান্ত করা হয়।

রঙ্গিনী লাক্ষা চাষের ক্ষেত্রে পলাশ, বেড় এবং অন্যান্য পোষক উদ্ভিদকে তিন ভাগে (3 : 1 : 3 অনুপাতে) ভাগ করা হয়। বৃহত্তর ভাগ দুইটিকে বৈশাখী ফলনে এবং ছোট ভাগটিকে কার্তিকী ফলনে ব্যবহার করা হয়।

(c) আক্রান্ত করা (Inoculation)— পোষক উদ্ভিদের বয়স বেশী হইলে উহা হইতে বেশী সংখ্যক শাখা বাহির হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। এই প্রকার বা অন্য গাছ হইতে নূতন গাছকে আক্রান্ত করা হয়। আক্রান্ত করিবার জন্য সুস্থ লাক্ষা পোকার আস্তরণযুক্ত উদ্ভিদ শাখাকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত শাখা গুলিকে ছোট ছোট টুকরা (25-30 সেণ্টিমিটার) করা হয়। লাক্ষাকীটের আস্তরণ সমেত এই ছোট ছোট ডালগুলিকে বীজ লাক্ষা (Lac seed) বলা হয়। উল্লেখ্য, এই আস্তরণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার লাক্ষাকীটই থাকে। এই বীজ লাক্ষাকে এইবার নূতন পোষক উদ্ভিদের ডালে দড়ির সাহায্যে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে ইনঅকুলেশন (Inoculation) বলে। নিম্ফ বাহির হইবার আনুমানিক 15 দিন পূর্বে নূতন ডালকে আক্রান্ত করিতে হয়।

(d) ফসল কাটা (Harvesting)—আক্রান্ত পোষক উদ্ভিদের শাখায় লাক্ষার আস্তরণ সুগঠিত হইলে শাখাগুলিকে কাটিয়া ফেলা হয়। কাটিয়া ফেলা শাখাগুলির

কয়েকটিকে লাক্ষা বীজ রূপে ব্যবহার করা হয় এবং বাকী শাখাগুলি হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা সংগ্রহ পদ্ধতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

15.9 লাক্ষা চাষ বৃদ্ধির উপায়

(a) পোষক উদ্ভিদের রোপণ ও পরিচর্যা- লাক্ষাকীটের পোষক উদ্ভিদ চরম আবহাওয়ায় সুন্দরভাবে অভিযোজিত। সুতরাং উহাদের পরিচর্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে নূতনভাবে রোপণ করিতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সার দিয়া কলম (Cutting) পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন দ্বারা নূতন গাছ রোপণ করিতে হয়। কলমগুলিকে একাধিক সারিতে এমনভাবে রোপণ করা হয় যে সব গাছগুলিকে কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করিলে উহারা অসংখ্য ত্রিভুজের ন্যায় দেখায়। এই পদ্ধতিতে রোপণ করিলে রোপিত গাছের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় এবং গাছগুলি শাখাপ্রশাখাযুক্ত হয়। গাছগুলির বয়স 3-4 বৎসর হইলে উহাদের ডাল কাটা (Pruning) হয়।

(b) শত্রু ও খাদক প্রাণী হইতে লাক্ষাকীটকে রক্ষা—কেবলমাত্র অন্য পতঙ্গের আক্রমণে 30-35% লাক্ষা ফসল নষ্ট হয়। চ্যালসিডয়ডিয়া (Chalcidoidea) গোষ্ঠীর পতঙ্গ লাক্ষা চাষের ক্ষতি করে। ইহারা লাক্ষা কোষের মধ্যে ডিম পাড়ে এবং ইহাদের লার্ভা লাক্ষাকীট খায়। বৈশাখী এবং কাতিকী ফসলের ইহারা বেশী ক্ষতি করে।

লাক্ষা পতঙ্গের ক্ষতিকর খাদক প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখ্য হইল কয়েক প্রকার মথ—হোলোসেরা পালভেরিয়া (*Holocera pulverea*) ও এনব্লেমা (*Enblemma*) এবং ক্রাইসোপা (*Chrysopa*)। ইহারা লাক্ষা কীটের আস্তরণের নিকট ডিম পাড়ে। ডিম হইতে নির্গত লাক্ষাকীট ইহারা ভোজন করে।

নিম্নোক্ত উপায়ে শত্রু ও খাদক পতঙ্গের হাত হইতে লাক্ষাকীটকে রক্ষা করা যায়—

(i) সংরক্ষণের জন্য সুস্থ লাক্ষা বীজ নির্বাচন ও নির্বাচিত লাক্ষা বীজকে প্রয়োজনে তারের আবরণীর মধ্যে সুরক্ষা।

(ii) লাক্ষা ফসল তোলায় সঙ্গে সঙ্গেই ফসলকে ভালভাবে জলে ধুইয়া লওয়া। ইহার ফলে লাক্ষা আস্তরণের ভিতর থাকা শত্রু পতঙ্গের মৃত্যু হয়।

(iii) সুষ্ঠু এবং পুরোপুরি ভাবে লাক্ষা ফসল কাটিয়া লওয়া। ইহার ফলে শত্রু পতঙ্গের প্রজনন স্থান সাময়িকভাবে ধ্বংস হইয়া যায়।

(iv) কীটনাশক রাসায়নিক প্রয়োগ- -5 সপ্তাহ অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে কীটনাশক রাসায়নিক ব্যবহার করিলে খাদক পতঙ্গ নষ্ট হয়। এণ্ডোসালফন (Endosulfon) ও থুরিসাইড (Thuricide) 1 : 1 অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া এবং জলে উহাদের ঘনত্ব 0·05% করিয়া স্প্রে (Spray) করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(v) পোষক উদ্ভিদের রক্ষা—পেস্ট (Pest) বা ক্ষতিকর পতঙ্গ ও জীবাণু (ছত্রাক, ভাইরাস) দ্বারা যাহাতে পোষক উদ্ভিদ আক্রান্ত না হয় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। ইহাদের অস্তিত্ব নিরূপিত হইলে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা লওয়া উচিত। উইপোকা, নানা প্রকার কক্কসিড (Coccid), বীটল (Beetle) প্রভৃতি পতঙ্গ পোষক উদ্ভিদের ক্ষতি করে।

সামগ্রিকভাবে লাক্ষা চাষ বৃদ্ধির উপায়—নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে সামগ্রিকভাবে লাক্ষা চাষ বৃদ্ধি করা যায়—

(a) আক্রান্ত করিবার পূর্বে আলোক ফাঁদ বা তারের ঝুড়ির ফাঁদে শত্রু পতঙ্গের নিধন।

(b) আক্রান্ত করিবার জন্য সুস্থ লাক্ষা বীজের ব্যবহার।

(c) স্ব আক্রান্ত (Self inoculation) না হইতে দেওয়া।

(d) কুসুম ও রঙ্গিনী স্ট্রেন একই স্থানে চাষ না করা।

15.10 লাক্ষার ব্যবহার

লাক্ষা নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই ইহার ব্যবসায়িক মূল্য আছে। লাক্ষা নিম্নোক্ত কাজে ব্যবহৃত হয় :

(a) গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারী

(b) কাঠের আসবাবপত্রের পালিশ

(c) বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ইনসুলেটর

(d) সিল (Seal) করিতে

(e) জুতার পালিশ প্রস্তুতে

(f) মানচিত্র তৈয়ারীতে।

অনুচ্ছেদ—16

মৎস্যচাষ

16.1 মৎস্য ও খাদ্যোৎপাদন

পৃথিবী বর্তমানে এক প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সমহারে হয় নাই। সুতরাং মানুষ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের চেষ্টাও রহিয়াছে।

মানুষের খাদ্য-তালিকায় চাল, গম, শাকসব্জি, ফলমূল ছাড়াও মাছ, মাংস, ডিম রহিয়াছে। কৃষিকার্যের উন্নতি দ্বারা কৃবিজ বস্তুর উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হইতেছে। আমিষজাতীয় খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য গো-পালন, মুরগী পালন ইত্যাদির সহিত মৎস্যের চাষ বা মাছের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে। মাছ হইতে উৎকৃষ্ট প্রোটিন পাওয়া যায়। সেই কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় মাছ একটি নিশ্চিত সংযোজন।

16.2 মৎস্যচাষ কাহাকে বলে

মৎস্যচাষ বলিতে প্রকৃতি হইতে মানুষের প্রয়োজনমত মৎস্য আহরণ বুঝায় না। মৎস্যচাষ বলিতে প্রকৃতি হইতে বিবেচনাসম্মত (Judicious) মৎস্য আহরণ এবং সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের সংরক্ষণ (Conservation) ও প্রজনন হার বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে বুঝায়। আবার মৎস্যচাষ অর্থে কেবলমাত্র খাদ্যযোগ্য মৎস্য-শ্রেণীর চাষ বুঝায় না। মৎস্যশ্রেণী ছাড়াও সন্ধিপদ পর্বের চিংড়ী (ছোট ও বড়), কাঁকড়া, শম্বুক পর্বের ঝিনুক (Oyster), গেঁড়ি, গুগলি ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর তিমি, ডলফিন (Dolphin) চাষ মৎস্যচাষের আওতায় পড়ে। ব্যাপক অর্থে মৎস্যচাষ বলিতে জলবাসী এবং মানুষের খাদ্যযোগ্য সকল প্রাণীর বিবেচনাসম্মত আহরণ এবং সেইসঙ্গে উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টাকে বুঝায়।

16.3 মৎস্যচাষের শ্রেণীবিভাগ

মাছ জলবাসী। সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, ভেড়ি ইত্যাদি মাছের আবাসস্থল। আবাসস্থল নির্ভর করিয়া মৎস্যচাষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :—

A. সমুদ্রে মৎস্যচাষ (Marine fishery) : সমুদ্রে মৎস্যচাষে সমুদ্র হইতে মনুষ্য খাদ্যযোগ্য মাছ বা অন্য পর্বের প্রাণীদের সংগ্রহ এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাজারজাত করাকে বুঝায়। সমুদ্রের তটরেখা হইতে সমুদ্রের দিকে 320 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পর্যাপ্ত সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়। এই

অঞ্চল হইতে বৎসরে প্রায় 75 মিলিয়ন টন মৎস্য সংগ্রহ করা হয়। সেই হিসাবে সমুদ্র উপকূলবাসীদের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য অত্যন্ত রূপে অর্থকরী।

বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে সমুদ্রে মৎস্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত সুতরাং সামুদ্রিক মৎস্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু বর্তমানে ইহা প্রতিষ্ঠিত যে সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের হার সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের হার অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে (হেরিং, স্যমন, সারডিন) বেশী হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সামুদ্রিক মৎস্যেরও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

বর্তমানে ইহা স্থির হইয়াছে যে মৎস্য সংগ্রহকারী দেশসমূহ এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে যাহাতে মৎস্যের অতি সংগ্রহ বা কম সংগ্রহ না হইতে পারে। সমুদ্রের একটি বিশেষ সংগ্রহ স্থানে কত মাছ থাকিতে পারে এবং কত মাছই বা সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে প্রথমে তথ্যানুসন্ধান করিয়া তবেই মৎস্য সংগ্রহ করা উচিত। ইহা ছাড়াও কয়েকটি মাছের প্রজনন ঋতুতে উহাদের সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

B. অন্তর্দেশীয় জলাধারে মৎস্যচাষ (Inland fishery): অন্তর্দেশীয় জলাধার দুই প্রকারের। মিষ্ট জলাধার (Fresh water) এবং ঈষৎ লবণাক্ত জলাধার (Brackish water)। মিষ্ট জলাধার বলিতে নদী, খাল, পুষ্করিণী, হ্রদ, বাঁধ (Dam) ইত্যাদি বুঝায়। ঈষৎ লবণাক্ত জলাধার বলিতে সমুদ্র উপকূলবর্তী ভেড়ি এবং নদীর মোহনায় সৃষ্ট 'ব'-দ্বীপগুলির অন্তর্ভুক্ত পুষ্করিণী, ঝিল ইত্যাদিকে বুঝায়। ঐগুলিতে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, সংগ্রহ এবং বাজারজাত করা অন্তর্দেশীয় জলাধারে মৎস্যচাষের আওতায় পড়ে।

16.4 মৎস্যচাষের মূল লক্ষ্য

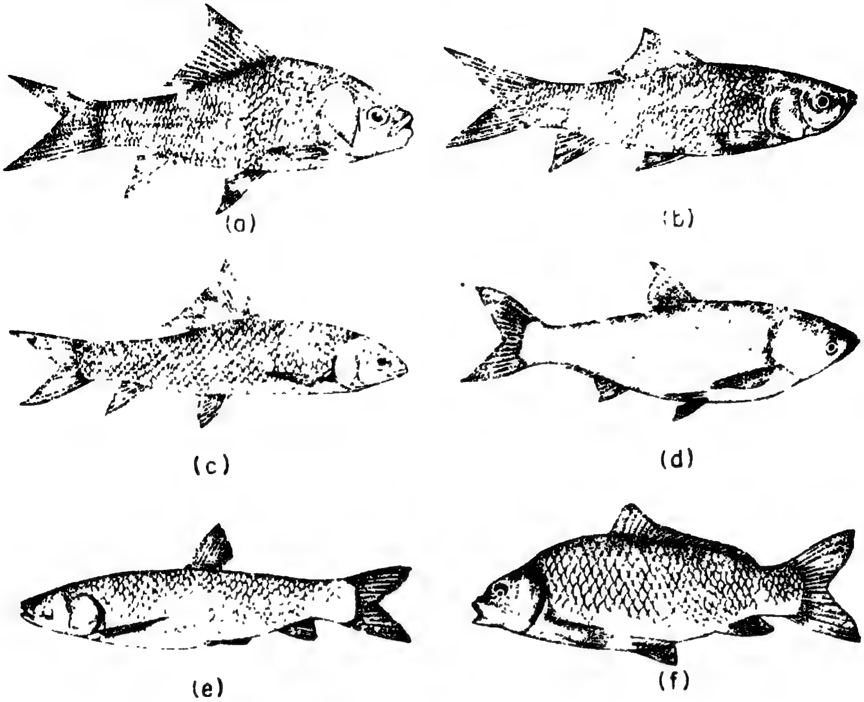
মৎস্যচাষের মূল লক্ষ্য দুইটি। একটি হইল মৎস্য ধরা বা সংগ্রহ (Capture) এবং অন্যটি হইল মৎস্যকৃষ্টি বা মৎস্যের লালন (Culture)। মৎস্য সংগ্রহ অর্থে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নদী, খালবিল, সমুদ্র, হ্রদ ইত্যাদি হইতে মৎস্য ধরা এবং সেইসঙ্গে মৎস্যের সংরক্ষণকে বুঝান হয়। কেননা যথেচ্ছভাবে মৎস্য ধরিলে মৎস্যের সঞ্চয় শেষ হইয়া যাইতে পারে। ছোট অথচ বদ্ধ জলাধারে মৎস্যের লালন, ডিমপোনা হইতে চারাপোনা হওয়া পর্যন্ত উহাদের তদারকি এবং চারাপোনার বিলিবণ্টন ইত্যাদি মৎস্যকৃষ্টির মধ্যে পড়ে।

16.5 পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের উৎস

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের প্রধান উৎস হইল—i. অন্তর্দেশীয় জলাধারসমূহ এবং ii. সমুদ্র।

বিভিন্ন নদী, খাল, পুষ্করিণী, বিল এবং বাঁধ ইত্যাদি অন্তর্দেশীয় জলাধারসমূহ পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যের প্রধান উৎস। খাদ্যযোগ্য নানা প্রজাতির মৎস্য ঐ

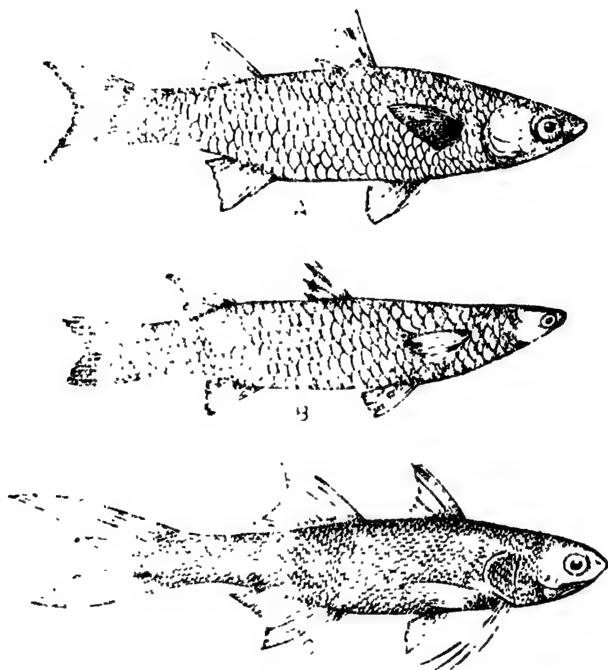
সমস্ত জলাধারে পাওয়া যায়। কার্প (Carp) জাতীয় মৎস্য, যথা—রুই (*Labeo rohita*), কালবোস (*Lebeo kalbasu*), কুরচি বাটা (*Labeo gonius*),



চিত্র 13.1—কতকগুলি অন্তর্দেশীয় ও বাহির হইতে আমদানী করা (Exogenous) মাছের বহিরাকৃতি - কাতলা (a), রুই (b), মৃগেল (c), ও, জলী রুই (d), ঘেসো রুই (e), সাইপ্রিনাস (f)।

কাতলা (*Katla katla*), মৃগেল (*Cirrhina mrigala*) ইত্যাদি অন্তর্দেশীয় জলাধার হইতে সংগ্রহ করা হয় (চিত্র 13.1)। খাদ্য হিসাবে ঐ সমস্ত মাছের চাহিদা প্রচুর। ইহা ছাড়াও পুঁটি (*Puntius*), সরলপুঁটি (*Puntius sarana*), তিতপুটি (*Puntius ticto*), চন্দনপুটি (*Barbus conchonius*), ফুটকিপুটি (*Puntius phutinio*) ইত্যাদি ছোট কার্পজাতীয় মৎস্য ঐ সমস্ত জলাধার হইতে সংগ্রহ করা হয়। অন্তর্দেশীয় ডোবা বা বিল হইতে মূলত জাওলা (*Jeol*) মাছ সংগ্রহ করা হয়। জাওলা মাছের মধ্যে কই (*Anabas testudineus*), শোল, শাল (*Channa striatus, C. marutius*), ল্যাটা (*Channa punctatus*), সিঙ্গি (*Heteropneustis fossilis*), মাগুর (*Clarius batrachus*) প্রধান। জাওলা মাছের প্রজনন হার বেশী এবং ইহাদের চাষ অল্প আয়াসসাপেক্ষ। নদীতে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় ও অন্যান্য যে সমস্ত বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প আছে (দামোদর ভ্যালী

করপোরেশন, ময়ূরাক্ষী প্রকল্প) তাহাদের দরুন বর্তমানে বেশ কিছু খাদ্যযোগ্য মাছ পাওয়া যায়। বাঁধসংলগ্ন জলাধারে কার্পজাতীয় মাছের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি হইতে অন্য যে সমস্ত মৎস্য সংগ্রহ করা হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল ইলিশ (*Hilsa ilisha*), বোয়াল (*Wallagonia attu*), চিতল (*Notopterus chitala*), ফলুই (*Notopterus notopterus*) এবং সিংগালা (*Macroneus seenghala*)।



চিত্র 16.2—কয়েকটি ভেড়ির মাছের বহিরাকৃতি—পারসে (A), ভাঙ্গন (B), গুরজাউলি (C)।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন-সংলগ্ন চব্বিশ-পরগণা জেলায় অনেক ভেড়ি আছে। এই ভেড়িগুলি হইতে নানা প্রজাতির চিংড়ী (*Palaemon*) এবং নানা সুস্বাদু মাছ, যথা ট্যাংরা (*Mystus*), আড় (*Arius*), পারশে (*Liza parsia*), ভাঙ্গন (*Liza tade*), ভেটকি (*Lates calcarifer*), তপসে (*Polynemus*), খয়রা (*Gadusia chapra*), বেলে (*Glossogobius*) সংগ্রহ করা যায় চিত্র (16.2)।

সমুদ্র হইতে যে সমস্ত খাদ্যযোগ্য মাছ সংগ্রহ করা হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হইল পায়রা চাঁদা (*Scatophagus*), পমফ্রেট (*Stromateus*), ম্যাকারেল (*Somber*) এবং বোম্বাই ডাক (*Harpodon*)।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সরবরাহ কেন্দ্রগুলি হইল ডায়মণ্ডহারবার, কোলাঘাট, উলুবেড়িয়া, আমতা, ক্যানিং এবং ধুলিয়ান গঙ্গা সন্নিহিত অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের কণ্টাই সাবডিভিসনের জোনপুট মৎস্যচাষ কেন্দ্র হইতে শুটকি মাছ, সার্কলিভার অয়েল (Shark liver oil) এবং মৎস্য হইতে উপজাত নানা বস্তু সরবরাহ করা হয়। এই উপজাত বস্তু মুরগীর খাবার ও সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

16.8 অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (Inland fishery)

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ একটি সুসংবদ্ধ শিল্পে পরিণত হইয়াছে। অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষে দুইটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। A ডিমপোনা সংগ্রহ এবং B চারাপোনার সংগ্রহ, লালন এবং পরিবেশন।

A. **ডিমপোনা সংগ্রহ :** মূলতঃ গঙ্গা নদী হইতে ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয়। পোনা বা কার্পজাতীয় মাছ বর্ষাকালে অগভীর জলে ডিম পাড়ে। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ে (যথা—পুষ্করিণী, হ্রদ ইত্যাদি) ডিম পাড়ে না। বর্ষাকালে নদীর উভয় পাড় প্লাবিত হইয়া উভয় পাড়ে যে সাময়িক অগভীর জলের সৃষ্টি হয় পোনা জাতীয় মাছ সেখানে ডিম পাড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এইভাবে ডিমপোনা সংগ্রহের পর অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমত, ডিমপোনা জীবিত অবস্থায় পরিবহণ করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ডিমপোনার সহিত আমিষাশী অন্য মাছের ডিমপোনা সংগৃহীত হইয়া যায়।

স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে ডিমপোনা সংগ্রহ অসুবিধাজনক হওয়ায় অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ সংস্থাগুলিতে বর্তমানে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয়। কার্পজাতীয় মাছ বিশেষতঃ রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের ডিম বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে নিষিক্ত করা হয়। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মৎস্যকে পিটুইটরী গ্রন্থি নির্যাস (Extract) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইঞ্জেকশন করিলে স্ত্রী মৎস্য ডিম পাড়ে এবং পুরুষ মৎস্য উহা নিষিক্ত করে। পদ্ধতিটিকে **নিবেশিত প্রজনন** (Induced breeding) বা হাইপোফাইসেসন (Hypophysation) বলে।

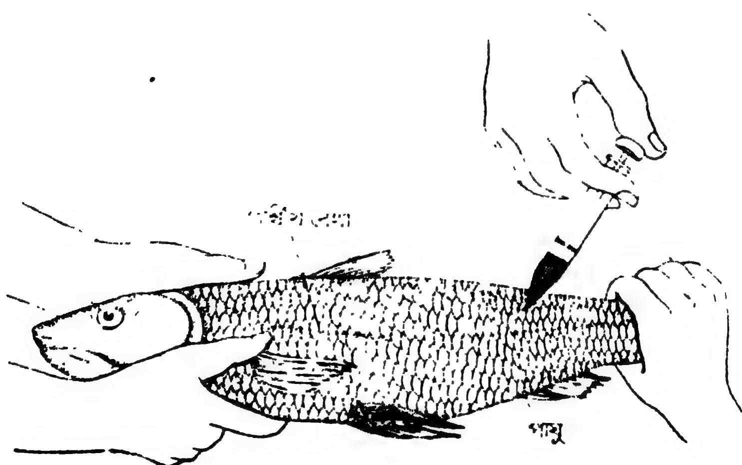
নিবেশিত প্রজনন করানোর উপায়—(a) **পিটুইটরী নির্যাস তৈয়ারী**—কার্প জাতীয় মাছের নিবেশিত প্রজননের জন্য প্রথমে পূর্ণ বয়স্ক ও সদ্য মৃত কার্প জাতীয় মাছের পিটুইটরী গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত গ্রন্থিগুলিকে 100% অ্যালকোহলে রাখা হয়। 24 ঘণ্টা পরে এই অ্যালকোহল হইতে গ্রন্থিগুলি তুলিয়া পুনরায় নূতন 100% অ্যালকোহলে রাখা হয়। এইভাবে গ্রন্থিগুলিকে নিরুদিত (Dehydrated) ও চর্বিমুক্ত করা হয়। গ্রন্থিগুলিকে কালো কাঁচের শিশিতে ঠাণ্ডা জায়গায় অথবা রেফ্রিজারেটারে (Refrigerator) রাখা হয়।

পিটুইটরী গ্রন্থির নির্যাস তৈয়ারী করিতে প্রথমে কালো কাঁচের শিশি হইতে গ্রন্থিগুলি বাহির করিয়া একটি কাঁচের পাত্রে রাখা হয়। এই অবস্থায় থাকিলে

অ্যালকোহল উবিয়া (Evaporate) যায়। গ্রন্থিগুলিকে এইবার টিস্যু হোমোজিনাইজার (Tissue homogenizer) যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়। এই সময় পাতিত জল বা ·03% লবণ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। ইহার পর হোমোজিনাইজার যন্ত্র হইতে ঐ পিটুইটরী চূর্ণসমেত পাতিত জল সেণ্ট্রিফিউজ (Centifuge) যন্ত্রের টিউবে (Centifuge tube) ঢালা হয়। সেণ্ট্রিফিউজ টিউব সমেত সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্র 500 rpm (Revolution per minute) বেগে চালানো হয়। ইহার পর সেণ্ট্রিফিউজ টিউবের উপর তল হইতে পিটুইটরী নির্যাস ইনজেকসন (Injection syringe) সিরিঞ্জে তুলিয়া লওয়া হয় প্রয়োজন বোধে পিটুইটরী নির্যাস ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণও করা যায়।

(b) জনিতা নির্বাচন (Selection of Breeders)—সুস্থ এবং 1.5 হইতে 5 কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে জনিতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। প্রজনন ঋতুতে কার্প জাতীয় মাছের স্ত্রী ও পুরুষ চেনা সহজ হয়। পুরুষ মাছের বক্ষ পাখনা কর্কশ (Rough) হয় কিন্তু স্ত্রী মাছের বক্ষ পাখনা মসৃণ (Smooth) থাকে। ইহা ছাড়াও স্ত্রী মাছের উদরদেশ গোলাকার এবং পায়ুছিদ্র রক্তাভ হইয়া যায়। পুরুষ মাছের পায়ুছিদ্র হইতে স্বাভাবিক ভাবে বা উদরদেশে চাপ দিলে এই সময় একপ্রকার পিচ্ছিল রস (Milt) বাহির হয়।

(c) ইনজেকসন - স্ত্রী জনিতাকে সন্ধ্যার সময় প্রথম পিটুইটরী নির্যাস



চিত্র 16.3—নির্দেশিত প্রজননে ইনজেকশন দিবার স্থান।

ইনজেকসন দেওয়া হয়। ইহার দেহের ওজনের কিলোগ্রাম প্রতি 2/3 মিলিগ্রাম নির্যাস প্রথম পর্যায়ে দেওয়া হয়। প্রথম ইনজেকসন দেওয়ার 5 হইতে 6 ঘণ্টা পরে স্ত্রী মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকসন দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়ে পুরুষ মাছকে ইনজেকসন

দেওয়া হয়। পুরুষ মাছকে মাত্র একবার ইনজেকসন দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই নির্যাসের পরিমাণ কিলোগ্রাম প্রতি 5-8 মিলিগ্রাম। পৃষ্ঠ পাখনা ও পুচ্ছ পাখনার প্রায় মধ্যস্থলে এবং স্পর্শেন্দ্রিয় রেখাকে (Lateral line sense organ) বাঁচাইয়া এই ইনজেকসন দেওয়া হয় (চিত্র 16.3)।

(d) **ব্রিডিং হাপার প্রতিস্থাপন**—ইনজেকসন দেওয়া দুইটি স্ত্রী মাছ পিছু ইনজেকসন দেওয়া একটি পুরুষ মাছ এইবার ব্রিডিং হাপায় (Breeding Hapa) ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ব্রিডিং হাপা মশারীর কাপড় দিয়া তৈয়ারী এবং ইহা নানান মাপের হয়। জনিতা মাছের ওজনের উপর নির্ভর করিয়া হাপার আয়তন নির্ধারিত হয়। হাপার একটিমাত্র কোণ খোলা থাকে। এই কোণ দিয়া জনিতা মাছ হাপায় ঢোকান বা হাপা হইতে বাহির করা হয়। বাঁশের খুঁটি দ্বারা হাপা পুকুর, খাল বা নদীতে আটকানো থাকে। হাপার তলা যাহাতে জলের তলে ঠেকিয়া না যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। হাপার 25 cm জলতলের উপরিভাগে রাখা হয়। ব্রিডিং হাপায় স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ে এবং পুরুষ মাছ উহাদের নিষিক্ত করে।

(e) **পরিস্ফুটন হাপায় প্রতিস্থাপন**—নিষিক্ত ডিমগুলির আবরণী একটু শক্ত হইলে ঐগুলি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ডিমগুলি এইবার পরিস্ফুটন হাপায় (Hatching Hapa) স্থানান্তরিত করা হয়। পরিস্ফুটন হাপার গঠনে বৈচিত্র্য আছে। পরিস্ফুটন হাপা আসলে দুইটি হাপা দ্বারা নির্মিত। কাপড়ের তৈয়ারী একটি হাপার ভিতর মশারীর কাপড়ে তৈয়ারী আর একটি হাপা এমনভাবে রাখা যে বাহির ও ভিতরের হাপা দুইটির মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে। বাহিরের হাপার প্রচলিত মাপ—182 cm × 91 cm × 91 cm এবং ভিতরের হাপার মাপ 152 cm × 76 cm × 76 cm। হাপা দুইটির প্রাচীরগুলি পরস্পরের সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখা হয়। ভিতরের হাপায় প্রায় একলক্ষ ডিম ছাড়া হয়। 14—15 ঘণ্টা পরে ডিমগুলি পরিস্ফুটিত হয়। সদ্য নির্গত মাছগুলি (Hatchling) ভিতরের হাপার ছিদ্রপথে বাহিরের হাপায় চলিয়া আসে। বাহিরের হাপায় 3/4 দিন রাখিবার পর চারামাছগুলি সঞ্চয় পুকুরে ছাড়া হয়।

ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে বাঁধ জাতীয় পুষ্করিণী হইতে কার্পজাতীয় মাছের ডিমপোনা সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। এই পুষ্করিণীতে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছ রাখা হয়। পুষ্করিণীর গঠনের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বিশেষ ধরনের পুষ্করিণীর একদিক উঁচু ও খোলা এবং অন্য অংশে বাঁধ থাকে। উঁচু অংশের অপরদিকে নালা কাটা থাকে। উঁচু অংশটিকে ঢাল এবং নালাগুলিকে মুলান বলা হয়। নালার মুখে বাঁখারী নির্মিত 'ছেঁড়া' লাগান থাকে। ইহার মধ্য দিয়া জল যাইতে পারে কিন্তু মাছ নহে। বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি হইলে ঢল নামিয়া সমস্ত অঞ্চলটিকে প্লাবিত করে। স্ত্রী মাছেরা অগভীর অংশে ডিম পাড়ে। পরে নিষিক্ত ডিম (Spawn) বা চারাপোনা সংগ্রহ করা হয়।

B. **চারাপোনার লালন ও সঞ্চয়:** সংগৃহীত চারাপোনাগুলিকে এইবার লালন পুকুরে (Nursery tank) রাখা হয়। লালন পুকুরগুলি 20 মিটার লম্বা, 14 মিটার চওড়া এবং ইহাতে অন্যূন 1 মিটার গভীর জল থাকে। চারাপোনা ছাড়িবার পূর্বে লালন পুষ্করিণীতে গোবর, খড় ও খোল (Oil cake) ইত্যাদি সার হিসাবে ফেলা হয়। ঐগুলি ফেলিলে প্লাঙ্কটন (Plankton), প্রোটোজোয়া ও সন্ধিপদ পর্বের ক্রাস্টেশিয়া শ্রেণীর প্রাণীরা বেশী হারে প্রজনন করে। ফলে চারাপোনাগুলি প্রচুর খাদ্য পায়।

চারাপোনাগুলি আকারে একটু বড় হইলে ইহাদের ধরিয়া পালন পুষ্করিণীতে (Rearing tanks) ছাড়া হয়। পালন পুষ্করিণী 50 মিটার লম্বা, 30 মিটার চওড়া এবং ইহাতে অন্যূন 1 মিটার গভীর জল রাখা হয়। পালন পুষ্করিণীতে কয়েকমাস রাখার পর ইহাদের সঞ্চয় পুষ্করিণীতে (Stocking ponds) রাখা হয়। এই পুষ্করিণী আকারে বড় এবং ইহাকে 2 মিটারের বেশী গভীর করা হয়। এইখানে মাছ বড় হয় এবং প্রয়োজনমত উহাদের ধরিয়া বাজারজাত করা হয়।

জিওল মাছের চাষ—কই (*Anabas testudineus*), শিঙি (*Heteropneustes fossilis*), মাগুর (*Clarias batrachus*), ল্যাটা (*Chana punctatus*), শাল (*Chana striatus*), শোল (*Chana marutius*) ইত্যাদি মাছের বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ (Accessory respiratory organ) আছে। এই অঙ্গের সাহায্যে বাতাস হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া এই মাছগুলি জলের বাহিরে বেশ কয়েকদিন জীবিত থাকিতে পারে বলিয়া ইহাদের জিওল মাছ (Jeol fish) বলা হয়।

জিওল মাছ বিশেষ করিয়া কই, শিঙি ও মাগুর পুষ্টিকর ও অন্যান্য মাছের তুলনায় সহজপাচ্য। এই সব মাছে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী, চর্বি কম এবং গ্রহণযোগ্য লৌহ (Iron) বেশী পরিমাণে থাকে। জিওল মাছ শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় 1·5 মিলিয়ন একর পতিত জলাশয় (Derelict water area =Swamp) আছে। এই সমস্ত পতিত জলাশয়কে রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছের চাষের উপযোগী করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই পতিত জলাশয়ের তলদেশে প্রচুর জৈব উপাদান থাকে কিন্তু জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের তুলনায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী থাকে। জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসঅঙ্গ থাকায় বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং এইভাবে ইহারা দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্বল্পতা পূরণ করে। সেই কারণে পতিত জলাশয়ে জিওল মাছ চাষ করা হয়। ইহা ছাড়াও খরা প্রবণ এলাকাগুলির জলাশয়ে জিওল মাছ চাষ করা সুবিধাজনক।

দেশে যত মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহার আনুমানিক 15 ভাগ জিওল মাছ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত খাল বিল ডোবা ইত্যাদি হইতে জিওল মাছ

আহরিত হইত। অর্থাৎ প্রকৃতিতে যা পাওয়া যায় তাহার উপর ইহা নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান নির্ভর উপায়ে জিওল মাছের চাষ সুরু হইয়াছে।

চাষ পদ্ধতি

A. **ডিম ও চারা সংগ্রহ—(i) প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ**—বর্ষার সময় নীচু জলাভূমি বিশেষ করিয়া ধান জমিতে জিওল মাছের ডিম ও চারা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া বা সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া জিওল মাছের চাষ সুরু করা যায়। সাধারণতঃ বিজয়া দশমী হইতে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চলে চারা জিওল মাছের হাট বসে।

(ii) **কৃত্রিম প্রজনন করাইয়া**—বর্ষাকাল জিওল মাছের প্রজননের সময়। রুই কাতলা প্রভৃতি মাছের ন্যায় পিটুইটারী হরমোন ইনজেকসন করিয়া জিওল মাছের প্রজনন করানো যায়। পুরুষ মাছকে কিলোগ্রাম ওজন প্রতি 12·5 মিলিগ্রাম এবং স্ত্রী মাছকে কিলোগ্রাম ওজন প্রতি 25 মিলিগ্রাম পিটুইটারী নির্যাস ইনজেকসন দেওয়া হয়। প্রতি ইঞ্চিতে 125টি ছিদ্রবিশিষ্ট নাইলন সুতা নির্মিত হাপা জিওল মাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

B. **পুকুর প্রস্তুত করা**—জিওল মাছ চাষের জন্য পুকুরের আয়তন বা গভীরতা বেশী হওয়া উচিত নয়। জলের গভীরতা মিটার হইলেই যথেষ্ট। চাষের পুকুর প্রস্তুতিতে আগাছা পরিষ্কার, সার প্রয়োগ বা অন্যান্য মাছের চাষের ন্যায় যত্ন লইবার প্রয়োজন নাই। তবে জিওল মাছের পোনা ছাড়ার আগে পুকুরে দুই একবার জাল ফেলিয়া শাল, শোল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ ও জলবাসী সাপ দূর করিতে পারিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জিওল মাছের চাষে মহুয়া খোল সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় না।

C. **চারা মাছ ছাড়া**—বর্ষার ঠিক পরেই জিওল মাছের পোনা ছাড়া উচিত। প্রতিটি চারার ওজন 8 হইতে 10 গ্রাম হইলে ভাল হয়। বিঘাপ্রতি 7 হইতে 8 হাজার চারা ছাড়িলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

D. **স্বাভাবিক ও পরিপূরক খাদ্য**—পতিত জলাশয়ে অনেক পোকা হয়। তাছাড়া প্রচুর প্ল্যাংকটন (Plankton) জন্মায়। জলাশয়ের তলে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকে। ইহারা জিওল মাছের স্বাভাবিক খাদ্য। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে নিচু মানের শুকনো সামুদ্রিক মাছ, পচা চাল বা গম, পচা আলু, গৃহস্থ বাড়ীর উচ্ছিষ্ট, পরিত্যক্ত রেশমকীট, গেঁড়ী-গুগলী চূর্ণ, গবাদি পশুর অন্ত্র মধ্যস্থ বস্তু ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে।

জিওল মাছ সাধারণত রাত্রিতে খাবার খায়। পরিপূরক দৈনিক দেয় খাদ্যের দুই-তৃতীয়াংশ সন্ধ্যাবেলা এবং এক-তৃতীয়াংশ খুব ভোরে দেওয়া উচিত।

হাজার প্রতি জিওল মাছের জন্য দৈনিক নিম্নোক্ত হারে পরিপূরক খাদ্য দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়—

প্রথম মাস —200 গ্রাম
দ্বিতীয় মাস—400 গ্রাম
তৃতীয় মাস—650 গ্রাম
চতুর্থ মাস—1 কেজি
পঞ্চম মাস—1 কেজি 300 গ্রাম
ষষ্ঠ মাস—2 কেজি।

E. **মাছ তোলা**—উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োগ করিলে শিঙি ও মাগুর মাছ 200 দিন ও কই মাছ 300 দিনে তোলার উপযুক্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে শিঙি ও মাগুরের ওজন 100—125 গ্রাম এবং কই মাছের ওজন প্রায় 125 গ্রাম হয়। সুতরাং মাছ ছাড়ার 200 দিন পর হইতে বাজারের চাহিদা এবং পুকুরে জলের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাছ তুলিতে হয়। সাধারণত বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সময় (মোটামুটিভাবে জুন মাসের প্রারম্ভে) মাছ ধরা হয়। মাগুর, সিঙি প্রভৃতি মাছ মাটির মধ্যে গর্ত করে বা কাঁকড়ার করা গর্তে নিরাপদ বোধে আশ্রয় গ্রহণ করে; সুতরাং গতানুগতিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ জাল টানিয়া ইহাদের ধরা সহজ হয় না, পুকুরের সব জল ছাঁচিয়া তবে ইহাদের ধরা সম্ভব হয়। জিওল মাছ জিইয়ে রাখা বা স্থানান্তরণ সুবিধাজনক, বরফের জন্য বাড়তি খরচ হয় না।

F. **জিওল মাছের রোগ ও প্রতিকার**—ব্যাক্টিরিয়া ঘটিত অনেক রোগে অনেক সময় জিওল মাছের মড়ক লাগে। জীবাণু আক্রান্ত জিওল মাছের শুঁড় ঝরিয়া যায় এবং দেহ শ্রীহীন হইয়া যায়। চোখের মণি সাদা দেখায়। ব্যবচ্ছেদ করিলে অনেক সময় আক্রান্ত মাছের দেহগহ্বরে সঞ্চিত জল (উদুরী রোগ) পাওয়া যায়।

জীবাণু ঘটিত রোগের প্রতিকারের জন্য খাবারের সহিত টেরামাইসিন ঔষধরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। চিকিৎসা প্রায় সপ্তাহব্যাপী করা হয়। প্রথম তিনদিন প্রতি কেজি খাবারের সহিত 100 মিলিগ্রাম টেরামাইসিন, পরের দুইদিন প্রতি কেজি খাবারের সহিত 50 মিলিগ্রাম এবং শেষ দুই দিন প্রতি কেজি খাবারের সহিত 25 মিলিগ্রাম টেরামাইসিন দেওয়া বিধেয়।

অনেক সময় জিওল মাছ ফিতাকৃমি বা গোলকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফিতাকৃমি পরজীবী হিসাবে অন্ত্রে বাস করে। গোলকৃমি মাংসপেশীতে সিস্ট গঠন করিয়া বাস করে। আক্রান্ত মাছগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং সরু লাঠির ন্যায় অসহায়ভাবে ভাসিতে থাকে। দেহের সম্মুখ ভাগ জল তলের উপরে থাকে। আক্রান্ত মাছগুলিকে তুলিয়া 4 লিটার জলে এক বোতল ফর্মালিন গোলা দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে সুফল পাওয়া যায়।

G. **নূতন পদ্ধতিতে চাষ**—চৌবাচ্চা (Galvanised tank) এবং বাঁশ বা প্লাস্টিক নির্মিত খাঁচায় জিওল মাছের চাষ—চৌবাচ্চায় জিওল মাছের চাষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা সম্ভব। শীতকালে এক ফুট এবং গ্রীষ্মকালে দুই ফুট গভীর জল চৌবাচ্চায় রাখিয়া উহার মধ্যে জিওল চারা ছাড়িতে হয়। পরিমাণ মত খাদ্য যোগাইয়া চারাগুলিকে বড় করা এবং প্রয়োজনমত ধরা সম্ভব। এই ধরনের চৌবাচ্চার জল প্রতিদিন পাল্টাইতে হয়।

বাঁশ বা প্লাস্টিকের খাঁচা তৈয়ারী করাইয়া ঐগুলিকে বড় জলাশয়ে বা খালে-বিলে দুই ফিট জলে ডুবাইয়া রাখিয়া উহার মধ্যে জিওল চারা ছাড়িয়া জিওল মাছ পালন করা যায়। ইহাতে সুবিধা এই যে স্বল্প পরিমাণ মাছ থাকায় উহাদের সহজে তুলিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ চৌবাচ্চায় চাষের ন্যায় প্রতিদিন জল পাল্টাইতে হয় না।

16.7 মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

A. **সামুদ্রিক মৎস্য**: সমুদ্রে মৎস্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত। স্বাভাবিক কারণেই সমুদ্রে কৃত্রিম উপায়ে মৎস্যকৃষ্টি বা মৎস্যের লালন প্রয়োজন হয় না। সমুদ্র হইতে বিবেচনাসম্মত মৎস্যসংগ্রহই মূল লক্ষ্য।

গভীর সমুদ্র হইতে মৎস্যসংগ্রহের জন্য দ্রুতগতি জলযান ও সংগৃহীত মৎস্যের জলযানে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। মৎস্য সংগ্রহের জন্য উন্নত ধরনের জাল ও জাল টানার যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা উচিত। জলযান মাছ সংগ্রহ করিয়া ফেরার পর সংগৃহীত মৎস্যগুলিকে বাজারজাত করিবার জন্য উন্নত পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়।

B **অন্তর্দেশীয় মৎস্য**: অন্তর্দেশীয় মৎস্যের ভাণ্ডর সমুদ্রের ন্যায় অফুরন্ত নহে। সুতরাং অন্তর্দেশীয় জলাধার হইতে মৎস্য সংগ্রহ এবং সেইসঙ্গে মৎস্যের বংশবৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়া সংগ্রহ ও উৎপাদনের মধ্যে একটি সমানুপাতিকতা আনার চেষ্টা করা উচিত।

অন্তর্দেশীয় জলাধারগুলির সংস্কার বা অব্যবহৃত জলাধারগুলিকে, যেমন—পুকুর, ডোবা ইত্যাদির সংস্কার করিয়া অন্তর্দেশীর জলাধারের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রয়োজনীয়। অন্তর্দেশীয় জলাধারগুলির জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis) করিয়া সেগুলিকে মৎস্যচাষ উপযোগী করিয়া তোলা উচিত।

বিভিন্ন মাছের জীবনবৃত্তান্ত, স্বভাব, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি অনুধাবন করিয়া কোন্ জলাধারে কোন্ ধরনের মাছ সার্থকভাবে বাঁচিতে পারে তাহা নির্ধারণ করা যায়।

জলাধারগুলিতে অন্যান্য কি ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে তাহা নির্ণয় করিয়া অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর প্রাণী বা উদ্ভিদের উৎখাত করা প্রয়োজন।

অবিবেচকের ন্যায় জলাধারগুলি হইতে মৎস্য সংগ্রহ করা উচিত নহে। প্রজনন

ঋতুতে স্ত্রীমৎস্যের এবং সাধারণভাবে অপরিণত বয়সের মৎস্য সংগ্রহ আইন প্রণয়ন করিয়া বন্ধ করা উচিত।

অন্তর্দেশীয় মৎস্যাকৃষ্টি ও মৎস্য পালনের উন্নতি বিধান করা প্রয়োজন। ডিম-পোনা সংগ্রহ ও চারাপোনার সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত হওয়া উচিত।

মৎস্য সংগ্রহ ও পরিবহণ বিজ্ঞানসম্মত হওয়া উচিত।

কলকারখানা নির্গত রাসায়নিক অনেকক্ষেত্রে অন্তর্দেশীয় জলাধারগুলিতে ফেলা হয়। ইহার ফলে জলের পরিবেশ দূষিত হইয়া পড়ে এবং মৎস্যের নানারূপ ক্ষতি হয়।

মাছের নিবিড় চাষপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অন্তর্দেশীয় জলাধারগুলিতে রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি দেশীয় মাছের মিশ্র চাষ ভারতবর্ষে বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত। ইহার সহিত দ্রুত বৃদ্ধিহারযুক্ত কিছু আমদানী করা বিদেশী মাছ, যথা—সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, সাইপ্রিনাস কার্প এবং গলদা চিংড়ির চাষ যুক্ত করিয়া মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ করা হয়। পুকুরের বিভিন্ন স্তরে মাছের যে খাবার আছে তাহার বিন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া একই পুকুরে বিভিন্ন মাছের চাষ করাকে মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ বলা হয়। সাধারণ পুকুরে বৎসরে হেক্টর প্রতি 600 কে জি. মাছ উৎপন্ন হয়। নিবিড় মিশ্র চাষ দ্বারা ঐ একই মাপের পুকুরে বৎসরে 1000 কে. জি. মাছের ফলন সম্ভব হইয়াছে।

মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ পদ্ধতি : মাছের নিবিড় মিশ্রচাষ নিম্নোক্তভাবে করা যায়—

(a) **পুকুর সংস্কার**—পুকুর হইতে আগাছা (Weed) এবং পুকুরের তলা হইতে পাঁক তুলিয়া পুকুরের সংস্কার করিতে হয়। পুকুর আয়তাকার হইলে ভাল হয়। পুকুরে 2 মিটার গভীর জল থাকা প্রয়োজন।

(b) মিশ্র চাষ সুরু করিবার পূর্বে সমস্ত খাদক মৎস্য এবং আগাছা ধ্বংস করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মহুয়া খোল ব্যবহার করিতে হয়। ইহারা আগাছার বিষ রূপে কাজ করে। উল্লেখযোগ্য খাদক মাছ হইল—ল্যাটা, শাল, শোল, কই, ন্যাদোস, মাগুর, বোয়াল প্রভৃতি। আমাছার (Weed fish) মধ্যে উল্লেখ্য হইল খয়রা, পুঁটি, চেলা প্রভৃতি।

(c) **চুনের প্রয়োগ**—হেকটাএকর প্রতি 200 হইতে 300 কেজি চুন প্রয়োগ করার কিছু দিন পরে মিশ্রচাষ সুরু করিতে হয়। চুন প্রয়োগ করিলে পুকুরের উর্বরতা বাড়ে এবং ছাড়া মাছগুলি সুস্থ থাকে।

(d) **সার প্রয়োগ**—চুন প্রয়োগের 7 হইতে 10 দিন পরে পুকুরে সার প্রয়োগ করিতে হয়। জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার সার পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা হয়। উল্লেখযোগ্য সার হইল খোল, গোবর, সুপারফসফেট ও অ্যামোন ফসফেট (Amon phosphate)।

(e) **চারা পোনা ছাড়া**—প্রথম পর্যায়ে সার প্রয়োগের তিন সপ্তাহ পরে পুকুরে চারা পোনা ছাড়িতে হয়। চানা পোনার দৈর্ঘ্য 100 হইতে 120 cm হওয়া প্রয়োজন।

(f) হেকটাএকর প্রতি চারা পোনার সংখ্যা নিম্নোক্ত সংখ্যায় বা শতকরা হিসাবে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। দুইপ্রকার মিশ্র চাষের একটি সংখ্যায় এবং অন্যটি শতকরা হিসাবে দেওয়া হইল—

সংখ্যা	শতকরা হিসাব
কাতলা—500	কাতলা—30%
রুই—1,500	রুই—50%
রুপালী রুই—1,000	মৃগেল—10%
ঘেসো রুই—500	কালবোস—10%
মৃগেল—750	

(g) **খাদ্যের অনুদান**—সরিষা খোল (Mustard oil cake), তুষ (Rice bran) ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে পুকুরে প্রয়োগ করিলে মিশ্র চাষে সুফল পাওয়া যায়। এক হেকটাএকর আয়তনযুক্ত পুকুরে 5,000 হইতে 7,500 চারা পোনা ছাড়ার পর নিম্নোক্ত নিয়মে খাদ্যের অনুদান দেওয়া প্রয়োজন—

(i) প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন তিন কিলোগ্রাম

(ii) পরের ছয়মাসে প্রতিদিন ছয় কিলোগ্রাম

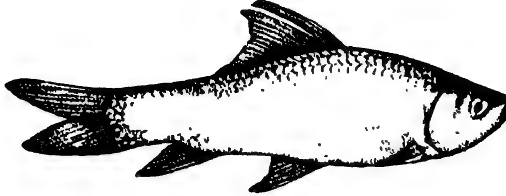
(iii) পরের নয়মাসে প্রতিদিন নয় কিলোগ্রাম

(iv) পরের বারোমাসে প্রতিদিন বারো কিলোগ্রাম

(h) বাজারজাত করিবার জন্য চারাপোনা ছাড়ার এক বছর পরে মাছ ধরা হয়। এই সময় মাছের ওজন 800/1000 গ্রাম হইয়া যায়।

অন্য দেশ হইতে মৎস্য আনিয়া সেগুলিকে এই দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজিত করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। অবশ্য এই ধরনের চেষ্টার ফলে কাশ্মীরের নদীগুলিতে ট্রাউট (*Trout*) মৎস্য স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে। ব্যাঙ্কক হইতে আমদানী করা সাইপ্রিনাস কারপিও (*Cyprinus carpio*) বর্তমানে এদেশে অভিযোজিত হইয়া গিয়াছে। তেলাপিয়া মোজাম্বিকা (*Telapia mossambica*) বা "আমেরিকান কৈ" বর্তমানে একটি অতি পরিচিত মাছ। ইহাও আফ্রিকা হইতে এদেশে আনিয়া সার্থকভাবে অভিযোজিত করা হইয়াছে। চীনদেশ হইতে আমদানী করা ঘেসোরুই (Grass carp) এবং রুপালী রুই (Silver carp) ভারতবর্ষে অভিযোজিত হইয়াছে। মাছগুলি খাইতে সুস্বাদু এবং প্রজনন ও বৃদ্ধির হার বেশী হওয়ায় এইগুলি চাষ করিতে মৎস্যচাষীগণ উৎসাহ বোধ করিতেছেন। এইভাবে অন্য দেশ হইতে মৎস্য আনিয়া সেইগুলিকে এই দেশের আবহাওয়ায় অভিযোজিত করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। সেই কারণে এই পদ্ধতির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

মাছের সংকরায়ণ (Hybridization of fish)—সংকরায়ণ দ্বারা উচ্চ প্রজনন শক্তিসম্পন্ন, রোগ প্রতিরোধী ও প্রতিকূল পরিবেশ বেশী পরিমাণে সহ্য করিতে পারে এইরূপ **সংকর মাছ** সৃষ্টি করা যায় (চিত্র 16.4)। সংকরায়ণ একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং ইহার সাহায্যে অভিপ্রেত চরিত্রলক্ষণ যুক্ত মাছ নির্বাচন করিয়া উহাদের সহিত



চিত্র 16.4 রুপালী রুই ও রুই মাছের সংকরায়ণ জাত রুপালী রুই (Silver Rohu) মাছের বহিরাকৃতি।

কাছাকাছি প্রজাতির বা গণের মাছের সংকরায়ণ করানো হয়। এইভাবে সৃষ্ট সংকর মাছের চরিত্রলক্ষণ জনিতৃ জনুর চরিত্রলক্ষণের মাঝামাঝি দশায় প্রকাশ পায়। আন্তঃ-প্রজাতি সংকরায়ণে সার্থক ভাবে নিম্নোক্ত সংকর মাছের সৃষ্টি হইয়াছে—

(a) পুরুষ রুই (*Labeo rohita*) × স্ত্রী কালবোস (*L. kalbasu*) = রুই কালবোস (সংকর)

(b) পুরুষ কালবোস × স্ত্রী রুই = কালবোস রুই (সংকর)

(c) পুরুষ বাটা (*L. bata*) × স্ত্রী রুই = বাটা রুই (সংকর)

(d) পুরুষ বাটা × স্ত্রী কালবোস = বাটা কালবোস (সংকর)

আন্তঃগণ সংকরায়ণে নিম্নোক্ত সংকর মাছ সৃষ্টি হইয়াছে—

(a) পুরুষ কাতলা (*Katla katla*) × স্ত্রী রুই = কাতলা রুই (সংকর)

(b) পুরুষ কাতলা × স্ত্রী কালবোস = কাতলা কালবোস (সংকর)

(c) পুরুষ কাতলা × স্ত্রী মৃগেল (*Cirrhina mrigala*) = কাতলা মৃগেল (সংকর)

(d) পুরুষ রুই × স্ত্রী মৃগেল = রুই মৃগেল (সংকর)

ভারতবর্ষের অন্তর্দেশীয় জলাধারগুলিকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাইয়া এবং সমুদ্র হইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ সহজেই নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং সেইসঙ্গে মৎস্য চালান দিয়া প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারে। সেই কারণে মৎস্যচাষের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত করার চেষ্টা করা উচিত।

অনুচ্ছেদ 17
চিংড়ী চাষ

17.1 চিংড়ী চাষ ও ভারতবর্ষ

সন্ধি পদ পর্বের ক্রাসতেশিয়া শ্রেণীভুক্ত চিংড়ী (Prawn) বর্তমানে সার্থক ভাবে চাষ করা সম্ভব হইয়াছে। চিংড়ী উৎপাদনে বিশ্ব মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। কিন্তু এই চিংড়ীর প্রায় 90% সমুদ্র হইতে আহরণ করা হয়। বাকী 10% চিংড়ী মোহনা সংলগ্ন নোনা জলের নদী ও খাড়ি হইতে সংগৃহীত হয়। সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের উপকূল বরাবর প্রায় কুড়ি লক্ষ হেক্টর নোনা জল ধৌত নাবাল জমি আছে এবং এই উপকূলবর্তী জল চিংড়ী ও অন্যান্য মাছের সম্ভারে ভরা। ইহাদের মধ্য হইতে বাগদা জাতীয় চিংড়ী (Peanids) উপকূল ভাগ সংলগ্ন নদী ও খাড়িতে খাবার ও বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া আসে। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাতে চিরাচরিত প্রথায় এই চিংড়ীর চাষ করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই চিংড়ীর চাষ করিতে পারিলে চিংড়ীর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হইলে উহা অন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ করিতে পারিবে এবং মাছ চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হইবে। সেই কারণে চিংড়ীর চাষের উপর বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

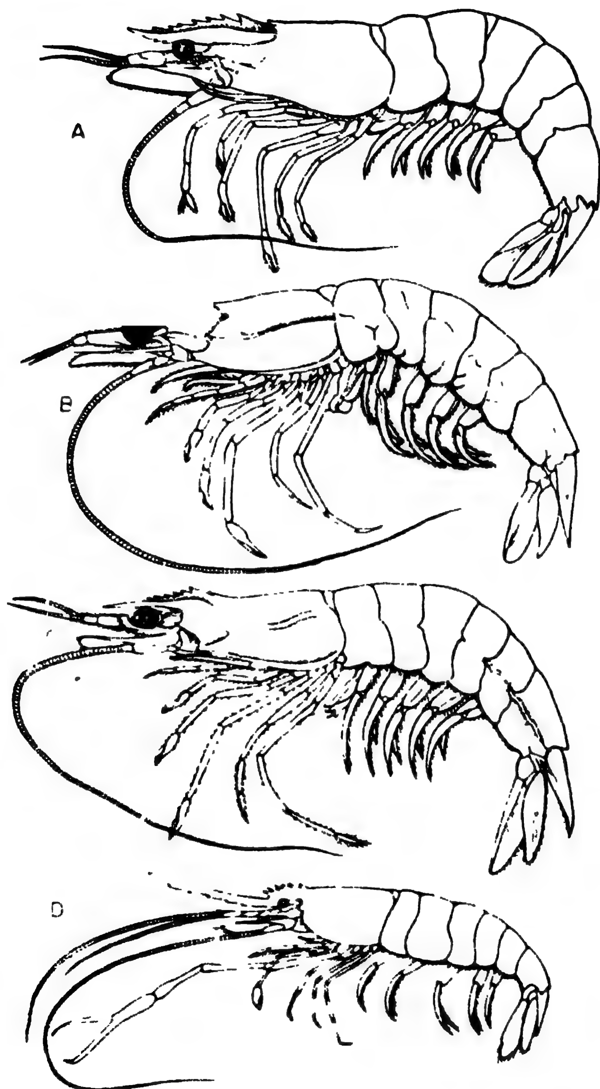
17.2 ভারতবর্ষের পূর্ব-উপকূলে চাষযোগ্য লবণাক্ত জলের চিংড়ীসমূহ—

বাগদা (*Penaeus monodon*)
চাপড়া বা পামড়া বা টুনা চিংড়ী (*P. indica*)
হেঁড়ে বাগদা (*P. semisulcatus*)
চামনে চিংড়ী (*Metapenaeus monoceros*)
হনো চিংড়ী (*M. brevicornis*)
রুশনা চিংড়ী (*Palaemon styliferus*)
চিংড়ী (মেটাপিনিয়াস) (*M. dobsoni M. affinis*) ইত্যাদি

17.3 চিংড়ী বীজ সনাক্তকরণ

(a) **বাগদা**—14 মিলিমিটার দীর্ঘ বাগদা বীজের পেটের দিকে আগাগোড়া অবিচ্ছিন্ন লাল দাগ ; ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণীর পেটের দিকে 14 হইতে 19টি খয়েরী দাগ ; 15 হইতে 20 মিলিমিটার অঙ্ক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বীজের কৃত্তি-

কাবরণীতে প্রথমে গোলাপী ও পরে সব্‌ুজ রংয়ের দাগ দেখা যায় (চিত্র 17.1); চাপড়া চিংড়ীর তুলনায় ইহাদের চোখ ছোট।



চিত্র 17.1 কয়েক প্রজাতির চাষযোগ্য চিংড়ীর বহিরাকৃতি – বাগদা (A), হনো (B), চামনে (C), চুশ্যা (D)।

(b) চাপড়া চিংড়ী—25 মি. মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ইহাদের ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের

কৃত্তিকাবরণীর পেটের দিকে 5-7টি খয়েরী বা হলুদ ছোপ দেখা যায়, শুঁড়ের ডগা লাল অথবা গোলাপী।

(c) **হেঁড়ে বাগদা**—ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণীর পেটের দিকে ৪-11টি খয়েরী দাগ ; শুঁড় চক্ষুদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া প্রসারিত।

(d) **চামনে চিংড়ী**—দেহের রং খয়েরী অথবা লালচে খয়েরী ; শুঁড় খুব লম্বা ; শিরোবক্ষের কৃত্তিকাবরণীর কিনারায় ঘনসন্নিবিষ্ট নীল বর্ণের ছিট ছিট দাগ ; ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণীর পেটের দিকে ঘন নীল ছিটগুলি ইংরাজী M অক্ষরের ন্যায় সজ্জিত।

(e) **হন্যে চিংড়ী**—শুঁড়ের পৃষ্ঠ দিকে সাতটি দাঁত ; অঙ্কীয় দিকে দাঁত থাকে না। গায়ের রং হালকা হলুদাভ এবং খয়েরী ছোপযুক্ত।

(f) **রুশ্না চিংড়ী**—শিরোবক্ষের কৃত্তিকাবরণীতে দুইটি কাঁটা ; দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণী প্রশস্ত এবং ইহা প্রথম ও তৃতীয় উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণীকে কিছুটা আবৃত করে ; দুইজোড়া পায়ের ডগা চিমটার ন্যায় ; শুঁড়ের গোড়া উঁচু, শুঁড়ের ডগায় দাঁতের সংখ্যা 1-3, গোড়ায় 5-7 এবং অঙ্কীয় দিকে 6-10 ; শিরোবক্ষ আকারে বড়।

(g) চিংড়ী : (i) **মেটাপিনিয়াস ডবসীন**—শুঁড় দাঁতযুক্ত এবং ছোট ; শিরোবক্ষ ও উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণীতে নীলচে ছিট ছিট দাগ।

(ii) **মেটাপিনিয়াস অ্যাফিনিস**—শিরোবক্ষ ও উদর খণ্ডকের কৃত্তিকাবরণীর দাগ অস্পষ্ট।

17.4 বিস্তরণ (Distribution)

রুশ্না চিংড়ী—হুগলী, মাতলা-রূপনারায়ণের মোহনায়, চিল্কা হ্রদ অঞ্চলে প্রচুর এবং গোদাবরী নদীর মোহনায় স্বল্প পরিমাণে সারা বছর পাওয়া যায়। আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর মাসে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হুগলী নদীর মৌসুমী দ্বীপ অঞ্চলে এই সময়ে বিন্তি জাল পিছু ঘণ্টায় 1,400 বাচ্চা ধরা পড়ে।

বাগদা—সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে, ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে বিশেষতঃ চিল্কা ও পুলিকাট হ্রদের মুখে, গোপালপুর, এন্নোর, মহানদী, গৌতমী গোদাবরী ইত্যাদি অঞ্চলে প্রায় সারা বছর বাগদা বীজ পাওয়া যায়। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসের ভরা কোটালে জোয়ার প্রতি প্রতিবার 10,000 বীজ সংগৃহীত হয়।

চাপড়া—ভারতের পূর্ব উপকূলের খাঁড়ি মোহনায় ও নোনা হ্রদে সারা বৎসরই ইহাদের বীজ পাওয়া যায় তবে জায়গা বিশেষে পরিমাণের তারতম্য ঘটে। সুন্দরবন অঞ্চলে জানুয়ারী হইতে মার্চ মাসে, কাকদ্বীপ ও বকখালিতে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীজের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

হেড়ে বাগদা – অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর খাঁড়ি মোহনায় এবং নোনা হ্রদে সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক হেড়ে বাগদার বীজ পাওয়া যায়। পুলিকট হ্রদে সারা বছর বীজ পাওয়া যায় তবে মার্চ, জুন, আগষ্ট এবং ডিসেম্বর মাসে বীজের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

চামনে চিংড়ী – হুগলী-মাতলা নদীর খাঁড়ি মোহনায়, আদিয়ার খাঁড়ি, পুলিকট, গোতমী গোদাবরী খাঁড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে চামনে চিংড়ীর বীজ পাওয়া যায়। চামনে চিংড়ী বীজ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবস্থায় সংগৃহীত হয়।

হন্যে চিংড়ী – হুগলী-মাতলা নদীর খাঁড়ি মোহনায় হন্যে চিংড়ীর বীজ বেশী সংখ্যায় সারা বছরই পাওয়া যায়।

চিংড়ী : (1) মেটাপিনিয়াস ডবসিনি – চিল্কা ও পুলিকট-হ্রদ ও গোতমী গোদাবরী খাঁড়ি মোহনায় ইহাদের বীজ যথাক্রমে বেশী ও কম সংখ্যায় পাওয়া যায়।

(2) মেটাপিনিয়াস অ্যাফিনিস – পূর্ব উপকূলবর্তী নদী মোহনায় এই চিংড়ীর বীজ পাওয়া যায়, তবে বীজের সংখ্যা খুব বেশী হয় না।

17.5 চিরাচরিত প্রথায় চিংড়ী চাষের মূলনীতি

ভারতবর্ষে বহুদিন ধরিয়া যে প্রথায় চিংড়ী চাষ হয় তাহাকেই চিরাচরিত প্রথা বলা হইয়াছে। এই ধরনের চাষে যে মৌলিক নীতি অবলম্বন করা হয় তাহা হইতেছে চাষযোগ্য ক্ষেত্রে জোয়ারের জলের সহিত আসা চিংড়ী বীজের প্রতিপালন, আকারবৃদ্ধি পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং পরিশেষে উহাদের সংগ্রহ ও বাজারজাত করা। পদ্ধতিটি কম খরচসাপেক্ষ এবং পদ্ধতিটিকে ধান জমিতে ধান কাটার পর ব্যবহার করা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় এই প্রথায় চিংড়ী চাষ হয়।

17.6 পশ্চিমবাংলার চিংড়ী চাষের পদ্ধতি

(a) ধান জমিতে চিংড়ীর চাষ : পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চলে ধানজমিতে সেচ খাল (Irrigation canal) হইতে চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হয় সেই সমস্ত ধানজমি চিংড়ী চাষে ব্যবহৃত হয়। জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত সেচ খালের তল ধান চাষের জমির তল অপেক্ষা প্রায় 10 সেন্টিমিটার নিচে রাখা হয়। বর্ষার সময় (জুন-জুলাই) ধানজমিতে সার দেওয়া হয় এবং ধানের চারা রোপণ করা হয়। আগষ্ট মাসে ধানজমি বৃষ্টির জলে ডুবিয়া যায় এবং এই জলে লবণের ঘনত্ব কম থাকে। এই সময় ধানজমি ও সেচ খালের মধ্যবর্তী মাটির বাঁধ স্থানে স্থানে কাটিয়া দেওয়া হয়। সেচ খালের জলে নদী হইতে আসা যে সমস্ত চিংড়ী ও অন্যান্য মাছের বীজ থাকে সেইগুলি এই কাটা অঞ্চল দিয়া ধানজমিতে প্রবেশ করে। এই সময় হইতে ধান কাটার আগে পর্যন্ত বীজগুলি ধানজমিতে বড় হয়। ধান কাটার বেশ কিছুদিন পূর্বে ধানজমি হইতে চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ সংগ্রহ করা হয় এবং উহাদের বাজারজাত করা হয়।

(b) **নোনা জলের ভেড়িতে চিংড়ী চাষ :** নোনা জলের ভেড়িতে মাছ চাষের উৎপত্তির ইতিহাস হিসাবে বলা হয় যে সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ করিবার জন্য হাজার হাজার একর জমির বনজঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর ঐ জমির চারিদিকে বাঁধ বাঁধিয়া পলি মাটি জমার জন্য ঐ মাটিতে স্লুইশ গেটের সাহায্যে জোয়ারের জল প্রবেশ করানো হইত। ভরা কোটালে ঐ জলের সহিত অনেক মাছের বীজ আসিত। ধান চাষের মাসগুলিতে ঐ বীজগুলি বড় হইত এবং উহাদের বাজারজাত করা হইত। পশ্চিমবঙ্গে 24 পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে নোনা জলের ভেড়িতে চিংড়ী চাষ করা হয়। চাষ করার পদ্ধতিটিকে 'ভাসা বাধ' (Bhasa bada) পদ্ধতি বলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 8000 বর্গ কিলোমিটার আয়তনের 'ব' দ্বীপ অঞ্চলে (সুন্দরবন) অসংখ্য নদী, খাঁড়ি ও খাল আছে। সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, মাতলা প্রভৃতি নদী গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ হারাইয়া সমুদ্রের অন্তর্নালীতে পরিণত হইয়াছে। এইসব খাঁড়িতে জোয়ার ও ভাটার জল 3 হইতে 5 মিটার পর্যন্ত উঠানামা করে। এই জলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর লবণ ও জৈব ক্ষরিত পদার্থ ভাসিয়া আসে।

ভাসা বাধ পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য নির্ধারিত এলাকার পরিধি বরাবর প্রথমে মাটির বাঁধ দেওয়া হয়। তারপর বাঁধের একস্থানে স্লুইশ গেট (Sluice gate) বসান হয়। স্লুইশ গেটের মধ্য দিয়ে নদী বা খাল হইতে আসা জলের সাহায্যে চাষের জমিকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। জোয়ারের জলের সঙ্গে আসা চিংড়ী ও অন্যান্য মাছের বীজ ঐ বাঁধ দেওয়া অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়। চাষের জমিতে বড় মাছ এবং আমাছা আসা বন্ধ করিবার জন্য কয়েকটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি হইল স্লুইশ গেট ও চাষের জমির মধ্যে খালে পাটা বসানো। দুই পাটার সংযোগস্থলে চেরা বাঁশ দিয়া তৈয়ারী 'বিত্ত' বা 'আটল' উল্টা 'v' বা 'w' আকারে এমনভাবে বসানো হয় যাহাতে কেবলমাত্র ছোট মাছ উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আর একটি পদ্ধতিতে পাটার সহিত বাক্স সদৃশ 'জো কল' লাগানো থাকে এই জো কলে বড় মাছ আটকাইয়া যায় এবং উহাদের ধরা হয়।

মাছ চাষের জমিতে বীজসহ জল জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবেশ করানো হয়। মার্চ এপ্রিল মাসে চাষ জমিকে ঘেরিয়া যে বাঁধ থাকে সেগুলি মেরামত করা হয়। মে জুন মাসে গরমের জন্য চাষের জমিতে জলের পরিমাণ কমিয়া যায়। অবৈধ সংগ্রহ বা চুরি বন্ধের জন্য এই সময় চাষের জমিতে বাঁশ ছোট কাঠ ইত্যাদি পুঁতিয়া দেওয়া হয়। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে মাছগুলি ধরিয়া বাজারজাত করা হয়।

17.7 কেরলায় পককালি পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষ

কেরালায় ধান চাষের নিচু জমিকে 'পককালি' বলে। কেরালায় পককালি জমিতে বছরে একবার ধান চাষ হয় (জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর)। ধান কাটার পর ধান-

জমির বাঁধগুলি প্রথমে মেরামত করা হয়। তারপরে সেচ খাল হইতে স্লুইশ গেটের মধ্য দিয়া ধানজমিতে জোয়ারের জল প্রবেশ করানো হয়। শরৎকালের প্রতি জোয়ারেই ধানজমিতে জল প্রবেশ করানো হয়। এই জলের সহিত অসংখ্য চিংড়ী ও অন্যান্য মাছের বীজ চাষ জমিতে প্রবেশ করে। ভাটার সময় যাহাতে মাছগুলি বাহিরে না চলিয়া যায় তাহার জন্য চাষ জমি ও স্লুইশ গেটের মধ্যে জাল আটকানো হয়। চাষ জমিতে বীজগুলিকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বড় হইতে দেওয়া হয়। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাছগুলি ধরা হয়।

17.8 জাপানে উদ্ভাবিত স্বল্প পরিসরে চিংড়ী চাষ পদ্ধতি

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জাপানে সম্প্রতি কংক্রীটের চৌবাচ্চার স্বল্প পরিসরে সার্থক ভাবে চিংড়ী চাষ সম্ভব হইয়াছে। পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

(a) **পূর্ণবয়স্ক চিংড়ী সংগ্রহ**—পূর্ণবয়স্ক কিছু পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ী প্রথমে সমুদ্র হইতে ধরা হয় এবং উহাদের জীবিত রাখা হয়। ইহাদের মধ্য হইতে সুস্থ ও সতেজ চিংড়ী বাছাই করা হয়। পিনিয়াস জ্যাপোনিকাস (*Penaeus japonicus*) প্রজাতির চিংড়ী ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত চিংড়ীগুলিকে (স্ত্রী ও পুরুষ) আতুড় পুকুরে ছাড়া হয়।

আতুড় পুকুরের গঠন ও কার্য—আতুড় পুকুরগুলি কংক্রীটের তৈয়ারী চৌবাচ্চার ন্যায়। ইহারা নানা মাপের হইতে পারে। সচরাচর $57m^3$ মাপের (তলা $4·2m \times 75m$, উচ্চতা $1·8m$) বা $200m^3$ মাপের (তলা $10m \times 10m$, উচ্চতা $2m$) চৌবাচ্চা ব্যবহার করা হয়। জল নিষ্কাশনের জন্য চৌবাচ্চার তলা 3% ঢালু করা হয়। চৌবাচ্চার জলের প্রবেশ ও নির্গম পথ থাকে। নির্গম পথটি চৌবাচ্চার ঢালু দিকে অবস্থিত। সমুদ্রের জল চৌবাচ্চায় ব্যবহৃত হয়।

পরিণত স্ত্রী চিংড়ী আঁতুড় পুকুরে ডিম পাড়ে এবং পুরুষ ঐগুলিকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম হইতে লার্ভা বাহির হয়। লার্ভাগুলির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য আঁতুড় পুকুরে পটাসিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম ফসফেট যথাক্রমে 10 : 1 অনুপাতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লার্ভাগুলি বড় হইলে এবং উহাদের পায়ে দাড়া দেখা দেওয়ার পর উহাদের সঞ্চয় পুকুরে (Stocking pond) স্থানান্তরিত করা হয়।

সঞ্চয় পুকুর ও মাছের বৃদ্ধি—সঞ্চয় পুকুরের গঠন আঁতুড় পুকুরের ন্যায় তবে ইহা আকারে বড়। সঞ্চয় পুকুরে সার দেওয়া হয় এবং চিংড়ীগুলি বড় হইলে উহাদের ধরিয়া বাজারজাত করা হয়।

জাপানী পদ্ধতিতে চাষের সুবিধা—জাপানী পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষের মূলতঃ দুইটি সুবিধা : প্রথমতঃ স্বল্প পরিসরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চিংড়ী চাষ ; দ্বিতীয়তঃ বছরের যে কোন সময়ে চিংড়ী পাইবার সুবিধা।

17.9 নোনা জলে চিংড়ি চাষের অসুবিধা ও প্রতিকার

নোনা জলে চিংড়ী চাষের অসুবিধাগুলি নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে—

1. **যান্ত্রিক কারণ : (a) পয়োদ্বারের গঠনগত ব্যর্থতা**—নোনা জলের খামারে পয়োদ্বারের গুরুত্ব অনেক। যোগান খালের (Feeder canal) সঙ্গে খাঁড়ির এবং খামারের প্রতিটি পুকুরের সহিত সংযোগ রাখা পয়োদ্বারের প্রধান কাজ। পয়োদ্বার সৃষ্টির সময় খারাপ মাল মসলা ব্যবহার অথবা পুকুরের তলা বসিয়া যাওয়া বা খামারের গঠনগত ত্রুটির ফলে চাষ নষ্ট হয়। এইগুলি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

(b) **বাঁধের মাটি ধ্বসা**—নোনা মাটি নরম এবং স্থিতিশীল নহে। ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিতে বাঁধের মাটি ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। সেই কারণে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

(c) **খামার পুকুরে পলি জমা**—খামার পুকুরে পলি জমার ফলে পুকুরের গভীরতা কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং একবার চাষ ও সংগ্রহ শেষ হইবার পর জমা পলি তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন।

(d) **অতিবৃষ্টিতে খামার ভাসিয়া যাওয়া**—দুইটি খামার মধ্যবর্তী পুকুরের বাঁধ খুব উচু করা হয় না। অতিবৃষ্টি বা পয়োদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়ায় খামার পুকুর ভাসিয়া যাইতে পারে। অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জন্য পাম্পের বন্দোবস্ত করা উচিত।

2. **পদার্থগত কারণ** : (a) **তাপমাত্রা**—গরমের দিনে খামার পুকুরে জল উত্তপ্ত হইতে পারে। ইহা ছাড়াও বাষ্পীভবনের ফলে জলের লবণতা বাড়িয়া যাইতে পারে। অনুরূপ ভাবে শীতের দিনে পুকুরের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিতে পারে। ইহা প্রতিরোধের জন্য খামার পুকুর ও জোয়ারের জলের মধ্যে একটি নিয়ত চলাচল ব্যবস্থা বজায় রাখা উচিত।

(b) **অনচ্ছ জল**—লবণতা হ্রাস, জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ভাসমান পলি ইত্যাদির জন্য খামার পুকুরের জল অনচ্ছ হইতে পারে। অনচ্ছ জলে শ্যাওলার বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না। সুতরাং জল যাহাতে অনচ্ছ হইয়া উঠিতে না পারে সেদিকে নজর রাখা উচিত।

3. **রাসায়নিক কারণ : (a) লবণতা**—সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত বৃদ্ধির জন্য খামার পুকুরের জলের লবণতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা উচিত। এই মাত্রা অতিক্রান্ত হইলে চিংড়ীর বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং উহারা রোগগ্রস্ত হয়। জোয়ারের জল ও খামারের জলে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিলে লবণতা ব্যাহত হইতে পারে না।

(b) **চাষের পুকুরের জৈব কারণ জনিত দূষণ**—খামারের জলে লবণের মাত্রা বাড়িলে অম্লজানের পরিমাণ কমিয়া যায়। অম্লজানের স্বল্পতায় পুকুরের তলায়

ক্ষরিত জৈব বস্তুর অজৈব সারে রূপান্তরিত হইতে বেশী সময় লাগে। এই অবস্থায় পুকুরের তলদেশে ক্ষরিত জৈব পদার্থের জমা হওয়ার হার উহাদের অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার হার হইতে বেশী হয় ফলে জলে জৈব দূষণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বায়ু-সঞ্চালক যন্ত্রের সাহায্যে জলে বায়ু সঞ্চালিত করিলে এই সমস্যার নিরসন হয়।

(c) **অম্লজানের ঘাটতি**—জলে লবণতার মাত্রা বাড়িলে দ্রবীভূত অম্লজান জল হইতে বাহির হইয়া যায়। নিবিড় মাছের চাষে চিংড়ী ও অন্যান্য মাছের শ্বাসক্রিয়ার ফলে জলে দ্রবীভূত অম্লজানের পরিমাণ কমিয়া যায়। আবার জলের নিচে শ্যাওলার উৎপাদন অল্প হইলে জলে দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া অম্লজানের পরিমাণ কমিতে পারে। ইহা বন্ধ করার জন্য খামারে জলের নিরন্তর স্রোত বজায় রাখার ব্যবস্থা ও বায়ুসঞ্চালনের যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

4 **জৈব কারণ**-জৈব কারণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—পরজীবি এবং ক্ষতিকারক কীট ও প্রাণী।

(a) **পরজীবি**—নোনা জলের খামারে চিংড়ী বা অন্য মাছ সচরাচর পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয় না। চিংড়ী কখনো কখনো বোপারাইড (Boparide) পরজীবি দ্বারা এবং ভাঙন জাতীয় মাছের (মিশ্র চাষে) লারনিয়া (Larnea) নামক পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়। খামারের বদ্ধ জল বাহির করিয়া এবং জোয়ারের জল প্রবেশ করাইয়া অথবা 5% পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্রাণ ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়। তবে লারনিয়া রোগগ্রস্ত মাছকে পুকুর হইতে তুলিয়া ফেলা বিধেয়।

(b) **ক্ষতিকারক কীট ও প্রাণী**—ব্যালানাস (Balanus) নামক সন্ধিপদী প্রাণীরা দলবদ্ধ ভাবে খামার সংলগ্ন কাঠের কাঠামোয় বাসা বাঁধে ও খামারের ক্ষতি করে।

বিভিন্ন ধরনের শামুক পুকুরের তলদেশে জমানো শ্যাওলা খায় ও চিংড়ী খাদ্য নষ্ট করে।

সাপ, পাখী, ভোঁদড় ইত্যাদি প্রাণী মাছ খায় ফলে উৎপাদন কমিয়া যায়। ইঁদুর বাঁধের মাটিতে গর্ত করে ও বাঁধের গঠন নষ্ট করে।

বান (Eel) জাতীয় মাছ জলের তলায় গর্ত করে বা বাঁধে গর্ত করে ফলে বাঁধের ক্ষতি হয়।

শিকারী প্রাণীদের জন্য ফাঁদ ব্যবহার করিলে বা ভীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যায়।

ট্রাইফিনাইল, টিন বা তামাকের গুঁড়া নিয়মমত ব্যবহার করিলে শামুকের উপদ্রব বন্ধ করা যায়।

কাঠামোর গায়ে আলকাতরা ব্যবহার করিলে ব্যালানাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

17.10 চিংড়ী চাষের উন্নতি

চিংড়ী চাষের উন্নতির জন্য বর্তমানে নিম্নোক্ত উপায়গুলি গ্রহণ করা হইয়াছে—

(a) চিংড়ী বীজ প্রাপ্তির স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

(b) নোনা জলে চিংড়ী চাষের উপযোগী জমি বৃদ্ধি। ভারতবর্ষে প্রায় 6000 বর্গ কিলোমিটার এখনও ব্যবহৃত হয় নাই।

(c) মাছ ছাড়ার পূর্বে খামার পুকুর তৈয়ারীতে যথেষ্ট সাবধানতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খামার নির্মাণ।

(d) বীজের সংগ্রহ ও বাছাই সঠিকভাবে করা।

(e) চিংড়ীর মিশ্র চাষ— চিংড়ীর সহিত নোনা জলের অন্যান্য মাছ, যথা— পারশে (*Liza persia*), ভাঙ্গন (*Liza tade*), চাঁদা (*Scatopus sp.*) প্রভৃতির মিশ্র চাষে সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(f) নিবেশিত প্রজনন (Induced breeding)—চিংড়ী মাছের নিবেশিত প্রজনন করানোর চেষ্টা চলিতেছে। দেখা গিয়াছে চিংড়ীকে চিংড়ীর অক্ষিদণ্ডের নির্যাস ইঞ্জেকসন করিলে উহারা প্রজনন করে। পদ্ধতিটি অনেকটা পোনা মাছের নিবেশিত প্রজননের ন্যায়। ইহা সার্থক হইলে চিংড়ী বীজ চাষীদের সরবরাহ সহজতর হইবে এবং চাষীরা চাষে উৎসাহ বোধ করিবে।

অনুচ্ছেদ 18

মুক্তা চাষ

18.1 মুক্তা চাষের ইতিহাস

মুক্তার সহিত মানুষের পরিচয় বহুযুগের। ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাচীন সাহিত্যে মুক্তার উল্লেখ আছে। বেদে মুক্তার কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহা প্রমাণ করে যে মুক্তা সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতবর্ষে প্রাক আর্য যুগে (খ্রীষ্টজন্মাব্দের 2000 বৎসর আগে) অর্জিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক গহনায় মুক্তার ব্যবহার দেখা গিয়াছে। এই ধরনের গহনায় একটি কেন্দ্রীয় হীরার পরিধি বেষ্টন করিয়া মুক্তার সারি দেখা যায়। প্রাচীন রোমে মুক্তা পদ ও মর্যাদার প্রতীক রূপে গণ্য হইত। বিশেষ পদমর্যাদা সম্পন্ন রাজপুরুষেরাই কেবলমাত্র মুক্তা ব্যবহার করিতে পারিত।

18.2 মুক্তা কি

মুক্তা শম্বুক পর্বের কয়েকটি সভ্যের দেহ-নিঃসৃত পদার্থ জমাট বাঁধিয়া সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি কার্যটি দেহের অভ্যন্তরে হয়। জমাট বাঁধা পদার্থটিকে নেকরে' (Necre) বা মাদার অফ পার্ল (Mother of pearl) বলে। এখানে উল্লেখ্য যে শম্বুক পর্বের সভ্যদের খোলক 'নেকরে' দ্বারা সৃষ্ট। শম্বুক পর্ব ছাড়াও পতঙ্গ শ্রেণীর কয়েকটি সভ্যের কৃত্তিকাবরণীতে এবং স্তন্যপায়ীদের শিংয়ে নেকরে জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত মুক্তা বলিতে শম্বুক পর্বের কয়েকটি প্রাণী কর্তৃক সৃষ্ট 'নেকরে'কে বোঝান হয়।

18.3 মুক্তার উপাদান

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুক্তার দুইটি প্রধান উপাদান আছে। ইহার প্রধান বা মুখ্য উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (Calcium carbonate)। দ্বিতীয় উপাদানটি অল্প মাত্রায় থাকে এবং ইহার নাম কনকিওলিন (Conchiolin)। কনকিওলিনে প্রোটিন অ্যালবুমেন (Albumen) পাওয়া যায়।

18.4 মুক্তার বর্ণ

মুক্তার বর্ণ নির্দিষ্ট নহে। পরিবেশ ও কোন্ প্রজাতি মুক্তাটি সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের উপর মুক্তার বর্ণ নির্ভর করে। মুক্তার বর্ণ সাদা, কালো, ধূসর, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি নানা ধরনের হইতে পারে। স্বাভাবিক মুক্তার দেহতল কর্কশ। ইহাকে পালিশ করিলে ইহার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। মুক্তার দেহতলের চাকচিক্যকে ওরিয়েন্ট (Orient) বলা হয়।

18.5 মুক্তার আকার

মুক্তার আকার গোল, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা নানা প্রকার হইতে পারে। গোল মুক্তার চাহিদা বেশী। মুক্তার ওজনে ভিন্নতা দেখা যায়। মুক্তার ওজনের একক পার্ল গ্রেন (Pearl grain)। এক পার্ল গ্রেন = 50 মিলিগ্রাম = $\frac{1}{4}$ ক্যারাট (Carat)। $\frac{1}{4}$ পার্ল গ্রেন ওজনের মুক্তাকে সীড পার্ল (Seed pearl) বলা হয়। এ পর্যন্ত পাওয়া সর্ববৃহৎ স্বাভাবিক মুক্তার ওজন 1,800 পার্ল গ্রেন। মুক্তাটির নাম দেওয়া হইয়াছে বারুর্য়ো (Baroques)। প্রাচ্য দেশে পাওয়া ওরিয়েন্টাল পার্লের (Oriental pearl) কদর পৃথিবীতে বেশী। একটি ডিম্বাকার 337 পার্ল গ্রেন ওজনের ও একটি 350 পার্ল গ্রেন ওজনের ওরিয়েন্টাল পার্ল বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

18.6 মুক্তার কদর

মুক্তার কদর উহার আকার ও ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে। নিখুঁত আকার ও ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতার উপর মুক্তার বাজার দর নির্ভর করে। শম্বুক পর্বের মুক্তা উৎপাদনকারী যে সকল সভ্যের খোলকের ভিতরের দিক মাদার অব পার্ল দ্বারা গঠিত সেই সমস্ত সভ্য প্রথম শ্রেণীর (First class) মুক্তা উৎপন্ন করিতে পারে। অন্য সভ্যদের দ্বারা উৎপন্ন মুক্তার ঔজ্জ্বল্য কম।

18.7 শম্বুক পর্বের মুক্তা উৎপাদনকারী সভ্যসমূহ

শম্বুক পর্বের বাইভ্যালবিয়া বা পেলিসাইপোডা শ্রেণীর অনেক সভ্য মুক্তা উৎপাদন করিতে পারে। ইহাদের সাধারণতঃ ঝিনুক (Oyster) বলা হয়। কয়েকটি মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের নাম—

a. পিংকটাডা ফুকাটা (*Pinctada fucata*)
b. পিঙ্কটাডা কেমনিটজি (*Pinctada chemnitzi*)
c. পিংকটাডা মার্জারিলিফেরা (*Pinctada margarilefera*)
d. পিংকটাডা আনোমিয়ইডেস (*P. anomioides*)
e. পিংকটাডা আট্রোপারপুরিয়া (*P. atropurpurea*)
f. পিংকটাডা মারটেনসিস (*P. martensis*)

পিংকটাডা মারটেনসিস পারস্য উপসাগর ও মান্নার উপসাগরে (Gulf of Mannar) পাওয়া যায়। ওরিয়েন্টাল পার্ল উৎপাদক হিসাবে ইহার সুনাম আছে। ভারত সাগরের কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় পিংকটাডা ফুকাটা প্রজাতি পাওয়া যায়।

প্রকৃত মুক্তা উৎপাদক ঝিনুক সমূহ ছাড়াও অসংখ্য সামুদ্রিক ঝিনুক এবং কয়েকটি মিঠা জলবাসী ঝিনুক (Fresh water oysters) মুক্তাসদৃশ বস্তু বা মুক্তা উৎপন্ন করিতে পারে। কয়েকটি এইরূপ সামুদ্রিক প্রজাতি হইল হেলিওটিস

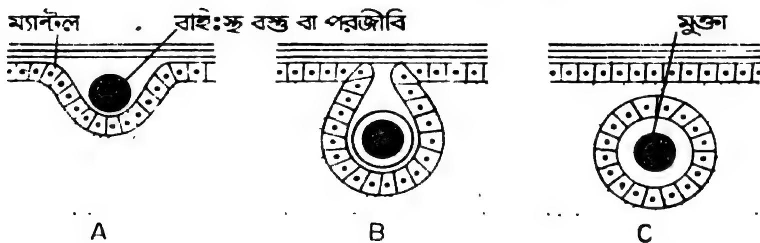
(*Heliotis sp.*), মাইটিলাস (*Mytilus sp.*) প্রভৃতি। গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাসকারী অনেক মিষ্ট জলের ঝিনুক হইতে মুক্তা পাওয়া গিয়াছে।

18.8 মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের স্বভাব ও বাসস্থান

মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকসমূহ নিশ্চল (Sedantary) প্রকৃতির। ইহারা সমুদ্রতলের বালি বা পাথরের গায়ে নিজেদের দেহের পশ্চাৎদিকের কিছু অংশ প্রোথিত করিয়া বসবাস করে। সমুদ্র তটরেখা হইতে 15-20 কিলোমিটার দূরে এবং 18-22 মিটার গভীরতায় ইহাদের পাওয়া যায়। ইহাদের বাসস্থানটিকে মুক্তাভূমি (Pearl bed) বলে। ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া মুক্তাভূমি আছে। সেই তুলনায় পশ্চিম উপকূলে মুক্তাভূমি নাই বলিলেই চলে। ভারতবর্ষের টিউটিকোরিন (Tuticorin in Tamilnadu) নিকটবর্তী অঞ্চলের মুক্তাভূমি হইতে লিঙ্গা (Lingha) নামক মূল্যবান মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। পারস্য উপসাগর, মান্নার উপসাগর, অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রের সাউথ প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ (Islands of South Pacific) সংলগ্ন সমুদ্রে, ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে, মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে মুক্তাভূমি আছে।

18.9 কি ভাবে মুক্তা উৎপন্ন হয়

শম্বুক পর্বের খোলক উহাদের দেহমধ্যস্থ ম্যান্টেল আবরণীর (Mantle) আবরক কলা (Epithelial cell) নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হয়। বাহির



চিত্র 18.1— মুক্তা সৃষ্টির ঘটনা প্রবাহ - খোলক ও ম্যান্টেল মধ্যবর্তী স্থানে বহিঃস্থ বস্তুর অবস্থান (A), ম্যান্টেল সৃষ্ট থলিতে বহিঃস্থ বস্তুর অবস্থান (B), বহিঃস্থ বস্তু বেষ্টন করিয়া পরতে পরতে নেকরে নিঃসরণ ও মুক্তার সৃষ্টি (C)।

হইতে অনুপ্রবেশকারী কোন বস্তু (Particle) বা পরজীবি (Parasite) ম্যান্টেল আবরণী ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে ম্যান্টেল আবরণীর কোষসমূহ উহাকে বেষ্টন করে এবং ঐ কোষগুলি হইতে নিঃসৃত পদার্থ বস্তুটিকে পরতে পরতে ঘিরিয়া ফেলে। এই নিঃসৃত পদার্থই মুক্তা উৎপন্ন করে (চিত্র 18.1)। অনুপ্রবেশকারী বস্তুটিম্যান্টেলগহ্বরেরগভীরেপ্রবিষ্ট হইলে প্রথমে বস্তুটিকে ঘেরিয়া ম্যান্টেল আবরণ

একটি থলি (Sac or Cyst) সৃষ্টি করে। পরে কোষগুলি নিঃসরণ আরম্ভ করে। অনুপ্রবেশকারী বস্তুটিকে ঘিরিয়া সৃষ্ট থলির উপর কোন চাপ কোন ভাবে সৃষ্ট না হইলে সাধারণতঃ গোলাকার মুক্তা পাওয়া যায়। থলিটির উপর চাপ সৃষ্টি হইলে মুক্তার আকার অনিয়ত হয়। অনিয়ত আকারের মুক্তাকে বারাক্যু (Baraque) মুক্তা বলে। খোলক ও ম্যাণ্টেল মধ্যবর্তী স্থানে অনুপ্রবেশকারী বস্তুটি থাকিলে ম্যাণ্টেল আবরণী হইতে কোনরূপ থলির সৃষ্টি হয় না। এই স্থলে উৎপাদিত মুক্তার একটি তল সমতল ও উহার বিপরীত তলটি অবতল হয়। ইহাদের ব্লিণ্টার পাল- (Blister pearl) বলে।

মুক্তা সহজেই উত্তাপ বা অ্যাসিডে নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের ঘামেও মুক্তা বিবর্ণ হইতে পারে। সেইজন্য মুক্তার ব্যবহার খুব সাবধানে করিতে হয়।

18.10 মুক্তা চাষ পদ্ধতি

মুক্তা চাষ দুইভাবে করা হয়। (a) প্রকৃতি হইতে আহরণ: (b) মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের ব্যবহার করিয়া প্রকৃতিতে কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদন। উভয় পদ্ধতি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়।

(a) **প্রকৃতি হইতে আহরণ**—এই পদ্ধতিতে সমুদ্রতলের মুক্তাভূমি হইতে ডুবুরী দ্বারা মুক্তা আহরিত হয়। মুক্তা আহরণের সময় ঋতু ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। 100 মিলিমিটার লম্বা এবং 4-5 বৎসর বয়স্ক ঝিনুক আহরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। আহরণের সময় নানা স্থানে নানারূপ। মান্নার উপসাগরে জুন হইতে অক্টোবর মাস আহরণের প্রকৃত সময়।

(b) **প্রকৃতিতে কৃত্রিম মুক্তা চাষ**—মুক্তার অর্থকরী মূল্য থাকায় মুক্তা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতিতে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মুক্তা উৎপাদনকারী ও কম বয়সী ঝিনুকের সনাক্তকরণের পর উহাদের শরীরের ভিতর কোন বস্তু জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং পরে উহাদের মুক্তা-ভূমিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রবিষ্ট বস্তুকে বেষ্টন করিয়া পূর্ব উল্লিখিত উপায়ে ঝিনুকটির দেহে মুক্তা সৃষ্টি হয়। 3-4 বৎসর পরে 90-100 মি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ঐ সমস্ত ঝিনুককে পুনরায় মুক্তাভূমি হইতে ডুবুরী দ্বারা তুলিয়া আনা হয় (Harvesting) এবং সৃষ্ট মুক্তা সংগ্রহ করা হয়।

কৃত্রিম মুক্তাচাষ পদ্ধতি সম্ভবত চীন দেশে প্রথম আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিষ্ট জলবাসী ঝিনুকের দেহে জোর করিয়া ছোট কাঠের টুকরা, ধাতু বা হাড়ের টুকরা ঢুকাইয়া চীন দেশে নিবেশিত মুক্তা চাষ (Induced Pearl culture) সুরু হয়। এই পদ্ধতিতে পাওয়া মুক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্ধগোলাকার হওয়ায় ইহারা ব্লিণ্টার পার্ল রূপে গণ্য হয়। এই অর্ধগোলাকার মুক্তার সহিত মাদার অফ পার্ল (Mother of Pearl) জোড়া দিয়া মুক্তা সম্পূর্ণ ও গোলাকার করা হয়। এই ধরনের মুক্তাকে পার্ল ডাবলেট (Pearl doublet) বলা হয়।

কৃত্রিম এবং সম্পূর্ণ গঠিত মুক্তাচাষ পদ্ধতি জাপানে 1890 খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভাবিত হয়। কোকিচি (Kokichi) নামক জাপানী বিজ্ঞানী মুক্তাচাষ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখান যে এক টুকরা মাদার অফ পার্ল অনুপ্রবেশকারী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হইলে ঝিনুকের দেহে কৃত্রিম অথচ সম্পূর্ণ গঠিত মুক্তা সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়াও এইভাবে সৃষ্ট মুক্তার সমগ্র দেহ নেকরে দ্বারা প্রস্তুত। এই আবিষ্কারের পর জাপানে মুক্তা চাষের হার ও সেইসঙ্গে মুক্তার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ও স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট মুক্তার মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য থাকে না। বর্তমানে জাপানে প্রায় 2,200 মুক্তা চাষ খামার আছে। 1960 সালের পর হইতে জাপানী কলাকুশলীদের সহায়তায় অস্ট্রেলিয়া মুক্তাচাষ সুরু করিয়াছে।

13.11 মুক্তাচাষ বৃদ্ধির উপায়

মুক্তার অর্থকরী মূল্য অনেক। অলঙ্কার ও কারু শিল্পে মুক্তা ব্যবহৃত হওয়ায় মুক্তার চাহিদা অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যন্ত বেশী। নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তাচাষ বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে

(a) মুক্তাভূমির অনুসন্ধান।

(b) মুক্তাভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার।

(c) অপরিণত অর্থাৎ আকারে ছোট ও বয়সে কম এই ধরনের ঝিনুক আহরণ না করা।

(d) কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তাভূমি হইতে ঝিনুক আহরণ।

(e) মুক্তা ঝিনুকের বংশবৃদ্ধির জন্য মুক্তাভূমির তদারকি।

(f) মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক সম্বন্ধে আরও বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধান ও উহাদের মধ্যে সংকরায়ণ করাইয়া দ্রুত বৃদ্ধিসম্পন্ন ও রোগ প্রতিরোধক সংকর প্রজাতির সৃষ্টি।

(g) মুক্তাভূমিকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা।

অনুচ্ছেদ—19

পেস্ট

19.1 পেস্ট কাহাকে বলে

ইংরাজী পেস্ট (Pest) শব্দের অর্থ কীট-পতঙ্গ। কিন্তু কৃষি-প্রাণিবিদ্যায় পেস্ট বলিতে সাধারণত সেই সকল কীট-পতঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাহারা আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদরাজী ও ফসল নষ্ট করে। এক কথায় যে সকল প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি বা আধিক্যে মানুষের কৃষিজ শস্যের, স্বাস্থ্যের ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটে তাহাদের পেস্ট বলে। কোন একটি প্রাণী প্রজাতিকে তখনই পেস্ট বলিয়া গণ্য করা হয় যখন কোন একটি নির্দিষ্ট বসতিতে উহাদের সংখ্যা থ্রেসহোল্ড অফ অ্যাবানডানস নিয়ম (Threshold of abundance) অতিক্রম করে। অনেক কীট-পতঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের কিছু কিছু উপকার করে কিন্তু অধিকাংশই আমাদের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। মশা, মাছি প্রভৃতি পতঙ্গ নানান ধরনের ব্যাধির জীবাণু বহন করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যহানি করে। সেইরূপ অনেক কীট-পতঙ্গ প্রয়োজনীয় লতাপাতা, শাক-সব্জি, ধান, গম, পাট প্রভৃতি উদ্ভিদ ও শস্যাদি খাইয়া আমাদের খাদ্যোৎপাদনের প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যার উন্নতির চেষ্টা অপরিহার্য। উন্নত কৃষিবিদ্যার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন করিতে হইলে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের সনাক্তকরণ, জীবন বৃত্তান্ত ও উহাদের ধ্বংস করার উপায় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে কৃষিনির্ভর দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ শস্য-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদাংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং নানাবিধ ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক সংক্রামিত করিয়া উদ্ভিদ ব্যাধির সৃষ্টি করে। কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ গুদামজাত শস্যকে নষ্ট করে। ধানগাছ ভক্ষণকারী একটি পেস্ট, গুদামজাত খাদ্যশস্যের একটি পেস্ট ও একটি স্তন্যপায়ী পেস্টের সম্বন্ধে বর্তমান অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

I. ধানগাছের পেস্ট (Pests of Paddy)

প্রায় 35-36 প্রকার পেস্ট ধানগাছের ক্ষতি করিলেও ইহাদের মধ্যে চারি প্রকার পেস্ট ফসল উৎপাদন ভীষণ ভাবে ব্যাহত করে। চারি প্রকার পেস্টের নাম—*a.* স্টেম বোরার (Stem borer), *b.* সোয়ারমিং ক্যাটারপিলার (Swarming caterpillar), *c.* রাইস বাগ (Rice bug) এবং *d.* গল্ ফ্লাই (Gall fly)। ট্রাইপোরাইজা ইনসার্টুলাস (*Tryporyza incertulus*) নামক স্টেম বোরার

ধানগাছের চরম ক্ষতি করে। স্পোডোপ্‌টেরা মাউরিসিয়া (*Spodoptera mauritia*) নামক মথের সোয়ারমিং ক্যাটারপিলার, লেপটোকোরাইজা ভেরিকরনিস্‌ (*Leptocorisa varicornis*) এবং লেপটোকোরাইজা অ্যাকিউটা (*Leptocorisa acuta*) প্রভৃতি রাইস বাগ বা গাঁধি পোকা এবং প্যাকিডিপ্লোসিস ওরাইজি (*Pachydiplosis oryzae*) নামক গল্‌ ফ্লাই ধানগাছের ক্ষতি করে।

19.2 ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাসের জীবনচক্র

লেপিডপ্‌টেরা বর্গভুক্ত প্রায় ছয়টি প্রজাতির মথের লার্ভা ধানগাছের দেহে ছিদ্র করে এবং উহার কলা (Tissue) ভক্ষণ করিয়া পুষ্টি গ্রহণ করে, ফলে উদ্ভিদ কলা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধান-উৎপাদনশীল অঞ্চলে ধানগাছের চরম ক্ষতি করে। ট্রাইপোরাইজা কেবল ধান-গাছকেই আক্রমণ করে এবং অন্য কোন উদ্ভিদের কলা ভক্ষণ করে না। সেইজন্য ইহাকে একভোজী বা মনোফ্যাগাস (Monophagous) পেস্ট বলে।



19.1—ট্রাইপোরাইজার জীবন বৃত্তান্ত
(A) পুরুষ, (B) স্ত্রী, (C) গাছের পাতায় ডিম, (D) শূককীট,
(E) মূককীট, (F) কাণ্ড মধ্যে গর্ত।

ট্রাইপোরাইজা একটি মথ এবং ইহার ডানা হলুদ বর্ণের। কেবলমাত্র স্ত্রী-মথের

অগ্রডানায় একটি করিয়া সুস্পষ্ট কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন আছে। পূর্ণাঙ্গ মথ ধানগাছের কোন ক্ষতি করে না।

স্ত্রী-মথ দফায় দফায় ধানগাছের পাতায় ডিম পাড়ে। প্রতি দফায় পাড়া ডিমের সংখ্যা—400—600। ডিমগুলি পাতায় স্তূপে স্তূপে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। ডিমগুলি হালকা হলুদ বর্ণের এবং রোমযুক্ত।

শূককীট—ডিম হইতে 4-6 দিন পরে শূককীট (Larva) নির্গত হয় (চিত্র 19.1)। লার্ভাগুলির গায়ে রোম থাকে। কিছু কিছু শূককীট ধানগাছের পাতা খায় এবং ধানগাছের পাতা হইতে নিজ দেহ নিঃসৃত লালা রসের সুতার সাহায্যে পাতা হইতে ঝুলিতে থাকে। ইহাদের কয়েকটি এই অবস্থায় বায়ু বাহিত হইয়া নিকটবর্তী ধান গাছে পৌঁছায় ও গাছটিকে আক্রান্ত করে। কিছু শূককীট ধানগাছের কাণ্ডের দিকে নামিয়া আসে এবং গাছের কাণ্ডের কোন অংশে একটি ছিদ্র করিয়া উহার কলার মধ্যে প্রবেশ করে। সেইজন্য ইহাকে স্টেম বোরার বা কাণ্ড রন্ধ্রক বলে। ইহার প্রচলিত নাম মাজরা পোকা। কাণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় ইহা লম্বায় প্রায় 2 সেন্টিমিটার হয়। পূর্ণাঙ্গ লার্ভার দেহ ঈষৎ হলুদ বর্ণের এবং মস্তকটি পীতাভ কমলা বর্ণের। পিউপায় (মূককীট) রূপান্তরিত হইবার পূর্বে লার্ভাটি নূতন একটি ছিদ্র তৈয়ারী করে এবং পরে এই ছিদ্রপথে সমঙ্গ মথ বাহির হয়। লার্ভা ছিদ্রটির মধ্যে একটি সিল্ক সদৃশ আবরণী তৈয়ারী করে এবং পিউপায় পরিণত হয়।

মূককীট (Pupa)—শূককীটের মুখনিঃসৃত লালা হইতে সৃষ্ট আবরণী বা গুটির মধ্যে পিউপা আবদ্ধ থাকে। মূককীট অবস্থা প্রায় 10 দিন স্থায়ী হয়। মূককীট হইতে সমঙ্গ বাহির হয়। শূককীট দ্বারা করিয়া রাখা গর্ত দিয়া সমঙ্গ বাহির হইয়া আসে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ইহারা ধানগাছকে আক্রান্ত করে।

ক্ষতির-প্রকৃতি—চারা অবস্থায় আক্রান্ত হইলে সমগ্র ধানগাছটি মরিয়া যায়। ইহার কিছু পরে আক্রান্ত হইলে ধানগাছের অগ্রাংশ সাদা হইয়া যায় এবং উৎপন্ন ধান শস্যবিহীন হয়। বৎসরের মধ্যে ট্রাইপোরাইজার জীবনচক্র একাধিকবার আবর্তিত হয়।

19.3 ধানগাছের অন্যান্য কয়েকটি পেস্ট

(1) সোয়র্মিং ক্যাটারপিলার (*Spodoptera mauritia*)- স্থানীয় নাম লেদা পোকা -স্ত্রী মথ দফায় দফায় বীজতলার ধানগাছের পাতায় বা ধানজমির ঘাসে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পাতায় গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত থাকে। প্রতি গুচ্ছে ডিমের সংখ্যা প্রায় 200। ডিম হইতে 7 দিন পরে শূককীট বাহির হয়। সবুজ বর্ণের শূককীটগুলি দলবদ্ধ হইয়া থাকে এবং গাছের সবুজ পাতা খায়। দিনের বেলায়

ইহারা পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রে ইহারা কর্মঠ হয়। শূককীট দশা 3-4 দিন স্থায়ী হয়।

পূর্ণগঠিত শূককীট মাটিতে নামিয়া আসে এবং মাটিনির্মিত গুটি সৃষ্টি করিয়া মূককীটে পরিণত হয়। 10 হইতে 14 দিন বাদে পিউপা হইতে মথ বাহির হয়। পূর্ণাঙ্গ মথের বর্ণ ধূসর ও প্রতি অগ্রডানায় একটি করিয়া সাদা ছাপ (চিত্র 19.2) থাকে। সচরাচর ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ইহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটে।



19.2 - স্পোডোপটেরা মাউরিশিয়া (*Spodoptera mauritia*) বা লেদাপোকার বহিরাকৃতি।

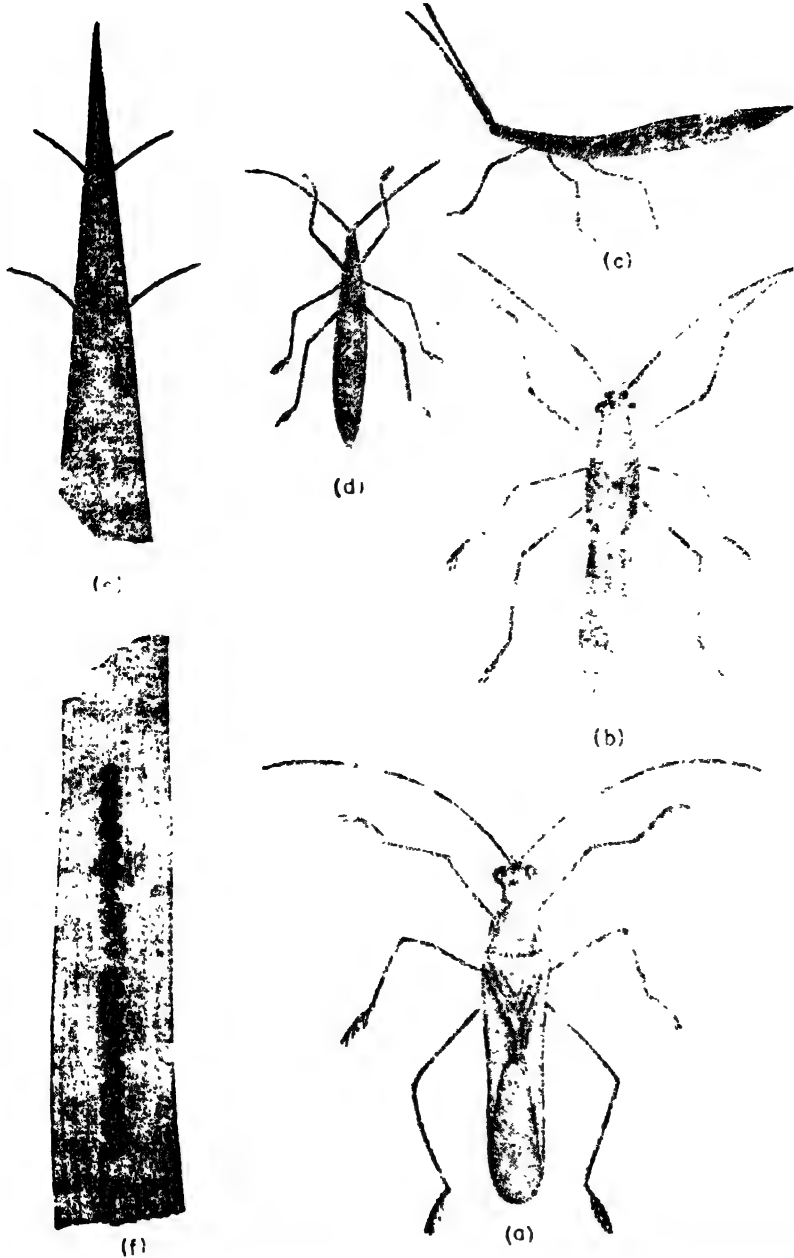
(2) গন্ধী পোকা (Rice bug—*Leptocorixa*)—হেমিপটেরা (*Hemiptera*) বর্গের অন্তর্গত কোরিডি (Coridae) গোত্রের লেপ্টোকোরাইজা ধানগাছের অন্যতম প্রধান পেস্ট। ইহার প্রচলিত নাম গন্ধীপোকা (চিত্র 19.3) কারণ ইহাদের দেহের গন্ধগ্রন্থি (Odoriferous gland) হইতে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ বাহির হয়। লেপ্টোকোরাইজা প্রধানতঃ বুনো ঘাস খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলেও ইহারা ধানগাছের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে ইহাদের উপস্থিতি বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের একটি বা দুইটি প্রজাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা নিম্ফ (Nymph) এবং পরিণত (Adult) উভয় দশায় এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ধানের দুগ্ধোৎপাদক দশায় (Milk stage) ধানের রস শোষণ করে। ফলে ধানের ফলন হ্রাস পায় এবং ধানকে শস্যবিহীন (Chaffy husk) করে।

চাষের জমি সংলগ্ন এবং আলের (Bunds) বুনো ঘাসে ইহাদের প্রজনন ক্রিয়া সাধিত হয়। ধানক্ষেতে যখন ধানের শীষ জন্মায় সেই সময় ইহারা দলে দলে ধান গাছকে আক্রমণ করে।

পূর্ণাঙ্গ গন্ধীপোকার দেহটি লম্বাটে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় 15 mm এবং উপাঙ্গগুলি প্রলম্বিত এবং শীর্ণ। প্রথমাবস্থায় দেহের রঙ সবুজ থাকে পরে উহা বাদামী রঙ ধারণ করে। স্ত্রী গন্ধীপোকা ক্ষুদ্রাকার পুঁতির ন্যায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলির রঙ গাঢ় বাদামী এবং ধানগাছের পাতার ফলকে 10 হইতে 20টি সারিতে পর পর সজ্জিত থাকে। ডিম হইতে প্রায় সাত দিনের মধ্যে নিম্ফ বাহির হয়। নিম্ফগুলি ধানগাছের রস শোষণ করে। ইহারা পাঁচবার খোলস ছাড়ে এবং 15-25 দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গন্ধীপোকায় পরিণত হয়।

জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ইহাদের উপদ্রব থাকে। কার্তিক মাসে ইহাদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

(3) পামরি পোকা (*Dicladispa armegera*)—কোলিওপটেরা (Coleoptera) বর্গের অন্তর্গত ক্রাইসোমেলিডি (Chrysomelidae) গোত্রের পামরি পোকা



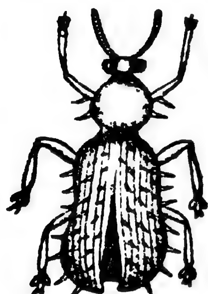
10.3- লেপ্টোকোরাইজা: জীবনবৃত্তান্ত—(a) পূর্ণাঙ্গ দশা (পৃষ্ঠ দৃশ্য), (b–d) নিম্ফ দশা, (e) ধান- হয় পাতা (আংশিক), (f) ধানগাছের পাতার সজ্জিত ডিমসমূহ।

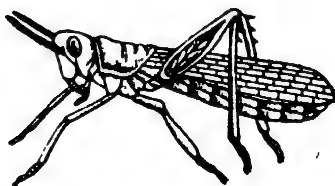
ধানগাছের একটি প্রধান পেস্ট (চিত্র 19.4)। ইহার আরও দুইটি প্রচলিত নাম সাম্কি পোকা ও মোরিচা পোকা। লার্ভা এবং পরিণত উভয় দশায় ইহারা ধানগাছের পাতার ক্ষতি করে। পরিণত পোকাগুলি পাতার ক্লোরোফিল যুক্ত কলা ক্ষতবিক্ষত করে এবং লার্ভাগুলি পাতার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন এপিডার্মিস মধ্যস্থ কলাস্তরগুলি ভক্ষণ করে।

স্ত্রী পামরি পোকা পাতার এপিডার্মিস স্তরের নিচে একটি একটি করিয়া প্রায় 100টি ডিম পাড়ে। ডিম হইতে লার্ভা ও পিউপা দশার মধ্য দিয়া প্রায় 8 দিন পরে পূর্ণাঙ্গ পোকা বাহির হয়।

বোরো ধানের ক্ষেত্রে পৌষ ও মাঘ মাসে এবং আমন ধানের ক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

(4) ধানের ফড়িং (*Hieroglyphus banian*)- অর্থোপটেরা (Orthoptera) বর্গের অ্যাক্রিডিডি (Acrididae) গোত্রের ধানের ফড়িং এয়ারোগ্লাইফাস ধানের একটি প্রধান পেস্ট বলিয়া বিবেচিত (চিত্র 19.4)। পরিণত এবং নিম্ফ উভয় দশায় ইহারা ধানগাছের পাতা খায়। জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ইহারা ধানক্ষেতে থাকে। কার্তিক মাসে ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।





19.4—ডাইক্লাডিসপা আর্মিজেরা (*Dicladispa armigera*) বা পামরি পোকার বহিরাকৃতি (বাম) ও এয়ারোগ্লাইফাসের (*Hieroglyphus banian*) বা ধানের ফড়িংয়ের বহিরাকৃতি (দক্ষিণ)।

19.4 কীটপতঙ্গের কবল হইতে ধানগাছকে রক্ষার উপায়

বিভিন্ন পেস্টের আক্রমণ হইতে ধানগাছকে রক্ষা করিতে হইলে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। অধিকাংশ ধানগাছের পেস্টের পরিযানের ক্ষমতা আছে। সেইজন্য ইহাদের আক্রমণ হইতে ধানগাছকে রক্ষা করিতে হইলে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্যথায় এক ক্ষেত হইতে অন্য ক্ষেতে পেস্টের বিস্তার বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে।

A. একই ধানক্ষেতে বৎসরের পর বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে ধান চাষ করিলে উহা ধানের পেস্টের বংশবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেইজন্য ফসলের **আবর্তন** (Crop rotation) বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত পোষক উদ্ভিদের অনুপস্থিতিতে পেস্টের জীবনচক্র আবর্তিত হইতে পারে না।

B. **আগাছামুক্তকরণ** অধিকাংশ ধান গাছের পেস্ট ক্ষেত সংলগ্ন অনাবাদি জায়গায় এবং আলের বুনো ঘাসে প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বিশেষ সময়ে ইহারা ধান- গাছকে আক্রমণ করে। মুক্ত ধানক্ষেত্রকে আগাছামুক্ত করা প্রয়োজন। ধানচাষের পূর্বে নতুন করিয়া আল তৈয়ারী করা বিশেষ দরকার।

C. **আলোক-ফাঁদ** (Light-traps): আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ধানক্ষেতে আলোক-ফাঁদ স্থাপন করা দরকার। আলোক ফাঁদে আবদ্ধ কীট পতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিয়া নির্দিষ্ট পেস্টের আক্রমণের সংকেত পাওয়া সম্ভব। ফলে উপযুক্ত ব্যবস্থা লওয়া যায়।

D. বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া ধানের জমিকে পেস্টমুক্ত করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যথা—*a* **সিস্টেমিক ইন্সেক্টিসাইড** (Systemic insecticide): এই ধরনের কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদ দেহের মধ্যে প্রয়োগ করিলে উহা বহুদিন সক্রিয় থাকে। কয়েকটি সিস্টেমিক ইন্সেক্টিসাইড: লেড আরসিনেট (Lead arsenate), ক্যালসিয়াম আরসিনেট (Calcium arsenate), ডাইমিক্রণ (Dimecron), নুরন (Nuron), পলিথিয়ন (Polythion) প্রভৃতি। *b*. **কনট্যাক্ট ইন্সেক্টিসাইড** (Contact insecticides): এই ধরনের কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ পেস্টের সংস্পর্শে আসিলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। কনট্যাক্ট ইন্সেক্টিসাইড: সাবান দ্রবণ (Soap solution), ফিস অয়েল (Fish oil), রেসিন অয়েল (Resin oil), নিকোটিন সালফেট (Nicotine sulphate), নিকোটিন দ্রবণ (Nicotine solution), কেরোসিন ইমালসন, (Kerosene emulsion), ক্রুড বা অশোধিত অয়েল ইমালসন (Crude oil emulsion) প্রভৃতি। *c*. **ফিউমিগেণ্ট** (Fumigants); এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ হইতে উদ্ভূত বাষ্প বা ধূম কীট-পতঙ্গের পক্ষে বিষাক্ত। ফিউমিগেণ্ট: মিথাইল ব্রোমাইড (Methyl bromide), ক্যালসিয়াম অ্যাগানাইড (Calcium aganide) প্রভৃতি। *d*. **পয়সন বেট ও ট্রাপ** (Poison baits and traps): কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রলোভন বা ফাঁদ তৈয়ারী করিয়া উহাতে বিষাক্ত কীটনাশক রাসায়নিক রাখিলে বিভিন্ন পেস্ট প্রলুব্ধ হইয়া মারা যাইবে। পয়সন বেট ও ট্রাপে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থে—জিঙ্ক ফসফাইড (Zinc phosphide)। বিভিন্ন ও বিষাক্ত পেস্টিসাইড (Pesticides) দ্বারা ধানগাছের পেস্টগুলিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া ধান উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যায়। আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় পেস্ট নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। আক্রান্ত ধানক্ষেতের সন্নিকটে আলোক-ফাঁদের (Light trap) ব্যবস্থা করিতে

হয়। ধানের পেস্টগুলির সমঙ্গ আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং মারা যায়। ইহা ব্যতীত ক্ষেত-খামারে পেস্টের আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুপোডোপ্টেরা, গল ফ্লাই, গন্ধি পোকা, হিস্পা প্রভৃতি ধানগাছের পেস্টের প্রজনন ধানক্ষেতের বুনো ঘাসে সম্পন্ন হয়। সেইজন্য চাষীদের প্রত্যেকের কর্তব্য ধানক্ষেতে বুনো ঘাস আদৌ জন্মাইতে না দেওয়া।

E. **বায়োলজিকাল নিয়ন্ত্রণ** (Biological control) : কোন ক্ষতিকারক প্রাণীর উপযুক্ত শত্রুর (যথা—খাদক, পরজীবি, ভাইরাস সন্ধান পাইলে উহাদের প্রয়োগে ক্ষতিকারক প্রাণীর নিধন অথবা প্রাণীটির পুরুষদের কৃত্রিম উপায়ে নির্বীজ (Sterilized) করিয়া ক্ষতিকারক প্রাণীদের প্রজননের হার কমানোর পদ্ধতিকে বায়োলজিকাল নিয়ন্ত্রণ বলে। বর্তমানে ধানের চাষে পেস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদ্ধতি লইয়া অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। আশা করা যায় অচিরেই সুফল পাওয়া যাইবে।

II. গুদামজাত খাদ্যশস্যের পেস্ট বা স্টোরেজ পেস্ট (Storage Pests)

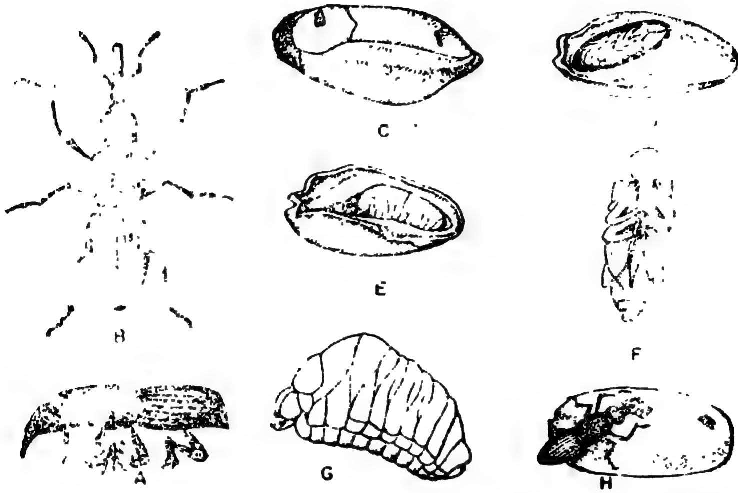
প্রায় কয়েক শত প্রজাতির কীট-পতঙ্গ গুদামজাত খাদ্যশস্যের (ধান, গম, যব ভুট্টা, ডাল প্রভৃতির) প্রভূত ক্ষতি করে। ইহাদের মধ্যে প্রধান পেস্টগুলি—i. **রাইস উইভিল** (*Rice weevil*) বা **সিটোফাইলাস অরাইজি** (*Sitophilus oryzae*), ii. **রাইজোপারথা ডমিনিকা** *Rhizopertha dominica*); iii. **খাপ্রা বিটল্** (Khapra beetle) বা **ট্রোগে ডারমা গ্রেনেরিয়াম** (*Trogoderma granarium*); iv. **সিটোট্রোগা গ্রেণ মথ** (Sitotroga grain moth) বা **সিটোট্রোগা সিরিয়ালিলা** (*Sitotroga cerealella*) v. **পালস্ বিটল্** (Pulse beetle) বা **ক্যালোসোব্রুকাণ ম্যাকুলেটাস** (*Callosobruchus maculatus*)। ইহারা খাদ্যদানার মধ্যে ডিম প্রসব করে এবং উৎপন্ন লার্ভা সমগ্র খাদ্যদানাকে ভক্ষণ করে। সেইজন্য গুদামজাত খাদ্যশস্যকে পেস্টের কবল হইতে মুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। গুদামজাত খাদ্যশস্য নষ্ট হইলে ইহা আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

19·5 সিটোফাইলাস

সারা পৃথিবীতে গুদামজাত খাদ্যশস্য বিশেষ করিয়া ধান বা চাল ও গম সিটোফাইলাস গণের অন্তর্ভুক্ত অরাইজি প্রজাতির পেস্টের আক্রমণে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্যশস্য বিনষ্ট করিতে ইহারা অদ্বিতীয়।

সমঙ্গ সিটোফাইলাসের দেহের বর্ণ লালচে বা বাদামী এবং ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় 3 মিলিমিটার। ইহার মস্তকের অগ্রভাগ প্রলম্বিত হইয়া ছুঁচালো হইয়াছে এবং ইহার একজোড়া শক্ত চোয়াল আছে। সমঙ্গ সিটোফাইলাস চঞ্চল প্রকৃতির, অর্থাৎ ইহারা

সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। সমঙ্গ সিটোফাইলাস 4-5 মাস বাঁচে। স্ত্রী সিটোফাইলাস খাদ্যশস্যের গায়ে একটি ক্ষুদ্র গর্ত তৈয়ারী করিয়া উহার মধ্যে একটি ডিম প্রসব করে (চিত্র 19.5)। ডিমটি গর্তের মধ্যে প্রোথিত হয় এবং আঠাল পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ডিম হইতে উদ্ভূত লার্ভা শস্যদানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ত্বক্ ছাড়া শস্যদানার সব কিছুই ভক্ষণ করে। লার্ভা পিউপায় রূপান্তরিত হয় এবং পিউপা হইতে সমঙ্গ শস্যদানা ভেদ করিয়া বাহিরে আসে।



19.5 সিটোফাইলাসের জীবন বৃত্তান্ত—পূর্ণাঙ্গ (A, B), ছিদ্রযুক্ত গম (C), গমের অভ্যন্তরে মূককীটের অন্তকীয় দশা (F), শূককীট (G), পূর্ণাঙ্গ কর্তৃক গমে ছিদ্র সৃষ্টি (H)।

প্রতিটি স্ত্রী সিটোফাইলাস প্রায় 300-400 ডিম প্রসব করে এবং ইহার জীবন চক্র সম্পূর্ণ হইতে প্রায় একমাস লাগে। সুতরাং খাদ্যশস্য গুদামজাত থাকাকালীন অবস্থায় সিটোফাইলাসের কয়েক জনু (*Generation*) অতিবাহিত হইতে পারে।

19.6 নিয়ন্ত্রণের উপায়

খাদ্যশস্যের মধ্যে জলীয় ভাগ [illegible]-এর কম হইলে সিটোফাইলাস শস্যদানার মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং গুদামজাত করিবার পূর্বে খাদ্যশস্যকে পরিমিতভাবে শুষ্ক করিয়া গুদামের মধ্যে সঞ্চিত করিলে সিটোফাইলাসের কবল হইতে খাদ্যশস্যকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। ইহা ছাড়া ফিউমিগেশন পদ্ধতি দ্বারা সিটোফাইলাস ধ্বংস করা যায়। বিভিন্ন পেস্ট হইতে গুদামজাত খাদ্যশস্যকে সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, যথা—i. শস্যদানার জলীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ, ii. গুদামের মধ্যে বাতাস চলাচল এবং iii. গুদামের মধ্যে উষ্ণতার নিয়ন্ত্রণ করা। যদি গুদামজাত খাদ্যশস্যে জলীয় অংশ 9% অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে পেস্টের আক্রমণ হইতে খাদ্যশস্যকে রক্ষা করা সম্ভব।

III. স্তন্যপায়ী পেস্ট-ব্যাণ্ডিকুটা বেঙ্গলেনসিস (*Bandicoota bengalensis*)

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর রোডেনশিয়া (Rodentia) বর্গের মুরিডি (Muridae) গোত্রের অন্তর্গত অনেক প্রজাতি পেস্টরূপে গণ্য। ইহারা প্রধানতঃ দুই ভাবে মানুষের ক্ষতি করে। প্রথমত, ইহারা মাঠের ফসল, চাষ জমির বাঁধ ও সঞ্চিত খাদ্যের ক্ষতি করে : দ্বিতীয়ত, ইহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মানুষের মধ্যে নানা প্রকার রোগ সংক্রামিত করে। অর্থকরী প্রাণিবিদ্যায় এই গোত্র বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সামগ্রিকভাবে মুরিডি গোত্র-ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতি প্রতি বৎসরে প্রায় 45 মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য নষ্ট করে। মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ইহা প্রায় 33 শতাংশ। ইহা ছাড়াও এই প্রজাতির প্রাণীরা 45টি বিভিন্ন রোগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ। ব্যান্ডিকুটা বেঙ্গলেনসিস নামক প্রজাতি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

19.7 বহিরাকৃতি

বাংলায় ব্যান্ডিকুটা ইঁদুরকে ধেড়ে ইঁদুর বা মেঠো ইঁদুর বলা হয়। ইংরাজীতে ইহা লেসার ব্যান্ডিকুট (Lesser bandicoot) নামেও পরিচিত। একটি পরিণত মেঠো ইঁদুর 15 হইতে 25 সেন্টিমিটার লম্বা। ইহাদের লেজের দৈর্ঘ্য 15 হইতে 18 সেন্টিমিটার। ইহাদের পৃষ্ঠতলের বর্ণ ধূসর বাদামী ও অঙ্কতলের বর্ণ সাদা। লেজ ব্যতীত ইহাদের সমগ্র দেহ স্থূল ও কর্কশ লোম দ্বারা আবৃত। উত্তেজিত হইলে ইহাদের লোমগুলি খাড়া হইয়া যায়।

ইহাদের মাথা গোলাকার কিন্তু তুণ্ডটি ঈষৎ প্রলম্বিত (চিত্র 19.6)। চোখ দুইটি ছোট, গোলাকার এবং উজ্জ্বল। বহিঃকর্ণ অর্ধ চন্দ্রাকার। অগ্র ও পশ্চাদ পদ সুগঠিত নখর যুক্ত পদগুলি খনন কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অঙ্কীয়দেশে 6 হইতে 8 জোড়া স্তনগ্রন্থি দুই সারিতে সজ্জিত থাকে। পূর্ণগঠিত মেঠো ইঁদুরের গড় ওজন প্রায় 200 গ্রাম। ইহাদের জীবনকাল 6 মাস।



19.6 ব্যান্ডিকুটা (*Bandicoota*) বহিরাকৃতি।

19.8 মেঠো ইঁদুরের পরিবেশ (Ecology)

মেঠো ইঁদুর অর্থে যাহারা মাঠে অর্থাৎ গ্রামীণ পরিবেশের ধান বা তৃণ ভূমিতে বাস করে। কিন্তু বিগত সত্তর বৎসরে মেঠো ইঁদুরের বিস্তার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে গ্রাম হইতে ক্রমশঃ শহরের (Urban) দিকে ইহাদের

বিস্তার ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ইহারা বর্তমানে রোডেন-সিয়া বর্গের প্রধান প্রতিভূ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ইহাদের বিস্তারের ঘনত্ব 98%। সেই তুলনায় র‍্যাটাস র‍্যাটাস (*Rattus rattus*) প্রজাতির ঘনত্ব প্রায় একশতাংশ অপেক্ষা কম এবং র‍্যাটাস নরভেজিকাস (*Rattus norvegicus*) প্রজাতির ঘনত্ব প্রায় দুই শতাংশ। ইহার অর্থ অন্যান্য গ্রাম প্রজাতির তুলনায় মেঠো ইঁদুরের প্রজাতির সভ্যসংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবন সংগ্রামে ইহাদের সাফল্যের কারণগুলি নিম্নরূপ—

(a) জটিল গঠনের বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত গর্ত খনন করিবার ক্ষমতা ;
(b) গর্তের মধ্যে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য খাদ্য সঞ্চয় অভ্যাস ;
(c) উগ্র ও মারমুখী স্বভাব ;
(d) বর্ধিত প্রজনন হার।

মেঠো ইঁদুর গর্তবাসী ও নিশাচর। শহরে সাধারণত ইহারা গুদাম ঘর বা গুদাম বা নিকটবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সূর্যাস্তের পরই ইহারা কর্মচঞ্চল হয়। ইহারা গর্ত খননে অত্যন্ত পারদর্শী। মাটির 1-1·5 মিটার নিচে প্রতি ইঁদুর একটি করিয়া প্রধান কক্ষ নির্মাণ করে। প্রতি প্রধান কক্ষ অনেকগুলি সুড়ঙ্গ পথ দ্বারা যুক্ত। সুড়ঙ্গগুলি 9 হইতে 12 মিটার লম্বা। প্রতিটি সুড়ঙ্গ একাধিক শাখা-সুড়ঙ্গ দ্বারা যুক্ত থাকে। সুড়ঙ্গ পথের বহির্মুখ গুড়া এবং সহজে সরানো যায় এইরূপ মাটি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সুড়ঙ্গে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। একটি প্রধান সুড়ঙ্গে 3-4 কেজি শস্য দানা থাকে। গুদাম ঘরে ইহাদের বিস্তারের ঘনত্ব নানা দেশে নানা রূপ। পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় কলিকাতাস্থ গুদাম ঘরে পুরুষ মেঠো ইঁদুর বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়। একটি সাধারণ ঘতনবিশিষ্ট কলিকাতাস্থ গুদাম ঘরে প্রায় 191টি ইঁদুর বাস করে। ইহার অর্থ গুদামঘরের জমির প্রতি বর্গমিটারে 0·78টি ইঁদুর থাকে। আমেরিকায় একটি সাধারণ মাপের গুদাম ঘরে 50টি ইঁদুর থাকিলে উহাকে ইঁদুরের সংখ্যাধিক্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

গুদাম ঘরে সঞ্চিত খাদ্যশস্যের মধ্যে মেঠো ইঁদুর গম ও ধান বেশী পছন্দ করে। মটর জাতীয় বীজের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ কম। প্রতি ইঁদুর প্রতিদিনে প্রায় 11·5 গ্রাম শস্যকণা খায় এবং 30 গ্রাম শস্যকণা নষ্ট করে।

মেঠো ইঁদুরের প্রজনন হার যেমন বেশী সেই রকম পরিণত ইঁদুরের মৃত্যু হারও বেশী। অর্থাৎ ইহাদের সংখ্যার তারতম্য মোটামুটি নির্দিষ্ট। কিন্তু জন্মহার ও মৃত্যুহার সমানুপাতিক হওয়ায় নবীন কর্তৃক প্রাচীনদের অপসারণের হার খুব দ্রুত। খাদক প্রাণীর অনুপস্থিতি, গুদামঘরের মধ্যে সর্বদাই সহনযোগ্য উষ্ণতা থাকা, খাদ্যের অফুরন্ত সরবরাহ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল এইগুলিকে বংশহার বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু মৃত্যু-হার বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ কি তাহা জানা যায় নাই। বয়স্ক মেঠো ইঁদুরের গায়ে বেশী সংখ্যক আঘাতজনিত ক্ষত ও সংরোহিত

দাগ দেখা যায়। ইহার সহিত উহাদের উগ্র ও মারমুখী স্বভাব একত্রিত করিয়া মনে করা হয় যে মেঠো ইঁদুরের মধ্যে অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম অত্যন্ত বেশী। দ্রুত প্রজনন হার থাকায় প্রজাতি সভ্য সংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ঘনত্ব যত বেশী হয় সংগ্রামও তত তীব্র হয়। পরস্পর সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট স্পষ্ট আঘাতগুলি সভ্যদের মৃত্যুর কারণ। আবার অনেকে মনে করেন সভ্য সংখ্যার ঘনত্বের বৃদ্ধির জন্য যে প্রেষ (Stress) সৃষ্টি হয় উহা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতন্ত্র বিশেষতঃ অ্যাড্রিনাল ও পিটুইটরী গ্রন্থিদ্বয়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অতিক্ষরণ ও যৌন গ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তায় ফলে মৃত্যুর হার বাড়িয়া যায়। তৃতীয় একটি মতে বলা হইয়াছে সভ্য সংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইলে অপরিণত মেঠো ইঁদুরের মৃত্যু হার বাড়িয়া যায়। উপরি-উক্ত কোন একটিকে জন্ম বা মৃত্যু হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ মনে না করিয়া যদি মনে করা যায় উহারা সকলে সক্রিয় থাকার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর হার সমানুপাতিক রহিয়াছে তাহা হইলে একটি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

জন্মের প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরেই মেঠো ইঁদুর প্রজননক্ষম হইয়া উঠে। পুরুষ মেঠো ইঁদুর 58 দিনে এবং স্ত্রী মেঠো ইঁদুর 90-100 দিনে প্রজনন উপযোগী হয়। ইহার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহারা বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাদের প্রজনন কালের কোন ঋতুভেদ নাই। বয়স্বী মেঠো ইঁদুর নবীনাদের তুলনায় এক-সঙ্গে একবারে বেশী সংখ্যক শাবকের জন্ম দেয়।

19.8 আচরণ (Behaviour)

অন্যান্য প্রজাতির ইঁদুরের ন্যায় ইঁদুর-ধরা ফাঁদকে মেঠো ইঁদুর ভয় পায় না। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে একই ইঁদুর বার বার ইঁদুর ধরা ফাঁদে ধরা পড়িয়াছে। মেঠো ইঁদুরের বিচরণ ভূমি অত্যন্ত সীমিত। সুড়ঙ্গ হইতে খাদ্যস্থল পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। বাসস্থল হইতে খাদ্যস্থান পর্যন্ত মাত্র 30 মিটারের মধ্যে ইহারা চলাচল করে। উন্মুক্ত স্থান বা রাস্তা পারাপার করিয়া এক গুদামঘর হইতে অন্য গুদাম ঘরে কদাচিৎ উহারা যায়।

মেঠো ইঁদুর সারারাত্রি কর্ম চঞ্চল থাকে তবে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে কর্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দিনের বেলা মেঠো ইঁদুর দেখা দিলে মনে করা হয় উহাদের সভ্যসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারা বাসী খাবার অপেক্ষা টাটকা খাবার বেশী পছন্দ করে এবং খাবারের ব্যাপারে ইহারা বিশেষ সন্দেহ-প্রবণ। সাধারণতঃ একই প্রকার খাবার ইহারা গ্রহণ করে। অন্য কোন প্রকার খাদ্য দিলে ইহারা প্রথমে উহা হইতে স্বল্প অংশ খায় এবং পছন্দমত হইলে তবেই ঐ খাবারের সবটুকু খায়—নচেৎ উহা বর্জন করে। মেঠো ইঁদুর সন্তরণে পটু। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ইহারা মাঠ হইতে কুড়ে ঘর বা গুদাম ঘরে চলিয়া আসে এবং আবার শীতকালে মাঠে ফিরিয়া যায়। ইহারা এককভাবে পরিষান করে।

19.9 মানুষের ইঁদুরজনিত ও ইঁদুরবাহিত রোগসমূহ—

ইঁদুর নিজ খাদ্য গ্রহণের সময় মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ও দেহ হইতে খসিয়া পড়া লোমদ্বারা খাদ্যবস্তুর উৎসটিকে সংক্রামিত করে। ইহা ছাড়াও মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী অনেক জীবাণু ইঁদুরের দেহে থাকে। এই ধরনের কয়েকটি রোগ নিম্নে উল্লিখিত হইল—

(*a*) **ইঁদুরের কামড়জনিত জ্বর** (Rat bite fever)—কোন ইঁদুর মানুষকে কামড়াইলে ইঁদুরের দাঁত ও মাড়িতে থাকা জীবাণু মানুষের রক্তে অনুপ্রবেশ করে। ফলে আক্রান্ত মানুষের জ্বর হয়।

(*b*) **লেপ্টোস্পাইরোসিস** (Leptospirosis)—ইঁদুরের মূত্রদ্বারা সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণ করিলে লেপ্টোস্পাইরোসিস নামক রোগ হয়।

(*c*) **স্যালমোনেলোসিস** (Salmonelosis)—ইঁদুরের মল দ্বারা সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণ করিলে স্যালমোনেলোসিস নামক রোগ হয়। এই রোগে খাদ্যে বিষক্রিয়ার (Food poisoning) ন্যায় উপসর্গ দেখা যায়।

(*d*) **মুরাইন টাইফয়েড** (Murine typhus fever)—ইঁদুরের গায়ে বহিঃপরজীবি হিসাবে বসবাসকারী র‍্যাট ফ্লি (Rat flea) নামক সন্ধিপদী দ্বারা মানুষ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়।

(*e*) **প্লেগ** (Plague)—র‍্যাট ফ্লি দ্বারা এই মারাত্মক রোগ সংক্রামিত হয়।

(*f*) **ক্যাপিলেরিয়া হেপাটিকা** (*Capillaria hepatica*)—ইহা ইঁদুরের একটি নিজস্ব রোগ। কখনো কখনো ইঁদুর কর্তৃক ইহা মানব শিশুতে সংবাহিত হয়।

19.10 নিয়ন্ত্রণ (Control)

মেঠো ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে প্রথমে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হয়—

(*a*) উহাদের বাসস্থান।

(*b*) উহাদের চলাচল পথ ও চলাচল সংক্রান্ত আচরণ।

(*c*) উহাদের খাদ্যগ্রহণের সময় ও খাদ্যাভ্যাস।

(*d*) অজ্ঞাত বস্তুর সংস্পর্শে উহাদের প্রতিক্রিয়া।

ঐগুলি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়ার পর উহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়—

(*a*) **সুড়ঙ্গপথ খোঁড়া বা সুড়ঙ্গপথ জলপূর্ণ করা**—মেঠো ইঁদুরের আবাসস্থল সুড়ঙ্গগুলি খুঁড়িয়া উহাদের প্রত্যক্ষভাবে সংহার করা যায়। আবার সুড়ঙ্গপথ জলপূর্ণ করিলে উহারা বাহিরে আসে এবং তখন উহাদের মারিয়া ফেলা হয়। সুড়ঙ্গপথ জলপূর্ণ করিবার সময় ব্লিচিং পাউডার বা কেরোসিন তেল প্রয়োগ করিলে উহারা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসার চেষ্টা করে।

(b) **ফাঁদ ব্যবহার**—ইঁদুর ধরিবার জন্য নানা প্রকার ইঁদুরকল বা ফাঁদ (Trap) বাজারে বিক্রয় হয়। মেঠো ইঁদুর ধরিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত তারের খাঁচা (12″ × 6½″ × 4½″) ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। মেঠো ইঁদুর ফাঁদকে ভয় না পাওয়ায় ফাঁদের ব্যবহার কার্যকরী হয়।

(c) **ইঁদুর মারা বিষের (Rodenticide) ব্যবহার**—নানা প্রকার রাসায়নিক ইঁদুর মারা বিষের কাজ করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইঁদুর মারা বিষ হইল—1080, স্টিকনিন (Stychnine), জিঙ্ক ফসফেট (Zine phosphate)। এই রাসায়নিকগুলি মাত্র এক মাত্রায় (Single dose) কার্যকরী হয় সেইজন্য ইহাদের এক মাত্রার ইঁদুর মারা বিষ (Single dose Rodenticide) বলে। খাদ্যবস্তুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহাদের ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজ করে। স্টিকনিন স্নায়ুতন্ত্রের উপর কার্যকরী। নারফেরিন (Narfarin), ডাইফেসিনোন (Diphecinone), পাইভ্যাল (Pival), ফিউমেরিণ (Fumerin), র‍্যাজল (Razol) প্রভৃতি রাসায়নিক রক্তঞ্চনে বাধা সৃষ্টি করে। এইগুলি খাবারের সহিত মেঠো ইঁদুরের রক্তে প্রবেশ করিবার পর ইঁদুরের দেহে কোন ক্ষত সৃষ্টি হইলে ইঁদুরের রক্ত তঞ্চিত হইতে পারে না। ফলে ইঁদুর মরিয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে খাদ্য বা জলের সহিত মিশ্রিত এই রাসায়নিকগুলি ইঁদুর গ্রহণ করে না। সেইজন্য রাসায়নিকগুলি ইঁদুরের চলাচল পথে বার বার প্রয়োগ করা হয়। ইঁদুরের গায়ের ক্ষত অথবা খাবায় লাগিয়া রাসায়নিকগুলি ইঁদুরের রক্তে যায় এবং কার্যকরী হয়।

(d) **সুড়ঙ্গ পথ ফিউমিগেসন** (Fumigation)—ইঁদুর নিধনের জন্য মিথাইল ব্রোমাইড (Methyl bromide), ক্যালসিয়াম অ্যাগামাইড (Calcium agamide) ইত্যাদি বাষ্পাকারে সুড়ঙ্গ পথে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(e) **নিরোধমূলক ব্যবস্থা** (Use of Protectors)—মেঠো ইঁদুর সচরাচর মানব গৃহের বাহিরে বাস করে। মানব গৃহে ইহারা খোলা দরজা, জানালা বা নর্দমা পথে প্রবেশ করে। সূক্ষ্ম-তারের জাল ব্যবহার করিলে ইঁদুরের গৃহে প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যায়। ঘরদোর যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখিয়া, ঘর অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহার্য আসবাবপত্র হইতে মুক্ত রাখিয়া এবং ঘরের প্রাচীরে কোনরূপ গর্ত না থাকিলে বাহির হইতে ইঁদুর ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। গৃহস্থ কর্তৃক অভুক্ত খাবার যত্র-তত্র ফেলিয়া রাখিলে উহা দ্বারা ইঁদুরকে নিমন্ত্রণ করা হয়। অভুক্ত খাবার, তরকারীর খোসা ইত্যাদি ঘরের বাহিরে আবর্জনা ফেলিবার পাত্রে ফেলিলে ঘরে ইঁদুর আসা বন্ধ হইতে পারে।

অনুচ্ছেদ 20

পোলট্রি (Poultry)

20.1 পোলট্রি কাহাকে বলে

পাখিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রজাতিকে আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে সমগ্র পৃথিবী খাদ্য সংকটের সম্মুখীন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত পাখিদের প্রতিপালনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পাখিদের মধ্যে আমরা সাধারণত মোরগ ও মুরগী, হাঁস, টার্কি, জাপানী কোয়েল প্রভৃতি পাখিদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করি। **পোলট্রি** (Poultry) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত উক্ত **অর্থকরী পাখিদের পোলট্রি** বলে। বহুযুগ পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি গৃহে পোলট্রি প্রতিপালন করার রীতি ছিল। কিন্তু গত কুড়ি বছরে পোলট্রি প্রতিপালন নতুনরূপ ধারণ করিয়াছে এবং **পোলট্রি শিল্পে** (Poultry Industry) পরিণত হইয়াছে। ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পোলট্রি শিল্পের প্রধান লক্ষ্য এবং গত দশ বছরে ডিমের উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পোলট্রি শিল্পে মোরগ ও মুরগীর স্থান সর্বাগ্রে। মোরগ ও মুরগী প্রতিপালন অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে অধিক লাভজনক। মুরগীর ডিম এবং মোরগ ও মুরগীর মাংস প্রোটিন খাদ্যরূপে আমরা গ্রহণ করি।

ব্যবসায়িক গুরুত্ব ছাড়াও পোলট্রি শিল্পের অন্যদিক আছে। ইহা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ আনিয়া দেয়। পোলট্রি শিল্পে মোরগ অপেক্ষা মুরগীর গুরুত্ব খুব বেশী। ভারতবর্ষে হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন গ্রামীণ কুটীর শিল্পরূপে গড়িয়া উঠে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 1979 সালে ভারতবর্ষে প্রায় 12,540 লক্ষ ডিম উৎপন্ন হইয়াছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোলট্রি শিল্পের দ্রুত প্রসার ফলিত প্রাণিবিদ্যার অগ্রগতির ফলশ্রুতি। এই শিল্পকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মোদ্যগ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিশেষ বিজ্ঞান- সম্মত জ্ঞানের প্রয়োজন।

20.2 সাধারণ তথ্য

পোলট্রি শিল্পকে ক্রমবর্ধমান ও লাভজনক সংস্থায় পরিণত করিতে হইলে নিম্ন-নির্দেশিত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন :—

I. ম্যানেজমেন্ট (Management)
II. ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ (Disease Control)
III. বিপণন (Marketing)

I. ম্যানেজ্‌মেণ্ট

পোলট্রি ম্যানেজ্‌মেণ্ট শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ব্রীড নির্বাচন এবং প্রজনন পদ্ধতি, বাসস্থান এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পুষ্টি, আলোক ব্যবস্থা প্রভৃতি ম্যানেজ্‌মেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

II. ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

পোলট্রিকে দূষণমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষেধক টীকা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

III. বিপণন

পোলট্রিতে উৎপন্ন ডিম ও মাংসকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা এবং উহাদের যথাযথ সরবরাহ, পোলট্রি সার এবং বিভিন্ন উপজাত বস্তু বিপণনের অন্তর্ভুক্ত।

I. ম্যানেজ্‌মেণ্ট

20.3 মুরগীর ও উহাদের বিভিন্ন প্রজাতি

মুরগী বিশেষ পরিচিত পোলট্রি পাখি। মুরগীর মাংস ও ডিম খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। মুরগীর বিজ্ঞানসম্মত নাম গ্যালাস ডোমেস্‌টিকাস (*Gallus domesticus*)। বর্তমানে গৃহপালিত বেশ কয়েক প্রকার মুরগী পরিলক্ষিত হয়। ইহারা মুখ্যত চারিটি বন্য প্রজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহারা গ্যালাস (Gallus) গণের অন্তর্ভুক্ত। বন্য প্রজাতি চারিটি—

(i) গ্যালাস গ্যালাস (*Gallus gallus*) বা গ্যালাস বাংকিভা (*G. bankiva*) জংলী লাল মুরগী।

(ii) গ্যালাস সোনের্যাটি (*G. sanneratti*)—জংলী ধূসর মুরগী।

(iii) গ্যালাস ভেরিয়াস (*G. varius*)—জাভার জংলী মুরগী।

(iv) গ্যালাস লাফায়েটি (*G. lafayetti*)—শ্রীলংকার জংলী মুরগী।

বর্তমানের সকল মুরগী উপরি উক্ত চারিটি বন্য প্রজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়া পরিবেশ তারতম্যে আকৃতিগত বৈচিত্র্য অর্জন করিয়াছে (চিত্র 20.1)। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মুরগীগুলিকে এক একটি পৃথক ব্রীড (Breed) রূপে গণ্য করা হয়। মুরগীর আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ, শ্রীলংকা সুমাত্রা ও জাভা অঞ্চল। কালক্রমে ইহারা ইউরোপ ও অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছে।

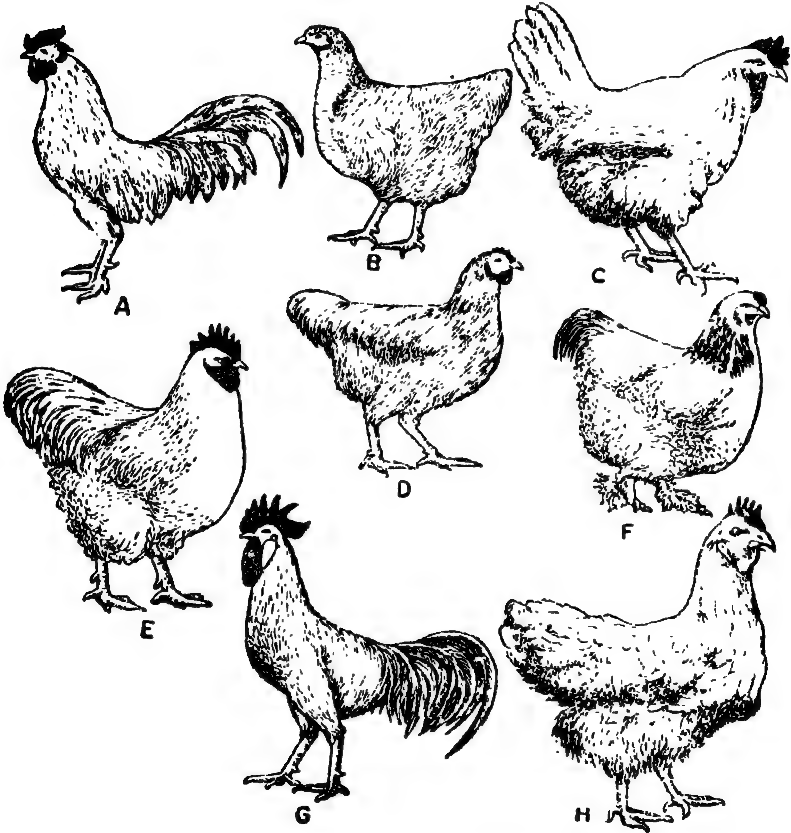
মুরগী আভিস্‌ (Class Aves) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং পক্ষিকুলের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইহাদের আছে। গৃহপালিত হওয়ার ফলে ইহাদের উড্ডয়ন ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু উড্ডয়ন অঙ্গ, যথা—ডানা (Wings), ডানাসংলগ্ন পালক (Wing feathers) এবং উড্ডয়ণ পেশী (Flight muscles) আছে। মুরগীর স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—

(a) মস্তকে চিরুণীর ন্যায় চূড়া বা ঝুঁটি থাকে।

(b) মস্তকের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া মোট দুইটি ওয়াটল (Wattles) আছে।

(c) কর্ণকুহর আলগা এবং কানের লতি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

মুরগী সর্বভুক। খাদ্যবস্তু খুঁটিয়া খাওয়ার জন্য ইহাদের চঞ্চু বিশেষভাবে অভিযোজিত। অন্যান্য পাখিদের ন্যায় ইহাদের অন্ননালী হইতে উৎপন্ন থলির ন্যায়



20.1 গৃহপালিত মুরগীর বৈচিত্র্য— (A) গণপাস বাংকিভা (পুরুষ), (B) প্লাইমাউথ রক (স্ত্রী), (C) হোয়াইট লেগহর্ণ (স্ত্রী), (D) রোড আইল্যান্ড রেড (স্ত্রী), (E) হোয়াইট অরফিংটন (পুরুষ), (F) লাইট ব্রহ্মা (স্ত্রী), (G) ব্ল্যাক মিনোর্কা (পুরুষ), (H) রোড আইল্যান্ড সাদা (স্ত্রী)।

ক্রপ (Crop) থাকায় গৃহীত খাদ্যবস্তু ক্রপের মধ্যে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। খাদ্যবস্তুর সঙ্গে গৃহীত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পাথর খণ্ড পাকস্থলীর গিজার্ড

(Gizzard) অংশে থাকে এবং ইহাদের দ্বারা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

মুরগী একলিঙ্গ প্রাণী এবং ইহাদের যৌন দ্বিরূপতা (Sexual dimorphism) সুস্পষ্ট। ইহাদের লিঙ্গ ক্রোমোসোমের সংগঠন বৈশিষ্ট্যময়। পুরুষ অর্থাৎ মোরগের (Cock) ক্ষেত্রে লিঙ্গ-ক্রোমোসোম XX এবং স্ত্রী বা মুরগীর (Hen) লিঙ্গ ক্রোমোসোম XO। ভেন্ট-সেক্সিং (Vent-Sexing) বা ফেদার-সেক্সিং (Feather-Sexing) পদ্ধতি দ্বারা একদিন বয়সী মুরগীর লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভবপর। 5-6 মাস বয়সে মুরগী ডিম প্রসব করিতে আরম্ভ করে। পুষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে অনিষিক্ত ও নিষিক্ত ডিমের খাদ্যমান সমান। পোলট্রি হইতে প্রাপ্ত ডিমসমূহ প্রধানতঃ অনিষিক্ত ধরনের হয়। কারণ পোলট্রিতে ডিম উৎপাদনের জন্য মুখ্যতঃ মুরগী প্রতিপালন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে শাবক উৎপাদনের জন্য মুরগী ও মোরগ একত্রে রাখা হয় এবং ইহাদের মিলনের ফলে উৎপন্ন নিষিক্ত ডিম হইতে শাবক জন্মায়। ডিম প্রসবের পর ভ্রূণের পরিস্ফুরণের জন্য 37° সেলসিয়াস উষ্ণতা প্রয়োজন। স্বাভাবিক অবস্থায় মুরগী ডিমের উপর 'তা' দেয় এবং উক্ত প্রক্রিয়াকে ইনকিউবেশন (Incubation) বলে। বর্তমানে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে 'তা' দেওয়া সম্ভব হয়। এই যন্ত্রটিকে ইনকিউবেটর (Incubator) বলে। ইনকিউবেটরের অভ্যন্তরে 37° সেলসিয়াস উষ্ণতা রাখা হয়। 21 দিন ইনকিউবেশনের পর ভ্রূণ শাবক বা চিক (Chick)-এ পরিণত হয়। মুরগী শাবক 21 দিন পরে চঞ্চুর সাহায্যে ডিমের খোলক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে। ডিমের খোলক ভাঙ্গিয়া মুরগী শাবকের বাহির হওয়ার পদ্ধতিকে হ্যাচিং (Hatching) বলে। হ্যাচিং-এর 36 ঘণ্টা পর পর্যন্ত মুরগী শাবকের খাদ্য ও জলের প্রয়োজন হয় না।

ডিম হইতে বাহির হওয়ার পরের আট সপ্তাহ পর্যন্ত মুরগী শাবককে চিক্ (Chick) বলে। আট সপ্তাহ হইতে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মুরগীকে গ্রোয়ার (Grower) এবং ছয় মাস হইতে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলকে পুলেট (Pullet) বলে। এক ও দেড় বৎসর বয়স্বী মুরগীকে হেন্ (Hen) বলে। ছয় মাস হইতে এক বৎসর বয়সের মোরগকে ককরেল (Cockerel) এবং পরে ইহাদের কক্ (Cock) বলে। ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষ গ্রোয়ারকে ব্রয়লার (Broiler) আখ্যা দেওয়া হয়। বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রভাবে ইহাদের বৃদ্ধি দ্রুত হওয়ায় ওজন বেশী হয়।

অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় মুরগী নানা ব্যাধি দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয় এবং পোলট্রিতে মুরগীর অধিক মৃত্যুহার রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যাধি নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজন। আদর্শ পোলট্রি পরিচালনার জন্য মুরগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। সুস্থ ও স্বাভাবিক মোরগ ও মুরগীর বৈশিষ্ট্য হইল :

(i) সর্বদা চঞ্চল ও ব্যস্ত

(ii) জ্বলজ্বলে চক্ষু

(iii) ঘন বিন্যস্ত পালক

(iv) সুগঠিত চিরুনীর ন্যায় মাথায় ঝুঁটি

(v) সুদৃঢ় পশ্চাৎ পদদ্বয়।

দেহকাণ্ডের পার্শ্ব ও পশ্চাৎ প্রান্তের আকৃতি ও গঠন পর্যবেক্ষণ করিয়া মুরগীর ডিম প্রসবের ক্ষমতা নিরূপণ করা সম্ভব। দেহকাণ্ডের উক্ত তলদ্বয় ইংরাজী অক্ষর 'V'-এর ন্যায় হয়। অন্তঃকঙ্কালে কিল (Keel) অস্থি ও শ্রোণীচক্রের (Pelvic girdle) মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা অবশ্যই 5 সেণ্টিমিটারের বেশী হয়। অধিক ডিম প্রসবকারী মুরগীর দেহকাণ্ডের পশ্চাৎপ্রান্তে পায়ুর দুই পার্শ্বে পেলভিক অস্থি 5 সেণ্টিমিটার দূরত্বে অবস্থান করে। ইহাদের পায়ুছিদ্রটি প্রশস্ত ও সিক্ত থাকে। অল্প ডিম উৎপাদনকারী মুরগীর পায়ুছিদ্রটি ক্ষুদ্রাকার ও সংকীর্ণ। অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগীর মাথার ঝুঁটি ও ওয়াটল উজ্জ্বল বর্ণের হয়। কিন্তু স্বল্প ডিম উৎপাদনকারী মুরগীর মাথার চূড়া ও ওয়াটল অনুজ্জ্বল।

পোলট্রি শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হইল—(i) অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদন, (ii) ভাল ও অধিক পরিমাণ মাংস উৎপাদন, (iii) মুরগী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত কম খাদ্য গ্রহণ ও (iv) বিভিন্ন ব্যাধি প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত ডিমের হ্যাচিং ক্ষমতা, মুরগীর দৈহিক বৃদ্ধি ও আয়ু নিরূপণের জ্ঞান মুরগী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। সেইজন্য পোলট্রি শিল্পে অধিক উৎপাদনের জন্য চারিটি প্রাথমিক প্রজাতি হইতে সংকরায়ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কয়েক জাতের মুরগী ও মোরগ উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের মুরগীর বিভিন্ন ব্রীড (Breeds) বলে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও উপযুক্ত ব্রীড উৎপন্ন করিবার দক্ষতার উপর পোলট্রি শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে।

1. মুরগীর বিভিন্ন ব্রীড

অধুনা পোলট্রি শিল্পে মুরগীর ব্রীডের শ্রেণীবিন্যাস করা হইয়াছে। আদি জন্মস্থান, ওজন, ডিমের 'তা' দেওয়ার প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা অনুসারে মুরগীর ব্রীডের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ জাতের, আদি জন্মস্থান অনুসারে বিভক্ত মুরগীর ব্রীডের উল্লেখ করা হইল ঃ

A. ভূমধ্যসাগরীয় ব্রীড (Mediterranean breed) :

ইতালী, স্পেন ও ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন কয়েকটি দেশে এই জাতের মুরগী পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় ব্রীডের মধ্যে প্রধান হইল—(a) শ্বেত লেগহর্ণ (*White Leghorn*), (b) মিণর্কা (*Minorca*), (c) অ্যানেনা (*Anena*) ইত্যাদি। ইহাদের ডিম উৎপাদনের হার বেশী।

শ্বেত লেগহর্ণ : লম্বাটে দেহের গ্রীবা ও দেহকাণ্ডের উপরিতলের গঠন ধনুকের ন্যায়। ইহাদের চঞ্চু, পশ্চাৎপদের অঙ্গুলি, পশ্চাৎপদের নিম্নাংশ ও ত্বক হলুদ বর্ণের হয়। পশ্চাৎপদদ্বয় লম্বাটে ও সুগঠিত। খাঁজ কাটা একটি ঝুঁটি শ্বেত লেগহর্ণের বৈশিষ্ট্য। মুরগীর ক্ষেত্রে ঝুঁটিটি এক পার্শ্বে ঝুলিয়া থাকে, কিন্তু মোরগের ঝুঁটি সর্বদা ঋজু বা খাড়া থাকে। কানের লতির রং সাদা। অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদন ক্ষমতার জন্যই লেগহর্ণ মুরগীর প্রতিপালন লাভজনক। বহিরাগত জাতের মধ্যে লেগহর্ণ মুরগী ভারতের শুষ্ক আবহাওয়ায় বিশেষভাবে অভিযোজিত। শ্বেত লেগহর্ণ ব্রীডের অন্তর্ভুক্ত প্রায় 12 জাতের মুরগী পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে বাফ্ (Buff), বাক্ (Buck), রেড (Red), সিলভার (Silver), কলম্বিয়ান (Columbian) এবং ব্ল্যাক্-টেলড রেড (Black-tailed red) উল্লেখযোগ্য।

মিণর্কা (Minorca) : সকল ভূমধ্যসাগরীয় ব্রীডের মধ্যে মিণর্কার আকার সর্বাপেক্ষা বড়। ইহাদের পালকের রঙ কালো। সেইজন্য ইহাদের কৃষ্ণ মিণর্কা (Black Minorca) বলা হয়। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ লম্বাটে এবং গ্রীবা অঞ্চল হইতে লেজ পর্যন্ত ক্রমশঃ ঢালু। ঝুঁটি একটি এবং কানের লতি শ্বেত বর্ণের। ত্বকের রঙ সাদা। ভারতের শুষ্ক আবহাওয়ায় ইহারা অনুপযুক্ত হওয়ায় আমাদের দেশে পোলট্রি শিল্পে ইহাদের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। ইহাদের ডিমের রঙ সাদা এবং আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।

অ্যানেনা (Anena) : এই ধরনের ব্রীড লেগহর্ণের ন্যায়। কিন্তু ত্বকের রঙ কালো এবং ইতস্তত বিস্তৃত সাদা পালক ইহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

সকল ভূমধ্যসাগরীয় ব্রীড এশীয় ও মার্কিনী ব্রীড অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্রাকার। ইহারা প্রচুর সংখ্যক সাদা ডিম প্রসব করে। ইহারা ডিমে 'তা' দেবার জন্য বসে না। সেইজন্য ভূমধ্যসাগরীয় ব্রীডকে নন-ব্রুডি (Non-broody) বা নন-সিটার (Non-sitter) শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

B. মার্কিনী ব্রীড (American Breed)

অধিকাংশ মার্কিনী ব্রীডের ত্বক্ হলুদ বর্ণের এবং পশ্চাৎ পদদ্বয়ের নিম্নাংশ পালকহীন। কানের লতি লাল এবং ইহারা বাদামী রঙের ডিম প্রসব করে। ডিম ও মাংসের জন্য এই ব্রীডের মুরগী প্রতিপালন করা হয়। মার্কিনী ব্রীডের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইল—(i) **প্লিমাউথ রক** (Plymouth rock), (ii) **লাল রোড আইল্যাণ্ড** (Rhode Island red), (iii) **সাদা রোড আইল্যাণ্ড** (Rhode Island white), (iv) **নিউ হ্যাম্পশায়ার** (New Hampshire), (v) **ডেলওয়ার** (Delware), (vi) **ইয়ানডোট** (Wyandottes), (vii) **জার্সি সাদা বড়** (Jersey white giant), (viii) **জার্সি কালো বড়** (Jersey black giant), (ix) **জাভা** (Java), **বুকুআই** (Bucueye), (x) **লিমোনা** (Lemona) প্রভৃতি।

সকল মার্কিনী ব্রীড ডিমে 'তা' দিবার জন্য বসে। সেইজন্য ইহাদের সিটার (Sitter) বা ব্রুডি (Broody) বলে।

প্লিমাউথ রক : এই ব্রীডের অধীনে অনেক জাতের মুরগী বর্তমান। ইহাদের সকলের দেহ প্রলম্বিত এবং স্থূল। মাথার ঝুঁটি একটি এবং খাড়া অবস্থায় থাকে। বক্ষের পেশীসমূহ উন্নত গঠনের। কানের লতি ক্ষুদ্রাকার এবং লাল।

রোড আইল্যান্ড সকল বহিরাগত ব্রীডের মধ্যে এই ধরনের মুরগী খুবই জনপ্রিয়। ইহাদের গঠন খুবই বলিষ্ঠ। ভারতের সকল আবহাওয়ায় ইহাদের অভিযোজন নিখুঁত। ইহাদের মধ্যে দুইটি জাতি পরিলক্ষিত হয়—একটির ঝুঁটি অখণ্ডিত এবং অপরটির দ্বিখণ্ডিত। ইহাদের পৃষ্ঠতল চ্যাপ্টা এবং পালকের রঙ বাদামী লাল। লেজের প্রধান পালকগুলি কালচে। সাদা রোড আইল্যান্ডে পালকের রঙ সাদা।

নিউ হ্যাম্পশায়ার : রোড আইল্যান্ড ব্রীডের ন্যায় ইহাদের দেহ আয়তাকার নহে। পৃষ্ঠতলের রং গাঢ় বাদামী লাল এবং অঙ্কীয়তল হালকা বাদামী লাল। মুরগীর লেজের পালকের রং কালো কিন্তু কিনারা লাল।

ডেলওয়্যার : সদ্য সৃষ্ট শাবকের রঙ সাদা। কিন্তু পরিণত অবস্থায় গ্রীবা, ডানা ও লেজের পালকে কালো ও সাদা দাগ বর্তমান। দেহটি প্রশস্ত এবং বক্ষদেশ সুগঠিত। মাথায় একটি ঝুঁটি থাকে। ইহারা আকারে বড় ও বাদামী রঙের ডিম প্রসব করে।

ইয়ানডোট : এই ধরনের মুরগীর দেহ প্রায় গোলাকার ও পৃষ্ঠতল সংক্ষিপ্ত। প্লিমাউথ ব্রীডের ন্যায় ইয়ানডোট ব্রীডের অনেক প্রকারভেদ আছে।

C. ইংলিশ-ব্রীড (English breed)

সকল ইংলিশ ব্রীড মুরগী সিটার ধরনের। উৎকৃষ্ট মাংসের জন্য ইংলিশ-ব্রীড বিশেষ উপযোগী। কয়েকটি প্রধান ব্রীড হইল : (i) **অস্ট্রালর্প** (Australorp), (ii) **কর্ণিশ** (Cornish), (iii) **সাসেক্স** (Sussex), (iv) **অর্পিংটন** (Orpington), (v) **ডোর্কিং** (Dorking), (vi) **লাল ক্যাপ** (Red cap) প্রভৃতি। কর্ণিশ ব্যতীত সকল ব্রীডের ত্বক্ সাদা। কানের লতির রঙ লাল। ডোর্কিং ও লাল ক্যাপ (Red cap) ব্যতীত সকলেই বাদামী রঙের ডিম প্রসব করে।

অর্পিংটন ব্রীড চারি প্রকার এবং ইহাদের সকলেরই দেহ প্রলম্বিত ও গোলাকার। পৃষ্ঠতল প্রশস্ত। ডোরকিং ব্রীডের বক্ষাঞ্চল প্রশস্ত এবং মস্তকটি অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাদের পাঁচটি অঙ্গুলি বর্তমান। অস্ট্রালর্পের গঠন অর্পিংটনের ন্যায় হইলেও ইহাদের দেহ অপেক্ষাকৃত লম্বাটে এবং হৃষ্টপুষ্ট। সকল ব্রীডগুলির মধ্যে সাদা কর্ণিশের কদর খুব বেশী। ইহাদের মাংস উৎপাদনক্ষমতা বেশী এবং ভারতবর্ষে ব্রয়লার (Broiler) উৎপাদনে ইহাদের বেশী ব্যবহার করা হয়।

D. ইউরোপীয় ব্রীড (European breeds)

এই ধরনের ব্রীডের অন্তর্গত ফ্রান্সের (i) হাউড্যান (Houdan), (ii) লা ফ্লাচি (La Flachi) ও (iii) ফেবিরোলিশ (Faverolles); বেলজিয়ামের (iv) ক্যাম্পাইন (Campine) এবং পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর কয়েকটি ব্রীড। ইহাদের মধ্যে পোল্যাণ্ডের ব্রীডগুলি উল্লেখ্য।

E. এশীয় ব্রীড (Asiatic breed)

এশিয়া মহাদেশে গৃহপালিত ব্রীডগুলির প্রকৃত জাত নির্ণয় করা কঠিন। ভারতে গৃহপালিত ব্রীডগুলির ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। এশীয় ব্রিডের মুরগীর দেহ আকারে বড়, অস্থি ভারী এবং পশ্চাৎপদদ্বয় পালক দ্বারা আবৃত থাকে। কানের লতি সংক্ষিপ্ত ও লাল ; ওয়াটল খুবই অস্পষ্ট। সকল এশীয় ব্রীডের অন্তর্ভুক্ত মুরগী হালকা বাদামী রঙের ক্ষুদ্রাকার ডিম দেয় এবং সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এশীয় ব্রীড হইল : (i) আসীল (Aseel), (ii) চাটগেয়ে (Chittagong), (iii) ব্রহ্মদেশীয় (Brahma), (iv) কোচিন (Cochin) প্রভৃতি। সকল এশীয় ব্রীড খাওয়ার মুরগী হিসাবে বিশেষ সমাদৃত। ইহাদের দেহে মাংসের পরিমাণ বেশী এবং মাংস সুস্বাদু। আসীল মোরগ লড়াকু স্বভাবের জন্য মোরগ-লড়াই (Cock-fighting)-এ ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে সর্বত্র আসীল ব্রীড দেখা যায়। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ভাল জাতের আসীল ব্রীড পাওয়া যায়। ইহাদের দেহের গঠন বলিষ্ঠ ও সতেজ ঝুঁটিটি ছোট এবং পালকের রঙ বৈচিত্র্যপূর্ণ। চাটগেয়ে ব্রীড আসামের পার্বত্য অঞ্চল ও চট্টগ্রামে বেশী পাওয়া যায়। পালকের রঙ ভিন্ন ধরনের হইলেও সোনালী ও হলুদ বর্ণের পালক অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। ওয়াটল ও কানের লতি ক্ষুদ্রাকার ও লাল বর্ণের হয়। এশীয় ব্রীডের মুরগী সুষ্ঠুভাবে ডিমে 'তা' দেয় এবং ইহারা সিটার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

2. পরিকল্পনা (Planning)

একটি আদর্শ পোলট্রি গঠনের পরিকল্পনার জন্য কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন, যথা

(a) মূলধন (Capital) : পোলট্রি গঠনে উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি থাকা দরকার। বাসস্থান ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতির ব্যয় বহনের জন্য প্রতিটি পাখির জন্য মাথাপিছু প্রায় Rs. 35-55/- স্থায়ী মূলধন একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া এক দিনের মুরগী শাবক হইতে ডিম প্রসবী অবস্থা (প্রায় 20 সপ্তাহ) পর্যন্ত প্রতিপালনের জন্য প্রতিটি পাখির জন্য প্রায় Rs. 15/- কার্যকরী মূলধন প্রয়োজন হয়।

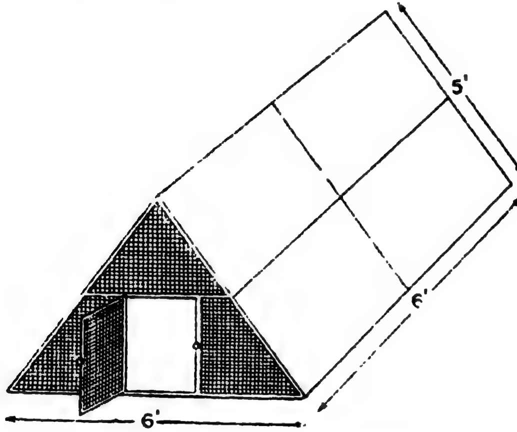
(b) অবস্থান (Location) : পোলট্রি গঠনের জন্য উপযুক্ত স্থান (Site) নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি স্থানে পোলট্রি গঠন করিতে হইবে যেখান হইতে পরিবহণ ব্যয় কম এবং যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে। মুরগীর উপযুক্ত খাদ্য ও জলের অবিরাম সরবরাহ থাকা দরকার।

3. বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি

নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি আদর্শ পোলট্রি নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ—

(i) **বাসস্থান** (Housing), (ii) **যন্ত্রপাতি** (Equipments), (iii) **খাদ্যবস্তু** (Feed), (iv) **চিক্ নির্বাচন** (Selection of Chicks), (v) **প্রতিষেধক টীকা** (Vaccination), (vi) **আলোকব্যবস্থা** (Lighting arrangement) এবং (vii) ব্যাধি—প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Diseases—Prevention and Control)।

মুরগী প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। কতটা পরিমাণ জায়গা পোলট্রি তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার উপর পোলট্রি পরিকল্পনা করা সম্ভব। যখন জায়গার পরিধি খুব বেশী তখন মুরগীকে মুক্ত অঙ্গনে বিচরণ করিতে দেওয়া যায়। এই ধরনের পোলট্রিকে **ফ্রি-রেঞ্জ পোলট্রি** (Free-range Poultry) বলে। এই ধরনের পোলট্রির চারিপার্শ্বে উপযুক্ত প্রাচীর দরকার এবং



20.2 অ্যাপেক্স (Apex) হাটের গঠন।

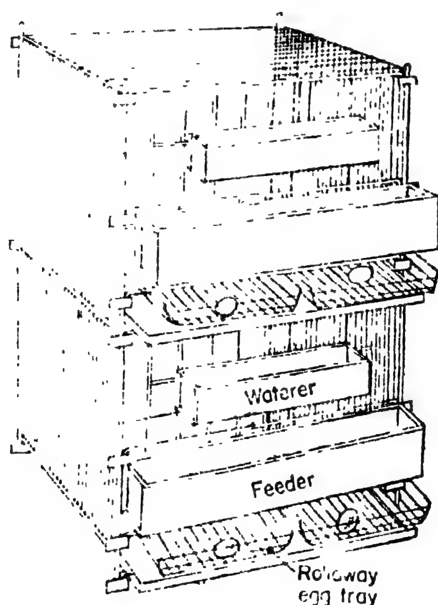
প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ জায়গায় কয়েকটি গাছ আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজন। ফ্রি-রেঞ্জ পোলট্রি পরিচালনার ব্যয় কম। কারণ প্রতিপালিত মুরগী ও মোরগ পরিবেশ হইতে খাদ্য-দানা, পোকা-মাকড় ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ জায়গার মধ্যে কয়েকটি খাঁচা (Cage) তৈয়ারী করা হয়। দিনের বেলায় মুরগী মুক্ত অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে খাঁচার মধ্যে আশ্রয় লয়। এই ধরনের পোলট্রিকে **সেমি-ইনটেন্সিভ পোলট্রি** (Semi-intensive Poultry) বলে। পাকা বাড়ীর ছাদে এই ধরনের পোলট্রি তৈয়ারী সম্ভব। যখন পোলট্রি গঠন কোন আবদ্ধ ঘরের মধ্যে পরিকল্পনা করা হয় তখন তাহাকে **ইনটেন্সিভ পোলট্রি** (Intensive Poultry) বলে। এই ধরনের পোলট্রিতে পাখি-

গুলিকে খাঁচার (Cage) মধ্যে প্রতিপালন করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাংসারিক প্রয়োজনে কোন পোলট্রি তৈয়ারী করিতে চান তিনি ফ্রি-রেঞ্জ বা সেমি-ইনটেনসিভ পোলট্রি তৈয়ারী করিতে পারেন। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পোলট্রি তৈয়ারী করিতে হইলে ইনটেনসিভ পোলট্রি গঠন শ্রেয়।

বাসস্থান (Housing)

ইনটেনসিভ পোলট্রিতে প্রতি পাখির জন্য প্রায় 3-4 বর্গফুট জায়গা দরকার। প্রতিকূল আবহাওয়া (যথা—উষ্ণতা, বৃষ্টি, আর্দ্রতা প্রভৃতি) হইতে পাখিদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত পোলট্রি গৃহ তৈয়ারী করিতে হইবে। পোলট্রিতে চিক্ (Chicks), গ্রোয়ার (Growers), লেয়ার (Layers) এবং বয়স্কা (Adults)-কে পৃথক ঘরে রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইতে চিকদের রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ফ্রি-রেঞ্জ পোলট্রিতে মুরগী প্রতিপালনের সময় জায়গার কোন স্থানে একটি অ্যাপেক্স হাট (Apex hut) তৈয়ারী করা শ্রেয় (চিত্র 20.2)। যেহেতু অ্যাপেক্স



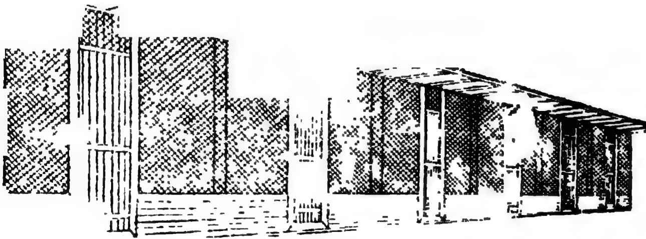
চিত্র 20.3 প্রসবখাঁচার চিত্ররূপ।

হাটের মেঝেতে পাখিদের বিষ্ঠা ও রেচন পদার্থ সঞ্চিত হয় সেইজন্য কয়েকদিন অন্তর অ্যাপেক্স হাটের স্থান বদল প্রয়োজন। কিন্তু ইনটেনসিভ পোলট্রিতে **প্রসবখাঁচা** (Laying cages) ব্যবহার করা হয়। প্রসবখাঁচার গঠন বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। 20·3 চিত্রে একটি আদর্শ প্রসবখাঁচার গঠন দর্শিত হইয়াছে।

প্রসবখাঁচা পোলট্রিতে একটি প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ। শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত আলোক ও বাতাসযুক্ত শান্ত আবাস মুরগীরা পছন্দ করে। প্রসবখাঁচার মেঝেতে দুইটি পাটাতন থাকে—সর্ব নিম্নে একটি প্রতিস্থাপনক্ষম ট্রে থাকে এবং অপরটি স্থায়ী তার নির্মিত জালের পাটাতন। ট্রেটি পরিষ্কার করিবার জন্য বাহির করা সম্ভব। ডিম প্রসব করিবার পর ডিম খাঁচার বাহিরে গড়াইয়া চলিয়া আসে এবং উহাদের সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। খাঁচার সম্মুখভাগ একটি রেলের সঙ্গে যুক্ত এবং মাঝখানে খাদ্য ও জলের পাত্র থাকে। এই ধরনের খাঁচা সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকে।

*ডিপ লিটার ঘর (Deep litter House)

ডীপ লিটার প্রতিস্থাপনের জন্য মুরগীর প্রসবগৃহ নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার এবং নিয়মিত বীজঘ্ন (Disinfectant) দ্বারা নির্বীজন করিতে হয়। কাঠের সংযোগস্থলগুলি আলকাতরা দ্বারা রঙ করা অথবা দেওয়ালের ফাটল সিমেন্ট দ্বারা বন্ধ করা বিশেষ দরকার। ডীপ লিটার সর্বসময় যেন শুষ্ক থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আর্দ্রতা ক্ষতিকারক। সিমেন্টের মেঝে ব্যবহার করা শ্রেয়। বিকল্পরূপে তারের খাঁচা ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু ইহা যেন মাটির সংস্পর্শে না থাকে। বায়ুচলন (Ventilation) এবং আলোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডীপ লিটার এরূপভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যেন চড়াই পাখী



চিত্র 20.4 একটি আদর্শ ডিপলিটারের চিত্ররূপ।

বেজী, ইঁদুর ও বিড়াল ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। ডীপ লিটার তৈয়ারীর উপাদান হইল কাঠের গুঁড়া (Saw dust) এবং ছোট ছোট কাটা খড় (Finely cut hay)। প্রসবঘরটি নির্বীজন করিয়া ইহার মেঝেতে প্রথমে কাঠগুঁড়া এবং ইহার উপর কাটা খড় বিছাইয়া প্রায় 6"—8" পুরু করিতে হইবে। ডীপ লিটারের উপর বসবাসের সময় মুরগী বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিলে উহা কাঠগুঁড়া ও খড়ের সহিত

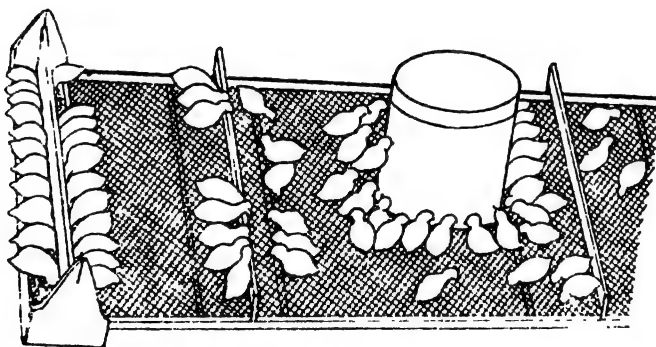
* ডীপ লিটার (Deep Litter) প্রকৃতপক্ষে মুরগীর প্রসব গৃহের মেঝে, প্রায় 6"—8" পুরু খড় বিছানো শয্যা।

মিশিয়া যায়। লিটার ভিজিয়া গেলে উক্ত জায়গার লিটার নতুন লিটার দ্বারা পরিবর্তন করা উচিত। লিটার ভিজা না থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভিজা কলি চূণ (Hydrated lime) ব্যবহার করিলে লিটারের আর্দ্রতা হ্রাস পায়। ডীপ লিটারে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুরগী পালকদের পা ভালভাবে নির্বীজন করা প্রয়োজন। খাদ্য ও জল এমনভাবে সরবরাহ করিতে হইবে যাহাতে ডীপ লিটারের পরিচ্ছন্নতা ও শুষ্কতা বিঘ্নিত না হয়। প্রতি বছর ডীপ লিটার সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে। পোলট্রিতে কোন সংক্রামক ব্যাধির ফলে মুরগীর অধিক মৃত্যু হইলে ডীপ লিটার সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। ডীপ লিটারের পরিবেশ যেন শান্ত ও আরামদায়ক হয়। মুরগী যাহাতে অযথা উত্তেজিত না হয় সে দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

পোলট্রি ঘরের গঠন

মেঝে (Floor) : পোলট্রি ঘরের মেঝে সিমেণ্টের দ্বারা কিংবা কাঠের পাটাতন দ্বারা তৈয়ারী হওয়া ভাল। মেঝে মাটির সংস্পর্শে না আসে--সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রযোজন। ইঁদুর পোলট্রি ঘরের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সেজন্য সিমেণ্টের তৈয়ারী মেঝে শ্রেয়।

দেওয়াল (Walls) : কাঠ কিংবা ইঁটের তৈয়ারী হওয়া দরকার। ডীপ লিটারের ক্ষেত্রে 1½' (0·45*m*) এবং খাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে 3' (0·9*m*) উচ্চতার পর দেওয়ালে ইঁট থাকে না। ঐ অংশ 2·5*cm* ছিদ্রযুক্ত তারের জাল দ্বারা আবদ্ধ করা হয়।



20.5 তারের পাটাতনে জল ও খাদ্যের পাত্র রাখিলে পালন স্থান পরিষ্কার রাখা যায়।

ছাদ (Roof) : ছাদ টাইল / অ্যাসবেস্টাস সিট / টিন / সিমেণ্ট নির্মিত হইতে পারে। ঘরের মাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ছাদ নির্মাণ করিতে হইবে। প্রতিকুল পরিবেশের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ছাদের গঠন ঠিক করা উচিত।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Essential Equipments) : আদর্শ পোলট্রির জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। ইহারা--

(a) ব্রুডার (Brooder) (b) ফিডার (Feeder), (c) ওয়াটারার (Waterer), (d) ইন্‌কিউবেটর (Incubator), ডিবিকার (Debeaker) এবং (f) বিবিধ (Miscellaneous items)।

(a) ব্রুডার (Brooder): সদ্যজাত মুরগী শাবক বা চিকের একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য 95°F (35°C) তাপমাত্রাযুক্ত ঘরের প্রয়োজন হয়। এই ঘরের মধ্যে 4—5 সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত শাবকদের রাখা হয়। প্রথম 2 সপ্তাহ ঘরের তাপমাত্রা 95°F রাখিয়া পরে প্রতি সপ্তাহে 5°F কমাইতে হইবে। ব্রুডার ঘরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রার পরিবর্তন যেন না হয়।

কেরোসিন, গ্যাস বা বিদ্যুৎচালিত একটি আদর্শ ব্রুডার ঘরে তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণ পরিমিত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেন হঠাৎ বায়ু-অনুবাহ (Drift of air) বা ঝোড়ো হাওয়া ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে সে ব্যাপারে যত্নশীল হইতে হইবে। ব্রুডার প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা বেশী থাকায় পরিবেশ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঠাণ্ডা বাতাস ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। ব্রুডার ঘরের পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও উহাতে যেন কোন ভক্ষক প্রাণী প্রবেশ করিতে না পারে সে দিকে নজর দিতে হবে।

ব্রুডার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, যথা—

(i) ল্যাম্প ব্রুডার (Lamp brooder): কেরোসিন তেলচালিত ব্রুডারে প্রায় 50টি চিক্ প্রতিপালন সম্ভব।

(ii) হোম-মেড ব্রুডার (Home-made brooder): কয়লা, কেরোসিন তেল, গ্যাস বা বিদ্যুৎচালিত ব্রুডার আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়।

(iii) কন্‌টিনুয়াস ব্রুডার (Continuous brooder): এই ধরনের ব্রুডারে কয়লা, গ্যাস, তেল ও বিদ্যুৎ জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া স্থায়ী ব্রুডার তৈয়ারী সম্ভব।

চিকের সংখ্যা অনুযায়ী যে কোন প্রকার ব্রুডার ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাপ নিয়ন্ত্রণ ও বায়ুচলন ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে।

(b) ফিডার (Feeder)

ফিডার পোলট্রিতে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের খাবারপাত্র। পোলট্রি ফিড দোকানে পোলট্রিতে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন প্রকার ফিডার কিনিতে পাওয়া যায়। ফিডার ব্যবহারের তাৎপর্য হইল—(i) সহজে পোলট্রি পাখি খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, (ii) খাদ্য অপচয় বন্ধ এবং (iii) পাখিরা খাদ্যের উপর বসিতে পারে না ও খাদ্যবস্তুর উপর বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে না। বিভিন্ন বয়সের মুরগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিডার প্রয়োজন, যথা—

(i) একদিন হইতে এক সপ্তাহ বয়সের পাখিদের জন্য ছোট ছোট কাঠের অথবা ডিম বহনের জন্য নির্মিত বিশেষ চ্যাপ্টা কাপের ন্যায় ফিডার (Cup-flats) ব্যবহার করা হয়।

(ii) এক সপ্তাহের পর হইতে কাঠ বা ধাতু নির্মিত অপেক্ষাকৃত বড় ফিডার ব্যবহার করিতে হইবে।

(iii) প্রথম দুই সপ্তাহে একটি দ্বি-তলযুক্ত একফুট লম্বা ফিডার ব্যবহার করিতে হয়। প্রতি 20টি পাখির জন্য একটি করিয়া ফিডার দরকার।

(iv) 3—8 সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি 10টি পাখির জন্য একটি করিয়া উপরি-উক্ত ফিডার প্রয়োজন হয়।

(v) আট সপ্তাহ পর হইতে প্রতি 6—7টি পাখির জন্য একটি ফিডার প্রয়োজন।

প্রতিটি ফিডারের মাথায় একটি ঘূর্ণায়মান চাকতী থাকায় কোন পাখি ফিডারের উপর উপবেশন করিতে পারে না এবং ফিডারটি এক ঘন সেণ্টিমিটার ছিদ্রযুক্ত তারের জাল দ্বারা আবৃত থাকে।

(c) **ওয়াটারার** (Waterer): ইহা পোলট্রিতে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের জলের পাত্র। পোলট্রি পাখিদের জলপানের জন্য জলের অবিরাম সরবরাহ থাকা দরকার (চিত্র 20.5)। জলের পাত্রটি বড় হওয়া প্রয়োজন। কারণ ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল থাকিবে ও সহজে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হইবে না। বড় বড় পোলট্রি খামারে স্বয়ংক্রিয় কয়েকটি জলের ফোয়ারা স্থাপন করা হয় এবং সারাদিন জল সরবরাহ অব্যাহত থাকে। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ পোলট্রি খামারে বিশেষ প্রয়োজন।

(d) **ইন্‌কিউবেটর** (Incubator): পোলট্রি শিল্পে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে বেশী সংখ্যক শাবক উৎপাদনের জন্য ইন্‌কিউবেটর নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটি সাধারণত বিদ্যুৎচালিত হয়। ইন্‌কিউবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ডিমের কেন্দ্রাঞ্চলে তাপমাত্রা স্থিরভাবে 32·2°c (90°F) রাখা। স্থির-তাপমাত্রা ছাড়াও ইহাতে পরিমিত আর্দ্রতা ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল অব্যাহত থাকে। ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে পরিস্ফুরণরত ডিমগুলিকে 19 দিনে হ্যাচিং-ট্রেতে (Hatching tray) স্থানান্তরিত করা হয় এবং 21 দিনে চিকগুলিকে সংগ্রহ করিয়া ব্রুডারে স্থাপন করা উচিত। ইন্‌কিউবেটরের আকার ডিমের 'তা'-দেওয়ার ক্ষমতা ও সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কোন কোন ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে 50-টি ডিম থাকিতে পারে। কয়েক হাজার ডিম ধারণের ক্ষমতাযুক্ত ইন্‌কিউবেটর কোন কোন পোলট্রিতে থাকে।

ইন্‌কিউবেটর কেরোসিন তেল বা গ্যাস চালিত হইতে পারে। গঠনের দিক হইতে ইন্‌কিউবেটর দুই প্রকার—

(i) **সেক্‌শন-ইন্‌কিউবেটর** (Section-Incubator)—যখন ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ থাকে।

(ii) **ক্যাবিনেট-ইন্‌কিউবেটর** (Cabinet-Incubator)—যখন ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে ইন্‌কিউবেটরের সাহায্যে ডিম হইতে শাবক উৎপাদনের সাফল্য কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে। শর্তগুলি :

(i) ইন্‌কিউবেটরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রার তারতম্য যেন $\pm 1^{\circ}C$ এর মধ্যে থাকে।

(ii) ইন্‌কিউবেটর যন্ত্রটি যেন শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত ঘরের মধ্যে স্থাপন করা হয়। ইন্‌কিউবেটরের পাল্লাটি ঘন ঘন খোলা উচিত নয়।

(iii) ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে ডিমগুলিকে 6 দিন ও 18 দিনে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা অনিষিক্ত ও মৃতভ্রূণযুক্ত ডিমগুলিকে বাতিল করা হয়।

(iv) এক প্রস্থ ডিম ইন্‌কিউবেশনের পর ইন্‌কিউবেটরটি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করিতে হয়।

(e) **ডিবিকার (Debeaker)** : ইহা পোলট্রিতে ব্যবহৃত একটি তীক্ষ্ম ধারালো ছুরির ফলা বিশেষ। প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি চিকের উপরের চঞ্চুর এক-তৃতীয়াংশ কর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায় মারামারির ফলে চিক্‌গুলি আহত ও ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে।

(f) আলোক ব্যবস্থা (Lighting arrangement)—প্রসবী মুরগীদের ডিম প্রসবে উত্তেজনা প্রদানের জন্য 10—12 ঘণ্টা দিনের আলোক দরকার। শীতকালে দিনের আলোকের স্বল্পতার জন্য কৃত্রিম আলোকের প্রয়োজন। পোলট্রির প্রসব গৃহে প্রতি 19 বর্গমিটার পরিমিত স্থানে একটি করিয়া 60 ওয়াটের বাল্ব মেঝে হইতে 2 মিটার উঁচুতে স্থাপন করিতে হইবে। সকালে ও বিকালের দিকে অতিরিক্ত আলোকের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

(g) **প্রতিষেধক টীকা** (Vaccination)—অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় মুরগী নানান সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হয়। পোলট্রি খামারে অসংখ্য পোলট্রি পাখি একত্রে সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। কোনও পাখি কোনও সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে খুব দ্রুত এবং অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাধির বিস্তার হয় এবং পোলট্রির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। বর্তমানে পোলট্রি পাখিদের বসন্ত, কলেরা, রাণীক্ষেত প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইজন্য অতি শৈশব অবস্থায় প্রতিটি পোলট্রি পাখিকে অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে টীকা দেওয়া প্রয়োজন। টীকা ফলপ্রদ হইলে পোলট্রি পাখিদের মৃত্যুর হার কমিয়া যায়।

(h) **ব্যাধি—প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ** (Diseases—prevention and control)—পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে পোলট্রিতে নানান ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অধিক সংখ্যক পোলট্রি পাখির মৃত্যু হয় এবং অবশিষ্ট পাখিরা দুর্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া যায়। ফলে পোলট্রি খামারের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। সেইজন্য পোলট্রিতে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধানের দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। সুস্থ ও সবল পোলট্রি পাখি নির্বাচন, উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যপ্রদান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ব্যাধির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্য কর্তব্য।

(i) **বিবিধ** (Miscellaneous items) : উপরিবর্ণিত যন্ত্রপাতি ব্যতীত পোলট্রি-শিল্পে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও ব্যবহৃত যন্ত্র হইল—(i) খাদ্য মিশ্রণের জন্য পাত্র (Food mixing container), (ii) খাদ্য পরিবেশনের জন্য চামচ (Food distributing spoon), (iii) ডিম সংগ্রহের জন্য তারনির্মিত বিশেষ খাঁচা (Egg collection wire net baskets), (iv) ডিম প্যাক করিবার ট্রে (Trays for packing eggs), (v) নিষিক্ত ডিম পরীক্ষার জন্য নীল আলোকের উৎস।

4. **মুরগীর খাদ্য** (Poultry Food) : কোন গৃহস্থের প্রয়োজনমত ডিমের প্রয়োজন মিটাইতে কয়েকটি দেশী মুরগী প্রতিপালনের জন্য সাধারণ শস্যদানা যথেষ্ট। কিন্তু পোলট্রি মুরগীর বৃদ্ধি ও ডিম উৎপাদনের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য যথোচিত পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। ডিম ও মাংসের উৎকৃষ্ট মান খাদ্যের উপর নির্ভর করে। পোলট্রিতে উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হইলে পাখিদের মধ্যে স্বজাতি-খাদক স্বভাবের (Cannibalistic habit) উদ্ভব হয় এবং উহারা সঙ্গীদের দেহ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া খায়। ফলে পোলট্রিতে আর্থিক ক্ষতি হয়। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, জল, ভিটামিন ও লবণের উপযুক্ত সংমিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্য পোলট্রিতে ব্যবহৃত হয়। আজকাল পোলট্রিতে ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈয়ারী খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রবিশেষে খাদ্যের তারতম্য হয়।

(a) **জীবন-ধারণের জন্য খাদ্যপ্রদান** (Feeding for maintenance)

দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা রক্ষা, পেশীক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উদ্ভবে, হৃত কলার পুনঃ প্রতিস্থাপনে ও ক্ষরণক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য মুরগীদের উপযুক্ত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন। সর্বঋতুতে মুরগীর দৈহিক উত্তাপ 38°C থাকে। দেহের আকার, লিঙ্গ, বাহ্য পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা ও কর্মক্ষমতার উপর শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত শক্তির উৎপাদন খুব বেশী হয় এবং ক্রমে হ্রাস পায়। পরিবেশের উত্তাপ কমিতে থাকিলে দেহের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি পায়। ফলে অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। দেহের স্বাভাবিক উত্তাপের স্থিতাবস্থা রক্ষা ও শক্তি উৎপাদনের জন্য খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের অংশ বেশী থাকা দরকার। ক্ষতসংরোহণ ও ক্ষরণক্রিয়ার জন্য প্রোটিনের ভাগ পরিমিত হওয়া আবশ্যক।

(b) **দেহের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যপ্রদান** (Feeding for body-growth)।

চিকের দৈহিক বৃদ্ধির হার অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশী। দুই সপ্তাহের মধ্যে দেহের ওজন দ্বিগুণ হয় এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে ওজন দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পরিমাণ ব্রীডের ভিন্নতা এবং বহুলাংশে খাদ্যের গুণাগুণ ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাদ্যোপাদানের মধ্যে প্রোটিন, জল, খনিজ লবণ (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড), ভিটামিন (A, D এবং রিবোফ্লেবিন) উপযুক্ত পরিমাণে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃদ্ধির প্রথমাবস্থায় প্রোটিনের প্রয়োজন বেশী হয়। ক্রমে প্রোটিনের প্রয়োজন হ্রাস পায়, যথা—8-12 সপ্তাহের চিকের 20-21% প্রোটিন প্রয়োজন এবং ক্রমে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় 1·6% প্রোটিন প্রয়োজন হয়। ক্রমবর্ধমান চিকের 1% ক্যালসিয়াম, 0·6% ফসফরাস, 0·5% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সামান্য পরিমাণ (প্রতি টন খাদ্যে ¼ পাউণ্ড ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন। প্রতি পাউণ্ড খাদ্যে 1,?50 IU ভিটামিন A, 175 IU ভিটামিন-D এবং 1·6 মিলিগ্রাম রিবোফ্লেবিন (পরিণত অবস্থায় 0·8 মিলিগ্রাম) থাকা প্রয়োজন।

(c) **মেদবহুল দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য প্রদান** (Feeding for fattening)

মাংসের উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধির জন্য পরিণত অবস্থার মোরগ ও মুরগীকে মেদবহুল করা হয়। বিপাকের সময় অতিরিক্ত পরিমাণ পরিবর্তিত কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন ফ্যাটে রূপান্তরিত হইয়া পেশীকে মেদ বহুল করে ; সেইজন্য বিশেষ করিয়া কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ প্রায় 75% রাখা হয়।

(d) **প্রসবী মুরগীকে খাদ্য প্রদান** (Feeding for egg-laying)

মুরগীর ব্রীড, দেহের আয়তন ও পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা, উপযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণের উপর নির্ভর করে।

একটি 56·7 গ্রাম ওজনের ডিমে 2 গ্রাম ক্যালসিয়াম, 7·5 গ্রাম প্রোটিন এবং 90-95 ক্যালরি শক্তি আবদ্ধ থাকে। ডিমের উপাদানগুলি মুরগীর দেহ হইতে আহৃত হয়। সুতরাং মুরগীর খাদ্যের মধ্যে উপাদানগুলির পরিমাণের সাম্য থাকা প্রয়োজন। 56·7 গ্রাম ওজনের ডিম উৎপাদনের জন্য প্রতিটি মুরগীর দৈনিক 0·78—1 পাউণ্ড উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। চার মাস বয়স হইতে পুলেটকে 1·7% প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দেওয়া উচিত। ক্রমে ইহা 1·5%-এ কমাইয়া আনা হয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান হইল—(i) ক্যালসিয়াম—2·05, (ii) ফসফরাস—0·75%, (iii) সোডিয়াম ক্লোরাইড—0·75% এবং স্বল্প পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ ও আয়োডিন। উক্ত লবণ ছাড়া প্রতি পাউণ্ড খাদ্যে অন্ততঃ 2,000 IU ভিটামিন-A এবং 300 IU ভিটামিন-D থাকা দরকার।

(e) **নির্মোচনের জন্য খাদ্যগ্রহণ** (Feeding for moulting)

মোরগ ও মুরগীর পুরাতন পালক পরিত্যাগ এবং তাহাদের নবীকরণকে নির্মোচন বলে। নির্মোচন ইহাদের একটি স্বাভাবিক জীবন-প্রক্রিয়া। সমগ্র দেহের ওজনের তুলনায় পালকের আনুপাতিক ওজন 5% হইলেও সমগ্র প্রোটিনের 20% পালকে বর্তমান। পালকে সালফারের উপস্থিতির জন্য খাদ্যে সিস্টিন ও মিথিওনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড অপরিহার্য।

(f) **হ্যাচিং ডিম উৎপাদনের জন্য খাদ্যপ্রদান** (Feeding for hatching egg production)

নিষিক্ত ডিম হইতে বাচ্চার পরিস্ফুরণ হয়। এই ধরনের নিষিক্ত বা হ্যাচিং ডিমের জন্য খাদ্যের পুষ্টিগুণ উপযুক্ত হওয়া দরকার। হ্যাচিং ডিমের মধ্যে ভ্রূণের পরিস্ফুরণের জন্য ভিটামিন (রিবোফ্লেবিন, বায়োটিন, ভিটামিন A এবং D, ফোলিক অ্যাসিড) ও ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ যথোপযুক্ত হওয়া দরকার।

ইনডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (Indian Council Agricultural Research) নির্দেশিত পুষ্টি অনুযায়ী চিকের খাদ্য তালিকা :

উপাদানসমূহ	প্রয়োজন		
	স্টার্টার ফিড	গ্রোয়ার ফিড	লেয়ার ফিড
ক্রুড প্রোটিন (% ওজন নিম্নসীমা)	20	16	15
ক্রুড তন্তু (% „ ঊর্ধ্বসীমা)	7	8	10
ভস্ম (% „ „)	10	10·5	11
ফসফরাস (% ওজন নিম্নসীমা)	0·8	0·8	1·0
ক্যালসিয়াম („ „)	1	1	2·2
ম্যাঙ্গানিজ (মি গ্রা কেজি)	60	60	60
আয়োডিন („)	1	1	1
লৌহ („)	20	20	20
তাম্র („)	2	2	2
দস্তা („)	50	50	50
ভিটামিন—A (আঃ একক/মিঃ গ্রা)	4,000	4,000	8,000
ভিটামিন—D_3 „	600	600	1,200
ভিটামিন—E (মি. গ্রা/কেজি)	10	10	10
থায়ামিন („)	6	6	6
রিবোফ্লেবিন („)	5	5	5
প্যানটোথ্যানিক অ্যাসিড („)	10	10	15
নিকোটনিক অ্যাসিড („)	20	20	20
বায়োটিন („)	0·1	0·01	0·01

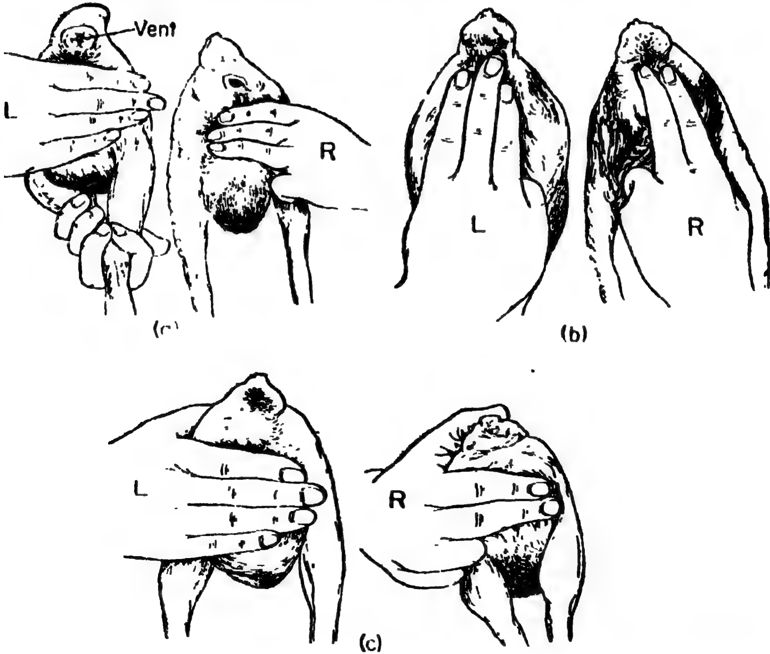
5. **চিক্ নির্বাচন (Selection of Chick)**—উপযুক্ত জাতের মুরগী নির্বাচনের উপর পোলাট্রির আর্থিক সাফল্য নির্ভর করে। অনেক পোলট্রির মালিক হ্যাচারি (Hatchery) হইতে নিষিক্ত ডিম ক্রয় করিয়া কৃমে উপায়ে বাচ্চা ফুটাইয়া লন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্যাচারি হইতে অন্ততঃ এক দিনের চিক (একদিনে লিঙ্গ নির্ধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব) ক্রয় করিয়া পোলট্রি সুরু করা যায়। কোন নিকটবর্তী হ্যাচারি হইতে চিক ক্রয় করা শ্রেয়। কারণ ইহাতে পরিবহনের অনেক সমস্যা দূর করা

সম্ভব হয়। প্রতিটি আদর্শ হ্যাচারিতে নিম্নলিখিত গুণাগুণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্রীডের চিক পৃথক ও নির্বাচিত করা হয় যথা: (i) দ্রুত বৃদ্ধি ক্ষমতা, (ii) শীঘ্র পালক উৎপত্তি, (iii) উত্তম মাংসযুক্ত এবং (iv) অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা।

6. **পোলট্রি-পাখি নির্বাচন ও বর্জন** (Selection and culling of Poultry-bird)—পোলট্রি পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল সুস্থ চিক্ নির্বাচন এবং অসুস্থ চিক্ বর্জন। দুর্বল, অসুস্থ ও কম ডিম উৎপাদনকারী পাখী বর্জন পদ্ধতিকে কিউলিং (Culling) বলে। কিউলিং-এর ফলে পোলট্রিতে খাদ্যের অপচয় বন্ধ হয়। প্রতি 100টি মুরগী হইতে অন্ততঃ গড়ে 60-80 ডিম পাওয়া প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত উপসর্গযুক্ত মুরগী অনুৎপাদক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং উহাদের বর্জন করা উচিত—

(i) ঝুঁটি এবং ওয়াটল—শুষ্ক, সংকুচিত এবং বিবর্ণ।
(ii) চক্ষু—গর্তে বসা এবং পলকহীন।
(iii) পায়ুছিদ্র—ক্ষুদ্র, শুষ্ক এবং গোলাকার।
(iv) পিউবিক অস্থিদ্বয়—শক্ত, মোটা এবং কাছাকাছি অবস্থিত।



চিত্র 20.6 রক্ষণ ও বর্জনের উপযুক্ত মুরগীর লক্ষণসমূহের তুলনামূলক চিত্ররূপ—L=উৎপাদক; R=অনুৎপাদক; (a) পায়ুছিদ্র শুষ্ক ও প্রাবৃত (অনুৎপাদক), সিক্ত ও উদ্বিত (উৎপাদক), (b) পিউবিক অস্থিদ্বয় মধ্যস্থ স্থান প্রশস্ত (উৎপাদক), অপ্রশস্ত (অনুৎপাদক), (c) পেলভিস অঞ্চল বিস্তৃত (উৎপাদক), সংকীর্ণ (অনুৎপাদক)।

(v) উদর —ক্ষুদ্র এবং তুলনামূলকভাবে শক্ত চামড়াযুক্ত।
(vi) রঙ্গক —পায়ু, চক্ষু বেষ্টনকারী বলয়, কানের লতি, চঞ্চু হলুদ রঙ্গকযুক্ত।
(vii) নির্মোচন—তাড়াতাড়ি কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী।

II. ব্যাধি

A. চিক্‌দের ব্যাধি (Diseases of Chicks)

1. মুরগীর টাইফয়েড (Fowl typhoid)

স্যালমোনেলা (*Salmonella*) গণের অধীনস্থ গ্যালিন্যারাম (*Gallinarum*) প্রজাতির জীবাণু (ব্যাক্‌টিরিয়া) দ্বারা ফাউল টাইফয়েড ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ (Symptoms): আক্রান্ত মুরগী দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, প্রবল জ্বর হয় এবং মস্তক ঝুলিয়া পড়ে। ইহার খাদ্যে অরুচি হয়।এবং সাদা রঙের মল ত্যাগ করে। রোগের লক্ষণ প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয়। অল্প ও পূর্ণ বয়স্ক মুরগী এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা (Prevention and Treatment): আক্রান্ত মুরগীকে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া উচিত। খাদ্য ও পানীয় জলকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ঠাণ্ডা যেন না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পশুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

2. পুলোরাম ব্যাধি (Pullorum disease)

স্যালমোনেল্যা পুলোরাম (*Salmonella pullorum*) নামক ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা পুলোরাম ব্যাধি সংঘটিত হয়। বাক্‌টিরিয়া মুরগীর ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করে এবং ডিমের মাধ্যমে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। পুলোরাম ব্যাক্‌টিরিয়াযুক্ত ডিম হইতে নির্গত বাচ্চা মুরগী পুলোরাম ব্যাধিগ্রস্ত হয়। এই রোগে মৃত্যুর হার প্রায় 100%।

লক্ষণ: পাতলা, আঠালো ও সাদা মলত্যাগ এই রোগের প্রধান লক্ষণ। আক্রান্ত বাচ্চারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও ঝিমাইতে থাকে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা: প্রসবী মুরগীদের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে পুলোরাম ব্যাধি আছে কিনা নির্ণয় করা উচিত। রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে আবাসস্থল বীজাণুমুক্ত করা উচিত। 0·04% ফুরাজোলিডোন (NF 180) ব্যবহার করিলে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

3. ককসিডিওসিস (Coccidiosis)

প্রোটোজোয়া সৃষ্ট এই রোগ 3-9 সপ্তাহ বয়সী মুরগীদের সিকাম ও ক্ষুদ্রান্ত্রকে আক্রমণ করে। সাধারণত গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগের প্রদুর্ভাব হয়।

লক্ষণ : খাদ্যে অরুচি দেখা যায়। পালকগুলি বিবর্ণ ও অমসৃণ হয়। ঝুঁটি ও ওয়াটলের রঙ পাণ্ডুর হয়। পরিশেষে পাখিদের মৃত্যু হয়। সিকাম আক্রান্ত হইলে মলের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হইতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা : স্বাভাবিকভাবে অনাক্রম্যতা বৃদ্ধির দ্বারা কক্সিডিওসিস নিয়ন্ত্রিত হয়। খাঁচাগুলি শুষ্ক রাখিতে হইবে এবং আক্রান্ত মুরগীদের পৃথক রাখা উচিত। পশুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফা জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

4. রাণীক্ষেত ব্যাধি (Ranikhet disease or New Castle disease)

ভাইরাসঘটিত মারাত্মক এই ব্যাধি শ্বসন অঙ্গ ও পৌষ্টিকতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। মৃত্যুর হার 25-100% এবং কোন ফলপ্রদ চিকিৎসা নাই। বাচ্চা ছাড়া পূর্ণ বয়স্ক ও প্রসবী মুরগীরা সংক্রামিত হয়। উত্তর প্রদেশের রাণীক্ষেতে এই ব্যাধি প্রথম দেখা দেয়।

লক্ষণ : আক্রান্ত মুরগীদের শ্বাসকষ্ট ও খাদ্যে অরুচি দেখা যায়। দুর্বলতার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হইয়া পরিশেষে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। মাথা সাধারণত দুইটি পায়ের মাঝখানে কিংবা কাঁধের উপর স্থাপন করা থাকে। মুরগী ঘন ঘন মল ত্যাগ করে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা : প্রতিষেধক টীকায় বিশেষ উপকার হয়। রাণীক্ষেত ব্যাধির কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই। আক্রান্ত মুরগীদের পৃথক রাখা দরকার।

5. অ্যাসপারজিলোসিস (Aspergilosis)

ছত্রাক ঘটিত এই ব্যাধিতে শ্বাসকষ্ট, চক্ষু-প্রদাহ, তৃষ্ণা প্রভৃ.. উপসর্গ দেখা যায়। মৃত্যুহার খুব বেশী। সন্তোষজনক চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়।

6. এনকেফালোমাইলিটিস (Encephalomylitis)

ছয় সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত চিক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পক্ষাঘাত পরিলক্ষিত হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ও ভিটামিন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

7. গামবোরো ব্যাধি (Gumboro disease)

অধুনাসৃষ্ট এই ব্যাধি ভাইরাস ঘটিত এবং পোলট্রির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিষেধক টীকা এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী।

B. পূর্ণবয়স্ক পোলট্রি পাখিদের ব্যাধি (Diseases of growing flocks)

কক্সিডিওসিস ও রাণীক্ষেত ব্যাধি ছাড়াও পূর্ণবয়স্ক মোরগ ও মুরগীর দেহে অসংখ্য অন্তঃপরজীবী বাস করে। কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হইল—

1. বড় গোলকৃমি (Large Round worms)

এই ধরনের কৃমির ডিম মলের সঙ্গে নিষ্কাশিত হয় এবং মাটির সহিত মিশিয়া যায়। বাচ্চা মুরগীরা মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহের সময় ডিমগুলি পৌষ্টিক নালীতে লইয়া আসে। ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে পরিণত হইতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ইহারা অবস্থান করে।

2. সিকাল কৃমি (Caecal worms)

মুরগীর সিকামের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ধূসরবর্ণের কৃমি বাস করে। ইহাদের দেহমধ্যে অবস্থিত এককোষী পরজীবী হিস্টোমোনিয়াসিস (Histomoniasis) ব্যাধির সৃষ্টি করে। স্ফীত সিকাম ছাড়া অন্য কোন উপসর্গ দৃষ্ট হয় না। পিপারেজিন যোগ ও ফেনোথিয়াজিন প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

3. ফিতাকৃমি (Tape worms)

মুরগীর অন্ত্রে ফিতাকৃমি বাস করে এবং অন্ত্রগহ্বর হইতে খাদ্যসার শোষণ করে। মুরগীর মলের সহিত নিষিক্ত ডিম বাহির হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। মাটির সহিত মিশ্রিত ফিতাকৃমির নিষিক্ত ডিমগুলি মধ্যবর্তী পোষক (Intermediate host) দেহমধ্যে অবস্থান করে। মুরগীরা মধ্যবর্তী পোষককে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত পরজীবী প্রাণীরা মুরগীর দেহমধ্যে চলিয়া আসে।

আক্রান্ত মুরগীদের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং দেহের ওজন কমিতে থাকে। ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা কমিতে থাকে। চিকিৎসার দ্বারা ফিতাকৃমির আক্রমণ বন্ধ-করা অসম্ভব। কারণ ফিতাকৃমির স্কোলেক্স অন্ত্রের গাত্রে আটকাইয়া থাকে এবং ইহাদের অপসারণ দুরূহ। পরিচ্ছন্ন বাসস্থান, বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ করিলে ফিতাকৃমির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

4. মারেক-বর্ণিত ব্যাধি (Marek's disease)

ইহা ভাইরাস-ঘটিত ব্যাধি এবং পোলট্রিতে এই ব্যাধির প্রকোপে মৃত্যু হার খুব বেশী। শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন মলত্যাগ এবং পরিশেষে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। কোন চিকিৎসা নাই। প্রতিষেধক টীকা প্রদানে সারা জীবন অনাক্রম্যতা বর্তমান থাকে।

C. প্রসবী মুরগীদের ব্যাধি (Diseases of laying birds)

রাণীক্ষেত ব্যাধি ও কৃমির আক্রমণ ছাড়া প্রসবী মুরগীদের অন্যান্য কয়েকটি ব্যাধি দেখা যায়, যথা—

(i) **ক্রনিক রেসপিরেটরী ব্যাধি** (CRD = Chronic Respiratory Disease): মাইকোপ্লাজমা গ্যালিনেরিয়াম (*Mycoplasma gallinerium*) নামক জীবাণু দ্বারা CRD সংক্রামিত হয়। সংক্রামিত ডিম অথবা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়। CRD ছোঁয়াচে ব্যাধি। শ্বাসকষ্ট, শ্লেষ্মাক্ষরণ ও সর্দি এই

ব্যাধির প্রধান লক্ষণ। উপযুক্ত প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ না করিলে মৃত্যুর হার খুব বেশী হয়। বর্তমানে সেরোলজিক্যাল পরীক্ষার (Serological test) দ্বারা CRD-যুক্ত মুরগীর দল পৃথক করা সম্ভব। প্রতি টন খাদ্যের সঙ্গে 200-400 গ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ মিশ্রিত করিলে CRD উপশম হয়।

(ii) **ল্যারিঙ্গো-ট্রেকিআইটিস** (Laryngo-tracheitis) : ভাইরাস ঘটিত এই মারাত্মক রোগে ল্যারিংক্স ও শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। প্রচন্ড সর্দি, চোখ ও মুখ হইতে জল ঝরে এবং মুখ খোলা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশের আগেই মুরগীর মৃত্যু হয়। এই রোগের সঠিক কোন ঔষধ নাই। প্রতিষেধক টীকা প্রয়োগে এই রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতার উদ্ভব হয়। এই রোগে আক্রান্ত সকল মুরগীকে সুস্থ মুরগী হইতে পৃথক রাখা উচিত।

(iii) **অ্যাভিয়ান লিউকনসিস্ কম্প্লেক্স** (ALC = Avian leukonsis complex) : ভাইরাস ঘটিত এই রোগ সাধারণত মুরগীর পক্ষাঘাত (Fowl paralysis) নামে পরিচিত। দেহের যে কোন অংশ আক্রান্ত হইতে পারে। মুরগীর পক্ষাঘাতে পা ও ডানার পেশী অকেজো হইয়া যায়। চোখ আক্রান্ত হইলে আইরিস বর্ণহীন হয় এবং ইহার গঠনের পরিবর্তন হয়। আন্তর অঙ্গ আক্রান্ত হইলে দেহের ওজন হ্রাস পায় এবং খাদ্যে অরুচি দেখা যায়। আক্রান্ত অস্থি অস্বাভাবিকভাবে স্থূল হয়।

(iv) **বসন্ত** (Pox) : ভাইরাস সৃষ্ট এই রোগে বাচ্চা মুরগীদের মৃত্যুর হার খুব বেশী হয়। মুখ, ঝুঁটি, ওয়াটল এবং দেহের পালকহীন অংশে ছোট ছোট স্ফোটকের মত গুটি দেখা যায়। মুখ ও গলার ভিতর ক্ষত সৃষ্টি হয়। দেহের ওজন এবং ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই রোগের কোন নির্দিষ্ট ঔষধ নাই। প্রতিষেধক টীকা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। 6-8 সপ্তাহ বয়সে টীকা দেওয়া শ্রেয়।

(v) **কলেরা** (Cholera) : পাস্টিউরেলা অ্যাভিসিডা (*Pasteurella avicida*) নামক ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সংক্রামিত এই ব্যাধি পোলট্রিতে দ্রুত ও মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। এই ব্যাধিতে মৃত্যুর হার খুব বেশী। রোগী ঘন ঘন পাতলা সবুজ মলত্যাগ করে। দুর্বলতা, নিষ্ক্রিয়তা, জ্বর ও অরুচি এই রোগের লক্ষণ। মস্তক, ঝুঁটি ও ওয়াটল কালচে রঙ ধারণ করে। স্থির অবস্থায় মস্তক নিচের দিকে এবং ডানাদ্বয় মাটিতে ঝুলিয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে রোগ লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মৃত্যু হয়।

জলের সহিত মিশ্রিত সালফা সেথাজিন প্রয়োগে ভাল কাজ হয়। মুরগীর বাসস্থান রোগজীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে খাদ্য ও পানীয় জল সংক্রামিত না হয়। প্রতিষেধক টীকা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

(vi) **যক্ষ্মা** (Tuberculosis) : **মাইকোব্যাক্‌টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস** (*Mycobacterium tuberculosis*) নামক ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা পোলট্রি পাখিদের যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি হয়। 18 মাস বয়সের মুরগীদের এই ধরনের রোগ দেখা যায়। ঝুঁটি ও ওয়াটলের শুষ্কতা, দেহের বিবর্ণতা, নিষ্ক্রিয়তা, ওজন হ্রাস এবং ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

প্রতিষেধক টীকা প্রয়োগ ও পোলট্রিতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করাই এই রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায়।

III **বিপণন** (Marketing)

বাণিজ্যিক দিক হইতে বিচার করিলে পোলট্রি ফার্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক লাভ এবং পোলট্রি শিল্পের ক্রমিক অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন। ডিম, জীবন্ত পাখী, পাখীর মাংস, সার প্রভৃতি যথাযথ বিপণনের দ্বারা পোলট্রি ফার্মের উন্নতি সম্ভব। বিপণনের উদ্দেশ্য হইল উৎকৃষ্ট মানের ডিম, মাংস ও অন্যান্য পোলট্রিজাত সামগ্রী দ্বারা প্রধানতঃ খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করা।

ডিম (Eggs) : ডিম পচনশীল। উত্তাপ ও আর্দ্রতায় ডিমের প্রভূত ক্ষতি হয়। সেইজন্য পরিচ্ছন্নতা ও অনুকূল পরিবেশে উহাদের সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন। ডিমের খোলক সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত এবং উক্ত ছিদ্রপথে ডিমের অভ্যন্তরে নানান ক্ষতিকর পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে ও ডিমের অভ্যন্তর হইতে জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়। সেইজন্য পোলট্রি হইতে ডিম সংগ্রহের পর হইতে বাজারজাত করার পূর্ব পর্যন্ত সকল অবস্থায় পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ডিম বাজারজাত করা সম্ভব—

(a) **অনিষিক্ত ডিম (Infertile egg) উৎপাদন** : অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদনের জন্য কেবলমাত্র মুরগী চাষ করা হয়। সেইজন্য মোরগ অপেক্ষা মুরগী বেশী সংখ্যায় রাখিতে হয়।

(b) **পরিচ্ছন্ন ডিম উৎপাদন** : অত্যধিক সংখ্যক পরিচ্ছন্ন খাঁচা (অন্ততঃ পাঁচটি মুরগী পিছু একটি খাঁচা) পরিচ্ছন্ন ডিম উৎপাদনে সাহায্য করে।

(c) **উপযুক্তভাবে গুদামজাত করা** : ডিম সংগ্রহের পর উহাদের উপযুক্তভাবে **ফিলার ফ্লাপের** (Filler Flap) মধ্যে সংরক্ষণ দরকার। এমতাবস্থায় ডিমসমূহের পরিবহণ বাঞ্ছনীয়।

ডিমের গুণভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস

প্রধানতঃ একটি পোলট্রি ফার্ম হইতে ডিম সংগ্রহের পর সরাসরি বাজারে বিক্রয়ার্থে পাঠানো হয়। কিন্তু বর্তমানে ডিমসমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, AA, A, B এবং C

(i) **AA ডিম** : পরিচ্ছন্ন ডিম।

(ii) A ডিম : সামান্য অপরিচ্ছন্নতা থাকে।

(iii) B ডিম : খোলক-গাত্রে সামান্য অংশে (প্রায় 1/16 অংশ) নোংরা থাকিতে পারে।

(iv) C-ডিম : খোলকের প্রায় ¼ অংশে অপরিচ্ছন্ন হয়।

ডিম গাত্রের রঙ সাধারণত সাদা ও বাদামী হয়। খরিদ্দার আকর্ষণের জন্য পরিচ্ছন্ন ও রঙীন পাত্রে ডিমগুলি প্রদর্শিত করার বন্দোবস্ত প্রয়োজন।

ক্যাণ্ডেলীং (Candling)

মোমবাতির আলোক শিখার সাহায্যে ডিমের আভ্যন্তরিক অবস্থা নিরূপণ সম্ভব। মোমবাতির শিখা ব্যতীত 25-40 ওয়াট বিদ্যুৎ-বাতি শ্রেয়। ইহাদের সূক্ষ্ম আলোকরশ্মির প্রয়োগে ডিমের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দ্বারা ডিমের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা সহজসাধ্য।

গ্রেডিং (Grading)

গুণাগুণ বিচার করিয়া ডিমের গ্রেডিং করা হয়। ভারতবর্ষে অধিকাংশ বাণিজ্যিক সংস্থা "আগমার্ক" ("Agmark") মান অনুসরণ করে। নিম্নে আই. এস. আই. (I.S.I.) নিরূপিত মান অনুসারে ডিমের গ্রেডিং প্রদত্ত হইল—

মান	ওজন (প্রতি দশটি ডিম)	ওজন (প্রতিটি ডিম)	বাতাবকাশের গভীরতা
A – অপেক্ষাকৃত বড়	596 গ্রাম +	60 গ্রাম +	4 মিমি
A—বড়	526-595 গ্রাম	53-59 গ্রাম	4 মিমি
A—মাঝারি	446-525 গ্রাম	45-52 গ্রাম	4 মিমি
B – ছোট	380-445 গ্রাম	38-44 গ্রাম	4 মিমি
B—তুলনায় বড়	596 গ্রাম +	60 গ্রাম	8 মিমি
B—বড়	526-595 গ্রাম	53-59 গ্রাম	8 মিমি

প্রকৃতপক্ষে মান নির্ণয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। সাধারণতঃ ডিমকে আকার অনুসারে ছোট ও বড় দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ডিম ক্রয়ের সময় 50 গ্রামকে ডিমের গড় ওজনরূপে স্থির করা হয়।

গুদামজাত করা (Storage)

উপযুক্ত সংরক্ষণের দ্বারা ডিমকে প্রতিকুল পরিবেশ হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে ডিমের প্রভূত ক্ষতি হয়। সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি—

(i) সুষ্ঠু তাপীয় প্রয়োগ (Thermal processing)

(ii) 70°C উত্তাপে 2-3 সেকেণ্ডে ফ্লাস প্রয়োগ (Flash treatment) করা।

(iii) জলের মধ্যে উত্তাপ প্রয়োগ—

50°C—35 মিনিট
55°C—15 ”
60°C—5 ”

(iv) তেলের প্রলেপ প্রদান।

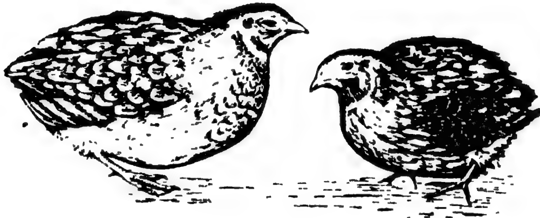
(v) ঘরে অথবা সংরক্ষণশালায় 0·56°C উত্তাপে ডিমকে গুদামজাত করা।

প্যাকিং ও পরিবহণ (Packing and Transport)

ডিমের খোলক খুবই পাতলা ও ভঙ্গুর। সেইজন্য বাজারে পাঠানোর পূর্বে উহাদের উপযুক্ত প্যাকিং প্রয়োজন। পরিবহণের সুবিধার জন্য কাগজ কিংবা প্লাস্টিক নির্মিত বিশেষ ধরনের ট্রে ব্যবহৃত হয়।

20.5 কোয়েল প্রতিপালন

জাপান হইতে আগত কোয়েল বর্তমানে পোলট্রি পাখিরূপে স্বীকৃত। 1974 খ্রীষ্টাব্দে জাপান হইতে ইহা প্রথম আমদানি করা হয়। অধুনা ইহাদের প্রতিপালন লাভজনক বলিয়া বিবেচিত। ইহাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম কোটার্নিক্স কোটার্নিক্স জাপানিকা (*Coternix coternix japanica*)।



চিত্র 20.7 কোয়েলের বহিরাকৃতির চিত্ররূপ—স্ত্রী (বাম), পুরুষ (দক্ষিণ)।

পাখিগুলি আকারে (ওজন 100-125 গ্রাম) ছোট হইলেও ইহাদের মাংস সুস্বাদু এবং ডিম (গড় ওজন 10 গ্রাম) উৎপাদনের হার বেশী। স্ত্রী পাখী সারা বৎসর ডিম প্রসব করে। 17 সপ্তাহ বয়স হইতে ডিম প্রসব আরম্ভ হয়। তিন সপ্তাহ বয়সে পুরুষ পাখিকে সনাক্ত করা যায়। ইহাদের গ্রীবার অঙ্কতলে বাদামী লাল পালক থাকে।

পরিস্ফুরণের জন্য অন্যান্য পোলট্রি-পাখিদের ন্যায় তাপমাত্রা প্রয়োজন।

অন্যান্য পোলট্রি পাখিদের তুলনায় কোয়েল সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা কম আক্রান্ত হয়। কোয়েল খুবই আরাম প্রিয় পাখি। ইহাদের প্রতিপালনের প্রধান উপকরণ হইল পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বিভিন্ন ধরনের কৃমি, কক্সিডিয়া এবং ছত্রাকের আক্রমণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

20.6 হাঁস প্রতিপালন

পোলট্রিতে মুরগীর গুরুত্ব বেশী হইলেও হাঁস প্রতিপালন স্থানবিশেষে আমাদের দেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তুলনামূলকভাবে হাঁস প্রতিপালন মুরগী প্রতিপালন অপেক্ষা সহজসাধ্য এবং হাঁসের ডিমের ওজন প্রায় 70-80 গ্রাম হয়।

হাঁস প্রতিপালনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ডিম উৎপাদন। ভারতবর্ষে প্রতিপালিত কয়েকটি ডিম প্রসবী হাঁসের ব্রীড হইল: **সিলেট মীট** (Syllet Mete), **নাগেশ্বরী** (Nageswari), **রানার** (Runner), **খাঁকি ক্যাম্বেল** (Khaki Campbell), **সাদা পিকিন্** (White Pekin), **মিনিকস্** (Minicos) প্রভৃতি। হাঁসেরা পাঁচ ছয় মাস বয়স হইতে ডিম পাড়ে এবং ভাল ব্রীডের হাঁস প্রতি ঋতুতে প্রায় তিনশত ডিম দেয়।

হাঁসেরা জল পরিবেশে থাকিতে ভালবাসে। দিনের বেলায় হাঁসেরা পুকুর, নালা, খালবিলে স্বচ্ছন্দে সাঁতার দেয় এবং জল হইতে সংগৃহীত গেঁড়ি, গুগলি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। রাতে বিশ্রামের জন্য ঘরের প্রয়োজন হয়। ইঁট কিংবা বাঁশ নির্মিত হাঁসের ঘর তৈয়ারী করা যায়। হাঁসের ঘরের মেঝে জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত এবং মেঝের উপর পাঁচ ইঞ্চি পুরু লিটার বিছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ঘরের বাহিরে জল ও খাবার পাত্র রাখা সুবিধাজনক। রাতের শেষে কিংবা সকালের দিকে হাঁস ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইতে 28 দিন সময় লাগে। ইনকিউবেটারের সাহায্যে হাঁসের ডিমে কৃত্রিম উপায়ে তা দেওয়া যায়।

উপযুক্ত খাদ্য ও পরিবেশে বাস করিতে পারিলে হাঁসদের ব্যাধি হয় না। মুরগীদের ন্যায় ইহারা শুকনো খাবার খুঁটিয়া খাইতে পারে না। গেঁড়ি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি থেঁতো করিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া কুঁড়োর সঙ্গে মিশাইয়া হাঁসদের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁসেদের খাদ্যের পরিমাণ বেশী লাগে। অপাচ্য ও নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণের ফলে অজীর্ণ রোগ ও পরিশেষে যকৃতের রোগ দেখা দেয়। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে চিকিৎসা করাইলে রোগ নিরাময় হয়। হাঁসদের সংক্রামক ক্ষয়রোগ পরিলক্ষিত হয়।

অনুচ্ছেদ 21

পরিবেশ বিজ্ঞান ও সংরক্ষণ

21.1 পরিবেশ বিজ্ঞান

ইকোলজি বা পরিবেশ বিজ্ঞানে জীবিত বস্তু যে বসতিতে (Habitat) থাকে সেই বসতির সহিত জীবিত বস্তুর সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে ঐ বসতিতে বসবাসকারী জীবিত বস্তুদের পরস্পরের সহিত প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। প্রত্যেক বসতিই সূর্যালোক, বায়ু, জল, বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ইত্যাদি ভৌত শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। আবার প্রতি বসতিরই একটি রাসায়নিক সংগঠন থাকে। রাসায়নিক সংগঠনে বসতিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ, মাটির গঠন (বেলে, দোআঁশ, পাথর, কর্দম) ইত্যাদি পড়ে। সমষ্টিগতভাবে বসতির উপর ইহাদের প্রভাবগুলিকে ভৌত রাসায়নিক ফ্যাক্টর (Physico-chemical factor) বা আবায়োটিক ফ্যাক্টর (Abiotic factor) বলা হয়। আবার ঐ বসতিতে যে সকল জীবিত বস্তু অর্থাৎ প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুবীক্ষণিক জীব (Microorganism) বাস করে তাহারা জীবন ধারণের জন্য পরস্পরের সহিত নানারূপ ক্রিয়াকাণ্ড করে। তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ডকে সমষ্টিগতভাবে বায়োটিক ফ্যাক্টর (Biotic factor) বলা হয়।

ইহা স্পষ্ট যে প্রতি বসতিতেই দুইটি ফ্যাক্টর থাকে। ইহাদের একটি হইল বায়োটিক ফ্যাক্টর এবং অন্যটি হইল আবায়োটিক ফ্যাক্টর। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে এই দুই ফ্যাক্টরের মধ্যে সম্বন্ধ গঠিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কেননা আবায়োটিক ফ্যাক্টরসমূহ যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণ নাই। পক্ষান্তরে বায়োটিক ফ্যাক্টরসমূহ যাহাদের লইয়া গঠিত তাহারা সকলেই জীবিত। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই উভয়ের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। বস্তুত ফ্যাক্টর দুইটি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একটি বাগানে ঘাস, গুল্ম, বৃক্ষ, পোকা, কেঁচো, পাখী সহজেই নজরে পড়ে। বাগানটি সূর্যালোক, বৃষ্টি বা জল, আলো, বাতাস সব কিছুই পায়। সুতরাং বাগানটিকে একটি বসতি হিসাবে ধরিলে উহাতে আবায়োটিক ও বায়োটিক ফ্যাক্টরগুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বসতিটিতে ঐ দুইটি ফ্যাক্টর এমনভাবে কাজ করে যে মনে হয় ওখানে ঘাস, গুল্ম, বৃক্ষ, পোকা, পাখী ইত্যাদি সার্থকভাবে অভিযোজিত (Adapted) রহিয়াছে।

কিন্তু ফ্যাক্টর দুইটি যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই ঐ স্থিতাবস্থা ব্যাহত হইয়া যায়। বাগানের মাটিতে যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান রহিয়াছে তাহাদের পরিমাণ কম হইলে ঘাস, গুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি বাঁচিতে পারিবে না। আবার অনেক দিন বৃষ্টি না হইলে ঘাস, গুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি মরিয়া

যাইবে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে আবায়োটিক ফ্যাক্টর ঠিক না থাকিলে বায়োটিক ফ্যাক্টর বিপদের সম্মুখীন হয়। আবার বায়োটিক ফ্যাক্টরগুলিও আবায়োটিক ফ্যাক্টরগুলির পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে। বাগানে যে গাছ আছে সেগুলি না থাকিলে মাটিতে জলীয় অংশের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। নাইট্রোজেন ফিক্সিং (Nitrogen fixing ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে আবায়োটিক ফ্যাক্টরের নাইট্রোজেন পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং কোন একটি নির্দিষ্ট বসতিতে আবায়োটিক ফ্যাক্টরগুলি বায়োটিক ফ্যাক্টরগুলিকে প্রভাবান্বিত করে, ইহা যেমন সত্য ইহার বিপরীত দিকও তেমনি সমান সত্য। বায়োটিক ফ্যাক্টর এবং আবায়োটিক ফ্যাক্টর উভয়েই উভয়কে প্রভাবান্বিত করে।

21.2 ইকোসিস্টেমের সংজ্ঞা

একটি বসতিতে বায়োটিক ও আবায়োটিক ফ্যাক্টরগুলির পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই কারণে বর্তমানে পরিবেশ বিদ্যাকে (Ecology) নূতনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে পরিবেশ বিজ্ঞান অর্থে প্রকৃতির গঠন এবং কর্ম অনুধাবন (Study of the structure and function of Nature)। প্রকৃতি অর্থে এখানে একটি বসতিতে বসবাসকারী সমস্ত জীবিত বস্তুর কর্মকাণ্ড এবং পরিবেশের উপর তাহাদের ক্রিয়া ও পরিবেশ কর্তৃক তাহাদের উপর ক্রিয়া বুঝান হইয়াছে। একটি বসতিতে যত জীবিত বস্তু আছে তাহাদের নিজেদের মধ্যে এবং যে পরিবেশে তাহারা থাকে সেই পরিবেশের সম্বন্ধকে ইকোসিস্টেম বা ইকোলজিক্যাল সিস্টেম (Ecosystem or Ecological system) বলা হয়। প্রকৃতিকে এখানে একটি বিরাট পরিবেশ তন্ত্র বা ইকোলজিক্যাল সিস্টেম বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এবং বসতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রকৃতির ইকোসিস্টেমকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রকৃতিকে এইভাবে কল্পনা করিয়া লওয়ার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। রাশিমূলকভাবে (Quantitatively) একটি ইকোসিস্টেম-এর গঠন এবং সেই সঙ্গে ইহার কার্য অনুধাবন করা ইহার ফলে সহজ হইয়াছে।

21.3 ইকোসিস্টেমের বিভাগসমূহ

অনুধাবনের সুবিধার জন্য ইকোসিস্টেমকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। এই পর্যায়গুলি নিম্নোক্তরূপ—A. গঠন, B. শক্তিপ্রবাহ এবং C. রাসায়নিক বস্তুর আবর্তন।

A. গঠন

ইকোসিস্টেমের গঠনে দুইটি মুখ্য উপাদান থাকে। একটি হইল a. আবায়োটিক উপাদান এবং অন্যটি হইল b. বায়োটিক উপাদান। বায়োটিক উপাদানগুলিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

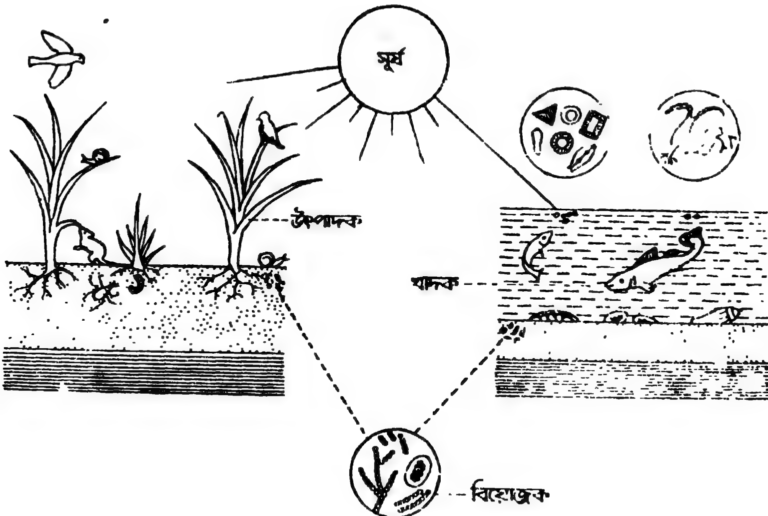
a. **আবায়োটিক উপাদান (Abiotic factors)**

আবায়োটিক উপাদান বলিতে জীবনের লক্ষণ নাই এইরূপ ভৌত শক্তি ও নানা রাসায়নিককে বুঝায়। ভৌত শক্তিগুলির মধ্যে আলো, বাতাস, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি পড়ে। রাসায়নিকগুলি হইল মাটি বা জলের বিভিন্ন খনিজ লবণ, পাললিক মাটি ইত্যাদি।

b. **বায়োটিক উপাদান (Biotic factors)**

i. **উৎপাদক :** সমস্ত জীবিত বস্তুর মধ্যে কেবলমাত্র সবুজ উদ্ভিদরাই নিজেদের খাদ্য সূর্যকিরণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল হইতে নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারে। সেই কারণে ইহাদের উৎপাদক (Producer) বা স্বভোজী বলা হয়।

ii. **ব্যবহারকারী বা খাদক :** ব্যবহারকারী (Consumer) বলিতে মূলত প্রাণীকে বুঝায়। প্রাণীরা নিজেদের খাবার নিজেরা উৎপাদন করিতে পারে না। উহারা সেই কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। যাহারা কেবলমাত্র উদ্ভিদ খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের প্রাথমিক ব্যবহারকারী (Primary consumer) বা প্রথম পর্যায়ভুক্ত খাদক বলা হয়। তৃণভোজী বা শাকাশী গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রাথমিক ব্যবহারকারী অর্থাৎ ইহারা উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। আবার মাংসাশী প্রাণীরা গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি খায়। ইহারা দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহারকারী (Secondary consumer) বা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক। ইহারা উদ্ভিদের উপর খাদ্যের জন্য পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।



21.1 একটি তৃণভূমি (বামে) ও একটি পুষ্করিণীর (দক্ষিণে) ইকোসিস্টেমের চিত্ররূপ।

iii. **শটনকারী বা বিয়োজক** (Decomposer) : প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত্যু হইলে ইহাদের দেহস্থিত প্রোটোপ্লাজম ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি শটনকারী জীব নিজেদের জন্য ব্যবহার করে। ব্যবহার করিবার সময় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তাহার ফলে অধিকাংশ জৈব যৌগ সরল অবস্থায় পুনরায় পরিবেশে ফিরিয়া যায়।

খাদ্য শৃঙ্খল : একই বসতিতে বসবাসকারী উৎপাদক ও ব্যবহারকারীরা খাদ্য ও খাদকের ভিত্তিতে একটি খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain) গঠন করে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে খাদ্য শৃঙ্খল সংক্রান্ত আলোচনা সহজভাবে করা যায়। একটি তৃণভূমিতে যে তৃণ থাকে তাহারা উৎপাদক কেন না সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ইহারা সৌর শক্তি, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলের সাহায্যে খাদ্য বা খাদ্য শক্তি (Food energy) উৎপাদন করিতে পারে। তৃণভূমিতে বসবাসকারী পতঙ্গরা এই তৃণ বা তৃণের রস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই পতঙ্গগুলি প্রথম পর্যায়ভুক্ত খাদক। এই বসতিতে বসবাসকারী অন্য প্রাণী যথা উভচর (ব্যাঙ) পতঙ্গগুলিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। ইহারা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত ব্যবহারকারী। তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত ব্যবহারকারী হইল সাপ কারণ ইহারা খাদ্য হিসাবে ব্যাঙ গ্রহণ করে। স্বাভাবিক কারণে উৎপাদক বা বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত ব্যবহারকারীর মৃত্যু হইলে মৃতদেহগুলি মাটিতে পড়ে। মাটিতে বসবাসকারী বিয়োজকসমূহ (ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক) মৃতদেহগুলির প্রোটোপ্লাজম নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং এই প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ জৈব যৌগ সরল অবস্থায় পুনরায় বসতিতে ফিরিয়া যায় এবং উৎপাদকরা উহা পুনরায় ব্যবহার করিয়া খাদ্য উৎপাদন করে।

খাদ্য শৃঙ্খলের ধর্ম

খাদ্য শৃঙ্খল উন্মোচন একটি জটিল বিষয়বস্তু। কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল কয়েকটি মূল নিয়মকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে। উহারা হইল—

1. খাদ্য শৃঙ্খলের গোড়ায় থাকে উৎপাদক। জীবন ধারণের জন্য ব্যবহারকারীরা উৎপাদকের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

2. আপাত দৃষ্টিতে খাদ্য শৃঙ্খলকে সহজ ও সরল মনে হয়। কিন্তু ইহা সময় সময় অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। প্রত্যেক ব্যবহারকারীই প্রয়োজনে একাধিক ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। আবার একই ব্যবহারকারী জীবনের বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। এই সমস্ত কারণে মূল খাদ্য শৃঙ্খল হইতে নানান শাখা খাদ্য শৃঙ্খল বাহির হইয়া খাদ্য শৃঙ্খলকে জটিল আকার প্রদান করে।

3. খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা ন্যূনতম তিন এবং সর্বাধিক পাঁচ।

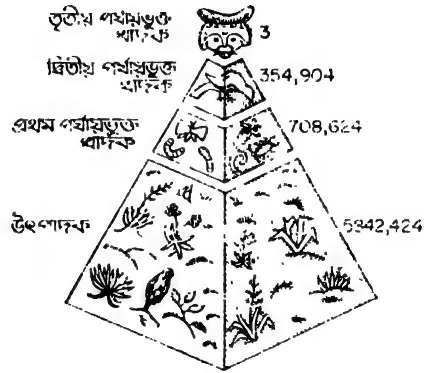
4. খাদ্যশৃঙ্খল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শৃঙ্খলের প্রথম পর্যায়ে যাহারা থাকে তাহারা আকারে ছোট কিন্তু সংখ্যায় বেশী (চিত্র 21 2) ; আবার যাহারা ঠিক ইহার উপরের পর্যায়ে থাকে তাহারা আকারে প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বড় কিন্তু

সংখ্যায় কম। খাদ্য শৃঙ্খলের উপরে যত উঠা যায় ততই অংশ গ্রহণকারী প্রাণীর সংখ্যা কমে কিন্তু আকার বৃদ্ধি দেখা যায়।

5. উৎপাদকগণ শক্তি সংগ্রহ করে। ব্যবহারকারীরা খাদ্যরূপে ঐ সংগৃহীত শক্তি গ্রহণ করে। খাদ্য শৃঙ্খলের যত উপরের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়।

6. খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি পর্যায় হইতে যতই উপরের পর্যায়ে যাওয়া যায় বায়োমাসের (Bio mass = বসতিতে উপস্থিত সমস্ত জীবিত বস্তুর সমষ্টি) পরিমাণ ততই কম হয়।

বসতি ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও ইকোসিস্টেমের গঠন প্রতিক্ষেত্রেই মোটামুটি একই ধরনের। একটি তৃণভূমি অথবা একটি পুষ্করিণী বসতি হিসাবে ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু ইহাদের ইকোসিস্টেমের গঠনের মধ্যে সমতা আছে। তফাৎ মূলত ঐ বসতি দুইটিতে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে। তৃণভূমিতে মূলযুক্ত উদ্ভিদ প্রধান উৎপাদনকারী। পুষ্করিণীতে জলজ উদ্ভিদ ও অণুবীক্ষণিক ভাসমান উদ্ভিদশৈবাল (Phytoplankton) মুখ্য উৎপাদনকারী। ব্যবহারকারী প্রাণী বা খাদক থাকে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই উহারা ভিন্ন প্রকৃতির। 21 চিত্রে একটি তৃণভূমি ও পুষ্করিণীর ইকোসিস্টেমের সমতা ও ভিন্নতা দেখান হইল।



চিত্র 21.2 খাদ্যস্তরের উপরের দিকে যত যাওয়া যায় (ব্যবহারকারীর খাদক) সংখ্যা তত কম হয়।

B. ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ (Energy flow in Ecosystem)

ইকোসিস্টেমের কর্মধারার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল শক্তি প্রবাহ (Energy flow)। কাজ করিবার ক্ষমতাকে শক্তি বলা হয়। শক্তির প্রকারভেদ আছে। ইহা আলোক শক্তি, তাপ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি নানারূপে প্রকাশিত হইতে পারে। ইকোসিস্টেমে উপরি-উক্ত সকল প্রকার শক্তি উপস্থিত থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আলোক শক্তি ও তাপ শক্তির প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী।

সূর্য শক্তির উৎস : ইকোসিস্টেমে সূর্য শক্তির প্রধান উৎস। সূর্যের গঠন এবং তাপমাত্রা এইরূপ যে ইহার হাইড্রোজেন প্রতিনিয়ত হিলিয়ামে (Helium) রূপান্তরিত হইতেছে। এই রূপান্তরের সময় অমিত শক্তির উদ্ভব হইতেছে। এই উদ্ভূত শক্তি সূর্য হইতে মহাশূন্যের সর্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সৌরমণ্ডলে

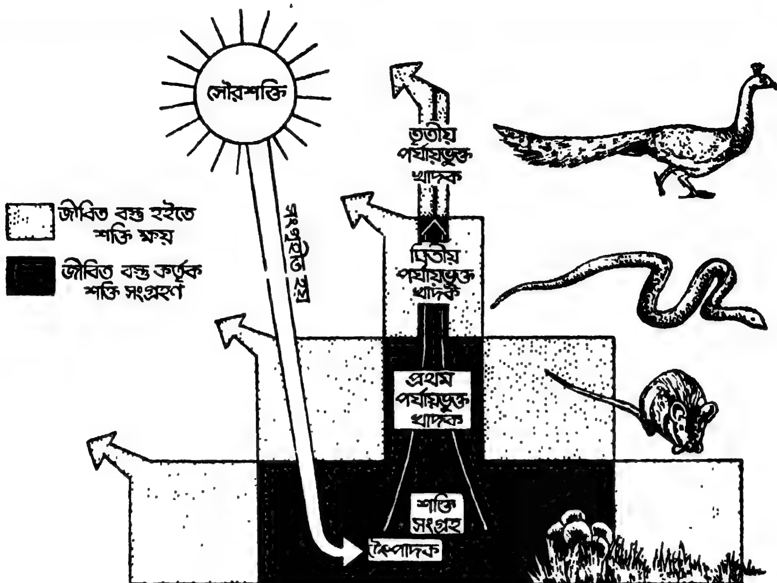
পৃথিবী একটি নগণ্য গ্রহ। সূর্য হইতে পৃথিবীর দিকে $12 \cdot 3 \times 10^{22}$ কিলো ক্যালোরি আলোক শক্তি আসে। কিন্তু ইহার সবটাই ভূপৃষ্ঠে আসে না। আবহমণ্ডলের মেঘ, ধূলি, ধোঁয়া ইত্যাদিতে এই শক্তির বেশ কিছুটা প্রতিফলিত হইয়া আবার মহাশূন্যে ফিরিয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতেও কিছু আলোক শক্তি প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু কিছু শক্তিকে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ধরিয়া রাখে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে সূর্য হইতে পৃথিবীতে যত আলোক শক্তি আসে তাহার শতকরা 0·1 অংশ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ধরা পড়ে।

ইকোসিস্টেম ও থার্মোডাইনামিক্স বা তাপগতিবিদ্যা : ইকোসিস্টেমে প্রবাহিত শক্তি তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্সের (Thermodynamics) প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম পুরোপুরি পালন করে। থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম নিয়মটি হইল শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না কিন্তু এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। দ্বিতীয় নিয়মে বলা আছে একটি শক্তি যখন অন্য একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন রূপান্তরিত হইবার প্রয়োজনে কিছু শক্তির (সাধারণত তাপশক্তি হিসাবে) অপচয় ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে সালোকসংশ্লেষে আলোক শক্তিকে উদ্ভিদ রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। রূপান্তরিত হইবার সময় কিছু তাপশক্তির সৃষ্টি হয় এবং ইহা কোন কাজে লাগে না। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষে যত আলোক শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহার অনুরূপ রাসায়নিক শক্তি সৃষ্টি হয় না—কিছু শক্তির তাপশক্তি হিসাবে অপচয় ঘটে।

ইকোসিস্টেমে শক্তির গতিপথ : ইকোসিস্টেমে উৎপাদনকারীরা আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উৎপাদনকারী উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সবুজ ছাড়া অন্যান্য আলোক বর্ণালী ও জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করে। এইভাবে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের সময় তাপ শক্তি রূপে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে। উৎপাদনকারীদের দেহে তাপশক্তি রাসায়নিক শক্তি রূপে থাকে। ইহাদের বিপাকীয় ক্রিয়ায় বিশেষত শ্বাসক্রিয়ায় কিছু স্থৈতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা উৎপাদনকারীদের ভক্ষণ করে। উৎপাদনকারীদের দেহে যে স্থৈতিক শক্তি থাকে তাহা প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা পায়। প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা এই শক্তির কিছু নিজেদের বিপাকীয় ক্রিয়ায় ব্যয় করে। দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহারকারীরা প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীদের ভক্ষণ করিয়া স্থৈতিক শক্তি অর্জন করে এবং নিজেদের বিপাকীয় ক্রিয়ায় ইহার কিছু অংশ ব্যয় করে (চিত্র 21.3)। সুতরাং প্রতিক্ষেত্রেই কিছু শক্তির অপচয় ঘটে।

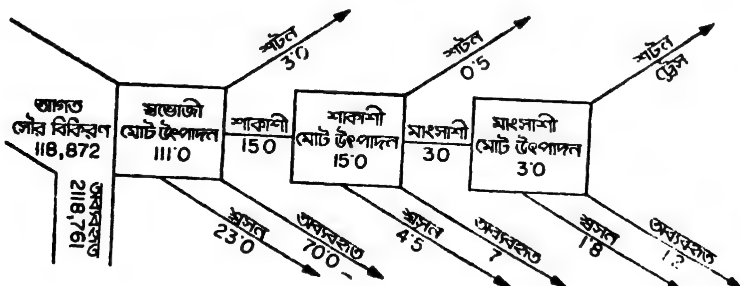
একটি বসতিতে যত উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী থাকে তাহাদের জৈব ক্রিয়ার জন্য অমিত শক্তির প্রয়োজন কিন্তু এই শক্তির বেশী পরিমাণই নষ্ট হয়। একটি বসতিতে শক্তি প্রবাহের ধারা নিম্নে আলোচিত হইল। তথ্যগুলি পরীক্ষালব্ধ।

1. একটি বসতির এক বর্গ সেন্টিমিটার স্থানে যত আলোক শক্তি সারা বৎসরে পতিত হয় তাহার দশমিক এক শতাংশ (0·1 percent) ঐ স্থানে বসবাসকারী উৎপাদকরা গ্রহণ করে। ঐ উৎপাদকদের শরীরে ঐ আলোক শক্তি হইতে প্রতি বৎসর



21.3 ইকোসিস্টেমে শক্তি সংগ্রহ ও জীবিত বস্তু কর্তৃক শক্তি ক্ষয়।

111·0 গ্রাম ক্যালোরি শক্তি সৃষ্টি হয়। ঐ উৎপাদকগুলি শ্বাসক্রিয়ায় 23·0 গ্রাম ক্যালোরি শক্তি প্রতি বৎসরে ব্যয় করে ও 70 শতাংশ অব্যবহৃত থাকে। বৎসরে



21.4 ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ। পরীক্ষালব্ধ তথ্য)।

3 শতাংশ শক্তির বিয়োজন বা শটন ঘটে। প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা উৎপাদনকারীদের ভক্ষণ করে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানের প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে মাত্র 15 গ্রাম ক্যালোরি শক্তি পায়। ঐ শক্তির 4·5 গ্রাম ক্যালোরি

প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা শ্বাসক্রিয়ায় ব্যবহার করে ও 0·5 গ্রাম ক্যালোরি শক্তি বিয়োজিত হয়। 7 গ্রাম ক্যালোরি অব্যবহৃত থাকে। বাকী {15−(4·5+0·5+7)} 3 গ্রাম ক্যালোরি দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহারকারীরা পায়। ইহারা শ্বাসক্রিয়ায় 1·8 গ্রাম ক্যালোরি ব্যবহার করে। ইহাদের ক্ষেত্রে বিয়োজন প্রায় শূন্য। অব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ 1·2 গ্রাম ক্যালোরি। শক্তি প্রবাহ 21·4 চিত্রযোগে দেখানো হইল।

পরিবেশবিদরা খাদ্য-পিরামিডের ন্যায় শক্তি প্রবাহের পিরামিড কল্পনা করিয়াছেন। ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলের অধীন। কোথাও একটু বিচ্যুতি ঘটিলেই ইকোসিস্টেম নিশ্চিতভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের প্রকৃতি (Nature of energy flow in Ecosystem)

a. **শক্তি প্রবাহ একমুখী** (Unidirectional) : উৎপাদনকারীরা সৌর শক্তি হইতে আলোক শক্তি আহরণ করে। উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে আলোক শক্তি কখনই সৌর শক্তিতে ফিরিয়া যায় না। প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা শক্তি উৎপাদকদের নিকট হইতে পায়। উৎপাদকরা ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে শক্তি পুনরুদ্ধার করে না।

b. **সমগ্র শক্তি প্রবাহের উৎস সৌর শক্তি** : ইকোসিস্টেম সৌর শক্তির উপর নির্ভরশীল। সৌর শক্তির প্রবাহের বাহিরে আসিলে ইকোসিস্টেম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

c. **শক্তি প্রবাহের ক্রমিক অবনতি** : খাদ্য শৃঙ্খলের সুরু হইতে শেষের দিকে যত যাওয়া যায় ততই শক্তি প্রবাহের ক্রমিক অবনতি ঘটে। উৎপাদনকারীরা যত শক্তি আহরণ করে তাহার সবটাই প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা পায় না ; শক্তির কিছু অংশ অব্যবহৃত থাকে এবং কিছু বিয়োজিত ও কিছু ব্যয়িত হয়।

d. লিন্ডেম্যান (Lindemann) 1942 খ্রীষ্টাব্দে ইকোসিস্টেমের শক্তির প্রবাহ ব্যাখ্যায় 10 শতাংশ নিয়ম (10 percent law) নামে একটি মতবাদ প্রচার করেন। প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারী যত উৎপাদনকারী খায় তাহার দশ শতাংশ প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীর দেহ গঠনে লাগিয়া যায়। অর্থাৎ একটি ছাগল যদি 100 কেজি খাদ্যবস্তু খায় তাহা হইলে এই খাদ্যবস্তুর 10 শতাংশ অর্থাৎ 10 কেজি ছাগলটির দেহ গঠনে লাগে। আবার একটি বাঘ 10 কেজি মাংস খাইলে ইহার 1 কেজি বাঘের দেহ গঠনে লাগে।

C. **ইকোসিস্টেমে রাসায়নিক বস্তুর আবর্তন** (Cyclical passage of materials in Ecosystem)

ইকোসিস্টেমের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিকের আবর্তন। জীবিত বস্তুর জীবনধারণের জন্য ত্রিশ বা ততোধিক রাসায়নিকের প্রয়োজন। এই রাসায়নিকগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বেশী মাত্রায় প্রয়োজন হয়। অন্যান্য রাসায়নিকের প্রয়োজন অল্প মাত্রায়। প্রয়োজনের পরিমাণ

যাহাই হউক রাসায়নিকগুলি প্রত্যেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবেশ হইতে জীবিত বস্তুর মধ্যে এবং পুনরায় জীবিত বস্তু হইতে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। রাসায়নিকগুলির চক্রাকার আবর্তন পথগুলিকে সমষ্টিগতভাবে **অজৈব-জৈব চক্র** বা **বায়োজিয়োকেমিক্যাল চক্র** (Inorganic-organic cycle or Biogeo-chemical cycle) বলা হয়। বায়ো (Bio) অর্থে এখানে জীবিত বস্তুকে, জিয়ো (Geo) অর্থে এখানে ভূত্বক, জল, বাতাস ইত্যাদি বোঝান হইয়াছে। বায়োজিয়োকেমিক্যাল চক্রে প্রতিটি রাসায়নিকের একটি নিজস্ব গতিপথ তথা আবর্তন চক্র থাকে।

বায়োজিয়োকেমিক্যাল চক্রে প্রতি রাসায়নিক দুই অবস্থায় উপস্থিত থাকে। একটি অবস্থাকে বলা হয় **রিজার্ভয়ার পুল** (Reservoir pool) এবং অন্য অবস্থাটিকে বলা হয় **সাইক্লিক্যাল পুল** (Cyclical pool)। রিজার্ভয়ার পুল গঠনে বৃহৎ কিন্তু ইহার আবর্তন গতি অত্যন্ত ধীর। পক্ষান্তরে সাইক্লিক্যাল পুল গঠনে ছোট, সক্রিয় এবং ইহার আবর্তন গতি দ্রুত। বস্তুত সাইক্লিক্যাল পুলই পরিবেশ হইতে জীবিত বস্তুর দেহে আবার জীবিত বস্তুর দেহ হইতে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তন করে। রিজার্ভয়ার অবস্থা দুইভাবে উপস্থিত থাকে ; যথা, **গ্যাসীয় দশা** (Gaseous type) এবং **পাললিক দশা** (Sedimentary type)। বাতাস ও জল রিজার্ভয়ার পুলের গ্যাসীয় দশা এবং ভূত্বক ইহার পাললিক দশা চিহ্নিত করে। কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদির আবর্তন রিজার্ভয়ার পুলের গ্যাসীয় দশা হইতে জীবিত বস্তুতে প্রবেশ করে। সালফার, ফসফরাস, আইওডিন ইত্যাদি পাললিক দশা হইতে জীবিত বস্তুতে প্রবেশ করে।

21.4 মানুষ ও ইকোসিস্টেম (Man and Ecosystem)

মানুষ ইকোসিস্টেমের এক বিশিষ্ট সভ্য। মানুষকে খাদ্যের জন্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। জল, আলো, অক্সিজেন সবই ইকোসিস্টেম হইতে আহরণ করিতে হয় এবং নিজের দিক হইতে ইকোসিস্টেমকে অনেক কিছু ফিরাইয়া দিতে হয়। অন্যান্য জীবিত বস্তুর ন্যায় মানুষও ইকোসিস্টেমের সংগঠকদের মধ্যে একটি। অন্তত প্রকৃতির গঠন ও কার্যের যে রূপ ইকোসিস্টেমে কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে মানুষও অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু মানুষ ইকোসিস্টেমের অনেক সংগঠকদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন নহে। মানুষের আর একটি পরিচয় আছে। মানুষ শৃঙ্খলাভঙ্গকারী। ইকোসিস্টেমের গঠন ও কার্য যে সুসংহত শৃঙ্খলে চলে মানুষ সেই শৃঙ্খলকে নিজ কর্মের দ্বারা ভাঙ্গিয়া দেয়। ফলে ইকোসিস্টেমের পরিবর্তন ঘটে।

ইকোসিস্টেমে মানুষের ভূমিকা অন্য জীবিত বস্তুর ভূমিকা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত ইকোসিস্টেমে মানুষের ভূমিকা ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রস্তর যুগের ইকোসিস্টেমে মানুষের যে ভূমিকা ছিল বর্তমান আণবিক যুগে সে ভূমিকার অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল আহার্য

সংগ্রহকারী (Food-gatherer)। স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া সে আহার্য সংগ্রহ করিত। খাদ্য পিরামিডে বা ইকোসিস্টেমে অন্যান্য জীবিত বস্তুর সংস্থাপনায় সে ছিল প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারী বা দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহারকারী। সে যুগে মানুষের সংখ্যাও ছিল কম। তাহারা স্থায়ীভাবে কোনও বসতিতে বাস করিত না। ছোট ছোট দলে দলবদ্ধ হইয়া যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

ক্রমে মানুষ কৃষিকার্য আরম্ভ করিল। চাষভূমি তৈয়ার করিবার জন্য বনজঙ্গল কাটিয়া ইকোসিস্টেমে প্রথম বিঘ্ন ঘটাইল। চাষবাস সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। চাষবাসের ফলে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল জনসংখ্যা। ফসল বোনার পর হইতে ফসল ওঠা পর্যন্ত যে সময় সেই সময়টিতে মানুষের করার মত খুব বেশী কিছু না থাকায় তাহার প্রচুর অবসরের সৃষ্টি হইল। নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির কল্যাণে মানুষ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার সুরু করিল। আসিল শিল্প যুগ। গ্রাম শহর নগরের পত্তন হইল। প্রকৃতির পরিবর্তন ধীর এবং ধারাবাহিকভাবে মানুষের হাতে ঘটিতে সুরু করিল।

বিগত পনের হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের দৈহিক গঠনের খুব পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু তাহার মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রচণ্ড পরিবর্তন হইয়াছে। মানুষ অনেক শিখিয়াছে। ভাষা ও সংস্কৃতির দৌলতে এক পুরুষের জ্ঞান পরের পুরুষে বর্তাইয়াছে। প্রকৃতির অনেক কিছু জানিয়া সেই জ্ঞানকে মানুষ নিজের কল্যাণে লাগাইয়াছে। ফলে ইকোসিস্টেমের অন্যান্য সভ্যের তুলনায় মানুষের অনেক বেশী স্বাধীনতা। মানুষ ইকোসিস্টেমের শুধুমাত্র সভ্য নহে কিছুটা নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষ ইকোসিস্টেমের নিম্নোক্ত উপায়ে পরিবর্তিত করিতেছে-

a. **বন-জঙ্গল নষ্ট করিয়া**: জনসংখ্যা বাড়িয়া বর্তমানে প্রায় বিস্ফোরণ দশায় পৌঁছাইয়াছে। ক্ষুধার জন্য খাদ্য চাই। খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন চাষযোগ্য জমি। চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে মানুষ নির্বিচারে বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিতেছে বা জলাজমি ভরাট করিতেছে। ইকোসিস্টেমে জীবিত বস্তুরা এক প্রয়োজনীয় উপাদান। বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলায় বনের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ আশ্রয়ী প্রাণীরা ধ্বংস হইতেছে। কোন এক বিশেষ স্থানের জীবিত বস্তু নষ্ট হওয়ার অর্থ সেই স্থানের ইকোসিস্টেমের ধ্বংস।

b. **আবহাওয়া কলুষিত করিয়া**: শিল্পের প্রসার অর্থে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি। কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কলকারখানায় ব্যবহৃত জ্বালানি হইতে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বাতাসকে দূষিত করিয়া তুলিতেছে। আবার কলকারখানা নির্গত নানা রাসায়নিক পুকুর, নদী ইত্যাদিতে বাহিত হইয়া জলমণ্ডলকে দূষিত করিয়া তুলিতেছে। ইকোসিস্টেমের আবায়োটিক উপাদান এইভাবে কলুষিত হওয়ায় ইকোসিস্টেম বিপদের সম্মুখীন হইতেছে।

c. **খনিজ লবণ আহরণ করিয়া :** অনেক খনিজ লবণ চক্রাকারে ইকোসিস্টেমে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত লবণের অধিকাংশেরই বৃহৎ সঞ্চয়স্থল (Reservoir) থাকে। মানুষ এই সঞ্চয়স্থলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে এবং ঐ সঞ্চয়স্থলগুলি হইতে নিজ প্রয়োজনে খনিজ আহরণ করিয়া খনিজগুলি প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিতেছে। উদাহরণ হিসাবে টিন ও ফসফরাসের কথা বলা যায়। বর্তমানে টিনের সঞ্চয় প্রায় শেষ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে মানুষ বৎসরে প্রায় 1 লক্ষ টন ফসফরাস খনি হইতে আহরণ করে আর ইকোসিস্টেমে বৎসরে 60 হাজার টন ফসফরাস ফিরিয়া যায়। সুতরাং প্রতি বৎসরে প্রায় 40 হাজার টন ফসফরাস মানুষ বেশী খরচ করে। এই হারে চলিলে একদিন ফসফরাসের সঞ্চয়ও শূন্য হইয়া পড়িবে।

d. **খাদ্য শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া :** মানুষের অত্যধিক শিকার প্রবণতায় অনেক সময় শিকারী প্রাণী—যথা বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হত্যা করে। অনেক সময় এক প্রাণীকে এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছাড়িয়া দিয়া সেই দেশের ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট করে।

সাধারণভাবে মনে হইতে পারে শিকারী প্রাণী হত্যা করিলে ইকোসিস্টেমের পরিবর্তন হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে শিকারী প্রাণী না থাকিলে ইকোসিস্টেম ধ্বংস হয়। শিকারী প্রাণীরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের ব্যবহারকারী। কোন জঙ্গলের ইকোসিস্টেমে যদি দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহারকারী না থাকে তাহা হইলে প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহারা অধিক সংখ্যায় উৎপাদনকারী ভক্ষণ করিবে। এক সময় উৎপাদনকারী না থাকায় প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা খাদ্যাভাবে মারা যাইবে।

যদিও দেরীতে তথাপি বর্তমানে মানুষ বুঝিয়াছে যে স্বল্পকালীন (Short-term) লাভের জন্য ইকোসিস্টেমের পরিবর্তন করা উচিত নহে। ইকোসিস্টেম বা ইকোসিস্টেমের অংশ বিশেষ (আবহাওয়া বা জীবিত বস্তু বা বায়োজিয়োকেমিক্যাল চক্র) নষ্ট করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। এই উপলব্ধির জন্য মানুষ তাহার ও ইকোসিস্টেমের সম্বন্ধে নূতন আলোকে চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছে

21.5 সংরক্ষণ (Conservation)

নিজ স্বার্থে, জনসংখ্যার চাপে ও সভ্যতার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখিতে মানুষ প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অনেক অপব্যবহার করিয়াছে। নির্বিচারে বন্য প্রাণী হত্যা, অবিবেচকের ন্যায় বন জঙ্গল কাটা, অপরিমিত খনিজ পদার্থ আহরণ, নদীর ধারা পথের পরিবর্তন ইত্যাদি ইহার সাক্ষ্য। বর্তমানে প্রকৃতি ও প্রকৃতির রীতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পূর্বকৃত কর্মের জন্য মানুষের যথেষ্ট অনুশোচনা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির প্রতি নিজের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে মানুষ যথেষ্ট সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে যে সুন্দর অবস্থায় পৃথিবী বর্তাইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থায় বা তাহা অপেক্ষা সুন্দর অবস্থায় উহা উত্তর পুরুষের হাতে তুলিয়া দিতে

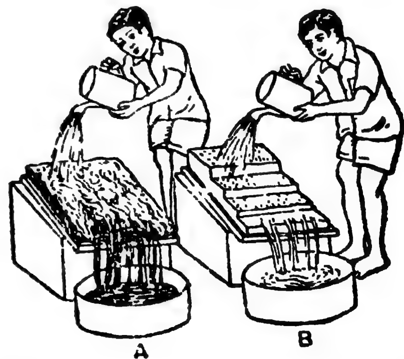
হইবে—এই ধরনের একটি দৃঢ় সঙ্কল্প বর্তমানে মানুষ করিয়াছে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ—ইহাই বর্তমান মানুষের ব্রত।

কিন্তু সংরক্ষণ অর্থে এখানে বন্যপ্রাণী, জঙ্গল ইত্যাদি এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থায় রাখা অথবা খনিজ সম্পদের আহরণ না করা বোঝায় না। এক কথায় প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক সম্পদকে স্থিতাবস্থায় রাখা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নহে। কেননা সভ্যতার ধারা অব্যাহত রাখিতে এবং নিজের প্রয়োজনে মানুষকে জঙ্গলের গাছ কাঠ রূপে বা কাগজরূপে ব্যবহার করিতেই হইবে। খনিজ সম্পদ ব্যবহার করিয়া সভ্যতার কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। সুতরাং প্রকৃত অর্থে সংরক্ষণ বলিতে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিচার-বুদ্ধি সমন্বিত ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে ক্ষয় পূরণের চেষ্টাকে বোঝান হয়।

মানুষ যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে তাহাদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর সম্পদ একবার ব্যবহারেই শেষ হইয়া যায় না। ইহারা পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইতে পারে। ভূমি, জল, জঙ্গল, শাক-সব্জি, ধান, গম ও বন্য প্রাণী এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহাদের **পুনর্গঠন-ক্ষমতাযুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ** (Renewable natural resources) বলা হয়। অন্য শ্রেণীর সম্পদ একবার ব্যবহারেই পুরোপুরি নষ্ট হইয়া যায়। কয়লা, খনিজ লবণ এবং তেল (পেট্রল) ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহাদের **পুনর্গঠন ক্ষমতাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ** (Non-renewable natural resources) বলা হয়।

কতকগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

A. **ভূমি সংরক্ষণ** : ভূমি বা মাটি কতকগুলি ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈব বস্তুর জটিল সংমিশ্রণ। মাটি আশ্রয় করিয়া গাছ দাঁড়াইয়া থাকে এবং গাছের জীবন মাটি-নির্ভর। মাটি ছাড়া গাছ বাঁচিতে পারে না। আবার গাছ ছাড়া প্রাণী বাঁচিতে পারে না, কেননা প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গাছের উপর নির্ভর করে।



চিত্র 21.5 পরীক্ষামূলক ভাবে দেখান হইয়াছে যে টেরেস কাল্টিভেশনে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

ভূমিক্ষয় একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি। বৃষ্টি, বাতাস, ভূমির উপরিভাগের (Top soil) মাটি ক্ষয় করে। ভূমির উপরিভাগের মাটি বৃষ্টি ধৌত হইয়া নদীতে পড়ে। ধূলি ঝড়ে (Dust storm) মাটি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। ভূমিতে গাছ থাকিলে গাছের

শিকড় মাটিকে শক্ত করিয়া আটকাইয়া রাখে। ফলে বৃষ্টি বা ধূলি ঝড়ে ভূমিক্ষয় খুব বেশী হইতে পারে না।

কিন্তু নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে গাছপালা কাটিতে হয়। বিশাল স্থান জুড়িয়া গাছপালা কাটার ফলে জমির উপরিভাগের মাটি গাছ-পালা হীন বা নগ্ন হইয়া পড়ে। কৃষি-কার্যের জন্য মানুষ জমির উপরি-ভাগের মাটিতে লাঙ্গল দেয়। এই সমস্ত কাজের ফলে বৃষ্টিপাত বা ধূলিঝড়ে ভূমিক্ষয় সহজ হইয়া যায়।

একই ভূমিতে একই ফসল বার বার চাষ করিলে জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যায়। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গিয়াছে যে প্রতি বৎসর ভারতের কৃষিযোগ্য ভূমির এক শতাংশ উর্বরতা হারাইয়া মরুস্থলীর আয়তন পরিস্ফীত করিতেছে। সাড়ে ত্রিশ কোটি হেক্টার কৃষিযোগ্য ভূমির মধ্যে সাড়ে চৌদ্দ কোটি হেক্টার নানা ধরনের ক্ষয় ও জলাভাবের কারণে কৃষির অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। এইভাবে ভূমিক্ষয় ভারতের ভৌগোলিক অদৃষ্টের সমস্যা রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যার পরিস্ফীতি কৃষি-ভূমির সীমিত অবস্থা, ভূমিক্ষয় ও বনভূমির সংকোচন ইহারা একত্রে এই নির্দেশ দিতেছে যে ভূমিরক্ষা জাতীয় কর্তব্য।

প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্ত এই শিক্ষাই দেয় যে ভূমিক্ষয়ের কারণে, বনভূমির সংকোচনে এবং কৃষিভূমির উর্বরতা রিক্ত হইবার কারণে ব্যাবিলন ও আসিরীয় সভ্যতার প্রাণস্রোত বিশুষ্ক মরুপথে ধারা হারাইয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি প্রাচীন জন উপনিবেশের বর্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ধারণা করিতে হয় যে তাহারা ভূমিক্ষয়েরই নিদারুণ পরিণামের স্মৃতিচিহ্ন।

দুই উপায়ে ভূমি সংরক্ষণ করা হয়। (i) জমির উর্বরতা বজায় রাখা, (ii) ভূমিক্ষয় রোধ। জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য জমিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করা হয় এবং শিম্ব জাতীয় গাছ লাগান হয়। শিম্ব জাতীয় গাছের মূলে যে ব্যাক্টিরিয়া থাকে তাহারা বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

বৃষ্টির জলের দরুন ভূমিক্ষয় রোধে জমিতে বৃক্ষ রোপণ (চিত্র 21.6) ও বৃষ্টির জল বহিষ্কারের সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। পাহাড়ী অঞ্চলে টেরেস কাল্টিভেশন (Terrace cultivation) বৃষ্টিপাতের দরুন ভূমিক্ষয় রোধে সবিশেষ কার্যকরী (চিত্র 21.5)।



চিত্র 21.6 পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গিয়াছে বৃক্ষ রোপণ করিলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

ধূলিঝড়ে ভূমিক্ষয় রোধে জমিতে ঘাস রোপণ, বাতাস বা ঝড়ের গতিপথের সহিত সমকোণে লম্বা লম্বা উদ্ভিদ সারিবদ্ধভাবে রাখা কার্যকর হয়। যেখানে সম্ভব বৃক্ষরোপণ করিলে ধূলিঝড়ে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ কম হয়।

B. **বন জঙ্গল সংরক্ষণ** (Conservation of forest): বন জঙ্গলে অনেক পশু পাখী বাস করে। কিন্তু নিজ প্রয়োজনে মানুষ বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলে। জঙ্গলের উদ্ভিদ হইতে মানুষ কাষ্ঠ সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ কাগজের উৎস। আবার নূতন বসতি স্থাপনের জন্যও মানুষ বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলে। কেবলমাত্র 1959-69 এই দশ বৎসরে পৃথিবী পৃষ্ঠে হইতে 16·9 লক্ষ হেক্টারে যত জঙ্গল ছিল তাহা নির্মূল করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক বন জঙ্গলের পরিবর্তে ঐ অঞ্চলে "কনক্রিটের" (Concrete জঙ্গল সৃষ্টি হইয়াছে। অবিবেচকের ন্যায় বন জঙ্গল কাটিলে ভূমিক্ষয় হয়। ক্যাচমেণ্ট অঞ্চলে (Catchment area) বনজঙ্গল কাটিলে নদীগুলিতে বর্ষাকালে জলস্ফীতি হয় ফলে নদীর উভয় পাড়ে বন্যা দেখা দেয়। ইহা ছাড়াও অন্য ঋতুতে নদীতে জলের পরিমাণ কমিয়া যায়।

বন জঙ্গল সংরক্ষণের উপায় কাষ্ঠ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা এবং যথাসম্ভব বন জঙ্গল না কাটা বা কাটিলেও নূতন করিয়া বৃক্ষরোপণ, দাবাগ্নি নিরোধ, বন জঙ্গলের গাছকে সুস্থ রাখার চেষ্টা এবং পোকামাকড় ও ছত্রাকের আক্রমণ হইতে গাছকে রক্ষা করা।

C. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী কাহাকে বলে

গৃহপালিত প্রাণী ব্যতীত যে সমস্ত প্রাণী (অণুবীক্ষণিক নয়) বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীতে, সমুদ্রে বা সমতলভূমিতে অর্থাৎ নিজেদের স্বাভাবিক বাসভূমিতে সার্থক ভাবে অভিযোজিত হইয়া বসবাস করে তাহাদের বন্যপ্রাণী বলে।

যে কোন দেশের বন্যপ্রাণী সম্ভার সেই দেশের জাতীয় সম্পদ। বন্যপ্রাণী কেবলমাত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে বন-জঙ্গলের শোভা বর্ধন করে না। সুষ্ঠু ও প্রয়োজনমত বন্যপ্রাণী কাজে লাগাইয়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি সম্ভব। বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল, পরিবেশের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিবার ক্ষমতা, বন্য-প্রাণীদের আচরণবিধি এবং বন্যপ্রাণী সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক সভ্যদেশের নাগরিকের কর্তব্য। পৃথিবীর একাধিক দেশ সেই দেশের কোন বিশিষ্ট বন্যপ্রাণীর পরিচয়ে পরিচিতি বা প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। যেমন বাঘের দেশ বলিতে ভারতবর্ষকে, ক্যাঙ্গারুর দেশ বলিতে অস্ট্রেলিয়াকে, কিউই (Kiwi) বলিতে নিউজিল্যাণ্ডকে এবং স্প্রিং বক (Spring Bock) বলিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বুঝায়।

বন্যপ্রাণীর ক্রমিক অবলুপ্তি

জনস্ফীতির চাপে পড়িয়া এবং নিজের প্রয়োজন মিটাইতে মানুষ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলগুলিকে যথেচ্ছভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বিগত দুই হাজার বৎসরে বন্যপ্রাণীর বাঁচিবার অধিকারকে মানুষ প্রায় অস্বীকার করিয়াছে। বন্যপ্রাণীদের বাঁচিবার কোন অধিকার নাই—উহাদের নিধন কর—ইহাই মানুষের কর্মের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে 1600 খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে 359টি প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং বিগত 2000 বৎসরে 100 প্রজাতির স্তন্যপায়ী লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে অনুমিত হইয়াছে যে প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি মিলিয়া সহস্রাধিক বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। ইহাদের সংরক্ষণের আশু বন্দোবস্ত না হইলে আগামী 100 বৎসরের মধ্যে ইহাদের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

বন্যপ্রাণী নিধনের কয়েকটি ঘটনা

প্রাণী সম্পদ ধ্বংসের কয়েকটি করুণ কাহিনী আজ মানুষের জানা। বন্যপ্রাণী সম্পদে আফ্রিকার স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের (Boer—পর্তুগীজ কুলোদ্ভূত উপনিবেশবাদী) আসার পর হইতেই আফ্রিকার বন্যপ্রাণী সম্পদের চিত্র পরিবর্তিত হইতে সুরু করে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই নির্বিচার হত্যার ফলে অ্যান্টিলোপ (Antelope) এবং জেব্রার (Zebra) সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পাইতে সুরু করে। এই নির্বিচার হত্যার সহিত উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকার বাইসন (Bison) হত্যা তুলনীয়।

পশ্চিম আফ্রিকার টাঙ্গানিকায় [(Tanganika) বর্তমানে তানজানিয়া] গত মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রচুর সিংহ পাওয়া যাইত। ঐ সময় টাঙ্গানিকা জার্মান উপনিবেশবাদীদের অধিকারে ছিল। উপনিবেশবাদীরা সিংহ শিকারীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করায় স্থানীয় অধিবাসীরা উৎসাহিত হইয়া প্রচুর সংখ্যায় সিংহ শিকার সুরু করে এবং অচিরেই সিংহ লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়।

রি-ইউনিয়ন দ্বীপ এবং মরিশাসের ডোডো (Dodo) পাখী সভ্যতার অগ্রযাত্রার শিকার। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সেই সময় হইতে অন্যান্য দেশে উপনিবেশ গঠনের চেষ্টা সুরু করে। দীর্ঘ দিনের সমুদ্রযাত্রায় খাবারের প্রয়োজন। তাই নাবিকরা অনেক সময় দ্বীপের নিকট নঙ্গর ফেলিয়া দ্বীপগুলি হইতে ভবিষ্যতের জন্য খাবার সংগ্রহের চেষ্টা করিত। মরিশাস ও রি-ইউনিয়ন দ্বীপের অসহায় ডোডো পাখী নাবিকদের হাতে এইভাবে হাজারে হাজারে মরিতে থাকে এবং মাত্র 100 বৎসরের মধ্যে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আটলান্টিক সমুদ্রের হেব্রাইডিস (Hebrides) দ্বীপ এবং আইসল্যাণ্ডের আউক (Auk) পাখীর ইতিহাস ডোডো পাখীর ন্যায়। আউক পাখীর মাংস ও

চাঁব উত্তম শ্রেণীর। ইহাদের উড়িবার ক্ষমতা না থাকায় ইহারাও নাবিকদের শিকার হইয়া ধরাতল হইতে অবলুপ্ত হয়। কথিত আছে যে 1844 খ্রীষ্টাব্দে শেষ আউক দম্পতির একজোড়া ডিম এক জেলের বুটের চাপে পিষ্ট হয় এবং শেষ আউক দম্পতিটিকে আগুনে রোষ্ট (Roast) করিয়া জেলের দল মহানন্দে শেষ আউক পাখীর নির্বাণ উৎসব পালন করে।

শুধুমাত্র মানুষের উদরপূর্তির জন্য আমেরিকার প্যাসেঞ্জার পায়রা (Passenger pigeon) অল্পদিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারা সংখ্যায় এত ছিল যে একসঙ্গে আকাশে উড়িলে কয়েক ঘণ্টার জন্য সূর্যালোক দেখা যাইত না। কিন্তু 1814 খ্রীষ্টাব্দে সিনসিনাটির চিড়িয়াখানায় শেষ প্যাসেঞ্জার পায়রাটির মৃত্যু ঘটে।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ সময়ে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম নিশ্চিহ্ন হয় উত্তর আফ্রিকার ক্ষুদ্রকায় হাতী। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানুষের শিকার হওয়ার করুণতম কাহিনী উত্তর আমেরিকার বাইসনের মধ্যে পাওয়া যায়। 1700 খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকায় বাইসনের সংখ্যা ছিল 600 লক্ষ আর 1883 খ্রীষ্টাব্দে বাইসনের সংখ্যা প্রায় শূন্য। উত্তর আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে রেল লাইন পাতার কাজ সুরু করে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল বোর্ড (Union Pacific Rail Board)। রেল লাইন পাতায় নিযুক্ত শ্রমিকদের উদর পূর্তির জন্য বাইসনের মাংস সরবরাহ করা হইত। মাংস সরবরাহকারক বিল কোডি (Bill Cody) একবছরে 4,280টি বাইসন হত্যা করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করে। রেল লাইন স্থাপিত হওয়ার পর বাইসনের সংখ্যা আরও কমিতে থাকে এবং উহারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে একদল বাইসন কানাডায় এবং একদল ইয়োলো-স্টোন ন্যাশানাল পার্কে বাঁচিয়া যায়। সংরক্ষিত ঘোষিত করার পর এই দুইটি দল হইতে বাইসনের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং ইহারা নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার জেব্রার জ্ঞাতিভাই কোয়োগা (Quaga) মাত্র 73 বৎসরের মধ্যে (1800 A. D. to 1873 A. D.) পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

মানুষ কর্তৃক অত্যধিক শিকার ও বাসস্থান নষ্ট হওয়ায় ভারতের বাঘ ও গণ্ডার অবলুপ্তির মুখোমুখী।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন

সাধারণ মানুষের কাছে যদি এ প্রশ্ন তোলা হয় যে বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ করা উচিত কি না, তা হইলে উত্তর পাওয়া যাইবে 'প্রয়োজন নাই'। মাঠের চাষীর নিকট বন্যপ্রাণী ক্ষতিকারক কেন না সময় অসময়ে উহারা আসিয়া ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে। পশুপালকদের নিকট বন্যপ্রাণী ক্ষতিকারক কেন না ইহারা পালিত পশু হত্যা করে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জমি সংরক্ষিত করিলে গো-

চারণ ভূমির পরিমাণ কমে। শিকারীদের নিকট বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাম্য নহে, কারণ আইন করিয়া বন্যপ্রাণী বধ বন্ধ করা অর্থে তাহার নিকট হইতে শিকার করার আনন্দ ও পশুচামড়া লইয়া ব্যবসার সুযোগ বন্ধ করা। শিকারী বন্যপ্রাণীরা মানুষ হত্যাকারী সুতরাং উহাদের সংরক্ষণ সাধারণ মানুষের কাম্য নহে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মতামত আত্মকেন্দ্রিক কেন না ব্যক্তিগত লাভ বা লোকসান ইহার সহিত জড়িত। কিন্তু বিজ্ঞানীদের নিকট মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণগুলি নিম্নোক্ত রূপ :—

(a) বন্যপ্রাণীদের প্রতি কর্তব্য

গত শতকের শেষ দিক হইতে দেশবিদেশের প্রাণিতত্ত্ববিদ ও পশুপ্রেমীরা বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনের চেষ্টা সুরু করেন। ধনীরা যেমন দরিদ্রদের সাহায্য করে ঠিক সেইভাবে প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীদের সাহায্য করা উচিত। বর্তমানের শ্লোগান (Slogan) হওয়া উচিত নির্বাকদের বাঁচার চিৎকারে যোগ দিন (Voice the voice of the voiceless)।

(b) **জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় বন্যপ্রাণীর প্রয়োজন আছে**—ইকোসিস্টেমে (Ecosystem) বন্যপ্রাণীর ভূমিকা আছে। বন্যপ্রাণীরা ইকোসিস্টেমের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুতরাং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণীর অবদান আছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত না হইলে এই ভারসাম্য ব্যাহত হয়। ইকোসিস্টেমের বায়োটিক (Biotic) উপাদানগুলি পরস্পরের সহিত খাদ্য শৃঙ্খলে (Food) আবদ্ধ। খাদ্য শৃঙ্খলে দ্বিতীয় সারির ব্যবহারকারী (Consumer) বিশেষতঃ মাংসাশী প্রাণী (Predators), যথা : বাঘ, সিংহ ইত্যাদির সংখ্যা কমিলে প্রথম সারির ব্যবহারকারী (Primary consumer) প্রাণী, যথা : হরিণ, শুয়ার ও গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথম সারির ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে নিজেদের বাসস্থান ও খাদ্যের অভাবজনিত কারণে উহারা পরিধান করিবে। ফলে বনভূমি সংলগ্ন চাষ-আবাদ উহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পক্ষান্তরে প্রাথমিক সারির ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কম হইলে দ্বিতীয় সারির ব্যবহারকারীরা মারা যাইবে কেননা খাদ্যের জন্য উহারা প্রথম সারির ব্যবহারকারীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এবং সেই সঙ্গে জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রয়োজন।

(c) **বন্যপ্রাণীর নন্দনতাত্ত্বিক (Aesthetic) ও সাংস্কৃতিক (Cultural) উপযোগিতা আছে**—সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বন্যপ্রাণীর উল্লেখ আছে। ঈশপস (Aeshops ' fable) ও পঞ্চতন্ত্রে বন্যপ্রাণী লইয়া যে সমস্ত গল্প আছে সেগুলি যেমন চিত্তগ্রাহী তেমনই কৌতূহল উদ্রেককারী ; অন্ততঃ বালকবালিকাদের কাছে।

বন্যপ্রাণীর উল্লেখ না থাকিলে বইগুলি উহাদের মাধুর্য হারাইত। প্রায় প্রতি দেশের প্রাচীন গল্প-কাহিনী এবং সাহিত্য বন্যপ্রাণীর উল্লেখে সম্পৃক্ত।

হাজার কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখনো মানুষকে আকর্ষণ করে। পাখীর সৌন্দর্য বা মিষ্টি ডাক বাদ দিলে প্রকৃতির কোন নির্জন স্থান কখনো মনোগ্রাহী হইতে পারে না।

(২) বন্যপ্রাণীর অর্থনৈতিক উপযোগিতা আছে— কোন দেশের বন্যপ্রাণী সম্ভার সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস। যথাযোগ্য ও বিবেচনাসম্মত ভাবে কাজে লাগাইলে উহা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া দেশের অর্থনীতিকে কিছুটা চাঙ্গা করিতে পারে।

কোন দেশের বিচিত্র ও বৈচিত্র্যময় প্রাণী সম্ভার অন্য দেশের প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করিতে পারে। ইহার ফলে দেশের পর্যটন ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। দেশের অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসের ও বন্যপ্রাণী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া ও উহাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করার সুবিধা দান করিয়া সহজেই পর্যটক আকর্ষণ করা যায়। এই ধরনের ব্যবস্থা করিয়া কেনিয়া যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বস্তুতঃ চা ও কফির পর ইহাই কেনিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান পন্থা।

বিনিময় বা ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা পশুশালায় প্রাণী সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশের পশুশালার জন্য বন্যপ্রাণী বিক্রয় করিলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। অনুরূপভাবে মিউজিয়ামের (Museum) জন্য মৃত বন্যপ্রাণীর চামড়া বা স্টাফড (Stuffed) বন্যপ্রাণী বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে একটি জীবিত ভারতীয় একশিঙ্গী গণ্ডারের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 30,000 টাকা।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে একটি দেশের বন্যপ্রাণী সম্ভার ঐ দেশের সম্পদ। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে লাগাইলে উহা আকরিক বা চা বা পাটের ন্যায় শিল্পে পরিণত হইতে পারে। অতএব, বন্যপ্রাণীর প্রয়োজন নাই ইহা সত্য এবং ঠিক নহে। বন্যপ্রাণীর প্রয়োজন আছে এবং সঠিক ব্যবহারে ইহা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে পারে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা

গত দশকের শেষদিকে দেশবিদেশের প্রাণিতত্ত্ববিদ ও পশুপ্রেমীরা সমবেতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বুঝাইতে সক্ষম হন যে মানুষের প্রাণিহত্যা-পিপাসা, অর্থলোভ এবং বনজঙ্গল কাটিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট করার ফলে জীবজগতের সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হইতেছে এবং ইহা বন্ধ না হইলে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। ইহার ফলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা সুরু হয়।

গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেন এই সাতটি দেশ মিলিয়া 1900 খ্রীষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে আফ্রিকার পশুপাখী ও মৎস্যের সংরক্ষণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 1913 খ্রীষ্টাব্দে বার্ণার শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সমগ্র পৃথিবীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের দরুন প্রস্তাবটি কার্যকরী করিয়া তুলিতে বিলম্ব ঘটে। যাহা হউক 1928 খ্রীষ্টাব্দে ব্রাসেলস শহরে কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দপ্তরটির প্রতিষ্ঠা হয়।

1913 খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে পুনরায় আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনের সুপারিশ অনুযায়ী 1933 খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে যে অধিবেশন হয় উহাতে প্রথমোক্ত সাতটি দেশ ছাড়াও মিশর, সুদান ও আবিসিনিয়া যোগ দেয়। ঐ অধিবেশনে আফ্রিকার সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী রক্ষাকল্পে একটি চুক্তিপত্র গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হয়।

1948 খৃষ্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অব নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস (International Union for the Conservation of Nature and Natural resources—IUCN) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। 33টি দেশ ইহাতে অংশগ্রহণ করে। সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণমূলক শিক্ষাসূচী নির্ণয়ন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সহিত মানুষের ভবিষ্যৎ যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এই উপলব্ধির জন্য 1961 খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (World Wild Life Fund—WWF) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের মরগেস (Morges) শহরে। বিশ্বের সর্বত্র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য ও পরামর্শদান এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই সংগঠন মূলতঃ নিম্নোক্ত কাজ করে :

a. অর্থসংগ্রহ।

b. বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

c. বিভিন্ন দেশের অবলুপ্তির মুখোমুখি প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য অর্থানুকুল্য ও বিশেষজ্ঞ প্রেরণ।

d. বন্যপ্রাণীর উপযোগিতা প্রচার ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে জনমত সংগঠন এবং জনশিক্ষা।

e. চোর, শিকারীদের হাত হইতে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য জঙ্গলরক্ষীদের প্রশিক্ষণ, উন্নত যানবাহন ও যন্ত্রাদির বন্দোবস্ত করা।

ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের প্রেসিডেণ্ট হলান্ডের প্রিন্স বার্ণাডের উক্তি অনুসারে সংগঠনটি গঠনের উদ্দেশ্য অনেকটা নোয়ার আর্ক (Noah's arc) সৃষ্টির ন্যায়। বন্যপ্রাণীদের অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করার ইহা একটি বিলম্বিত অথচ সার্থক প্রচেষ্টা।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিদরা মনে করেন WWF বন্যপ্রাণীদের জন্য একটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ন্যায় (A kind of United Nations for Conservation)। ইহার প্রধান কাজ অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অবলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সংরক্ষণ। ইহাদের তত্বাবধানে বর্তমানে 77টি দেশে ৪40টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্পে কাজ চলিতেছে।

জাতীয় পর্যায়ে ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রচেষ্টা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ধ্যানধারণার সুরু হয়। সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপের পরিচয় ঐ সময় হইতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (300 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জঙ্গল হইতে অবিবেচকের ন্যায় কাঠ সংগ্রহ, বন্যপ্রাণী হত্যা বা বন্যপ্রাণীজ বস্তুর অপরিমিত সংগ্রহ নিষিদ্ধ করার কথা ইহাতে উল্লেখিত আছে। সম্রাট অশোক নির্মিত পঞ্চম স্তম্ভে বন্যপ্রাণী, পাখী, মাছ এবং বৃক্ষ সংরক্ষণের কথা ঘোষিত আছে। কিন্তু ইহার পর হইতে ভারতবর্ষে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর কোন গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই।

এই শতাব্দীর প্রথমভাগে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি লওয়ার প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে দেখা যায়। 1935 খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তৎকালীন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিদের নির্দেশানুসারে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা যোগদান করে। ঐ সম্মেলনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সর্বভারতীয় একটি চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু সেই অনুযায়ী কোন কাজ হয় নাই।

স্বাধীনতার পর 1952 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথমে ভারতীয় পক্ষী সংরক্ষণ সমিতি ও পরে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ গঠিত হয়। এই পর্ষদের উপদেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক বন্যপ্রাণী পর্ষদ স্থাপিত হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ প্রাদেশিক পর্ষদগুলিকে কেবলমাত্র পরামর্শ প্রদান করে কিন্তু প্রাদেশিক পর্ষদগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকে। পশ্চিমবঙ্গ বন্যপ্রাণী পর্ষদ 1955 খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রাণীদের সংরক্ষণ বর্তমান মুহূর্তে প্রয়োজন :

1. মেরু ভল্লুক (Polar bear), 2. নীল-তিমি (Blue whale), 3. লাল নেকড়ে (Red wolf), 4. ওরাং ওটাং (Orang utan), 5. স্পাইডার মঙ্কি (Spider monkey), 6. গণ্ডার (Rhinoceros), 7. বৃহদাকার কচ্ছপ (Giant tortoise), 8. ইউরোপের সামুদ্রিক ঈগল (European sea eagle), 9. ক্যালিফোরনিয়ার কণ্ডর (Californian condor), 10. আরব দেশের অরিক্স (Arabian oryx), 11. ফার সীল (Fur seal), 12. পেঙ্গুইন (Penguin) এবং 13. করমোরেণ্ট (Cormorant)।

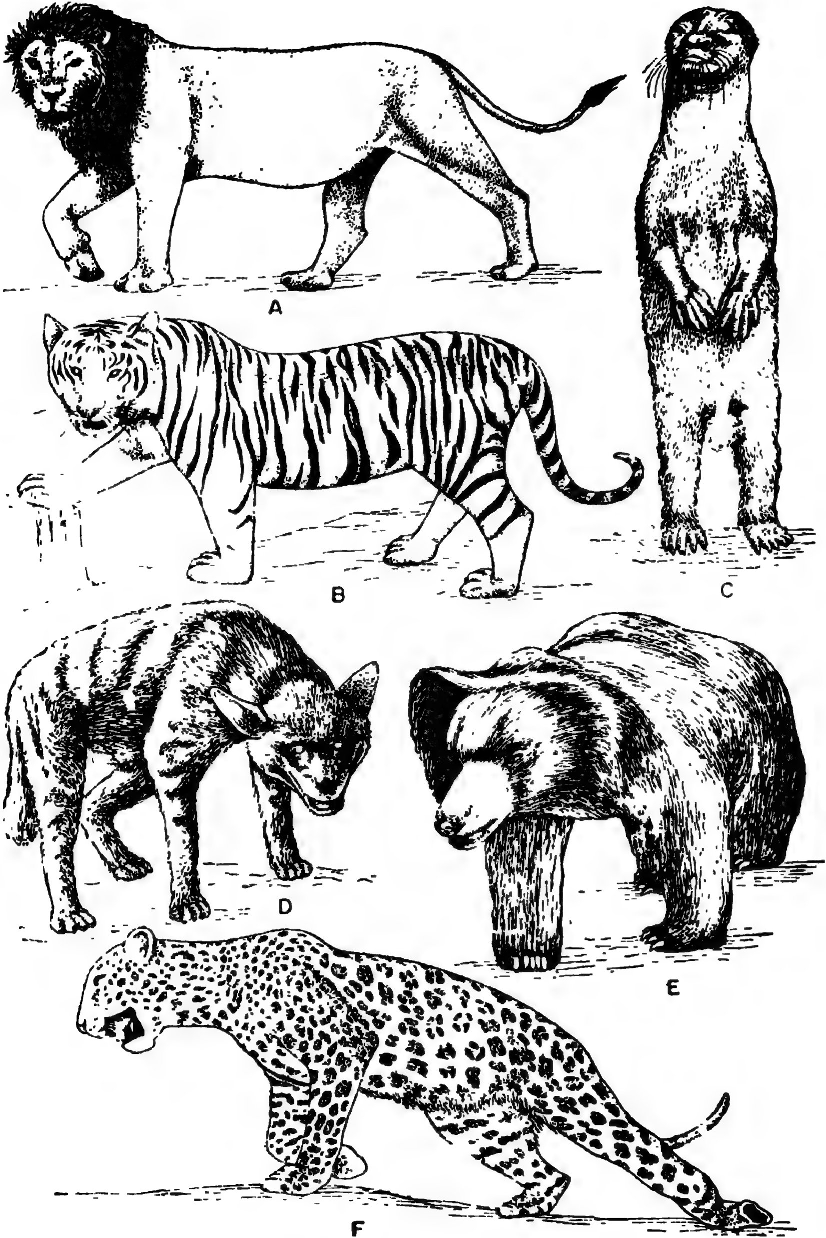
ভারতে যে সমস্ত বন্যপ্রাণী অবলুপ্তির পথে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল (চিত্র 21.8 হইতে 21.11)

a. স্তন্যপায়ী

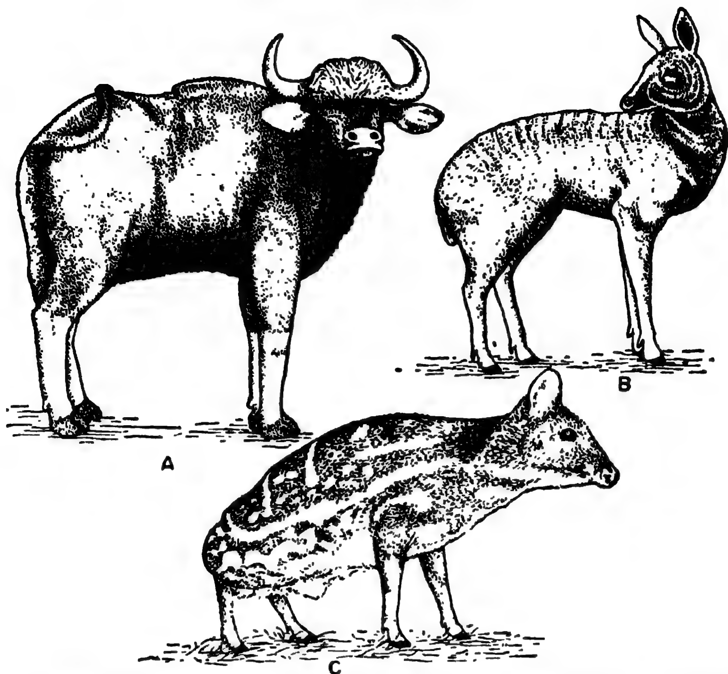
1. উল্লুক (Hoolock—*Hylobates hoolock*), 2. সিংহের ন্যায় লেজ বিশিষ্ট হনুমান (Lion-tailed macaque—*Macaca silenus*), 3. নীলগিরি হনুমান (Nilgiri langur—*Presbytis johni*), 4. টুপীপরা হনুমান (Capped langur—*Presbytis pileatus*), 5. সোনালী হনুমান (Golden langur—*Presbytis geei*), 6. ভারতীয় বাঘ (*Panthera tigris*), 7. এসিয়ার সিংহ (Asian lion—*Panthera leo persica*), 8. চিতাবাঘ (Common leopard—*Panthera pardus*), 9. তুষার চিতাবাঘ (Snow leopard—*Panthera uncia*), 10. মেঘছাপা চিতাবাঘ (Clouded leopard—*Neofelis nebulosa*), 11. সোনালী বিড়াল (Golden cat—*Felis temmincki*), 12. মেছো বিড়াল (Fishing cat—*Felis viverrina*), 13. মরচে রঙা ছোপওয়ালা বিড়াল (Rusty spotted cat—*Felis rubiginosa*), 14. মর্মর বিড়াল (Marbled cat—*Felis marmorata*), 15. লিনক্স (*Felis caracal*), 16. নেকড়ে বাঘ (Wolf—*Canis lupes*), 17. শ্লথ ভালুক (Sloth bear—*Melursus urcinus*). 18. পাণ্ডা (Red panda—*Cilursus fulgens*), 19. ভারতীয় বুনোগাধা (Indian wild ass—*Equus hemionus*). 20. ভারতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডার (Indian one-horned rhinoceros—*Rhinoceros unicornis*), 21. বন্য মহিষ (Wild buffalo—*Bubalus bubalis*). 22. ভরাল (Bharal—*Pseudois nayaur*), 23. আইবেক্স (Indian ibex—*Capra ibex*), 24. চিনকারা (Indian gazelle—*Gazella gazella*), 25. কৃষ্ণসার (Black buck—*Antelope cervicapra*), 26. কাশ্মিরী হরিণ (Hangul—*Cervus elephus hanglu*), 27. বাদামী শিং হরিণ (Thamin—*Cervus eldi*), 28. জলার হরিণ (Swamp deer—*Cervus duvaucelli*). 29. কস্তুরী হরিণ (Musk deer—*Moschus moschiferus*), 30. বামন বরাহ (Pigmy hog—*Sus salvanius*), এবং 31. বনরুই বা বজ্রকীট (Pangolin—*Manis crarsicaudata*)।

b. পাখী

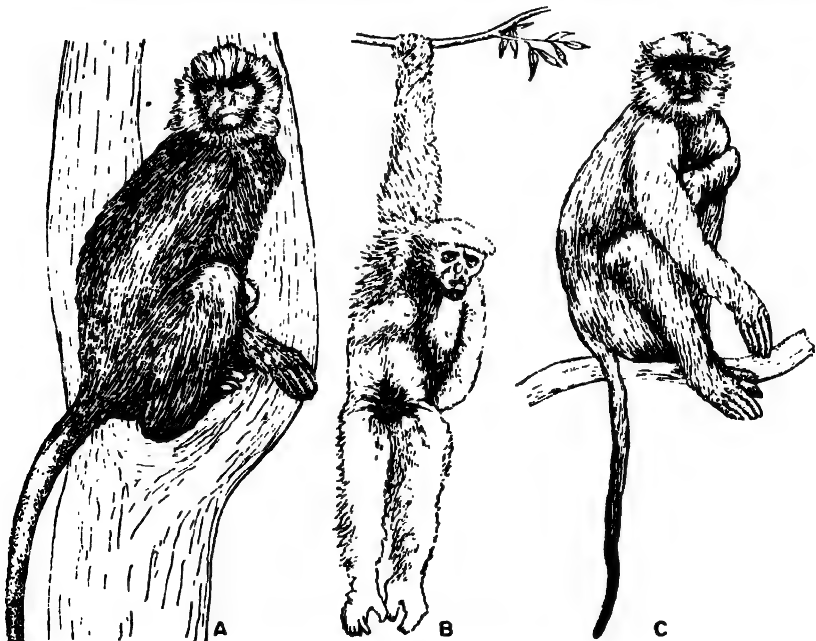
1. ফ্লোরিক্যান (Florican—*Eupodotis bengalensis*), 2. কালো গলা সারস (Black necked crane—*Grus nigriocollis*), 3. রক্তাভ ফেসেন্ট (Blood phaesants—*Ithagenis cruentus tibetanas*), 4. ঈগল (Eagle—*Accipeter gentiles*), 5. বাস্টার্ড (Great Indian Bustard—*Chorotis*



চিঃ 21.7 অবলুপ্তির সম্মুখীন ভারতীয় বন্যপ্রাণী (A) সিংহ, (B) বাঘ, (C) ভোঁদড়, (D) দাগযুক্ত হায়েনা, (E) শ্লথ ভল্লুক, (F) চিতাবাঘ।



চিত্র 21.8 অবলুপ্তির সম্মুখীন ভারতীয় বন্যপ্রাণী—(A) গৌর, (B) কস্তুরীমৃগ, (C) মাউস ডিয়ার।



চিত্র 21.9 অবলুপ্তির সম্মুখীন ভারতীয় বন্যপ্রাণী (A) নীলগিরি হনুমান, B) উল্লুক, (C) হনুমান।

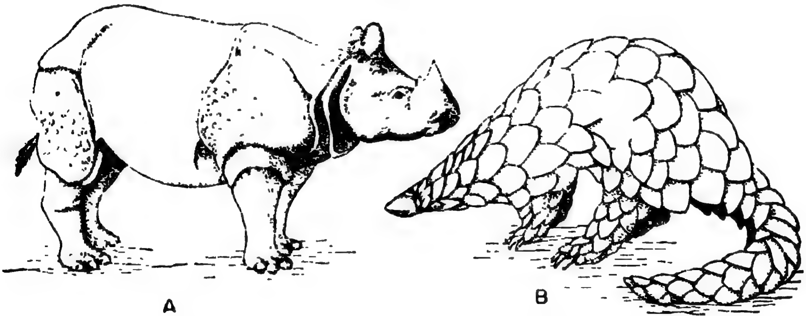
nigriceps), 6. সারস (Hooded crane—*Grus monacha*), 7. ট্রাগোপান (*Tragopan melanocephlus*), 8. সাইবেরিয়ার সারস (Sibrerian white crane—*Grus leucogeranus*), 9. অসপ্রে (Osprey—*Pandion haliactus*), 10. স্পার মোরগ (Spur Fowl—*Galloperdix sp.*)।

e. **সরীসৃপ**

1. গোসাপ (Monitor lizard—*Varanus griseus*), 2. রিডলে কচ্ছপ (Atlantic Ridley turtle—*Lepidochelys kempit*), 3. গঙ্গার কচ্ছপ (Ganges soft shelled turtle—*Trionyx gangeticus*), 4. সমুদ্রের কচ্ছপ (Green sea-turtle—*Chelonia mydas*), 5. ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*), 6. কুমীর (*Crocodilus porosus* : *C palustris*), 7. শঙ্খচূড় (Naja), 8. ডিম খাওয়া সাপ (Egg eating snake—*Elachistodon westermanni*)।

সংরক্ষণের উপায়

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রকৃতিবিদরা প্রথমে চিন্তা করিতে সুরু করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের (1914-1918) পর হইতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রচেষ্টা একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করে এবং ক্রমে



চিত্র 21.10 অবলুপ্তির সম্মুখীন ভারতীয় বন্যপ্রাণী—(A) গণ্ডার, (B) বনরুই বা পিপীলিকাভুক।

আরো তীব্রতর আকার ধারণ করিয়া আন্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সকল দেশই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সকল দেশই বর্তমানে তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়াছে—সেগুলি হইল A. জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, B. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন প্রতিষ্ঠা এবং C. জনশিক্ষা।

A. জাতীয় উদ্যান

বন্যপ্রাণীদের নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েকটি জাতীয় উদ্যান (National Park) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমেরিকা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমেরিকায় 1872 খ্রীষ্টাব্দে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক (Yellowstone National Park) প্রতিষ্ঠা হয়। আইন করিয়া জাতীয় উদ্যানে গাছ কাটা বা প্রাণী হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। পর্যটক আকর্ষণের জন্য ও চিত্তবিনোদনের জন্য জাতীয় উদ্যানগুলিকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের নানা প্রকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রচেষ্টাটি ফলপ্রসূ হয়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রায় 30টি জাতীয় উদ্যান আছে। ইহাদের সম্মিলিত আয়তন 13,00,000 একর।

আমেরিকায় জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার সাফল্য অন্যান্য দেশকেও জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুগার জাতীয় উদ্যান (Krugar National Park—3000 sq. miles), ট্যাঙ্গানিকার সেরেঙ্গেটি জাতীয় উদ্যান (Sarengati National Park—10,000 sq. miles), কঙ্গোয় অ্যালবার্ট জাতীয় উদ্যান (Albert National Park—5,00,000 sq. acres) গঠিত হয়।

ভারতবর্ষেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জন্য জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা সুরু হয় (চিত্র 21.5)। 1938 খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং জেলার সেনচল, মংপং এ এই জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে জলপাইগুড়ি জেলার চাপ্‌রামারি (1939) ও জলদাপাড়া (1940) অঞ্চলে জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। 1941 খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরে বেণুগোপাল বন্যপ্রাণী পার্ক এবং 1945 খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে হেলি ন্যাশনাল পার্ক (বর্তমান নাম করবেট ন্যাশনাল পার্ক) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে 48টি জাতীয় উদ্যান আছে।

ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ সংরক্ষণ স্থানগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে :

1. **জাতীয় উদ্যান** (National Park) : ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় উদ্যান বলিতে এমন অঞ্চল বুঝায় যে অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্যপ্রাণী ও ঐতিহাসিক কোন নিদর্শন চিরকালের জন্য সংরক্ষিত। ঐ অঞ্চল এমনভাবে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে যে প্রয়োজন ব্যতীত ঐ অঞ্চলের কোন পরিবর্তন আনা চলিবে না এবং উহাকে উত্তরসূরীদের নিকট অপরিবর্তিত অবস্থায় ন্যস্ত করিতে হইবে।

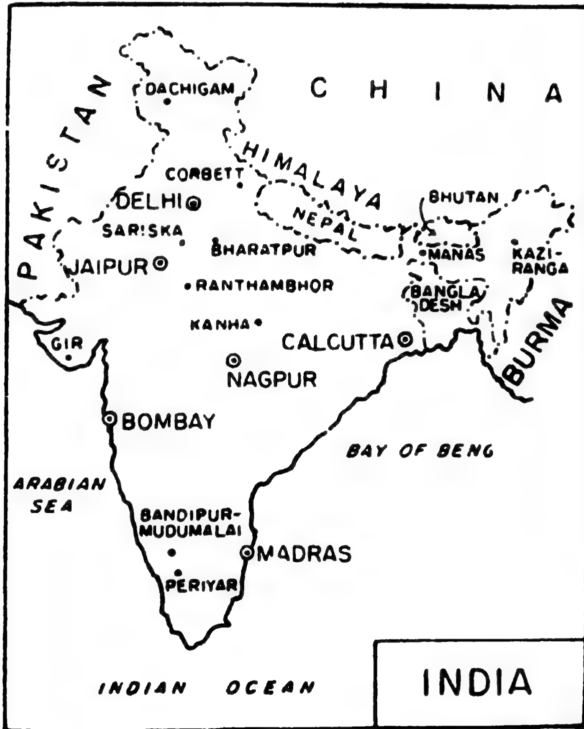
2. **বন্যপ্রাণী স্যাংচুয়ারি বা নিবাস** (Wild life sanctuary) : উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এমন অঞ্চল যেখানে বন্যপ্রাণী হত্যা, শিকার বা ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

3. **অভয়ারণ্য** (Protected area) : অভয়ারণ্য বলিতে সেই সমস্ত অঞ্চল বুঝায় যেখানে (a) প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ ; (b) অবলুপ্তির সম্মুখীন বন্যপ্রাণীদের

সংরক্ষণের প্রকল্প বর্তমান এবং (c) নগর বা ধর্মস্থানের সন্নিকটে বসবাসকারী বন্য-প্রাণীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

4. **সংরক্ষিত বন** (Reserved forest): সংরক্ষিত বন বলিতে সেই অঞ্চলকে বুঝায় যেখানে ভারতীয় বন আইন (Indian Forest Act) অনুযায়ী প্রাণী শিকার বা গাছ কাটা নিষিদ্ধ।

B. **আইন প্রতিষ্ঠা**: বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সকল দেশই আইন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আইন করিয়া কিছু প্রাণীকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হইয়াছে। সংরক্ষিত প্রাণীগুলির হত্যা নিষিদ্ধ ও হত্যা আইনত দণ্ডনীয় এই কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জাতীয় উদ্যান; অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ; চোরাগোপ্তা শিকার (Poaching) ইত্যাদি বন্ধের জন্য যথেষ্ট সশস্ত্র বনরক্ষী নিয়োগ ইত্যাদি করা হয়।



21.11—বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের জাতীয় উদ্যান মানচিত্র।

C. **জনশিক্ষা**: বন্যপ্রাণী যে জাতীয় সম্পদ, নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করিলে যে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় ইহার প্রচার এবং রেডিও, টেলিভিসন, সিনেমা ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষামূলক আলোচনার সাহায্যে জনশিক্ষা ও জনমত গঠন করা উচিত।

ভারতবর্ষের জাতীয় উদ্যানসমূহ

বন্যপ্রাণীদের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে প্রায় 50 রকমের স্তন্যপায়ী প্রজাতি ও অনেক পক্ষী ও সরীসৃপ প্রজাতি বিলুপ্তির মুখোমুখি অবস্থায় রহিয়াছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 5টি জাতীয় উদ্যান ও 126টি সংরক্ষিত অঞ্চলে গঠন করা হইয়াছে। উহাদের অবস্থান ভারতবর্ষের মানচিত্রে (চিত্র 21.5) দেখান হইয়াছে। উদ্যানগুলির সম্মিলিত আয়তন ভারতবর্ষের ব্যবহারযোগ্য জমির প্রায় 0·6 শতাংশ। জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত অঞ্চল ভারতবর্ষে সমগ্র জঙ্গল অঞ্চলের প্রায় 2·3 শতাংশ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

(A) **জলদাপাড়া**—ভারতীয় গণ্ডার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 1941 খ্রীষ্টাব্দ জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারী (Sanctuary) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠার পিছনে অবিভক্ত বাংলার বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী ও নিসর্গপ্রেমী ই. ও স্যেবেরের (E. O. Shebbeare) অবদান আছে।

পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় জলদাপাড়া অবস্থিত। 36 বর্গমাইল আয়তনের এই স্যাংচুয়ারিটির উত্তরে উত্তরবাংলা ও আসামের মধ্যে সংযোগকারী রেল লাইন আছে। নিকটবর্তী রেল স্টেশন হাসিমারা। তোড়সা নদীর খাতের উভয় পার্শ্বে ইহা অবস্থিত। তোড়সা ছাড়াও হিমালয় হইতে নির্গত অনেক ছোট ছোট নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া নদীর জালক সৃষ্টি করিয়াছে। লম্বা ও বড় বড় ঘাসযুক্ত এই জলা অঞ্চল গণ্ডার সংরক্ষণের পক্ষে আদর্শ। গণ্ডার ছাড়াও এখানে হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, গোর (Gour), সম্বর হরিণ, বুনো শুয়োর, চিতল হরিণ, বাঁকিং হরিণ, হগ হরিণ, বুনো মুরগী ও ময়ূর পাওয়া যায়।

শুভ্র-তুষার কিরীটনী হিমালয় ইহার পশ্চাৎপটে থাকায় স্থানটি সৌন্দর্যময়। পর্যটকদের থাকার সুবন্দোবস্ত এখানে আছে।

(B) **করবেট ন্যাশানাল পার্ক**—করবেট ন্যাশানাল পার্ক ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় উদ্যান। 1935 খ্রীষ্টাব্দে হেলী ন্যাশানাল পার্ক নামে ইহার সূচনা হয়। 1957 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত শিকারী ও পশুপ্রেমী জিম করবেটের স্মৃতি রক্ষার্থে হেলী ন্যাশনাল পার্কের নাম পরিবর্তন করিয়া করবেট ন্যাশানাল পার্ক নাম রাখা হয়।

উত্তরপ্রদেশের দুন অঞ্চলে ও হিমালয়ের পাদদেশে পার্কটি অবস্থিত। হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত রামগঙ্গা নদীর পশ্চিম হইতে দক্ষিণে প্রসারিত একটি বাঁকের মধ্যবর্তী 125 বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া ইহা অবস্থিত। রামনগর ও হালদোয়ানী নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন। লম্বা বড় বড় ঘাস ও মাঝে মাঝে শাল, শিমুল প্রভৃতি গাছ এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

মূলতঃ বাঘের জন্য সংরক্ষিত হইলেও করবেট ন্যাশানাল পার্কে হাতি, চিতাবাঘ, কালো ভাল্লুক, হায়েনা, বুনো কুকুর, বুনো শুয়োর, সম্বর, চিতল, সজারু পাওয়া যায়। নানা ধরনের পাখী ও নদীতে ঘড়িয়াল ও কুমীর আছে।

পর্যটকদের থাকার ও পার্ক পরিদর্শনের সুব্যবস্থা আছে। নভেম্বর হইতে মে মাস ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

(C) **বান্দিপুর**—পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকে মহীশূরে বান্দিপুর অবস্থিত। 1941 খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন মহীশূরের মহারাজা মৃগয়ার জন্য বান্দিপুর সংরক্ষিত করেন। ইহা মধ্যস্থলের 22 বর্গ মাইল আয়তনবিশিষ্ট অঞ্চল বর্তমানের সংরক্ষিত বান্দিপুর। মহীশূর হইতে 50 মাইল দূরে মহীশূর উতকামণ্ড পথের ধারে ইহা অবস্থিত।

বান্দিপুরে বৃষ্টির পরিমাণ কম এবং এখানকার জঙ্গল পর্ণমোচী বৃক্ষ লইয়া গঠিত। বসন্তকালে এখানে ফুলের সমারোহ দেখা যায়। যথেষ্ট সংখ্যক জল-স্থানের (Water place) অভাবে বন্যপ্রাণী বিস্তার এই অঞ্চলের সর্বব্যাপী নহে।

গৌর এখানকার প্রধান বাসিন্দা। ইহা ছাড়াও হাতী, চিতাবাঘ, চিতল, বুনো কুকুর, শ্লথ ভল্লুক (Sloth bear), বুনো শুয়োর, সম্বর, চৌশিঙ্গা হরিণ এখানে পাওয়া যায়।

পর্যটকদের জন্য এখানে সুব্যবস্থা আছে। বছরের যে কোন সময়ে এখানে আসা যায়।

(D) **গির**—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও গুজরাট প্রদেশে গির অবস্থিত। সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ইহার সূচনা হয়। 1967 খ্রীষ্টাব্দের পর ইহাকে স্যাংচুয়ারিতে উন্নীত করা হয়। আয়তনে 50 বর্গ মাইল এই অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক। পর্ণমোচী টিক (Teak) গাছ ও স্থানে স্থানে বাবলা গাছের উপস্থিতি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় সিংহের (*Panthera leo persica*) শেষ জীবিত কয়েকটি প্রতিভূর (প্রায় 200) উপস্থিতি এই জঙ্গলকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়াছে। সিংহ ছাড়াও এখানে সম্বর, নীলগাই, চিতল, বুনো শুয়োর পাওয়া যায়।

জুনাগড় হইতে রেলযোগে এখানে আসা যায়। ডিসেম্বর হইতে জুন মাস এখানে আসিবার উপযুক্ত সময়।

(E) **সুন্দরবন**—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনায় এক বিস্তীর্ণ ও অখণ্ড জলা জঙ্গল লইয়া সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠিত হইয়াছে। সুন্দরবন সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট একটি বিশাল ব-দ্বীপ। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন তিন হইতে পাঁচ হাজার বছর আগে বর্তমানের সুন্দরবন অঞ্চল জলের তলায় ছিল। গঙ্গা নদীর ভাগীরথী হইতে ভৈরব এবং পরে পদ্মার দিকে প্রবাহ পথ পরিবর্তনের ফলে এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটি অতি দ্রুত গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় ভাগের (সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চল) সুন্দরবনের আয়তন প্রায় 1,630 বর্গমাইল। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে নদী ও উত্তর পশ্চিমে আবাদজমি দ্বারা অঞ্চলটি বেষ্টিত। সংরক্ষিত অঞ্চলটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় 66 মাইল লম্বা, চওড়ায় ইহা 44 মাইল—যদিও স্থানে স্থানে ইহা 1 হইতে

1·5 মাইল চওড়া। অসংখ্য নদী ও খাড়ি মাকড়সার জালের মত অঞ্চলটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

লবণাম্বুজলের সুন্দরী, গরাণ প্রভৃতি গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল এই স্থানের বৈশিষ্ট্য। ম্যালেরিয়ার আধিক্য এবং স্বল্প বসতিযুক্ত এই সংরক্ষিত অঞ্চলে বহু বৈচিত্র্যময় বন্যপ্রাণী পাওয়া যায়।

রয়াল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger), বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বুনো শুয়োর, বাঁদর, অনেক প্রজাতির বিষধর সাপ, (যথা : গোখরো, কেউটে, শাখামুটি, ময়াল সাপ), কুমীর, গোসাপ ও পেরিঅপথ্যালমাস, (Periopthalmus), বোলিওপথ্যালমাস (Boliophthalmus) প্রভৃতি মাছ এখানে পাওয়া যায়। এক সময়ে এখানে গণ্ডার পাওয়া যাইত।

সমগ্র সুন্দরবনই সংরক্ষিত বলিয়া পরিগণিত তবে ইহার কিছু কিছু অংশ বিশেষভাবে সংরক্ষিত। সুন্দরবনের কয়েকটি বিশেষভাবে সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল—

(1) ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল—WWF-এর সহযোগিতায় ও আনুকুল্যে ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য ভারতে যে নয়টি স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। 119টি ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া এবং সম্মিলিত ভাবে 2,585 বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। সমগ্র বসিরহাট মহকুমাভুক্ত এই অঞ্চলটিকে 15টি ব্লকে (Block) ভাগ করা হইয়াছে। অঞ্চলটিকে দুইটি সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : (a) ওয়াইলডারনেস ভাগ (Wilderness Zone)—বিস্তার 1,330 বর্গ কিলোমিটার। মায়াদ্বীপ, ছোটোহারদি, গোসাবা, গোনা, মাতলা, চেমটা, বাগবারা প্রভৃতি অঞ্চলের বনভূমি ইহার অন্তর্গত। চেমটা ব্লকের 125 বর্গ কিলোমিটার আদি বা কেন্দ্রীয় (Primitive or Central) সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হয়। (b) বাফার ভাগ (Buffer Zone)—ওয়াইলডারনেস ভাগের পূর্ব ও উত্তর বাফার ভাগ রূপে গণ্য।

(2) সজনাখালি—সজনাখালি পক্ষীর জন্য সংরক্ষিত। ইহার আয়তন 142 বর্গমাইল। এখানে পেলিক্যান, করমোরেণ্ট, ডার্টার (Darter), আইবিস, কালগলাযুক্ত স্টর্ক (Black-necked stork), বক প্রভৃতি পাখী প্রচুর সংখ্যায় বাসা বাঁধিয়া থাকে। কলিকাতা ও ক্যানিং হইতে সরাসরি সজনাখালি যাওয়া যায়।

(3) হ্যালিডে আইল্যাণ্ড (Halliday island)—ব-দ্বীপাকার সুন্দরবনের একেবারে প্রান্তে হ্যালিডে আইল্যাণ্ড অবস্থিত। আয়তনে ইহা প্রায় 2·5 বর্গমাইল। অল্প সংখ্যক বাঘ, চিতল হরিণ ও বুনো শুয়োর এখানে পাওয়া যায়।

(4) লোথিয়ান আইল্যাণ্ড (Lothian island)—ব-দ্বীপাকার সুন্দরবনের আর এক প্রান্তে লোথিয়ান আইল্যাণ্ড অবস্থিত। ইহার আয়তন 1·5 বর্গমাইল। কিছু বাঘ, চিতল হরিণ ও বুনো শুয়োর এখানে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

জৈব রসায়ন

রাসায়নিক শিল্পের মানদণ্ডে প্রতি জীবিত কোষ একটি ক্ষুদ্র অথচ সদা কর্মরত রাসায়নিক কারখানার সমতুল্য। স্বীয় বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন এবং সর্বোপরি গৃহীত খাদ্যবস্তুর জৈব রসায়নিক পরিবর্তন কোষের তথা জীবিত বস্তুর দেহমধ্যে সংঘটিত হয়।

বর্তমান অধ্যায়ে কয়েকটি মুখ্য জৈব রসায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ—22

পরিপাক (Digestion)

22.1 খাদ্য ও পরিপাক

মানুষের দেহের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ, কলাসমূহের ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের (Food) প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—

I. **প্রক্সিমেট প্রিন্সিপল অফ্ ফুড** (Proximate principles of food) : কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট।

II. **প্রোটেক্‌টিভ প্রিন্সিপল অফ্ ফুড** (Protective principles of food) : ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল।

খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট প্রধানতঃ পৌষ্টিক নালীর মধ্যে ক্ষরিত পাচক রসের উৎসেচকগুলির শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ফলে ক্ষুদ্রতর, সহজদ্রাব্য ও সরল অণুতে পরিণত হয়। উৎসেচক ছাড়াও পাচক রসের অপর কয়েকটি উপাদান খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অবস্থিত গ্রন্থি হইতে পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে পাচক রস নিঃসৃত হয়। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জলের পরিপাকের প্রয়োজন হয় না।

22.2 মুখবিবরে খাদ্যের পরিপাক (Digestion of food in Mouth Cavity)

জিহ্বা ও চোয়ালের সঞ্চালনে খাদ্য দন্তের দ্বারা কর্তিত ও পিষ্ট হয় এবং লালাগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লালার (Saliva) সহিত মিশ্রিত হয়। লালাগ্রন্থিতে দুই প্রকার কোষ দেখিতে পাওয়া যায়—(i) **সেরাস কোষ** (Serous cells) হইতে মূলত উৎসেচক এবং (ii) **মিউকাস কোষ** (Mucous cells) হইতে মূলতঃ শ্লেষ্মা (Mucin) ক্ষরিত হয়।

লালার উপাদান (Composition of Saliva) : লালা প্রশমিত অথবা ঈষৎ ক্ষার বা অম্লধর্মী, বর্ণহীন, সান্দ্র ও জলীয় রস। ইহাতে 99·5% জল, 0·2% সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি ধাতু ঘটিত ক্লোরাইড বা বাই-কার্বোনেট প্রভৃতি অজৈব লবণ এবং 0·3% জৈব উপাদান—যথা : টায়ালিন (Ptyalin), শ্লেষ্মা (Mucin), ইউরিয়া (Urea), লাইসোজাইম (Lysozyme), ক্যালিক্রিণ (Kallikrein) ইত্যাদি থাকে। লালার pH 6·02—7·05 এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·002—1·012।

লালার কার্যাবলী (Functions of Saliva)

লালার অনেকগুলি কার্যের মধ্যে উল্লেখ্য কার্যাগুলি হইল : (i) লালার শ্লেষ্মা খাদ্যকে পিচ্ছিল করিয়া গলাধঃকরণে সাহায্য করে। শ্লেষ্মা গ্লাইকোপ্রোটিন হওয়ায় বাফার (Buffer) হিসাবে কাজ করে। (ii) ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতে ও কিঞ্চিৎ আম্লিক পরিবেশে লালার শ্বেতসার-বিশ্লেষী এনজাইম—টায়ালিন (Ptyalin) খাদ্যের গ্লাইকোজেন ও শ্বেতসারের জল-বিশ্লেষ ঘটাইয়া ডেক্সট্রিন, মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজে পরিণত করে। টায়ালিনের প্রভাব পাকস্থলীতে বহুক্ষণ থাকে। ক্রমে পাকস্থলীর গাত্র হইতে নিঃসৃত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড টায়ালিনকে নিষ্ক্রিয় করে। (iii) লালায় উপস্থিত লাইসোজাইম (Lysozyme) নামক এন্‌জাইম খাদ্যের সহিত আগত ব্যাক্‌টিরিয়ার কোষপ্রাচীরের কার্বোহাইড্রেটকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া উহাদের বিনষ্ট করে ; (iv) লালার জল খাদ্যকে দ্রবীভূত করিয়া টায়ালিনের ক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং আস্বাদন অনুভূতিতে সহায়তা করে। লালা মুখ ও জিহ্বাকে সিক্ত রাখিয়া কথা বলায় সাহায্য করে এবং মুখবিবরকে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখে। লালায় উপস্থিত থায়োসায়ানেট (Thiocyanate) এবং প্রোটিন বিশ্লেষী উৎসেচক ব্যাকিটরিয়া ধ্বংস করে। লালায় উপস্থিত প্রোটিন অ্যান্টিবডি মুখে বসবাসকারী কেরিস ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করে। লালার ক্ষরণ কম হইলে (Xerostomia) দাঁতের ক্যারিস এবং মুখগহ্বরের রোগ বৃদ্ধি পায়। (v) লালায় অল্প পরিমাণ ইউরিয়া, গন্ধক যৌগ থাকায় উহা রেচনক্রিয়ায় সাহায্য করে।

22.3 পাকস্থলী গহ্বরে খাদ্যের পরিপাক (Digestion of food in Stomach cavity)

খাদ্য বস্তুর পরিপাক ক্রিয়ায় গলবিল (Pharynx) এবং অন্ননালীর (Oesophagus) তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই। চর্বিত ও পিষ্ট খাদ্য অন্ননালী গহ্বরে প্রবেশ করিলে ইহার ক্রম-সংকোচনের ফলে খাদ্যপিণ্ড নিম্নমুখী হইয়া পাকস্থলী গহ্বরে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রে অসংখ্য সরল নলাকার গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থিগুলির মুখ পাকস্থলীর গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রে পেপ্‌টিক কোষ (Peptic cells), শ্লৈষ্মিক কোষ (Mucous cells) এবং প্যারায়েটাল কোষ (Parietal or Oxyntic cells) থাকে। পেপ্‌টিক কোষ হইতে এন্‌জাইম পেপসিনোজেন, শ্লৈষ্মিক কোষ হইতে শ্লেষ্মা এবং প্যারায়েটাল কোষ হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ক্যাস্‌ল বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান (Castle's Intrinsic factor) ক্ষরিত হয়। পাকস্থলী হইতে ক্ষরিত রসকে পাকস্থলী-রস (Gastric juice) বলে।

পাকস্থলী-রসের উপাদান

পাকস্থলী-রস তীব্র অম্লধর্মী (pH 0·9—1·5) এবং পীতাভ। ইহাতে প্রায় 99·3% জল, 0·3% জৈব পদার্থ, 0·3% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং 0·16% অজৈব

লবণ থাকে। অজৈব লবণের মধ্যে উল্লেখ্য সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি এবং জৈব পদার্থের মধ্যে পেপ্‌সিন (Pepsin)। বাছুরের পাকস্থলী-রসের নিষ্ক্রিয় প্রো-রেনিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় সক্রিয় রেনিনে পরিণত হয়। ঈষৎ অম্লধর্মী পরিবেশে রেনিন দুধের প্রোটিন (কেসিন)-এর জলবিশ্লেষ ঘটাইয়া প্যারাকেসিন উৎপন্ন করে। প্যারাকেসিন ক্যালসিয়ামের সহিত মিলিত হইয়া ছানায় পরিণত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে রেনিন অনুপস্থিত। জৈব পদার্থের মধ্যে পেপসিন (Pepsin), রেনিন বা কাইমোসিন (Renin or Chymosin), লাইপেজ (Lipase), ক্যাসল্‌-বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান (Castle's intrinsic factor) এবং শ্লেষ্মা প্রভৃতি প্রধান। ইহা ছাড়াও স্বল্প পরিমাণে অ্যামাইলেজ (Amylase), গ্যাস্ট্রিসিন (Gastricin), ক্যাথেপসিন (Cathepsin) থাকে। সম্প্রতি পাকস্থলী রসে গ্যাসট্রিক ইনহিবিটরী পেপটাইড (G I P.) নামক হরমোনের উপস্থিতি প্রমাণিত হইয়াছে।

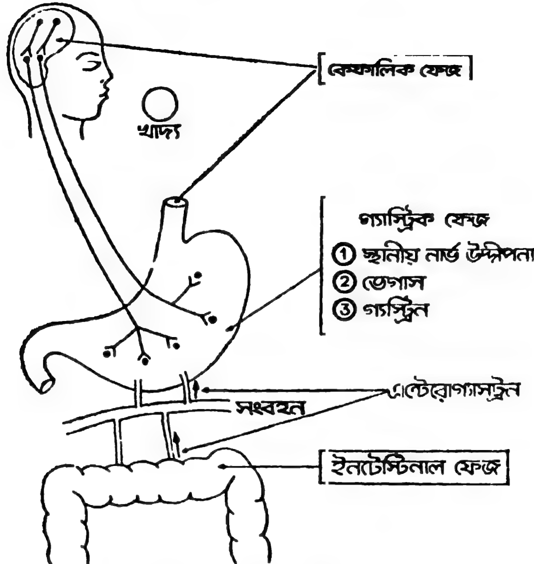
পাকস্থলী-রসের ক্ষরণের বিভিন্ন পর্যায়

খাদ্যবস্তুর গন্ধ ও স্বাদের প্রভাবে জিহ্বা ও নাসিকার গ্রাহকগুলি উদ্দীপিত হয়। গ্রাহকগুলি হইতে সৃষ্ট নার্ভীয় বিভব প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম ও নবম করোটিক নার্ভের মাধ্যমে মেডালা অবলংগাটায় পৌঁছায়। মেডালা অবলংগাটা হইতে দশম করোটিক নার্ভের মাধ্যমে নার্ভীয় বিভব পাকস্থলীতে পৌঁছায় এবং ভোজন আরম্ভের পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাকস্থলী-রস ক্ষরণ আরম্ভ হয়। ক্ষরণ প্রায় ত্রিশ মিনিট চলে। ইহাকে পাকস্থলী-রস ক্ষরণের কেফালিক ফেজ (Cephalic phase) বলে। কেফালিক ফেজে পাকস্থলী-রসের ক্ষরণের পরিমাণ ঘণ্টায় 500 ml এবং ক্ষরণকাল পরবর্তী ফেজের তুলনায় স্বল্প। এই ফেজের রসে পেপসিনোজেন (Pepsinogen) পরিমাণে বেশী থাকে।

পাকস্থলীতে আসা খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) নামক হরমোন রক্তে ক্ষরিত হয় এবং উহা পাকস্থলী গ্রন্থি-সমূহকে উদ্দীপিত করে। আহারের আধ ঘণ্টা পর হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে পাকস্থলী-রসের ক্ষরণ চলে। এই পর্যায়কে গ্যাস্ট্রিক ফেজ (Gastric phase) বলে (চিত্র 22.1)। গ্যাসট্রিনের উদ্দীপনায় ক্ষরিত পাকস্থলী রসে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী। এই পর্যায়ে ঘণ্টা প্রতি 200 ml রস ক্ষরিত হয়। গ্যাসট্রিনের প্রভাব অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

পাকস্থলী হইতে অর্ধজীর্ণ ও অর্ধতরল খাদ্যবস্তু (খাদ্যমণ্ড = Chyme) ডিওডিনাম গহ্বরে পৌঁছাইলে ইহার সংস্পর্শে ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে নিঃসৃত সিক্রিটিন (Secretin), কোলিসিস্টোকাইনিন (Cholesystokynin), এন্টেরোগ্যাসট্রোন (Enterogastrone) প্রভৃতি স্থানীয় হরমোন পাকস্থলী-রসের

ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই দশাকে ইনটেস্টিনাল ফেজ (Intestinal phase) বলে। এন্টেরোগ্যাসট্রোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাকস্থলী-রস ক্ষরণকে এন্টেরোগ্যাসট্রিক রিফ্লেক্স (Enterogastric reflex) বলে।



চিত্র 22.1 পাকস্থলী রস ক্ষরণের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্ররূপ।

পাকস্থলী-রসের কার্যাবলী

পাকস্থলী-রসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলী-রসের পেপ্‌সিন ও রেনিন নামক এন্‌জাইমগুলিকে সক্রিয় করে এবং পাকস্থলী গহ্বরকে আম্লিক রাখিয়া পেপ্‌সিনের ক্রিয়ায় সহায়তা করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের সহিত আগত রোগজীবাণু বিনাশ করে এবং খাদ্যের সুক্রোজকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ফ্রুক্‌টোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করে।

পাকস্থলী-রসে ক্ষরিত নিষ্ক্রিয় পেপ্‌সিনোজেন (Pepsinogen) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় সক্রিয় পেপ্‌সিনে (Pepsin) পরিণত হয়। তীব্র আম্লিক পরিবেশে পেপ্‌সিন—(i) প্রোটিনকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া প্রোটিওস (Proteose) ও পেপ্‌টোনে (Peptone) পরিণত করে, (ii) দুধের কেসিনকে ছানায় পরিবর্তিত করে এবং ছানার জলবিশ্লেষ ঘটায়।

খাদ্যে উপস্থিত ভিটামিন B_{12} ক্যাস্‌ল্‌-বর্ণিত আভ্যন্তরীণ উপাদানের সাহায্যে শোষিত হয়। উক্ত এন্‌জাইমের ক্ষরণ বিঘ্নিত হইলে ভিটামিন B_{12} অভাবজনিত রক্তাল্পতা রোগ হয়। পাকস্থলী গহ্বরে ফ্যাট পরিপাককারী উৎসেচক লাইপেজ (Lipase)-এর ক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা নাই।

পাকস্থলী-রসের শ্লেষ্মা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়াকে প্রশমিত করে এবং পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে আবৃত রাখিয়া উহাকে অ্যাসিডের ক্রিয়া হইতে রক্ষা করে। ফলে পাকস্থলী-রসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলীকে পরিপাক করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও পাকস্থলী রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের pH 2 হইলে গ্যাসট্রিনের প্রভাবে নূতন করিয়া অ্যাসিড ক্ষরণ হইতে পারে না। এইভাবে পাকস্থলী ক্ষত (Ulcer) রোধ হয়।

22.4 ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পরিপাক (Digestion of food in Small Intestine)

পাকস্থলী গহ্বরে খাদ্যের প্রায় চারি ঘণ্টাব্যাপী অবস্থানকালে পাকস্থলী গাত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্য দলিত, পিষ্ট, অর্ধজীর্ণ, অর্ধতরল খাদ্যমণ্ডে (Chyme) পরিণত হয় এবং পাকস্থলীর পাইলোরিক অংশে পরিবাহিত হয়। পাইলোরিক অংশে ক্রমসংকোচ তরঙ্গের প্রভাবে মাঝে মাঝে পাইলোরিক পেশীবলয় শিথিল হয় এবং খাদ্যমণ্ড ডিওডিনাম গহ্বরে প্রবেশ করে। ডিওডিনাম গহ্বরে খাদ্যমণ্ড অগ্ন্যাশয়-রস, পিত্ত ও আন্ত্রিক-রসের সংস্পর্শে আসে এবং উহাদের সম্মিলিত প্রভাবে পাচিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়।

অগ্ন্যাশয়-রস (Pancreatic juice)

অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি। ইহার বহিঃক্ষরা রসক্ষরণকারী থলির (Pancreatic acini) সেরাস কোষ হইতে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয় এবং নালীর মধ্য দিয়া উক্ত রস ডিওডিনাম গহ্বরে পড়ে। অগ্ন্যাশয়ের গাত্রে এবং বহিঃক্ষরা রসক্ষরণকারী থলিগুলির ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত কোষপুঞ্জ থাকে। উক্ত কোষপুঞ্জগুলিকে **আইলেটস অফ ল্যাংগারহ্যানস্** (Islets of Langerhans) বলে এবং ইহারাই অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ। ইহাদের বিটা কোষ (β-cell) হইতে ইনসুলিন (Insulin) এবং আলফা কোষ (α-cell) হইতে গ্লুকাগণ (Glucagon) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। অগ্ন্যাশয়-রস রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্ন্যাশয়-রসের উপাদান

অগ্ন্যাশয়-রস ক্ষারধর্মী। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·010 – 1·030। ইহাতে 98·5% জল, 1% সোডিয়াম ও পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর বাই কার্বোনেট এবং অন্যান্য অজৈব লবণ এবং 0·5% জৈব পদার্থ থাকে। জৈব পদার্থের মধ্যে অনেকগুলি এনজাইম বর্তমান, যথা—ট্রিপ্‌সিন, কাইমোট্রিপ্‌সিন, এণ্টারোকাইনেজ (কার্বক্সি-পেপ্‌টাইডেজ), লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, অ্যামাইলপ্‌সিন, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, রাইবোনিউক্লিয়েজ, ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি।

অগ্ন্যাশয়-রসের কার্যাবলী

অগ্ন্যাশয়-রস পরিপাকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ার ফলে ইহা সমপরিমাণ পাকস্থলী-রসকে প্রশমিত করে। অগ্ন্যাশয়-রসে ক্ষরিত নিষ্ক্রিয় ট্রিপ্‌সিনোজেন (Trypsinogen) ডিওডিনাম গহ্বরে আন্ত্রিক রসের এণ্টেরোকাইনেজ এন্‌জাইমের প্রভাবে সক্রিয় ট্রিপ্‌সিনে (Trypsin) পরিণত হয়। ক্ষারীয় পরিবেশে ট্রিপ্‌সিন—(a) ক্ষারধর্মী প্রোটিনকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া পেপ্‌টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে। (b) অগ্ন্যাশয়-রসের কাইমোট্রিপ্‌সিন ও কার্বক্সিপেপ্‌টাইডেজ নামক এন্‌জাইমগুলিকে সক্রিয় করে। অগ্ন্যাশয়-রসের নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপ্‌সিনোজেন ডিওডিনাম গহ্বরে ট্রিপ্‌সিনের প্রভাবে কাইমোট্রিপ্‌সিনে পরিণত হয়। কাইমোট্রিপ্‌সিন ক্যালসিয়ামের সহায়তায় দুধের কেসিনকে ছানায় (ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেট) এবং অন্যান্য প্রোটিনকে পেপ্‌টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। ট্রিপ্‌সিনের প্রভাবে সক্রিয় কার্বক্সিপেপ্‌- টাইডেজ প্রোটিনের জল বিশ্লেষ ঘটাইয়া পেপ্‌টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

ঈষৎ ক্ষারীয় পরিবেশে এবং ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতে অগ্ন্যাশয়-রসের অ্যামাইলপ্‌সিন (Amylopsin) পলিস্যাকারাইডের জলবিশ্লেষ ঘটাইয়া উহাকে মল্টোজ, গ্লুকোজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। অ্যামাইলপ্‌সিন সেলুলোজ পরিপাকে অক্ষম।

অগ্ন্যাশয়-রসের লাইপেজ বা স্টিয়াপ্‌সিন (Steapsin) পিত্তের সাহায্যে ফ্যাটকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া প্রথমে ডাইগ্লিসেরাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পরে ডাইগ্লিসেরাইডকে ভাঙ্গিয়া মোনোগ্লিসেরাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে। ফস্‌ফোলাইপেজের ক্রিয়ায় ফসফোলিপিড জলবিশ্লিষ্ট হইয়া ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। পিত্তের উপস্থিতিতে কোলেস্টেরল এস্টারেজ কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের যৌগকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ফ্যাটি অ্যাসিডকে মুক্ত করে।

অগ্ন্যাশয়-রসের রাইবোনিউক্লিয়েজ ও ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ যথাক্রমে RNA ও DNA অণুর জলবিশ্লেষ ঘটাইয়া নিউক্লিওটাইডে পরিণত করে। সংক্ষেপে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটকে জীর্ণ করিতে অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আন্ত্রিক-রস (Succus entericus)

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অবস্থিত নলাকার আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands) হইতে আন্ত্রিক-রস নিঃসৃত হয়। খাদ্যমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিলে ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ক্ষরিত এণ্টেরোক্রাইনিন (Enterocrinin) নামক স্থানীয় হরমোন আন্ত্রিক-রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

আন্ত্রিক-রসের উপাদান

ঈষৎ অম্লধর্মী বা ক্ষারধর্মী আন্ত্রিক-রসের pH 6·3—9·0 এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1·010। ইহাতে প্রায় 98·5% জল, 0·7% সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের

ক্লোরাইড ও বাইকার্বনেট (অজৈব লবণ) ইত্যাদি, এবং 0·8% জৈব উপাদান থাকে। জৈব উপাদানের মধ্যে শ্লেষ্মা ও বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক, যথা—এন্টেরোকাইনেজ, অ্যামাইনোপেপ্টাইডেজ, ট্রাইপেপ্টাইডেজ, ডাইপেপ্টাইডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ, নিউক্লিওসাইডেজ, সুক্রেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, লাইপেজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আন্ত্রিক-রসের ক্রিয়া

আন্ত্রিক-রসের উৎসেচকগুলি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পরিপাক সম্পূর্ণ করে। আন্ত্রিক-রসের এন্টেরোকাইনেজ অগ্ন্যাশয়-রসের ট্রিপ্সিনকে সক্রিয় করিয়া তোলে। অ্যামাইনোপেপ্টাইডেজ, ট্রাইপেপ্টাইডেজ ও ডাইপেপ্টাইডেজ প্রোটিনের পরিপাক সম্পূর্ণ করে। অ্যামাইনোপেপ্টাইডেজ পেপ্টাইডের জলবিশ্লেষ ঘটাইয়া ক্ষুদ্রতর পেপ্টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। ট্রাইপেপ্টাইডেজ ট্রাইপেপ্টাইডের জলবিশ্লেষ ঘটাইয়া ডাইপেপ্টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড মুক্ত করে। ডাইপেপ্টাইডেজ ডাইপেপ্টাইডকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

আন্ত্রিক রসের উৎসেচকগুলি কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক সম্পূর্ণ করে। সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ ও মল্টেজ যথাক্রমে সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মল্টোজকে মোনোস্যাকারাইডে পরিণত করে। সুক্রোজ হইতে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ; ল্যাক্টোজ হইতে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ এবং মল্টোজ হইতে দুই অণু গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

পিত্তের সাহায্যে আন্ত্রিক লাইপেজ ফ্যাটকে মোনোগ্লিসেরাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে। নিউক্লিওটাইডেজ ও নিউক্লিওসাইডেজ নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিপাক সম্পূর্ণ করে।

পিত্ত (Bile)

খাদ্যমণ্ড পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে নিঃসৃত কোলিসিস্টোকাইনিন-প্যানক্রিওজাইমিন নামক (CCK-PZ) হরমোন পিত্তথলির সংকোচন ঘটায়; ফলে সঞ্চিত পিত্ত ডিওডিনাম বিবরে প্রবেশ করে। পিত্ত যকৃত হইতে ক্ষরিত হইয়া পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে। পিত্তথলি পিত্তকে আরও ঘন (Concentrated) করিয়া দেয়। হেপাটোক্রাইনিন (Hepatocrinin) নামক হরমোন পিত্ত ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

পিত্তের উপাদান

ক্ষারধর্মী, পীতাভ সবুজ, তিক্ত স্বাদযুক্ত পিত্তে প্রায় 96% জল, 3% জৈব পদার্থ এবং 1% অজৈব পদার্থ থাকে।

অজৈব পদার্থ—সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতুঘটিত বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড, ফসফেট প্রভৃতি লবণ।

জৈব পদার্থ—পিত্ত লবণ (Bile salts) এবং পিত্তরঞ্জক (Bile pigments) ছাড়াও কোলেস্টেরল, লেসিথিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, শ্লেষ্মা প্রভৃতি থাকে।

পিত্তলবণ দুইটি হইল সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (Sodium glycocholate) এবং সোডিয়াম টওরোকোলেট (Sodium taurocholate)। পিত্তরঙ্গক দুইটি হইল বিলিরুবিন (Bilirubin) এবং বিলিভার্ডিন (Biliverdin)।

পিত্তের ক্রিয়া

পিত্তের বহুবিধ কার্যের মধ্যে প্রধান হইল অন্ত্রের ক্ষারধর্মিতা অব্যাহত রাখা ও পরিপাকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা। পিত্তলবণদ্বয় ফ্যাটের পৃষ্ঠটান হ্রাস করে, ফলে ফ্যাটের বৃহৎ কণাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয়। ফ্যাট এই অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্র গহ্বরের জলীয় পরিবেশে অবদ্রবে (Emulsion) পরিণত হয়। লাইপেজ অবদ্রবিত ফ্যাটকে জলবিশ্লিষ্ট করিতে সক্ষম। কোলেস্টেরল পরিপাকে পিত্তলবণগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পিত্তলবণ শক্তিশালী কোলেরেটিক (Choleretic) হিসাবেও কাজ করে। যে বস্তু পিত্ত ক্ষরণের বৃদ্ধি ঘটায়, তাহাকে কোলেরেটিক বলা হয়। এন্টেরোহেপাটিক (Enterohepatic) সংবহনের দ্বারা শোষিত পিত্ত-লবণ নতুন করিয়া পিত্ত অ্যাসিডের নির্মাণ রোধ করে, কিন্তু লবণগুলি নিজেরাই তাৎক্ষণিক ক্ষরিত হইয়া পিত্ত ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। যে বস্তু পিত্তথলির সঙ্কোচন বৃদ্ধি করে, তাহাকে কোলাগগ (Cholagogue) বলা হয়। উদাহরণ--অ্যাসিড, প্রোটিন পরিপাকের বস্তু, ক্যালসিয়াম (Ca^{2+})।

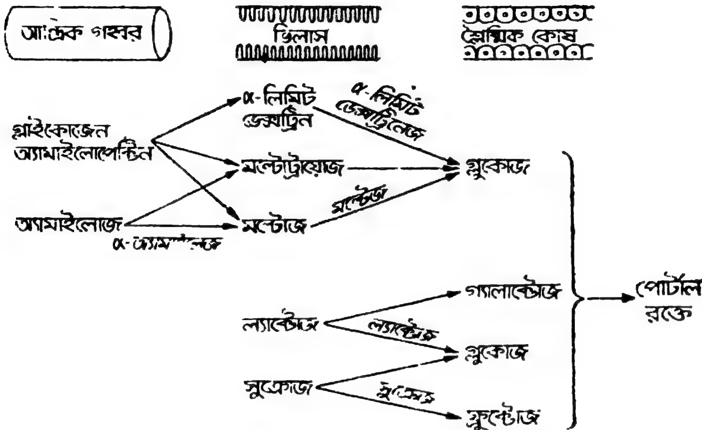
ক্ষুদ্রান্ত্রগাত্রের ক্রমসংকোচ-তরঙ্গ খাদ্যকে বৃহদন্ত্রে বহন করে। বৃহদন্ত্রে কোন পাচক রস নিঃসৃত হয় না। সেইজন্য এখানে কোন পরিপাক ক্রিয়া হয় না। বৃহদন্ত্রে খাদ্যাবশেষ হইতে জল, অজৈব লবণ প্রভৃতি পুনঃশোষিত হয়। জলীয় অংশ পুনঃশোষণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে মল (Faeces) উৎপন্ন হয় এবং মলাশয়ে মল সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। মলাশয়ের সংকোচন-তরঙ্গ ক্রিয়ার ফলে মলত্যাগ সম্ভব হয়।

22.5 কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক (Digestion of Carbohydrate)

পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে কার্বোহাইড্রেজ (Carbohydrases) শ্রেণীর বিভিন্ন উৎসেচকের দ্বারা জলবিশ্লিষ্ট হইয়া পলিস্যাকারাইড ও ডাইস্যাকারাইডগুলি গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাক্টোজ প্রভৃতি মোনোস্যাকারাইডে পরিণত হয় এবং ইহারাই কার্বোহাইড্রেট হইতে প্রধান পরিপাকজাত বস্তু। উদ্ভিদতন্তুর সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ নামক পলিস্যাকারাইড পরিপাক উপযোগী উৎসেচক মানুষের নাই। বৃহদন্ত্র গহ্বরে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়া ও এককোষী প্রাণীদের দ্বারা সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ পাচিত হইয়া ক্ষুদ্রাণুবিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়।

মুখগহ্বরে লালার টায়ালিন, ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতে, সিদ্ধ (Boiled) স্টার্চকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও "লিমিট ডেক্সট্রিন" নামক ক্ষুদ্র

পলিস্যাকারাইডে পরিণত করে। পাকস্থলীর মধ্যে টায়ালিনের ক্রিয়া বহুক্ষণ চলে। পরিশেষে পাকস্থলী রসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড টায়ালিনকে নিষ্ক্রিয় করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিছু সুক্রোজকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করে। পাকস্থলী রসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাক করিবার মত কোন উৎসেচক থাকে না। ক্ষুদ্রান্ত্রে অগ্ন্যাশয়-রস ও আন্ত্রিক-রসের উৎসেচকগুলি কার্বোহাইড্রেট-গুলির উপর নানাভাবে ক্রিয়া করে (চিত্র 22.2)।



চিত্র 22.2 কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক পদ্ধতির চিত্ররূপ।

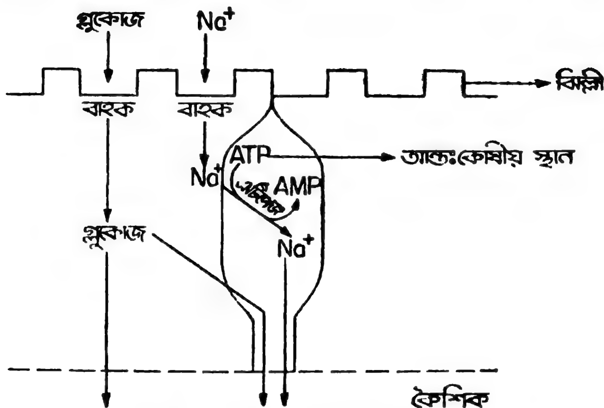
অগ্ন্যাশয়-রসের অ্যামাইলেজ স্টার্চ, ডেক্সট্রিন, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি পলি-স্যাকারাইডকে ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে জলবিশ্লেষিত করিয়া মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। আন্ত্রিক রসের মল্টেজ নামক উৎসেচক মল্টোজ ও মল্টোট্রায়োজকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া গ্লুকোজে পরিণত করে। আন্ত্রিক-রসের অপর একটি উৎসেচক আইসোমল্টেজ লিমিট ডেক্সট্রিনকে মল্টোজ ও গ্লুকোজ অণুতে পরিণত করে। ঐ রসেরই সুক্রেজ সুক্রোজকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ, ল্যাক্টেজ ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে পরিণত করে। বৃহদন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা সেলুলোজের পরিপাক ঘটে এবং অ্যাসেটিক অ্যাসিড, প্রোপায়োনিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

22.6 কার্বোহাইড্রেটের শোষণ (Absorption of carbohydrate)

হেক্সোজ (C_6) এবং পেন্টোজ (C_5) ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা দ্রুত শোষিত হয়। শোষণের পর ইহারা রক্তের মাধ্যমে পোর্টাল শিরার জালিকাতে প্রবেশ করে। কয়েকটি পেন্টোজ ব্যাপন (Diffusion) পদ্ধতিতে শোষিত হয়।

কিন্তু গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ সক্রিয় পরিবহণের (Active transport) দ্বারা শোষিত হয়। ফ্রুক্টোজ শোষিত হয় সাহায্যগ্রাহী ব্যাপন (Facilitated diffusion) পদ্ধতির দ্বারা।

গ্লুকোজ শোষণের সম্ভাব্য প্রণালী : গ্লুকোজ এবং Na^+ একই বাহকের (Carrier) মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে। ইহাকে সিমপোর্ট (Symport) বলা হয়। কোষের ভিতরে Na^+ কম থাকায় বাহির হইতে Na^+ কোষের অভ্যন্তরে



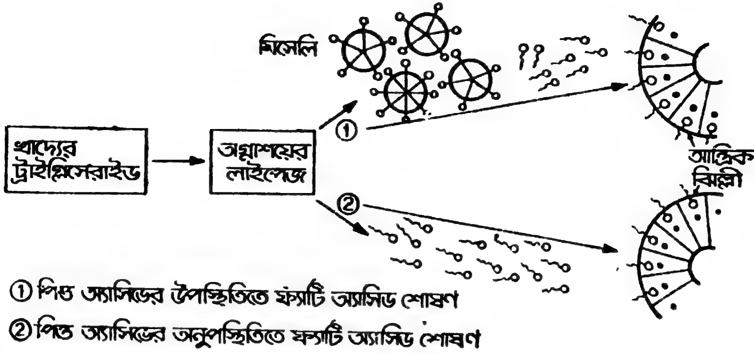
চিত্র 22.3 কার্বোহাইড্রেট শোষণের চিত্ররূপ।

প্রবেশ করে। একই সময়ে গ্লুকোজও প্রবেশ করে (চিত্র 22.3)। ইহার পর সোডিয়াম আন্তঃকোষীয় স্থানে চলিয়া যায় ও গ্লুকোজ কৈশিকে (Capillary) প্রবেশ করে। Na^+ কোষ হইতে বাহির হওয়ার ফলে, কোষের ভিতরে Na^+ আবার হ্রাস পায়, ফলে Na^+ সমেত গ্লুকোজ আবার কোষে প্রবেশ করে। সুতরাং গ্লুকোজ শোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পরোক্ষভাবে Na^+ হইতে পাওয়া যায়।

22.7 ফ্যাটের পরিপাক (Digestion of fat)

পরিপাকের পূর্বে ফ্যাটের বৃহৎ কণাগুলি প্রথমে পিত্ত লবণের সহায়তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া অবদ্রবে পরিণত হয়। কারণ পাচকরসের জলদ্রাব্য উৎসেচকগুলি কেবল ফ্যাটকণার বহিঃপৃষ্ঠের উপর ক্রিয়া করিতে সক্ষম। অবদ্রাবিত অবস্থায় ফ্যাটের কণাগুলি জলে স্থিরভাবে বিস্তৃত থাকে এবং তাহাদের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলও বহুগুণ বাড়িয়া যায়। পাকস্থলী রসের লাইপেজ ফ্যাটকে খুব বেশী পরিপাক করিতে পারে না, কারণ পাকস্থলী গহ্বরে ফ্যাট অবদ্রাবিত অবস্থায় থাকে না। অগ্ন্যাশয়-রস ও আন্ত্রিক-রসের লাইপেজ ফ্যাটের পরিপাক সম্পূর্ণ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে পিত্তের অ্যাসিডগুলি ফ্যাট কণার পৃষ্ঠটান কমাইয়া উহাকে অবদ্রাবিত করে। এই অবদ্রাবিত অবস্থায় ফ্যাটের আকারকে মিসেলি (Micelle) বলে (চিত্র 22.4)। প্রতি

মিসেলির ব্যাস 3—10 nm। ইহাদের পোলার (Polar) অংশ বাহিরের দিকে এবং জল-বিদ্বেষী (Hydrophobic part) অংশ ভিতরের দিকে থাকে। আন্ত্রিক ও



চিত্র 22.4 ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিপাক পদ্ধতির চিত্ররূপ।

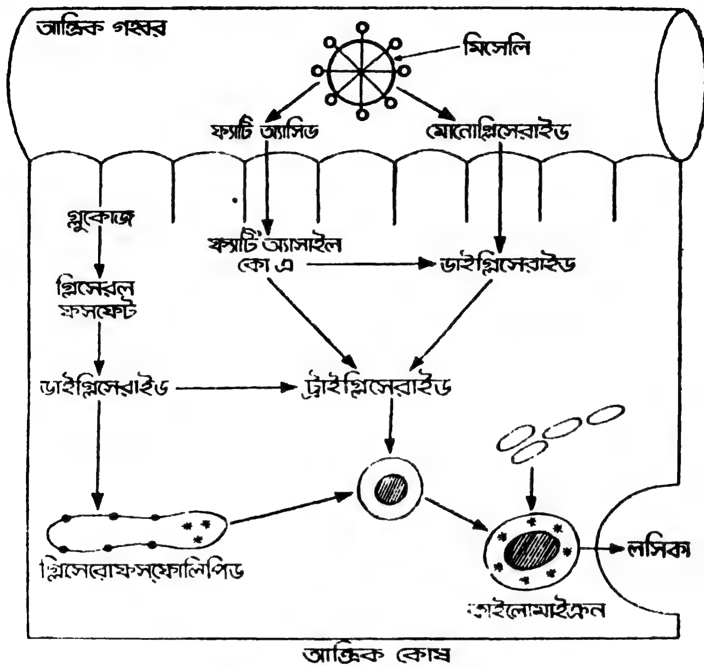
অগ্ন্যাশয়-রসের লাইপেজ উক্ত অবদ্রবিত ফ্যাটকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ডাইগ্লিসেরাইড, মোনোগ্লিসেরাইড এবং মুক্ত (Free) ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে। কিছু মোনোগ্লিসেরাইড ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে লাইপেজের ক্রিয়ায় গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। অধিকাংশ মোনোগ্লিসেরাইড ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রকোষ মধ্যে শোষিত হয় এবং কোষ মধ্যে লাইপেজের ক্রিয়ায় গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়।

অগ্ন্যাশয়-রসের কোলেস্টেরল এস্টারেজের ক্রিয়ায় জলবিশ্লিষ্ট হইয়া কোলেস্টেরল এস্টারগুলি কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। কোলেস্টেরল এস্টারেজ পিত্ত লবণের সাহায্যে সক্রিয় হয়। অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক-রসের ফসফোলাইপেজ (লেসিথিনেজ) ফসফোলিপিডের উপর ক্রিয়া করে। ফ্যাটের কিছু অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে জলবিশ্লিষ্ট না হইয়া পিত্ত লবণের ক্রিয়ায় অবদ্রবিত আকারে শোষিত হয়।

22.8 ফ্যাটের শোষণ (Absorption of Fats)

সাহায্যগ্রাহী ব্যাপনের (Facilitated diffusion) দ্বারা মিসেলি হইতে মোনোগ্লিসেরাইড, কোলেস্টেরল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড আন্ত্রিক কোষে প্রবেশ করে। 10-12টির কম কার্বন পরমাণু দ্বারা গঠিত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি সরাসরি পোর্টাল রক্তে চলিয়া যায় এবং তথায় উহারা স্বাধীন ফ্যাটি অ্যাসিড (FFA বা Free Fatty Acid) হিসাবে থাকে। বাকি ফ্যাটি অ্যাসিড রিএস্টারিফিকেশন (Re-esterification) পদ্ধতিতে ট্রাইগ্লিসেরাইডে (ফ্যাট) পরিণত হয়। ট্রাইগ্লিসেরাইড এবং কোলেস্টেরল এস্টার ইহার পর লাইপোপ্রোটীন, কোলেস্টেরল এবং ফসফোলিপিডের দ্বারা আবৃত হইয়া কাইলোমাইক্রনে (Chylomicron) রূপান্তরিত হয় এবং লসিকায় প্রবেশ করে (চিত্র 22.5)।

আন্ত্রিক কোষের মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামে (Endoplasmic reticulum) মূলত মোনোগ্লিসেরাইড এবং ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এর দ্বারা ট্রাই-গ্লিসেরাইড তৈয়ারী হয়। গ্লিসেরল ফসফেট হইতে কিছু পরিমাণে ট্রাইগ্লিসেরাইড সৃষ্টি



চিত্র 22.5 ফ্যাট শোষণের চিত্ররূপ।

হয়। গ্লিসেরল ফসফেট গ্লিসেরোফসফোলিপিড প্রস্তুত করে এবং উহা কাইলোমাইক্রন সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সর্বাধিক ফ্যাট শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রের অগ্রাংশে হয়। খাদ্যের প্রায় 95% ফ্যাট শোষিত হয়। পিত্ত, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অগ্ন্যাশয়ের রসের উপস্থিতিতে কোলেস্টেরল অন্ত্রে শোষিত হয়। উদ্ভিদ স্টেরলগুলি শোষিত হয় না এবং ইহারা কোলেস্টেরল শোষণের হার হ্রাস করে। কোলেস্টেরল ক্ষুদ্রান্ত্রের পশ্চাৎ ভাগে শোষিত হয় এবং অবশেষে কাইলোমাইক্রনরূপে সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে।

22.9 প্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Proteins)

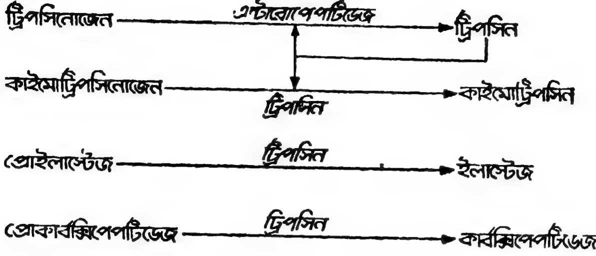
প্রোটিন পরিপাক পাকস্থলী গহ্বরে আরম্ভ হয়। পাকস্থলী রসের নিষ্ক্রিয় পেপ্সিনোজেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।

$$\text{পেপসিনোজেন} \xrightarrow{\text{হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড}} \text{পেপসিন}$$

তীব্র আম্লিক পরিবেশে পেপ্সিন প্রোটিনকে ভাঙ্গিয়া প্রোটিওস, পেপটোন ও পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

পেপসিন
প্রোটিন——→অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন
↓
প্রোটিওস, পেপটোন, পলিপেপটাইড

ক্ষুদ্রান্ত্রে অগ্ন্যাশয়-ও আন্ত্রিক-রসের প্রোটিন বিশ্লেষী উৎসেচকগুলি প্রোটিনের পরিপাকে সাহায্য করে।

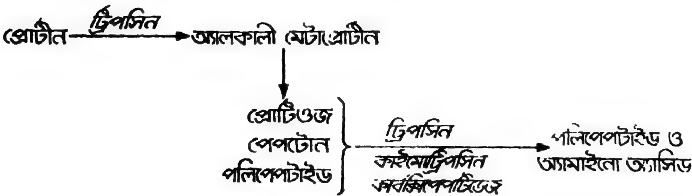


চিত্র 22.6 ট্রিপসিন দ্বারা অন্য উৎসেচকদের সক্রিয়করণের চিত্ররূপ।

আন্ত্রিক-রসের এন্টেরোকাইনেজ অগ্ন্যাশয়-রসের নিষ্ক্রিয় ট্রিপ্সিনোজেনকে সক্রিয় ট্রিপ্সিনে পরিণত করে (চিত্র 22.6)। প্রোটিন, পেপ্টোন ও বড় পলিপেপ্টাইড অণুকে ট্রিপ্সিন জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ক্ষুদ্রতর পেপ্টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। ট্রিপ্সিনের দ্বারা অগ্ন্যাশয়-রসের নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপ্সিনোজেন সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয় এবং দুধের প্রোটিনকে (কেসিন) জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ছানায় পরিণত করে।

রেনিন
কেসিন——→প্যারাকেসিন——→ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেট

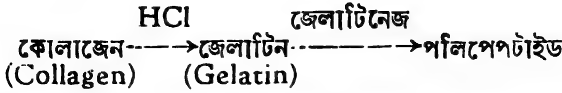
ট্রিপ্সিনের ক্রিয়ায় সক্রিয় কার্বক্সিপেপটিডেজ পেপ্টাইডকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ক্ষুদ্রতর পেপ্টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে (চিত্র 22.7)। আন্ত্রিক-



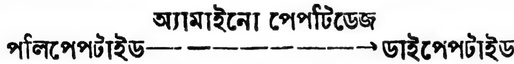
চিত্র 22.7 ট্রিপসিনের কার্যের চিত্ররূপ।

রসের অ্যামাইনোপেপ্টাইডেজ পেপ্টাইডকে জলবিশ্লিষ্ট করিয়া ট্রাইপেপ্টাইড, ক্ষুদ্র পেপ্টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। এই রসের ট্রাইপেপ্টাইডেজ ট্রাইপেপ্টাইডের জলবিশ্লেষ ঘটাইয়া ডাইপেপ্টাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন

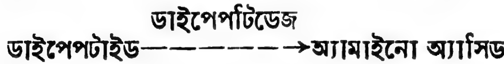
করে। আন্ত্রিক-রসের ডাইপেপ্‌টাইডেজ নামক উৎসেচক ডাইপেপ্‌টাইড অণুকে দুই অণু অ্যামাইনো অ্যাসিডে জলবিশ্লিষ্ট করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের শেষ পরিপাকজাত অবস্থা।



কোলাজেন HCl-এর সংস্পর্শে আসিয়া জেলাটিন তৈয়ারী করে। জেলাটিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে জেলাটিন পরিশেষে পলিপেপটাইডে পরিবর্তিত হয়।







ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন এবং ইলাসটেজ পলিপেপটাইড গঠনকারী অন্তঃস্থ পেপটাইড বণ্ডের (Internal peptide bond) উপর কার্য করিতে সক্ষম বলিয়া এণ্ডোপেপটিডেজ (Endopeptidase) নামে পরিচিত। অন্যদিকে কার্বক্সি-পেপটিডেজ ও অ্যামাইনোপেপটিডেজ বহিঃস্থ পেপটাইড বন্ডগুলিকে (COOH and NH_2 প্রান্তে) জলবিশ্লিষ্ট করে বলিয়া এক্সোপেপটিডেজ (Exopeptidase) হিসাবে চিহ্নিত।

22.10 প্রোটীনের শোষণ (Absorption of Proteins)

D-অ্যামাইনো অ্যাসিড (Dextrorotatory) শোষিত হয় নিষ্ক্রিয় ব্যাপন (Passive diffusion) পদ্ধতির মাধ্যমে এবং L-অ্যামাইনো অ্যাসিড (Laevorotatory) শোষিত হয় সক্রিয় পরিবহণের (Active transport) মাধ্যমে।

প্রোটীন শোষণের জন্য তিন প্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থা আছে (চিত্র 22.8) :

(1) নিরপেক্ষ (Neutral) অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবহণ-ব্যবস্থা।

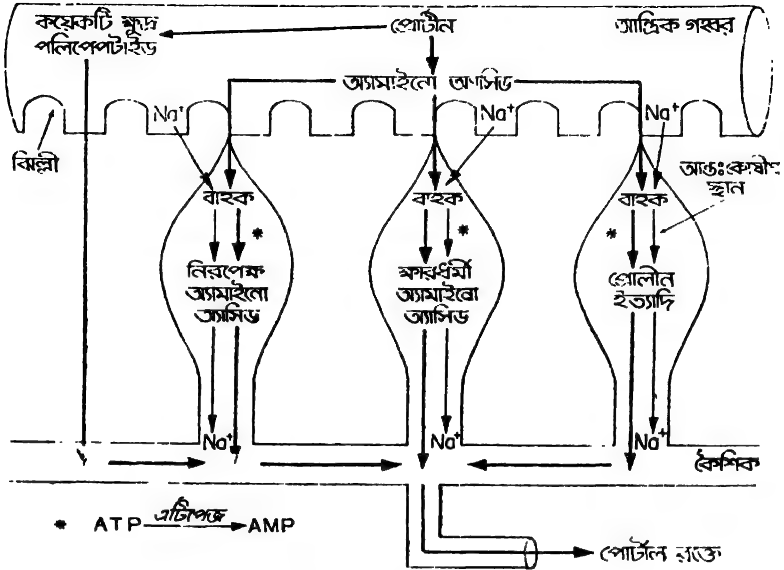
(2) ক্ষারধর্মী (Basic) অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবহণ-ব্যবস্থা।

(3) প্রোলীন, হাইড্রক্সিপ্রোলীন ইত্যাদির জন্যে বিশেষ পরিবহণ-ব্যবস্থা।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের শোষণ গ্লুকোজ শোষণের অনুরূপ। শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র পলিপেপটাইড (প্রোলীন, হাইড্রক্সিপ্রোলীন, কারনোসিন, অ্যানসেরিন) সরাসরি পোর্টাল রক্তে প্রবেশ করে।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের শোষণহার ক্ষুদ্রান্ত্রের অগ্রভাগে দ্রুত কিন্তু পশ্চাৎভাগে মন্থর। মলের প্রোটীন খাদ্যের প্রোটীন নয়, উহা উৎসেচক এবং মৃত শ্লৈষ্মিক কোষগুলি হইতে সৃষ্ট। কিছু বহিরাগত প্রোটীন (Antigen) সংবহনে প্রবেশ

করিয়া অ্যান্টিবডির সৃষ্টি (Antibody) উদ্বুদ্ধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনের আধিক্য অ্যালার্জীর (Allergy) কারণ হইয়া দাঁড়ায়।



চিত্র 22 8 প্রোটিন শোষণের চিত্ররূপ।

নিউক্লিক অ্যাসিডের (Nucleic acid) পরিপাক ও শোষণ :

ক্ষুদ্রান্ত্রে অগ্ন্যাশয়ের নিউক্লিয়েজ এনজাইমের সাহায্যে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিওটাইডে বিশ্লিষ্ট হয়। নিউক্লিওটাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া ফসফোরিক অ্যাসিড ও নিউক্লিওসাইডে পরিণত হয়। নিউক্লিওসাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া শর্করা (Sugar) এবং পুরিন (Purine) অথবা পিরামিডিন (Pyrimidine) বেসে (Base) পৃথক হইয়া যায়। এই বেসগুলি সক্রিয় পরিবহণের (Active Transport) দ্বারা শোষিত হয়। ধাপগুলি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

(1) নিউক্লিক অ্যাসিড —নিউক্লিয়েজ→ নিউক্লিওটাইড

(2) নিউক্লিওটাইড —নিউক্লিয়েজ→ ফসফোরিক অ্যাসিড ও নিউক্লিওসাইড

(3) নিউক্লিওসাইড —→ শর্করা (Sugar) + পুরিন (Purine) ও পিরিমিডিন (Pyrimidine) বেস (Base)

অনুচ্ছেদ-23

কার্বোহাইড্রেটের বিপাক

23.1 খাদ্য হইতে শোষিত কার্বোহাইড্রেটের পরিণাম

(1) হেক্সোজ (ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ) যকৃতে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

(2) যকৃতে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন (Glycogen) রূপে সঞ্চিত থাকে।

(3) জারণের দ্বারা গ্লুকোজ হইতে শক্তি সৃষ্টি এবং শক্তির ব্যবহার।

(4) গ্লুকোজ হইতে অন্যান্য যৌগ সংশ্লেষ—যেমন ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড।

23.2 কর্বোহাইড্রেটের বিপাকের বিভাগসমূহ

(1) **গ্লাইকোজেনেসিস** (Glycogenesis) : যকৃত এবং পেশীতে গ্লুকোজ হইতে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষ।

(2) **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** (Glycogenolysis) : যকৃতে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেন ভাঙ্গিয়া গ্লুকোজ এবং পেশীতে পাইরুভেট (Pyruvate) ও ল্যাক্টেট (Lactate) সৃষ্টি।

(3) **গ্লাইকোলাইসিস** (Glycolysis) : অক্সিজেনের অভাবে (Anaerobic condition) গ্লুকোজ এবং গ্লাইকোজেন হইতে পাইরুভেট ও ল্যাক্টেটের সৃষ্টি।

(4) **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** (Citric Acid Cycle) : অক্সিজেনের উপস্থিতিতে (Aerobic condition) পাইরুভেট হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের সৃষ্টি।

(5) **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (Gluconeogenesis) : সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র এবং গ্লাইকোলাইসিসের সাহায্যে অকার্বোহাইড্রেট (Non-carbohydrate) উৎস হইতে গ্লুকোজ এবং গ্লাইকোজেন সংশ্লেষ।

(6) **হেক্সোজ মোনোফসফেট শান্ট** (HMP Shunt) : গ্লাইকোলাইসিস এবং সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র ব্যতীত অন্য পদ্ধতির দ্বারা গ্লুকোজের জারণ।

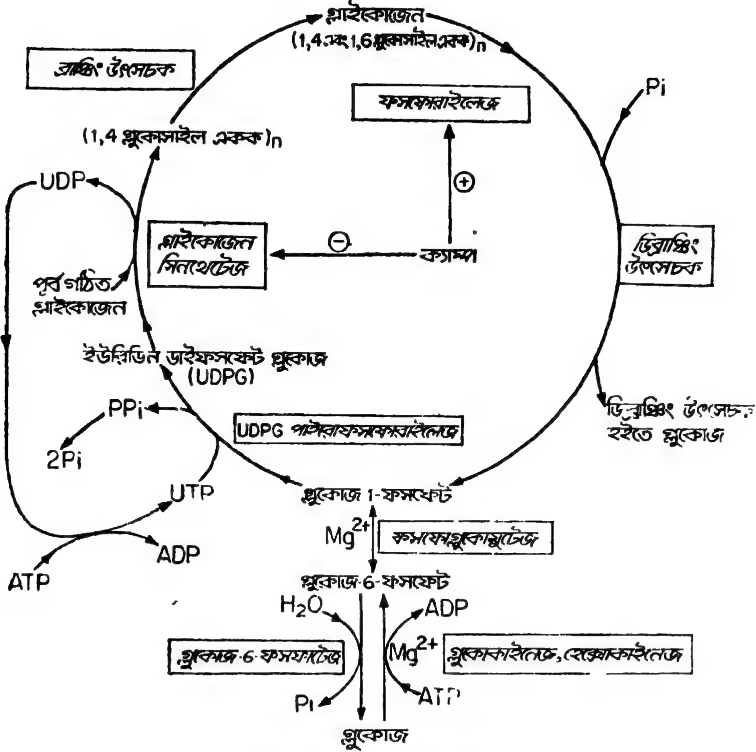
(1) গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis) (চিত্র 23.1)

এই পদ্ধতির ধাপগুলি নিম্নরূপ :

a. ATP এবং Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে হেক্সোকাইনেজ এবং গ্লুকোকাইনেজ উৎসেচকের প্রভাবে গ্লুকোজ গ্লুকোজ-6-ফসফেটে পরিণত হয়। গ্লুকোজের প্রতি হেক্সোকাইনেজের আকর্ষণ খুব বেশী। গ্লুকোকাইনেজ শুধুমাত্র আহারের পর রক্তের গ্লুকোজের উপর ক্রিয়া করিতে সক্ষম।

b. ফসফোগ্লুকোমুটেজ এবং Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে গ্লুকোজ-6-ফসফেট গ্লুকোজ-1-ফসফেটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়াটি উভয়মুখী।

c. পরবর্তী ধাপে গ্লুকোজ-1-ফসফেট ইউরিডিন ট্রাইফসফেটের (UTP) সহিত বিক্রিয়া করিয়া ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকোজের (UDPG) সৃষ্টি করে। এই বিক্রিয়ায় UDPG-পাইরোফসফোরাইলেজ অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং অজৈব পাইরোফসফেট মুক্ত (Released) হয়।



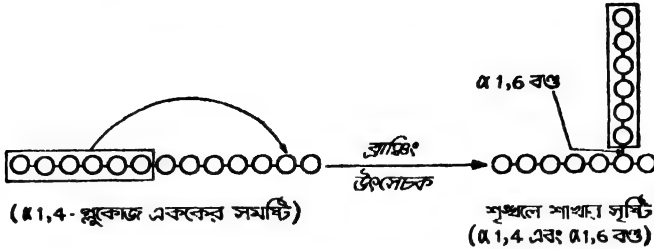
চিত্র 23.1 গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিসের রূপ
P_i = অজৈব ফসফেট, PPi = পাইরোফসফেট
⊕ = উদ্দীপক, ⊖ = রোধক।

d. UDPG-তে উপস্থিত সক্রিয় গ্লুকোজের C_1 গ্লাইকোজেনের অন্তিম গ্লুকোজ রেসিডু (Residue) C_4-এর সহিত একটি গ্লাইকোসাইডিক (Glycosidic) বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়। গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় ইহা সম্ভব হয়।

e. পূর্বে সৃষ্ট গ্লাইকোজেন শৃঙ্খলের সহিত ক্রমশঃ α 1, 4 বন্ডের দ্বারা গ্লাইকোজেন 'বৃত্তের' নূতন নূতন শাখা (Branches) গঠিত হয়।

f. এইভাবে যখন গ্লাইকোজেন শৃঙ্খল 6—11 গ্লুকোজ রেসিডু (Residue) দ্বারা গঠিত হয় তখন ব্রাঞ্চিং (Branching) উৎসেচক [অ্যামাইলো 1, 4→1, 6

ট্রান্সগ্লুকোসিডেজ] গ্লাইকোজেনের উপর ক্রিয়া করিয়া ∝ 1, 4 [অন্তত 6টি গ্লুকোজ রেসিডু (Residue)] একটি অংশ প্রতিবেশী শৃঙ্খলে স্থানান্তরিত করে। ইহার ফলে



চিত্র 23.2 ব্রাঞ্চিং উৎসেচকের ক্রিয়া।

একটি ∝ 1, 6 বণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং গ্লাইকোজেন অণুতে একটি শাখার প্রসার ঘটে (চিত্র 23.2)।

গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ :

এই উৎসেচক পেশীতে (এবং সম্ভবত যকৃতে) দুইটি আকারে থাকে—সিনথেটেজ D (নিষ্ক্রিয়) এবং সিনথেটেজ I (সক্রিয়)। সিনথেটেজ D হইতে সিনথেটেজ ফসফাটেজ উৎসেচকের প্রভাবে সিনথেটেজ I সৃষ্টি হয়। গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ ইনসুলিন এবং গ্লুকোজের প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু cAMP উদ্দীপনা রোধ করে।

এপিনেফ্রিন অ্যাডিনাইলেট সাইক্লেজ উৎসেচককে সক্রিয় করে এবং উহা ATP হইতে cAMP-এর সৃষ্টি করে। cAMP-এর প্রভাবে cAMP-নির্ভর প্রোটীন কাইনেজ (cAMP dependent protein kinase) সক্রিয় হইয়া উঠে এবং উহা গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ I-কে ফসফোরাইলেট (Phosphorylate) করিয়া নিষ্ক্রিয় সিনথেটেজ D-তে রূপান্তরিত করে। সমগ্র ঘটনাবলী 23.3 চিত্রের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে।

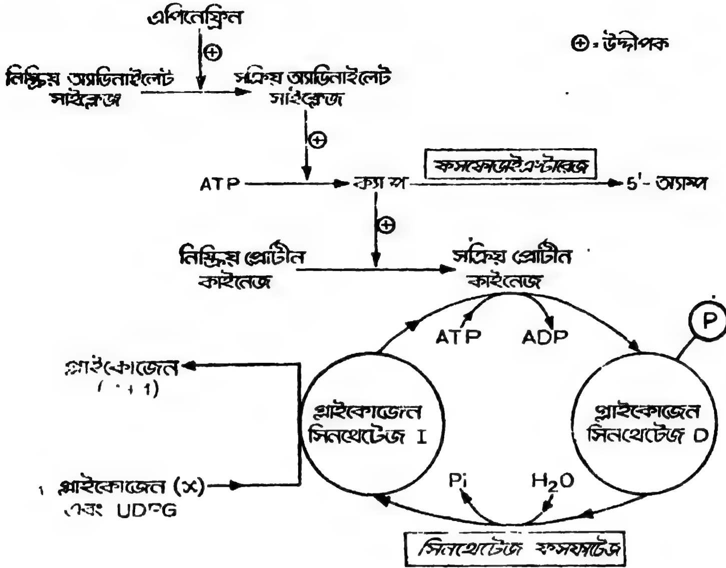
(2) **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** (Glycogenolysis) (চিত্র 23.1)

a. ফসফোরাইলেজ উৎসেচকের প্রভাবে যকৃতে গ্লাইকোজেন ভাঙনের সূচনা হয়। এই উৎসেচকটি ∝ 1, 4 বণ্ডের ফসফোরাইলাইটিক (Phosphorylytic) বিশ্লেষণ ঘটায়। একটি ∝ 1, 6 বণ্ডের উভয় প্রান্তে চারিটি করিয়া গ্লুকোজ রেসিডু (Residue) অবশিষ্ট না থাকা পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকে।

b. ইহার পর ডিব্রাঞ্চিং উৎসেচকের (Debranching enzyme) [অ্যামাইলো-1, 6, গ্লুকোসিডেজ] সাহায্যে 1, 6 বণ্ডের জলবিশ্লেষণ ঘটে।

উপরি-উক্ত দুইটি উৎসেচকের সাহায্যে গ্লাইকোজেন গ্লুকোজ-1-ফসফেটে পরিণত হয়।

c. ফসফোগ্লুকোমুটেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় গ্লুকোজ-1-ফসফেট হইতে গ্লুকোজ-6-ফসফেট সৃষ্টি হয়। উৎসেচকটির ক্রিয়া উভয়মুখী।



চিত্র 23.3 পেশীতে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজের নিয়ন্ত্রণ।

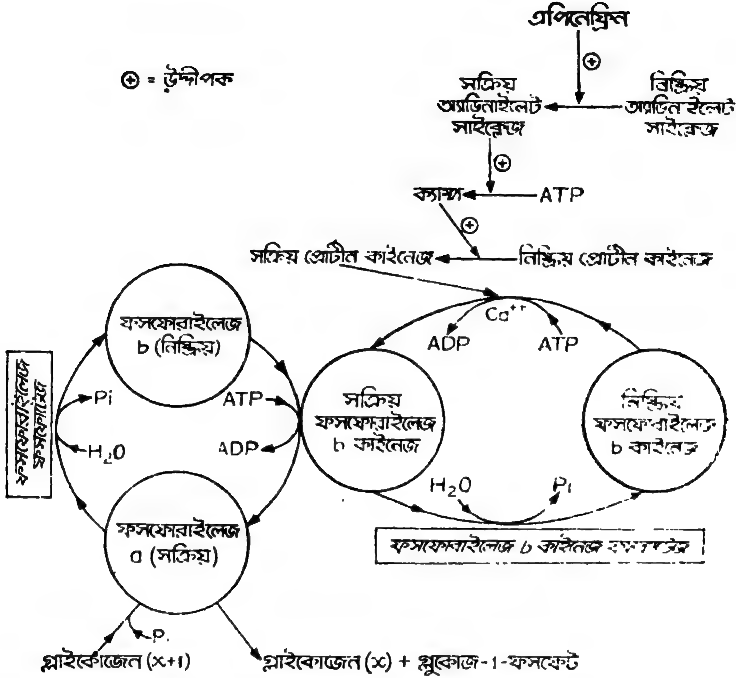
d. যকৃতে এবং বৃক্কে (পেশীতে নহে) গ্লুকোজ-6-ফসফাটেজের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ-6-ফসফেট হইতে গ্লুকোজ মুক্ত হয়। এই মুক্ত গ্লুকোজ ব্যা (Diffusion) পদ্ধতির দ্বারা কোষের বাহিরে এবং রক্তে প্রবেশ করিতে পারে।

ফসফোরাইলেজ :

a. যকৃতে ইহা দুইটি আকারে থাকে—ফসফোরাইলেজ a (সক্রিয়) এবং ফসফোরাইলেজ b (নিষ্ক্রিয়)। ডিফসফোরাইলেজ দ্বারা নিষ্ক্রীয়করণ এবং ফসফোরাইলেজ b কাইনেজ দ্বারা সক্রিয়করণ ঘটে।

b. পেশীতেও ফসফোরাইলেজ দুইটি আকারে থাকে—ফসফোরাইলেজ a (5'-AMP-এর অনুপস্থিতিতে সক্রিয়) এবং ফসফোরাইলেজ b (5'-AMP-এর উপস্থিতিতে সক্রিয়)। দেহে ফসফোরাইলেজ a স ্র। ইহা পিরিডক্সাল ফসফেটের 4টি অণু দ্বারা গঠিত। জলবিশ্লেষণের দ্বারা ফসফোরাইলেজ a ফসফোরাইলেজ b তে পরিণত হয়। ফসফোরাইলেজ b পিরিডক্সাল ফসফেটের 2 অণু দ্বারা গঠিত। এই বিক্রিয়ার জন্যে ফসফোরাইলেজ ফসফাটেজ উৎসেচক আবশ্যক। কাইনেজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে ফসফোরাইলেজ b হইতে পুনরায় ফসফোরাইলেজ a সৃষ্ট হয়। নিষ্ক্রিয় ফসফোরাইলেজ b কাইনেজের সক্রিয়করণ ঘটে cAMP-নির্ভর প্রোটীন

কাইনেজ এবং Ca^{2+}-এর উপস্থিতিতে। cAMP সৃষ্টির জন্যে এপিনেফ্রিন, অ্যাডিনাইলেট সাইক্লেজ এবং ATP আবশ্যক।



চিত্র 23.4 পেশীতে ফসফোরাইলেজের নিয়ন্ত্রণ।

3. গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) (চিত্র 23.5 & 23.6)

অবায়ব অবস্থায় পেশী সংকোচনের ফলে পাইরুভেট এবং ল্যাক্টেট অন্তিম বস্তু হিসাবে সৃষ্ট হয়। কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ইহারা জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের সৃষ্টি করে। অবায়ব অবস্থায় পাইরুভেট এবং ল্যাক্টেট সৃষ্টিকে গ্লাইকোলাইসিস বলা হয়। [এম্বডেন-মেয়ারহফ নির্দেশিকা (Embden-Meyerhoff pathway)]

গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা

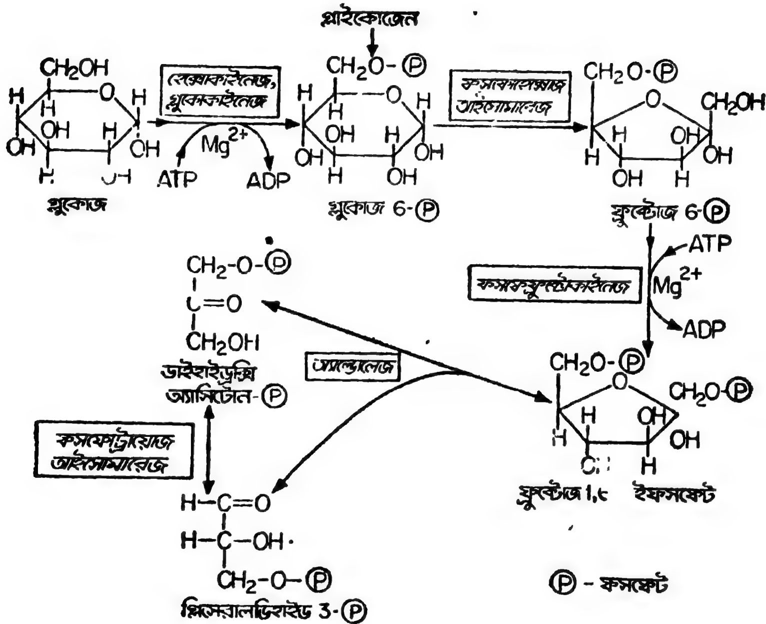
এম্বডেন-মেয়ারহফের পথনির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত উৎসেচকগুলি সাইটোসলে (Cytosol) অবস্থিত।

(a) প্রথমে গ্লুকোজ, হেক্সোকাইনেজ, গ্লুকোকাইনেজ, ATP এবং Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে গ্লুকোজ-6 ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। ইহা একটি একমুখী (Irreversible) বিক্রিয়া।

(b) গ্লুকোজ-6 ফসফেট ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ-6 ফসফেটে পরিণত হয়।

(c) ফ্রুক্টোজ-6 ফসফেট ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ এবং ATP-র উপস্থিতিতে ফ্রুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেটে পরিণত হয়। ইহাও একটি একমুখী (Irreversible) বিক্রিয়া

(d) অ্যাল্ডোলেজ, ফ্রুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেটকে বিশ্লিষ্ট করিয়া গ্লিসেরালডিহাইড-3 ফসফেট এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটের সৃষ্টি করে। এই দুটি যৌগ ফসফোট্রাইওস আইসোমারেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় একটি হইতে অন্যটি (Inter-convertible) সৃষ্টি করিতে পারে।



চিত্র 23.5 গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়ের বিক্রিয়াসমূহের চিত্ররূপ।

(e) গ্লিসেরালডিহাইড-3 ফসফেট জারিত হইয়া 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ার জন্যে গ্লিসেরালডিহাইড-3 ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এবং সহউৎসেচক NAD আবশ্যক। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হয়।

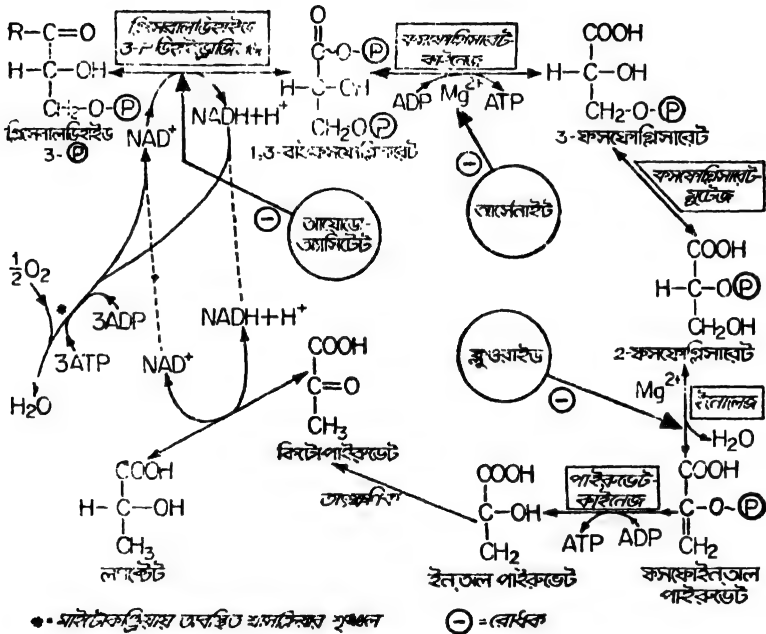
(f) ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এবং ATP-র উপস্থিতিতে 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেট হইতে 3-ফসফোগ্লিসারেটের সৃষ্টি হয়।

[শুধুমাত্র লোহিত রক্তকণিকায় বাইফসফোগ্লিসারেট মুটেজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেট 2,3 ডাইফসফোগ্লিসারেটে (2, 3 DPG) রূপান্তরিত হয়। 2, 3 DPG হিমোগ্লোবিন হইতে অক্সিজেনের বিশ্লেষণ ঘটায়।]

(g) ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ উৎসেচকের প্রভাবে 3-ফসফোগ্লিসারেট 2-ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়।

(h) 2-ফসফোগ্লিসারেট হইতে ফসফোইনঅল পাইরুভেট সৃষ্টি হয়। ইনোলেজ এবং Mg^{2+} ইহাতে সাহায্য করে।

(i) ফসফোইনঅল পাইরুভেটের ফসফেট গ্রুপ ADP-তে স্থানান্তরিত হইয়া ATPর সৃষ্টি হয়। এই একমুখী (Irreversible) বিক্রিয়ার জন্যে পাইরুভেট কাইনেজ আবশ্যক।



চিত্র 23.6 এম্বডেন-মেয়ারহফ বর্ণিত গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতির পথনির্দেশিকা।

(j) ইনলপাইরুভেট তৎক্ষণাৎ কিটোপাইরুভেটে রূপান্তরিত হয়। ইহাও একটি একমুখী (Irreversible) বিক্রিয়া।

(k) অবায়ব অবস্থায় NADH-এর পুনর্জারণ সম্ভব নয়। সুতরাং NADH দ্বারা পাইরুভেট বিজারিত হয় এবং ল্যাক্টেটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় ল্যাক্টেট ডিহাইড্রোজিনেজ অণুঘটকের কার্য করে।

সমগ্র গ্লাইকোলিসিসের দ্বারা ATPর সৃষ্টি

এক অণু গ্লুকোজ হইতে 1 অণু গ্লিসেরালডিহাইড 3-ফসফেট উৎপন্ন হয়। ইহার পর প্রত্যেক প্রোডাক্টের (Product) দুইটি অণু সৃষ্ট হয়।

বিক্রিয়া	সৃষ্ট ATPর সংখ্যা
(a) গ্লিসেরালডিহাইড 3-ফসফেট হইতে 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেট	6
(b) 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেট হইতে 3-ফসফোগ্লিসারেট	2
(c) ফসফোইন্অল পাইরুভেট হইতে ইন্অলপাইরুভেট	2
	10

ATP ব্যবহৃত হয় নিম্নোক্ত ধাপগুলিতে :—

(a) গ্লুকোজ হইতে গ্লুকোজ-6 ফসফেট	1
(b) ফ্রুক্টোজ-6 ফসফেট হইতে ফ্রুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেট	1
	2

সুতরাং সংশ্লিষ্ট ATPর সংখ্যা = 10 – 2 = 8.

কিন্তু, অবায়ব অবস্থায় NADH মাইটোকন্ড্রিয়ায় জারিত হয় না। গ্লিসেরালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজের NADH ল্যাক্টেট ডিহাইড্রোজিনেজে পুনঃ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ATPর সংখ্যা 2।

হর্মোনের প্রভাব

(1) ইনসুলিন হেক্সোকাইনেজ এবং ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজকে উদ্দীপিত করে।

(2) গ্লুকাগণ যকৃতের গ্লুকোজ-6-ফসফাটেজকে উদ্দীপিত করে।

রোধক (Inhibitors)

(1) আয়োডোঅ্যাসিটেট (Iodoacetate) গ্লিসেরালডিহাইড-3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজকে রোধ করে।

(2) আর্সিনেট (Arsenate) 1, 3 ডাইফসফোগ্লিসারেট হইতে-3-ফসফোগ্লিসারেটের সৃষ্টিকে রোধ করে।

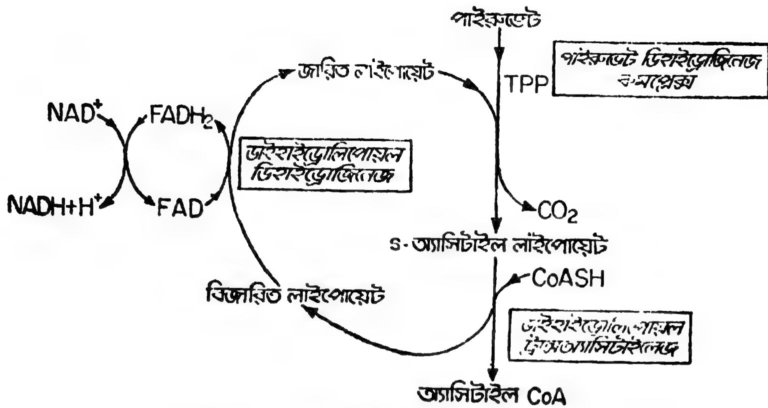
(3) ফ্লুওরাইড (Fluoride) ইনোলেজকে রোধ করে।

পাইরুভেটের জারণ (চিত্র 23.7)

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে পাইরুভেট অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন (Oxidative decarboxylation) পদ্ধতির দ্বারা অ্যাসিটাইল কোএতে পরিণত হয়। এই সমগ্র পদ্ধতিটি পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কম্প্লেক্স নামক উৎসেচকবর্গের উপস্থিতিতে সম্ভব।

থায়ামিন পাইরোফসফেট (TPP) এবং জারিত লাইপোয়েটের (Oxidised lipoate) উপস্থিতিতে পাইরুভেট এস-অ্যাসিটাইল লাইপোয়েটে (s-Acetyl lipoate) পরিণত হয়। ডাইহাইড্রোলিপোয়ল ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজের (Dihydro-

lipoyl transacetylase) প্রভাবে s-অ্যাসিটাইল লাইপোয়েট কোএনজাইম Aর সহিত বিক্রিয়া করিয়া অ্যাসিটাইল কো A এবং বিজারিত লাইপোয়েটের (Reduced



চিত্র 23.7 পাইরুভেটের জারণ পদ্ধতির চিত্ররূপ।

lipoate) সৃষ্টি হয়। ডাইহাইড্রোলিপোয়ল ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে FAD বিজারিত লাইপোয়েটকে পুনর্জারিত করে। বিজারিত FADকে NAD জারিত করে। বিজারিত NAD অবশেষে শ্বাসক্রিয়ার শৃংখলে (Respiratory chain) প্রবেশ করিয়া 3 অণু ATPর সৃষ্টি করে।

4. সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র অথবা ক্রেবস্ চক্র (Krebs' Cycle) অথবা ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (TCA cycle) (চিত্র 23.8)

বায়ব অবস্থায় মাইটোকণ্ড্রিয়ায় যে ধারাবাহিক বিক্রিয়াগুলির সাহায্যে পাইরুভেট হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বলা হয়।

এই চক্রের বিক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ :—

(a) অ্যাসিটাইল কোএ অক্সালো অ্যাসিটেটের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সাইট্রেটের সৃষ্টি করে। এই বিক্রিয়ায় সাইট্রেট সিনথেটেজ অণুঘটকের কাজ করে।

(b) অ্যাকোনিটেজ উৎসেচকের প্রভাবে সাইট্রেট প্রথমে জলবিশ্লিষ্ট হইয়া অ্যাকোনিটেট এবং পুনরায় জলযুক্ত হইয়া আইসোসাইট্রেটে পরিণত হয়।

(c) আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজের প্রভাবে আইসোসাইট্রেট হইতে অক্সালোসাক্সিনেটের সৃষ্টি হয়।

(d) আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ এবং Mn^{2+}এর উপস্থিতিতে অক্সালো-সাক্সিনেট ডিকার্বক্সিলেশন পদ্ধতির দ্বারা ∝-কিটোগ্লুটারেটে রূপান্তরিত হয়।

(e) পাইরুভেটের অনুরূপ অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশনের দ্বারা ∝-কিটোগ্লুটারেট সাক্সিনাইল কো-এতে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ার জন্যে TPP,

লাইপোয়েট, NAD, FAD এবং ∝-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্স আবশ্যক।

চিত্র 23.8 সাইট্রিক-অ্যাসিড চক্রের চিত্ররূপ।

(f) সাক্সিনাইল কো-এ থাইওকাইনেজ উৎসেচকের প্রভাবে এবং গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেটের (GTP) উপস্থিতিতে সাক্সিনেটে রূপান্তরিত হয়।

(g) সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের দ্বারা এবং FADর উপস্থিতিতে ফুমারেটে পরিণত হয়।

(h) ফুমারেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফুমারেট ম্যালেটে রূপান্তরিত হয়।

(i) অবশেষে ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ এবং NADর উপস্থিতিতে ম্যালেট অক্সালো অ্যাসিটেটে পরিণত হয়।

সংশ্লিষ্ট ATPর সংখ্যা

বিক্রিয়া	ATPর সংখ্যা
আইসোসাইট্রেট→অক্সালোসাক্সিনেট	3
∝-কিটোগ্লুটারেট→সাক্সিনাইল কো এ	3
সাক্সিনাইল কো এ→সাক্সিনেট	1
সাক্সিনেট→ফুমারেট	2
ম্যালেট→অক্সালো অ্যাসিটেট	3
মোট	12

রোধক (Inhibitors)

(a) ফ্লুয়োরো অ্যাসিটেট (Fluoro acetate) অ্যাকোনিটেজকে রোধ করে।

(b) আর্সেনাইট (Arsenite) ∝-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজকে রোধ করে।

(c) ম্যালোনেট (Malonate) সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজকে প্রতিদ্বন্দিতা-মূলকভাবে রোধ করে।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের তাৎপর্য

(a) দেহে বিপাকের ফলে বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট (গ্লুকোজ), লিপিড (ফ্যাটি অ্যাসিড) এবং প্রোটিন (অ্যামাইনো অ্যাসিড) অ্যাসিটাইল কো এ তে পরিণত হয় এবং অবশেষে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের দ্বারা জারিত হয়।

(b) এই পদ্ধতির দ্বারা যে বিজারিত বস্তুগুলির সৃষ্টি হয় (হাইড্রোজেন অথবা ইলেকট্রনের আকারে) তাহারা শ্বাসক্রিয়ার শৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করে।

(c) সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র অ্যাম্ফিবোলিক (Amphibolic) অর্থাৎ ইহা ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং গ্লুকোনিওজেনেসিসের উৎস। একই সময়ে ইহা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের অন্তিম পরিণামও ঘটায়।

5. **গ্লুকোনিওজেনেসিস** [Gluconeogenesis (চিত্র 23.9)]

অকার্বোহাইড্রেট উৎস [গ্লুকোজেনিক (Glucogenic) অ্যামাইনো অ্যাসিড, ল্যাক্টেট, গ্লিসেরল] হইতে গ্লুকোজ সংশ্লেষকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলা হয়।

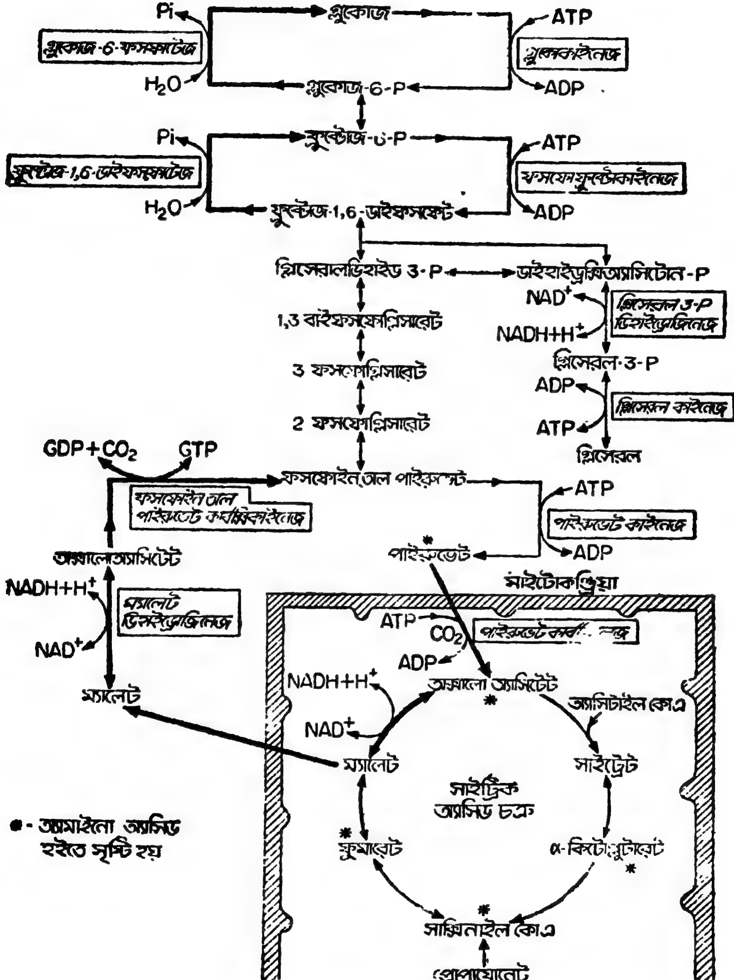
এই সমগ্র পদ্ধতিটি গ্লাইকোলাইসিসের বিপরীত কেবল 3টি ধাপ বাদে (এই ধাপগুলি গ্লাইকোলাইসিসে একমুখী)।

ইহারা হইল

1. পাইরুভেট→ফসফোইনল পাইরুভেট
2. ফ্রুক্টোজ 1, 6 ডাইফসফেট→ফ্রুক্টোজ 1 ফসফেট
3. গ্লুকোজ 6 ফসফেট→গ্লুকোজ
4. গ্লুকোজ 1 ফসফেট→গ্লাইকোজেন

এই ধাপগুলি নিম্নোক্তভাবে ঘটে :

(a) মাইটোকণ্ড্রিয়ায় অবস্থিত পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, ATP, বায়োটিন এবং CO_2র উপস্থিতিতে পাইরুভেট অক্সালো অ্যাসিটেটে পরিণত হয়। অক্সালো অ্যাসিটেট মাইটোকণ্ড্রিয়া হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। সুতরাং উহা ম্যালেটে পরিবর্তিত



চিত্র 23.9 গ্লুকোনিওজেনেসিস পদ্ধতির চিত্ররূপ। * মিথিওনিন, সেরিন, সিস্টিন, থ্রিওনিন, গ্লাইসিন ইত্যাদি হইতে পাইরুভেট; অ্যাসপার্টেট হইতে অক্সালো অ্যাসিটেট; টাইরোসিন, ফিনাইলঅ্যালানিন হইতে ফুমারেট; আইসোলিউসিন, লিউসিন, ভ্যালিন হইতে সাক্সিনাইল কো-এ; হিস্টিডিন, প্রোলীন, হাইড্রক্সিপ্রোলীন, আরজিনিন, গ্লুটামেট হইতে α কিটোগ্লুটারেট।

হইয়া ব্যাপনের সাহায্যে মাইটোকণ্ড্রিয়ার বাহিরে আসে। ইহার পর ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে উহা পুনরায় অক্সালোঅ্যাসিটেটে পরিণত হয়। অবশেষে ফসফোইনলল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ এবং GTPর উপস্থিতিতে অক্সালো অ্যাসিটেট ফসফোইনলল পাইরুভেটে রূপান্তরিত হয়।

(b) যকৃত, বৃক্ক এবং ঐচ্ছিক পেশীতে ফ্রুক্টোজ 1, 6 ডাইফসফাটেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেটে পরিণত হয়।

(c) গ্লুকোজ 6 ফসফাটেজ উৎসেচকের প্রভাবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লুকোজ পরিবর্তিত হয়। এই উৎসেচকটি অন্ত্র, যকৃত এবং বৃক্কে পাওয়া যায়।

(d) গ্লুকোজ 1 ফসফেট গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় UDGP এবং গ্লাইকোজেন সিনথেটেজের সাহায্যে।

প্রোপায়োনেট হইতে গ্লুকোজ (চিত্র 23 9)

প্রোপায়োনেট থায়োকাইনেজ এবং কো-Aর প্রোপায়োনেট প্রভাবে প্রোপোয়োনিল কো-A তে রূপান্তরিত হয়। ইহার পর প্রোপায়োনিল কো-A কার্বক্সিলেজের প্রভাবে উহা CO_2 যুক্ত হইয়া D-মিথাইল ম্যালোনিল কো-A তে পরিণত হয়। এই যৌগটি রেসিমেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে L-মিথাইল ম্যালোনিল কো-A তে রূপান্তরিত হয়। ইহা আইসোমারেজের দ্বারা সাক্সিনাইল কো-A তে পরিবর্তিত হয়। সাক্সিনাইল কো-A সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের একটি মধ্যবর্তী ধাপ (Intermediate)।

গ্লিসেরল হইতে গ্লুকোজ

যকৃত এবং বৃক্কে গ্লিসেরোকাইনেজ এবং ATPর সাহায্যে গ্লিসেরল হইতে গ্লিসেরল 3-ফসফেটের সৃষ্টি হয়। উহা গ্লিসেরল-3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এবং NADর সাহায্যে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে পরিণত হয়। ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন গ্লুকোজে পরিণত হয়।

ল্যাক্টেট হইতে গ্লুকোজ

অবায়ব গ্লাইকোলাইসিসের দ্বারা পেশীতে ল্যাক্টেট সৃষ্টি হয়। উহা রক্তের সাহায্যে যকৃতে পৌঁছায় এবং তথায় গ্লুকোজ এবং গ্লাইকোজেনে পরিণত হয় গ্লুকোনিওজেনেসিসের দ্বারা (ল্যাক্টেট হইতে পেশী গ্লুকোজ সংশ্লেষ করিতে অক্ষম)। এই গ্লুকোজ রক্তের সাহায্যে পুনরায় পেশীতে প্রবেশ করে। সমগ্র পদ্ধতিটিকে কোরির চক্র (Cori's cycle) বলা হয়।

অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে গ্লুকোজ

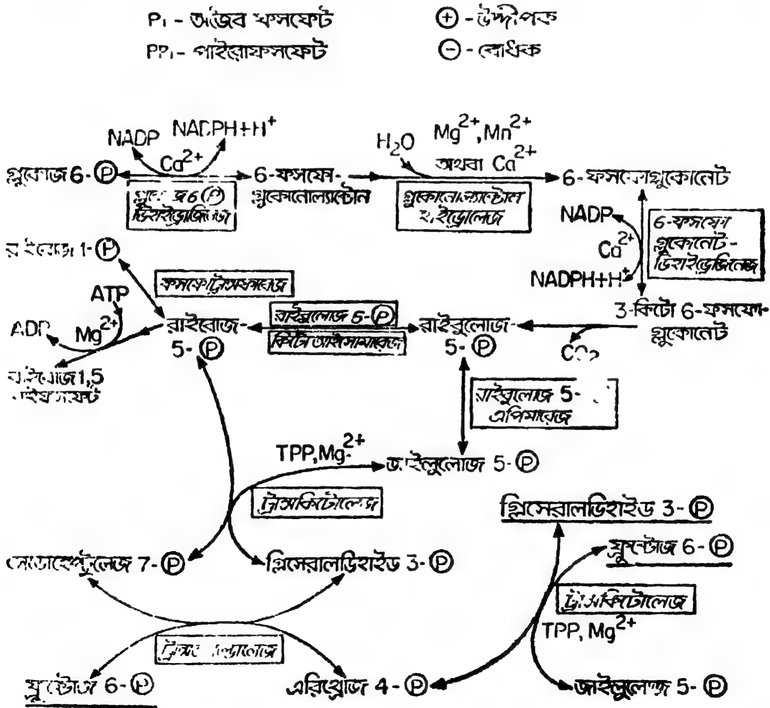
ট্রান্সঅ্যামাইনেশন অথবা ডিঅ্যামাইনেশনের দ্বারা গ্লুকোজিনিক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের বিভিন্ন মধ্যবর্তী দশায় (Intermediates) পরিণত হয় এবং ম্যালেটে রূপান্তরিত হইয়া গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড হইতে গ্লুকোজ

β-অক্সিডেশনের দ্বারা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি অ্যাসিটাইল কো A তে পরিণত হয়। অ্যাসিটাইল কো A সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করিয়া ম্যালেটে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে ম্যালেট গ্লুকোজে পরিণত হয়।

6. **হেক্সোজ মোনোফসফেট শান্ট** (HMP Shunt) অথবা **পেন্টোজ ফসফেট পথনির্দেশিকা** (PP Pathway) (চিত্র 23.10)

ইহা গ্লাইকোলাইসিস ব্যতীত গ্লুকোজ জারণের আর একটি পদ্ধতি। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ার বাহিরে অবস্থিত। হাইড্রোজেন গ্রাহক রূপে NADর পরিবর্তে NADP ক্রিয়া করে। HMP শান্ট যকৃত, অ্যাডিপোজ কলা, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, থাইরয়েড, লোহিত রক্তকণিকা, শুক্রাশয় এবং স্তনে ঘটে।



চিত্র 23.10 HMP শান্টের (shunt) চিত্ররূপ।

এই পদ্ধতিতে 3 অণু গ্লুকোজ-6-ফসফেট হইতে 3 অণু CO_2 এবং 5 অণু পেন্টোজ শর্করার সৃষ্টি হয়। ঐ শর্করাগুলি অবশেষে 2 অণু ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট এবং 1 অণু গ্লিসেরালডিহাইড-3-ফসফেটে পরিণত হয়।

বিক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ :

a. গ্লুকোজ-6-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এবং Mn^{2+}, Mg^{2+} অথবা Ca^{2+}-এর উপস্থিতিতে গ্লুকোজ-6-ফসফেট 6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাক্টোনে পরিণত হয়। উহা হাইড্রোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে 6-ফসফোগ্লুকোনেটে পরিবর্তিত হয়।

b. 6-ফসফোগ্লুকোনেট পরিবর্তিত হইয়া 3-কিটো 6-ফসফোগ্লুকোনেটের সৃষ্টি করে। ইহার জন্যে ডিহাইড্রোজিনেজ NADP এবং Mg^{2+}, Mn^{2+} অথবা Ca^{2+}-এর উপস্থিতি আবশ্যক। 6-ফসফোগ্লুকোনেট ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে রাইবুলোজ-5-ফসফেটে পরিণত হয়।

c. রাইবুলোজ-5-ফসফেট রাইবুলোজ-5-ফসফেট এপিমারেজের দ্বারা জাইলুলোস-5-ফসফেটে এবং রাইবুলোজ-5-ফসফেট কিটো আইসোমোরেজের দ্বারা রাইবোজ-5-ফসফেটে পরিণত হয়।

d. TPP, Mg^{2+} এবং ট্রান্সকিটোলেজের প্রভাবে জাইলুলোজ-5-ফসফেটের 1 এবং 2 কার্বনের স্থানান্তর ঘটে ফলে সেডোহেপ্টুলোজ-7-ফসফেট এবং গ্লিসেরালডিহাইড-3-ফসফেটের সৃষ্টি হয়।

e. ট্রান্সঅ্যাল্ডোলেজ উৎসেচকের প্রভাবে সেডোহেপ্টুলোজ-7-ফসফেট হইতে 3টি কার্বন গ্লিসেরালডিহাইডে স্থানান্তরিত হয়। উহার ফলে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট এবং এরিথ্রোজ-4-ফসফেটের সৃষ্টি হয়।

f. TPP এবং Mg^{2+}-এর সাহায্যে ট্রান্সকিটোলেজ উৎসেচকের দ্বারা জাইলুলোজ-5-ফসফেটের C_1 এবং C_2 স্থানান্তরিত হইয়া এরিথ্রোজ-4-ফসফেটের সহিত যুক্ত হয় ফলে ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট এবং গ্লিসেরালডিহাইড-3-ফসফেটের সৃষ্টি হয়।

HMP শান্টের তাৎপর্য

(1) এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট CO_2 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পুরিন বেস সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় (গ্লাইকোলাইসিসে CO_2 সৃষ্ট হয় না)।

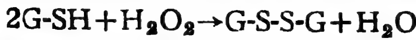
(2) এই পদ্ধতির দ্বারা বিজারিত NADPর (NADPH) সৃষ্টি হয় এবং ইহা মাইটোকন্ড্রিয়ার বাহিরে ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল এবং স্টেরয়েড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। ইউরোনিক অ্যাসিড পথনির্দেশিকায় (Uronic acid pathway) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সংশ্লেষেও NADPH আবশ্যক।

(3) এই পদ্ধতির দ্বারা সৃষ্ট পেন্টোজ শর্করা নিউক্লিক অ্যাসিড এবং নিউক্লিওটাইড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

(4) ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট এবং গ্লিসেরালডিহাইড-3-ফসফেট গ্লাইকোলাইসিসে ব্যবহৃত হয়।

(5) রক্তের লোহিত রক্ত কণিকায় HMP শান্টের দ্বারা সৃষ্ট NADPH গ্লুটাথায়োন রিডাক্টেজ উৎসেচকের প্রভাবে জারিত গ্লুটাথায়োনকে (G-S-S-G)

বিজারিত গ্লুটাথায়োনে (2G-SH) রূপান্তরিত করে। নিম্নোক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই সদ্যসৃষ্ট বিজারিত গ্লুটাথায়োন রক্ত কণিকা হইতে H_2O_2 সরাইয়া দেয় :



$$2G\text{-}SH + H_2O_2 \rightarrow G\text{-}S\text{-}S\text{-}G + H_2O$$

এই বিক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ H_2O_2 লোহিত রক্ত কণিকার জীবন-কাল হ্রাস করে এবং উহাদের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি করে।

23.3 প্রোটিনের বিপাক

প্রোটিন সকল সজীব কোষের প্রধান উপাদান। প্রোটিন পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশে প্রোটিন-বিশ্লেষী উৎসেচকের দ্বারা সরল অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিই প্রোটিনের অন্তিম বিপাকজাত বস্তু। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি প্রধানত সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের অগ্রভাগ হইতে শোষিত হইয়া পোর্টাল শিরার রক্তে প্রবেশ করে।

23.4 প্রোটিন বিপাকের ঘটনাপ্রবাহ

(1) যকৃতের অ্যামাইনো অ্যাসিড অপচিত হইয়া প্রথমে অ্যামোনিয়া এবং পরে ইউরিয়াতে রূপান্তরিত হয়।

(2) কলার অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি কলার ক্ষয় পূরণে (Tissue repair) ব্যবহৃত হয়।

(3) অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেনের সাহায্যে বিভিন্ন নাইট্রোজেনঘটিত (Nitrogenous) যৌগ—যেমন পিত্ত অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, পিউরিন, পিরিমিডিন, এপিনেফ্রিন, থাইরক্সিন, অ্যামাইনো শর্করা, উৎসেচক এবং ফসফোলিপিডের বেস (Base) ইত্যাদি তৈয়ারী হয়।

অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিণাম নিম্নোক্তরূপ :—

(a) যকৃতে অপচিতি

(b) কলা প্রোটীনের সংশ্লেষ

(c) অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ সৃষ্টি

(4) সাধারণত যে পরিমাণ নাইট্রোজেন দেহে প্রবেশ করে, ঠিক সেই পরিমাণই প্রস্রাব, মল এবং ঘামের মাধ্যমে রেচিত হয়। সমগ্র পদ্ধতিটিকে নাইট্রোজেন সমস্থিতি (Nitrogen equilibrium) বলা হয়।

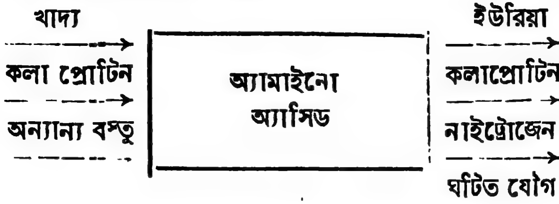
(5) যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিতে সালফার থাকে, তাহাদের পরিণাম নিম্নরূপ :—

(a) যকৃতে অপচিত হইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হওয়া

(b) কয়েকটি কলা প্রোটীনের সংশ্লেষ যেমন কেশ

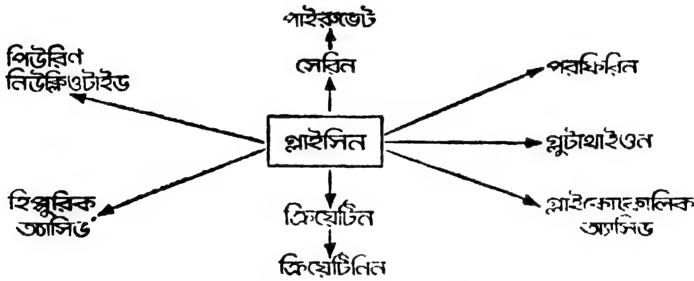
(c) অন্যান্য বস্তুর গঠনের সহযোগী—যেমন টরিন (Taurine), গ্লুটাথাইওন, ইনসুলিন ইত্যাদি।

সুতরাং ঘটনাটির রূপরেখা নিম্নরূপ



23.5 শোষিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির পরিণাম নিম্নরূপ : (চিত্র 23.11-13)

1. **প্রোটিন সংশ্লেষ :** মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি দেহে সঞ্চিত থাকিতে পারে না। ইহারা কেবল প্রোটিন আকারেই কলায় আবদ্ধ থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি পেপ্‌টাইড বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হইয়া পেশী, যোগকলা, নার্ভকলা, রক্তরস-প্রোটিন, উৎসেচক, পেপ্‌টাইড হর্মোন (অক্সিটোসিন, ইনসুলিন) প্রভৃতি সংশ্লেষ করে।



চিত্র 23.11 গ্লাইসিনের পরিণামের চিত্ররূপ।

2. **হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য পরফিরিনের সংশ্লেষ :** হিমোগ্লোবিন, সাইটোক্রোম, পরফিরিন-যৌগের প্রোটিন এবং পরফিরিন অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে সংশ্লেষিত হয়।

3. **জৈব অ্যামাইন সংশ্লেষ**. ডিকার্বক্সিলেজ উৎসেচকের প্রভাবে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল বর্গকে কার্বন ডাই-অক্সাইড আকারে মুক্ত করিয়া কয়েকটি সক্রিয় জৈব অ্যামাইন (যথা—হিস্টামিন, সেরোটোনিন, অ্যাড্রেন্যালিন, নর্-অ্যাড্রেন্যালিন ইত্যাদি) সংশ্লেষিত হয়।

4. **পিউরিন পিরিমিডিন সংশ্লেষ :** গ্লাইসিন, গ্লুটামিক ও অ্যাসপারটিক অ্যাসিড নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে নিউক্লিক অ্যাসিডের পিউরিন ও পিরিমিডিন নামক নাইট্রোজেন ঘটিত বেসগুলি সংশ্লেষিত হয়।

5. **মেলানিন সংশ্লেষ :** টাইরোসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে মেলানিন সংশ্লেষিত হয়।

6. **কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষ** : যকৃত ও বৃক্কে গ্লাইসিন, অ্যালানিন, সেরিন প্রভৃতি অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেন সংশ্লেষ হয়।

ফিনাইলঅ্যালানিন
মেলানিন
নরএপিনেফরিন
এপিনেফরিন
টাইরোসিন
থাইরক্সিন
ফুমারেট
অ্যাসিটেট
অ্যাসিটাইল কো এ

চিত্র 23.12 টাইরোসিনের পরিণামের চিত্ররূপ।

7. **কিটোজেনেসিস** (Ketogenesis) : লিউসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভাঙ্গনের ফলে কিটোনবর্গীয় বস্তু উৎপন্ন হয়।

অ্যাসিটো-অ্যাসিটাইল কো এ
সেরেটোনিন
ট্রিপ্টোফান
জ্যান্থুরেনিক অ্যাসিড
নিকোটিনিক অ্যাসিড

চিত্র 23.13 ট্রিপ্টোফানের পরিণামের চিত্ররূপ।

8. **পিত্ত-লবণ সংশ্লেষ** : গ্লাইসিন, টরিন প্রভৃতি অ্যামাইনো অ্যাসিড যকৃতে পিত্ত-লবণ সংশ্লেষে সাহায্য করে।

9. **শক্তি সরবরাহ** : অ্যামাইনো অ্যাসিডের দহনের ফলে শক্তির উদ্ভব হয়। প্রতি গ্রাম প্রোটিন হইতে 4·3 কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

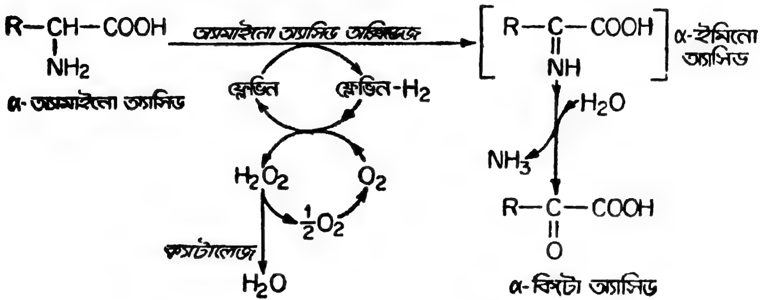
10. **ট্রান্সমিথাইলেশন** (Transmethylation) : এই পদ্ধতিতে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিথাইলমূলক ($-CH_3$) দাতা ট্রান্সমিথিলেজ উৎসেচকের সাহায্যে অন্য কোন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। মেথিওনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিথাইলমূলক দাতা ইথানল অ্যামাইনের সহিত মিলিত হইয়া কোলিন উৎপন্ন করে।

11. **ডি কার্বক্সিলেশন** (Decarboxylation) : অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে কার্বক্সিল বর্গ কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে নির্গত হইয়া অ্যামাইনে পরিবর্তিত হয়।

$$\text{হিস্টিডিন} \xrightarrow[]{-COOH \;\rightarrow\; -CO_2} \text{হিস্টামিন}$$

23.6 অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেনের অপচিতি এবং ইউরিয়া সংশ্লেষ (চিত্র 23.14-16)

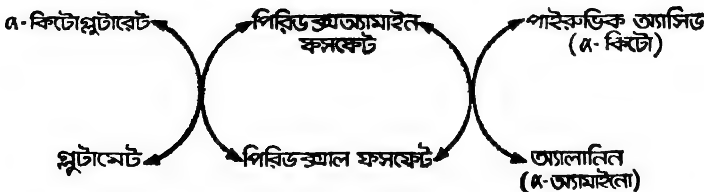
(1) অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন (Oxidative deamination) : ইহা যকৃত ও বৃক্কে সংঘটিত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিহাইড্রেজ, ডিসালফহাইড্রেজ প্রভৃতি উৎসেচকের সহায়তায় বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে অ্যামাইনোমূলক ($-NH_2$) গ্রূপ অপসারিত হয়। অপসারণের ফলে একটি নাইট্রোজেনবিহীন অবং অপরটি নাইট্রোজেন যুক্ত অংশ প্রস্তুত হয়।



চিত্র 23.14 অক্সিডেটিভ ডি-অ্যামাইনেশন পদ্ধতির চিত্ররূপ।

নাইট্রোজেনবিহীন অংশটি কিটো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। কিটো অ্যাসিড কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয় বা নাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের মাধ্যমে শক্তি-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত অংশটি অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া রক্তে সঞ্চিত থাকে। ফলে রক্তে বিষক্রিয়ার উদ্ভব হয়। ক্রেব্‌স্‌ ও হেনসেলেইটের ইউরিয়া চক্রের (Krebs' and Henseleit's urea cycle) মাধ্যমে ইহা কম ক্ষতিকর ইউরিয়ায় পরিবর্তিত হইয়া মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়।

(2) ট্রান্সঅ্যামাইনেশন (Transamination) : এই প্রক্রিয়ায় এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে অন্য এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড ও কিটো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। অ্যামাইনোট্রান্সফেরেজ উৎসেচক এবং পাইরিডক্সাল ফসফেট নামক



চিত্র 23.15 ট্রান্সঅ্যামাইনেশন পদ্ধতির চিত্ররূপ।

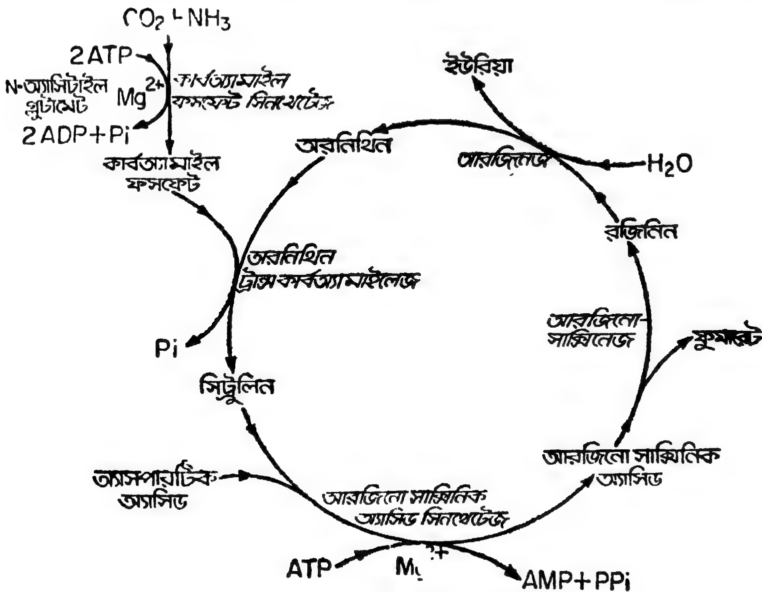
কো-এনজাইমের প্রভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো বর্গটি কোন কিটো

অ্যাসিডের কিটোন বর্গের জায়গায় স্থানান্তরিত হইলে—একটি নূতন কিটো অ্যাসিড এবং একটি নূতন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়।

(3) **ইউরিয়া সংশ্লেষ :** ডিঅ্যামাইনেশন এবং ট্রান্সঅ্যামাইনেশন পদ্ধতির দ্বারা অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে অপসারিত অ্যামাইনো বর্গ যকৃতে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া মূত্রের দ্বারা বাহির হইতে পারে। অ্যামোনিয়া আকারেও ইহা মূত্রে যাইতে পারে। ইউরিয়া মানবদেহে প্রধান প্রোটিনেতর নাইট্রোজেন ঘটিত বিপাকীয় বস্তু (Non-protein nitrogenous end product)। যকৃতে অরনিথিন (Ornithine) অ্যামাইনো অ্যাসিডটির অনুঘটক ক্রিয়ায় ইউরিয়া চক্র বা অরনিথিন চক্রের (Ornithine cycle) মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে উদ্ভূত অ্যামোনিয়া ও অ্যামাইনো বর্গের ক্রিয়ার দ্বারা ইউরিয়া সংশ্লেষিত হয় (চিত্র 23.16)।

জৈব মূল্য : খাদ্য হইতে আহৃত প্রোটিনের শতকরা যতটা দেহে প্রোটিনরূপে রক্ষিত হয়, তাহাকেই উক্ত প্রোটিনের জৈব মূল্য (Biological value) বলে।

কার্বঅ্যামাইল ফসফেট সিনথেটেজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেটের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বঅ্যামাইল ফসফেট ও অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট সৃষ্টি হয়। এই ক্রিয়ার জন্যে



চিত্র 23.16 ইউরিয়া সংশ্লেষের চিত্ররূপ।

কোএনজাইমরূপে N-অ্যাসিটাইল গ্লুটামেট (N-acetyl glutamate) প্রয়োজন হয়। অরনিথিন ট্রান্সকার্বঅ্যামাইলেজ উৎসেচকের দ্বারা কার্বঅ্যামাইল ফসফেটের

কার্বঅ্যামাইল বর্গ অরনিথিন অণুর সহিত যুক্ত হইয়া সিট্রুলিনে (Citrulline) পরিণত হয়। আরজিনিনোসাক্সিনেট সিনথেটেজ উৎসেচক ও ATP-এর দ্বারা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড ও সিট্রুলিন একত্রিত হইয়া আরজিনিনোসাক্সিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। আরজিনিনোসাক্সিনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় আরজিনিনোসাক্সিনিক অ্যাসিড হইতে আরজিনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। পরিশেষে আরজিনেজের ক্রিয়ায় আরজিনিন জলবিশ্লিষ্ট হইয়া ইউরিয়া উৎপন্ন করে এবং অরনিথিনকে মুক্ত করে। মুক্ত অরনিথিন আবার ইউরিয়া সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

23.7 অপ্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড

ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় যে সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহে সংশ্লেষিত হইতে পারে, সেইগুলি খাদ্যে না থাকিলেও কোন অসুবিধা হয় না। এই সকল অ্যামাইনো অ্যাসিডকে (যথা—গ্লাইসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড) **অপ্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Non-essential amino acids) বলে। অপর অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে (যথা—ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, লাইসিন, মেথিওনিন ও ফিনাইলঅ্যালানিন) **অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Essential amino acids) বলে, কারণ উক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে সংশ্লেষিত হইতে পারে না। খাদ্যে ইহাদের উপস্থিতি অপরিহার্য।

নাইট্রোজেন সমস্থিতি (Nitrogen Equilibrium) : স্বাভাবিক অবস্থায় নাইট্রোজেনের সমস্থিতি (অর্থাৎ মূত্রে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খাদ্য হইতে শোষিত নাইট্রোজেনের সমান থাকা) প্রয়োজন। বৃদ্ধির সময় খাদ্য হইতে যতটা নাইট্রোজেন শোষিত হয় তাহা অপেক্ষা কম নাইট্রোজেন মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব থাকিলে মূত্রে নির্গত নাইট্রোজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে। দেহের বৃদ্ধি ও নাইট্রোজেন সাম্য অব্যাহত রক্ষা প্রোটিনের জৈব মূল্যের (Biological value) উপর নির্ভর করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিনের (Animal proteins) জৈব মূল্য বেশী, কারণ এই জাতীয় প্রোটিনে সকল প্রকার অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রাচুর্য থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ (Plant proteins), যথা দানাশস্য, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতির জৈব মূল্য কম, কারণ এই ধরনের প্রোটিনে কোনও কোনও অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শোষিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি অংশত প্রোটিন সংশ্লেষে ব্যর্থ হয়।

অনুচ্ছেদ 24

উৎসেচক বা এনজাইম (Enzyme)

24.1 ভূমিকা

জীবদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জীবদেহের কোন নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার পরিবর্তনে উৎসেচক অনুঘটকের কাজ করে। জীবিত কোষ দ্বারা নির্মিত দ্রবীভূত কলয়ডাল (Colloidal) জৈব অনুঘটককে (Catalyst) উৎসেচক বা এনজাইম বলা হয়। প্রতিটি উৎসেচক নিজ ক্রিয়ায় অত্যন্ত নির্দিষ্ট (Specific)। কয়েকটি উৎসেচক সরল প্রোটিন ধরনের, কিন্তু অধিকাংশ উৎসেচকই কনজুগেটেড প্রোটিন (Conjugated protein)। ইহাতে একটি প্রোটিন অংশ [অ্যাপোএনজাইম (Apoenzyme)] এবং একটি অপ্রোটিন অংশ [কো-এনজাইম (Coenzyme) বা প্রোস্থেটিক গ্রুপ (Prosthetic group)] বর্তমান।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উষ্ণতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উষ্ণতা বাড়াইলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বাড়িয়া যায়। আবার কম উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার কমিয়া যায়। কম উষ্ণতায় বিক্রিয়াশীল অণুগুলির গতিশীলতা কম থাকে। অণুগুলির কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা কমিয়া যাওয়ায় বিক্রিয়ার হারও কমিয়া যায়। কিন্তু বেশী উষ্ণতায় বিক্রিয়াশীল অণুগুলির গতিশীলতা বেশী হইয়া যায়। ফলে অণুগুলির কাছাকাছি আসিবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায় এবং বিক্রিয়ার হার বেশী হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সেই কারণে তাপশক্তির ব্যবহার করা হয়। এই তাপশক্তিকে এই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি (Activation energy) বলা হয়।

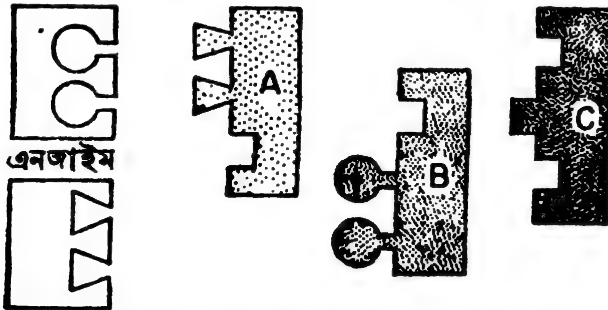
জীবিত বস্তুর দেহের মধ্যে প্রতিনিয়ত অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু দেহের বাহির হইতে আসা তাপশক্তি তথা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এই সমস্ত বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় না। কেন না প্রোটোপ্লাজম একটি সীমিত উষ্ণতার মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে। অধিকাংশ প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহা 25°C হইতে 45°C এর মধ্যে থাকে। সুতরাং মনে হইতে পারে যে যেহেতু জীবিত বস্তু বেশী উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে না সেইহেতু জীবিত বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার অত্যন্ত কম। কিন্তু জীবিত বস্তুর ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। অল্প উষ্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অতি দ্রুতগতিতে সহস্র সহস্র রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। জীবিত বস্তুর দেহে উৎসেচক রূপ এক জৈব প্রভাবকের উপস্থিতিতেই ইহা সম্ভব হয়।

অনুঘটক বা প্রভাবকের (Catalyst) উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার দ্রুত বা মন্থর হয়। প্রভাবকেরা বিক্রিয়ার পর নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে। জৈব রসায়নের বিক্রিয়ায় প্রভাবকগুলিকে উৎসেচক বলা হয়। উৎসেচক প্রভাবকের ন্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকিয়া বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত বা হ্রাস করে এবং বিক্রিয়ার শেষে নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে।

উৎসেচকগুলি প্রোটিন নির্মিত হওয়ায় গঠনে অত্যন্ত জটিল। ইহাদের আণবিক ওজন বেশী এবং ইহারা বেশী উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায় (Thermolabile)।

24.2 উৎসেচকের ক্রিয়ার সম্ভাব্য প্রণালী (Postulated mode of action of enzymes)

(1) একটি প্রদত্ত কোষে উৎসেচকের সংখ্যা অনেক। একই কোষের একটি উৎসেচক অন্য উৎসেচক হইতে গঠন ও কার্যের দিক দিয়া আলাদা। উৎসেচক যে রাসায়নিকের উপর ক্রিয়া করে সেই রাসায়নিকটিকে **সাবস্ট্রেট** (Substrate) বলা হয়। কোষের মধ্যে উৎসেচকের ন্যায় সাবস্ট্রেটের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু অনেক সাবস্ট্রেট ও অনেক উৎসেচক থাকিলেও উহারা পরস্পরের সহিত যথেচ্ছভাবে বিক্রিয়া করে না। কোন্ উৎসেচক কোন্ সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করিবে তাহা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে। একই গঠনের অনেকগুলি সাবস্ট্রেটের উপর একই উৎসেচক বার বার কাজ করিতে পারে। সব'ক্ষেত্রে একটি উৎসেচকের একটি সাবস্ট্রেটের সহিত বিক্রিয়া ঘটিলেই একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষ হয় না। রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ধাপে ধাপে সাধিত হয়। একটি উৎসেচক একটি সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করিয়া সাবস্ট্রেটটিকে পরবর্তী ধাপের বিক্রিয়ার উপযোগী করিয়া দেয়। সাবস্ট্রেটের অণুর সহিত উৎসেচকের যুক্ত থাকা অবস্থাকে **এনজাইম সাবস্ট্রেট** কমপ্লেক্স (Enzyme Substrate Complex) বলা হয়। এই কমপ্লেক্স সৃষ্টির ধরনটি অনেকটা 'তালাচাবি' সম্বন্ধের ন্যায় (চিত্র 24.1)। একটি তালা খুলিতে বিভিন্ন আকারের চাবির মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ গঠনের চাবির প্রয়োজন হয়। ঠিক সেইরকমভাবে



চিত্র 24.1 উৎসেচক ও সাবস্ট্রেটের মধ্যে কাল্পনিক 'তালাচাবি' দশার চিত্ররূপ।

একটি সাবস্ট্রেটের যে গঠন সেই গঠনে একটি বিশেষ উৎসেচকই সর্বতোভাবে মিশিয়া যাইতে পারে। চিত্রে তিনটি সাবস্ট্রেট A, B, ও C এবং দুইটি উৎসেচক দেখান হইয়াছে। চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যায় যে উৎসেচক দুইটির একটি B ও অন্যটি A সাবস্ট্রেটের সহিত সর্বতোভাবে মিলিতে পারে। সাবস্ট্রেট C এর সহিত বিক্রিয়া করিবার মত উৎসেচক এখানে নাই।

এন্‌জাইম + সাবস্ট্রেট ⇌ এন্‌জাইম-সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স
E S ES

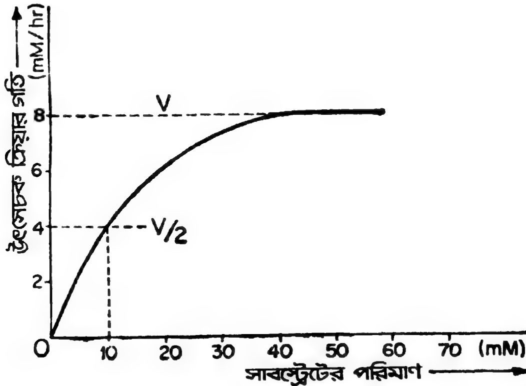
এন্‌জাইম-সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স → এন্‌জাইম + প্রোডাক্ট
ES E P

(2) নিবেশিত যোগ্যতা পদ্ধতি ("Induced Fit" Mechanism)—সাবস্ট্রেট এন্‌জাইমের সক্রিয় অংশে (Active site) যুক্ত হয় এবং এন্‌জাইমের গঠনের পরিবর্তন ঘটায় (Configurational change)। সুতরাং কমপ্লেক্সগুলি গঠিত হয় কোভ্যালেন্ট (Covalent), হাইড্রোজেন অথবা ইলেকট্রোস্টাটিক (Electrostatic) যোজক (Bond) দ্বারা। এন্‌জাইমের সক্রিয় অংশ (Active site) এবং কার্যকরী অংশ (Functional group) মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট গঠনের (Definite spatial configuration) সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সাবস্ট্রেট হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হয়।

24.3 উৎসেচকের ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ (Factors regulating Enzyme action)

(1) **উৎসেচক এবং সাবস্ট্রেটের সংস্পর্শ** : উৎসেচক ও সাবস্ট্রেট পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এন্‌জাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে।

(2) **উৎসেচক এবং সাবস্ট্রেটের পরিমাণ** : সাবস্ট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে উৎসেচকের ক্রিয়ার গতিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু এমন একটি সময়



চিত্র 24.2 মিচেলিস রেখাচিত্র।

আসে যখন সাবস্ট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও রাসায়নিক বিক্রিয়া স্বাভাবিক গতিতে চলে। এই সময় উৎসেচকের আর কোন অণু মুক্ত থাকে না। 24.2 চিত্রে এই বক্তব্যটি মিচেলিস কার্ভ (Michaelis curve) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কাইনেটিক

সমীকরণটি (Kinetic equation) মিচেলি মেনটেন সমীকরণের (Michaelis Menten equation) সাহায্যে পাওয়া যাইতে পারে।

এই সমীকরণ অনুযায়ী

$$v = \frac{V\,[S]}{K_m + [S]}$$

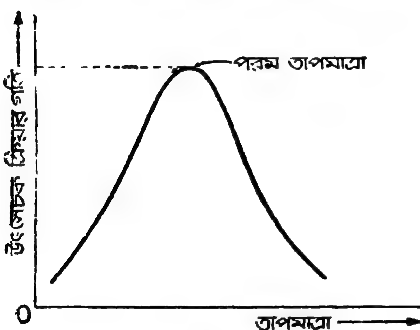
যেখানে v = বিক্রিয়ার গতি (Velocity)
V = বিক্রিয়ায় সর্বাধিক গতি
S = সাবস্ট্রেটের পরিমাণ
K_m = মিচেলির ধ্রুবক (Constant)

সাবস্ট্রেটের যে পরিমাণ উপস্থিত থাকিলে সর্বাধিক গতির অর্ধেক প্রকাশ পায়, তাহাকে K_m বা মিচেলির ধ্রুবক (Constant) বলা হয়।

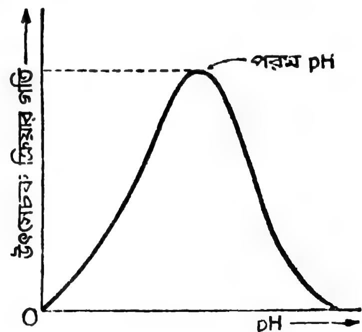
অর্থাৎ, যখন $v = V/2$,

$$K_m = [S]$$

(3) তাপমাত্রা (Temperature) : প্রতিটি উৎসেচক একটি সহনীয় তাপমাত্রায় (Favourable temperature range) ক্রিয়া করতে সক্ষম (চিত্র 24.3)। উত্তাপ বৃদ্ধি করিলে অথবা হ্রাস হইলে উৎসেচকের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যে তাপমাত্রায় উৎসেচকের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়, তাহাকে পরম তাপমাত্রা (Optimum temperature) বলা হয়।



চিত্র 24.3 তাপমাত্রা ও উৎসেচকের ক্রিয়ার গতিপথের চিত্ররূপ।

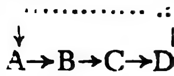


চিত্র 24.4 pH ও উৎসেচকের ক্রিয়ার গতিপথের চিত্ররূপ।

(4) pH : প্রতিটি উৎসেচক একটি নির্দিষ্ট pH-এ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই নির্দিষ্ট pH-কে পরম pH (Optimum pH) বলা হয়। pH পরিবর্তন করিলে উৎসেচকের ক্রিয়ার গতি হ্রাস পায় (চিত্র 24.4)।

উদাহরণ—পেপসিন (pH 1·5), ট্রিপসিন (pH 8·0)

(5) প্রোডাক্ট (Product) এবং ফিডব্যাক (Feedback)

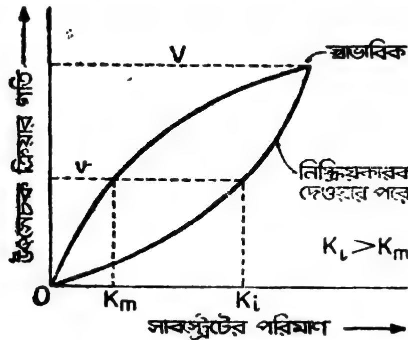


ধরা যাউক, A হইতে B, C এবং D উৎসেচক ক্রিয়ার ফল (Product)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে যথেষ্ট পরিমাণে D তৈয়ারী হইলে ক্রিয়ার গতি হ্রাস পায়। সুতরা D এখানে A হইতে B তৈয়ারীর প্রণালীকে রোধ করে। ইহাকে নেগেটিভ ফিডব্যাক (Negative Feedback) বলা হয়।

(6) উৎসেচকের ক্রিয়ারোধ (Inhibition of enzyme activity)

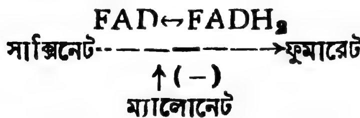
ক্রিয়ারোধ মূলতঃ তিন প্রকারের—

(a) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিয়ারোধ (Competitive inhibition) : এইক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয়কারকগুলি উৎসেচকের সক্রিয় অংশের (Active site) সঙ্গে উভয়মুখী (Reversible) রূপে যুক্ত থাকে এবং যুক্ত থাকার জন্যে সাবস্ট্রেটের সহিত



চিত্র 24.5 প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিয়ারোধের চিত্র।

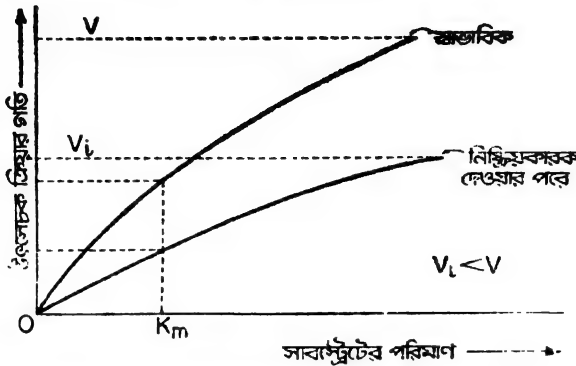
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উদাহরণ—ম্যালোনেট দ্বারা সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজের ক্রিয়ারোধ (চিত্র 24.5)।



অধিক পরিমাণ সাবস্ট্রেট প্রদান করিলে কিন্তু ক্রিয়ারোধ হয় না। সুতরাং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সর্বাধিক গতি (V_{max}) অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু নিষ্ক্রীয়কারকের জন্যে X_m বৃদ্ধি পায়। (চিত্রে দেখানো হয়েছে $K_i > K_m$)

(b) অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিয়ারোধ (Non-competitive inhibition) : এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয়কারকগুলি উৎসেচকের সক্রিয় কেন্দ্রের (Active centre) সহিত একমুখী রূপে (Irreversibly) যুক্ত হয়। উদাহরণ—সায়ানাইড (Cyanide)

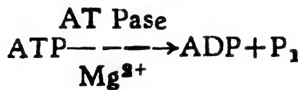
দ্বারা সাইটোক্রোম অক্সিডেজের (Cytochrome oxidase) ক্রিয়ারোধ। এই ধরনের ক্রিয়ারোধে K_m অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু নিষ্ক্রীয়কারকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার সর্বাধিক গতি (চিত্র 24 6) হ্রাস পায় (V <V)।



চিত্র 24.6 অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিয়ারোধের চিত্রূপ।

(c) অ্যালোস্টেরিক নিষ্ক্রীয়করণ (Allosteric inhibition): এইক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয়কারক সক্রিয় অংশ (Active site) ব্যতীত অন্য কোন কেন্দ্রের (Centre) সঙ্গে যুক্ত হইয়া সাবস্ট্রেটের প্রতি উৎসেচকের সক্রিয় অংশের (Active site) আকর্ষণ পরিবর্তন করে। এইক্ষেত্রে K_m এবং V_{max} উভয়ই পরিবর্তিত হয়। নিষ্ক্রীয়কারকের উপস্থিতিতে K_m বৃদ্ধি পায় এবং V_{max} হ্রাস পায়।

সহযোগী উৎসেচক এবং সক্রিয়কারক : যে অজৈব বস্তুর দ্বারা উৎসেচক সক্রিয় হইয়া উঠে তাহাকে উৎসেচক সক্রিয়কারক (Enzyme activator) বলা হয়। উদাহরণ—Cl, Ca^{2+}, Mn^{2+}, Mg^{2+}



$$ATP \xrightarrow[Mg^{2+}]{AT\ Pase} ADP + P_1$$

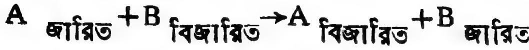
24.4 উৎসেচকের শ্রেণীবিন্যাস

উৎসেচক যে ধরণের রাসায়নিক সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করে সেই সাবস্ট্রেটের নাম অনুযায়ী উৎসেচকের নামকরণ বা শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। সেই অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেটের উপর যে উৎসেচক কাজ করে তাহাদের কার্বোহাইড্রেজ (Carbohydrase), প্রোটীনের উপর যাহারা কাজ করে তাহাদের প্রোটীনেজ (Proteinase) এবং লিপিডের উপর যাহারা কাজ করে তাহাদের লাইপেজ (Lipase) বলা হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় প্রতিটি উৎসেচকের ইংরেজী নামের শেষের তিনটি অক্ষর এ, এস, ই (a, s, e)। কোন রাসায়নিক উৎসেচক কিনা তাহা এই শেষের তিনটি অক্ষর নজর করিলেই বুঝা যাইবে। অবশ্য সব উৎসেচকের নামের ক্ষেত্রে উহা সত্য নহে। যেমন প্রোটিনের উপর বিক্রিয়াকারী উৎসেচক ট্রিপসিন (Trypsin)।

পূর্বোক্ত ধরনের নামকরণ বা শ্রেণীবিন্যাস বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধুনা উৎসেচকগুলি কি ধরনের বা কি পদ্ধতিতে কাজ করে তাহার উপর নির্ভর করিয়া উৎসেচকদের নামকরণ করা হয়।

যথা—

I. **অক্সিডোরিডাক্টেজ** (Oxidoreductases) : যে সকল উৎসেচক জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া করে।



ইহাদের আবার নিম্নরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে :

a. অক্সিডেজ (Oxidases) : যাহারা হাইড্রোজেনকে অক্সিজেন গ্রাহক হিসাবে ব্যবহার করে।

উদাহরণ—ইউরিকেজ (Uricase), সাইটোক্রোম অক্সিডেজ।

b. অ্যানঅ্যারোবিক ডিহাইড্রোজিনেস (Anaerobic dehydrogenase) : যাহারা অক্সিজেন ভিন্ন অন্য কোন রাসায়নিক হাইড্রোজেন গ্রাহক হিসাবে ব্যবহার করে।

উদাহরণ—ম্যালেট্ ডিহাইড্রোজিনেজ, ল্যাক্টেট ডিহাইড্রোজিনেজ।

c. হাইড্রোপারঅক্সিডেজ (Hydroperoxidases) : যাহারা হাইড্রোজেন পার অক্সাইডকে সাবস্ট্রেট হিসাবে ব্যবহার করে।

উদাহরণ—পারঅক্সিডেজ, ক্যাটালেজ (Catalase)।

d. অ্যারোবিক ডিহাইড্রোজিনেজ (Aerobic dehydrogenase) : যাহারা অক্সিজেন অথবা অন্য কোন বস্তুকে হাইড্রোজেন গ্রাহক হিসাবে ব্যবহার করে।

উদাহরণ—জ্যান্থিন অক্সিডেজ (Xanthine oxidase)।

e. অক্সিজিনেজ (Oxygenases) : ইহারা একক হাইড্রোজেন দাতার উপর ক্রিয়া করিয়া অক্সিজেন যোগ করে।

উদাহরণ—ট্রিপ্টোফান্ অক্সিজিনেজ।

f. হাইড্রক্সিলেজ (Hydroxylases) : ইহারা যুগল দাতার (Paired donor) উপর ক্রিয়া করিয়া একটি দাতার সহিত অক্সিজেন যুক্ত করে।

উদাহরণ—স্টেরয়েড হাইড্রক্সিলেজ।

II. **ট্রান্সফারেজ** (Transferases) : যে সকল এনজাইম সাবস্ট্রেট অণুগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রুপের স্থানান্তর ঘটায়।

ইহাদের আবার বিভাগ আছে :

a. ট্রান্সফসফোরাইলেজ (Transphosphorylases)।

উদাহরণ—হেক্সোকাইনেজ (Hexokinase), ফসফোগ্লুকোমুটেজ (Phosphoglucomutase)।

b. ট্রান্সগ্লাইকোসাইডেজ (Transglycosidases)।

উদাহরণ—ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase)।

(c) ট্রান্সঅ্যামাইনেজ (Transaminases)।

উদাহরণ—গ্লুটামেট-পাইরুভেট (Glutamate-pyruvate) ট্রান্সঅ্যামাইনেজ।

(d) ট্রান্সঅ্যাসাইলেজ (Transacylase)।

উদাহরণ—অ্যামাইনো অ্যাসিড ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ।

(e) ট্রান্সমিথাইলেজ (Transmethylase)।

III. **হাইড্রোলেজ** (Hydrolases): যে সকল এনজাইম জলবিশ্লেষ (Hydrolysis) ঘটাইয়া সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া করে।

a. যাহারা গ্লাইকোসিল (Glycosyl) বস্তুর উপর ক্রিয়া করে।

উদাহরণ—গ্যালাক্টোসিডেজ (Galactosidase)।

b. যাহারা পেপটাইড (Peptide) বন্ডের উপর ক্রিয়া করে।

উদাহরণ—পেপসিন, রেনিন।

c. এস্টারেজ (Esterases)। উদাহরণ—লাইপেজ (Lipase), ফসফাটেজ।

d. অ্যামাইডেজ (Amidase)। উদাহরণ—ইউরিয়েজ (Urease), আরগাইনেজ (Arginase)।

e. হাইড্রোলাইটিক ডিঅ্যামাইনেজ (Hydrolytic deaminase)।

উদাহরণ—গুয়ানিন (Guanine) ডিঅ্যামাইনেজ।

IV. **আইসোমারেজ** (Isomerases): যে সকল এনজাইম সাবস্ট্রেটকে যথাযথ আইসোমারে পরিবর্তন করে।

a. রেসিমেজ এবং এপিমারেজ (Racemase and Epimerase)।

উদাহরণ—অ্যালানিন রেসিমেজ (Alanine)।

L-অ্যালানিন ⇄ D-অ্যালানিন।

b. সিস-ট্রান্স আইসোমারেজ (Cis-trans isomerase)।

উদাহরণ—রেটিনিন (Retinine) আইসোমারেজ।

ট্রান্স-রেটিনিন ⇄ 11-সিস্ রেটিনিন।

c. অ্যাল্ডোজ (Aldose) হইতে কিটোজ (Ketose)।

উদাহরণ—ট্রাইওসফসফেট আইসোমারেজ (Triosephosphate isomerase)।

D-গ্লিসারালডিহাইড-3-ফসফেট ⇄ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোনফসফেট
(Glyceraldehyde-3-phosphate) (Dihydroxy acetone phosphate)

V. **লাইয়েজ** (Lyase): যে সকল এনজাইম জলবিশ্লেষ ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সাবস্ট্রেট হইতে কোন গ্রুপকে অপসারণ করে।

a. অ্যালডিহাইড লাইয়েজ (Aldehyde lyase)।

উদাহরণ—অ্যালডোলেজ (Aldolase)।

কিটোজ-1-ফসফেট ⇄ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট + অ্যালডিহাইড।

b. কার্বন-অক্সিজেন লাইয়েজ।

উদাহরণ—ফুমারেজ (Fumarase)।

ম্যালেট ⇌ ফুমারেট + H_2O।

VI. **লাইগেজ** (Ligases): এই শ্রেণীভুক্ত এনজাইম অনুঘটকের ন্যায় কো-ভ্যালেন্ট (Co-valent) বন্ড সৃষ্টি করিয়া দুই অণু সাবস্ট্রেটকে যুক্ত করে।

a. যে সকল এনজাইম C-S বন্ড তৈয়ারী করে। যেমন—সাক্সিনেট থাইওকাইনেজ (Succinate thiokinase)।

b. যে সকল এনজাইম C-N বন্ড তৈয়ারী করে। যেমন—গ্লুটামিন সিনথেটেজ (Glutamine synthetase)।

c. যে সকল এনজাইম C-C বন্ড তৈরী করে। যেমন—অ্যাসিটাইল কো-এ কার্বক্সিলেজ (Acetyl CoA carboxylase)।

24.5 সহযোগী উৎসেচক (Coenzyme)

যে তাপস্থায়ী (Heat-stable), ডায়ালাইজেবল (Dialyzable), অপ্রোটিন (Non-protein) জৈববস্তু উৎসেচকের প্রস্থেটিক অংশ হিসাবে কার্য করে তাহাকে সহযোগী উৎসেচক বলা হয়। কিছু কিছু উৎসেচকের প্রোটিনের সহিত প্রোটীন ব্যতীত (Non-protein) অন্য রাসায়নিক যুক্ত থাকে। এই সহযোগী উৎসেচক প্রস্থেটিক অংশ লৌহ, তাম্র, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ (Iron, Copper, Zinc, Manganese) ইত্যাদি লইয়া গঠিত হয়।

উৎসেচকের মূল প্রোটিন অংশটিকে অ্যাপোএনজাইম (Apoenzyme) বলা হয়। অ্যাপোএনজাইম এবং কোএনজাইম মিলিত হইয়া হলোএনজাইম (Holoenzyme) গঠন করে।

24.6 সহযোগী উৎসেচকের শ্রেণীবিন্যাস

I. রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী

(a) (i) অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP)

(ii) নিকোটিনামাইড অ্যাডিনোসিন ডাই নিউক্লিওটাইড ফসফেট (NADP এবং NAD)

(iii) ফ্লেভিন মোনোনিউক্লিওটাইড (FMN), থাইয়ামিন পাইরোফসফেট (TPP), ভিটামিন B_6 (পিরিডক্সিন)। ইহাদের সকলেরই অ্যারোমেটিক হেটারো রিং (Aromatic hetero ring) আছে।

(b) (i) বাইওটিন,

(ii) লাইপোইক অ্যাসিড। ইহাদের নন-অ্যারোমেটিক হেটারো রিং (Nonaromatic hetero ring) থাকে।

(c) (i) সুগার ফসফেট

(ii) কোএনজাইম Q। ইহাদের হেটারো রিং (Hetero ring) নাই।

II. কার্য অনুযায়ী

(a) গ্রুপ স্থানান্তরকারী (Group transferring)

(i) ATP

(ii) সুগার ফসফেট

(iii) TPP

(iv) কোএনজাইম-এ (CoA)

(v) পিরিডক্সাল ফসফেট

(vi) বাইওটিন

(b) হাইড্রোজেন স্থানান্তরকারী (Hydrogen transferring)

(i) NAD এবং NADP

(ii) FMN এবং FAD

(iii) কোএনজাইম Q

(c) পুষ্টি সংক্রান্ত

CoA, TPP, NAD এবং NADP, পিরিডক্সাল ফসফেট, FMN, FAD, ফোলিক অ্যাসিড কোএনজাইম, বাইওটিন।

24.6 অন্তঃ উৎসেচক এবং বহিঃ উৎসেচক

যে সমস্ত উৎসেচক কোষের মধ্যে থাকিয়া কাজ করে তাহাদের **অন্তঃউৎসেচক** (Endoenzyme) এবং যাহারা কোষের বাহিরে আসিয়া কাজ করে তাহাদের **বহিঃউৎসেচক** (Exoenzyme) বলে।

আইসোএনজাইম অথবা আইসোজাইম (Isoenzyme or Isozyme) : যে উৎসেচকগুলি বিভিন্ন আকারে থাকে এবং যাহাদের আকারগুলি রাসায়নিক-ভাবে, ইমুউনোলজি অনুসারে (Immunologically) এবং ইলেকট্রোফোরেটিক ধর্ম অনুযায়ী (Electrophoretically) পৃথক তাহাদের আইসোএনজাইম বলা হয়।

উপস্থিতি :—স্তন্যপায়ী, উভচর, পাখি, পতঙ্গ ইত্যাদির রক্তরসে, এককোষী প্রাণীদের দেহরসে (Serum) এবং উদ্ভিদ কলাতে আইসোজাইম থাকে।

উদাহরণ—বিভিন্ন ডিহাইড্রোজিনেজ (ল্যাক্টেট ডিহাইড্রোজিনেজ), অক্সিডেজ, ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, ফসফাটেজ ইত্যাদি।

24.7 বিভিন্ন কার্যকরী উৎসেচক

কার্বোহাইড্রেটের উপর নিম্নোক্ত উৎসেচক কাজ করে—টায়ালিন, সুক্রেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ (Ptyalin, Sucrase, Maltase, Lactase)। প্রোটীনের উপর নিম্নোক্ত উৎসেচক কাজ করে—পেপসিন, ট্রিপসিন, ইরেপসিন (Pepsin Trypsin, Erepsin)। লিপিডের উপর বিক্রিয়াকারী উৎসেচকের নাম লাইপেজ

মানুষের পৌষ্টিক নালীতে নিঃসৃত প্রধান উৎসেচক সমূহ

এনজাইম	উৎস	ক্রিয়াস্থল	ক্রিয়াধীন বস্তু	ক্রিয়াজাত বস্তু
টায়ালিন	লালাগ্রন্থি	মুখবিবর	স্টার্চ ও অন্যান্য পলিস্যাকারাইড	ডেক্সট্রিন, মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ
পেপসিন	পাকস্থলীর গ্রন্থি	পাকস্থলী	প্রোটিন	পেপটোন
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	ডিওডিনাম	প্রোটিন	পেপটাইড
কাইমোট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	ডিওডিনাম	কেসিন	প্যারাকেসিন
কার্বক্সিপেপটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়	ডিওডিনাম	প্রোটিন, পেপটাইড	ক্ষুদ্রতর পেপটাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড
অ্যামাইলপসিন	অগ্ন্যাশয়	ডিওডিনাম	পলিস্যাকারাইড	মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, গ্লুকোজ
লাইপেজ	অগ্ন্যাশয়, আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	ট্রাইগ্লিসেরাইড, ফ্যাট	ডাইগ্লিসেরাইড, মোনোগ্লিসেরাইড, ফ্যাটি অ্যাসিড
রাইবোনিউক্লিয়েজ	অগ্ন্যাশয়	ডিওডিনাম	আর এন এ	রাইবোনিউক্লিওটাইড
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ	অগ্ন্যাশয়	ডিওডিনাম	ডি. এন এ.	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড
এন্টেরোকাইনেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন	সক্রিয় ট্রিপসিন
অ্যামাইনোপেপটাইডেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	প্রোটিন, পেপটাইড	ক্ষুদ্রতর পেপটাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড
ট্রাইপেপটাইডেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	ট্রাইপেপটাইড	ডাইপেপটাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড
ডাইপেপটাইডেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	ডাইপেপটাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড
আইসোমল্টেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	ডেক্সট্রিন	মল্টোজ, গ্লুকোজ
মল্টেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	মল্টোজ	গ্লুকোজ
সুক্রেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	সুক্রোজ	গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ
ল্যাকটেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	ল্যাকটোজ	গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ
নিউক্লিওটাইডেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	নিউক্লিওটাইড	নিউক্লিওসাইড, ফসফেট
নিউক্লিওসাইড ফসফোরিলেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ক্ষুদ্রান্ত্র	নিউক্লিওসাইড	পিউরিন, পিরিমিডিন, পেন্টোজ ফসফেট

(Lipase)। শ্বাসক্রিয়ার কয়েকটি উৎসেচক হইল সাইটোক্রোম অক্সিডেজ ও ডিহাইড্রোজিনেজ (Cytochrome oxidases and Dehydrogeneses)।

কোষের মধ্যে উৎসেচক একবার সৃষ্ট হইলেই তাহা চিরস্থায়ী হয় না। অতি ব্যবহারে উহারা স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হইয়া যায়। নষ্ট হইলে কোষের মধ্যে উহারা পুনরায় সংশ্লেষিত হয়। উৎসেচক সংশ্লেষ জীন (Gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি জীন কর্তৃক একটি উৎসেচক অথবা একটি জীন কর্তৃক বহু উৎসেচকের (One gene one enzyme or one gene many enzymes) সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

অনুচ্ছেদ 25

হর্মোন (Hormone)

25.1 ভূমিকা

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine glands) বা অনাল গ্রন্থি (Ductless glands) হইতে ক্ষরিত জৈব অনুঘটকের ন্যায় কার্যকরী যৌগকে হর্মোন (Hormone) বলে। প্রাণিদেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অঙ্গের শারীরবৃত্তীয় কার্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনায় হর্মোনের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রীক শব্দ 'Hormao' হইতে গৃহীত হর্মোন কথাটির শব্দগত অর্থ "উত্তেজক" ; কিন্তু হর্মোন সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উদ্দীপনা জোগায় না। ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ক্রিয়া বিপরীতমুখী হইতে পারে। হর্মোনকে "উদ্বোধক" নামেও অভিহিত করা হয়। উৎপত্তিস্থল হইতে নিঃসৃত হর্মোন দেহের বিভিন্ন অংশে সংবাহিত হইয়া রাসায়নিক সহযোজনে (Chemical co-ordination) অংশ গ্রহণ করে। হর্মোনকে সংক্ষেপে রাসায়নিক সংবাদবাহক বলা হয়। ইহাদের প্রাথমিক কার্য হইতেছে এক ধরনের কোষের সমষ্টি হইতে "রাসায়নিক বার্তা" (Chemical message) অন্য কোষ গোষ্ঠীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

25.2 হর্মোনের বৈশিষ্ট্য

বহুকোষী প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক সহযোজনে হর্মোনের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রাণিদেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হর্মোন দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তের মাধ্যমে সংবাহিত হইয়া স্থান নির্দিষ্ট অঙ্গের (Target organ) কার্যাদি নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়। প্রাণিদেহে বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহে (Endocrine glands) নানা ধরনের হর্মোন উৎপন্ন হয়। প্রাণিদেহে সকল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি সহযোগিতার ভিত্তিতে অবস্থান করে এবং উহারা একত্রে এণ্ডোক্রাইন তন্ত্র (Endocrine system) গঠন করে। হর্মোনের ক্রিয়ার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :—

i. উৎসেচক ও ভিটামিনের ন্যায় হর্মোন স্বল্প মাত্রা বা ঘনত্বে কার্যকরী হয়।

ii. হর্মোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে অথবা অনুঘটকের (Catalyst) ন্যায় স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত না হইয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করিতে সমর্থ।

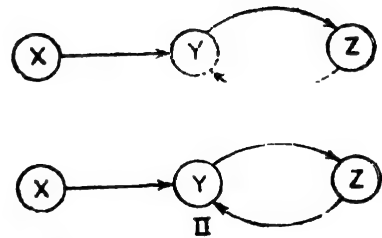
iii. হর্মোন যে গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয় সেই গ্রন্থিতেই সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনে নিঃসৃত হয়। স্বীয় কার্য সম্পাদন করার পর হর্মোন সাধারণত নিষ্ক্রিয় ও বিনষ্ট হইয়া যায়।

iv. অধিকাংশ হর্মোনের ক্রিয়া দ্রুত সংঘটিত হয় (যথা—অ্যাড্রিনালিন)। কতকগুলি হর্মোনের ক্রিয়া ধীর গতিতে সম্পাদিত হয় (যথা– থাইরক্সিন)।

v. একই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে একাধিক হর্মোন নিঃসৃত হইতে পারে।

vi. কয়েকটি হর্মোন দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রাণিদেহের শর্করার আপেক্ষিক পরিমাণ ও প্রাণীদের বৃদ্ধি একাধিক হর্মোন দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

vii. হর্মোন উৎপাদনকারী গ্রন্থিসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না। একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্রিয়া অন্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্রিয়ার উপর উহা নির্ভরশীল। ইহারা প্রত্যেকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকরী হয়। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি X হইতে ক্ষরিত হর্মোন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি Y-কে উদ্দীপিত করে। Y গ্রন্থি তাহার বিনিময়ে X গ্রন্থির ক্ষরণ বন্ধ করিতে পারে (চিত্র 25.1)। উদাহরণস্বরূপ পিট্যুইটারী গ্রন্থির অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হর্মোন থাইরয়েড, জনন অঙ্গ এবং অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ-ক্রিয়ায় উদ্দীপনা আনিয়া দেয়। উক্ত তিনটি গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত নির্দিষ্ট হর্মোন পিট্যুইটারী গ্রন্থির অগ্রভাগের হর্মোনের ক্ষরণ বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন একটি বিশেষ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্ষরণ ক্রিয়া পরোক্ষভাবে অন্য গ্রন্থির মাধ্যমে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফিড-ব্যাক (Feed-back) পদ্ধতি বলে। ফিড-ব্যাক প্রক্রিয়ার দ্বারা এণ্ডোক্রাইন তন্ত্রের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।



চিত্র 25.1 ফিডব্যাক প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ। I নেগেটিভ ফিডব্যাক—X-গ্রন্থি Y-গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে; অনুরূপ ভাবে Y-গ্রন্থি Z-গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে; উদ্দীপ্ত Z-গ্রন্থি কিন্তু Y-গ্রন্থির ক্ষরণ রোধ করে। II পজিটিভ ফিডব্যাক—X-গ্রন্থি Y-গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে; Y-গ্রন্থি Z-গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে; সক্রিয় Z-গ্রন্থি এক্ষণে Y-গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে।

viii. কয়েকটি হর্মোনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভিটামিন নির্ভর।

ix. হর্মোন সহজেই জলে দ্রবণীয়, ফলে ইহা সহজেই রক্তস্রোত বা কোষরসের মাধ্যমে বাহিত হইতে পারে।

x. হর্মোনের আণবিক গুরুত্ব খুব কম হওয়ায় ইহা সহজেই কৌশিক প্রাচীর ভেদ করিয়া অন্তরকোষ স্থানে যাইতে পারে।

xi. কয়েকটি হর্মোন ব্যতীত (যথা—ইনসুলিন) প্রায় সব কয়টি হর্মোনের অণুগুলি সহজেই ব্যাপন ক্রিয়া দ্বারা কোষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে বা কোষ হইতে বাহিরে আসিতে পারে।

25.3 হর্মোনের শ্রেণীবিন্যাস

I. রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী

(a) প্রোটীন (পলিপেপটাইড)

উদাহরণ—ইনসুলিন (Insulin), বৃদ্ধি হর্মোন (GH)

(b) স্টেরয়েড—ইহাদের কেন্দ্রীয় অংশে সাইক্লোপেন্টানোপারহাইড্রো ফেনান্থ্রিন (Cyclopentanoperhydro phenanthrene) বলয় (Ring) থাকে।

উদাহরণ—কর্টিকোস্টেরয়েড (Corticosteroid), অ্যান্ড্রোজেন (Androgen), ইস্ট্রোজেন (Estrogen)

II. কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী

(a) ধ্রুপদী (Classical) হর্মোন—ইহারা নির্দিষ্ট অঙ্গে (Target organ) কার্য করে। যথা—থাইরক্সিন, ইনসুলিন ইত্যাদি।

(b) গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল হর্মোন (GI hormones)—ইহারা পৌষ্টিক নালীর মধ্যে ক্রিয়া করে. যথা—সিক্রিটিন (Secretin), কোলেসিস্টোকাইনিন-প্যানক্রিওজাইমিন (CCK-PZ)

(c) স্থানীয় (Local) হর্মোন—ইহারা উৎপত্তিস্থলেই কার্য করে। উদাহরণ—হিস্টামিন (Histamine), প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন (PG) ইত্যাদি।

25.5 হর্মোনের ক্রিয়ার সম্ভাব্য প্রণালী (Mechanism of action of hormones)

(1) এনজাইম সংশ্লেষ নিউক্লিয়াসকে উদ্দীপনা প্রদান (Induction of enzyme synthesis at nuclear level)

(a) সাইটোসলে স্টেরয়ড হর্মোন একটি বাইন্ডিং প্রোটীনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোষের নিউক্লিয়াসে পরিবাহিত হয়।

(b) ক্রোমাটিনের সহিত বিক্রিয়ার পরে উহা mRNA-র সংশ্লেষ ঘটায়। এই mRNA ছাঁচ (Template) হিসাবে ক্রিয়া করিয়া নির্দিষ্ট প্রোটীন এনজাইমের সংশ্লেষ ঘটায়। উহা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে (Endoplasmic reticulum) সঞ্চিত থাকে।

(c) থাইরয়েড হর্মোনও অনুরূপভাবে কাজ করে, কিন্তু হর্মোনগুলি ক্রোমাটিনের স্তরে প্রোটিনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়।

(2) রাইবোসোম স্তরে এনজাইম সংশ্লেষ (Enzyme synthesis at ribosomal level)

হর্মোন রাইবোসোমে সংবাদের অনুবাদের (Translation of information) ক্ষমতার উপর ক্রিয়া করিয়া উৎসেচক প্রোটিনের সংশ্লেষ নিবেশিত করে।

(3) **উৎসেচকের প্রত্যক্ষ সক্রিয়করণ** (Direct activation at enzyme level)

সম্ভবতঃ কোষের পর্দায় অবস্থিত হর্মোন-গ্রাহকের (Hormone receptor)-সহিত যুক্ত হইয়া হর্মোন ক্রিয়া করে।

(4) **কোষ পর্দায় হর্মোন ক্রিয়া** (Hormonal action at membrane level)

(a) অনেক হর্মোন কার্বোহাইড্রেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড ইত্যাদির স্থানান্তর ঘটায়। সাধারণত ইহারা কোষের পর্দার সহিত বিশেষ রীতিতে যুক্ত হয়।

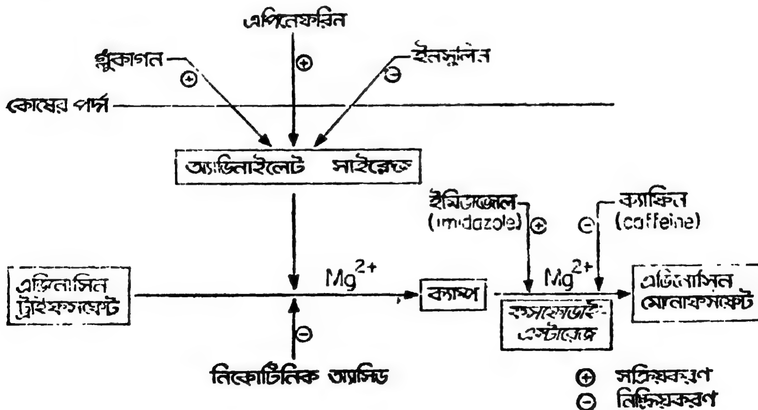
(b) অধিকাংশ প্রোটিন হর্মোন কোষের পর্দায় অবস্থিত নির্দিষ্ট গ্রাহকদের (Specific receptor) সহিত যুক্ত হইয়া পর্দার বিভিন্ন উৎসেচক তন্ত্রকে (Membrane enzyme system) সক্রিয় করে।

(c) অধিক পরিমাণে ইনসুলিন এবং থাইরয়েড হর্মোন ক্ষরিত হইলে গ্রাহকদের সংখ্যা কমিয়া যায়।

(5) **ক্যাম্পের সহিত হর্মোন ক্রিয়ার সম্পর্ক**

ক্যাম্প (cAMP-3', 5' cyclic adenosine monophosphate) একটি নিউক্লিওটাইড।

(a) গ্লুকাগণ যকৃতে ক্যাম্পের (cAMP) পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি করে (চিত্র 25.2)। পেশীর তুলনায় যকৃতে এপিনেফরিনের কার্য বিপরীতধর্মী। ইনসুলিন যকৃতে ক্যাম্পের পরিমাণ হ্রাস করে।



চিত্র 25.2 cAMP ও হর্মোন ক্রিয়ার সম্বন্ধপরতার চিত্ররূপ।

(b) সম্ভবত হর্মোনগুলি কোষ পর্দায় নির্দিষ্ট গ্রাহকের সহিত যুক্ত হয় এবং ইহা অ্যাডিনাইলেট সাইক্লেজ (Adenylate cyclase) এনজাইমকে সক্রিয় করিয়া তোলে। ক্যাম্প শেষ পর্যন্ত অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেটে পরিণত হয়।

(c) ক্যাম্প দ্বারা ফসফোরাইলেজের সক্রিয়করণ—ফসফোরাইলেজ কাইনেজ এনজাইমের সরাসরি সক্রিয়করণের ফলে ফসফোরাইলেজ সক্রিয় হয়।

(d) অ্যাডিপোজ (Adipose) কলাতে ক্যাম্প অনুরূপভাবে প্রোটিন কাইনেজ এনজাইমকে সক্রিয় করিয়া লাইপোলাইসিস (Lipolysis) ঘটায়।

বর্তমানে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় ক্যাম্প যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

25.6 প্রাণি-হর্মোন (Animal hormones)

প্রাণিদেহে বিভিন্ন হর্মোন উৎপন্নকারী গ্রন্থি থাকে। প্রতিটি গ্রন্থি এক বা একাধিক হর্মোন উৎপাদন করে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হর্মোন উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলি মেরুদণ্ডীদের তুলনায় অনুন্নত।

অমেরুদণ্ডীদের বিভিন্ন হর্মোন

চ্যাপ্টা ক্রিমি, অঙ্গুরীমাল, খোলকী ও সন্ধিপদ প্রাণীদের দেহে হরমোনের উপস্থিতি প্রমাণিত হইয়াছে। চিংড়ী জাতীয় প্রাণীদের পুঞ্জাক্ষির বৃন্তে অবস্থিত **সাইনাস গ্রন্থি** (Sinus gland) এক প্রকার হর্মোন উৎপন্ন করে। ইহার প্রভাবে **রঞ্জক-কোষগুলি** (Chromatophores) সম্প্রসারিত ও ঘন হইতে পারে। এই সম্প্রসারণ ও ঘনীভবনের ফলে চিংড়ী পরিবেশের রঙের সহিত নিজের গায়ের রঙ মেলায়।

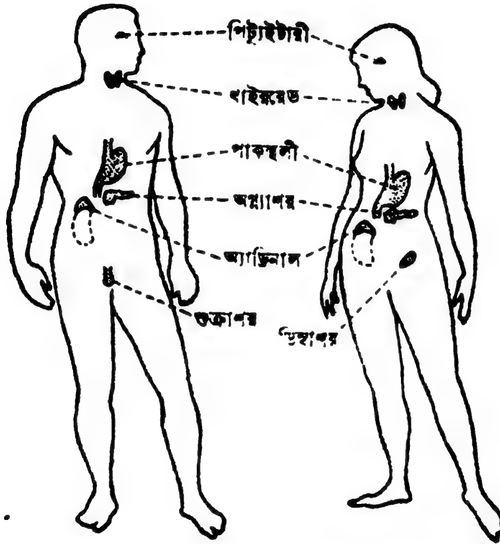
পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের **নির্মোচন** (Moulting) এবং শূককীট হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় **রূপান্তর** (Metamorphosis) হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সকল পতঙ্গের মস্তিষ্কের ঠিক পশ্চাতে অবস্থিত **কর্পাস অ্যালাটাম** (Corpus allatum) হইতে একটি হর্মোন রূপান্তরে সাহায্য করে। অপরপক্ষে মস্তিষ্কের পারস্ ইন্টারসেরিব্রালিস্ (Pars intercerebralis) অংশের **নিউরোসিক্রিটরি কোষগুলি** (Neuro-secretory cells) হইতে নিঃসৃত অন্য একটি হর্মোন নির্মোচন ও রূপান্তর ত্বরান্বিত করে। সিল্ক মথের শূককীট হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রূপান্তর দুইটি হর্মোনের সহযোগিতার ফলে সম্ভব হয়। পারস্ ইন্টারসেরিব্রালিসের নিউরোসিক্রিটরি কোষগুলি এন্. এস্. এইচ্. (N S. H.) নামক একটি হর্মোন উৎপন্ন করে। ইহা করপোরা কার্ডিয়াকার (Corpora cardiaca) অ্যাক্সনের মাধ্যমে বাহিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এন্. এস্. এচ্. প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে (Prothoracic glands) উত্তেজিত করিয়া **এক্‌ডাইসোন** (Ecdysone) নামক একটি হর্মোন নিঃসৃত হইতে সাহায্য করে। এক্‌ডাইসোন বৃদ্ধি ও রূপান্তরে অংশ গ্রহণ করে। শূককীট অবস্থায় করপোরা অ্যালাটা হইতে নিঃসৃত একটি হর্মোন স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে সহায়তা করে।

যাযাবর মথ, পিপীলিকা, বিভিন্ন পতঙ্গ এবং বহু প্রাণীর দেহ হইতে নিঃসৃত **ফিরোমন** (Pheromone) নামক উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট একপ্রকার হর্মোন নিজ প্রজাতিদের

মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করে। ইহারা গমনপথে ফিরোমন ছড়াইয়া যায়। ফলে পথ অনুসরণ এবং প্রত্যাবর্তনে সাহায্য হয়। মৌমাছিদের জীবন যাপনে ফিরোমনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

মেরুদণ্ডীদের হর্মোন

মেরুদণ্ডীদের দেহে বিশেষ ধরনের হর্মোন উৎপাদনকারী অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে মেরুদণ্ডীদের দেহ নিঃসৃত হর্মোন নানাবিধ বিপাকীয় ও জৈব ক্রিয়ায় সক্রিয়



চিত্র 25.3 মানুষের দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের অবস্থানের চিত্ররূপ।

অংশ গ্রহণ করে (চিত্র 25.3)। নিম্নে মানুষের বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হর্মোন ও উহাদের ক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :—

I. পিট্যুইটারী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হর্মোন (Hormones secreted by Pituitary gland)

এণ্ডোক্রাইন তন্ত্রের (Endocrine system) অধিনায়ক পিট্যুইটারী গ্রন্থি অগ্রমস্তিষ্কের ডায়েনকেফালন অংশের অংকদেশে অবস্থিত। ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট এই গ্রন্থি অস্থিনির্মিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত। পিট্যুইটারি গ্রন্থি তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—

(a) অগ্রভাগ (Pars anterior or Adenohypophysis)
(b) মধ্যভাগ (Pars intermedia)
(c) পশ্চাদ্‌ভাগ (Pars posterior or Neurohypophysis)

A. পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হর্মোন

পিটুইটারির অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত ট্রপিক (Tropic) হর্মোন প্রধানত অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্ষরণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। হর্মোনগুলির নাম ও কার্য :

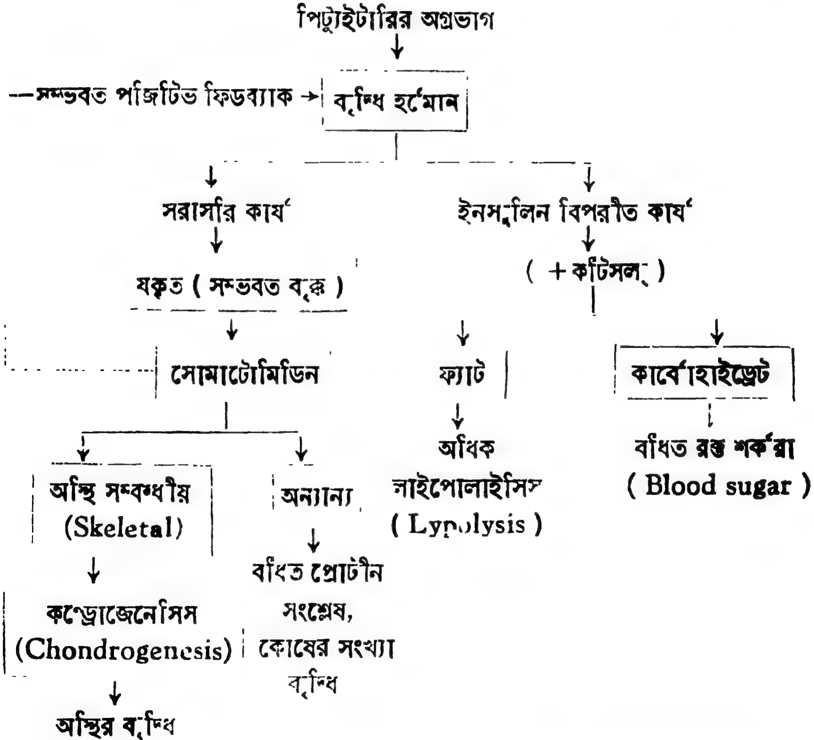
(1) **সোমাটোট্রপিক হর্মোন** (Somatotropic Hormone or STH) বা বৃদ্ধি হর্মোন (Growth Hormone)

রাসায়নিক গঠন : বৃদ্ধি হর্মোন একটি পলিপেপটাইড। ইহাতে 91টি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এবং ইহার আণবিক ওজন 21,500।

কার্য

(1) দেহের সামগ্রিক সুসামঞ্জস্য বৃদ্ধি করে।

(2) সোমাটোমিডিন (Somatomedin) সংশ্লেষ ঘটাইয়া ইহা ক্রিয়া করে।



ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : (a) হাইপোথ্যালামাস হইতে বৃদ্ধি হর্মোন নিঃসারী হর্মোন (GHRH) এবং বৃদ্ধি হর্মোন প্রতিরোধী হর্মোন (GHIH) ক্ষরিত হয়। ইহারা যথাক্রমে বৃদ্ধি হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি এবং হ্রাস করে।

(b) বৃদ্ধি হর্মোনের ক্ষরণ ব্যায়াম (Exercise), হাইপোগ্লাইসিমিয়া (Hypoglycemia), উপবাস, উত্তেজনা এবং ঠাণ্ডার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়।

STH অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষরিত হইলে অতিকায়ত্ব (Gigantism) ও অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly) রোগের উদ্ভব হয়। কম নিঃসৃত হইলে বামনত্ব (Dwarfism) দেখা যায়।

অতিকায়ত্ব : লম্বা অস্থিগুলির অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে এবং হাত ও পা দেহের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহারা সাধারণত মানসিক ভাবে অসুস্থ হয় (Mentally subnormal)।

অ্যাক্রোমেগালি : ইহা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। হাত ও পায়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং চর্ম পুরু হইয়া যায়। চোয়াল নিচে ঝুলিয়া পড়ে [প্রোগন্যাথিজম (Prognathism)] ও মুখ রুক্ষ হইয়া উঠে।

বামনত্ব : ইহা শিশুদের হইয়া থাকে। বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং জনন অঙ্গের সম্পূর্ণ স্ফুরণ হয় না (Sexual retardation)।

(2) **থাইরোট্রপিক হর্মোন** (Thyrotropic hormone) বা **থাইরয়েড উত্তেজক হর্মোন** (TSH)

রাসায়নিক গঠন : ইহা একটি গ্লাইকোপ্রোটীন এবং ইহার আণবিক ওজন 30,000। TSH-α এবং TSH-β নামক দুইটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (Chain) ইহা গঠন করে।

কার্য : থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও কার্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে সংবহনে থাইরক্সিন নিঃসরণ (Release) বৃদ্ধি করে।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : হাইপোথ্যালামাস হইতে থাইরোট্রপিন নিঃসারী হর্মোন (TRH) নামক একটি ট্রাইপেপটাইড ক্ষরিত হয়। এবং ইহা TSH-এর ক্ষরণের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। ইহার কার্যের জন্যে ক্যালসিয়াম আবশ্যক।

(3) **অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হর্মোন** (Adrenocorticotropic hormone বা ACTH)

রাসায়নিক গঠন : ACTH 39টি অ্যামাইনো অ্যাসিড লইয়া গঠিত একটি পলিপেপটাইড এবং ইহার আণবিক ওজন প্রায় 45,000।

কার্য : (a) ইহা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(b) কোলেস্টেরল হইতে স্টেরয়েড হরমোন সংশ্লেষে ইহার ভূমিকা আছে।

(c) চর্মে মেলানিনের (Melanin) বিস্তারণে (Dispersion) ইহা সাহায্য করে।

(d) অগ্ন্যাশয় হইতে ইনসুলিন ক্ষরণে ইহা উদ্দীপক রূপে কাজ করে।

(e) অ্যাডিপোজ কলাতে ইহা লাইপোলাইসিস (Lipolysis) ঘটায়।

(f) অধিক পরিমাণে ACTH কুশিংগস্ রোগ (Cushing's disease) সৃষ্টি করে.

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : (a) হাইপোথ্যালামাসের কর্টিকোট্রপিন নিঃসারী হর্মোন (CRH) ইহার ক্ষরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

(b) চাপের (Stress) [যথা—মানসিক চাপ, উদ্বেগ] দ্বারা হাইপোথ্যালামাসের কেন্দ্র (Centre) সক্রিয় হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে ACTH ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। ।

(4) গোনাডোট্রপিক হর্মোন (GTH)

(a) ফলিকুল উত্তেজক হর্মোন (FSH)

রাসায়নিক গঠন : ইহা গ্লাইকোপ্রোটিন এবং α এবং β-উপএকক (Subunit) দ্বারা গঠিত।

কার্য : (i) স্ত্রী সত্তোর ক্ষেত্রে ইহা গ্রাফিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি এবং পরিণতি ঘটায় এবং ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণ ঘটায়।

(ii) পুরুষের ক্ষেত্রে ইহা সেমিনিফেরাস নালিকা (Seminiferous tubule) এবং শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ঘটায়। শুক্রাণু উৎপাদনের (Spermatogenesis) প্রারম্ভিক অবস্থায় ইহা সাহায্য করে।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : টেস্টোস্টেরন, প্রোজেস্টেরন এবং অধিক পরিমাণে FSH স্বয়ং এই হর্মোনের ক্ষরণ রোধ করে।

(b) লুটিনাইজিং হর্মোন (LH)

রাসায়নিক গঠন : FSH-এর ন্যায় ইহাও α এবং β উপএকক দ্বারা গঠিত গ্লাইকোপ্রোটীন।

কার্য : (1) স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা গ্রাফিয়ান ফলিকলের অন্তিম পরিণতি, ওভুলেশন (Ovulation), কর্পাস লুটিয়ামের (Cornus luteum) সৃষ্টি এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ ঘটায়।

(b) পুরুষের ক্ষেত্রে ইহা টেস্টোস্টেরনের ক্ষরণ ঘটায় ফলে শুক্রাণু উৎপাদন অব্যাহত থাকে। ইহার ক্রিয়ায় গৌণ পুরুষ চরিত্রের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

(5) প্রোল্যাক্টিন (PL)

রাসায়নিক গঠন : ইহা প্রোটীন নির্মিত এবং ইহার আণবিক ওজন 23,000।

কার্য : (a) ইহা কর্পাস লুটিয়ামকে সক্রিয় করে এবং প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(b) পায়রার ক্ষেত্রে ইহা ক্রপস্থ (Crop) গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি করে এবং 'পায়রার দুগ্ধ' (Crop-milk or Pigeon's milk) ক্ষরণ করে।

(c) গর্ভাবস্থায় ইহা স্তন গ্রন্থির (Mammary gland) ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : PL ক্ষরণ হাইপোথ্যালামাসের প্রোল্যাক্টিন রোধক ফ্যাক্টরের (PIF) ক্রিয়ায় হ্রাস পায়।

B. পিট্যুইটারি গ্রন্থির মধ্যভাগ হইতে নিঃসৃত হর্মোন :

ইন্টারমিডিন (Intermedin) অথবা মেলানোসাইট উদ্দীপক হর্মোন (MSH)

রাসায়নিক গঠন : ইহা α-MSH এবং β-MSH নামক দুটি পেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। α-MSH শৃঙ্খল ACTH-এর শৃঙ্খলের প্রথম 13টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অনুরূপ।

কার্য : ইহা মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও মানুষের রঙ্গক কোষের (Melanocyte) বিস্তারণ ঘটাইয়া গায়ের রঙ পরিবর্তনে সহায়তা করে। ACTH-এর পরিমাণ অধিক হইলে, দেহে রঙ্গকবৃদ্ধি হয় (Pigmentation) [অ্যাডিসন বর্ণিত রোগ (Addison's disease)]।

C. পিট্যুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে নিঃসৃত হর্মোন :

পিট্যুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে নিঃসৃত হর্মোনকে **পিট্যুইট্রিন** (Pituitrin) বলে। পিট্যুইট্রিন দুইটি হর্মোন লইয়া গঠিত, যথা—(a) **ভ্যাসোপ্রেসিন** (Vasopressin) বা **অ্যান্টি-ডাইইউরেটিক হর্মোন** (Antidiuretic hormone ADH) বা **পিট্রেসিন** (Pitressin) এবং (b) **অক্সিটোসিন**।

রাসায়নিক গঠন : ভ্যাসোপ্রেসিন 8টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত একটি চক্রাকার (Cyclic) পলিপেপটাইড। ইহার গঠন অক্সিটোসিনের অনুরূপ কেবল আইসোলিউসিনের পরিবর্তে ফিনাইল অ্যালানিন এবং লিউসিনের পরিবর্তে লাইসিন থাকে।

কার্য : (1) বৃক্কনালীর (Renal tubules) জল শোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে মূত্রে জলের পরিমাণ কম হইয়া যায়। জালকের সংকোচনে সাহায্য করে, ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এই হর্মোনের অপ্রতুল ক্রিয়ার ফলে **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** (Diabetis insipidus) নামক বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়।

(2) ইহা গোনাডোট্রপিনের ক্ষরণ রোধ করে, বিশেষ করিয়া LH।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : শারীরিক এবং মানসিক চাপ (Stress)। অ্যাসিটাইল কোলিন, নিকোটিন, মরফিন ইত্যাদি ADH ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(b) **অক্সিটোসিন** (Oxytocin) বা **পিটোসিন** (Pitosin)

রাসায়নিক গঠন : 8টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত ইহা একটি চক্রাকার পলিপেপটাইড। আনুমানিক আণবিক ওজন 1000।

কার্য : (1) ইহা স্তনের পেশীর সংকোচন ঘটাইয়া দুগ্ধ ক্ষরণে সাহায্য করে।

(2) প্রসবকালে ইহা জরায়ুর পেশীর সংকোচন ঘটায়।

(3) পিত্তথলি, অন্ত্র ইত্যাদির সংকোচন এই হর্মোনের দ্বারা সাধিত হয়।

II. থাইরয়েড হইতে নিঃসৃত হর্মোন (**Hormones secreted by thyroid gland**)

শ্বাসনালী সংলগ্ন ও স্বর যন্ত্রের অঙ্কদেশে অবস্থিত মানুষের ডিম্বাকৃতি **বিশিষ্ট**

থাইরয়েড গ্রন্থির দুইটি প্রধান অংশ একটি অনুভূমিক যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার রন্ধ্র থলির ন্যায় ফলিকল (Follicle) দ্বারা ইহা গঠিত। ফলিকলের প্রাচীর সমমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত এবং ফলিকল গহ্বর কোলয়েড দ্বারা পূর্ণ থাকে। কিছু প্যারাফলিকুলার (Parafollicular) কোষও থাকে।

থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত থাইরক্সিন (Thyroxine), ট্রাই-আয়োডো-থাইরোনিন (Tri-iodothyronine) এবং থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyro-calcitonin) নামক তিনটি হর্মোনের সমষ্টিকে থাইরয়েড হর্মোন বলে। আয়োডিন (I_2) এই হর্মোনের প্রধান সংগঠক।

রাসায়নিক গঠন : থাইরোগ্লোবুলিনের যথাক্রমে 3 এবং 5 সংখ্যক স্থানে আয়োডিনেশনের (Iodination) দ্বারা মোনোআয়োডোটাইরোসিন এবং ডাই-আয়োডোটাইরোসিন তৈয়ারী হয়। দুটি ডাইআয়োডোটাইরোসিন অণুর মিলনের (Coupling) দ্বারা থাইরক্সিন অণু গঠিত হয়। মোনো এবং ডাই-আয়োডোটাইরোসিনের মিলনের ফলে ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন গঠিত হয়।

পরিবহণ : সাধারণত 99·98% থাইরক্সিন রক্তরসের থাইরক্সিন বাইন্ডিং প্রি-অ্যালবুমেন (TBPA) এবং থাইরক্সিন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন (TBG) নামক প্রোটীনদ্বয়ের সহিত যুক্ত থাকে। কেবলমাত্র অবশিষ্ট মুক্ত থাইরক্সিন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

কার্য : (a) হাইপোথাইরয়েড অবস্থায় কলার অক্সিজেন ব্যবহার হ্রাস পায়, এবং রুগীর নাড়ির গতি (Pulse) মন্থর হইয়া পড়ে, মেদ জমে, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা বৃদ্ধি পায়, লাইপোলাইসিস কমিয়া যায়। হাইপারথাইরয়েড অবস্থায় ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটে।

(b) ইহা অন্ত্রে গ্লুকোজ শোষণ এবং যকৃত ও পেশীতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis) বৃদ্ধি করে।

(c) প্রোটীন সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে।

(d) অধিক পরিমাণ থাইরয়েড হর্মোন তাপ (Heat) সৃষ্টি করে। ফলে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

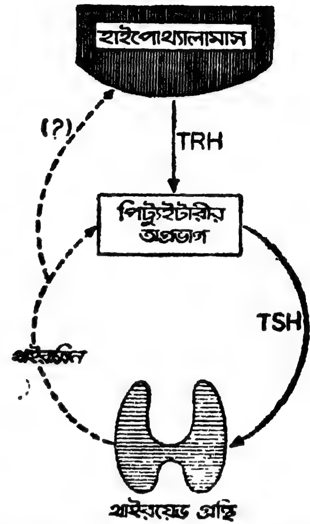
(e) হাইপারথাইরয়েড অবস্থায় দেহের প্রোটিন এবং ফ্যাট অপচিত হয়, ফলস্বরূপ দেহের ওজন কমিয়া যায়।

(f) স্ত্রী ঋতুচক্র (Menstrual cycle) এবং প্রজনন ক্ষমতার (Fertility) জন্যে থাইরয়েড হর্মোন আবশ্যক।

(g) হাইপোথাইরয়েড অবস্থায়, বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানসিক স্ফুরণ হ্রাস পায়।

(h) ব্যাঙাচির উপর থাইরক্সিন দিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহারা দ্রুত রূপান্তরিত হইয়া বামন (Dwarf) ব্যাঙে পরিণত হয়। হাইপোথাইরয়েড অবস্থায় রাখা ব্যাঙাচিরা কখনোই ব্যাঙে পরিণত হয় না। সুতরাং থাইরয়েড হর্মোন কলার বৃদ্ধি ও বিভাজনে উদ্দীপক হিসাবে কার্য করে।

থাইরয়েড হর্মোন ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : হাইপোথ্যালামাস হইতে থাইরোট্রপিন নিঃসারী হর্মোন (TRH) ক্ষরিত হয় এবং ইহা পিট্যুইটারীর অগ্রভাগ হইতে থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোনের (TSH) ক্ষরণ ঘটায় (চিত্র 25.4)। TSH থাইরয়েড গ্রন্থির উপর কার্য করিয়া থাইরয়েড হর্মোন সৃষ্টি করে। থাইরয়েড হর্মোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে নেগেটিভ ফিডব্যাক পদ্ধতিতে থাইরয়েড হর্মোনের ক্ষরণ রোধিত হয়। এই ফিডব্যাক পদ্ধতি পিট্যুইটারীর উপর বেশী মাত্রায় ক্রিয়া করে এবং সম্ভবত হাইপোথ্যালামাসের উপরও ইহার কার্য আছে।



চিত্র 25.4 থাইরক্সিন ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চিত্ররূপ।

থাইরয়েড গ্রন্থির অধঃক্রিয়া (Hypo-activity of Thyroid gland)

a. শিশুদের ক্রেটিনিজম্ (Cretinism) হয়। ইহাতে শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং কেশ কমিয়া যায়।

b. প্রাপ্তবয়স্কদের মিক্সিডিমা (Myxoedema) হয়। ইহাতে মুখ, হাত স্ফীত হইয়া যায় (Bloating), মৌলিক বিপাকীয় হার (BMR) হ্রাস পায়, দেহের তাপমাত্রা হ্রাস পায়, দেহের ওজন বৃদ্ধি পায়। মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

থাইরয়েড গ্রন্থির অধিক্রিয়া (Hyperactivity of thyroid gland)

থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন ক্ষরণ বেশী হইলে গ্রেভস্ রোগ (Grave's disease) হয়। বিস্ফারিত ও উদ্গত চক্ষু, থাইরয়েড গ্রন্থির অতি বৃদ্ধি (গলগণ্ড) (Hypertrophy), হাতের মৃদু কম্পন (Tremor), হৃদ্-স্পন্দনের হার বৃদ্ধি, নার্ভাসনেস (Nervousness), বর্ধিত BMR, ওজন বৃদ্ধি এবং তাপ সহ্য করিবার শক্তি হ্রাস পায়।

III. প্যারাথাইরয়েড হইতে নিঃসৃত হর্মোন (Hormones secreted bv Parathyroid)

মানুষের দুইজোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যে প্রোথিত থাকে। প্যারাথাইরয়েড হইতে নিঃসৃত হর্মোনকে **প্যারাথর্মোন** (Parathormone বা PTH) বলে। থাইরয়েড গ্রন্থির ন্যায় প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি হইতে **ক্যালসিটোনিন** (Calcitonin) ক্ষরিত হয়।

প্যারাথর্মোন (PTH)

রাসায়নিক গঠন : ইহা 84টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত একটি পলিপেপটাইড শৃংখল এবং ইহার আণবিক ওজন প্রায় 95,000।

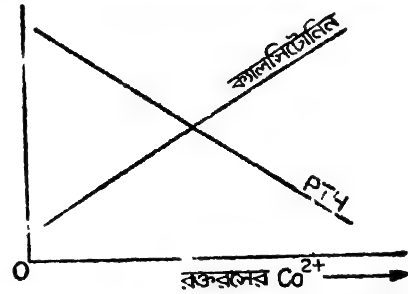
কার্য : ইহা প্লাজমায় ক্যালসিয়ামের ও ফসফরাসের পরিমাণ যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস করে। PTH মূত্রে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমাইয়া দেয় ও ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভিটামিন Dকে সক্রিয় করিয়া ইহা অন্ত্রে ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে। ইহা অস্থি হইতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস স্থানান্তরিত করে।

ক্যালসিটোনিন (Calcitonin)

রাসায়নিক গঠন : ইহা 32টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত একটি পলিপেপটাইড শৃংখল এবং ইহার আণবিক ওজন 3600।

কার্য : ইহা প্লাজমায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। অস্থি হইতে ইহা ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের স্থানান্তর রোধ করে।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : রক্তরসের ক্যালসিয়াম PTH এবং ক্যালসিটোনিনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যখন ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন PTH-এর ক্ষরণ হ্রাস পায় (চিত্র 25.5)। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পাইলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটে।



চিত্র 25.5 PTH, ক্যালসিটোনিন এবং রক্তরসের Ca^{2+} সম্বন্ধপরতার চিত্ররূপ।

অধিক্রিয়ার ফল : হাইপারপ্যারাথাইরয়ডিজমের (Hyperparathyroidism) ফলে অস্থি অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম বিমুক্ত হইয়া ভঙ্গুর হইয়া যায়। ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা, অজীর্ণতা ইত্যাদি লক্ষিত হয়।

অধঃক্রিয়ার ফল : হাইপোপ্যারাথাইরয়ডিজমের (Hypoparathyroidism) ফলে রক্তে ক্যালসিয়াম স্বল্প হইয়া যাওয়ায় নার্ভতন্ত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ঐচ্ছিক পেশীর অনৈচ্ছিক সংকোচন (Hypocalcemic tetany) ঘটে ও পেশী দুর্বল হইয়া পড়ে।

IV. **থাইমাস হইতে নিঃসৃত হর্মোন** (Hormone secreted by Thymus)

থাইমাস হইতে ক্ষরিত হর্মোন থাইমোসিন (Thymosin) শৈশব অবস্থায় অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সাহায্য করে।

V. অ্যাড্রিনাল (Adrenal) বা সুপ্রারেনাল (Suprarenal) গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হর্মোন

প্রতিটি বৃক্কের অগ্রভাগে টুপির ন্যায় অবস্থিত একটি করিয়া অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে অনেকগুলি হর্মোন নিঃসৃত হয়। প্রতিটি গ্রন্থি দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিকে মেডালা (Medulla) এবং পরিধিস্থ অঞ্চলটিকে কর্টেক্স (Cortex) বলে।

কর্টেক্স হইতে নিঃসৃত হর্মোনগুলিকে সামগ্রিকভাবে কর্টিকোস্টেরয়েড (Corticosteroid) বলে।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স তিনটি অংশ লইয়া গঠিত—

(1) **জোনা গ্লোমেরুলোসা** (Zona glomerulosa)

এই অংশ হইতে মিনারেলোকর্টিকয়েড (Mineralocorticoids), যথা—অ্যালডোস্টেরন (Aldosterone) নিঃসৃত হয়।

(2) **জোনা ফ্যাসিকুলাটা** (Zona fasciculata)

এই অংশ হইতে গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid) নিঃসৃত হয়।

(3) **জোনা রেটিকুলারিস** (Zona reticularis)

ইহা হইতে অ্যাড্রিনাল অ্যান্ড্রোজেন (Androgen) নিঃসৃত হয়।

মেডালা হইতে নিঃসৃত হর্মোন

অ্যাড্রিনাল মেডালা হইতে নিঃসৃত হর্মোনকে এপিনেফ্রিন (Epinephrine) ও নর-এপিনেফ্রিন (Nor-epinephrine) বলে।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স—কর্টিকোস্টেরয়েড হর্মোন।

রাসায়নিক গঠন—স্টেরয়েড হর্মোনগুলির একটি সাইক্লোপেণ্টানো পারহাইড্রো ফেনান্থ্রিন নিউক্লিয়াস থাকে, প্রাকৃতিক স্টেরয়েডগুলিতে সাধারণত অ্যালকোহল গ্রুপ থাকার ফলে উহাদের স্টেরল বলা হয়। উল্লেখযোগ্য স্টেরয়েডগুলি হইল কর্টিসল, 17-ডিহাইড্রক্সিকর্টিকোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন, এবং দুইটি অ্যান্ড্রোজেন-অ্যান্ড্রোস্টিনডাইওন এবং ডিহাইড্রো-এপি-অ্যান্ড্রোস্টেরন।

পরিবহণ—সংবহনে ইহারা কর্টিকোস্টেরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিনের (CBG) সহিত যুক্ত হইয়া পরিবাহিত হয়।

কার্য :

(a) **গ্লুকোকর্টিকয়েড**

(1) ইহারা রক্তে গ্লুকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়।

(2) পেশীতে ইহারা গ্লুকোজ ব্যবহার কমাইয়া দেয়, প্রোটীন সংশ্লেষ কমাইয়া দেয় ও প্রোটীন অপচিতি বাড়াইয়া দেয়।

(3) অ্যাডিপোজ কলাতে ইহারা লাইপোলাইসিস বৃদ্ধি করে।

(4) ইহারা গ্লুকোনিওজেনিসিসের (Gluconeogenesis) মূল উৎসেচক-গুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(5) ইহারা স্ফীতিরোধী (Antiinflammatory) এবং দেহসংরক্ষণবিরোধী (Immunosuppressive agent)।

(6) ইহারা চাপের (Stress-combating) মোকাবিলায় সহায়তা করে।

(b) মিনারেলোকর্টিকয়েড

ইহারা বিশেষত অ্যাল্ডাস্টেরন সোডিয়ামের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয় ও পটাসিয়ামের পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

(c) অ্যান্‌ড্রোজেন

(1) ইহারা দেহে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করে (প্রোটীন সংশ্লেষ বৃদ্ধি)

(2) স্বল্প পরিমাণে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ করে।

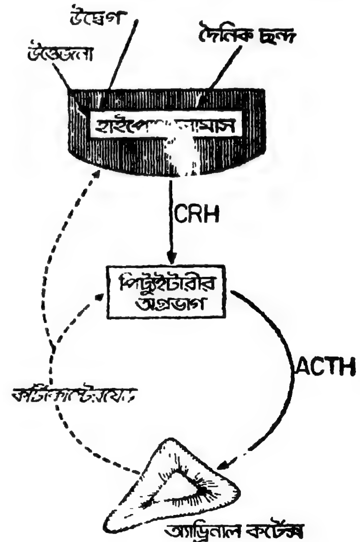
ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ

গ্লুকোকর্টিকয়েড (চিত্র 25.6)

(1) হাইপোথ্যালামাস হইতে নিঃসৃত CRH পিটুইটারীর অগ্রভাগের উপর কার্য করিয়া ACTH ক্ষরণ ঘটায়। ACTH-এর উদ্দীপনার সাহায্যে কর্টিকোস্টেরয়েড তৈয়ারী হয়। কর্টিসল স্বয়ং ফিডব্যাক পদ্ধতির দ্বারা নিজের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(2) কোন প্রকার চাপ (Stress) সরাসরি হাইপোথ্যালামাসের উপরে ক্রিয়া করিয়া অধিক মাত্রায় CRH ক্ষরণ ঘটায়। CRH অবশেষে কর্টিকোস্টেরয়েডের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটায়।

(3) দৈনিক ছন্দ (Diurnal rhythm) —মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ACTH ক্ষরণ সকালে বৃদ্ধি পায় ও সন্ধ্যায় হ্রাস পায়। ইহার জন্যে যে 'বায়োলজিক্যাল ঘড়ি' (Biological clock) ক্রিয়া করে, তাহা সম্ভবত হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত।



চিত্র 25.6 গ্লুকোকর্টিকয়েড ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চিত্ররূপ।

মিনারেলোকর্টিকয়েড—অ্যাল্ডোস্টেরন ক্ষরণ নিম্নোল্লিখিত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়:

(1) বৃক্কের ধমনীতে নিম্নচাপ (Low renal arterial pressure) থাকিলে রেনিন (Renin) বেশী ক্ষরিত হয় এবং উহা অ্যাল্ডোস্টেরন ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(2) মানসিক উত্তেজনা

(3) অধিক পরিমাণে রক্তরসে পটাসিয়াম থাকিলে।

(4) রক্তরসে স্বল্প পরিমাণে সোডিয়ামের উপস্থিতি।

অধিক্রিয়ার ফল

অ্যান্ড্রোজেনের অধিক ক্ষরণের ফলে অ্যাড্রিনোজেনিটাল সিন্ড্রোম (Adreno-genital syndrome) সৃষ্টি হয়। ইহাতে পুরুষদের অত্যাধিক লোম হয়, স্ত্রীর পুরুষোচিত লক্ষণ প্রকাশ পায় (Masculinisation of female) এবং শিশু অকালে যৌন শক্তি লাভ করে (Precocious psuedopuberty)।

অত্যাধিক গ্লুকোকর্টিকয়েড ক্ষরণের ফলে কুশিংস সিন্ড্রোম (Cushing's syndrome) পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে চাঁদের ন্যায় মুখাকৃতি (Moon-faced), কাঁধে মেদ জমা (Buffalo-hump), হাইপারটেনশন, প্রোটীন হ্রাস, মানসিক অসুস্থতা এবং প্রায়ই মধুমেহের সৃষ্টি হয়।

অত্যাধিক মিনারেলোকর্টিকয়েড ক্ষরণের ফলে (কনস্ সিন্ড্রোম (Conn's syndrome) পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে দেহে পটাসিয়ামের হ্রাস ও সোডিয়ামের বৃদ্ধি ঘটে ফলে ইডিমা (Oedema), হাইপারটেনসন, টিটানি, বহুবার মূত্রত্যাগ এবং অ্যালকালোসিস (Hypokalemic alkalosis) ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

অধঃক্রিয়ার ফল

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের অধঃক্রিয়ার ফলে অ্যাডিসনস্ রোগ (Addison's disease) সৃষ্টি হয়। ইহাতে হাইপোটেনশন, পেশী দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে অসামর্থ্য, রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাস, অধিক মেলানিন রঞ্জক বস্তুর সঞ্চয়, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হয়।

অ্যাড্রিনাল মেডালা নিঃসৃত হর্মোন

রাসায়নিক গঠন—এই হরমোনগুলিতে ক্যাটিকল (Catechol) নিউক্লিয়াস থাকে। একটি অ্যামাইনো গ্রুপ যুক্ত থাকায় ইহাদের ক্যাটিকোলামিন (Catecholamine) বলা হয়। এপিনেফ্রিনের সহিত মিথাইল (CH_3) গ্রুপ যুক্ত হইলে নরএপিনেফ্রিনের সৃষ্টি হয়।

কার্য : (a) ইহারা "পলায়ন বা লড়াই" (Flight or fight mechanism) বিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(b) ইহারা রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

(c) এপিনেফ্রিন cAMP-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফলে গ্লাইকোজেনোলাইসিসের (Glycogenolysis) হার বর্ধিত হয় এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়া

যায়। নরএপিনেফ্রিন একই কার্য করে—কিন্তু ইহার শক্তি এপিনেফ্রিনের এক-পঞ্চমাংশ।

(d) অ্যাডিপোজ কলাতে ইহারা লাইপোলাইসিস বৃদ্ধি করে।

(e) এপিনেফ্রিন মৌলিক বিপাকীয় হার (BMR) বৃদ্ধি করে।

(f) এপিনেফ্রিন হৃৎপিণ্ডের সকল কার্য বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ডের পেশীর সংকোচনের শক্তি এবং হার দুইই বাড়িয়া যায়। ইহা ছাড়াও ঐচ্ছিক পেশীর ধমনীর সংকোচন এবং চর্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ধমনীর প্রসারণ ঘটায়। নরএপিনেফ্রিনের ভূমিকা যৎসামান্য।

(g) এপিনেফ্রিন পৌষ্টিক নালী, ব্রঙ্কিওল (Bronchiole) এবং মূত্রথলি (Urinary bladder) ও অনৈচ্ছিক পেশীর প্রসারণ (Relaxation) ঘটায় ও শুধুমাত্র চক্ষু পেশীকে সংকুচিত করে।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ—হাইপোথ্যালামাস উচ্চতর কেন্দ্রের (Higher centre) ন্যায় কাজ করে। এপিনেফ্রিনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপ —

(1) কম পরিমাণ অক্সিজেন, অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্ধিত pH ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(2) বর্ধিত রক্তচাপ ক্ষরণ রোধ করে। রক্তচাপ হ্রাস পাইলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটে।

(3) ঠাণ্ডা লাগিলে ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

নরএপিনেফ্রিন ক্ষরণ সম্ভবত রক্তচাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অধিক্রিয়ার ফল—ফিওক্রোমোসাইটোমা (Phaeochromocytoma) সৃষ্টি হয়। ইহার উপসর্গগুলি হইল—ক্ষণস্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী হাইপারটেনশন, বর্ধিত রক্তচাপ, মুখ চোখের লাল আভা, ঘাম, দ্রুত নাড়ির গতি (Pulse), জ্বর, মানসিক উদ্বেগ, মধুমেহ, থাইরোটক্সিকোসিস (Thyrotoxicosis), ওজন হ্রাস ইত্যাদি।

VI. অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃস্রাবী অংশ হইতে নিঃসৃত হর্মোন

অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত আইলেটস্ অফ্ ল্যাঙ্গারহ্যান্সে (Islets of Langerhans) চারি প্রকার কোষ থাকে --

α-কোষ হইতে গ্লুকাগণ (Glucagon) ক্ষরিত হয়।

β-কোষ হইতে ইনসুলিন (Insulin) ক্ষরিত হয়।

δ-কোষ হইতে সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin) ক্ষরিত হয়।

F কোষ হইতে প্যাংক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide) ক্ষরিত হয়।

ইনসুলিন

রাসায়নিক গঠন—ইহা 51টি অ্যামাইনো অ্যাসিড লইয়া গঠিত। A এবং B নামক দুইটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল ডাইসালফাইড যোজকের (Disulphide

bridge) সাহায্যে পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। ইনসুলিনের আনুমানিক আণবিক ওজন 5740।

কার্য—(ইনসুলিন)

(1) মস্তিষ্ক, বৃক্ক নালী, আন্ত্রিক শ্লেষ্মা, এবং লোহিত রক্ত কণিকা ব্যতীত দেহের সব কোষে গ্লুকোজ প্রবেশের হার বৃদ্ধি করে, ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাস পায়।

(2) ইনসুলিনের প্রভাবে ফ্যাটি অ্যাসিড অধিক পরিমাণে সংশ্লেষিত হয় এবং দেহে ট্রাইগ্লিসেরাইড (ফ্যাট) সঞ্চিত হয়।

(3) পেশীতে ইনসুলিনের প্রভাবে গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis), এবং প্রোটীন অপচিতি কমিয়া যায়।

(4) যকৃতে ইনসুলিন প্রোটীন ও ফ্যাট সংশ্লেষ বাড়াইয়া দেয়। ইহা গ্লুকোনিওজেনেসিস হ্রাস ও গ্লাইকোজেনেসিস বৃদ্ধি করে।

কার্যপদ্ধতি

(1) কোষের পর্দায় অবস্থিত গ্রাহকের (Receptor) সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইনসুলিন বিভিন্ন ক্রিয়ায় উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

সম্প্রতি ইনসুলিন গ্রাহক সনাক্ত হইয়াছে। এই গ্রাহক একটি গ্লাইকোপ্রোটীন। গ্লাইকোপ্রোটীনটির আণবিক ওজন প্রায় 300,000। ইনসুলিন—গ্রাহক যৌগ সম্ভবত লাইসোজোমে পৌঁছাইয়া বিশ্লিষ্ট হয় এবং গ্রাহকটি আবার ব্যবহৃত হয়।

(2) ইনসুলিনের বিভিন্ন ক্রিয়া cAMP-এর পরিমাণ হ্রাস করিয়া সম্পন্ন হয়।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ

যে যে অবস্থায় ইনসুলিন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়

(1) রক্তে শর্করার আধিক্য ঘটিলে

(2) বৃদ্ধি হর্মোন, গ্লুকোকর্টিকয়েড এবং গ্লুকাগণ উপস্থিত থাকিলে

(3) শর্করা এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে

(4) অধিক পরিমাণে cAMP, ACTH এবং থাইরোট্রপিন থাকিলে

(5) ভেগাস (Vagus) নার্ভ উদ্দীপিত হইলে।

যে যে অবস্থায় ইনসুলিন ক্ষরণ রোধিত হয়

(1) এপিনেফ্রিনের উপস্থিতিতে

(2) উপবাসকালে

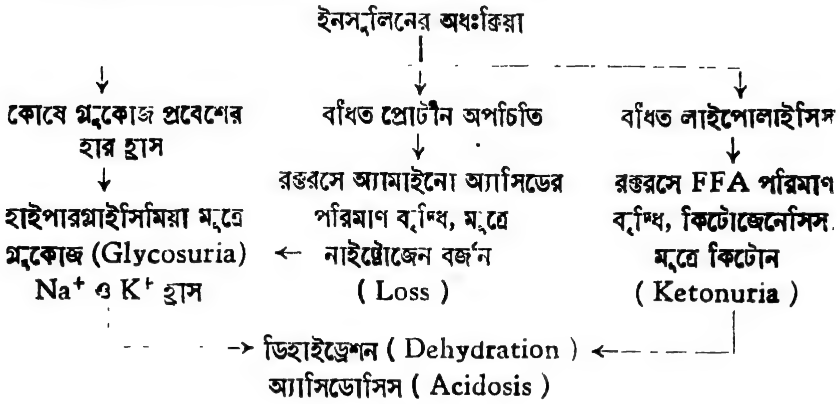
(3) ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতিতে

(4) ভেগোটমি (Vagotomy) ঘটিলে

(5) অ্যালক্সান (Alloxan) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ β-কোষ হইতে ইনসুলিন ক্ষরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিলে।

অধঃক্রিয়ার ফল—ইহার ফলে **মধুমেহ** (Diabetes mellitus) রোগের সৃষ্টি হয়। ইহার উপসর্গগুলি হইল—বহুবার মূত্রত্যাগ (Polyuria), বহুবার জলপানের ইচ্ছা (Polydypsia), হাইপার গ্লাইসেমিয়া (Hyperglycemia), বর্ধিত ক্ষুধা (Polyphagia), ওজন হ্রাস, মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি (Glycosuria), কিটোসিস (Ketosis), অ্যাসিডোসিস (Acidosis) এবং কোমা (Coma)।

মধুমেহ রোগের কারণ ছকের আকারে দেওয়া হইল :



অধিক্রিয়ার ফল : ইহার ফলে **হাইপোগ্লাইসিমিয়ার** (Hypoglycemia) সৃষ্টি হয়। এই রোগে ক্লান্তি, অবসাদ, ক্ষুধাবৃদ্ধি, মানসিক উদ্বেগ, ঘাম এবং চরম অবস্থায় (Acute) কোমা, প্রলাপ (Delirium) এবং মৃত্যুও হইতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইপোগ্লাইসিমিয়া গ্লুকাগন এবং এপিনেফ্রিন ক্ষরণের উদ্দীপক হিসাবে ক্রিয়া করে। এই দুইটি হর্মোন একত্রে কাজ করিয়া শীঘ্রই রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

গ্লুকাগন

রাসায়নিক গঠন : ইহা 29টি অ্যামাইনো অ্যাসিড লইয়া গঠিত একটি পলিপেপটাইড। ইহার আণবিক ওজন 3500।

কার্য : গ্লুকাগনের কার্য ইনসুলিনের বিপরীত। উহা গ্লুকোনিওজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস এবং লাইপোলাইসিস বৃদ্ধি করে। গ্লুকাগন পেশীতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঘটাইতে অক্ষম। ইহা ছাড়াও গ্লুকাগন বৃদ্ধি হর্মোন, ইনসুলিন এবং সোম্যাটোস্ট্যাটিনের ক্ষরণে উদ্দীপকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ

(1) হাইপোগ্লাইসিমিয়া গ্লুকাগনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(2) অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুকাগনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(3) ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লুকাগনের ক্ষরণ রোধ করে।

(4) ব্যায়াম (Exercise) গ্লুকাগনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

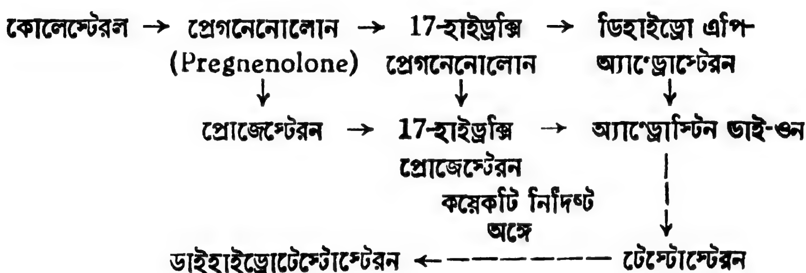
(5) চাপে (Stress) গ্লুকাগন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইনসুলিন ক্ষরণ হ্রাস পায়।

VII. জনন-অঙ্গ হইতে নিঃসৃত হর্মোন

I. পুরুষের ক্ষেত্রে

(a) **টেস্টোস্টেরন :** ইহা শুক্রাশয় মধ্যস্থ লেইডিগ (Leydig) কোষ হইতে ক্ষরিত হয়।

রাসায়নিক গঠন : কোলেস্টেরল হইতে নিম্নোল্লিখিত ধাপগুলির দ্বারা টেস্টোস্টেরনের সৃষ্টি হয়—



কয়েকটি নির্দিষ্ট অঙ্গে, যথা—প্রস্টেট গ্রন্থিতে, 5-α-রিডাক্টেজ উৎসেচকের প্রভাবে টেস্টোস্টেরন ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরনে পরিণত হয়।

পরিবহণ : রক্তরসে 97% টেস্টোস্টেরন প্রোটীনের সহিত যুক্ত থাকে। (40% গোনাডল স্টেরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিনের (GBG) সহিত, 40% অ্যালবুমেনের সহিত এবং 17% অন্যান্য প্রোটীনের সহিত)।

কার্য : (1) টেস্টোস্টেরন সহযোগী যৌন অঙ্গের [প্রস্টেট, ভাস (Vas), এপিডিডাইমিস (Epididymis), সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle)] বৃদ্ধি ও কার্যকে প্রভাবিত করে।

(2) টেস্টোস্টেরন পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তোলে।

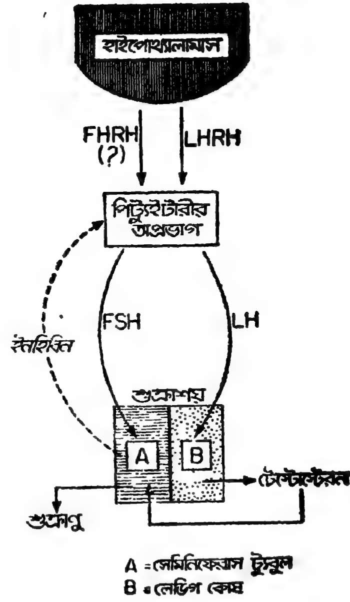
(3) ইহা দেহে প্রোটীন সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে (Anabolic effect)

(4) FSH-এর সহিত ইহা একত্রে কার্য করিয়া শুক্রাণু উৎপাদনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(5) স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা ইস্ট্রোজেনের ক্রিয়া রোধ করে এবং দুগ্ধ ক্ষরণ ও স্ত্রীঋতু (Menstruation) বন্ধ করিয়া দেয়।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : হাইপোথ্যালামাসের লুটিনাইজিং হর্মোন নিঃসারী হর্মোন (LHRH) পিটুইটারীর অগ্রভাগ হইতে LH এবং FSH-এর ক্ষরণ ঘটায়।

ফলিকল উদ্দীপক হর্মোন নিঃসারী হর্মোন (FRH) হাইপোথ্যালামাস হইতে ক্ষরিত হয় কিনা, সে-বিষয়ে বিতর্ক আছে। LH-এর প্রভাবে লেডিগ কোষ হইতে টেস্টোস্টেরন ক্ষরিত হয়। টেস্টোস্টেরন FSH-এর সহিত কার্য করিয়া শুক্রাণু উৎপাদন করে (চিত্র 25.7)। টেস্টোস্টেরন ফিডব্যাকের পদ্ধতির দ্বারা LHRH-এর ক্ষরণ রোধ করিতে পারে। FSH ক্ষরণ ইনহিবিন (Inhibin) নামক একটি প্রোটীন রোধ করে। ইহার আনুমানিক আণবিক ওজন 10,000। ইনহিবিন সম্ভবত সার্টোলি (Sertoli) কোষ হইতে ক্ষরিত হয় এবং ইহা সরাসরি পিট্যুইটারীর উপর ক্রিয়া করে।

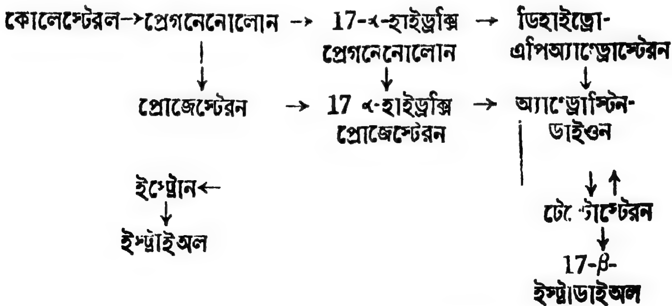


চিত্র 25.7 টেস্টোস্টেরন ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চিত্ররূপ।

II. স্ত্রীর ক্ষেত্রে: ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন

রাসায়নিক গঠন: ইস্ট্রোজেন একটি স্টেরয়েড হর্মোন (C_{18})। মুখ্য ইস্ট্রোজেনগুলি হইল 17-β-ইস্ট্রাডাইঅল (Oestradiol), ইস্ট্রোন (Oestrone) এবং ইস্ট্রাইঅল (Oestriol)। ইহারা ডিম্বাশয় এবং অমরা (Placenta) হইতে ক্ষরিত হয়। প্রোজেস্টেরনও একটি স্টেরয়েড হর্মোন।

ইহাদের সৃষ্টির ধাপসমূহ নিম্নরূপ :—



পরিবহণ: রক্তরসের অ্যালবুমেনের সহিত 60% ইস্ট্রাডাইঅল এবং GBG-র সহিত 37% ইস্ট্রাডাইঅল যুক্ত অবস্থায় থাকে।

কার্য

(a) **ইস্ট্রোজেন**

(1) ইস্ট্রোজেন জরায়ু, যোনি, যৌন কেশ (Pubic hair) এবং বগলের কেশ বৃদ্ধি করে।

(2) ইহা স্ত্রীঋতু চক্রকে প্রভাবিত করে এবং স্তনের স্ফুরণের জন্য আবশ্যকীয় স্তনের নালীর প্রসারণ ঘটায়।

(3) ইস্ট্রোজেন যোনির (Vagina) এপিথিলিয়ামকে কর্নিফায়েড (Cornified) করিয়া দেয়।

(4) স্ত্রীর গৌণ বৈশিষ্ট্য ইস্ট্রোজেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(5) RNAর বৃদ্ধি ঘটাইয়া ইহা জরায়ুর বৃদ্ধি দ্রুত করিয়া দেয়।

(6) ইস্ট্রোজেন রক্তরসে থাইরক্সিন এবং CBG-র পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(7) ইস্ট্রোজেন কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস করে।

(৮) অস্থির বিপাকেও ইস্ট্রোজেনের ভূমিকা আছে।

(9) ইস্ট্রোজেন দেহে লবণ এবং জলের পরিমাণের স্বল্প বৃদ্ধি ঘটায়।

(b) **প্রোজেস্টেরন**

(1) ইহা ইস্ট্রোজেন উদ্দীপিত জরায়ুর এণ্ডোমেট্রিয়ামের (Endometrium) বৃদ্ধি ঘটায় এবং উহাকে গর্ভাধানের (Implantation) জন্য প্রস্তুত করে।

(2) কয়েকটি কার্যে উহা ইস্ট্রোজেনের কাজের বিপরীত ক্রিয়া করে।

(3) ইহা স্তনের স্ফুরণ বৃদ্ধি করে।

(4) ইহা দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এবং শ্বাসক্রিয়ায় (Respiration) উদ্দীপনা যোগায়।

ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : হাইপোথ্যালামাস হইতে লুটিনাইজিং হর্মোন নিঃসারী হর্মোন (LHRH) ক্ষরিত হয়। ইহা FSH এবং LH উভয়েরই ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।

ঋতুচক্রের প্রথমে ইস্ট্রোজেন FSH এবং LH ক্ষরণকে রোধ করে। ওভুলেশনের 24 ঘণ্টা পূর্বে হঠাৎ LH ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (+ve ফিডব্যাক)। ইহাকে LH সার্জ (LH surge) বলা হয় (চিত্র 25.8)। LH সার্জের 9 ঘণ্টা পরে ওভুলেশন ঘটে। কিন্তু ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের বর্ধিত পরিমাণ আবার FSH এবং LH ক্ষরণ রোধ করে (- ve ফিডব্যাক)। সুতরাং ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল বিষয়।

VIII. **অমরা হইতে নিঃসৃত হর্মোন** (Placental hormones)

ইহারা হইল কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (cG), ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, কোরিওনিক প্রোল্যাক্টিন ও রিল্যাক্সিন (Relaxin)।

কোরিওনিক প্রোল্যাক্টিনের কার্য প্রোল্যাক্টিনের অনুরূপ।

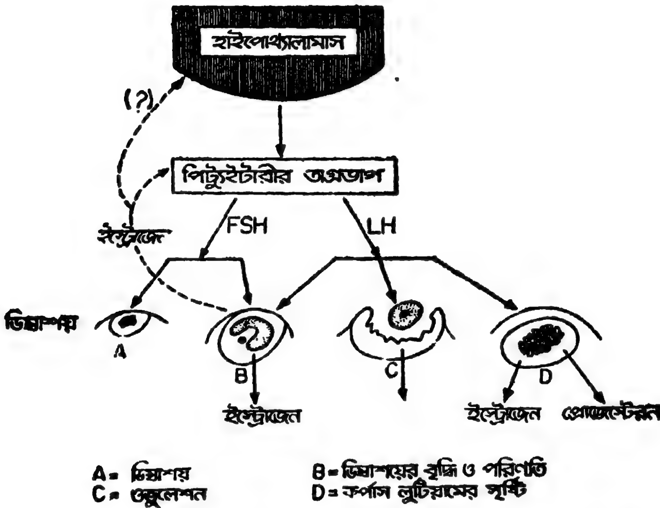
কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন : ইহা একটি গ্লাইকোপ্রোটীন। ইহা গর্ভাবস্থায় নারীদেহ ও ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করে।

রিল্যাক্সিন : ইহা একটি জল দ্রাব্য পলিপেপটাইড হর্মোন। ইহা প্রসব কালে জরায়ুর প্রসারণ ঘটায় এবং প্রসবে সাহায্য করে।

IX. **পিনিয়াল বডি** : ইহা মস্তিষ্কের তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের (Ventricle) উপরে এবং কর্পাস ক্যালোসামের পশ্চাৎ ভাগের নিম্নে অবস্থিত।

পিনিয়াল বডিতে ট্রিপ্টোফান হইতে মেলাটোনিন (Melatonin) সৃষ্টি হয়।

কার্য : মেলাটোনিন MSH-এর বিপরীতধর্মী এবং ইহা চর্মের বর্ণকে হাল্কা করিয়া দেয়।



চিত্র 25.8 স্ত্রী জননাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হর্মোনগুলির ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চিত্ররূপ।

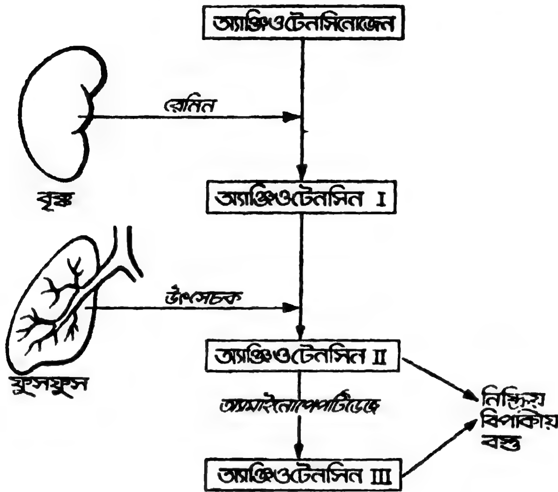
X. **বৃক্ক হইতে নিঃসৃত হর্মোন** : ইহারা হইল এরিথ্রোপোয়েটিন (Erthyropoietin) এবং রেনিন (Renin)।

(a) **এরিথ্রোপোয়েটিন** : ইহা একটি গ্লাইকোপ্রোটীন এবং ইহার আণবিক ওজন 23,000। ইহা অক্সিজেন অভাবে লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকাটি 25.9 চিত্রে দেখানো হইল।

(b) **রেনিন** : গ্লোমেরুলাসের নিকটস্থ অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের কোষে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত কোষগুলিকে জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস (JGA) বলা হয়। এখান হইতে রেনিন ক্ষরিত হয়।

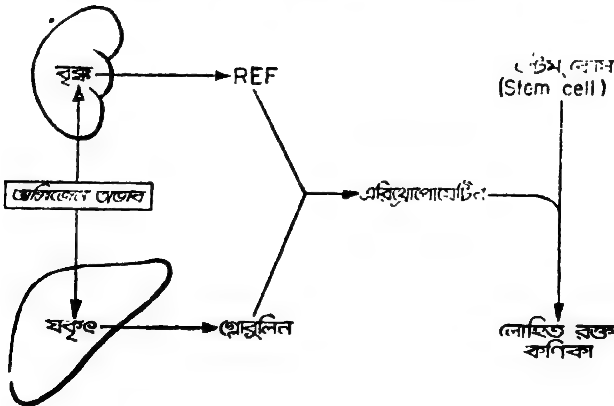
রেনিনের কার্য : যকৃত দ্বারা নির্মিত অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন নামক গ্লোবুলিনের উপর রেনিন ক্রিয়া করিয়া উহাদের অ্যাঞ্জিওটেনসিন I-এ পরিণত করে। ফুসফুস এবং দেহের অন্যান্য অংশে ইহা উৎসেচকের প্রভাবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন II-তে পরিণত

হয়। অ্যাঞ্জিওটেনসিন II অ্যাঞ্জিওটেনসিনেজ উৎসেচকের দ্বারা শীঘ্রই অপচিত হয়। উহা হইতে ক্ষুদ্র পরিমাণে অ্যাঞ্জিওটেনসিন IIIও সৃষ্টি হয়। সমগ্র পদ্ধতিটি



চিত্র 25.9 এরিথ্রোপোয়েটিনের সৃষ্টি ও কার্যপদ্ধতির চিত্ররূপ—REF=রেনাল এরিথ্রোপোয়েটিক ফ্যাক্টর (Renal Erythropoietic Factor)

25.10 চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হইয়াছে। অ্যাঞ্জিওটেনসিন II ধমনীর সংকোচন করিয়া রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। কিন্তু উহা শীঘ্রই অপচিত হওয়ায় এই কার্যটি



চিত্র 25.10 রেনিনের কার্যপদ্ধতির চিত্ররূপ।

ক্ষণস্থায়ী, উহা অ্যালডোস্টেরণ ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে যাহার ফলে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। অ্যাঞ্জিওটেনসিন IIIও অনুরূপভাবে কার্য করে।

অনুচ্ছেদ 26

ভিটামিন (Vitamins)

26.1 ভূমিকা

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট ছাড়া জীবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য ভিটামিন, খনিজ লবণাদি ও জল একান্ত প্রয়োজন। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এক বিশেষ ধরনের প্রবল শক্তিসম্পন্ন জৈব রাসায়নিক যৌগ এবং ইহা প্রধানত প্রাণিদেহে খাদ্যের সহিত গৃহীত হয়। ইহারা বিপাকের সময় জৈব অনুঘটকের কাজ (Organic catalysts) করে, ফলে জীবদেহে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কার্যাদি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং দেহাভ্যন্তরে রাসায়নিক সহযোজন রক্ষিত হয়। উপযুক্ত ভিটামিনের অভাবে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক পুষ্টিতে ভিটামিন অপরিহার্য, সেইজন্য ভিটামিনকে খাদ্যপ্রাণ বলে। উদ্ভিদ যাবতীয় প্রয়োজনীয় ভিটামিন নিজেদের দেহের মধ্যে প্রস্তুত করে।

26.2 ভিটামিনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(i) জীবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জীবন-প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ভিটামিন অপরিহার্য। (ii) বিভিন্ন ভিটামিনের প্রধান উৎস হইল উদ্ভিদ। অবশ্য কয়েকটি ভিটামিন প্রাণী ও মানুষের দেহে সংশ্লেষিত হয়। (iii) ভিটামিনের তাপ ও শক্তি উৎপাদন'' তা সাধারণতঃ থাকে না, কিন্তু পরোক্ষভাবে ইহারা তাপশক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। (iv) খাদ্য বেশী সিদ্ধ বা শুষ্ক হইলে অধিকাংশ ভিটামিন বিনষ্ট হইয়া যায়। (v) ভিটামিন অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থাকিলেও উহা কোষের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়ায় সাহায্য করে। (vi) কোন কোন ভিটামিন তাপ প্রয়োগে বিকৃত হইলেও কয়েকটি ভিটামিন তাপ প্রয়োগে অবিকৃত থাকে। (vii) বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বিপাকীয় ক্রিয়া বিঘ্নিত হয় এবং ভিটামিনের অভাবজনিত নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

26.3 ভিটামিনের প্রকারভেদ

দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ভিটামিনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—

(A) **ফ্যাটদ্রাব্য ভিটামিন** : ভিটামিন A, D, E এবং K.

(B) **জলদ্রাব্য ভিটামিন** : ভিটামিন B-Complex, C এবং D.

A ফ্যাট-দ্রাব্য ভিটামিন

ভিটামিন/প্রোভিটামিন	বিপাক	সক্রিয় মেটাবোলাইট ও কার্য	অভাবজনিত রোগ	আধিক্যজনিত উপসর্গ	উৎস	দৈনিক প্রয়োজন
ভিটামিন এ **প্রোভিটামিন :** β-ক্যারোটিন **ভিটামিন** রেটিনল (Retinol)	রেটিনল-বাইডিং প্রোটীনের (RBP) সঙ্গে যুক্ত হইয়া রেটিনাইল এস্টারের মাধ্যমে লসিকায় প্রবাহিত হয়।	11-সিস রেটিনাল - রোডোপ্সিন এবং আলোক সংবেদী রঞ্জকের সংগঠক। এপিথেলিয়াম, নার্ভ ও অস্থি কলার বৃদ্ধির জন্যে আবশ্যক।	**শিশু :** জেরোসিস (Xerosis), কেরাটোম্যালেশিয়া (Keratomalacia), মৃত্যু। **প্রাপ্তবয়স্ক :** রাতকানা (Nycta'opia), জেরোডারমা (Xeroderma)	**হাইপারভিটামিনোসিস এ** (Hypervitaminosis A) মাথাব্যথা, বমি ভাব, বমি, মাথা ঝিমঝিম করা, অস্থিতে ব্যথা।	**প্রাণিজ :** যকৃত, দুধ, মাখন, ডিম, বৃক্ক, কড মাছের যকৃতের তৈল **উদ্ভিজ্জ :** হলুদ শাকসবজি, টমেটো, আম, পেয়ারা ইত্যাদি	1·5—1·8 μg.
ভিটামিন ডি **প্রোভিটামিন :** আরগোস্টেরল (উদ্ভিদ এবং 7-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল (চর্ম) **ভিটামিন** ডি 2 (আরগোক্যালসিফেরল) ডি 3 (কোলিক্যালসিফেরল)	অতি-বেগুনী রশ্মি দ্বারা প্রোভিটামিন হইতে ভিটামিন উৎপন্ন হয়। যকৃতে 25-হাইড্রক্সি ভিটামিন D এবং বৃক্কে 1,25-ডাই-হাইড্রক্সি ভিটামিন ডি তৈয়ারী হয়।	1,25 ডাই-হাইড্রক্সি ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাকের প্রধান হরমোনাল নিয়ন্ত্রক (Hormonal regulator)	**শিশু :** রিকেটস (Rickets) **প্রাপ্তবয়স্ক :** অস্টিওম্যালেশিয়া (Osteomalacia)	**হাইপারভিটামিনোসিস ডি** হাইপারক্যালসিমিয়া (Hypercalcemia), হাইপারক্যালসিনুরিয়া (Hypercalcinuria),	দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম, কড ও হাঙ্গরের যকৃত হইতে পাওয়া তৈল, মানুষের ত্বকের উপর সূর্যালোক।	4—6 μg.

ভিটামিন/প্রোভিটামিন	বিপাক	সক্রিয় মেটাবোলাইট ও কার্য	অভাবজনিত রোগ	আধিক্যজনিত উপসর্গ	উৎস	দৈনিক প্রয়োজন
				নেফ্রোক্যালসিনোসিস (Nephrocalcinosis)		
ভিটামিন ই টোকোফেরল (Tocopherol)	অজানা	সক্রিয় মেটাবোলাইট অজানা। ইঁদুরে বন্ধ্যাত্ব নিবারক (Anti-sterile) কার্য। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক জারণ বিরুদ্ধাচারী (Anti-oxidant) হিসাবেও কার্য করে।	**শিশু :** অ্যানিমিয়া (Anaemia)। **প্রাপ্তবয়স্ক :** অজানা। ইঁদুরের ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মৃত্যু ও বাঁদরে পেশীর শৈথিল্য লক্ষ্য করা গিয়াছে।	অজানা। মাথাব্যাথা, ঝাপসা দৃষ্টি ইত্যাদি।	ডিম, মাংস, যকৃত, মাছ, মুরগী, কড তৈল, তুলা বীজের তৈল।	25–30 mg.
ভিটামিন কে কে$_1$-ফাইলোকিউনোন (Phylloquinone) কে$_2$-মেনাকিউনোন (Menaquinone)	অজানা	মেটাবোলাইট অজানা। রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে। কে$_1$ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ আবশ্যক।	**শিশু :** রক্তপাত (Haemorrhage) **প্রাপ্তবয়স্ক :** দোষযুক্ত রক্ত তঞ্চন, অনবরত রক্তক্ষরণ।	কোন কোন ক্ষেত্রে হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া (Hyper-bilirubinemia	ফুলকপি, বাঁধাকপি, টাটকা শাকসবজি। আন্ত্রিক ব্যাক্টিরিয়া প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে$_2$ প্রস্তুত করে।	—

B. জল-দ্রাব্য ভিটামিন

ভিটামিন	কোএনজাইম	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া	আধিক্যজনিত উপসর্গ	উৎস	দৈনিক প্রয়োজন
ভিটামিন বি$_1$ [থায়ামিন (Thiamine)]	থায়ামিন পাইরো ফসফেট (TPP)	α-কিটো অ্যাসিড এবং কিটোস্যুগারদের অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন (Oxidative decarboxylation)	**বেরিবেরি** (Beriberi) পা স্ফীত এবং উহাতে জল জমে (Oedema)	—	ঢেঁকি-ছাটা চাল, ভাতের ফেন, শস্যের ভূষি। বীট, গাজর, বাদাম, সয়াবিন, ডিমের কুসুম, মাছ, মাংস, দুধ।	1·2—1·5 mg.
ভিটামিন বি$_2$ [রাইবোফ্লেভিন (Riboflavin)]	ফ্লেভিন এডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড (FAD) ও ফ্লেভিন মোনোনিউক্লিওটাইড (FMN)	ইলেকট্রন হাইড্রোজেন। স্থানান্তর বিক্রিয়া (উদাহরণ—পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ)	স্নায়বিক দুর্বলতা, শুষ্ক ত্বক, ক্ষুধামান্দ্য, অবসন্নতা, ঠোঁটে ক্ষত সৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে ক্ষত (Cheilosis), ম্যাজেণ্টা রঙের জিহ্বা।	—	অবায়ব ব্যাক্টিরিয়া, দুধ, যকৃত, বৃক্ক, মাছ, হৃৎপিণ্ড, সবুজ শাক-সবজি, সিম, বরবটি, মটরশুটি, শস্য।	1·5 – 1·8 mg.
ভিটামিন বি$_3$ [প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (Pantothenic acid)]	কো এ (Co A)	অ্যাসাইল গ্রুপ স্থানান্তর বিক্রিয়া (উদাহরণ—সাইট্রেট সিনথেটেজ)	অকালে চুল পাকা, বমি, আন্ত্রিক গোলযোগ, ব্যাহত বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা।	—	কোল ইস্ট (Yeast), যকৃত, ঢেঁকি-ছাটা চাল, দুধ, মাংস, ডিম, সবুজ শাকসবজি, ফল, গুড়, সুজি ইত্যাদি।	5 · 10 mg.

ভিটামিন	কোএনজাইম	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া	আধিক্যজনিত উপসর্গ	উৎস	দৈনিক প্রয়োজন
ভিটামিন বি$_4$ কোলিন (Choline)	—	প্যারাসিমপ্যাথেটিক (Parasympathetic) নার্ভের রাসায়নিক সহযোগী (Chemical mediator), ফসফোলিপিডের সংগঠক এবং ট্রান্সমিথাইলেশন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।	বিঘ্নিত বৃক্ক ও যকৃতের ক্রিয়া, ফ্যাট ও প্রোটিনের পরিপাকে বিঘ্ন।	—	যকৃত, ডিমের কুসুম, মাংস, শস্য, দুধ, ফল, শাকসবজি।	অজানা
ভিটামিন বি$_5$ নায়াসিন (Niacin অথবা নিকোটীনিক অ্যাসিড।	নিকোটিনামাইড এডিনাইন ডাই নিউক্লিওটাইড (NAD) এবং নিকোটিনামাইড এডিনাইন ডাই নিউক্লিওটাইড ফসফেট (NADP)	ইলেকট্রন হাইড্রোজেন) স্থানান্তর বিক্রিয়া। চর্ম, পৌষ্টিকনালী, এবং নার্ভের সাধারণ কার্যের জন্য আবশ্যক।	**পেলাগ্রা** (Pellagra) (a) ডার্মাটাইটিস (Dermatitis) (b) ডায়ারিয়া (Diarrhoea) (c) ডেমেনসিয়া (Dementia)	জ্বলে যাওয়ার অনুভূতি।	সবুজ শাকসবজি, ইস্ট, দুধ, যকৃত, ডিম, ফল ইত্যাদি।	16—20 mg.
ভিটামিন বি$_6$ পিরিডক্সিন, (Pyridoxine) পিরিডক্সাল (Pyridoxal), পিরিডক্সামাইন (Pyridoxamine)	পিরিডক্সাল ফসফেট (Pyridoxal phosphate)	ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, ডিকার্বক্সিলেশন, ট্রান্সসালফুরেশন বিক্রিয়া, শিশুদের বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক।	অ্যাক্রোডাইনিয়া (Acrodynia) নামক চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, স্নায়বিক চাঞ্চল্য, অনিদ্রা ও আন্ত্রিক গোলযোগ।	—	সবুজ শাকসবজি, ইস্ট, ভুট্টা, গম, ফল, মাংস, ডিম, যকৃত, দুধ ইত্যাদি।	1·6—2 mg.

ভিটামিন	কোএনজাইম	শারীর বৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া	আধিক্যজনিত উপসর্গ	উৎস	দৈনিক প্রয়োজন
ভিটামিন বি$_{12}$ সায়ানোকোবালামিন (Cyanocobalamin)	মিথাইল-কোবালামিন (Methyl-cobalamin)	লোহিত রক্ত কণিকার বৃদ্ধির জন্যে আবশ্যক, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। প্রোটীনের সংশ্লেষে আবশ্যক।	পারনিশাস অ্যানিমিয়া (Pernicous), গ্লসাইটিস (Glossitis), নার্ভাস সিস্টেমের গুরুতর গোলযোগ, (Neuropathy) মানসিক উপসর্গ অ্যামব্লাইওপিয়া (amblyopia)	—	যকৃত, বৃক্ক, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, চীজ (Cheese) কয়েকটি ছত্রাক।	2 – 3 μg.
ভিটামিন এইচ্ বায়োটিন (Biotin)	এন-কার্বক্সি বায়োটিনিল-লাইসিন (N-Carboxy biotinyl-lysine)	কার্বক্সিলেজ কোএনজাইমের কার্বন ডাইঅক্সাইড স্থানান্তর বিক্রিয়া (CO_2 "fixation")।	বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য অ্যানিমিয়া, পেশীতে ব্যথা, হাত পায় চর্মরোগ (Dermatitis)।	—	ডিমের কুসুম, যকৃত, বৃক্ক, ঈস্ট, দুধ, টমেটো, ফল, শাকসবজি ইত্যাদি।	50—60 μg.
ফোলিক অ্যাসিড ফোলাসিন (Folacin) টেরোগ্লুটামিক অ্যাসিড (Pteroglutamic acid)	টেট্রাহাইড্রোফোলিক অ্যাসিডের ডেরিভেটিভ (Tetrahydrofolic acid derivative)	1-কার্বন স্থানান্তর বিক্রিয়া (O_1 metabolism) যথা—পিউরিন নিউক্লিওটাইড ও থাইমিডাইলেট (Thymidylate) সংশ্লেষ।	মেগালোব্লাস্টিক পার্ণিশিয়াস অ্যানিমিয়া, বিঘ্নিত বৃদ্ধি, দুর্বলতা, বন্ধ্যাত্ব, প্রসূতির স্বল্প দুগ্ধক্ষরণ (Inadequate lactation)	বৃক্কের কার্য ব্যাহত হইতে লক্ষ্য করা গিয়াছে :	ইস্ট, যকৃত, বৃক্ক, মাছ, মাংস, সবুজ শাকসবজি, দুধ, ফল, আন্ত্রিক ব্যাকটিরিয়া।	400 μg.

ভিটামিন	কোএনজাইম	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া	আধিক্যজনিত উপসর্গ	উৎস	দৈনিক প্রয়োজন
ভিটামিন সি অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (Ascorbic acid)	—	জারণ বিরুদ্ধাচারী (Antioxidant)' কোলাজেন (Collagen) সংশ্লেষ, আন্তঃকোষীয় বস্তু (Intercellular substance) সংশ্লেষ, সম্ভবত টাইরোসিন অপচিতিতে আবশ্যক। ইহা ছাড়াও লোহ শোষণে সাহায্য করে ও সর্দিতে ঔষধ হিসাবে কাজ করে।	স্কার্ভি (Scurv.) .) আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ (Haem rrhage) (b) বিঘ্নিত ক্ষত নিরোধ (c) লম্বা অস্থি ফুলিয়া যায় (d) অস্থি ভঙ্গুর হইয়া পড়ে (e) মাড়ি স্ফীত হয় এবং অনবরত রক্তক্ষরণ হয় (f) রক্তাল্পতা (g) দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় (h) সাধারণ দুর্বলতা।	—	কমলা, লেবু জাতীয় ফল Citrus fruits ', টমেটো, লংকা, আঙুর, আপেল, দুধ, সবুজ শাকসবজি, কলা, কাঁঠাল, কাঁচা মাছ, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি।	40—45 mg.
ভিটামিন পি সাইট্রিন (Citrin) রিউটিন (Rutin) হেস্পেরিডিন (Hesperidin)	—	ভিটামিন সি-এর ক্রিয়াতে সহায়তা করে।	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	লেবু জাতীয় ফল, আমলকী ইত্যাদি।	অজ্ঞাত

প্রশ্নাবলী ও উত্তর-সংকেত

প্রথম অধ্যায়

অ্যামিবা (Amoeba)

1. যুক্তি সহকারে প্রাণিসর্গে অ্যামিবার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 3)
2. অ্যামিবার আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্রসংযোগে বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 4)
3. চিত্রসহযোগে অ্যামিবার জীবন-চক্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 4-14)
4. অ্যামিবার পুষ্টিকে কেন হলোজোয়িক পুষ্টি বলা হয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 6)
5. অ্যামিবার গমন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 8-10)
6. পার্থক্য নির্দেশ কর :
   (a) প্লাজমাজেল ও প্লাজমাসল। (উঃ পৃষ্ঠা 4)
   (b) দ্বিভাজন ও বহুভাজন। (উঃ পৃষ্ঠা 11-12)
7. টীকা লিখ :
   (a) পিনোসাইটোসিস। (উঃ পৃষ্ঠা 7)
   (b) সংকোচনশীল গহ্বর। (উঃ পৃষ্ঠা 11)

প্যারামেশিয়াম (Paramoecium)

1. যুক্তি সহকারে প্রাণিসর্গে প্যারামেশিয়ামের স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 14-15)
2. প্যারামেশিয়ামের পুষ্টি পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 18-19)
3. প্যারামেশিয়ামের জলসাম্যরক্ষা ও রেচন পদ্ধতির বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 20-21)
4. প্যারামেশিয়ামের আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 15-18)
5. নিউরোনিম ও অ্যাক্সোনিমের পার্থক্য কি? (উঃ পৃষ্ঠা 16)
6. সিলিয়ার সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও এবং সিলিয়ার দ্বারা প্যারামেশিয়ামের গমনক্রিয়ার বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 16-17)
7. প্যারামেশিয়ামের নিউক্লিয়াসের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় দ্বিরূপতা আছে কি? (উঃ পৃষ্ঠা 18)
8. চিত্রসহযোগে প্যারামেশিয়ামের যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 23)
9. প্যারামেশিয়ামের বিভিন্ন প্রজনন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও। (C. U. 1975, '77) (উঃ পৃষ্ঠা 21-26)

10. টীকা লিখ :
   (a) সংশ্লেষ. (উঃ পৃষ্ঠা 23)
   (b) সংকোচনশীল গহ্বর. [C. U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 18)
   (c) স্বষেক. (উঃ পৃষ্ঠা 24)
   (d) পরিবাহী নিউক্লিয়াস। (উঃ পৃষ্ঠা 23)
11. পার্থক্য লিখ :
   (a) সাইটোস্টোম ও সাইটোপাইজি, (উঃ পৃষ্ঠা 18)
   (b) খাদ্যগহ্বর ও সংকোচনশীল গহ্বর. (উঃ পৃষ্ঠা 18)
   (c) কনজুগ্যাণ্ট ও এক্সকনজুগ্যাণ্ট, (উঃ পৃষ্ঠা 23)
   (d) সংশ্লেষ ও স্বষেক। (উঃ পৃষ্ঠা 23-24)

গিয়ার্ডিয়া (Giardia)

1. প্রাণিসর্গে গিয়ার্ডিয়ার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 27)
2. গিয়ার্ডিয়ার জীবন-চক্র আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 27)
3. গিয়ার্ডিয়াসিস কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 27)
4. চিত্রসহযোগে গিয়ার্ডিয়ার ট্রোফোজোয়াইট ও সিস্টক দশার বর্ণনা দাও।
   (উঃ পৃষ্ঠা 27+29)
5. কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রথম গিয়ার্ডিয়া লক্ষ্য করেন ? (উঃ পৃষ্ঠা 27)
6. মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে অন্তঃপরজীবীরূপে বাস করে এইরূপ একটি প্রোটোজোয়ার নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 27)
7. টীকা লিখ :
   (a) সাকিং ডিস্ক (উঃ পৃষ্ঠা 27), (b) প্যারাবেসাল বডি, (উঃ পৃষ্ঠা 28)
   (c) অ্যাক্সোস্টাইল. (উঃ পৃষ্ঠা 27) এবং (d) সিস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 29)।

প্লাজমোডিয়াম

1. মানুষের ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী জীবাণুর জীবন-বৃত্তান্তের বিবরণ দাও।
   [C. U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 31-34)
2. প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের জীবন-চক্র চিত্রসহযোগে আলোচনা কর।
   (উঃ পৃষ্ঠা 32)
3. ভেক্টর কাহাকে বলে ? প্লাজমোডিয়ামের ভেক্টরের নাম কি ?
   (উঃ পৃষ্ঠা 30)
4. মানুষের দেহাভ্যন্তরে সংঘটিত প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের বিভিন্ন দশার বর্ণনা কর। [C. U. 1979] (উঃ পৃষ্ঠা 32-34)

5. মশকীর দেহমধ্যে সংঘটিত প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের দশটির নাম কি ? উক্ত দশা চিত্র দ্বারা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর।
[C. U. 1983] (উঃ পৃষ্ঠা 32-35)
6. প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কখন উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং কেন ? (উঃ পৃষ্ঠা 34)
7. প্লাজমোডিয়াম-এর অপরিচিতমূলক তত্ত্বাদি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 37)
8. ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 41)
9. প্লাজমোডিয়াম গণের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিগুলির তুলনামূলক বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 38-39)
10. প্লাজমোডিয়ামের পরজীবী অভিযোজনগুলি উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 39)
11. টীকা লিখ :
(a) সিগনেট-রিং দশা (উঃ পৃষ্ঠা 33), (b) উকাইনিট (উঃ পৃষ্ঠা 35), (c) হিপ্‌নোজোয়াইট (উঃ পৃষ্ঠা 44), (d) সাইজণ্ট (উঃ পৃষ্ঠা 32)
(e) স্যার রোনাল্ড রস্ (উঃ পৃষ্ঠা 31)।
12. পার্থক্য লিখ :
(a) স্পোরোজোয়াইট ও মেরোজোয়াইট, (উঃ পৃষ্ঠা 32)
(b) সাইজোগোনি ও স্পোরোজোয়াইট, (উঃ পৃষ্ঠা 32+36)
(c) ম্যাইক্রোগ্যামেটোসাইট ও ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট, (উঃ পৃষ্ঠা 35)
(d) সিস্ট ও উওসিস্ট, (উঃ পৃষ্ঠা 35)
13. কেন স্ত্রী অ্যানোফিলস ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণু বহন করে ? (উঃ পৃষ্ঠা 30)
14. কিভাবে প্লাজমোডিয়ামের সনাক্তকরণ করা যাইতে পারে। (উঃ পৃষ্ঠা 40)
15. ম্যালেরিয়া রোগের সাধারণ উপসর্গ কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 41)
16. প্লাজমোডিয়ামের এরিথ্রোসাইটিক চক্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 32-33)

মনোসিস্টিস

1. মনোসিস্টিসের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 47)
2. প্রাণিসর্গে মনোসিস্টিসের স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 45)
3. মনোসিস্টিসকে অন্তঃপরজীবী প্রাণী বলা হয় কেন ? (উঃ পৃষ্ঠা 45)
4. মনোসিস্টিসের যৌন জনন পদ্ধতি চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 47)
5. মনোসিস্টিসের সংক্রামণ পদ্ধতি ও আশ্রয়দাতার উপর উহার প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 48-49)

6. টীকা লিখ :

(a) পেলিকল (উঃ পৃষ্ঠা 45), (b) মায়োনিমস (উঃ পৃষ্ঠা 46),
(c) গ্রিগেরাইন মুভমেন্ট (উঃ পৃষ্ঠা 46), (d) সিউডোনেভিসেলা (উঃ পৃষ্ঠা 48),
(e) জাইগোসিস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 48)।

সাইকন

1. সাইকনের দেহে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার স্পিকিউল-এর গঠন বর্ণনা কর। পরিফেরা শ্রেণীবিন্যাসে ইহার প্রয়োজনীয়তার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।
[B. U. 1985] (উঃ পৃষ্ঠা 56)
2. সাইকনের দেহের ভিতর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা কর ও উহার দেহের বিভিন্ন কোষের কার্যকারিতার বর্ণনা দাও। [C. U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 53)
3. সাইকনের নালীতন্ত্রের বিবরণ দাও ও সাইকনের জীবনে উহার কার্য উল্লেখ কর। [C. U. 1975, 1979] (উঃ পৃষ্ঠা 53)
4. সাইকনের দেহের বিভিন্ন প্রকার কোষের বিবরণ দাও ও প্রত্যেকটির কার্য উল্লেখ কর। (C. U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 55)
5. প্রাণিসর্গে সাইকনের স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 52)
6. পার্থক্য লিখ :
(a) অসিয়া ও অস্কিউলাম, (উঃ পৃষ্ঠা 53)
(b) প্রোসোপাইল ও অ্যাপোপাইল, (উঃ পৃষ্ঠা 54)
(c) কোয়ানোসাইট ও পিনাকোসাইট। (উঃ পৃষ্ঠা 54+56)
7. টীকা লিখ :
(a) কোয়ানোসাইট (উঃ পৃষ্ঠা 54), (b) গিমিউল (উঃ পৃষ্ঠা 57),
(c) বাহক কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 58), (d) অ্যাম্ফিব্লাস্টুলা (উঃ পৃষ্ঠা 59)।

ওবেলিয়া

1. ওবেলিয়ার জীবন-চক্রে পলিপ ও মেডুসা দশার প্রকৃত পার্থক্য কি ?
(উঃ পৃষ্ঠা 61)
2. ওবেলিয়াকে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় কেন ? (উঃ পৃষ্ঠা 60)
3. ওবেলিয়ার সিনোসার্কে অবস্থিত বিভিন্ন কোষের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।
(উঃ পৃষ্ঠা 62-64)
4. ওবেলিয়ার মেডুসার সচিত্র বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 67)
5 "জনুঃক্রম" বলিতে কি বুঝায় ? তোমার পঠিত যে কোন হাইড্রোজোয়ান প্রাণীর জীবন-ইতিহাসের সাহায্যে উহা ব্যাখ্যা কর।
[B.U. 1985 ; C.U. 1984] (উঃ পৃষ্ঠা 69-70)

6. ওবেলিয়া কলোনীর মধ্যে কি কি প্রকার জুইড (Zooids) দেখা যায়? বিভিন্ন জুইডের কার্য উল্লেখ কর। [C.U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 65-67)
7. "ওবেলিয়া একটি ত্রিরূপী কলোনী"—ব্যাখ্যা কর। [C.U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 61)
8. ওবেলিয়া কলোনীর বিবরণ দাও এবং মেটাজেনেসিসের উপর টীকা লিখ। [C.U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 61, 69-70)
9. **পার্থক্য নির্দেশ কর :**
   (a) সিনোসার্ক ও পেরিসার্ক, (উঃ পৃষ্ঠা 62)
   (b) নাইডোব্লাস্ট ও নাইডোসিল, (উঃ পৃষ্ঠা 64)
   (c) হাইড্রোথিকা ও গোনোথিকা, (উঃ পৃষ্ঠা 65)
   (d) রিং ক্যানেল ও রেডিয়াল ক্যানেল। (উঃ পৃষ্ঠা 67)
10. **টীকা লিখ :**
   (a) মেসোগ্লিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 62); (b) পেরিডার্ম (উঃ পৃষ্ঠা 65); (c) ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 63); (d) লিথোসিস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 67); (e) লেপ্টোমেডুসা (উঃ পৃষ্ঠা 68) (f) প্লানুলা লার্ভা (উঃ পৃষ্ঠা 69)।

সী-অ্যানিমোন

1. সী-অ্যানিমোনের গঠন বর্ণনা কর। [C.U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 71)
2. সী-অ্যানিমোনের জীবন-চক্রে মেটাজেনেসিস হয় কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 70)
3. সী-অ্যানিমোনের দেহের বিভিন্ন কোষের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 73)
4. সী-অ্যানিমোনের গঠন বৈচিত্র্য বর্ণনা কর এবং বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালী উল্লেখ কর। [C.U. 1979] (উঃ পৃষ্ঠা 71)
5. সী-অ্যানিমোনের দেহে অবস্থিত তিন প্রকার নিমাটোসিস্টের চিত্র অঙ্কন কর। (উঃ পৃষ্ঠা 74)
6. **টীকা লিখ :**
   (a) সিনক্লাইড (উঃ পৃষ্ঠা 71); (b) সাইফনোগ্লিফ (উঃ পৃষ্ঠা 71); (c) অ্যাকনসিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 73); (d) মেসেন্টেরী (উঃ পৃষ্ঠা 72); (e) ইণ্টারমেসেন্টেরীক চেম্বার (উঃ পৃষ্ঠা 72); (f) পেরিস্টোম। (উঃ পৃষ্ঠা 71)

হর্মিফোরা

1. টিনোফোরা পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 79)
2. হর্মিফোরাকে টিনোফোরা পর্বভুক্ত করা হইয়াছে কেন ? (উঃ পৃষ্ঠা 79)

3. হাঁমিফোরার গঠন ও কলাস্থান বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 82)
4. হাঁমিফোরার খাদ্যনালীতন্ত্রের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 82)
5. প্রাণিসর্গে হাঁমিফোরার স্থান নির্ধারণ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 84)
6. চিত্রসহ হাঁমিফোরার স্টাটোসিস্টের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 81)
7. হাঁমিফোরার জীবন-চক্রে কোন লার্ভা দশা আছে কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 82)
8. **টীকা লিখ :**
   (a) কোলোব্লাস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 80); (b) ব্যালেন্সার (উঃ পৃষ্ঠা 81);
   (c) চিরুনি-পাত (উঃ পৃষ্ঠা 79); (d) কোলেনকাইমা (উঃ পৃষ্ঠা 82);
   (e) মেরুপাত (পৃষ্ঠা 81)।

ফিতাকৃমি

1. ফিতাকৃমির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। প্রাণিসর্গে ইহাদের স্থান নির্ণয় কর। (উঃ পৃষ্ঠা 85)
2. ফিতাকৃমির জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত কর। [C.U. 1978] (উঃ পৃষ্ঠা 93)
3. চিত্রসহ টিনিয়ার একটি পরিণত প্রোগ্লটিডের গঠন বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 89)
4. টিনিয়ার জননতন্ত্র বিশদভাবে লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 90)
5. **টীকা লিখ :**
   (a) স্কোলেক্স (উঃ পৃষ্ঠা 85); (b) রসটেলাম (উঃ পৃষ্ঠা 85);
   (c) স্ট্রোবিলা (উঃ পৃষ্ঠা 87); (d) লাইম কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 89);
   (e) ফ্লেম কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 90); (f) মেহলি-বর্ণিত গ্রন্থি (উঃ পৃষ্ঠা 91);
   (g) উটাইপ (উঃ পৃষ্ঠা 91); (h) হেক্সাকান্থ এমব্রায়ো (উঃ পৃষ্ঠা 93);
   (i) সিস্টিসারকাস (উঃ পৃষ্ঠা 93); (j) টিনিয়াসিস (উঃ পৃষ্ঠা 94)।
6. পরজীবীত্বের জন্য ফিতাকৃমির গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবৃত কর। (উঃ পৃষ্ঠা 94)
7. ফিতাকৃমির সংক্রমণ পদ্ধতি উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 93)

লিভারফ্লুক

1. লিভারফ্লুকের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি ? প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 94+95)
2. লিভারফ্লুকের দেহপ্রাচীরের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 95-96)
3. লিভারফ্লুকের জীবন-ইতিহাসে শামুকের দেহে প্রাপ্ত বিভিন্ন দশার বর্ণনা দাও। [C.U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 99-101)

4. লিভারফ্লুকের রেচনতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 97)
5. লার্ভা কি ? লিভারফ্লুকের বিভিন্ন প্রকার লার্ভা-অবস্থার বর্ণনা দাও।
[C. U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 99-102)
6. লিভারফ্লুকের জননতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 98-99)
7. লিভারফ্লুকের জীবন-চক্রের সচিত্র বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 99-101)
8. **টীকা লিখ :**
   (a) মাইরাসিডিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 99) ; (b) স্পোরোসিস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 101) ;
   (c) রিডিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 101) ; (d) সারকেরিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 102) ;
   (e) লিভার রট (উঃ পৃষ্ঠা 94)।
9. **পার্থক্য লিখ :**
   (a) সেলগ্রন্থি ও পেনিট্রেশন গ্রন্থি (উঃ পৃষ্ঠা 99+101) ;
   (b) সারকেরিয়া ও মেটাসারকেরিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 102) ;
   (c) শুক্রনালী ও শুক্রথলি (উঃ পৃষ্ঠা 98)।

অ্যাসকারিস

1. অ্যাস্‌কারিসের বিজ্ঞানসম্মত নাম ও প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্দেশ কর।
(উঃ পৃষ্ঠা 103)
2. অ্যাসকারিসের জনন অঙ্গ এবং জীবন-বৃত্তান্তের বিবরণ দাও।
[C.U. 1981] (উঃ পৃষ্ঠা 109-110]
3. অ্যাসকারিসের দেহ প্রাচীরের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 105)
4. স্ত্রী-অ্যাসকারিসের প্রস্থচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন কর এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। (উঃ পৃষ্ঠা 106)
5. কিরূপে পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাস্‌কারিসের পার্থক্য বিচার করবে ? অ্যাসকারিসের ডিম্ব মানবদেহে প্রবেশের পর হইতে পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত বর্ণনা কর।
[C. U. 1974, '84] (উঃ পৃষ্ঠা 104 & 110)
6. অ্যাস্‌কারিসের জননতন্ত্রের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 109)
7. অ্যাস্‌কারিসের জীবনবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
[C.U. 1976, '79] (উঃ পৃষ্ঠা 110)
8. অ্যাস্‌কারিসের সংক্রামণ পদ্ধতি বিবৃত কর। (উঃ পৃষ্ঠা 110)
9. **টীকা লিখ :**
   (a) সিউডোসিল (উঃ পৃষ্ঠা 103) ; (b) যৌন দ্বিরূপতা (উঃ পৃষ্ঠা 104) ;
   (c) সিন্‌সিটিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 105) ; (d) ফ্যাস্‌মিড (উঃ পৃষ্ঠা 108) ;
   (e) পিনিয়াল সিটি (উঃ পৃষ্ঠা 109)।
10. অ্যাস্‌কারিস সংক্রামণের ফলে মানুষের কি কি উপসর্গ পরিলক্ষিত হয় ?
(উঃ পৃষ্ঠা 111)

জোঁক

1. জোঁকের বিজ্ঞানসম্মত সনাক্তকরণ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 150)
2. চিত্রসহ জোঁকের বহিরাকৃতির বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 113-114)
3. জোঁকের দেহের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 117)
4. জোঁকের দেহে বিভিন্ন ছিদ্র কি কি? উহাদের অবস্থান ও কার্য উল্লেখ কর। [C.U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 114-115)
5. জোঁকের পৌষ্টিকতন্ত্র অঙ্কন ও বর্ণনা কর। [C.U. 1978, 1982] (উঃ পৃষ্ঠা 119)
6. জোঁকের সংবহনতন্ত্রের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 121)
7. জোঁকের জননতন্ত্রের বিবরণ দাও। [C.U. 1976] (উঃ পৃষ্ঠা 132)
8. জোঁকের রক্তের বৈশিষ্ট্য কি? (উঃ পৃষ্ঠা 121)
9. জোঁকের একটি টেষ্টিকিউলার নেফ্রিডিয়ামের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর এবং প্রিটেষ্টিকিউলার নেফ্রিডিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য দেখাও। (উঃ পৃষ্ঠা 126)
10. জোঁকের সংবেদী অঙ্গসমূহের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 131)
11. জোঁকের গমন পদ্ধতি বিবৃত কর। (উঃ পৃষ্ঠা 118)
12. **টীকা লিখ :**
    (a) বট্রিয়ডাল কলা (উঃ পৃষ্ঠা 116); (b) গুটি (উঃ পৃষ্ঠা 116); (c) হিরুডিন (উঃ পৃষ্ঠা 121); (d) সিলিয়েটেড অরগ্যান (উঃ পৃষ্ঠা 126); (e) অ্যাট্রিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 133); (f) স্পারমাটোফোর (উঃ পৃষ্ঠা 134)।

কেঁচো

1. কেঁচোর বিজ্ঞানসম্মত নাম এবং প্রাণিসর্গের ইহার অবস্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 135+151)
2. নেফ্রিডিয়াম কাহাকে বলে? কেঁচোর নেফ্রিডিয়াম বর্ণনা কর। [C.U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 145-147)
3. কেঁচোর বহিরাকৃতির বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 136)
4. কেঁচোর দেহের বিভিন্ন ছিদ্রের অবস্থান ও কার্য নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 137)
5. কেঁচোর পাচনতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 140)
6. কেন কেঁচোর রক্ত সংবহনতন্ত্র "রুদ্ধ" ধরনের বলা হয়? চিত্র সহযোগে ইহার রক্তসংবহনতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 142)
7. নেফ্রিডিয়াম কি? কেঁচোর বিভিন্ন প্রকার নেফ্রিডিয়ার বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 145)

8. **টীকা লিখ :**
   (a) সিটা (উঃ পৃষ্ঠা 137) ; (b) ক্লোরাগোগেন কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 139) ;
   (c) ছদ্ম হৃৎপিণ্ড (উঃ পৃষ্ঠা 144) ; (d) স্পারমাথিকা (উঃ পৃষ্ঠা 150) ;
   (e) টিফলোসোল (উঃ পৃষ্ঠা 141) ; (f) মিউকোসাইট (উঃ পৃষ্ঠা 139) ।
9. কেঁচোর জননতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 149)

আরশোলা

1. আরশোলার বিজ্ঞানসম্মত নাম ও প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 154)
2. আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র অঙ্কন ও বর্ণনা কর। [C.U. 1979, '83] (উঃ পৃষ্ঠা 164)
3. আরশোলার মুখোপাঙ্গের সচিত্র বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 157)
4. আরশোলার খাদ্য পরিপাক ও শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [C.U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 164+168)
5. আরশোলার শ্বাসযন্ত্র অঙ্কন ও বর্ণনা কর। এই প্রাণীর শ্বসন পদ্ধতির বিবরণ দাও। [C.U. 1978] (উঃ পৃষ্ঠা 168)
6. আরশোলার শ্বসনতন্ত্রের বিবরণ লিখ। [C.U. 1981] (উঃ পৃষ্ঠা 168)
7. আরশোলার স্ত্রীজনন অঙ্গের গঠন ও কার্যের বিবরণ দাও। [C.U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 185)
8. আরশোলার হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 173)
9. পুং-আরশোলার জননঅঙ্গের বিবরণ দাও। [C.U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 184)
10. আরশোলার নার্ভতন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 175)
11. আরশোলার অন্তঃস্রাবী অঙ্গের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 183)
12. **টীকা লিখ :**
    (a) মিক্সোসিল (উঃ পৃষ্ঠা 163) ; (b) নেফ্রোসাইট (উঃ পৃষ্ঠা 175) ; (c) ক্যাম্পানিফর্ম রিসেপ্টর (উঃ পৃষ্ঠা 180) ; (d) ওমাটিডিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 180) ; (e) করপোরা কার্ডিয়াকা ও করপোরা অ্যালাটা (উঃ পৃষ্ঠা 182-183) ; (f) কন্‌গ্লোবেট গ্রন্থি (উঃ পৃষ্ঠা 185) ; (g) নিষ্ক (উঃ পৃষ্ঠা 187)।

পাইলা

1. প্রাণিসর্গে পাইলার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 191)
2. পাইলার খোলকের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 193)

3. পাইলার দেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ণনা কর। পাইলাকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয় ? [C.U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 201+191)
4. পাইলার পৌষ্টিকতন্ত্রের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 195)
5. পাইলার শ্বসনতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 199)
6. পাইলার নার্ভতন্ত্র বর্ণনা কর। [C U. 1976, '81] (উঃ পৃষ্ঠা 207)
7. পাইলার জননতন্ত্রের বিবরণ দাও। [C,U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 210)
8. পাইলার নার্ভতন্ত্র অপ্রতিসাম্য কেন ? যুক্তিসহ বুঝাও। (উঃ পৃষ্ঠা 208)
9. পাইলার গমন পদ্ধতি বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 198)
10. **টীকা লিখ ঃ**
(a) র‍্যাডুলা (উঃ পৃষ্ঠা 196); (b) রেনোপেরিকার্ডিয়াল ছিদ্র (উঃ পৃষ্ঠা 205); (c) অস্‌ফ্রেডিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 208); (d) স্টাটোসিস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 209); (e) জাইগোনিউরি (উঃ পৃষ্ঠা 208); (f) অ্যাওর্টিক অ্যাম্পুলা (উঃ পৃষ্ঠা 201); (g) হিমোসিল (উঃ পৃষ্ঠা 195); (h) বস্‌ (উঃ পৃষ্ঠা 192)।

স্টারফিশ

1. স্টারফিশের বিজ্ঞানসম্মত নাম ও প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 214)
2. স্টারফিশের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 215)
3. স্টারফিশের জল সংবহনতন্ত্রের বিবরণ দাও। [C.U. 1974, '80, '84] (উঃ পৃষ্ঠা 225)
4. স্টারফিশের পেডিসিলারির গঠন ও কার্যের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 216)
5. জলসংবহন তন্ত্রের গঠনের বিশেষ উল্লেখসহ স্টারফিশের গঠনের বিবরণ দাও। [C.U. 1978] (উঃ পৃষ্ঠা 225)
6. স্টারফিশের গমন-অঙ্গের গঠন ও কার্যের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 217)
7. স্টারফিশের একটি বাহুর প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দৃষ্ট অংশগুলির সচিত্র বর্ণনা কর। [C.U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 220)
8. স্টারফিশের পৌষ্টিক তন্ত্রের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 222)
9. স্টারফিশের হিমাল তন্ত্রের কাজ কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 228)
10. স্টারফিশের নার্ভতন্ত্রের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 231)
11. স্টারফিশের পরিস্ফুরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 233+234)
12. স্টারফিশের অ্যাক্সিয়াল কমপ্লেক্সের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 229)
13. স্টারফিশের সিলোমের সংগঠন ও উৎপত্তি বিবৃত কর। (উঃ পৃষ্ঠা 221)
14. স্টারফিশের দেহে বিভিন্ন অসিকলের বিন্যাস চিত্রসহ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 218)

15. **পার্থক্য লিখ :**
   (a) মিউকাস কোষ ও মিউরিফর্ম কোষ। (উঃ পৃষ্ঠা 218)
   (b) অ্যাক্সিয়াল সাইনাস ও অ্যাক্সিয়াল অরগ্যান। (উঃ পৃষ্ঠা 227)
   (c) মোরুলা ও গ্যাস্ট্রুলা। (উঃ পৃষ্ঠা 233)

16. **টীকা লিখ :**
   (a) প্যাপুলি (উঃ পৃষ্ঠা 216); (b) পোডিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 217); (c) ম্যাড্রিপোরাইট (উঃ পৃষ্ঠা 225); (d) অ্যাক্সিয়াল সাইনাস (উঃ পৃষ্ঠা 226); (e) টিড্‌ম্যানস্ বডি (উঃ পৃষ্ঠা 227); (f) হিমাল প্লেক্সাস (উঃ পৃষ্ঠা 229); (g) নার্ভ পেণ্টাগন (উঃ পৃষ্ঠা 231); (h) লার্ভাল অরগ্যান (উঃ পৃষ্ঠা 235); (i) বাইপিনেরিয়া লার্ভা (উঃ পৃষ্ঠা 235); (j) ডরস্যাল স্যাক (উঃ পৃষ্ঠা 229)।

ব্রাঙ্কিওস্টোমা

1. ব্রাঙ্কিওস্টোমার প্রধান কর্ডেট বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? এই প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
   [C. U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 237, 245-250)
2. ব্রাঙ্কিওস্টোমার রেচনতন্ত্র বর্ণনা কর।
   [C. U. 1974, '78, '83] (উঃ পৃষ্ঠা 254-256)
3. ব্রাঙ্কিওস্টোমার দেহপ্রাচীরের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 239)।
4. ব্রাঙ্কিওস্টোমার গলবিলের গঠন ও কার্যের বিবরণ দাও।
   [C. U 1976] (উঃ পৃষ্ঠা 245)
5. ব্রাঙ্কিওস্টোমার দেহকাণ্ডের গলবিলীয় ও আন্ত্রিক অঞ্চলের প্রস্থচ্ছেদের তুলনামূলক বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 243-244)
6. ব্রাঙ্কিওস্টোমার সম্মুখভাগের লম্বচ্ছেদ অঙ্কন করিয়া অংশগুলির এবং খাদ্যগ্রহণে উহাদের ভূমিকার বর্ণনা কর।
   [C. U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 242+245)
7. ব্রাঙ্কিওস্টোমার রক্তসংবহনতন্ত্রের বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 252)
8. ব্রাঙ্কিওস্টোমার ক্ষেত্রে সিলিয়ারী পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ বর্ণনা কর।
   [C. U. 1979, '80] (উঃ পৃষ্ঠা 248)
9. ব্রাঙ্কিওস্টোমার গঠন বৈচিত্র্য বর্ণনা কর। [C. U. 1981] (উঃ পৃষ্ঠা 242)
10. ব্রাঙ্কিওস্টোমার স্নায়ুতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 256)
11. **টীকা লিখ :**
   (a) মায়োটোম (উঃ পৃষ্ঠা 244), (b) নোটোকর্ড (উঃ পৃষ্ঠা 244), (c) মায়োকোমা (উঃ পৃষ্ঠা 244), (d) এণ্ডোস্টাইল (উঃ পৃষ্ঠা 248),

(e) আট্রিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 251), (f) সোলেনোসাইট (উঃ পৃষ্ঠা 255), (g) ব্রাউন ফানেল (উঃ পৃষ্ঠা 254), (h) কলিকার পিট (উঃ পৃষ্ঠা 257), (i) অ্যাম্ফিওক্সিডিস্ (উঃ পৃষ্ঠা 261), (j) বুলবিউল (উঃ পৃষ্ঠা 253), (k) টেরিজিয়াল পেশী (উঃ পৃষ্ঠা 250), (l) মাইক্রোফ্যাগাস (উঃ পৃষ্ঠা 248) ।

ভেটকী ও ল্যাটা

1. ভেটকীর বিজ্ঞানসম্মত নাম কি ? ইহার স্বভাব ও বসতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 264)
2. চিহ্নিত চিত্রসহ ভেটকীর বহিরাকৃতির বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 265)
3. ভেটকীর পৌষ্টিক তন্ত্রের সহিত ল্যাটার পৌষ্টিক তন্ত্রের তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 271 & 290)
4. ভেটকীর এফারেন্ট ব্রাংকিয়াল সিস্টেমের বিবরণ দাও। [C. U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 277)
5. ভেটকী ও ল্যাটার ধমনীতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 277 & 292)
6. ভেটকীর রেচন-জননতন্ত্রের বর্ণনা দাও। [C. U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 288)
7. ভেটকীর শিরাতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 280)
8. ভেটকীর ধমনীতন্ত্র বর্ণনা কর। [C. U. 1981] (উঃ পৃষ্ঠা 277)
9. ভেটকীর শ্বসন অঙ্গের বর্ণনা দাও। [C. U. 1982] (উঃ পৃষ্ঠা 274)
10. **পার্থক্য লিখ** :
    (a) টিনোয়েড ও সাইক্লয়েড আঁইশ। (উঃ পৃষ্ঠা 267)
    (b) ফাইসোস্টোমাস ও ফাইসোক্লিস্টাস পটকা। (উঃ পৃষ্ঠা 275)
    (c) রেনাল ও হেপাটিক পোর্টাল শিরা। (উঃ পৃষ্ঠা 281)

কুনো ব্যাঙ

1. কুনো ব্যাঙের বিজ্ঞানসম্মত নাম ও প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্ণয় কর। (উঃ পৃষ্ঠা 295 & 253)
2. কুনো ব্যাঙের পাচনতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 307)
3. কুনো ব্যাঙের উপাক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 304)
4. কুনো ব্যাঙের রক্তের বিস্তারিত বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 317)
5. কুনো ব্যাঙের ধমনীতন্ত্রের সচিত্র বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 321)
6. কুনো ব্যাঙের শিরাতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 323)
7. কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। মস্তিষ্কের প্রাধন অংশগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 329)

8. করোটিক নার্ভ কাহাকে বলে ? কুনো ব্যাঙের করোটিক নার্ভের সংখ্যা কত ? 5, 7, 9 এবং 10 নম্বর করোটিক নার্ভের প্রকৃতি, উৎস ও বিস্তার বিবৃত কর। (উঃ পৃষ্ঠা 331)
9. ব্যাঙের হৃদযন্ত্রের অন্তর্গঠনের বিবরণ দাও ও উহার ভিতর কিরূপভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহা বর্ণনা কর। [C. U. 1974 '79] (উঃ পৃষ্ঠা 319-320)
10. কুনো ব্যাঙের চক্ষুর গঠন ও কার্য পদ্ধতি বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 337)
11. "কুনো ব্যাঙের কর্ণ দ্বৈত ইন্দ্রিয়ের কাজ করে"—ব্যাখ্যা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 339)
12. কুনো ব্যাঙের শ্বাসতন্ত্র বর্ণনা কর। ব্যাঙাচি কিভাবে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে ? [C. U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 314-315)
13. কুনো ব্যাঙের রেচনতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 341)
14. স্ত্রী ও পুরুষ কুনো ব্যাঙ কিভাবে চেনা যায় ? স্ত্রী- ও পুং-জননতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 345)
15. পোর্টাল তন্ত্র কি ? ব্যাঙের পোর্টাল তন্ত্রের বর্ণনা দাও। [C. U. 1976] (উঃ পৃষ্ঠা 325)
16. কুনো ব্যাঙের জীবন-চক্র সম্পূর্ণ করিতে থাইরয়েড গ্রন্থির ভূমিকা কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 344)
17. কোন শিরার মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাহিত হয় ? (উঃ পৃষ্ঠা 325)
18. **পার্থক্য লিখ :**
   (a) নেফ্রন (উঃ পৃষ্ঠা 341) ও নিউরোন (উঃ পৃষ্ঠা 327)।
   (b) ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ও সায়াটিক প্লেকসাস (পৃঃ 335)।
   (c) ফোরামেন ম্যাগনাম (উঃ পৃষ্ঠা 301) ও ফোরামেন অব্ মন্রো (উঃ পৃষ্ঠা 330)
   (d) অপ্টোসিল ও রাইনোসিল (উঃ পৃষ্ঠা 330)
   (e) স্ট্রাটাম স্পঞ্জিওসাম ও স্ট্রাটাম কম্প্যাক্টাম (উঃ পৃষ্ঠা 299)
   (f) স্ট্রাটাম কর্ণিয়াম ও স্ট্রাটাম জারমিনেটিভাম (উঃ পৃষ্ঠা 298)
   (g) কেভাম পাল্‌মোকিউটেনিয়াম ও কেভাম অ্যায়োর্টিকাম (উঃ পৃষ্ঠা 319)
   (h) কোনাস আর্টারিওসাস ও ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস (উঃ পৃষ্ঠা 319+320)
   (i) ডুরা ম্যাটার ও পায়া ম্যাটার। (উঃ পৃষ্ঠা 328)
19. **টীকা লিখ :**
   (a) নপ্‌শিয়াল প্যাড (উঃ পৃষ্ঠা 298), (b) পাকমণ্ড (উঃ পৃষ্ঠা 309), (c) কর্ডিটেণ্ডিনি (উঃ পৃষ্ঠা 319), (d) ক্যারোটিড ল্যাবিরিন্থ (উঃ পৃষ্ঠা 321), (e) লসিকা (উঃ পৃষ্ঠা 326), (f) রেটিনা (উঃ পৃষ্ঠা 338), (g) বিডারস্ অরগ্যান (উঃ পৃষ্ঠা 347)।
20. কুনো ব্যাঙের জীবন-চক্র ও রূপান্তর বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 348)

ক্যালোটিস

1. ক্যালোটিসের স্বভাব এবং প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 356)
2. ক্যালোটিসের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 357)
3. ক্যালোটিসের পৌষ্টিক তন্ত্রের সচিত্র বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 365)
4. ক্যালোটিসের ধমনীতন্ত্র অঙ্কন এবং বর্ণনা কর। [B. U. 1975, '77] (উঃ পৃষ্ঠা 370-373)
5. ক্যালোটিসের ফুসফুসের গঠন ও ইহার শ্বসনক্রিয়া বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 367)
6. ক্যালোটিসের হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া বুঝাও। (উঃ পৃষ্ঠা 368-370)
7. ক্যালোটিসের শিরাতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। (উঃ পৃষ্ঠা 374)
8. ক্যালোটিসের মস্তিষ্ক অঙ্কন ও বর্ণনা কর। [B. U. 1976] (উঃ পৃষ্ঠা 375-376)
9. ক্যালোটিসের বর্ণের বৈশিষ্ট্য কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 378)
10. ক্যালোটিসের স্ত্রী ও পুং-জননতন্ত্রের তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 380)
11. **টীকা লিখ**

    (a) হেমিপেনিস (উঃ পৃষ্ঠা 380), (b) কলুমেলা অরিস (উঃ পৃষ্ঠা 378), (c) জ্যাকবসন অঙ্গ (উঃ পৃষ্ঠা 377), (d) ড্যাক্টাস ক্যারোটিকাস (উঃ পৃষ্ঠা 372), (e) সাইনাস ভেনোসাস (উঃ পৃষ্ঠা 368), (f) হ্যাপ্লোডন্ট (উঃ পৃষ্ঠা 365), (g) ফ্রিল (উঃ পৃষ্ঠা 359), (h) নির্মোচন (উঃ পৃষ্ঠা 356)।

সাপ

1. গর্তাশ্রয়ী হওয়ায় জন্য সাপের অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 381)
2. সাপের কশেরুকার বৈচিত্র্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 383)
3. বিষধর সাপের বিষযন্ত্র ও দংশন প্রক্রিয়া চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 384)
4. নির্বিষ ও বিষধর সাপের তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 387)

পায়রা

1. পায়রার পাচনতন্ত্রের সচিত্র বিবরণ দাও। [C. U. 1978] (উঃ পৃষ্ঠা 412)

2. পায়রার বহিঃকঙ্কালের বিবরণ দাও। [C. U. 1975, '84] (উঃ পৃষ্ঠা 395)
3. পায়রার বায়ু-থলির গঠন ও ইহাদের কার্য বর্ণনা কর।
[C. U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 419)
4. দ্বৈত-শ্বসন কাহাকে বলে ? পায়রার দ্বৈত-শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(উঃ পৃষ্ঠা 423)
5. পায়রার হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর। [C. U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 425)
6. পায়রার ধমনীতন্ত্র বর্ণনা কর। [C. U. 1976] (উঃ পৃষ্ঠা 428)
7. পায়রার দেহের অগ্রাঞ্চলের শিরাগুলির বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 432)
8. পায়রার উড্ডয়নে যে সকল পেশী সহায়ক তাহাদের বিবরণ দাও।
[C. U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 408)
9. পায়রার উড়ন পদ্ধতির উল্লেখ কর। [C. U. 1979] (উঃ পৃষ্ঠা 452)
10. পায়রার উড্ডন অভিযোজন বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 452)
11. র‍্যাটাইটি ও ক্যারিন্যাটির পার্থক্যগুলি বিবৃত কর।
[C. U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 645)
12. পায়রার চক্ষুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 443)
13. শ্বাসকার্যের সংজ্ঞা লেখ। পায়রার শ্বসনঅঙ্গের বর্ণনা দাও।
[C. U. 1980] (উঃ পৃষ্ঠা 417)
14. পায়রার হৃৎপিণ্ডের সচিত্র বর্ণনা দাও এবং সংক্ষেপে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত চলাচল বর্ণনা কর। [C. U. 1983] (উঃ পৃষ্ঠা 424)
15. পায়রার মস্তিষ্কের বিবরণ দাও। [C. U. 1981] (উঃ পৃষ্ঠা 436)
16. পায়রার সুষুম্নাকাণ্ড সুষুম্নানার্ভের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। (উঃ পৃষ্ঠা 445)
17. **পার্থক্য লিখ :**
(a) কপ্রোডিয়াম, ইউরোডিয়াম ও প্রক্টোডিয়াম (উঃ পৃষ্ঠা 445)
(b) ধমনী, শিরা ও জালক (উঃ পৃষ্ঠা 427)
(c) পেরিলিম্ফ ও এণ্ডোলিম্ফ (উঃ পৃষ্ঠা 448)
(d) পায়রার পাইগোস্টাইল (উঃ পৃষ্ঠা 455) ও কুনো ব্যাঙের ইউরোস্টাইল।
(উঃ পৃষ্ঠা 304)
(e) কর্পোরা বাইজেমিনা (উঃ পৃষ্ঠা 437) ও কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা
(উঃ পৃষ্ঠা 498)
(f) রড-কোষ ও কোন-কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 445)
18. **টীকা লিখ :**
(a) বার্সা ফ্যাব্রিসি (উঃ পৃষ্ঠা 415), (b) প্রবাহী বায়ু (Tidal air) (উঃ পৃষ্ঠা 423), (c) পেক্‌টেন (উঃ পৃষ্ঠা 445), (d) জুগুলার যোজক (Jugular anastomosis), (e) পিউডেনভাল প্লেক্সাস (উঃ পৃষ্ঠা 442),

(f) সাইরিংস (উঃ পৃষ্ঠা 418), (g) ইউরোপাইজিয়াল গ্রন্থি [C. U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 395)

গিনিপিগ

1. গিনিপিগের বিজ্ঞানসম্মত নাম ও প্রাণিসর্গে ইহার স্থান নির্দেশ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 463)
2. গিনিপিগের বহিরাকৃতির সচিত্র বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 464)
3. গিনিপিগের ত্বকের বৈশিষ্ট্য কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 465)
4. গিনিপিগের পৌষ্টিকতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 480)
5. গিনিপিগের দাঁতের বৈশিষ্ট্য ও দন্ত-সংকেত লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 481)
6. গিনিপিগের হৃদযন্ত্রের অন্তর্গঠনের বর্ণনা কর এবং হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 486-488)
7. গিনিপিগের স্বরযন্ত্রের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 484)
8. গিনিপিগের ফুসফুসের গঠন এবং শ্বসনের যান্ত্রিক পদ্ধতি বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 485)
9. গিনিপিগের রক্তসংবহন তন্ত্রের কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
   উঃ (1) কেবলমাত্র বাম আওর্টিক মহাধমনীর উপস্থিতি।
   (2) বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা।
   (3) রেনাল পোর্টাল শিরার অনুপস্থিতি।
10. গিনিপিগের পুং-জননতন্ত্রের বিবরণ দাও। [C.U. 1974] (উঃ পৃষ্ঠা 486-487)
11. গিনিপিগের চক্ষু ও কর্ণের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 504+506)
12. গিনিপিগের পুং-জননতন্ত্রের সহিত স্ত্রী-জননতন্ত্রের তুলনা কর। [C.U. 1978] (উঃ পৃষ্ঠা 509+510)
13. গিনিপিগের করোটির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 468)
14. করোটিক নার্ভ কাহাকে বলে ? 2, 5, 7 এবং 10 নম্বর করোটিক নার্ভের নাম লিখ এবং গিনিপিগে তাহাদের উৎপত্তি ও বিন্যাস সংস্থান উল্লেখ কর। [C.U. 1977] (উঃ পৃষ্ঠা 500-503)
15. **পার্থক্য লিখ :**
   (a) বাইকাসপিড কপাটিকা ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা। (উঃ পৃষ্ঠা 488)
   (b) সিস্টোল ও ডায়াস্টোল। (উঃ পৃষ্ঠা 488)
   (c) ফুসফুসীয় ধমনী ও ফুসফুসীয় শিরা। (উঃ পৃষ্ঠা 489+495)
   (d) কর্পাস স্ট্রায়েটাম ও কর্পাস ক্যালোসাম। (উঃ পৃষ্ঠা 498)
   (e) থিকোডণ্ট ও হেটারোডণ্ট দাঁত। (উঃ পৃষ্ঠা 468)
   (f) অ্যাটলাস ও অ্যাক্সিস। (উঃ পৃষ্ঠা 472+473)
   (g) ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস। (উঃ পৃষ্ঠা 505)

16. **টীকা লিখ :**

(a) ডায়াস্টেমা (উঃ পৃষ্ঠা 469) ; (b) মেডিয়াস্টিনাম (উঃ পৃষ্ঠা 486) ; (c) ভারমিস (উঃ পৃষ্ঠা 499) ; (d) আইটার (উঃ পৃষ্ঠা 500) ; (e) গ্যাসেরিয়ন গ্যাংলিয়ন (উঃ পৃষ্ঠা 501) ; (f) অরগ্যান অব্ কর্টি (উঃ পৃষ্ঠা 505) ; (g) কাউপার গ্রন্থি (উঃ পৃষ্ঠা 509) ; (h) অ্যাজাইগোস লোব (উঃ পৃষ্ঠা 485) ; (i) ম্যামিলারী বডি (উঃ পৃষ্ঠা 498), (j) অপ্‌টিক কায়াজমা (উঃ পৃষ্ঠা 498) ; (k) পন্‌স (উঃ পৃষ্ঠা 499) ; (l) অ্যাসিটাবুলাম [C.U. 1975] (উঃ পৃষ্ঠা 479) ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. শ্রেণীবিন্যাস কি ? ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তোমার মতামত লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 515)
2. বায়োনমিক্ শ্রেণীবিন্যাস কাহাকে বলে ? জীবজগতে ইহার তাৎপর্য কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 518)
3. কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসের সহিত প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাসের মূল পার্থক্য কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 518)
4. লিনিয়াসকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের জনক বলা হয় কেন ? লিনিয়াস অবলম্বিত প্রাণিগোষ্ঠীর শ্রেণীবিন্যাস দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 519)
5. বিজ্ঞানসম্মত নামকরণের তাৎপর্য উল্লেখ কর ? (উঃ পৃষ্ঠা 523)
6. দ্বিপদ নামকরণ ও ত্রি-পদ নামকরণের পার্থক্য কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 523, 524)
7. নামকরণের আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। এই ধরনের নীতির তাৎপর্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 524)
8. প্রাণিরাজ্যের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 527)

তৃতীয় অধ্যায়

1. প্রাণিকুলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 534)
2. প্রোটোজোয়া পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি ? এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত দশটি পরজীবী প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 537-539)
3. স্পঞ্জকে পরিফেরা পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন ? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। কয়েকটি স্পঞ্জের বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 542-545)
4. প্ল্যানুলা লার্ভা কোন পর্বভুক্ত প্রাণীদের জীবন-চক্রে দৃষ্ট হয় ? (উঃ পৃষ্ঠা 547)
5. টিনোফোরা পর্বের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং দুইটি উদাহরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 550)
6. মানুষের অন্ত্রে পরজীবীরূপে বাস করে এই ধরনের একটি চ্যাপ্টা কৃমির নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 554)

7. মানুষের নিম্নোক্ত রোগ কোন্ কোন্ প্রাণীর দ্বারা সংঘটিত হয় ?
(a) শ্লীপদ (উঃ পৃষ্ঠা 557) ; (b) অ্যাস্‌কেরিয়েসিস (উঃ পৃষ্ঠা 557)
(c) ম্যালেরিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 540) ; (d) অ্যামিবিয়েসিস (উঃ পৃষ্ঠা 539)
(e) পায়োরিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 439) ; (f) কালাজ্বর (উঃ পৃষ্ঠা 538) ;
(g) ঘুম-রোগ (উঃ পৃষ্ঠা 538)।

8. অ্যানিলিডা পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 557)

9. আরথ্রোপোডা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এই পর্বের অধীনে কয়েকটি উপকারী ও অপকারী প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 560-568)

10. মোলাস্কা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণী পর্যন্ত উদাহরণ সহ ভাগ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 569-570)

11. কোন প্রকার শম্বুকজাতীয় প্রাণী হইতে মুক্তা পাওয়া যায় ? (উঃ পৃষ্ঠা 572)

12. একাইনোডার্মাটা পর্বের নামকরণের সার্থকতা কি ? ব্যাখ্যা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 574)

13. কর্ডাটা পর্বের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 580)

14. কেন মাছকে ভার্টিব্রেটা উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ? (উঃ পৃষ্ঠা 588)

15. অমেরুদণ্ডী কর্ডাটা প্রাণী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পার্থক্য দেখাও। (উঃ পৃষ্ঠা 589)

16. সাইক্লোস্টোমাটা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কি কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 591)

17. ল্যাম্প্রে ও হ্যাগফিসের তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 591)

18. তরুণাস্থিময় ও অস্থিময় মাছের পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 611)

19. অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসহ শ্রেণীবিন্যাস কর এবং বিভিন্ন বর্গের ভারতীয় প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 614)

20. সরীসৃপদের বৈশিষ্ট্য কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 622)

21. ল্যাসারটিলিয়া ও অফিডিয়া উপবর্গদ্বয়ের তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 627)

22. র‍্যাটিটি ও ক্যারিনেটির তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 645)

23. ম্যামেলিয়া শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত শ্রেণীবিন্যাস কর। (উঃ পৃষ্ঠা 648)

24. বাদুড় কোন বর্গের অন্তর্গত ? এই বর্গের অধীনস্থ উপবর্গ দুইটির তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 655)

25. মানুষ যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত—সেই বর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 656)

26. জলবাসী স্তন্যপায়ী দুইটি বর্গের তুলনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 659-660)

27. পেরিসোড্যাক্টাইলা ও আর্টিওড্যাক্টাইলা বর্গের তুলনামূলক আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 665)

28. গরুর পাকস্থলী চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। (উঃ পৃষ্ঠা 665)

29. **নিম্নলিখিত কোষ/কোষাণু/অঙ্গাণু / অঙ্গ কোন পর্ব/শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য ?**

(1) ক্ষণপাদ (উঃ পৃষ্ঠা 535), (2) কোয়ানোসাইট (উঃ পৃষ্ঠা 543), (3) নিডোব্লাস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 547), (4) ভেলাম (উঃ পৃষ্ঠা 547), (5) কোলোব্লাস্ট (উঃ পৃষ্ঠা 550), (6) ফ্লেম কোষ (উঃ পৃষ্ঠা 552), (5) স্কোলেক্স (উঃ পৃষ্ঠা 555), (8) সিটা (উঃ পৃষ্ঠা 558), (9) ফুট (উঃ পৃষ্ঠা 570) (10) টিউব-ফুট (উঃ পৃষ্ঠা 576), (11) অ্যারিস্টটলের লন্ঠন (উঃ 577), (12) নোটোকর্ড (উঃ পৃষ্ঠা 580), (13) প্রাক্‌মৌখিক উপবৃদ্ধি (উঃ পৃষ্ঠা 583), (14) টিউনিক (উঃ পৃষ্ঠা 585), (15) মায়োটোম (উঃ পৃষ্ঠা 587), (16) প্লাকয়েড আঁইশ (উঃ পৃষ্ঠা 599), (17) তৃতীয় চক্ষু (উঃ পৃষ্ঠা 625), (18) ফোরামেন অব্‌ প্যানিজা (উঃ পৃষ্ঠা 628), (19) সাইরিংস (উঃ পৃষ্ঠা 631), (20) পেকটেন (উঃ পৃষ্ঠা 631), (21) মধ্যচ্ছদা (উঃ পৃষ্ঠা 649), (22) ক্যালকার (উঃ পৃষ্ঠা 655), (23) ট্রাগাস (উঃ পৃষ্ঠা 655), (24) কার্নাসিয়াল দাঁত (উঃ পৃষ্ঠা 671)।

30. **নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি কোন পর্বের/শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর :**
(1) জেলি ফিশ (উঃ পৃষ্ঠা 544), (2) বেরো (উঃ পৃষ্ঠা 551), (3) সাগর-কুসুম (উঃ পৃষ্ঠা 549), (4) যকৃত-কৃমি (উঃ পৃষ্ঠা 554), (5) টিনিয়া (উঃ পৃষ্ঠা 555), (6) সমুদ্র-মূষিক (উঃ পৃষ্ঠা 559), (7) সিলভার-ফিশ (উঃ পৃষ্ঠা 568), (8) রেশম-কীট (উঃ পৃষ্ঠা 568), (9) রাজ-কাঁকড়া (উঃ পৃষ্ঠা 564), (10) মারজেরিটিফেরা (উঃ পৃষ্ঠা 572), (11) অক্টোপাস (উঃ পৃষ্ঠা 573), (12) তারামাছ (উঃ পৃষ্ঠা 576 (13) সমুদ্র-শশা (উঃ পৃষ্ঠা 578), (14) ব্যালানোগ্লোসাস (উঃ পৃষ্ঠা 584), (15) হ্যাগ-ফিশ (উঃ পৃষ্ঠা 591), (16) ইলেকট্রিক মাছ (উঃ পৃষ্ঠা 600), (17) করাত মাছ (উঃ পৃষ্ঠা 600), (18) "বম্বে ডাক" (উঃ পৃষ্ঠা 605), (19) সমুদ্র-ঘোড়া (উঃ পৃষ্ঠা 607), (20) ট্রাইলোটোট্রাইটন (উঃ পৃষ্ঠা 620), (21) স্ফেনোডন (উঃ পৃষ্ঠা 624), (22) হংসচঞ্চু (উঃ পৃষ্ঠা 648), (23) ক্যাঙ্গারু (উঃ পৃষ্ঠা 653)।

চতুর্থ অধ্যায়

1. প্রাণি-ভূগোল কাহাকে বলে ? (উঃ পৃষ্ঠা 669)
2. ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তার সমান নয় কেন ? (উঃ পৃষ্ঠা 669-670)

3. প্রাণী বিস্তারের ফ্যাক্টরগুলি সবিস্তারে বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 670)
4. প্রাণীদের বিস্তারের উপর নির্ভর করিয়া ভূ-পৃষ্ঠকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় ? প্রত্যেকটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 675)
5. নিম্নউল্লেখিত প্রাণীসমূহ কোন অঞ্চলে বাস করে ?
   (a) অপোসাম (উঃ পৃষ্ঠা 676)
   (b) লামা (উঃ পৃষ্ঠা 677)
   (c) লেপিডোসাইরেন (উঃ পৃষ্ঠা 677)
   (d) উট (উঃ পৃষ্ঠা 677)
   (e) প্রোটোপ্‌টেরাস (উঃ পৃষ্ঠা 678)
   (f) গরিলা (উঃ পৃষ্ঠা 678)
   (g) ময়ূর (উঃ পৃষ্ঠা 679)
   (h) ক্যাঙ্গারু (উঃ পৃষ্ঠা 679)
   (i) সিংহ (উঃ পৃষ্ঠা 678)
6. প্রাণি বিস্তারের ভূ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশদভাবে লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 680)

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

ZOOLOGY—PASS

First Paper

Answer *five* questions from Group A which must include No. 1 and *one* from Group B

Group A

১। বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখসহ পরিফেরা পর্বের শ্রেণী পর্যন্ত বিন্যাস কর। (উঃ পৃঃ 542)

অথবা

উপযুক্ত ভারতীয় উদাহরণ এবং যুক্তিসহ অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর বর্তমান বর্গ (অর্ডার) পর্যন্ত বিন্যাস কর। (উঃ পৃঃ 613)

২। মানুষের ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী প্রাণীদের নাম লেখ। বাহক পতঙ্গের মধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনবৃত্তান্তের বিবরণ দাও। (উঃ পৃঃ 32)

৩। ওবেলিয়া কলোনীর বিবরণ দাও এবং মেটাজেনেসিসের উপর টীকা লিখ। (উঃ পৃঃ 61)

৪। শ্বাসকার্যের সংজ্ঞা লেখ। পায়রার শ্বসন অঙ্গের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃঃ 412)

৫। স্টারফিসের ওয়াটার ভাস্কুলারতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃঃ 225)

৬। অ্যাম্ফিওক্সাসের সিলিয়ারী পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ-প্রণালীর বিবরণ লেখ। (উঃ পৃঃ 245)

৭। লেটিসের জনন-মূত্রতন্ত্রের বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 288)

৮। পুং-আরশোলার জনন-অঙ্গের বিবরণ দাও। (উঃ পৃঃ 134)

৯। নিম্নলিখিত যে-কোনও তিনটির নকশা এবং সংক্ষিপ্ত টীকাসহ বিবরণ দাও।

(ক) বাইপিনোরিয়া, (উঃ পৃঃ 233)

(খ) ভেলিজার, (উঃ পৃঃ 212)

(গ) বট্রিঅয়ডাল টিস্যু, (উঃ পৃঃ 117)

(ঘ) পায়রার ক্লোয়েকা, (উঃ পৃঃ 412)

(ঙ) মাছের পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখা। (উঃ পৃঃ 224)

১০। পায়রার হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 424)

Group B

১১। জলজ স্তন্যপায়ীদের নাম লেখ। 'সিটেশিয়ার' জলজ-অভিযোজন বর্ণনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 299)

১২। জীব-অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ডারউইনের অবদানের আলোচনা কর।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 276)

১৩। বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন জুওজিওগ্রাফিক্যাল অঞ্চলের বিবরণ দাও এবং উহাদের প্রতিটির আদর্শ প্রাণিগোষ্ঠীর উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 675)

ZOOLOGY—PASS

Second Paper

Answer *six* questions, *four* from Group A and *two* from Group B

Group A

১। ব্যাণ্ডিকুটা বেঙ্গলেনসীস-এর পরিবেশ এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যাহা জান লেখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৪৮)

২। বমবিক্স মোরির জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 429)

৩। পশ্চিমবঙ্গের মৌমাছি-পালন শিল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 43৮)

৪। পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান মেজর কার্পসের মিশ্রচাষের পদ্ধতি এবং সমস্যার আলোচনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 455)

৫। ভারতের প্রসিদ্ধ অভয় অরণ্যগুলির নাম কর এবং উহাদের যে-কোনও একটিতে প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থাদির বিষয়ে লেখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 533)

৬। ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাসের জীবনবৃত্তান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিবরণ লেখ।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 480)

৭। লাক্ষা-পতঙ্গের নাম লেখ এবং লাক্ষাচাষের পদ্ধতির বিবরণ দাও।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 444)

৮। পোলট্রি পাখীর প্রধান রোগগুলির নাম লেখ এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণের উপর মন্তব্য কর। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 512)

৯। পশ্চিমবঙ্গের চিংড়ি চাষ সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 46৮)

Group B

১০। প্রাণিকোষের প্রথম মিওটিক বিভাজনের বিবরণ দাও।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 67)

১১। ড্রসোফিলার সেক্স্ ক্রোমোজোমের এবং লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যালান্স থিয়োরীর বিবরণ দাও। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 164)

১১। টিসু কাহাকে বলে ? কয় ধরনের প্রাণী-টিসু হয় ? উহাদের যে কোনটির বর্ণনা দাও। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 374)

১৩। খরগোসের প্লাসেন্টা কিভাবে তৈরী হয় লেখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 369)

ZOOLOGY—PASS

First Paper

Answer *five* questions from Group A which must include No. 1 and any *one* from Group B

Group A

১। যুক্তি ও উদাহরণসহ প্রোটোজোয়া পর্বের শ্রেণী পর্যন্ত বিন্যাস কর। ১০
(উঃ পৃঃ 531)

অথবা যুক্তি ও উদাহরণসহ বর্তমান সরীসৃপদের বর্গ (অর্ডার) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর। (উঃ পৃঃ 620)

২। অ্যাস্‌ক্যারিসের জনন-অঙ্গের এবং জীবন-বৃত্তান্তের বিবরণ দাও।
(উঃ পৃঃ 110)

৩। আরশোলার শ্বসনতন্ত্রের বিবরণ লিখ। (উঃ পৃঃ 168)

৪। পাইলার নার্ভতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃঃ 205)

৫। অ্যাম্ফিঅক্‌সাসের গঠনবৈচিত্র্য বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 238)

৬। ল্যাটিসের ধমনীতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 276)

৭। পায়রার মস্তিষ্কের বিবরণ দাও। (উঃ পৃঃ 436)

৮। যে-কোনও চারিটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ

(ক) সিগনেট্ রিং (উঃ পৃঃ 33), (খ) গেমিউলস্ (উঃ পৃঃ 57), (গ) অস্‌ফ্রেডিয়াম (উঃ পৃঃ 208), (ঘ) টিউবফুট (উঃ পৃঃ 227), (ঙ) ভেগাস নার্ভ (উঃ পৃঃ 334), (চ) টিনয়েড স্কেল (উঃ পৃঃ 267)।

Group B

৯। অভিযোজন কাহাকে বলে ? উড্ডয়ন অভিযোজনের বিবরণ লিখ। ২০
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 292)

১০। নয়াডারউইনবাদের সমালোচনামূলক আলোচনা লিখ। ২০
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 280)

ZOOLOGY—PASS

Second Paper

Answer *six* questions, *four* from Group A and *two* from Group B

Group A

১। ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাসের আচরণ এবং ইহাদের দমন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 280) ১৫

২। রেশমপোকার রোগসমূহের এবং উহা দমনের পদ্ধতি বর্ণনা দাও। ১৫
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 434)

৩। আমাদের দেশের লাক্ষাচাষ পদ্ধতি আলোচনা কর। ১৫
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 444)

৪। মুরগীচাষে যে সব বিভিন্ন জাতির মুরগীচাষ করা হয় তাহাদের বিবরণ লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 447) ১৫

৫। সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত প্রধান প্রধান স্তন্যপায়ীর নাম লিখ এবং ভারতবর্ষে উহাদের সংরক্ষণের কি সাধারণ নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা লিখ। ১৫
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 533)

অথবা, ভারতবর্ষের যে কোন তিনটি অভয়ারণ্যে কি কি প্রধান স্তন্যপায়ীদের সংরক্ষিত করা হইয়াছে তাহার বিবরণ লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 530-533) ১৫

৬। আমাদের দেশের মুক্তাচাষ পদ্ধতি এবং উহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 474) ১৫

Group B

৭। জেনেটিক্ বস্তু হিসাবে ডি. এন. এ.'র মূল্যায়ন কর। ২০
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 238)

৮। মানুষের সেক্সক্রোম্যাটিনের বিবরণ লিখ। এবং উহা পঠন-পাঠনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 174)

৯। তোমার পঠিত যে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিযুক্তকরণ প্রক্রিয়ার বিবরণ লিখ।
(উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 339) ২০

১০। মুরগীর ভ্রূণাবরণীর গঠনপদ্ধতির বর্ণনা লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড পৃঃ 360) ২০

ZOOLOGY—PASS

First Paper

Group A

(Group C is Compulsory)

Answer any *two* questions :—

1. Classify Phylum Mollusca upto class giving reasons and examples. (Ans. Page—569) 20

2. Describe the life cycle of *Plasmodium vivax* in the human body. (Ans. Page—32) 20

3. Give a brief account of the reproductive organs of cockroach. (Ans. Page—184) 20

4. Describe the heart of a pigeon and discuss the circulation of blood through it. (Ans. Page—425) 20

Group B

5. Answer any *fifteen* questions :—

(*i*) Mention the two principal features of Phylum Chordata. (Ans. Page—581) 2×15=30

(*ii*) Mention the two principal Arthropodan features of cockroach. (Ans. Page—153)

(*iii*) Give two distinguishing features of a polyp and of a medusa. (Ans. Page—61)

(*iv*) Where Radula is found and what is it function ? (Ans. Page—196)

(*v*) What is a nephridium and what is its function ? (Ans. Page—146)

(*vi*) What are the scientific names of the primary divisions of the brain of Lates ? (Ans. Page—281)

(*vii*) How many nephridia and how many testis occur in Leech ? (Ans. Page—125+132)

(*viii*) What are the characteristic features of the notochord of Amphioxus ? (Ans. Page—241)

(*ix*) Name the first two cervical vertebrae of pigeon and distinguish between the two vertebrae. (Ans. Page—457)

(*x*) With what organ the aerial respiration in Pila is conducted ? Where is it located. (Ans. Page—195)

(*xi*) Distinguish between a coelenteron and a coelome. (Ans. Page—61+138)

(*xii*) Distinguish between Pyloric caeca and Hepatic caeca. (Ans. Page—165+248)

(*xiii*) What is a portal vein and how many types are there ? (Ans. Page—325)

(*xiv*) Indicate the location of the madreporite in star fish. What is its function ? (Ans. Page—225)

(*xv*) How many chambers are there in the heart of a cockroach and what are their characteristics ? (Ans. Page—173)

(*xvi*) What are the functions of a tube foot ? (Ans. Page—227)

(*xvii*) In which animal, endostyle and epipharyngeal groove occur. What are their functions ? (Ans. Page--245)

(*xviii*) In what ways male and female ascaris can be identified ? (Ans. Page—104)

(*xix*) Distinguish between the operculum of Pila and that of a Lates. (Ans. Page—193+274)

(*xx*) Give the names of four characteristic animals of the Ethiopean region. (Ans. Page—678)

Group C

Answer any *four* questions :—

6. Describe the adaptive features of the aquatic vertebrates. (Ans. Vol. 2, Page—299) 15

7. Give an account of the palaeontological evidences in support of organic evolution. (Ans. Vol. 2, Page 260) 15

8. To which Zoogeographical realm do the following animals belong ? (*Answer* any ten). 15

(*a*) Trilototriton (Page—678), (*b*) Hylobates (Page—678), (*c*) Kangaroo (Page—679), (*d*) Kiwi (Page—679), (*e*) Sphenodon (Page—678), (*f*) Zebra (Page—678), (*g*) Protopterus (Page—678), (*h*) Ceratodus (Page—679), (*i*) Opossum (Page—676), (*j*) Penguin (Page—678), (*k*) Peacock (Page—679) and (*l*) Rhinoceros (Page—678).

9. Discuss Darwin's theory of evolution. 15 (Ans. Vol. 2, Page—276)

10. Classify the living amphibians with reasons and examples upto order. (Ans. Page—613) 15

11. Describe the digestive system of leech. (Ans. Page—119) 15

12. Give an account of respiratory organ in Lates. 15 (Ans. Page—274)

ZOOLOGY—PASS

First Paper

Group A

১। যে-কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও :— 15×2=30

(ক) বৈশিষ্ট্যগতভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে কি ভাবে পৃথক করিবে ? (উঃ পৃঃ 649)

(খ) ওবেলিয়াকে ট্রাইমরফিক্ কলোনী কেন বলিবে ? (উঃ পৃঃ 61)

(গ) অ্যাসকেরিসের দেহ গহ্বরকে প্রকৃত সিলোম বলা যায় কিনা কারণসহ লিখ। (উঃ পৃঃ 106)

(ঘ) জোঁকের দেহমধ্যস্থিত ক্রপের দুইটি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 119)

(ঙ) জোঁকের ডিম্বাশয় থলি কোথায় থাকে এবং উহার কাজ কি ?(উঃ পৃঃ 134)

(চ) আরশোলার কোল্যাটিরিয়াল গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত এবং উহার কাজ কি ? (উঃ পৃঃ 186)

(ছ) আরশোলার শ্বাসকার্য কোন্ অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় ? (উঃ পৃঃ 168)

(জ) দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া স্টারফিসকে একাইনোডারমেটা পর্বে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা দেখাও।

(উঃ (১) অরীয় প্রতিসম দেহ এবং (২) জল সংবহন তন্ত্রের উপস্থিতি।)

(ঝ) পাইলার রেচনকার্য প্রধানত কোন্ অঙ্গদ্বারা সম্পাদিত হয় এবং উহা পাইলার কোন্ অংশে থাকে। (উঃ পৃঃ 204)

(ঞ) কি কি লার্ভাদশার মাধ্যমে স্টারফিসের রূপান্তর হয়। (উঃ পৃঃ 235)

(ট) অসফ্রেডিয়াম কোথায় পাওয়া যায় এবং উহার কাজ কি ? (উঃ পৃঃ 208)

(ঠ) হেস্চেক নেফ্রিডিয়াম কোন্ প্রাণীদেহে থাকে এবং উহার কাজ কি ? (উঃ পৃঃ 255)

(ড) ল্যাটিসের অন্তর্বাহী ব্র্যাঙ্কিয়াল ধমনী এবং বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনীর কার্যের মধ্যে পার্থক্য কি ? (উঃ পৃঃ 277)

(ঢ) পায়রার মস্তিষ্কের প্রাথমিক অংশগুলির বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। (উঃ পৃঃ 436)

(ণ) সিনস্যাক্রাম বলিতে কি বুঝ এবং ইহা কোথায় পাওয়া যায়। (উঃ পৃঃ 458)

(ত) ল্যাটিসের যুগ্ম পাখনাগুলির নাম লিখ। (উঃ পৃঃ 265)

(থ) আরশোলার ম্যালপিজিয়ান নালিকার অবস্থান নির্দেশ কর এবং ইহার মুখ্য কাজ কি ? (উঃ পৃঃ 174)

(দ) মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তের মুখ্য উপাদান কি কি ? (উঃ পৃঃ 317)

(ধ) ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীর নাম লিখ। (উঃ পৃঃ 678)

(ন) মানুষের দেহে দুইটি পরজীবী প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ।
উঃ (১) প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, (২) অ্যাস্‌কারিস লাম্বিক্রয়ডিস।

Group B

যে-কোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। খেচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ 292)

৩। নয়া-ডারউইনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ 280)

৪। যুক্তি ও উদাহরণসহ মোলাস্কা পর্বের অধোশ্রেণী (সাবক্লাস) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর। (উঃ পৃঃ 569)

অথবা

যুক্তি ও উদাহরণসহ বর্তমান সরীসৃপদের বর্গ (অর্ডার) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর।
(উঃ পৃঃ 622)

৫। ম্যালেরিয়ার পরজীবীয় জীবন ইতিহাসে মশার ভিতরে সংঘটিত জীবনচক্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 34)

৬। আরশোলার পাচনতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃঃ 164)

৭। পায়রার হৃৎপিণ্ডের সচিত্র বর্ণনা দাও, এবং সংক্ষেপে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত চলাচল বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 424)

৮। অ্যাম্‌ফিঅক্সাসের রেচনতন্ত্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 254)

ZOOLOGY—FIRST PAPER

The figures in the margin indicate full marks

Group A

১। যে-কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ— ২ × ১৫ = ৩০

(ক) সাইজ্‌গোনি কি ধরনের বংশবিস্তার ও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়। (উঃ পৃঃ 32)

(খ) দুইটি অন্তঃকোষীর পরজীবীর নাম উল্লেখ কর।

(উঃ (১) প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, (২) প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরী।)

(গ) পেরিসার্ক কি ? ইহার পরিবর্তিত রূপের নাম দাও। (উঃ পৃঃ 63+65)

(ঘ) ওবেলিয়া কলোনির গ্যাসট্রোজ্‌ওইড়ে যে কর্ষিকা থাকে তাহার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 65)

(ঙ) বৈশিষ্ট্যগতভাবে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে কিভাবে পৃথক করিবে ? (উঃ পৃঃ 589)

(চ) জোঁকের চোয়ালের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 119)

(ছ) জোঁকের রেচনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 125)

(জ) পাইলার স্ট্যাটোসিস্ট কোন্ অংশে অবস্থিত এবং উহার কাজ উল্লেখ কর।

(উঃ পৃঃ 209)

(ঝ) পাইলাকে কেন উভচর মোলাস্কা বলা হয় ? (উঃ পৃঃ 199)

(ঞ) দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া প্লাজমোডিয়ামকে প্রোটোজোয়া পর্বে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা দেখাও।

(উঃ (১) এককোষী প্রাণী, (২) সাইজোগোনি ধরনের অযৌন জনন।)

(ট) অর্গান অব বোজেনাস কোথায় পাওয়া যায় এবং উহার কাজ উল্লেখ কর।

(উঃ পাইলার এবং অন্যান্য শম্বুক জাতীয় প্রাণীদের রেচন অঙ্গকে অর্গান অব বোজেনাস বলে। ইহারা রেচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।)

(ঠ) তারামাছের টিড্‌ম্যানস্ বডির অবস্থান, সংখ্যা ও কাজ উল্লেখ কর।

(উঃ পৃঃ 227)

(ড) তারামাছের টিউব-ফুটের দুইটি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

(উঃ পৃঃ 227)

(ঢ) পোডিসেরারি কি এবং ইহা কোন্ প্রাণীতে পাওয়া যায় ? (উঃ পৃঃ 217)

(ণ) অ্যাম্ফিওক্সাসের বাক্কাল সিরি কোথায় অবস্থিত ? ইহার কাজ উল্লেখ কর।

(উঃ পৃঃ 239)

(ত) অ্যাম্ফিওক্সাসের রেচন অঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 254)

(থ) ল্যাটিসের হৃৎপিণ্ডে কয়টি প্রকোষ্ঠ ? ল্যাটিসের হৃৎপিণ্ডকে কেন ভেনাস হৃৎপিণ্ড বলা হয় ? (উঃ পৃঃ 276)

(দ) ফ্যালসিফর্ম প্রসেসের অবস্থান, আকৃতি এবং ইহার উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 286)

(ধ) পায়রার দুধ কি ? (উঃ পৃঃ 414)

(ন) ফোরামেন ট্রায়োসিয়ম কোন্ প্রাণীতে পাওয়া যায় ? ইহার কাজ উল্লেখ কর। (উঃ পৃঃ 406)

Group B

২নং প্রশ্ন এবং আর যে-কোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ— ১০

২। যুক্তি ও উদাহরণসহ অ্যানিলিডা পর্বের অধোশ্রেণী (সাবক্লাস) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর। (উঃ পৃষ্ঠা 557)

অথবা

যুক্তি ও উদাহরণসহ ম্যামেলিয়াদের অধোশ্রেণী (সাবক্লাস) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর। (উঃ পৃষ্ঠা 648)

৩। মেটাজেনেসিস্ কি ? ওবেলিয়ার জীবন-বৃত্তান্তে ইহার চিত্রসহ বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 68-69) ২০

৪। পরজীবী কাহাকে বলে ? পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাসকারিসের পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। চিত্রসহ ইহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 104+110) ২০

৫। চিত্রসহ পায়রার বহিঃকঙ্কাল বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 395) ২০

৬। চিত্রসহ তারামাছের ওয়াটার ভাসকুলার সিস্টেম বর্ণনা কর এবং ইহার কাজগুলি লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 225)

Group C

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

৭। অভিযোজন কাহাকে বলে ? মেরুদণ্ডী প্রাণীদের গৌণ জলজ অভিযোজন বর্ণনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 299) ২০

৮। বিভিন্ন জুওজিওগ্রাফিক্যাল অঞ্চলের বিবরণ দাও এবং উহাদের প্রাণিগোষ্ঠীর উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 675) ২০

ZOOLOGY—PASS

First Paper

Candidates are required to give their answers in their own words as far a· practicable

Group A

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

১। যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ— ২×১০=২০

(ক) 'সিগ্‌নেট রিং' দশা কি ? পোষকের নাম লিখ যাহাতে প্লাজমোডিয়ামের এই দশা ঘটিয়া থাকে। (উঃ পৃষ্ঠা 33)

(খ) এণ্ডোস্টাইল কি এবং কোন্ প্রাণীতে পাওয়া যায় ? (উঃ পৃষ্ঠা 245)

(গ) জোঁককে অ্যানিলিডা পর্বে অন্তর্ভুক্তির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 114)

(ঘ) আরশোলার পা-এর বিভিন্ন অংশের নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 160)

(ঙ) ওলিগোপাইরিণ স্পার্ম কি ? কোন্ প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহা থাকে। (উঃ পৃষ্ঠা 210)

(চ হাইড্রোরাইজা কি ? কোন্ প্রাণীতে ইহা দেখা যায় ? (উঃ পৃষ্ঠা 61)

(ছ) ফাইসোস্‌টোমাস পট্‌কা কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 273)

(জ) ব্লাস্টোস্টাইল কি এবং কোন্ প্রাণীতে ইহা দেখা যায় ? (উঃ পৃষ্ঠা 65)

(ঝ) পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাসকারিসের পার্থক্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 104-05)

(ঞ) ম্যাড্রিপোরাইট কি এবং কোন প্রাণীতে ইহা ᐧᐧা যায় ? (উঃ পৃষ্ঠা 225)

(ট) ল্যাটিসে কয়টি পাইলোরিক সিকা বর্তমান এবং এগুলির কাজ কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 272)

(ঠ) র‍্যাডুলা কি এবং ইহা কোন্ প্রাণীতে দেখা যায় ? (উঃ পৃষ্ঠা 196)

(ড) রেক্টিসেস কি এবং পায়রাতে কয়টি রেক্টিসেস থাকে ? (উঃ পৃষ্ঠা 398)

(ঢ) পায়র. ; ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রে যে কপাটিকা আছে তাহার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 425)

(ণ) নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের দুইটি প্রাণীর নাম লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 677)

Group B

পূর্ণমান—৬৪

প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

২। সাইজোগোনি কি ? চিত্রসহ প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স-এর প্রি-এরিথ্রোসাইটিক, এরিথ্রোসাইটিক এবং এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক চক্র বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 32)

৩। চিত্রসহ হিরুডিনেরিয়ার শরীরের মধ্যভাগের প্রস্থচ্ছেদ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 117)

৪। শ্বসন কি ? চিত্রসহ পাইলার শ্বসনতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 199)

৫। অ্যাম্ফিওক্সাস্-এর রেচনতন্ত্র এবং রেচনপ্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 254)

৬। করোটিক নার্ভ কি ? ভেট্কীতে মোট কয়টি করোটিক নার্ভ আছে ? ১ম, ৩য়, ৫ম এবং ১০ম করোটিক নার্ভের নাম, উৎস, গন্তব্যস্থল এবং প্রকৃতি বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 331)

৭। চিত্রসহ আরশোলার উভয় জননতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 184-85)

৮। বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণসহ মলাস্কা পর্বের অধোশ্রেণী (সাবক্লাস) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর। (উঃ পৃষ্ঠা 569)

অথবা

যুক্তি ও উদাহরণসহ অ্যাম্ফিবিয়াদের বর্গ (অর্ডার) পর্যন্ত শ্রেণী বিন্যাস কর। (উঃ পৃষ্ঠা 613)

Group C

পূর্ণমান—১৬

প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

৯। অভিযোজন কি ? পায়রার ভোল্যান্ট অভিযোজন বর্ণনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 374)

১০। অভিব্যক্তি কি ? নয়াডারউইনতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 356)

ZOOLOGY—PASS

Second Paper

Group A

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

১। যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :— ২×১০=২০

(ক) ভারতবর্ষে চাষ হয় এমন চারটি রেশম মথের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 429)

(খ) রেশম মথের ছত্রাকঘটিত একটি রোগের নাম ও তাহার লক্ষণসমূহ লিখ।
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 435)

(গ) সিস্টেমিক কীটনাশক কাহাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 485)

(ঘ) কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে মুক্তা প্রস্তুত হয় ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 477)

(ঙ) কশিং-ওভার বাধাদানকারী দুই শর্তের নাম কর।
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 207)

(চ) ডীপ লিটার কাহাকে বলে ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 503)

(ছ) $\left(\frac{a+c}{+b+}\right)$ হইতে কি কি ক্রশ-ওভার গ্যামেট সৃষ্টি হইতে পারে ?

(উঃ (১) abc, (২) $+++$), (৩) $ab+$, (৪) $++c$, (৫) $a++$,
(৬) $+bc$

(জ) মাছের প্রণোদিত প্রজনন কি ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 255)

(ঝ) জেনেটিক বস্তুর বিশেষত্ব কি।ক ? ,(২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 238)

(ঞ) অ্যাল্‌বাইনিজম্ কি বংশানুক্রমিক ? ইহা বিরল কেন ?
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 150)

(ট) হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্র কাহাকে বলে ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 388)

(ঠ) এক্সোক্রিন এবং অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি কাহাকে বলে ?
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 380)

(ড) হিমো-এণ্ডোথেলিয়াল অমরা কাহাকে বলে ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 369)

(ঢ) কর্টিক্যাল বিক্রিয়া কি ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 344)

(ণ) সংযোগকারী কলা কি ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 382)

Group B

পূর্ণমান—৪৮

প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

২। ট্রাইপোরাইজা ইন্‌সারটুলাস্-এর জীবন-চক্র বর্ণনা কর। ইহা কিভাবে ফসলের ক্ষতি করে? কোন্ পরিবেশে ইহাদের প্রকোপ দেখা যায়? ইহার দমনের উপায়-গুলি বল। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 480)

৩। মধু কিভাবে তৈয়ারী হয়? আধুনিক উপায়ে মৌমাছি পালনের বর্ণনা দাও। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 438+441)

৪। একটি মুরগী-পোলট্রিকে আর্থিকভাবে লাভজনক করিতে যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 493)

৫। বাস্তুতন্ত্রের সহিত বন্যপ্রাণীর সম্পর্ক কি? পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঘ্র ও গণ্ডার সংরক্ষণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 533)

৬। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাক্ষা চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর। লাক্ষার ব্যবহার কি কি? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 445)

৭। ভারতবর্ষে চাষ হয় এমন দুইটি চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। পশ্চিমবঙ্গে চিংড়ি চাষের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 465+468)

Group C

পূর্ণমান—৩২

প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

যে-কোনো **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

৮। ড্রসোফিলা-এর লিঙ্গ-নির্ধারণে ব্রীজেস্-এর জীন-ভারসাম্য মতবাদ ব্যাখ্যা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 172)

৯। একটি প্রাণীকোষে মিয়োসিস্-এর প্রথম প্রফেজ দশা বর্ণনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 67)

১০। মুরগীর এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এণ্ডোডার্ম-এর উৎপত্তি বর্ণনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 357)

১১। ডাউন সিন্‌ড্রোম কি? ইহার কারণগুলি বর্ণনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 146)

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

ZOOLOGY—PASS

Second Paper

All questions are of equal value. Answer any four questions taking at least two from each group.

Group A

1. What do you mean by Parasite? Give an account of the life history of Giardia sp. (Ans. Page—29)
2. Classify phylum Coelenterata up to classes with Characters and examples. (Ans. Page—546+550)
3. Mention the structural peculiarities of *Fasciola hepatica* and its life history. (Ans. Page—95+99)
4. Describe the excretory system of *Hirudinaria* sp. (Ans. Page—125)
5. Describe the different parts of the alimentary canal in Cockroach and mention the role of midgut in digestion. (Ans. Page—164)
6. Why is the Star fish called an Echinoderm? Describe the water vascular system in *Asterias* sp. (Ans. Page—225)

Group B

7. Describe the structure of heart of Cavia and mention the course of circulation through it. (Ans. Page—486)
8. Compare the anatomical features Carinatae and Ratitae birds. (Ans. Page—644)
9. Describe the urino-genital systems in *Cavia* sp. (Ans. Page—506-510)
10. Write notes on :—Ampullae of Lorenzini (Ans. Page—O.S, Quill feather (Ans. Page—397), Poison apparatus of snake (Ans. Page—384), Fish scales (Ans. Page—267).

ZOOLOGY—PASS

Second Paper

Answer any five questions, taking at least two from each group.
The questions are of equal value.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable

Group A

1. Draw and describe the process of conjugation in *Paramoecium* What is the significance of conjugation? (Ans. Page—23)

2. Classify Phylum Porifera upto classes with distinctive characters and examples. (Ans. Page—542)

3. Describe the life history of *Obelia* and *Ascaris*. (Ans. Page—68+110)

4. Describe the respiratory organs and the mechanism of respiration in *Periplaneta*. (Ans. Page—168)

5. Draw and describe the nervous system of *Unio*.

6. Write short notes on any *four* of the following :

(*a*) Cilia in Protozoa (Ans. Page—16), (*b*) Spicules of *Sycon* (Ans. Page—56), (*c*) Radula of *Pila* (Ans. Page—196), (*d*) Crop in leech (Ans. Page—119), (*e*) Tube feet in starfish (Ans. Page—230), (*f*) Organ of Bojanus in *Unio*.

Group B

7. Classify Phylum Chordata upto classes giving distinctive characters and examples. (Ans. Page—580)

8. Compare the Urinogenital system of male and female *Bufo*. (Ans. Page—341-345)

9. Distinguish between poisonous and nonpoisonous snakes. (Ans. Page—387)

10. Describe the mechanism of flight in *Columba*. (Ans. Page—452)

11. Draw and describe the heart of Rabbit mentioning the circulation of blood through it. (Ans. Page—486)

12. Distinguish between (*any four*) :

(*i*) Single and double circulation in heart. (Ans. Page—276+486)

(*ii*) Ventricle and auricle. (Ans. Page—486)

(*iii*) Anus and vent. (Ans. Page—480+307)

(*iv*) Mullerian and Wolffian ducts.

(*v*) Amphicoelous and Procoelous vertebrae. (Ans. Page—269+303)

(*vi*) Ctenoid and cycloid scales. (Ans. Page—266)

(*vii*) Homodont and Heterodont dentition. (Ans. Page 365+468)

(*viii*) Hepatic portal and Renal portal systems. (Ans. Page—325)

Answer any *five* questions

যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

1. What is called locomotion ? Describe the different locomotory organs and mechanism of locomotion in Protozoa. 2+7+6=15

১। গমন কাহাকে বলে ? আদ্যপ্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার গমন প্রত্যঙ্গের গঠন এবং গমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

2. Define the term "Parasite". Describe the life history, pathogenicity and control of *Plasmodium vivax*. 2+8+3+2=15

২। "পরজীবী" শব্দের সঠিক বর্ণনা কর। প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স (*Plasmodium vivax*)-এর জীবন-ইতিহাস, সংক্রমণের ফল এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিবরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 32+41)

3. Describe the structures of different spicules found in sponges. Write note on their importance in the classification of Porifera. 11+4=15

৩। স্পঞ্জ দেহে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার স্পিকিউল (*Spicule*)-এর গঠন বর্ণনা কর। পরিফেরার শ্রেণী বিন্যাসে ইহার প্রয়োজনীয়তার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (উঃ পৃষ্ঠা 55)

4. What is meant by Alternation of generations ? Explain it with reference to the life history of any hydrozoan animal studied by you. 4+11=15

৪। "জনুঃক্রম" বলিতে কি বুঝায় ? তোমার পড়া য কোন হাইড্রোজোয়ান (*hydrozoan*) প্রাণীর জীবন-ইতিহাস আলোচনা করিয়া উহা ব্যাখ্যা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 69)

5. Give the distinctive characters and an account of the life-history of *Ancylostoma Juadenale*. 5+10=15

৫। অ্যানকাইলোস্টোমা ডিউওডিনেল (*Ancylostoma duodenale*)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখসহ জীবন-ইতিহাস-এর বিবরণ দাও।

6. Give a comparative account of excretion in Annelida. 15

৬। অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের রেচনের তুলনামূলক বিবরণ দাও।

7. State the anatomical peculiarities and systematic position of *Limulus*. 5+10=15

৭। গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখসহ প্রাণী সর্গে লিমুলাস (*Limulus*)-এর স্থান সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

8. **What is respiration? Give a comparative account of the respiratory organs and mechanism of respiration in Mollusca.**

2+13=15

৮। "শ্বসন" কি ? মোলাস্কা (*Mollusca*) বা শম্বুক জাতীয় প্রাণীর শ্বসনযন্ত্র এবং শ্বসন পদ্ধতির তুলনামূলক বিবরণ দাও।

9. **Write the distinctive characters of the phylum Echinodermata and mention its classes and orders with characters and examples.** **4+6+5=15**

৯। "একাইনোডর্মাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ এবং উহার শ্রেণী ও বর্গের নাম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ দাও। (উঃ পৃষ্ঠা 575)

প্রথম পত্র

প্রতি বিভাগ হইতে অন্ততঃ দুইটি প্রশ্নসহ যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক—বিভাগ

১। (ক) একটি আদর্শ প্রাণীকোষ বলিতে তুমি কি বোঝ ? ৪

(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 12)

(খ) সাইটোপ্লাজমের চারটি অঙ্গাণুর নাম লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 35) ৪

(গ) মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তির আধার বলা হয় কেন ? ৮

(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 38)

(ঘ) সোমাটিক কোষ ও জার্মকোষ বলিতে তুমি কি বোঝ ? ৪

(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 274)

২। (ক) মেণ্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রটি দাও। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 99)

(খ) দ্বিসংকর প্রজননের সাহায্যে উহা ব্যাখ্যা কর এবং ইহার F_2 জনুর ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত দেখাও। ৪+১৬ (১০+৬)

(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 102)

৩। জীব-বিবর্তন কি ? ডারউইনের রূপান্তরিত মতবাদের আলোচনা কর।

(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 280) ৪+১৬

৪। (ক) অভিযোজনের সংজ্ঞা দাও। ২

(খ) মুখ্য জলচর ও গৌণ জলচর প্রাণীর পার্থক্য লিখ। ৬

(গ) উপযুক্ত চিত্র সহকারে মাছ ব্যতীত অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জলজ অভিযোজনের বর্ণনা দাও। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 299) ১২

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারটি) : ৪×৫

(ক) দ্বিপদ নামকরণ। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 523)

(খ) হোমোজাইগাস এবং হেটেরোজাইগাস। (উঃ ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা 84)

(গ) ডি. এন. এ. (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 24)

(ঘ) সেণ্ট্রিওল। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 44)

(ঙ) ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 62)

(চ) জীবাশ্ম। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 260)

খ—বিভাগ

৬। ইকোসিস্টেম কি ?
ইকোসিস্টেমে শক্তির প্রবাহ আলোচনা কর। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 524)৪+১৬

৭। (ক) পরিপাক কি ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 551) ২

(খ) অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক বলিতে তুমি কি বোঝ ? ৪

(গ) মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান পরিপাক অঙ্গগুলি কি ? (উঃ পৃষ্ঠা 480) ৪

(ঘ) শর্করা ও প্রোটিন কিভাবে পরিপাক হয় ? ৫+৫
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 533)

৮। (ক) বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ? ৪
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 533)

(খ) অভয়ারণ্য (স্যাংচুয়ারী) বলিতে তুমি কি বোঝ ? ৪
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 546)

(গ) জলদাপাড়া, গীর ও সুন্দরবন কিসের জন্য প্রসিদ্ধ ? ৪×৩
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 546-547)

৯। Chick-এর অ্যামনিওন ও অ্যালানটয়েসের গঠন বর্ণনা কর এবং তাহাদের কার্য লিখ। (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 3‘ –365) ১৪+৩×২

১০। (ক) কলা কি ? (উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 374) ২

(খ) মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কত প্রকার কলা দেখা যায় ?
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 374)

(খ) মেরুদণ্ডী প্রাণীর যোগকলাতন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ১৪
(উঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা 395)

Second Paper

ক—বিভাগ

১। চিত্রসহযোগে একটি Amoeba-র গঠন বর্ণনা কর। ইহার অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গাণুর কার্যকলাপের বিবরণ দাও। Amoeba-র যৌন জনন পদ্ধতি আলোচনা কর। (উঃ পৃষ্ঠা 3) ৬+৪+১০

২। *Sycon*-এর দেহপ্রাচীরের বিভিন্ন প্রকার কোষের বিবরণ দাও ও প্রত্যেকটির কাজ উল্লেখ কর। (উঃ পৃষ্ঠা 55) ১২+৮

৩। *Ascaris*-এর জনন অঙ্গের এবং জীবন বৃত্তান্তের বিবরণ দাও। ১০+১০ (উঃ পৃষ্ঠা 109 & 110)

৪। পরিচ্ছন্ন চিত্রসহযোগে *Periplaneta*-র শ্বসনতন্ত্র ও শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা কর। Haemolymph কি? (উঃ পৃষ্ঠা 168) ১৮+২

৫। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসহ Echinodermata-কে শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস কর। প্রতিটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। ১৫+৫

খ—বিভাগ

১। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণসহ Chordata-কে শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস কর। (উঃ পৃঃ 575) ১৪+৬

২। *Branchiostoma*-র সম্মুখভাগের লম্বচ্ছেদ অঙ্কন কর। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশগুলি বর্ণনা কর এবং খাদ্যগ্রহণে উহাদের ভূমিকা উল্লেখ কর। ৫+৭+৮ (উঃ পৃঃ 243)

৩। *Scolidon*-এর সহিত একটি আদর্শ Teleost-এর তুলনা কর। ২০ (উঃ পৃঃ 611)

৪। পোর্টালতন্ত্র কি? পরিচ্ছন্ন চিত্রসহযোগে *Bufo*-র শিরাতন্ত্রের বর্ণনা দাও। (উঃ পৃঃ 325) ৪+১৭

৫। *Calotes*-এর রেচন-জননতন্ত্র অঙ্কন করিয়া বর্ণনা কর। (উঃ পৃঃ 3/9) ২০

৬। শ্বাসকার্যের সংজ্ঞা লেখ। চিত্রের সাহায্যে *Columba*-এর শ্বসন অঙ্গের বর্ণনা দাও। Double respiration কি? (উঃ পৃঃ 417) ৩+১৪+৩